পাঁচটি
রানী কাহিনী

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-২০

হঠাৎ পাওয়া গান

প্রথম প্রকাশ
১৯৬২

প্রকাশক :
সংস্কৃতি সংসদ
১/১২, রোল্যাণ্ড রোড,
কলকাতা-২০
৪৮-২০২২

লেখিকা পরিচিতি,
প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ :
দি রেডিয়েন্ট প্রসেস
৬ এ. এস. এন. ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা—১৩

মুদ্রক :
সুমুদ্রণ
১৪. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

জননী কৈকেয়ী



দৃষ্টিকোণ

রামায়ণে সবচেয়ে অবহেলিত এবং ঘৃণিত চরিত্র কৈকেয়ী। তাকে না হলে রামায়ণ হতো না। রামায়ণ রাম রাবণেব যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এহ বাহ্য। ভ্রাতৃবিরোধের পরিণামকে ভ্রাতৃপ্রেমে উত্তরণের অবলম্বন হিসাবে রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধ কাহিনীর প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়েছে। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রামচন্দ্র বনে গেল; এই স্থূল যুক্তিতেও বিশ্বাসী নই। অযোধ্যার আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল রাজনীতি রামচন্দ্রকে আত্মরক্ষার জন্য বনে যেতে বাধ্য করেছিল। এই সত্য ঢাকতে পিতৃসত্যের অবতারণা। কৈকেয়ী রামচন্দ্রের বিমাতা, দশরথের অনার্যা পত্নী বলে তাকেই নিমিত্তের ভাগী করা খুব সহজ হলো। রাম-রাবণের যুদ্ধকাব্য রামায়ণ রচনায় কৈকেয়ীর ইন্ধন। তার নিষ্কলুষ মাতৃত্বকে কলঙ্কিত করা হলো। হাজার হাজার বছর ধরে কৈকেয়ী সেই কলঙ্কের ভারে ন্যুব্জ।

হঠাৎ আধুনিক লেখকের মনে প্রশ্ন জাগল, যে জননীর বক্ষদেশে মাতৃত্বের অমৃতকুণ্ড, সেই নির্মল মাতৃবক্ষ থেকে হঠাৎ হলাহল উঠল কেন? সেবা, করুণা, আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি কৈকেয়ীর সন্তানে আত্মপর নেই। তাহলে তার মাতৃত্বের পরিণাম এত করুণ, হৃদয়হীন হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর রামায়ণে চাপা পড়ে আছে।

এই উপন্যাস কৈকেয়ীর জননীরূপকে খুঁজবার জন্য এবং বুঝবার জন্য। অযোধ্যার আকাশছোঁয়া প্রাসাদচূড়ার অভ্যন্তরে অযোধ্যার সিংহাসন নিয়ে যে পারিবারিক কলহ এবং ষড়যন্ত্র চলছিল তার অন্তঃস্রোতে ইক্ষ্বাকুবংশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে কেমন করে তা জীর্ণ করছিল ইক্ষ্বাকু রাজবংশকে তার এক মর্মন্তুদ কাহিনী উদঘাটন করে বোঝাতে চেয়েছি কৈকেয়ী নির্দোষ। আসলে, তার শুভ্র নির্মল মাতৃত্ব হল রাজনীতির শিকার। কৈকেয়ীর প্রবল মাতৃত্বের অভিমান তার দুর্ভাগ্যের কারণ। দশবথের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কৈকেয়ী সহধর্মিণীর কর্তব্য করেছে। ভরতের সিংহাসন চাওয়া কোন স্বার্থপরতা নয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে কৈকেয়ীর কোন কাজই পাপ নয়। পরিশেষে, আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত দুঃখিত, ব্যথিত কৈকেয়ী যখন কুলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরতের সঙ্গে বনগমন করল তখন কৈকেয়ীকে কোন বিচারে বলব, সে সর্ব কর্মনাশা, সে পাপী, ডাইনী, রাক্ষুসী?

রামায়ণে কৈকেয়ী কখনো দ্বিতীয়া মহিষী কখনো কনিষ্ঠা মহিষী বলে উল্লিখিত হয়েছে। কনিষ্ঠা মহিষী রূপে তাকে গ্রহণ করা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাকে বিবাহ করার পর দশরথ সন্তানের পিতা হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গের চরু ভক্ষণের ঘটনা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। দশরথের লিঙ্গদৌর্বল্য এবং প্রজননশক্তি

পুনরুদ্ধারের সাফল্যে দশরথ যদি জনক হয় তাহলে সুমিত্রাকে অবশ্যই কৈকেয়ীর অগ্রে স্থান দিতে হয়।

ভরতকে দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে খাড়া করেনি, তবে তার ধারণা সৃষ্টি করেছি। কারণ ভরত সম্পর্কে দশরথের মনে একটা অহেতু ভীতি ছিল। দশরথের মনে ভরত সম্পর্কে ভীতিকেই আমি ভরতের জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে ধরেছি।

ভরত শত্রুঘ্ন আমার চোখে কৈকেয়ীয় যমজ পুত্র ছাড়া কিছু নয়। বাল্য থেকেই ভরত শত্রুঘ্ন কেকেয়রাজ্যে অবস্থান করছে। বিবাহের সময় ভরত শত্রুঘ্নকে আনার জন্য মিথিলা থেকে কেকয়ে দূত গিয়েছিল। কৈকেয়ী দশরথের কাছে অন্য রানীর দুই পুত্রের নির্বাসন চেয়েছিল। কিন্তু শত্রুঘ্নের কোন উল্লেখ নেই। এহ বাহ্য। শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণের মধ্যে যমজের ভ্রাতৃত্ববোধের এবং একাত্মবোধের কোন লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়নি। এক বীজ থেকে যে দুটি প্রাণের জন্ম, তাদের আকর্ষণের একাত্মতায় যে যমজসুলভ ভাব থাকা উচিত তা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মধ্যে কোথাও দেখি না। বরং ভরত শত্রুঘ্নের মধ্যে পাই।

পরিশেষে বলব, রামায়ণ পাঠ রসাস্বাদনের আনন্দের দিকে নজর রেখেই বইটিকে সবদিক দিয়ে আধুনিক কালের উপযোগী করতে চেষ্টা করেছি। আমার প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকারাই তা বিচার করবেন। কৈকেয়ীর উপেক্ষিত অবহেলিত মাতৃত্বকে যদি সত্যই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পেরে থাকি তবে আমার শ্রম সফল হয়েছে বুঝব। এ সম্পর্কে কারো কোনো অভিমত থাকলে অবশ্যই লেখককে জানাতে পারেন।

ডঃ দীপক চন্দ্র

ঝিলাম নদীর তীরে সুন্দর মনোরম নগরী গির্জাক। কেকয় রাজ্যের রাজধানী। দুর্ধর্ষ উপজাতি অধ্যুষিত কেকয় রাজ্যের নৃপতি হলেন অনুবংশের অশ্বপতি। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। অতিথিবৎসল বলে খ্যাতি আছে তাঁর। অতিথিকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করেন। অতিথি শত্রু হলেও সমাদরের কোন কার্পণ্য নেই তাঁর।

অকস্মাৎ অযোধ্যার রাষ্ট্রদূতের আগমন উপলক্ষ করে কেকয়ের নানা লোক নানরকম কথা বলতে লাগল। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। যে যার নিজের দিক থেকে ব্যাখ্যা করল। অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা হল রাজসভায়। প্রত্যেকের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তবু মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। মতান্তর বাদ প্রতিবাদের উত্তেজনা জমে উঠল রাজধানীর মজলিসে মজলিসে। অবশেষে গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে রাজসভা বসল।

কাঞ্চন নির্মিত বেদীতে স্থাপিত স্বর্ণ সিংহাসনে মহারাজ অশ্বপতি উপবিষ্ট। তাঁকে গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল। গালে হাত রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকলকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। পাত্র মিত্র সভাসদও নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিল। অমাত্য প্রধান সুবীর উঠে দাঁড়িয়ে রাজসভার মধ্যে বলল : মহারাজ, অনুমতি করলে নগরবাসীরা যা বলছে, আমি নিবেদন করতে পারি। বেশির ভাগ নাগরিকের মত হল যে, দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরের অধীপতি শম্বর মহারাজের বন্ধু। আমাদের মিত্র রাজা। তিনি এখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধরত। তাঁকে আক্রমণের উদ্দেশ্যেই অযোধ্যাপতি চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিয়ে আসছেন। ব্রহ্মাবর্তের পথে রাজা দশরথ আমাদের রাজ্যে আতিথ্য গ্রহণ করলে কার্যত শম্বরের মনে আমাদের সম্পর্কে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হবে। এই ভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেকয়ের মাটিতে পা রাখছে। এ সময় তাঁকে রাজনৈতিক আতিথ্য জ্ঞাপন করলে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। দশরথের আতিথ্যগ্রহণের মতলব বন্ধুজনোচিত নয়।

প্রধান পুরোহিত বলল মহারাজের অনুমতি পেলে আমি দু'চার কথা সংযোজন করতে পারি। অশ্বপতি মাথা নেড়ে তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রাজাদেশ লাভ করে পুরোহিত বলল : দশরথ একজন চতুর ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। অতএব এ আগমন কিছুতে তাঁর সদিচ্ছা সফর নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আমাদেরও রাজনৈতিক ভাবে নিতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের স্বরূপ নিয়ে যত মতভেদ।

যুবরাজ ভদ্র অধৈর্য হয়ে বলল : মতভেদ থাকবে কেন? আমরা অনুবংশের লোক। শম্বর আমাদের বন্ধু ও স্ববংশীয়। রাক্ষসদের মতো অসুরদের একটি পৃথক দুনিয়া প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে শম্বর রাবণের বন্ধু ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। দেবলোককে সে অসুরলোক করবে। এতে অন্যায় কোথায়? রাবণের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। তাই দেব-বিরোধী গোষ্ঠী নিয়ে রাবণের ঐক্য ভাঙারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। দেবতারা আমাদের শত্রু। উপজাতি বংশোদ্ভূত অনুবংশীয় বীরদের ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করে তারা। বিদ্রূপ করে। অবহেলা দেখায়। তাই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে আমরা জাতীয় কর্তব্য মনে করি। পিতা হলেন শম্বরের পুরোনো বান্ধব। দেবতাদের সঙ্গে সংঘর্ষে পিতা শম্বরের পক্ষে। এঁরা দুইজন একত্রে যুদ্ধ করলে দেবলোকের সাধ্য নেই তাদের প্রতিরোধ করে। এমনিতে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। এরকম একটি সুন্দর সুযোগে শম্বরের দেবলোক আক্রমণ আমরা সমর্থন করি! কিন্তু দশরথ আসছেন আমাদের বিভেদ

বাড়াতে। সুতরাং, তাঁকে কেকয়রাজ্যের অতিথিরূপে বরণ করা কতখানি সঙ্গত পিতাকে তা ভেবে দেখতে হবে।

সেনাপতি অশ্বসেন বলল : অযোধ্যাপতি দশরথ কখনই অতিথির যোগ্য নন। কেকয় রাজ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর চতুরঙ্গ বাহিনীর যাত্রা কিছুতে অনুমোদন করা যায় না। এতে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সমরাভিযান তাঁর সামরিক বাহিনীর মহড়া। বিপক্ষদলের মনে অকারণ একটা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের মনোবল নষ্ট করা এবং এক দুঃসহ স্নায়ু উত্তেজনায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত ও ত্রস্ত রেখে তাদের আত্মবল ধ্বংস করে, তাদের সামরিক প্রতিক্রিয়া ও মতিগতি নির্ণয় করার এক চমৎকার দাওয়াই এই সামরিক মহড়া। শত্রুকে হুঁশিয়ার করা এবং তার আচরণকে যথেষ্ট সংযত ও শান্ত রাখার এক পরোক্ষ চাপ। চতুর অযোধ্যাপতি ঠাণ্ডা মাথায় স্নায়ু যুদ্ধের এক উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে শম্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও বন্ধুত্ব জাগ্রত করে এক বৃহৎ রাজনৈতিক জয় আদায়ের ফন্দী এঁটেছেন। শম্বরের সঙ্গে আমাদের বিভেদ সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর জয়ে আমাদের পরাজয়। এ কথা মনে রেখে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

মন্ত্রীবর সুবীর ধীরে ধীরে শান্ত গলায় বলল : সেনাপতি অশ্বসেনের বক্তব্য আমি সমর্থন করি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, শম্বরকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করার কৌশলরূপে ধূর্তরাজা সরল, মহাপ্রাণ, অতিথিবৎসল কেকয় রাজকে ব্যবহার করবে। অথবা, কেকয় রাজ্যের দুর্বলতার রন্ধ্রপথগুলি অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দাবি আদায়ের চাপ সৃষ্টি করবে।

তারপর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মন্ত্রীবর সুবীর পুনরায় বলল : আমার আরো ধারণা, অত্যন্ত সজ্জন, অতিথিবৎসল কেকয়রাজকে আতিথেয়তায় ব্যস্ত রেখে শম্বরকে নির্বান্ধব করাও তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার বিশাল সৈন্যবাহিনীর আহারাদি এবং অন্যান্য সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে কেকয়ের শস্যভাণ্ডার এবং অর্থ ভাণ্ডারে যথেষ্ট টান পড়বে। এর ফলে কেকয় রাজ্যে বেশ একটা অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টি হবে। বিপুল ক্ষয় ক্ষতির অঙ্কে কেকয় রাজ্যে এমন এক দুর্বিষহ অবস্থার উদ্ভব হবে যা তার নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। অতএব অযোধ্যাপতির প্রবেশ নিরর্থক এবং ক্ষতিকর।

কেকয়রাজ অশ্বপতি কিন্তু এত সব কথার মধ্যে একটি কথাও বললেন না। মনোযোগ সহকারে সকলের কথা শুনছিলেন। প্রত্যেকের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি এবং চিন্তা ছিল। নিজেকে যথাসম্ভব তাদের আলোচনা থেকে দূরে রেখে নিরাবেগ চিত্তে তাদের শণিত কথাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করছিলেন। অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। আস্তে আস্তে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন : মহামতি দশরথের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমাদের অপরিজ্ঞাত। তবু তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা হল তাতে প্রত্যেকের দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, বন্ধুত্বের মর্যাদারক্ষায় আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকের কথা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত। আপনাদের মত আমি এদেশের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষায় সচেতন। আপনাদের সকলের বক্তব্য যত যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, অনুমানের উপর নির্ভর করে শুধু সন্দেহের বশে তাঁর আতিথ্যের আবেদনকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আপনাদের পুনর্বিবেচনার জন্যই আমি কতকগুলি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। অকারণ শত্রু সৃষ্টি করা রাজনীতির ধর্ম নয়। মিত্র আচরণে পরিতুষ্ট রেখে হৃদয় জয় করা শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের কূটকৌশল। তাই বলছি, মাননীয় অতিথিকে অকারণ সন্দেহের চোখে দেখে যদি ভুল করি তা-হলে শত্রুর হাতই শক্ত হবে তাতে। সমাদরে যাকে ধন্য করতে পারি, অনাদর করে তাকে শত্রু করব কেন? তাঁর বিশাল সমরবাহিনী সম্পর্কে সেনাপতি অশ্বসেনের আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই। রাজ্যের ভেতর দিয়ে সেনাবাহিনী গেলেই যে রাজ্য জয় হয়ে গেল, আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের সতর্ক সেনাবাহিনী সর্বদা মিত্রবাহিনীকে বেষ্টন করে আছে। রাজ্য সীমার বাইরে বেরোনোর পথ বন্ধ। বাইরের পথ খোলা না থাকলে অবরুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায় না। রসদ এবং যুদ্ধাস্ত্রের নিয়মিত সরবরাহের পথ বন্ধ রেখে কোন মূর্খও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এই সরল সত্য কথাটা মনে রাখলে আর আশঙ্কা থাকবে না। অতএব, আপনাদের সম্মতি পেলে মহামান্য অতিথি বরণের আয়োজন করতে পারি।

অশ্বপতির পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হল সভায়। সবাই একবাক্যে তাঁর বক্তব্য অনুমোদন করল।

অতিথিবরণের সাজসাজ রব পড়ে গেল রাজধানী গির্জাকে। সমগ্র নগরী উৎসবের রূপ পেল। পত্র পুষ্পে পল্লবে পতাকায় সজ্জিত করা হল বিশাল রাজপথ। প্রতিটি পথের সংযোগস্থলে তোরণ নির্মিত হল। রাজপ্রাসাদও রূপে রঙে রেখায় অপরূপ হয়ে উঠল। স্বয়ং কেকয়রাজ অযোধ্যাপতি দশরথকে সমাদর করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

দশরথ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ অযোধ্যার বিখ্যাত মূল্যবান শিল্পদ্রব্য, উপহার সামগ্রী এবং বহু সুন্দরী রমণী কেকয়রাজকে দিয়ে প্রীত করল।

দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরের অধিপতি শম্বর চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত করে ব্রহ্মালোক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। লক্ষ্য তার ইন্দ্রলোক জয়। রাবণের সঙ্গে ইন্দ্রের সখ্য সম্পর্ক তার মনঃপূত হয়নি। রাবণের একাধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তাকে ঈর্ষান্বিত করল। ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিয়ে রাক্ষস ও অসুরের বিরোধ পুরনো। সেই বিরোধের ইন্ধন দিয়ে সে এক বিভেদের রাজনীতি সূচনা করল। অসুরদের একত্র করে সে এক পৃথক অসুরভূমি গঠনের সংকল্প প্রকাশ করল। কিন্তু তার সংগ্রাম রাবণের সঙ্গে নয়, দেবতাদের বিরুদ্ধে।

শম্বরের সঙ্কল্প সব অসুর অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচার করা হল। কিন্তু অনেকে রাবণের ভয়ে এবং ঐক্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় শম্বরের আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ এবং ভীতি প্রদর্শন করা হল। সব অসুর প্রধানের কাছে তার আদেশ নির্দেশ নতুন নতুন করে জারি হল। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও দেবলোক নিশ্চিহ্ন করে ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানটিকে সে মুছে ফেলবে। অধিকৃত দেবভূমি অসুরভূমি নামে অভিহিত হবে। শুধু অসুরেরা থাকবে সে রাজ্যে। শম্বরের অভিনব ঘোষণায় প্রতিটি বীর অসুরের রক্ত যুদ্ধের জন্য নেচে উঠল। যুধাস্ত্র ভর্তি শকট সাজিয়ে তারা শম্বরের সঙ্গে ব্রহ্মাবর্তে যাত্রা করল। প্রতিটি যোদ্ধার মুখে দেবলোকের প্রতি সুতীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি। চোখে তাদের অনাগত এক অসুর রাজ্যের স্বপ্ন।

দেবলোক থেকে সে খবর পৌঁছল আর্যাবর্তে। ইন্দ্র সবার কাছে আবেদন জানাল। সকলের সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোন আর্যনৃপতি এগিয়ে গেল না। রাবণের রক্তচক্ষুকে ভয় পেল তারা। আর্যাবর্তের প্রধান নরনাথ অযোধ্যা মহীপতি দশরথকে প্রতিনিধি করে তারা ইন্দ্রলোকে পাঠাল। সব আর্যরাজাই গোপনে নিজ নিজ বাহিনী থেকে বেশ কিছু সৈন্য, অস্ত্র, অশ্ব, শকট, খাদ্য, রথ প্রভৃতি দিল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে দশরথ মধ্যাহ্নসূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিল।

যাত্রার সময় দশরথ নানা রকম দামী নয়ন মনোহর উপহার সামগ্রী নিয়েছিল। গোড়াতেই সে মতলব করেছিল কেকয়রাজ্যের অধিপতি অশ্বপতিকে বশ করতে পারলে দেবাসুরের সংগ্রামের চিত্র বদলে যাবে। কারণ অশ্বপতি এবং শম্বর দুই বন্ধু। তাদের প্রণয়ও গাঢ়। শম্বরের দক্ষিণ হস্তও বটে। অশ্বপতির সৈন্যবাহিনী বিশাল। প্রত্যেকেই রণকুশলী এবং কষ্টসহিষ্ণু। জীবন মরণ পণ করে এরা যুদ্ধ করে। সুতরাং, দেবতাদের সঙ্গে রণে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলে অনেকখানি জয় আদায় করা সম্ভব হবে। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবে কোন্ মন্ত্রবলে? তবু দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার একটা উপায় সে চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে চরের মুখে জানতে পারল, অশ্বপতি ভীষণ অতিথিবৎসল রাজা। অতিথি তাঁর কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতিথি শত্রু হলেও অশ্বপতি সমাদরের কোন ত্রুটি রাখেন না। এই চরিত্রগুণটিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে দশরথ তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠাল। এবং ম্লেচ্ছরাজ্য কেকয়ের ভেতর দিয়েই সে ব্রহ্মালোকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অশ্বপতির আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন করা সম্ভব বলে মনে হল।

দশরথের সম্মানে কয়েকদিন ধরে উৎসব চলল কেকয়ে। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান এর আনন্দ

উৎসবে রাজপ্রাসাদ মেতে রইল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথকে দেখার জন্য রাজ্যের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সমাগম হল সেখানে। এছাড়াও প্রতিদিন বহু দর্শনার্থীর ভিড় লেগেই ছিল। দশরথের শিষ্ট আচরণে, সুমিষ্ট ভাষণে সকলে তুষ্ট হল। ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি থেকে আরম্ভ করে সম্ভ্রান্ত সকল ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে নিজেকে ধন্য মনে করল।

অতিথির আদর, যত্ন পরিচর্যার একটুও ত্রুটি রাখলেন না অশ্বপতি। সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যে আতিথেয়তায় অন্তরঙ্গতায় দশরথ অভিভূত হল।

অবশেষে যাত্রার দিন উপস্থিত হল। যাত্রার আগে দশরথ শিবমন্দিরে গেল পূজা দিতে। কেকয়রাজ অশ্বপতিও তার সঙ্গে রইলেন। সুসজ্জিত সপ্ত অশ্ববাহিত রথে তাঁরা দু'জন মন্দিরে গেলেন।

মন্দিরে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ীর উপর। পূজারী পুরোহিত পূজাবিধি পালনে দশরথকে যত সাহায্য করুক আর আপ্যায়ন করুক, পরিচর্যা রমণীয় হয় রমণীর সেবা ও সান্নিধ্যে। অতিথি সেবা ত্রুটিহীন করতে আতিথেয়তাকে আরো অন্তরঙ্গ ও মধুর করতে কেকয়রাজ আপন দুহিতাকে মন্দিরে নিযুক্ত করলেন।

মন্দিরের পথ পুষ্পমাল্যে এবং নানাবর্ণের পতাকায় সজ্জিত করা হল। দু'একটি তোরণও রাজপথে নির্মিত হল। উঁচু চড়াই পাহাড়ী পথের দুধারে উৎসুক মানুষের ভিড়। জনতার অভিনন্দন এবং হর্ষ কুড়োতে কুড়োতে দশরথের রথ ভিড়ের ভিতর দিয়ে মন্দগতিতে এগিয়ে চলল।

রথ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল। পুরনারীরা উলু ও শঙ্খধ্বনি দিল। যুবরাজ ভদ্র এবং মন্ত্রীবর সুবীর দুজনে দশরথকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। জনতা জয়ধ্বনি দিল। সকলের সঙ্গে দশরথ মন্দিরে প্রবেশ করল। অমনি সুগন্ধী পুষ্প বলয়ে সজ্জিতা একদল নৃত্য পটীয়সী যৌবনবতী দেবদাসী মরালীর মতো ভেসে ভেসে এল নাটমঞ্চে। প্রস্ফুটিত ফুলের মতো সজীব এই সুযৌবনা দেবদাসীরা তাদের যৌবনপুষ্ট দেহের লীলায়িত বিন্যাসে বিচিত্রমুদ্রা রচনা করে নাচতে লাগল। নাচছিল পাগলের মতো। সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো দুলছিল তাদের দেহ। বিদ্যুতে রেখার মতো তাদের আঁখিকোণে কটাক্ষ মুহুর্মুহু ঝলক দিচ্ছিল। রঙিন কাঁচুলির আড়ালে দুটি বক্ষ গোলক উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে ঘন ঘন কাঁপছিল। ললনারা চক্রকারে পাক দিতে দিতে উল্কার মতো ছুটে গেল দেব বিগ্রহের দিকে। নাটমঞ্চ থেকে দেখা যাচ্ছিল কাঞ্চনময় মঞ্চে রক্ষিত হর পার্বতীর অনুপম যুগল শিলামূর্তি। নর্তকীরা সকলে একসঙ্গে হরপার্বতীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর মাথা রেখে তারা আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করল!

দশরথের দুই চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা। অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো অশ্বপতি, ভদ্র প্রমুখদের অনুসরণ করল। আলো ঝলমল মন্দির দ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তারা।

দশরথের চোখের তারায় তখনও অনাস্বাদিতপূর্ব সুখানুভূতির আবেশ। মৃদুগতি মরালীর মতো সামনে এসে দাঁড়াল কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী। কৈকেয়ী গৌরবর্ণা। প্রতিমার মতো নিখুঁত মুখ। ছোট কপাল তার চমৎকার। থোকায় থোকায় নেমে আগা চুল কোমর পর্যন্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঝর্নার মতো অবিন্যস্ত তার কেশদাম। মসৃণ ত্বক, চোখা নাক, খাসা চোখ। নীলকান্ত মণির মতো চোখের তারা দুটি। পল্লবঘন চোখ দুটি সরোবরের মতো স্থির, শান্ত। অগাধ ও গভীর। কি গভীর অনুভূতি মাখানো চাহনি। ঘুম ঘুম আবেশে বিভোর। বর্তুলকার চিবুক, বিম্বফল সদৃশ ঠোঁট, মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁত, ঝিনুকের মতো কান, মরালের মতো গ্রীবা, শঙ্খের মতো পয়োধর। যাকিছু রমণীয় এবং সুন্দর ঈশ্বর যেন উজাড় করে দিয়ে অনুপমা করে গড়েছেন তাকে!

দশরথ স্তব্ধ। চোখের পলক পড়ে না তার। চোখ দুটো খদ্যোতের মতো জ্বলে। কৈকেয়ীর উদগ্র যৌবন যেন মরীচিকার মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল। তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে দশরথ তার দিকে চেয়েছিল।

কৈকেয়ীর বর্ণাঢ্য পোশাক আর ঝকমকে অলঙ্কার শোভিত তনু বহুমূল্যের রত্নখচিত হাল্কা নীল শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকার। নীবিবন্ধ থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ের কুঁচি উরুর দুইদিকে সমান

ভাবে পাটে পাটে থাকে থাকে নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। কোমরের উর্ধ্বভাগে চুমকির কাঁচুলি ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। বিমুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি থেকে কমনীয় উর্ধ্বাঙ্গকে ঢেকে রাখার কোন সামাজিক অনুশাসন উপজাতি সমাজে নেই। রাজকন্যা হলেও উপজাতি সমাজের রীতি তাকেও মানতে হয়। অলঙ্কার প্রিয় উপজাতি রমণীর মতো কৈকেয়ীও তার তন্বী সুঠাম অবয়ব সাজিয়ে তুলেছে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে। ঝিনুকের মতো দুটি কানে মুক্তোর ঝুমকো, চন্দ্রশোভার মতো ললাটে টায়রা, বল্লরীর মতো ভুজদ্বয়ে কঙ্কন, বলয়, পদ্মনালের মতো কণ্ঠে হারের লহর। মেঘবরন কুন্তলে থোকা থোকা সুগন্ধী পুষ্পগুচ্ছর সঙ্গে সোনার কাঁটা আর চিরুনী। সব অলঙ্কারে সোনার উপর জড়োয়া কাজ। চুনির পাশে পান্না, পীতাভ পোখরাজ আর হীরে, মোতি জহরৎ মিশে রঙের ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছে। ফুল্লপয়োধরের পীতবর্ণ রেশমীর কাঁচুলিতে মরকতের গায়ে সোনা আর পদ্মরাগ মণি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রূপ নয় রূপের আগুন। সে আগুনে পুরুষের মন পোড়ে, দেহ জ্বলে।

দশরথের আকস্মিক ভাবান্তর চতুর অশ্বপতির দৃষ্টি এড়াল না। অধরে তাঁর গর্বিত হাসি ফুটল। চোরা চোখে তাকাতে গিয়ে দশরথের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। বিব্রত লজ্জায় সংকুচিত হল দশরথ। নিজেকে সংযত করার জন্যে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। বিভ্রান্ত চাহনিতে কামনার আগুন নিভে গিয়ে ফুটে উঠল অকপট বিস্ময়।

অশ্বপতি কৈকেয়ীর অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে গর্বিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন : আমার কন্যা কৈকেয়ী।

অশ্বপতির ইংগিত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল।

একথা শুনে লাজুক অপ্রতিভতায় দশরথের ভুরু কোঁচকাল। মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। শরবিদ্ধ হরিণের মতো আর্তস্বর তার কণ্ঠ থেকে তৎক্ষণাৎ নির্গত হল : অঃ!

কৈকেয়ীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব তার ভরা যৌবনের ব্যাক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলল। রূপের দেমাকেই সে যেন একটু বেশি স্বতন্ত্র। তবু দশরথের মনে হল, সত্যিই অসাধারণ সে। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু একটা ভীষণ দুর্বলতায় তার বুক কাঁপছিল। লজ্জা পাচ্ছিল। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কেমন বেদনাচ্ছন্ন আর সকরুণ সে দৃষ্টি।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৈকেয়ীর সুডৌল মুখখানা। মধুর কণ্ঠে বলল : মহারাজ পবিত্র গঙ্গাজলে আচমন করে হরপার্বতীর বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করুন আমার সঙ্গে। তারপর গন্ধধূপ আর পুষ্প দিয়ে দেবতার অর্ঘের আয়োজন করুন।

দশরথ সহসা কথা বলতে পারল না। সম্মোহিতের মতো তার অনুগমন করল। মধুর প্রসন্নতায়, আবিষ্ট তার চেতনা। রাজেন্দ্রাণীর মতো কৈকেয়ীব শান্ত সমাহিত রূপের ঐশ্বর্য তাকে কৈকেয়ীর দিকে বেগে আকর্ষণ করতে লাগল। বাসনা অনন্ত কামনার দীপ হয়ে জ্বলছিল বুকে। বাসনা পুরণের উন্মাদনায় আকুল হল সে। কারণ, বীর চায় প্রতিমুহূর্তে নিজের জীবনকে সার্থক করে পেতে। জীবন তার কাছে খেলার, আনন্দের উপভোগের। জীবনকে বাজি রেখে বীর জীবন মরণ যুদ্ধে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যেমন তার বুক কাঁপে না, তেমনি জীবনের সুখ, তৃপ্তি আনন্দের জন্য বীর্যের গর্বে সুন্দরী নারীকে দাবি করতেও কুণ্ঠা নেই তার। এ হল বীর-ধর্ম। এ দাবি সব বীর্যবান পুরুষের। পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য ধন বীর কামনা করে। একে ভাগ্যের প্রসাদ বা অনুগ্রহ মনে করে না। দাবিই মনে করে। রূপবতী কৈকেয়ী দশরথের হৃদয়ে সেই অনুচ্চারিত দাবির প্রতিধ্বনি করল।

বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করতে করতে অপরাধীর মতো নিজের ত্রুটি স্বীকার করে সংযত স্বরে আত্মনিবেদনের ভাষায় বলল : রাজকন্যা আমি তো এদেশের ধর্ম কর্মের রীতি নীতি জানি না। তুমি আমার হাত ধরে শিখিয়ে নাও।

বিগ্রহের পিছনে ছাই ছাই অন্ধকার। তবু, দশরথ কৈকেয়ীর নিঃশব্দ হাসির ভেতর তার উদ্দাম প্রাণের ইশারা ফুটে উঠতে দেখল। অমনি বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠল। আদিম কামনা প্রগলভ করে তুলল তাকে। ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল : প্রেমের দেবতা হর পার্বতীর ভাষা শুনতে পাচ্ছ রাজকন্যা?

মন্দির অভ্যন্তরে নিথর স্তব্ধতার ভেতর তার কথাগুলো কাতর কান্নার মতো শোনাল।

দশরথের প্রশ্নে কৈকেয়ী থমকে দাঁড়াল। বিগ্রহের সুউচ্চ কাঞ্চন মঞ্চে কান পাতল। গোল মুখে, কাজল কালো চোখের তারায় হাসি হাসি সরলতা, কৌতুকে উজ্জ্বল। ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল: প্রেমের দেবতা পাষাণ। তাঁর হৃদয় নেই। তবু মানুষের প্রাণের বীণায় তার মৌন স্তম্ভিত প্রেমের অব্যক্ত বাণী সুর হয়ে ওঠে। এ জন্যেই নিদ্রিত দেবতাকে বলে জাগ্রত।

বিচিত্র একটা পুলকানুভূতিতে দশরথের মনটা প্রজ্জ্বলিত মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল। আকস্মাৎ শত কৌতূহলিত মানুষের দৃষ্টির সম্মুখবর্তী হওয়ার জন্য নিজের আবেগকে মুহূর্তের জন্য সংযত করল। তারপর, পুনরায় দৃষ্টি অন্তরালবর্তী হলে, নিচু গলায় বলল : রাজকন্যা, যুগ-যুগান্তর ধরে প্রেম মানুষের রক্তে বহমান। সরল ধর্মবিশ্বাসের আলোয় তাকে আরো উজ্জ্বল এবং শাশ্বত করে তুলতে এই পাষাণ বিগ্রহের আয়োজন। হরপার্বতীর ঐ যুগল রূপ অনাদিকাল ধরে ঈশ্বরের বাণী শোনাচ্ছে। বলছে : মানুষ তুমি পশু নও, অমৃতের সন্তান! তোমার ভেতরের পশুকে প্রেম সুন্দর করে। বিশ্ব চারাচরের মানুষের কল্যাণের প্রতীক প্রেমের এই যুগল বিগ্রহ। প্রেমের বীর্যে মানুষ সুন্দর হয়। মহান হয়।

কৈকেয়ী কথা বলতে পারল না। প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বিস্মিত বিহ্বলতা নামল তার দুই চোখে। তার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হল তীব্র একটা আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। তথাপি, বুকের ভেতর জলতরঙ্গের মতো রিন রিন করে বাজছিল দশরথের কথাগুলো। স্তিমিত আলোয় দেখল দশরথের অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যৌবন সমুজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ দেহ এবং স্বাস্থ্য। তারুণ্যের সৌন্দর্য, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, কমনীয়তা অটুট তার শরীরে। প্রস্ফুটিত পুষ্প যেমন ভ্রমরকে আকর্ষণ করে তেমনি একটা আকর্ষণ তার অবয়বে, নম্র চাহনিতে; পনীরের মতো কোমল রক্তবর্ণ অধরে। নিদারুণ উত্তেজনায় কৈকেয়ীর দেহমন বিকল হয়ে গেল। আধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। দৃপ্ত যৌবনা রমণীর সেই অনির্বচনীয় লাজুক অপ্রতিভ সৌন্দর্যের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দশরথ তাকিয়ে রইল। নিরীক্ষণ শুধু করল না, হৃদয়ঙ্গমও করল। কৈকেয়ীর দুই চক্ষু বোজা। বিপুল আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত হল দশরথ। নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘনীভূত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। বলল : স্তিমিত আলোতেই তোমাকে দেখতে আমার ভাল লাগছে রাজকন্যা। নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতে এত আনন্দ হচ্ছে কেন? ভক্ত যেমন সর্বস্ব নিবেদন করে দেবতাকে, ঠিক তেমনি দীনাতিদীন প্রার্থীর মতো আমিও নিজেকে নিবেদন করলাম তোমার কাছে। প্রেমের দেবতার ইচ্ছায় তুমি আমার ধর্মের সহকর্মিণী হয়েছ। সহধর্মিণী হতে বাধা কোথায়? এখন তোমার ইচ্ছে হলে দুটি শীর্ণ তটিনী এক হয়ে মিশে যেতে পারে সাগরে।

কৈকেয়ী আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। দক্ষিণ হস্তের করতল দিয়ে দশরথকে সজোরে ঠেলে দিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। দশরথ দেখল কৈকেয়ীর কোন চাঞ্চল্য নেই। সে নির্বিকার, নিরাবেগ চিত্তে তার হাতে পুষ্প বিল্বপত্র দিল। কণ্ঠ মিলিয়ে তার সঙ্গে পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করল।

অর্ঘ্যদানের অনুষ্ঠান শেষ হল একসময়। প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল দশরথ। তার চেতনার ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর কৈকেয়ীর অনির্বচনীয় শরীরী সৌন্দর্য নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল। তাই কেমন একটা নিশি পাওয়া মানুষের মতো আচ্ছন্ন অভিভূতভাব তার মুখে থমথম করতে লাগল। উপস্থিত রাজপ্রতিনিধিরা কিন্তু ভাবছিল, ভক্তবৎসল মহামান্য অতিথি তদগতচিত্তে দেবতার ধ্যান করছে। তাই, এরূপ আত্মসমাহিত তিনি।

অনেকক্ষণ কেটে গেলে কৈকেয়ী মধুর কণ্ঠে ডাকল তাকে। বলল : মহারাজ! কি মিষ্টি সেই স্বর! মনে হল অনেকদূর থেকে সে স্বর যেন ভেসে ভেসে এল দশরথের কানে।

দশরথের বুকের ভেতর চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকাল তার দিকে। উদভ্রান্ত চোখে অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল : চলুন তাহলে।

কৈকেয়ীর সঙ্গে রথে উঠল দশরথ। রথে দশরথ সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক উদাসীন ছিলেন। নিজের

মনের ভেতর ডুব দিয়ে কি যেন ভাবছিল তন্ময় হয়ে। তার এই আকস্মিক আশ্চর্য পরিবর্তন অশ্বপতিকে অবাক করল। নাটমঞ্চে রূপধন্যা সুযৌবনা, দেবদাসীদের দেখা থেকেই মহামান্য অতিথির চোখের চাহনি বদল হতে দেখেছেন তিনি। কিন্তু দশরথের চিত্তবিনোদনের জন্য এরকম হাজার রমণী অযোধ্যায় প্রতিদিন তার সেবায় নিযুক্ত। ললনাপ্রিয় দশরথের নিজস্ব প্রমোদকক্ষে এরকম আকর্ষণীয়া রূপরম্যা, লাস্যময়ী তরুণীর অভাব নেই। অনাবরণ দেহের অপরিসীম সৌন্দর্যে ভরপুর যৌবন চিহ্নগুলি উন্মুক্ত করে রাজার সম্মুখে নৃত্য করে তারা। সে নৃত্য আরো উত্তেজক, আরো চিত্তবিভ্রমকারী। প্রমোদ গৃহের ঝাড় বাতির আলোয় তাদের অনাবৃত আশ্চর্য যৌবনশ্রী অগ্নিশিখার মতো জ্বলে। কামনা-লালসা লেলিহান শিখার মতো লকলক করে তাদের সর্বাঙ্গে। উষ্ণ জলের স্রোতের মতো তরলিত কামনা মোমের মতো গলে গলে পড়ে রক্তে। সুতরাং-এ উত্তেজনা, আনন্দ, রোমাঞ্চ দশরথের কাছে নতুন কিছু নয়। এসবে তার মন অভিভূত হলেও হৃদয় বিকল হওয়ার কথা নয়। এসব একঘেয়ে আনন্দ উপভোগের মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব নেই। তাহলে দশরথ অন্যমনস্ক কেন? কি হয়েছে তার? আকস্মিক কোন অসুস্থতার জন্য কি এরূপ চিত্তবৈকল্য? ভেবে কুল-কিনারা করতে পারলেন না অশ্বপতি। অবশেষে, "কে জানে? দূর ছাই!" করে দশরথকে নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করলেন। আত্মরক্ষার মগ্নতাকে অন্যমনস্কতার রূপ দেবার জন্য অশ্বপতি পথের দু'ধারে চলমান শোভার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাঁ সাঁ করে বাতাসের ঝাপটা লাগছিল দশরথের চোখে, মুখে, নাকে, কানে। হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছিল। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথার মুকুট ঠিক করছিল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হল দশরথের দেহ। স্নায়ুর চাপ হ্রাস পেল। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গুলো সজীব ও ক্রিয়াশীল হল। গভীর বিষাদের বরফ গলতে সুরু করায় মুখের মালিন্য গেল কেটে। মনের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব জাগল। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে তখনও নানা চিন্তা এ জিজ্ঞাসার ভিড়। সহসা কৌশল্যার মুখখানা তার মনের পটে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। কারণ, ওই চিন্তার মধ্যেও আশ্চর্য রকমভাবে একটা ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো কৈকেয়ীর তন্বী সুঠাম অবয়বের নিটোল সুন্দর প্রতিমার মতো মূর্তিটি বারংবার চোখের তারায় ঝলকিয়ে উঠল।

যে পথ ধরে রথ যাচ্ছিল, সেই পথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথ অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়ছিল। নিজেকে প্রশ্ন করছিল আর নিজের মনেই তার একটা কাল্পনিক উত্তর সন্ধান করছিল। পঞ্চদশী কৈকেয়ীর রক্তের শিরায় শিরায় কী তার মতো গলিত আগুনের স্রোত বইছিল? থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল তার শরীরের ভিতর বাহির? কৈকেয়ীকে তার কেমন নির্লিপ্ত, নির্বিকার, অসহায় মনে হচ্ছিল। তথাপি একটা অসহিষ্ণুতা পীড়া দিচ্ছিল তাকে। চোখের তারায় ছিল একটা অব্যক্ত জিজ্ঞাসার প্রশ্ন, কেমন একটা ভীরু দ্বিধার ছায়া। আসলে তা ভীরুতা নয়। সে হল পঞ্চদশী তরুণীর প্রেমের সরস সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। আধো অন্ধকার বিগ্রহের পিছনে কৈকেয়ী তার ডান হাত মুঠো করে ধরেছিল। আর তাতেই তার থরথরিয়ে উঠেছিল বুক। কৈকেয়ীর ভীরুতা ছিল, দ্বিধা ছিল, কিন্তু তার আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখ প্রেমানুভূতির তীব্রতায় জ্বলজ্বল করছিল। ঠোঁটে তার কথা বলার শক্তি ছিল না কিন্তু মুখখান দুরন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। কৈকেয়ী চুপি চুপি স্বরে ডাকল : 'মহারাজ!' সে ডাক শুনে নিজেই চমকে উঠেছিল সে। ভাললাগার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার একটা দুর্জয় সাহস দেখিয়েছিল কৈকেয়ী। আনন্দ বিস্ময় এবং একটি সূক্ষ্ম সহানুভূতিবোধ তার চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটেছিল। অতএব সে এখন নিঃসন্দেহ যে, কৈকেয়ী ভালবাসে তাকে। তাহলে কেকয়রাজ অশ্বপতির কাছে মনের বাসনা প্রকাশ করতে বাধা কোথায়? বাধা একটা নয়, অসংখ্য বলে মনে হল দশরথের। নিষেধের প্রতিমূর্তি কেকয়রাজ এখন তার কাছে বাস্তব সত্য। তাঁর কাছে কৈকেয়ীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া এক কঠিন কাজ। স্বাভাবিকভাবে তাদের বিবাহ হয় না। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, বয়স, পরিবেশ, সময় সব নিয়ে এ বিবাহ অসঙ্গত এবং অসিদ্ধ। বাধার কথা মনে হতে বুকের ভেতর তার কাঁটা ফোটার যন্ত্রণায় টন টন করে উঠল। মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরির মধ্যে খঞ্জনির মতো বাজতে লাগল একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা; কৈকেয়ীকে পাবে

না কেন? কৈকেয়ীর কাছেই বা তার শূন্য জীবনের মূল্য কোথায়? কান্নারুদ্ধ হৃদয়ের এক রুদ্ধ আবেগে নিজের মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভয়ঙ্কর সাধ পূরণের জন্য যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তবুও কৈকেয়ীর উপর তার দাবি ত্যাগ করবে না। বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে চায়। দাবির নীতি মেনেই বীর্যবান পুরুষ কেশরফোলা সিংহের মতো গর্জন করে আক্রমণের সংকেত দেয়। সে রকম কিছু একটা করার অভিপ্রায় নিয়ে সে অশ্বপতির দিকে তাকাল। চোখে তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি। দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। ছিল শুধু একটা সেতু স্থাপনের প্রয়াস। সে সেতু তার নিজের কূল থেকে অশ্বপতির তীরে ওঠা।

দশরথ জানত না সে নিজেই অশ্বপতির জিজ্ঞাসার স্রষ্টা। অশ্বপতির দিকে তাকাতেই তাঁর চোখের তারায় অবাক বিস্ময় আর কৌতূহলিত রহস্যের দ্যুতি দেখতে পেল। দশরথের নিজের প্রাণও তাতে দ্যুতিময় হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে তার অভিভূত আচ্ছন্নভাব দূর হল। দশরথের চোখে শঙ্কা, দ্বিধা কিছুই ছিল না। দুজনের চোখাচোখিতে ঠোঁটের অগ্রভাগে ঈষৎ অপ্রস্তুত হাসি বর্তুল হয়ে উঠল।

দশরথের কথা বলার আগেই অশ্বপতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন : মহান বন্ধু অযোধ্যাপতি আপনি কি কোন শারীরিক আস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন? আমার আতিথেয়তার কি কোন ত্রুটি হল? আপনার শরীর ঠিক আছে তো? আপনাকে সারাক্ষণ অত্যন্ত বিমর্ষ চিন্তিত দেখে আমি যারপরনাই অশান্তি ও উদ্বেগ বোধ করেছি। এখন অনুগ্রহ করে বলুন আপনার কি হয়েছে? আপনার কোন কাজে আমি লাগতে পারি?

অশ্বপতির সহৃদয় আন্তরিকতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হল দশরথ। সহসা কোন কথা বলতে পারল না। দ্বিধা সংকোচ কাটাতে আরো কিছু সময় লাগল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে সকৌতুকে বলল : কেকয় রাজ্যে পা দিয়ে আমার জীবনের হিসাবের গরমিল দেখতে পেলাম। অঙ্কের উত্তর মেলাতে পারছি কৈ? মহারাজ হয়তো কিছু সূত্র সন্ধান দিতে পারবেন। আপাতত এই সাহায্যটুকু পেলেই তৃপ্ত হব।

অশ্বপতির চোখের ছটায় কৌতুক ঝিলিক দিল। একটু হাসার চেষ্টা করলেন। অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা তাঁর স্বরে বাজল। বললেন : ভারি মজা তো!

দশরথ চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল! সত্যিই তাই।

অশ্বপতি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকাল। দশরথের মুখে রঙের ছোপ লাগল। চোখের তারায় নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছিল কৈকেয়ীর প্রদীপ্ত যৌবনরূপ। বুকের ভেতর বাজতে লাগল কৈকেয়ীর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর। সুখের অনুভবে দশরথের চেতনা কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে রইল।

দেখতে দেখতে রথ রাজপ্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করল। সিংহদ্বার পেরিয়ে অতিথির গৃহ সংলগ্ন প্রাঙ্গণের সামনে দাঁড়াল।

অশ্বপতি দশরথকে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে কক্ষে নিয়ে গেলেন। ঐ সামান্য পথটুকু অতিক্রম করার সময় দশরথের বুকের উপর দুরন্ত ঝড় বয়ে গেল। উপকূলের বুকে আছড়ে পড়া ঝড়ের মতো অশান্ত অবস্থা তার। এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কি, ভেবে স্থির করতে পারছিল না। কেমন করে কথাগুলো শুরু করবে? কি করলে সব দিক রক্ষা হয়, তার কথা চিন্তা করে আকুল হল। বিভ্রান্ত অসহায়তাবোধে তার পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, পায়ের নীচে মৃদু ভূকম্পন হচ্ছে। আসলে হৃদয়ের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন হচ্ছিল।

কথা বলতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল। জিভ দিয়ে শুকনো জোড়া লাল ঠোঁট দুটো ভেজানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জিভও তার অস্বাভাবিক শুকনো। ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল। প্রদীপ শিখার মতো কাঁপছিল জ্বলজ্বল চোখের চাহনি। কেমন একটা অসহায় আর্তি ফুটে উঠেছিল সেখানে।

অশ্বপতি স্থির দৃষ্টিতে দশরথের হাবভাব লক্ষ্য করলেন। তারপর দেয়ালের ছবিগুলো একটা একটা করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। উদ্দেশ্য দশরথের অসমাপ্ত মনের কথা শোনা। সেজন্য মনেতে তাঁর অধীর ব্যগ্রতা। কিন্তু ঘূণাক্ষরে তাঁর মনের ভাব দশরথকে বুঝতে দিলেন না। এধার ওধার

করে আরাম কেদারায় উপবেশন করলেন।

বেল, জুঁই ফুলের গন্ধে ঘর ভরেছিল। অশ্বপতি হাঁটুর উপর পা তুলে দিয়ে শিকারীর মতো তীক্ষ্ণ চোখ মেলে দশরথকে দেখতে লাগলেন। মুখের অভিব্যক্তিতে তাঁর একটা হাসি হাসি ভাব। চোখে চোখ পড়তে দশরথ হাসল অপ্রতিভের মতো। জড়তা এবং ভয় ভয় ভাবটা দূর হল। অসংকোচে বলল : মহামান্য অশ্বপতি, বাইরে দেখে মানুষের অন্তরের সব পরিচয় আঁচ করা যায় না। আমার বুকের ভেতর লুকোনো কান্নার কণ্ঠস্বর হঠাৎ হর-পার্বতীর মন্দিরে বুক চিরে বেরিয়ে এল। সেই প্রথম অনুভব করলাম, অন্তরে কী ভীষণ রিক্ত আমি! আর শূন্যতা আমাকেই ব্যঙ্গ করল। অথচ কি আর বয়স হয়েছে আমার! যৌবনসীমা উত্তীর্ণ করলেও এখনও আমি অমিত বীর্যসম্পন্ন পুরুষ সিংহ। দেহে তারুণ্যের দীপ্তি, বুকে সাগরের উচ্ছ্বাস। আঁখির কটাক্ষে মদনের মোহনধনু, কণ্ঠে কোকিলের প্রগলভতা, হৃদয়ে ঝিল্লীর ধ্বনি। এসব অনুভবের কথা। একে ব্যাখ্যা কিংবা বিশ্লেষণ করা দায়।

দশরথের অকারণ আবেগের কোন উত্তর অশ্বপতির জানা ছিল না। প্রয়োজন থেকে আলাদা করে নেওয়া এই সব কথার অর্থ তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগাল। মানুষের মন এক অদ্ভুত চিত্রকর। চেনা মুহূর্তগুলির এক আশ্চর্য সুন্দর ছবিই সে মনের পটে ফুটিয়ে তোলে। কত অদ্ভুত ঘটনার বিস্ময়কর কল্পিত দৃশ্য সে সব। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের এই রকম একটা ভাবাবেশের সৃষ্টি হয়। এটা তার অন্তরের গোপন দুঃখের অথবা গোপন সুখের অনুভূতি থেকে হয়। দশরথও সেরকম কোন দুঃখ বা সুখের অনুভূতি বলতে ব্যগ্র বলে মনে হল অশ্বপতির। তাই কথা বলার সময় তার চোখ মুখের এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। চোখের দৃষ্টি সুদূর, নয়নের রূপ সুন্দর, কণ্ঠের স্বর মধুর আর ভরাট। অশ্বপতি কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বিভ্রান্ত স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন : মাঝে মাঝে সব মানুষ কেমন যেন দার্শনিক হয়ে যায়। এই অকারণ বিহ্বলতা তার মনের বিলাস।

দশরথের বিস্ফারিত চোখের তারা দুটি অশ্বপতির চোখের তারায় স্থির হল। মনের ভেতর অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ কথার প্রতিক্রিয়ার একটা ঝড় বয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার বাহ্যচেতনা লুপ্ত ছিল। মনের গভীরে ডুবে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে বেশ কয়েকবার মাথা নাড়ল। আস্তে আস্তে সম্মোহিতের মতো গভীর গলায় বলল : মহামতি অশ্বপতি! এ এক অন্য অনুভূতি। নিজেকে বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হয়। নিরানন্দ জীবনের অর্থ কি? বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। কেন, এরকম, মনে হয় বলতে পারেন? কেন নিজেকে একা আর দুঃখী লাগে?

অশ্বপতি বিব্রতবোধ করলেন। হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে রইলেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন : এ প্রশ্নের জবাব আমি কি দেব? কতটুকু বা জানি? ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকট আত্মীয় ছাড়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করা শক্ত।

দশরথের চোখে ব্যথা ঘনাল। কণ্ঠস্বরে মিনতি ঝরল। বলল : তবু, আপনি বলুন। নিজেকে আমার কেন এত একা লাগে? কেন মনে হচ্ছে আমার কেউ নেই?

অশ্বপতি নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন : কেন হয় আপনি জানেন না?

না, কেবল মনে হচ্ছে প্রগাঢ় যন্ত্রণা আমার বুকের মধ্যে থাবা গেড়ে বসেছে।

অশ্বপতি দশরথকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শান্ত ভাবলেশহীন দুই চোখে তাঁর অদ্ভুত প্রশ্ন। দ্বিধায় ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। বিব্রত স্বরে বললেন : মহারাজ, আপনার এই অনুভূতির মধ্যে কোন গভীর দার্শনিকতা নেই। প্রবৃত্তির তাড়না আপনাকে এমন অন্যমনা এবং চঞ্চল করে তুলেছে। পুত্রহীনতার দুঃখ আপনার এই একাকীত্ববোধের জন্য দায়ী। আপনার ভার্যা আছে, রাজ্য, ঐশ্বর্য আছে, কেবল নেই তার উত্তরাধিকার। তাই, এই সুতীব্র যন্ত্রণা। অর্থ, ঐশ্বর্য, আরাম, বিলাস, ব্যসন খ্যাতি মানুষের বহিরঙ্গকে ভরিয়ে রাখে কিন্তু অন্তরে সে দীন হতে দীন।

দশরথ অবাক স্বরে প্রশ্ন করল : এসব আপনি কি বলছেন?

মহারাজ আপনার স্পর্শকাতর ও সযত্ন গোপন স্থানটির সন্ধান করে আমি যা অনুভব করছি,

তাই আপনাকে বললাম। পুত্রহীনতার কষ্ট আপনাকে এই যন্ত্রণা দিচ্ছে। মানুষের জীবনে যত দুঃখ এবং যন্ত্রণা তার উৎপত্তির উৎস প্রবৃত্তির গভীরে। অক্ষমতা ব্যর্থতার সঙ্গে দুরন্ত ইচ্ছার বিরোধ যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে ওঠে। প্রতিরোধের প্রাচীর যখন ভেঙে পড়ে তখন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে মনের এই ক্ষয় চলে। মানুষ পশুর মতো দেহসর্বস্ব জীব নয়। সন্তান সন্ততির মধ্যে সে তার বংশধারা রক্ষা করতে চায়। তাই প্রত্যেক নারী ও পুরুষ সন্তান চায়। সন্তান তার প্রতীক। মৃত্যুর পরেও যে তাদের ঐশ্বর্য কৃষ্টি বহন করে নিয়ে যাবে আর এক কালে। এই ভাবে ব্যক্তি তার সন্তানের ভেতর দিয়ে নতুন করে বেঁচে উঠে; সমাজ, ধর্ম, পরিবারকে নতুন প্রাণ দেয়। এইখানেই তার জীবনের সার্থক জয়যাত্রা। সেই যাত্রাপথের যখন বিঘ্ন ঘটে তখন মানুষের মনের গভীরে শ্মশানের চিতা জ্বলে। পুত্রহীনতার দুঃখ আপনার এই একাকীত্ববোধ ও পরিজনহীনতাবোধের জন্যে দায়ী। ভার্যা, রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন, সম্পদ কোন কিছুর অভাব আপনার নেই তবু মন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। তাই এই বিলাপ।

দশরথ চুপ করে রইল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ধীরে ধীরে বলল : মহামতি অশ্বপতি এসব কথা এত গভীর করে কোনদিন স্থির চিত্তে ভাবিনি। আজ মনে হচ্ছে, ক্ষুধার্ত প্রবৃত্তি তার শিকারকে গ্রাসের সম্মুখে রেখে বসে আছে। সংকোচে আহার করতে পারছে না। যদিও হিংস্র থাবা মেলে প্রবৃত্তি গ্রাস করতে চাইছে তাকে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কুণ্ঠা, সৌজন্য বোধের বাধা কাটিয়ে উঠতে না পারায় তীব্র যন্ত্রণা তার স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে।

অশ্বপতি কোন কিছু না ভেবেই বলল : মহারাজ, ক্ষুধার আকর্ষণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতি অনুমোদিত। সন্তান ক্ষুধা মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা আবেগবান বৃত্তি। জীবনের নতুন অঙ্গীকার নিয়ে চলার পথে একধাপ এগিয়ে যায় মানুষ, মানুষের সমাজ। বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার তাগিদে আপন প্রাণশক্তিতে দুর্দমনীয় হয়ে সে সৃষ্টি করে, নতুন হয়ে গড়ে ওঠে আপন সন্তানের মধ্যে। সৃষ্টির এই আবেগ শুধু দেহগত নয় মনোগতও বটে।

অশ্বপতির কথা শুনতে শুনতে দশরথের তনু মন রোমাঞ্চিত হল। সৃষ্টিতত্ত্বের এবং শরীরতত্ত্বের এই অদ্ভুত নিয়মটা সে জানত না বলে আশ্চর্য হল। অশ্বপতির কথা থেকে প্রথম অনুভব করল জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজন সে রকম প্রকৃতি তার সৃষ্টি রক্ষার স্বার্থে জীবের মধ্যে যৌন আবেগের আকর্ষণকে দুর্জয় করে তুলেছে। কিন্তু সব ভুলে যাওয়া, ডুবে যাওয়া আনন্দ আস্বাদনের মধ্যে সন্তান সৃষ্টির এষণার চেয়েও একটা দুর্লভ অব্যক্ত দৈহিক আনন্দ সুখ ও অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও উত্তেজনা পাওয়ার জন্য মানুষ মিথুনাসক্ত হয়। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আনন্দ উত্তেজনাতেই দশরথ নারী চেয়েছে এবং পেয়েছে। কিন্তু অশ্বপতি হঠাৎ তার সব হিসেব এবং ধ্যান জ্ঞান ওলোট-পালোট করে দিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে দশরথ প্রশ্ন করল : মহান রাজা অশ্বপতি, আমার বিকল চিত্তের উৎস তা হলে নারী। নারীর মধুর সাহচর্য আমাকে সন্তানের জনক করবে, মনের কষ্ট লাঘব করবে, আমায় পরিপূর্ণতা দেবে। উত্তরকালের বুকে আমার চিরচিহ্ন যে এঁকে রাখবে তাকে কেমন করে পাব আমি? আপনার কাছেই বা কিরকম সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি?

বলতে বলতে দশরথের দুই চোখের দৃষ্টি দীপ্ত হল। মুখে খুশির ঝলক লাগল। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসির ধার তার ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলল। অশান্ত তৃষ্ণা তার সংযম ভাসিয়ে দিল। কৈকেয়ীর মুগ্ধতা তাকে প্রগলভ করল। নিজের সঙ্গে কৌতুক করে বলল : আঁখির কটাক্ষে মদনের মোহনধনুর নিশানা এখনও অব্যর্থ। পাহাড়ী ঝর্নার উচ্ছল তারুণ্য আমার শরীরে ক্রীড়াচঞ্চল। বক্ষে আমার মত্ত মধুপের প্রেমের গুঞ্জন। আমার রূপ যৌবনের কোন ঘাটতি নেই। এখনো দাদুরীর আচমকা ডাকে আমার হৃদয় উতলা হয়। মুগ্ধতা প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়। আশা জাগায়। তৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলে।

দশরথের সারা মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি। কথাগুলি অসংলগ্ন। প্রকাশের ভাষা প্রলাপের মতো। আসলে কিসের একটা দ্বিধা ও অনতিক্রমনীয় বাধার মতো তার কণ্ঠরোধ করল। তাই এক চিরজিজ্ঞাসার কাছে সে উৎকর্ণ, বোবা।

অশ্বপতি চমকাল। চোখে তার সন্দেহ এবং অনুসন্ধিৎসা। মুখে আতঙ্কের ছায়া। ঘটনার

আকস্মিকতা অনেকটা মেঘে ঢাকা ছায়ার মতো মনের দিগন্ত জুড়ে রইল। প্রকৃতপক্ষে, কৈকেয়ী সম্পর্কিত এক অজ্ঞাত ভাবনা তাঁকে বিমর্ষ করল। তাই, দশরথের কথায় কোন জবাব দিলেন না। নিজের বিমর্ষ চিন্তায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে দেখলেন দশরথের মুখ।

নীরবতা অনেক সময় বার্তা থেকে তীব্র এবং গভীর। অশ্বপতির বিহ্বল বিভ্রান্ত নিবিড় দৃষ্টি দশরথের অনুভূতিতে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা যেন এক ধাক্কায় মনের গভীরে অটল বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে তার কোন কুণ্ঠা হল না। দশরথের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। বলল ঃ রাজকন্যা কৈকেয়ীকে দেখা থেকে মন আমার উতলা হয়েছে। কেকয় রাজ্যের মাটি থেকে আমি নির্মল সুন্দর এই মুক্তোটি কেড়ে নিয়ে আমার প্রেমের মালা গাঁথব। আমার প্রার্থনা পূরণ করে কৃতার্থ করুন। কেকয় রাজ্যের সঙ্গে অযোধ্যার আত্মীয়তা, রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকাল অশ্বপতি। দুই চোখে তার ক্রোধ ঝিলিক দিল। প্রায় আর্তস্বরে প্রতিবাদ করে বলল : অসম্ভব!

নির্বিকার কণ্ঠে দশরথ প্রশ্ন করল—কেন? বাধা কোথায়?

অশ্বপতি বললেন : বর্ণে গোত্রে আমরা এক নই। আমাদের বিবাদ আজন্ম।

এ হল ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। আসলে আমরা কশ্যপের বংশধর। বিভেদ কলহ শুধু বাইরের ঘটনা। বার মহল ছেড়ে ভিতর মহলে ঢুকলে এ সব তুচ্ছ মান অভিমানের জটিলতা আর থাকবে না।

তবু পারি না।

মহান অশ্বপতি, দশরথ তার পাওনাকে কখনও ভিক্ষে করে না। তবু প্রেমবশে হাত পেতে সে যা চাইল তা থেকে যদি বঞ্চিত হয় তা হলে বীর্যের গর্বে, পাশব পৌরুষবলে তাকে অধিকার করে। কিন্তু এখান তার প্রয়োজন নেই। আমি জানি, অতিথিবৎসল রাজা, অতিথির সুখ ও তৃপ্তির জন্য নিজ কন্যাকে যখন তার আপ্যায়নে নিযুক্ত করেছেন, তখন অতিথির প্রার্থনা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে অনর্থক আতিথ্যের অপমান করবেন না। এতে কেকয়রাজ্যের সুনাম ও সুযশ হানি হবে। অযোধ্যাপতির দাবিকে ভাগ্যের পরম প্রসাদ বলে মনে করা উচিত। রাজনৈতিক প্রয়োজনে কেকয় এবং অযোধ্যার মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ গড়ে ওঠা আবশ্যক। আত্মীয়তার সেই সুযোগ অযাচিতভাবে আমরা পেয়েছি।

দশরথের নরম গরম মেশানো ভাষণে অশ্বপতি বিস্ময়ে হতবাক হলেন। অপলক দুটি চোখে তাঁর মুগ্ধতা নামল। শান্ত গলায় বললেন : কৈকেয়ী কিশোরী। অপরিণত বালিকা।

শিশুকাল থেকে নারীজাতি জননী, গৃহিণী, প্রণয়িনী, প্রিয়ভাষিণী, সেবাপরায়ণা। নারীর সব লক্ষণগুলি কৈকয়ীর দেহে মনে পরিস্ফুট। আমি চাই তার মন, প্রাণ, আত্মাকে। তার সান্নিধ্য আমাকে দু'দণ্ডের শান্তি দিয়েছিল।

অশ্বপতি স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দশরথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। নিঃশব্দে কিছু মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই সময়টুকুতে অশ্বপতির মস্তিস্কের মধ্যে অনেকগুলো কথা একসঙ্গে জেগে উঠল। দশরথের এই আবেগ তার মুগ্ধতা থেকে সঞ্চারিত। আবেগের নির্ঝরিণীতে তার মন প্রাণ প্লাবিত। কৈকেয়ীর রূপের ঝলক লেগে তার চোখ মন ধাঁধিয়ে রয়েছে। ভালমন্দ বিচারবোধ লুপ্ত হয়েছে। মুগ্ধতার আবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে ও পরিস্থিতির বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তন করতে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : মহারাজ অজপুত্র যদি একান্তই আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হন, তা হলে কুলপ্রথানুসারে আপনাকে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হবে। আপনি রাজি হলে তবে এই বিবাহ অনুমোদন করা যেতে পারে।

কি সে শর্ত?

প্রতিশ্রুতি ছাড়া তা বলা সম্ভব নয় অযোধ্যাপতি নেমি।*

* দশরথের অন্য এক নাম

দশরথ মুহূর্তের জন্যে থমকাল। পরক্ষণেই মুগ্ধতার আবেশের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে তার মনে হল কৈকেয়ীর জন্য সব করতে পারে সে। তাকে অদেয় কিছু নেই। শর্ত যত কঠিন হোক প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় তাকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। এর সঙ্গে তার নিজস্ব মর্যাদা এবং অনুরাগের সততা জড়িয়ে আছে। এই অনুভূতি তার মনে গাঢ়তর হল। অমনি সঙ্কল্প জাগল। চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে মুগ্ধ আবেগে রঙের ঔজ্জ্বল্য ঝলকিয়ে উঠল। চিন্তাহীন বিভ্রমে অশ্বপতির কথার প্রতিধ্বনি করে বলল : প্রতিশ্রুতি দিলাম।

অশ্বপতির মুখে বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল। শান্ত গলায় বললেন : মন্দিরের বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে গঙ্গাজল স্পর্শ করে অঙ্গীকার করতে হবে।

আমি প্রস্তুত। নির্বিকারভাবে বলল দশরথ।

শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে দশরথ অঙ্গীকার করল। পুরোহিতের সঙ্গে যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করল কেকয়রাজের শর্ত মেনে কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করব। অন্যথা কৈকেয়ীর উপর কোন দাবি রাখব না। এমন কি বীর্যগর্বে পাশব শক্তিবলে তাকে অধিকার করব না। কখনও তার শক্রতা করব না, শত্রুর চোখেও দেখব না।

শপথ শেষ হলে অনেকটা স্বপ্ন দেখার মতো দুটি বিস্মিত সলাজ চোখে দশরথ অশ্বপতির দিকে তাকাল। অশ্বপতি ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর স্বরে বলল : অপরাধ মার্জনা করবেন। পঞ্চদশী কৈকেয়ীর সঙ্গে আপনার বয়সের ব্যবধান চিন্তা করেই শর্তগুলো আমাকে আরোপ করতে হচ্ছে। আমি পিতা। সব পিতাই কন্যার সুখ, শান্তি, সমাদব এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে পাত্র নির্বাচন করে। আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই। বহুপত্নীক অযোধ্যাপতির অন্যান্য রাণীদের মধ্যে কৈকেয়ী বোধ করি সর্বকনিষ্ঠা। স্বভাবতই তার কর্তৃত্ব উপেক্ষিত ও অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল অথবা রাজপ্রাসাদের অন্যান্য রাণী ও রমণীর ঈর্ষার পাত্র হবে সে। কৈকেয়ীকে তাদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বাস করতে হবে। রাজ অন্তঃপুরে সে যাতে মর্যাদার সঙ্গে নিজের কর্তৃত্বে এবং অধিকারের জোরে বাস করতে পারে সে জন্য কতকগুলো অতিসাধারণ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে মহারাজকে। শর্ত পালন করা, না করা মহারাজেব অভিরুচি। তবে, শপথের মধ্যবর্তী হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর থাকলে সত্য রক্ষায় মহারাজ অবিচল থাকবে। এটাই বিশ্বাস আর কি!

দশরথের অধরে হাসি হাসি ভাব। নিজের অজ্ঞাতেই একটা আবেগ অনুভব করে বলল : নিশ্চয়ই।

অশ্বপতি মুখ টিপে হাসলেন। কিন্তু চোখের চাহনিতে তাঁর বিস্মিত জিজ্ঞাস। কৈকেয়ীর জন্য দশরথ সব কিছু করতে প্রস্তুত। এই সব ঘটনায় তার সঠিক ভূমিকা কি অশ্বপতি বুঝতে পারলেন না। দশরথের এত উন্মত্ততা কি জন্য? কোন নিষেধ শুনতে চায় না,। কেন? এই কেন'র কোন উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। উদ্বেগাকুল চিত্তে বললেন : অজপুত্র নেমি; আমার জামাতা হতে গেলে কৈকেয়ীকে প্রধানা মহিষীর সম্মান দিতে হবে। * দুই; কোন পুত্রসন্তান জন্মালে তাকে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে হবে। অন্য কোনো সন্তানের দাবি গ্রাহ্য হবে না। অগ্রজ হলেও না। কৈকেয়ীর পুত্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে প্রতিকূলচারী পুত্রদের নির্বাসন দিতে হবে। এই শর্তগুলি পালনে সম্মত হলে কৈকেয়ী আপনার ভার্যা হতে পারে।

শর্তের কথা শুনে দশরথ স্তম্ভিত। তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। কিন্তু কৈকেয়ীর নিষ্পাপ সরল সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানির অনির্বচনীয় লালিত্য ও মাধুর্য তার চোখের তারায় ভেসে ওঠল। তার সমস্ত ভাবনা চিন্তার মধ্যে এই কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধল। মনে হল, কৈকেয়ী প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেবার জন্যই অশ্বপতি এই কৌশল করেছেন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি প্রয়োগ কবে অশ্বপতি দশরথের অসন্তোষ যেমন এড়ালেন তেমনি কৌশলে কৈকেয়ীকে তার বধূরূপে পাওয়ার এক অন্তরায় সৃষ্টি কবলেন। অশ্বপতির এ এক বিচিত্র

প্রসিদ্ধ রামায়ণ টীকাকার তিলক (ইনি বালগঙ্গাধব, তিলক নন) দশরথের প্রতিজ্ঞাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : "তব পুত্র্যাং যো জনিযাতে তস্মৈ রাজ্যং প্রদাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাবান্ ইত্যর্থঃ।'

রাজনীতি। আপন কন্যাকে এ কোন ভয়ঙ্কর রাজনীতির দাবা খেলায় নিয়ে এলেন তিনি? একি তাঁর ক্ষমতা দখলের লড়াই? অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা? সেই মুহূর্তে নানাবিধ জটিল প্রশ্নে দশরথের চিত্ত ভারাক্রান্ত হল।

অশ্বপতির এই ভীষণ প্রস্তাব মানতে গেলে নীতির দিক থেকে তাকে দেউলে হতে হবে। আবার না মানলে তার শপথের মর্যাদাহানি হয়। এ রকম একটা শক্ত শর্তের মারপ্যাঁচে ফেলে অশ্বপতি তার দুর্বার বাসনার গতিরোধ করবে, দশরথ স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। এখন শর্ত মেনেই কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অশ্বপতির কূট কৌশল ব্যর্থ করার কোন রন্ধ্রপথ নেই। শর্তগুলো স্বীকার করা কোন দুরূহ ব্যাপার নয়। কেবল নিজের কাছে ছোট হওয়ার লজ্জায়, কষ্টে বুক তার চিন্ চিন্ করছিল। প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় এটুকু ত্যাগ করতে হবে তাকে। অদৃষ্ট হয়তো ভালোর জন্য এমন একটা শপথে উৎসাহিত করল। তার কোন সন্তান নেই। কৈকেয়ী পুত্রবতী হয়ে যদি ইক্ষ্বাকু বংশের উত্তরাধিকারীর সমস্যা মীমাংসা করে তা হলে সেটা সৌভাগ্য তার। অযোধ্যার সিংহাসনে সেই হবে একমাত্র উত্তরাধিকার। সুতরাং অশ্বপতির প্রধান শর্তটি মানতে তার অপত্তি থাকার কথা নয়। সাবিত্রী উপাখ্যানের কথা মনে পড়ল। স্বামীর মৃত্যুই তাকে জননী হওয়ার পথ করে দিল। সেরকমভাবে কৈকেয়ীর সঙ্গে বিয়েটা তার জনকত্ব অর্জনের পথ যদি করে সে হবে আশীর্বাদ। অশ্বপতি এখানে নিমিত্ত। পুত্রহীনতার ব্যথা, অনুভূতি দশরথের বুকে হঠাৎ নিদারুণ হয়ে উঠল। বন্ধ্যাত্বের জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা সংসারধর্ম একরকম ত্যাগ করেছে। দিবারাত্রির বেশির ভাগ সময় পূজার্চনা নিয়ে কাটায়। তার সঙ্গে রাণীদের সম্পর্কও অত্যন্ত শীতল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর নিজের গোপন দুঃখ ভুলে থাকার জন্য মৃগয়া এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকে। কিন্তু এ যে জীবন নয়, জীবনের সঙ্গে প্রতারণা দশরথ তা অনুভব করে। একটি সন্তানের অভাবে অযোধ্যার সব শ্রী যেন অন্তর্হিত হয়েছে। অশ্বপতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অযোধ্যার শ্রী যদি ফেরে তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কৈকেয়ী তার জীবনে অভিশাপ না হয়ে তো, আশীর্বাদ হতে পারে। দশরথের মনের আকাশে যে মেঘ জমেছিল, তা একটু একটু কবে ফিকে হয়ে গেল। লোভ, স্বার্থপরতা কর্তব্যহীনতার কথা ভেবে সে একটু ভয় পেয়ে ছিল যা। এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই। মনে মনে স্থির করে ফেলল অশ্বপতির প্রস্তাবে রাজি হবে। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার পর দশরথ ধীরে ধীরে বলল : আমি কৈকেয়ীকে চাই। তাকে সমাদরেই রাখব। রাজমহিষীর মর্যাদা দেব। তার পুত্রই অযোধ্যার রাজা হবে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে তিন সাত্যি করলাম। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুতির কথা জানবে না।

অশ্বপতি চমকালো। অভিভূত আচ্ছন্নতায় প্রস্তরীভূত অবস্থা তাঁর। দশরথের চোখের উপর নীরব বিস্মিত চোখ রেখে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো বিড় বিড় করে বললেন : প্রতিশ্রুতি দিলাম, অন্য কেউ জানতে পারবে না।

সাফল্যের গৌরবদীপ্তি দশরথের চোখে মুখে উজ্জ্বল হল। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। হাসি হাসি মুখে কৌতুক ভাব। ধীরে ধীরে বলল : এবার আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বক্তব্য! বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না অশ্বপতির। অঙ্গীকারবদ্ধ দশরথের কোন প্রশ্ন কিংবা কোন দাবি থাকতে পারে অশ্বপতি ভাবতে পারেননি। ভেবেছিলেন ভাগ্যের স্রোত তাঁর দিকে বইছে। উচ্চাশার সিঁড়িগুলো একটা একটা করে উঠেছেন তিনি, এখন সেই সিঁড়ি দশরথ তাঁর কাছ থেকে কৌশলে সরিয়ে নিচ্ছে মনে করে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় অস্থির হলেন। মনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হল। এস্ত ব্যাকুলতায় প্রশ্ন করলেন : একবার অঙ্গীকারের পর আর কোন শর্ত থাকে না।

দশরথের দুই চোখে কৌতুক অধরে মধুর হাসি। মৃদুস্বরে বলল : শর্ত! শর্তের কথা বলব

কেন?

তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে অশ্বপতি বললেন : শর্তের কথা যদি ঘুরিয়ে হয়। তা-হলে মানব না।

দশরথ নম্র কণ্ঠে বলল : আশ্চর্য লোক আপনি। এত দাবি পূরণ করেও আপনার মন পেলাম না। আপনার সব দাবি পূরণ করেছি। প্রেমের জন্য আমি কি না করেছি, আপনি আমাকে দিয়ে দাসখৎ লিখে নিয়েছেন, তবু আপত্তি করেনি। কিন্তু এখনও আপনার মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আশঙ্কা। কেন?

অশ্বপতি নম্রহাসির সঙ্গে বললেন : জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক গোষ্ঠী এসব বিভিন্নতার জন্যই আমার এই উৎকণ্ঠা। একটা পরিষ্কার বোঝা-পড়া, আমাদের আন্তরিকতাকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। আর্যদের রহস্যময় রাজনীতির খেলায় আমরা ঠকেছি, বারংবার হেরেছি, আবার কষ্ট করে জিতেছি। জোর করে নিজেদের দাবি ও অধিকার কায়েম করেছি।

কিন্তু আমিও চাই আপনার কাছ থেকে সহযোগিতার অঙ্গীকার। আমি যেমন আপনর সব কিছু মেনে নিয়েছি, আপনারও উচিত আমার মান-সম্মান পুরোপুরি বাঁচানো।

আপনার ভূমিকা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মতো কিছু নেই। শর্ত নয়, আপনার পূর্ণ সহযোগিতা।

তারপর হাসি হাসি মুখ করে দশরথ বলল : আমার মান-সম্মান সব তো আপনাকে সঁপে দিয়েছি। আপসোসের কারণ না হয়, এমন কিছু করুন।

সহসা হৃষ্ট হয়ে অশ্বপতি বললেন : বেশ, আমিও অঙ্গীকার করছি সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করব না।

অশ্বপতির কণ্ঠের শেষ রেশটুকু কক্ষের মধ্যেই ছিল। মিলিয়ে যাওয়ার আগে দশরথের ওষ্ঠে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটল। কূট রাজনৈতিক চালে যে অশ্বপতি বাধা পড়ল, এ অনুভূতি তার ছিল না। মানুষের মনের গতি, অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার একটা সহজাত ক্ষমতা দশরথের ছিল। তাই প্রেম ও কর্তব্যবোধের যে সংকট সৃষ্টি হল তার আশু মীমাংসার জন্য বিবাহকে ত্বরান্বিত ও দ্রুত করার প্রয়োজন তীব্র হল। এই বিয়ে দশরথের কাছে খুবই জরুরী এবং রাজনৈতিক।

কৈকেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাবর্তের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা তার। এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল আর কি! কেকয় রাজকন্যা দশরথের প্রিয়তমা মহিষী হয়ে তার সঙ্গে রথে অবস্থান করছে জানলে দস্যু শম্বর আশ্চর্য হবে। প্রিয়বন্ধু অশ্বপতি স্বার্থে, লোভে প্রভুত্ব অকাঙ্ক্ষায় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, একথা জানলে, ভীষণ হতাশ হবে সে। তার মনোবল ভেঙে পড়বে। ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে তার মন যত পুড়বে তত যুদ্ধে দিশাহারা হবে। তাকে পরাজিত করা তখন কঠিন হবে না। তা-ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে প্রদর্শন করার একটা সুযোগও সে পাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরেরা সুন্দর। সেখানেই তারা শৌর্য, বীর্য, দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তেজ সাহস পৌরুষ বেশি করে প্রদর্শন করে। ব্রহ্মাবর্তের যুদ্ধে পঞ্চদশী কৈকেয়ী তাকে বেশী করে পরিমাপ করতে পারবে! আর তাতেই তার প্রতি কৈকেয়ীর ভালবাসা দ্বিগুণ হবে। আসক্তি তীব্র হবে।

এইরকম একটা অনুভূতির তাড়না তাকে নেশার মতো পেয়ে বসল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলল : এক প্রহরের মধ্যে হরপার্বতীর মন্দিরে কৈকেয়ীর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্পন্ন করার সব আয়োজন করুন। প্রহরান্তে আমাকে ব্রহ্মাবর্তে যাত্রা করতে হবে। কৈকেয়ী আমার সহযাত্রিনী হবে। প্রিয়তমা মহিষীরূপে সে সর্বদা আমার পাশে পাশে থাকবে। আমার লক্ষ্যের ধ্রুবতারা হয়ে সে জ্বলবে।

সে কি? আকাশ থেকে পড়ল অশ্বপতি। বলল : বিয়ে বলে কথা! না, না, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এত সত্বর কেমন করে সম্ভব? ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে গোছের কথা বললে কি রাজকন্যার বিয়ে হয়?

দশরথের কণ্ঠস্বর জোরাল হল। বলল : আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই। সামনে আমাদের দুরূহ সঙ্কট। অযথা সময় অপচয় করব কোথা থেকে?

আমার আত্মীয়-পরিজন, প্রজা, বন্ধু, ছাড়া তো এ বিয়ে হতে পারে না।

কিন্তু দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ ভেরী আমাকে ডাকছে। বিপন্ন দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমাকে এখনই যেতে হবে। কৈকেয়ীও যাবে আমার সঙ্গে, থাকবে আমার পাশে পাশে। এর কোন নড়চড় হবে না।

শম্বর আমার বন্ধু। তার সাহায্যে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমিও দেবতাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৈকেয়ীর জন্য যা যা করা দরকার ছিল আমি অঙ্গীকার করেছি। আর কোন দাবি থাকতে পারে না। আপনার সুবিধা-অসুবিধা কোথায় আমি জানতেও চাই না। এ জন্য নতুন কোন সর্তও আরোপ করা চলবে না। কৈকেয়ী আমার বাগদত্তা এখন। তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে উৎসাহিত করবেন না। এরকম প্ররোচনায় প্রতিজ্ঞা দুর্বল এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব অঙ্গীকার পালন করে আপনার সত্য রক্ষা করুন।

অশ্বপতির মুখে কথা সরে না। আয়ত চোখের কালো তারা অপলক স্থির বিদ্ধ হয়ে থাকে দশরথের চোখে। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা নিবিড়, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা গভীর। অশ্বপতিকে বেশ চিন্তিত ও বিপন্ন মনে হল। কথা যেন তার বুকের কাছে আটকে রইল। নিঃশ্বাসে তাই তীব্র ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। মুখের পেশীতে যন্ত্রণা, কষ্ট। চোখের তারায় কি একটা বলতে না পারা অসহায়তা।

অশ্বপতির কাছে কৈকেয়ীর বিবাহ ছিল নিয়তির এক অমোঘ সংকেতের মতো। আর দশরথকে মনে হয়েছিল কল্পতরু। দশরথের আকস্মিক প্রস্তর কঠিন দৃঢ়তা তার অনুমান ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এক সংঘাত সূচনা করল। কিন্তু সাফল্যের গৌরবতৃপ্তি দশরথের মুখের উপর, চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে একপ্রস্থ রঙের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত করল। দশরথের ঐ মুহূর্তের অভিব্যক্তি তাকে অধিকতর সুন্দর করল। অশ্বপতি নিজেও মুগ্ধ অভিভূত হলেন। সম্মোহিতের মতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। বললেন : উত্তম। তোমার অভিলাষ, আমার অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করবো। কিন্তু সত্যরক্ষার নাম করে তুমি যে আমার কতখানি শত্রুতা করলে, এবং কিরূপ কলঙ্কভাগী করলে তা তুমি চিন্তাও করতে পার না। এর দুঃখ অনুতাপ গ্লানি আমার মরলেও যাবে না।

হরপার্বতীর মন্দিরে খুব সংক্ষেপে বিনা আড়ম্বরে দশরথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করল। গুটিকয়েক গণ্যমান্য বক্তি, রাজকর্মচারী এবং রাজপরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না বিবাহ অনুষ্ঠানে।

সলাজ নম্র কম্পিত দুই-চোখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে কৈকেয়ী দশরথের দিকে তাকাল। দিব্যকান্ত তনু তার যৌবনের সৌন্দর্যে-সমুজ্জ্বল। অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ-দেহ অটুট সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। হাল্কা গোলাপী রঙের পোশাক দশরথকে দর্শনীয় করে তুলল। তার বিশাল চেহারা ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করে তুলল।

কৈকেয়ীর গভীর চাহনিতে কেমন একটা থমথমে ভাব। শান্ত সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি দেবমন্দিরের বিস্তীর্ণ অলিন্দে প্রসারিত করে দিয়ে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গেল।

মেঘের অন্তরাল থেকে যে ভাবে বৃষ্টি ঝরে পড়ে, কৈকেয়ীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা দুটি চোখ থেকে তেমনি ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। বিবাহকালে সব মেয়েরই পড়ে। তারপরেই আবার অশ্রুভেজা মুখে ফুটে ওঠে অদ্ভুত এক আনন্দের অভিব্যক্তি। জীবন রহস্যের সে কথা জানা সত্ত্বেও তীব্র একটা অস্বস্তির কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হল দশরথের অন্তঃকরণ।

ধীর পদক্ষেপে কৈকেয়ীর হাত ধরে এগিয়ে চলল দশরথ। অজানিত একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতর টিপ টিপ করতে লাগল। বাম হাতে ধরা কৈকেয়ীর ডান হাতখানা আরো কাছে টেনে নিয়ে তার দেহের ঘনিষ্ঠ হল। গায়ে গা লাগিয়ে তারা হাঁটছিল। বিশাল দেবভূমির প্রান্তসীমানায় অপেক্ষমান রথের কাছাকাছি হলে ক্ষীণ কণ্ঠে দশরথ অস্ফুটস্বরে বলল : এস এখন আমার হাতে হাত রেখে

ওঠ। পা তোল সাবধানে। আমি হব তোমার রথের সারথী।

কৈকেয়ী যন্ত্রচালিতের মতো রথে উঠল। হাওয়ার বেগে ছুটল রথ। গিরি, বন, কানন নিমেষে দৃষ্টির অন্তরাল হতে লাগল। পশ্চাৎভাগ ধুলোয় আচ্ছন্ন হল। দৃশ্যের পর দৃশ্য সরে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই মন ছিল না কৈকেয়ীর। জড়সড় হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল সে। তার চোখের তারার বিষণ্ণ বেদনা থম থম করছিল।

পাশাপাশি দুই নদী শতদ্রু সরস্বতী যেখানে মিশেছে সেই মোহানার মাঝখানে এসে দাঁড়াল দশরথ। ইন্দ্রলোকে যাওয়ার ঐ রাস্তার মুখ অবরোধ করে আছে তিমিরধ্বজ। বিশাল সেনাবাহিনী সর্বক্ষণ সেখানে পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করার ছিল না। অতএব ইন্দ্রলাকে যাওয়ার পথ বন্ধ। অগত্যা সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না দশরথের। উদ্দেশ্য শম্বরের স্নায়ুর উপর কিছু চাপ বৃদ্ধি করা।

সৈন্যশিবির স্থাপনের জন্য এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ ঠেকানোর জন্য নিকটের অরণ্য থেকে বড় বড় গাছ কেটে এনে কাঠের উঁচু প্রাচীর তৈরি করা হলো। প্রাকার ভেদ করে বা ডিঙিয়ে শম্বরের বর্বর সৈন্যেরা যাতে শিবিরে হামলা করতে না পারে সেজন্য প্রাকারের গায়ে গায়ে সৈন্যদের শিবির এবং সেনাপতিদের কক্ষ নির্মাণ করা হল। আর তার সামনে বেশ কিছুটা খোলা জায়গা রাখা হলো, যাতে মুখোমুখি ছোটখাট সংঘর্ষ সৈন্যরা করতে পারে। চতুর্দিক ঘেরা প্রাকারের মধ্যস্থলে দশরথ ও কৈকেয়ীর থাকার গৃহ নির্মিত হলো। সৈন্যশিবির পাহারায় সুবন্দোবস্ত করতে কোন ক্রটি করল না সেনাপতিরা।

আরো উত্তরে শম্বরের সৈন্য শিবির। ইন্দ্রলোক অবরুদ্ধ করে রেখেছে অর্ধবৎসরের অধিককাল। দুরারোহ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর ইন্দ্রলোক অবস্থিত হওয়ায় সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ পেল না শম্বর। তাই চারদিক থেকে ইন্দ্রলোক অবরুদ্ধ করে তাদের আত্মসমপর্ণে বাধ্য করার নীতি নিয়েছিল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে দিল। সরবরাহ না থাকলে অস্ত্র, খাদ্যের অসুবিধা একদিন তাদের দেখা দেবেই। সেদিন তাদের প্রতিরোধের শক্তি থাকবে কোথায়? শম্বর শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষা করে আছে। এজন্যে যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয় তবু করবে শম্বর, যতদিন ইন্দ্রের অমরাবতীর প্রাসাদ চূড়াটি মাটিতে ভেঙে না পড়ে ততদিন এভাবেই প্রতীক্ষা করবে তারা।

তবু আত্মসমর্পণের পর্ব ত্বরান্বিত করার জন্য শম্বর তার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিল চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম, নগর লোকালয়ের ওপর হামলা করে, অত্যাচারে উৎপীড়নে অধিবাসীদের জীবন যেন জর্জরিত করে তোলে। শম্বরের আদেশ সৈনিকদের বর্বর নিষ্ঠুর করে তুলল। দুর্বল নারীদের ধরে এনে তারা যৌন লালসা চরিতার্থ করল। পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করল। শিশুদের ক্রীতদাস করে রাখল। শম্বরের উৎপীড়ন এখানে থামল না। খেত খামারগুলি পুড়িয়ে দেশে প্রবল খাদ্যাভাব সৃষ্টি করল। গ্রাম জ্বালিয়ে মানুষকে নিরাশ্রয় এবং গৃহহীন করল। জনপদ অবাধে লুটপাট করে তারা স্বদেশে ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলল।

অসহায় মানুষের দুর্বিষহ কান্না, বুকভাঙা বেদনা দশরথকে বিচলিত করল। তার বীররক্ত যুদ্ধের উন্মাদনায় নেচে উঠল। প্রতিবেশী দেশের নিরীহ প্রজাদের ওপর শম্বরের পৈশাচিক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা অধর্ম। ঘোরতর পাপ মনে হলো। এতে অত্যাচারীর অত্যাচার প্রশ্রয় পায়। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা প্রকট হয়। এ ভাবে তার স্পর্ধাকে বাড়তে দেওয়া কাপুরুষতা। সুতরাং স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধির পরিকল্পনা তার ব্যর্থ হয়েছে। কার্যত এ পথে অসুরকে দমানো যাবে না। একমাত্র মুখোমুখি লড়াইয়ে বর্বরদের উচিত শিক্ষা হবে। তাই সমস্ত বীর আর সৈন্যদলকে জড়ো করে দশরথ বলল : দুর্গত, দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য তোমরা অস্ত্র হাতে তুলে নাও। অশ্ব, রথ সব প্রস্তুত কর। বীর কখন মরতে ভয় পায় না। সম্মুখ রণে মৃত্যু, বীরের একান্ত কাম্য। শম্বরেব সৈন্যবাহিনীর

উপর ঝাঁপিয়ে পড় তোমরা। অসহায়, দুর্গত বান্ধব রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের জীবন ও সম্পত্তি শম্বরের হাত থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। যতক্ষণ না শম্বরের মৃত্যু হচ্ছে, তার সেনাবাহিনীর সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হচ্ছে, ততক্ষণ চলবে এই যুদ্ধ। চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ থামব না। অসংখ্য প্রাণের মূল্যে আমাদের, যুদ্ধে জিততে হবে; এই শপথ হবে আমাদের জেতাব মন্ত্র। আমৃত্যু আমিও যুদ্ধ করব তোমাদের সাথে। যুদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ কর। বলো : জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। দশরথের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ভেরী বেজে উঠল। সৈন্যরা যে যার যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। তারপর বন্যার স্রোতের মতো তারা প্রাকার থেকে নির্গত হলো।

শম্বরের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে দশরথ ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হলো। সেই রথে কৈকেয়ী ছিল তার সহযোগী। শুধু তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ক্ষিপ্রগতিতে রথ চালনার অসামান্য দক্ষতায় দশরথ সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচল।

রক্তে দশরথের শরীর ভিজে গিয়েছিল। ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। মুখের রঙ তার ফ্যাকাশে হলো। দুই চোখ নিমীলিত। নিথর নিস্পন্দ দেহে প্রাণ আছে কি নেই বোঝা গেল না। বিশাল রথে মৃতবৎ শুয়েছিল। বুকের মৃদু ওঠা নামাতে তার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রকট হলো। দশরথের এই অবস্থা কৈকেয়ীকে হতবুদ্ধি করল না। সাধারণ রমণীর মতো নিজেকে সে অত্যন্ত বিপন্ন বা অসহায় ভাবল না। চিন্তা বা বিবর্ণ ভয়ে অস্থির হল না। ঠাণ্ডা মাথায় সে তার কর্তব্য স্থির করল! এক্ষুণি দশরথের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা আবশ্যক। তাকে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু কে রথ চালাবে? রথের সারথীও ভীষণ জখম হয়েছে। হাত দুটি অকেজো হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় দেহ বেঁকে যাচ্ছে। কণ্ঠ দিয়ে একটানা কাতর স্বর বেরোচ্ছে।

শম্বর তাদের দিকে রথ নিয়ে ধেয়ে গেল। অমনি কেমন একটা খিল ধরা ভয়ে কৈকেয়ীর শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তবু এক আশ্চর্য সাহসে নিজেকে সে শক্ত রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত মনোবল সংহত করে, মরিয়া হয়ে রথ চালাতে লাগল। বায়ুবেগে চলল রথ। শম্বরের সাধ্য ছিল না কৈকেয়ীর যন্ত্রচালিত রথের পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে।

শিবিরে বসবাসকালে দশরথ প্রেমবশে তাকে যন্ত্রচালিত রথ চালানোর কলাকৌশল দেখিয়েছিল এবং পাশে বসিয়ে রথ চালনা করতেও শিখিয়েছিল। কিন্তু সে শেখা যে এত ভাল হয়েছিল আগে জানার অবকাশ হয়নি কৈকেয়ীর। আর সে শেখা যে এরকম করে কাজে লেগে যাবে স্বপ্নেও কল্পনা করে নি কৈকেয়ী। সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি তার মনে সুখ দিচ্ছিল।

কিন্তু এই অনুভূতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এক লহমার জন্য মনে এসে মিলিয়ে গেল। চোখে তার যুদ্ধের দৃশ্যগুলো ভাসছিল। কত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দশরথ যুদ্ধ করছিল। চোখের পলক না পড়তে দশদিকে আনায়াসে রথ ঘুরিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ রচনা করছিল। এই বিশেষ রণকৌশল একমাত্র অযোধ্যাপতি নেমির ছিল। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা এবং কৃতিত্বের জন্য রথী মহলে সে দশরথ নামে পরিচিত হল। শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে কৈকেয়ী স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল। এরকম আশ্চর্য যুদ্ধ সে আগে দেখেনি। রথীশ্রেষ্ঠ দশরথ সম্পর্কে তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব হল। এরকম একজন বীরের পত্নী হওয়ার জন্য নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করল। সেই সুখ, আনন্দানুভূতি থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করবে? এরকম একটা আতঙ্কিত সন্দেহে এবং উৎকণ্ঠায় তার দুই চোখ সহসা অশ্রুসজল হল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদল।

অনেকটা পথ এসে থামল বনের ধারে। অচৈতন্য অবস্থায় দশরথ যন্ত্রণায় আঃ! উঃ! করে কাতরাচ্ছিল। কৈকেয়ী তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করল। মমতা উজাড় করে দিয়ে আহত জায়গাগুলোর উপর হাত বোলাল। ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করল। ইঙ্গুদি তেল লাগাল। গভীর ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে কচি দূর্বা পিষ্ট করে চেপে ধরল। পরিধানের বস্ত্র

ছিঁড়ে আঁট করে বাঁধল। বসনের অনেকখানি ক্ষতস্থান ঢাকতে লেগে গেল। তারপর ঝরনার জলে আঁচল ভিজিয়ে দশরথের চোখে মুখে দিল। রক্তমাখা অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের শুকনো রক্তের দাগ ঘষে ঘষে তুলল। তারপর সারথির জখম স্থান ভালো করে কাপড় দিয়ে জড়াল।

প্রাথমিক পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বুকের গভীর থেকে উঠে এল। সেবার অনাবিল আনন্দে মনে খুশি খুশি ভাব জাগল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে থাকল। তাড়াতাড়ি এবং নিরাপদে পিতৃরাজ্যে ফিরে যাওয়ার সমস্যা তাকে ভাবিয়ে তুলল।

দীর্ঘ পথ। বেশ কয়েকদিন লাগল যেতে। কিন্তু কোন পথ কোন দিকে গেছে কিছু জানা নেই তার। একমাত্র ভরসা আহত রথের চালক। তার নির্দেশে চন্দ্রভাগা নদী পার হয়ে কেকয়ের পথ ধরল।

পথের দুধারে গাছপালা দ্রুত পেছন দিকে সরে যেতে লাগল। সামনের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা রোদ্দুর। কি জানি কেন, সমস্ত আকাশটা যেন তারই মতো উদ্বিগ্ন। শঙ্কায় কাতর।

দশরথের সুস্থ হতে বেশ কয়েক মাসে লেগে গেল। এর মধ্যে কেকয় থেকে অযোধ্যায় তার আহত হওয়ার খবর গেল। মন্ত্রীবর বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, ধৌম্য'র সঙ্গে দশরথের আরো দুই রাজমহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রা কেকয়ে গেল।

কৈকেয়ীর স্বামী সেবা, পরিচর্যা, নিবিড় সাহচর্য তাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করল। শুধু তাই নয়, কৈকেয়ীর প্রীতি স্নিগ্ধ আচরণ, সেবায়, স্বাচ্ছন্দ্যে, আতিথেয়তায়, অন্তরঙ্গতায় এত আন্তরিক যে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার মনে যেটুকু বিরূপতা ছিল তা ঘুচে গেল। মনে হল, কৈকেয়ী ভালবাসার প্রতিমূর্তি। যে ভালবাসা সব কিছু সুন্দর করে দেয় সেই ভালবাসার যাদুমন্ত্রে তাদের সম্মোহিত করল সে। কৌশল্যা, সুমিত্রার অন্তরে সপত্নীগত বিদ্বেষ বিষ আর ছিল না। কিন্তু মনের গভীরে ঈর্ষা তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল। কিন্তু অতলান্ত মনের সেই অভিব্যক্তি ছিল না তাদের আচরণে। বরং একটা গৌরববোধ ছিল। আহত স্বামীকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা করে কৈকেয়ী সুস্থ করল সেজন্য কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তাদের মনটা। কৈকেয়ী নিজগুণে ধীরে ধীরে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার অত্যন্ত আপনজন এবং অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। দশরথ এ হেন রূপসীকে পত্নী করে ঠিক কাজই করেছে। কৈকেয়ীর জন্য দশরথকে তারা জীবিত দেখল। এ হল দশরথের বিধিলিপি। ঈশ্বরের অনন্ত করুণায় দশরথ কৈকেয়ীর মতো সর্বকর্ম নিপুণা স্ত্রী-রত্ন লাভ করেছে। এখন বেচারা স্বামী তদের সুখী হোক এটাই তাদের একান্ত কামনা।

অযোধ্যার প্রাসাদে কৈকেয়ী দশরথের সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়পত্নী হয়ে জীবন সুরু করল। নবজনম হল তার। সে আর কেকয়ের রাজকন্যা নয়, অযোধ্যার রাজমহিষী।

॥ দুই ॥

কৈকেয়ীকে নিয়ে দশরথ যেদিন অযোধ্যায় ফিরল সেদিন থেকে পক্ষকাল ধরে চলল নববধূ বরণের উৎসব। গোটা নগরীকে উৎসবের রূপ দেওয়া হল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের আনাগোনা বেশ কয়েকদিন ধরেই চলল। প্রজারা দেখতে এল তাদের নতুন রাণীকে।

প্রজাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। দশরথ দেবলোকে যুদ্ধ করতে গিয়ে সিংহের মত শিকার করে এনেছে রূপসী কিন্নর কন্যা কৈকেয়ীকে। ভুবনের আলো এসে রাজার প্রাসাদ আলো করে রেখেছে। তার রূপ দেখে রাজা থেকে রাণী পর্যন্ত মুগ্ধ, দাসদাসী, আত্মীয়, পরিজনের মন ভরে আছে তার সুন্দর আচরণে আর মিষ্ট ভাষণে। রাজপ্রাসাদে সর্বত্র খুশির স্রোত বইছে। হৃদয় মাধুর্যে

সে জয় করে নিয়েছে সকলকে। প্রজারাও তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছে। কৈকেয়ীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং সেবার গল্পে তাদের অন্তর ভরে রইল।

প্রজাদের খুশির কথা পরিচারিকা মন্থরা কৈকেয়ীকে জানিয়েছিল। অযোধ্যার প্রাসাদে নতুন পরিবেশে কৈকেয়ীর কোনা অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য কেকয়রাজ একজন চতুরা, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন বুদ্ধিমতী রমণী, মন্থরাকে তার মন্ত্রণাদাত্রী করেই অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন। অযোধ্যাবাসীর অন্তরে কৈকেয়ীর হৃদয় মাধুর্য, নতুন রাণীর প্রতি বিস্মিত শ্রদ্ধা, রোমাঞ্চিত গর্ব ও সম্মানকে অনির্বাণ করে জ্বালার জন্য মন্থরা প্রকাশ্য দরবারে জনসমক্ষে উপস্থিত হতে বলল তাকে। নতুন রাণীর বাসনা পূরণ করতে দশরথও প্রকাশ্য দরবারের আয়োজন করল।

রাজপ্রাসাদের বিশাল চত্বরে বিপুল লোকের সমাগম হল। মাথার উপর তাদের নানা রঙের কাপড়ে তৈরি বিশাল চাঁদোয়া। জনতাকে সুশৃংখল রাখতে তক্‌মাধারী রাজপুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করছিল।

রাজা রাণী আগমনের সংকেত-বাদ্য বেজে উঠল। তারপর সূচনা হল মধুর সঙ্গীত এবং নৃত্য। অনুষ্ঠান শেষ হলে মঞ্চে এসে দাঁড়াল রাজা রানী। উল্লসিত জনতাকে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে অভিনন্দন জানাল নতুন রানী। প্রজাদের মধ্যে নতুন রাণীকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। চিৎকার করে, তারা অভিনন্দন জানাতে লাগল। রাণীমা পরমাসুন্দরী তাদের! তার রূপের কোন তুলনা হয় না। সে অপরূপা। অনন্ত বিস্ময় তার শরীরে। সোনালি নধর আপেলের মতো তার রঙ। নীলোৎপলের মতো স্বপ্নালু দুই আঁখি। সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে জুঁই'র সুবাস। সেই সুবাসে বাতাসের প্রাণে খুশির নেশা লাগল। তার হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ল জনতার অন্তরে।

প্রাসাদ অলিন্দের সংলগ্ন উঁচু মঞ্চে স্বর্ণ সিংহাসনে বসেছিল দশরথ। তার দক্ষিণ পাশে রক্ষিত স্বর্ণ সিংহাসনে কৈকেয়ী আর বাম পাশে কৌশল্যা। আর পিছনের সারিতে ছিল পাত্র-মিত্র পরিজন।

অযোধ্যার সকল লোক জানল, কৈকেয়ীর রূপ রমণীর ঐশ্বর্য। অলঙ্কার তার রূপের শোভা এবং সৌন্দর্য। অঙ্গের দ্যুতি। কৈকেয়ী শুধু রূপবতী নয়, তার গুণেরও শেষ নেই। গুণের জন্যই সে দশরথের এবং অযোধ্যার মনের মতো রানী। কেকয়রাজ অশ্বপতি কন্যাকে সর্বগুণে গুণান্বিত করেছেন। শিক্ষাই কৈকেয়ীকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলল। এ কৃতিত্ব কৈকেয়ীর চেয়ে আশ্বপতির অধিক। জনতার মধ্যে এ ধরনের গুঞ্জন মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে মঞ্চ পর্যন্ত এসে পৌছল। বৈকেয়ী সিংহাসনে বসে নিবিষ্ট মনে তা শুনল। বুকের ভেতর কথাগুলো বীণার তারের মতো রিণ্ রিণ্ করে বাজতে লাগল অনেকক্ষণ। বাবার জন্য গর্ব হল তার। বুকখানা আনন্দে ভরে গেল।

নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে অনুভব করল, সে দশরথের নির্জন নিভৃতের কামিনী নয়, কিংবা তার পতিব্রতা পত্নী শুধু নয়, সে এ রাজ্যের রাণী। শুধু সংসার বা প্রাসাদটুকুতে নয়, রাজ্যেরও অনেক দায়িত্ব তার। এ রাজ্য, প্রজা তো তারই। এমন করে নিজের অধিকারের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল কৈকেয়ীর। এই ভাবটাই তার কাছে সত্য মনে হল। কারণ মানুষ সারা জীবন ধরে শুধু পাওয়ার নেশায় ঘুরছে। পেয়ে তার সুখ নেই। এক পাওয়া শেষ হতেই আর এক পাওয়ার অকাঙ্খা জাগে বুকে। রাজারও ক্ষমতায় তৃপ্তি নেই, পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন তার দুই চোখে। সাগরে মিশে নদীর সুখ। এর মানে জীবন থেমে থাকে না, জীবন ক্রমাগতই চলে। চলতে চলতে কখনও অচলায়তনে গিয়ে শেষ হয়, আবার কখনও অনন্তে গিয়ে পরিপূর্ণতা পায়। পাওয়াটাই আসল কথা।

নিজের অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করল কৈকেয়ী। আর অবাক হল। এ কোন নতুন দুনিয়া খুলে গেল তার সামনে! হঠাৎ কেন অদৃশ্য দেবতার অমোঘ নির্দেশে এই সব কথা মনে হল তার? কথাগুলো মনে হওয়া থেকে বুকের ভেতর একটা অসহ্য উত্তাপে জ্বালা করছিল।

কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, তার যাত্রাপথের মাঝখানে অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে কৌশল্যা। সে বাধা উত্তরণের পথ নেই! কৌশল্যা শুধু দশরথের মহিষী নয়, স্নেহময়ী গৃহিণী। প্রাসাদের দাসদাসী এবং কর্মচারীর প্রতি তার সস্নেহে মধুর ব্যবহার, নিপুণ কর্তব্যপরায়ণতা এবং অতিথি পরিচর্যার জন্য সকলেই হৃষ্টচিত্তে রাণীর প্রশংসা করে। দাসদাসীরা কৌশল্যাকে মান্য করে।

তার নির্দেশ শোনে। তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তার মরমী মনের মাধুরী দিয়ে বিশাল সংসারটাকে সাজিয়ে রখেছে ছবির মতো। কোথাও এতটুকু অসংগতি নেই। রাজমহিষী কৌশল্যার সংসার শুধু প্রাচুর্যে ভরা নয়, শ্রীমণ্ডিত। শুধু সংসার আর প্রাসাদে নয় রাজাও তার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে। কৌশল্যাকে ঈশ্বর যেন কর্তৃত্বের দেবী করে পাঠিয়েছে। স্ত্রে অনন্যা। নারীসুলভ ঈর্ষায় কৈকেয়ীর বুকের ভেতর চিন্ চিন করে। সব নারী চায় গৃহে সাম্রাজ্ঞী হতে। কিন্তু কৌশল্যা থাকতে সে সাম্রাজ্য কোথায় পাবে কৈকেয়ী? অনুচিত মুগ্ধতায় তার মস্তিষ্ক পাপে বিদ্ধ হয়। সুন্দর মুখের সুকোমল পেশী শক্ত হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ক্রমে। কৈকেয়ী কোন কথা বলল না। পুঞ্জীভূত বাসনার দাহ স্নায়ুতে স্নায়ুতে। কেবল নামহীন ইন্দ্রিয় জোনাকির মত টিপ টিপ করে জ্বলছিল। সেই চকিত আলোর বিন্দুতে তার অনুভূতি নিজের কাছে সাড়া দেয়। সচকিত হয়ে নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করল কেন এমন হয়? এ তার কিসের সূচনা?

অমনি কৈকেয়ীর মস্তিষ্কের অন্ধকার সীমায় এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিকে কৌশল্যা ঝলকে উঠল। কী আশ্চর্য সুন্দর স্নেহ আর মমতা দিয়ে কৌশল্যা তাকে বরণ করল। সপত্নীগত বিদ্বেষ, ক্ষোভ, দুঃখ বেদনা, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, ঈর্ষা তার আচরণে প্রকাশ পেল না। কৌশল্যার সংযত শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর দেবীমূর্তি দেখে কৈকেয়ীর কখনও মনে হয়নি স্বামীর মুখ চেয়ে কৌশল্যা তাকে বরণ করেছিল। বরং জননীর মতো তাকে আপ্যায়িত করল। ভাল ভাল খাবার পরিপাটি করে সাজিয়ে তার সামনে ধরল। পাশে বসে নিজে তার তদারকি করল। সুমিত্রাও পাশে বসেছিল। বসে বসে চামর দোলাচ্ছিল। গোল হয়ে পুরনারীরাও বসেছিল তার পাশে। কত হাসাহাসি, তামাসা, কৌতুক, গল্প তাকে নিয়ে হতে লাগল। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে বসে অনেক মেয়েলি কথা তার কানে এল। কৈকেয়ী খাচ্ছিল না। কেমন উদাস অন্যমনস্কের মতো মাথা নীচু করে হাত নাড়ছিল। থালার উপর আঙ্গুলের দাগ কাটছিল। কৈকেয়ীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কৌশল্যা দরদী গলায় বলল : বাড়ির কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে তাই না! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ বোন, এ কষ্ট তো সইতে হবে। বিয়ের আগে আমারও বায়না ছিল কত! মাকে ছেড়ে এক তিল থাকতে পারতাম না। এখন সে সব কোথায় গেল, মনেও পড়ে না। দুদিন বাদে তোমারও সয়ে যাবে। সবই কপাল। মেয়েমানুষের জীবনটা বিধাতা এক আশ্চর্য ধাতু দিয়ে গড়েছে। ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তারপর অন্য লোকের হাতে তুলে দাও। সেই অজানা অপরিচিত মানুষটা তার ভাগ্যবিধাতা। তারই খেয়াল খুশি ইচ্ছার পুতুল। সংসার, ছেলেপুলে ঘরকন্না নিয়ে তার জীবন। এটুকুই তার অবলম্বন। তার জগৎ। তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে সব রমণী মেতে থাকে, নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। নিজের সঙ্গে তার নিজের এই বঞ্চনা প্রতিমুহূর্ত। তাই নিরন্তর একটা বিরোধ লেগে রয়েছে তার মনে, কাজে এবং সংকল্পে।

কৌশল্যার কথাগুলো কৈকেয়ীর মন ছুঁয়ে গেল। এসব অনুভূতি হওয়ার মতো তার বয়স হয়নি। কৌশল্যা তার চেয়ে বয়সে বড়। অনেকদিন স্বামীর ঘর করছে। তার অভিজ্ঞতাও বেশি। কৌশল্যা অনেকদিন ধরে জীবন দিয়ে যা জেনেছে, কৈকেয়ী সেই অভিজ্ঞতা এবং জীবনদর্শনের যোগফল এক মুহূর্তে জানল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না; তবে, এটা বোঝা গেল যে, কৌশল্যা জীবনের প্রতিটি ব্যাপারকে মর্ম দিয়ে অনুভব করে। কেন করে, কে জানে? অনুভব করাতেই বোধহয় তার সুখ। আর কোন নারীর মুখে জীবনকে এত গভীর করে বলতে শোনেনি। এর কারণ, কৌশল্যার বন্দী নারী অন্তরে কোথাও একটা যন্ত্রণা অথবা কষ্ট আছে। না হলে এসব অনুভূতি কেমন করে হল তার মনে? অথচ বাইরে থেকে দেখে মনের এসব দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা বিক্ষোভের কোন প্রতিক্রিয়া যা তাব অনুভূতিতে প্রতিমুহূর্ত ক্রিয়াশীল তার কিছুই অনুমান করতে পারা যায় না। কৌশল্যার উপেক্ষিত কষ্টের চকিত অনুভূতিতে তার বুক টন টন করছিল। কষ্টের মধ্যেই অনুভব করল— কষ্ট দুঃখ, বেদনা বাদ দিয়ে কোন মানুষে বেঁচে নেই। সে নিজেও একটা কষ্টে আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে।

এই ভাবনাসূত্রে তার আরো মনে পড়ল, কৌশল্যার পরিতাপিত অন্তরের নিগূঢ় মর্মকথা। বেশ

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কৌশল্যা পুনরায় বলল : তুমি নতুন। সব জান না। অভিজ্ঞতাও কম। তবু সব জেনে রাখা ভাল, রাণীর ভাগ্যে মেয়ে মানুষের তৃপ্তি সুখ দেয়নি ঈশ্বর।

নিজের অজান্তে প্রশ্ন করল কৈকেয়ী : কেন?

চোখের পাতায় নিবিড় ব্যথার ছায়া ঘন হল কৌশল্যার। বলল : স্বামীকে নিজের করে পাওয়া রাণীদের কপালে থাকে না। পেয়ে হারায় তারা। আর সে হারানো দুঃখ যে কত ভয়ানক তা জান না তুমি।

কৈকেয়ী কোন জবাব দেয়নি। জবাব দেবার মতো কোন কথাই ছিল না তার। দুই চোখ তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছিল। উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় তার মুখ থম থম করছিল।

ঢোঁক গিলে কৌশল্যা বলল : মহারাজের জীবনে আমি প্রথম নারী। কিন্তু আমিও পাইনি তাঁকে। যেদিন এ প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করলাম, সেদিন মনে হল স্বর্গ পেলাম। পুরুষের তপ্ত ভালবাসা ধন্য করল আমাকে। এই সুখ, আর আরামের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু দুদিন বাদে প্রশ্ন জাগল, এই কি সুখের নমুনা? কিছু কালের ভেতর নতুনের নেশা কেটে গেল। জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি ভরাতে ক্রমেই রাজাকে পাওয়া দুর্লভ হল। প্রমোদ কক্ষেই কাটে সারাক্ষণ বিয়ে বিয়ে খেলা করে। তাদের হাজার খেয়াল আর বিলাসিতার মধ্যে বিয়ে, বৌও এক বিলাস। রানী হওয়া একটা বৃহৎ পরিহাস।

কৈকেয়ী, কৌশল্যার মুখের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট হয়ে কথা শুনছিল। চোখে মুখে তার গভীর আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল। কারণ, জীবনের এসব কথা সে জানে না। নতুন শুনছে। তাই তার ভিতরটা একটা ভয়ঙ্কর ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল : আমার ভীষণ ভয় করছে।

কৌশল্যা একটু এস্ত হয়। নিবিড় কালো দুই চোখের তারায় এক তীব্র উৎকর্ণতা। নিচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : নিজেরও তো প্রয়োজন বলে বস্তু আছে। নিজের প্রয়োজনের বন্ধনটাই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধন। কিন্তু সে বন্ধন মহারাজের ছিল না। সুন্দরী ললনাদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছেন সর্বক্ষণ। গৃহিণীর মনের সংবাদ রাখার সময় কোথায় তার? আমরা তাদের আশ্রিত। অনুগৃহীত। ঘর সাজাবার বিলাস দ্রব্য। আমার নারী জন্ম বৃথা। নারী হয়ে পারি না পুরুষকে আকর্ষণ করতে, তাকে কাছে টানতে। ধরে রাখার কিংবা বশ করার মন্ত্রও জানি না। ব্যর্থতার এই দুঃখে মন পোড়ে, হৃদয় জ্বলে। পুরুষের চিত্ত জয়ের শক্তি বিধাতা নারীকে দিয়েছেন। কিন্তু আমায় দেননি কেন? মহারাজকে যাদু করেও রাখতে পারলাম না। হেরে যাওয়ার এই গ্লানিতে মন পোড়ে, বুক জ্বলে। বলতে বলতে কৌশল্যার কণ্ঠস্বর তীব্র আবেগে ভারী হল। চোখের পাতায় উপেক্ষিত অসম্মানের ছায়া সুনিবিড় হল। কৈকেয়ীর কিশোরী প্রাণের মধ্যে অতর্কিতে অপমানের বেদনা এতো গভীর ভাবে বেজেছিল যে, নিঃশব্দে চোখ মুছতে মুছতে সে ওঠে গেল। চকিতবিদ্ধ কষ্ট তার আচ্ছন্নতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হল।

কৌশল্যা এমন অনায়াসে কথাগুলো বলল, যে কৈকেয়ী চিন্তাই করেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় কৌশল্যার বুকের ভেতর ঝটিতি অজস্র ক্ষোভ জিজ্ঞাসা একসঙ্গে এমনই উথালি পাথলি করতে লাগল যে একটি কথাও সে উচ্চারণ করতে পারল না। নীরব শ্রোতার ভূমিকায় তার কিশোরী মনের আবেগ অনুভূতি লজ্জায় আবিষ্ট হল। নিরালা ঘরের নির্জনতার মধ্যে দশরথ কৌশল্যার সম্পর্ক তীব্রভাবে আবর্তিত হতে লাগল। মনে একটা জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি প্রবল হল। দশরথ কৌশল্যার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। কিন্তু তাতে প্রেম নেই, আকর্ষণ নেই, আবেগ নেই। এমন কি অধিকারবোধও সংকুচিত। সম্পর্কটা তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক। সুবিধা আর স্বার্থের। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতখানি উত্তাপহীন এবং নির্বিকার হলে তবে এরকম অসহায় অভিসম্পাতের মতো মনে হয় নিজের অবস্থাকে। কৈকেয়ীর মস্তিষ্কে কথাটা বিদ্যুতের মতো ছুঁয়ে যায়; অমনি যন্ত্রণা বিদ্ধ এক কষ্টে বুক তার টনটন করে। অনুরূপ আতঙ্কে বিবর্ণ হল তার মুখশ্রী। পেশী শক্ত হল। প্রাসাদে নিজেকে তার ভীষণ একা এবং নিঃসহায় মনে হল। রুদ্ধ অভিমানে সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর, আত্মহারা আবেগে অনেকক্ষণ একা একা কাঁদল। কেঁদে হালকা হল।

নিজের অজান্তে কৈকেয়ী ভাবতে লাগল কৌশল্যা যা যা বলল সব সত্যি? এর একবর্ণও মিথ্যে নয়? তাকে ধোঁকা দেয়ার কৌশল'ও হতে পারে? কর্তৃত্ব রক্ষার স্বার্থে অথবা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেও কৌশল্যা তাকে ভয় দেখাতে পারে। স্বামী সম্পর্কে কৌশল্যা যে তার মনে একটা ঈর্ষা বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করছে না তার কি প্রমাণ আছে? এ সবই হয়ত কৌশল্যার ছলনা। তার উপর দশরথের আত্যন্তিক আকর্ষণ, টান এবং প্রেম কৌশল্যাকে ঈর্ষান্বিত করছে। তাই দশরথের প্রতি তাকে বিরূপ করার জন্য, তাকে দূরে সরানোর জন্য তার প্রেমে ক্লান্তি আনার জন্য নিজেকে নিয়ে হয়তো সত্য মিথ্যার গল্প বানিয়েছে কৌশল্যা। এ সব সন্দেহ ও সংশয়ে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। তার সারা মনে গ্লানি জমল। কিন্তু দেহ মনের ক্ষুধা, চাওয়ার তীব্রতা, জয় করার নেশা, নীড় রচনার স্বপ্ন, জীবনের কাছে অনেক চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে জীবনের এককূল থেকে আর এক কূলের দিকে প্রবলবেগে টানতে লাগল। তাই, কৌশল্যার কথাগুলো তার চিন্তায়ও মনেতে দীর্ঘস্থায়ী হল না। বলাবাহুল্য এই বোধই তাকে আত্মসচেতন মহিলা করে তুলল। রাজাপ্রাসাদের আলোর রোশনানই, প্রাণের প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, বিলাস, ভোগ সুখের মধ্যে আত্মার কৃচ্ছ সাধন এবং দারিদ্র বেমানান। নিজের সত্তাকে, মনকে পঙ্গু নিঃশেষ করে শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। নিঃস্ব শীতের শাসনে নিঃশেষ হয়ে যায় গাছের পাতা। যারা ঝরে গেল তাদের কেউ মনে রাখে না—গাছও না। বাঁচার জন্যে প্রয়োজন আনন্দ আব তৃপ্তি। চরিতার্থতার সুখ। ওই অনুভূতি তার সারা মনে একটা নতুন সুরে জাগল। কৌশল্যার কথাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে কি একটা নিবিড় আতঙ্ক আর ঘৃণায়। নিজের কর্তব্য সে করেনি। পত্নীর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিজেকেই নিজে ঘৃণা করে। জীবনে কোন পাওয়া কোন তৃপ্তিতে তার অধিকার নেই। তাই শুধু কাঁদে, হা হুতাশ করে। কিন্তু তাদের সে ভুল পথে কৈকেয়ী গেল না। দশরথ তাঁর জীবনে প্রথম পুরুষ। তার স্বামী। তার প্রেম, তার জীবন। তাকে প্রেমে বশ করেছে, সেবায় জয় করেছে। দশরথ তার সব পাওয়ার স্বপ্ন। সারা জীবনের ব্যাকুল কামনা। তার সেই অধিকাবের উপর আর কারো ভাগ সে রাখবে না। দশরথ শুধু তার একার। একান্ত নিজের। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অসহ্য। কৌশল্যা, সুমিত্রাকে নিজের অজান্তে সে ঈর্ষা করতে লাগল।

নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল কৈকেয়ী। আত্মমুগ্ধ সমাধিস্থ ভাব তাকে এমন নিরাসক্ত এবং নির্বিকার করে রাখল যে দরবারে বিভিন্ন ঘোষণা এবং নিয়ম মাফিক কাজকর্ম কিছুই দেখছিল না। জনতার উল্লাস, হর্ষ, কোলাহল, জয়ধ্বনি তার কানে আসছিল, কিন্তু তাতে তার একাগ্রতা নষ্ট হল না। কিংবা তার প্রতি কোন আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ পেল না। শূন্যদৃষ্টিতে সে জনতা দেখছিল। তার অন্যমনস্ক ঔদাসীন্যের দিকে তাকিয়ে দূর আকাশে চিকুর হানা চমক লাগল দশরথের মনে। কৈকেয়ী প্রস্তরমূর্তিবৎ, বধিব। তাব চোখে ছিল একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ।

উৎকণ্ঠায় দশবথের দুই চোখের চাহনি সুনিবিড় হল। রহস্যের সুমুখে একটা গভীর জিজ্ঞাসার ভুরু টান টান, অপলক দৃষ্টি। নিচু স্বরে উচ্চারণ করল ছোট রাণী!

কৈকেয়ী চমকে উঠল। সম্মোহিতের মত সাড়া দিল তার ডাকে। বললঃ হুঁ।

কৈকেয়ী কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দশরথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হাসার চেষ্টা করে বলল : কিছু বলবে?

দশরথ মাথা নাড়ল। বললঃ এই দরবার তোমার জন্য। অথচ, তুমি নির্লিপ্ত নির্বিকার ও উদাসীন। এর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই?

কী করব বল?

দশরথ সেই মুহূর্তে জবাব দিতে পারল না। তার চোখের দিকে তাকাল। তারপর, উদ্ধত বুকের দিকে। দৃষ্টিতে তার অসহায়তা ফুটল। খুব আস্তে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল। এখানে আসার পর থেকে তুমি কেমন বদলে গেছ। কিসের দুঃখ তোমার কাছে বড় হয়ে উঠল, জানতে ইচ্ছে করে। তোমাব কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হয়।

কৈকেয়ী হাসল। ভারী গলায় বলল, দুঃখ নিজে থেকেই অনেক বড়। তার কোন সীমা পরিসীমা

নেই। বুক থেকে উঠে আসা একটা কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করল। আর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সেই সাথে।

দশরথ কষ্টে মাথা নাড়ল। ফিস ফিস স্বরে বলল : তোমার কোন দুঃখই থাকবে না একদিন দেখ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর কথাবার্তার মধ্যে মন্ত্রীবর বশিষ্ঠ সশরীরে উপস্থিত হল। সবিনয়ে নিবেদন করল: মহারাজ ছোটরাণীর হাত থেকে প্রজারা অন্ন, বস্ত্র, এবং স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণের জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু পরিশ্রম স্বীকার করে তাকে একাজ করতে হবে নিজের হাতে। এটাই এ রাজ্যের কুলপ্রথা।

গরিব দুঃখী প্রজাদের অন্ন-বস্ত্র-ধন বিতরণ করতে কৈকেয়ীর বার বার মনে হতে লাগল সে নিজেই এ রাজ্যের অধীশ্বর। অসীম তার ক্ষমতা। এই রাজ্য প্রজা সব তার। সে এর রক্ষক, পালক, শাসক।

গভীর রাত।

পৃথিবী নিস্তব্ধ। রাতের আকাশে তারারা শুধু জেগে। নীচের পৃথিবী ঘুমিয়ে। সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। পাহারা দেবার জন্য কেউ জেগে নেই। প্রাসাদের প্রহরীরাও থামের গায়ে মাথা রেখে আঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দশরথ চুপি চুপি তার শয্যা থেকে উঠল। পায়ে পায়ে কৌশল্যার কক্ষের সামনে দাঁড়াল। বন্ধ দরজায় হাত দিতে খুলে গেল। পা টিপে টিপে কক্ষে ঢুকল। কৌশল্যার পালঙ্কের উপর বসল। নিদ্রিত কৌশল্যাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। পরিধানের স্বচ্ছ পাতলা বসন নিদ্রার মধ্যে এলোমেলো ও বিস্রস্ত হয়েছিল। আর তার আড়ালে অবারিত হয়েছিল বক্ষবাসের আবরণমুক্ত কোমল, নরম সুডৌল মসৃণ দুটি স্তনভাণ্ড, গুরুনিতম্বে অস্পষ্ট ছায়াভাস এবং কটিতলের উলংগ জঙ্ঘা। খর যৌবনবতী সেই অনির্বচনীয় অনাবৃত সৌন্দর্যের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি কামনায় আবিল হয়ে উঠল। আর গলা মোমের মতো তরল স্রোত তার মেরুদণ্ড দিয়ে বইতে লাগল। নিদারুণ উত্তেজনায় দেহমন তার বিবশ হয়ে গেল। রাত্রির সেই মধ্যযামের নিথর নিস্তব্ধতার ভেতর চুপ করে বসে থাকতে থাকতে তার সারা অঙ্গে লাগল কামনার জোয়ার। নদীতটের মত পড়ে থাকা শরীরটা উপর ঢেউর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দলাই মালাই করতে ইচ্ছে হল। নদী হয়ে তার দেহে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পারল না দশরথ।

তুষারাবৃত পাহাড়ের মতো হিমশীতল আর কঠিন তার দেহ। কেবল আঙ্গুলগুলো লুব্ধ আর মত্ত হয়ে উঠল। পরম আদরে তার বুকে আলতো করে হাত বোলাল।

নিদ্রিত কৌশল্যার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে গেল তার শিহরন। অমনি কৌশল্যা চমকাল। চোখ খুলল। ধড়ফড় করে উঠে বসল ফেননিভ কোমল শয্যায়। সদ্য ঘুমভাঙা দুই চোখে তখনও একটা আতঙ্ক, উদ্বেগ জড়িয়ে ছিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল। এক অব্যক্ত বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা দশরথকে দেখেই যেন থমকে গেল। অবাক চোখ অবাকতর করে সে দশরথের দিকে তাকাল। ঠোঁটে তার ধরা পড়ে যাওয়ার গ্লানিকর লজ্জার আভাস। তার সমগ্র অভিব্যক্তিতে একটি ভীরু অপরাধবোধের আর্তি যেন মার্জনা চাইছিল। কিন্তু তাতেই চল্লিশ বছরের দশরথকে এত সুন্দর লাগছিল যে তাতে ত্রিশ বছরের কৌশল্যার রক্ত থরথরিয়ে উঠল। মুহূর্তে কৌশল্যাকে অন্যরকম লাগল। প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির তীব্রতায় জ্বল জ্বল করছিল বয়স্ক দুটি চোখ। দশরথের বুকের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে কৌশল্যার বিস্ময়মাথিত স্বর ধ্বনিত হল : তুমি! এত রাতে!

তোমাকে দেখব বলে চুপি চুপি এসেছি। কতকাল পাই না তোমায়। নিভৃতে দুটো মনের কথা বলতে এলাম।

কৌশল্যার বুকের ভেতর অশান্ত সাগরের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস। নিজেকে তার কেমন অশক্ত লাগছিল।

মনে হচ্ছিল, একটা কিছু আশ্রয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তথাপি, কেমন একটা সহিষ্ণুতায় সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দশরথের দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে বলল রাত্রি এত মধুর, প্রেম এত সুন্দর, আগে কখনও অনুভব করিনি। কতকালের পিপাসাকাতর মরুভূমির ওপর নামল ভরা শ্রাবণের স্নিগ্ধ বর্ষণ। আনন্দের এই অসহনীয় আবেগ আমি রুখব কি করে?

কৌশল্যা মুহূর্তে দশরথের গলা জড়িয়ে ধরল। শরীরের নিবিড় স্পর্শ দশরথের অনুভূতিতে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করল। আগ্রাসী তৃষ্ণার চুমুকে নিজেকে পরিপূর্ণ দান করার আনন্দের মধ্যে ডুবে গিয়ে কৌশল্যা বলল : ওগো এটা কোন্ ঋতু? ঋতুরাজ বসন্ত কি আমার তিরিশ বছরের জীবনে ফিরে এল? তাই বুঝি পৃথিবীতে এত সবুজের সমারোহ, গাছে গাছে পাখির কাকলি! বসন্তের মলয়ে প্রাণ জুড়োনোর আবেশ। বুকের ভেতর ঝর্নার কলরোল। তাই খোলা চোখে দেখছি নীল আকাশের আকুলি। আজ আমার একি হল? আমি কি জানতাম, আমার সুখের স্বপ্ন এমনি করে পায়ের তলায় অনুগত রাত্রির মতো লুটিয়ে পড়বে?

দশরথের নীরব চোখে তার উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। ভীষণ মৌন এবং গম্ভীর তার মুখ। কৌশল্যার আবেগে ঘোরলাগা আচ্ছন্নতা তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে পাক খাচ্ছিল। আর একটা তীব্র অপমানবোধে তার বুক টাটাচ্ছিল। আপন মনের জটলায় কষ্ট পাচ্ছিল। কেমন একটা অসহায় ক্লান্তিতে ধুঁকছিল। কাঁটার মতো মনের ভেতর খচখচ করে ফুটছিল কৌশল্যার প্রগলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীর। তীব্র অসহায় যন্ত্রণায় কৌশল্যা তাকে আঘাত করেছিল। এ তার প্রাপ্য! তবু তার চৈতন্য জুড়ে কৌশল্যার নিষ্ঠুর কৌতুক তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে নিজের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল। ভীরু চমকানো কষ্ট বিদ্ধ অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল তার কণ্ঠে। বলল : মহিষী তোমার বিদ্রূপ বড় নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গ ভীষণ নির্মম।

কৌশল্যার দুই চোখে বিভ্রান্ত বিস্ময়! সম্মোহিতের মতো উচ্চারণ করল : আমার সব পাওয়ার মাঝে এমন নিষ্ঠুর হলে কেন মহারাজ? তোমার সামান্য করুণা, সহানুভূতিতে যার জীবন ধন্য হয়ে যেত তাকে অনুগ্রহ দেখালে না কেন? ভুলেই তো ছিলাম। তবে, কেন বসন্তের বার্তা নিয়ে এলে? একি শুধু ছলনা? কিন্তু আমি তো একবারও তা মনে করিনি। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল রাত্রি। তুমি কেন তালভঙ্গ করলে? কেন স্বপ্ন ভেঙ্গে খান্ খান্ করলে? মুখে তোমার হাসি নেই, চোখে নেই সোহাগভরা দৃষ্টি। কেন? কি হয়েছে তোমার? আমি তোমার সকল দুঃখের সাথী। আমাকে খুলে বল। লুকিয়ো না কিছু।

দশরথ অভিভূত। মনে মনে সে অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে কৌশল্যার দুর্জয় ক্রোধ, অভিমান, আক্রোশ প্রকৃতপক্ষে তার ভালবাসার অভিমান। দশরথকে নিজের করে পাওয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার একটা দুর্জয় অভিলাষ কোন না কোন কারণে তার আকর্ষণের মধ্যে সংঘাত বাধাল। এজন্য দায়ী ছিল দশরথ ও কৈকেয়ীর দু'জনের জীবনকে দেখবার ভাববার ভঙ্গী আর চিন্তা। যে পরিবেশের ভেতর তাদের জীবন প্রবাহ স্বাভাবিক হতে পারত দশরথ তার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তাই, কৌশল্যার অন্তরে আকর্ষণ বিকর্ষণের সংঘাত নানাবিধ অনুভূতির বিশ্রণে জটিল ও অস্বাভাবিক। এই অসংগতি কৌশল্যার স্বরে রীতিমত বিদ্রূপের মতো বেজেছিল। পরক্ষণে দশরথের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি কৌশল্যার মস্তিষ্কে ঝলকে উঠে দপ্ করে নিভে গেল। বুক তার তীব্র অনুশোচনায় হাহাকার করে উঠল। কৌশল্যা সম্পর্কে দশরথের এই অনুভূতি তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত তাই কথা বলতে পারল না দশরথ। খানিকটা অসহায়ভাবে ডাকল : মহিষী!

রাজা! দুরন্ত আলিঙ্গনে আমকে একটু কাছে টেনে নাও। বল, আমি তোমার। চিরকালের মতো তুমি আমার।

উতলা হয়ো না রানী। দশরথ তোমারই থাকবে। শরতের মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দেয় সূর্য। কিন্তু সেটা সাময়িক।

রাজা তোমার কথার মধ্যে সন্দেহ, প্রতিশ্রুতির মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা। তুমি সব খুলে বল।

দশরথ ভগ্নকণ্ঠে করুণভাবে বলল : রানী বাজে কথায় শুধু দুঃখ বাড়ে।

মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই সব কথা শুন না।

কৌশল্যার মুখে যেন ঝড়ের ঝাপ্টা লাগল। তার দৃষ্টি আচমকা আঘাতে বেদনাহত। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সে। কৌশল্যার আঁচল বুক থেকে খসে পড়ল। কাঁচুলিতে ফিতের ফাঁস ছিল না। মুক্ত বক্ষের মসৃণ চিক্কণ ত্বক দেখা যাচ্ছিল। কৌশল্যা আঁচল টেনে বুক ঢাকল না। খোলা বুকের উপর দশরথের দুই চোখ জ্বলছিল।

কৌশল্যার স্বরের মধ্যে কেমন একটা আচ্ছন্নভাব। ভাঙা গলায় বলল : তবু বল তুমি। আমি সব সইতে পারি। জন্মলগ্ন যার অশুভ, জীবন চির দুঃখের তাকে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? আমি তো জানতাম ছোটরানী আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে দেবে। এর চেয়ে অধিক দুর্ভাগ্যের সংবাদ তুমি আমায় কি দেবে?

দশরথ খানকটা হতভম্বের মতো কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে থাকল। সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল : তা কেন হবে?

রাজা, সে তোমার জীবনদাত্রী। তোমার রূপমুগ্ধ প্রণয়িণী। তাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ, শান্তি পেয়েছ। সেজন্য আমার কোনা দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে। তুমি শুধু আমাকে দুঃখের ভাগ দাও। তাতেই আমার শান্তি।

দশরথ কিঞ্চিৎ বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। তার মুখের পেশী শক্ত হল। ঠোঁটের দু'কোণে কাঠিন্য ফুটে উঠল। দৃষ্টি প্রখর হল। কণ্ঠস্বর তার কঠিন ও গম্ভীর হয়ে ধ্বনিত হল। বলল : ছোটরাণীকে তুমি ঈর্ষা কর। তোমাদরে দু'জনের বনিবনা হচ্ছে না। দুজনা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে জ্বলছ। তোমাদের দুজনের সহবস্থান এক জায়গায় আর সম্ভব নয়।

কৌশল্যার বুকের মধ্যে কেঁপে গেল। মুখে কষ্টের ছায়া সুনিবিড় হল। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল : এ সব কথা কেন আসছে?

জানি না। দশরথ রুদ্ধ স্বরে মাথা নাড়ল। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তোমাদের দু'জনের থাকার আলাদা আলাদা প্রাসাদ হওয়া ভাল।

কথা শেষ করার জন্য দশরথ দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। চোয়াল শক্ত আর কঠিন হল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল ঃ আগামী ফাল্গুনের শুভ তিথিতে সরযূর তীরে নবনির্মিত বিশাল রাজপ্রাসাদে আমি তোমাকে নিজে নিয়ে যাব। এখানকার রেষারেষিতে তোমাকে মানায় না। রাজমহিষীর একটা আলাদা মর্যাদা থাকা দরকার। আমি তোমাকে সেই গৌরবে রাখব। কাশীরাজ্যের সমুদয় গ্রাম, নগর তোমায় আমি দান করলাম; তুমি হবে তার একমাত্র শাসনকর্ত্রী, তার রক্ষক। সম্রাজ্ঞীর সম্মানে তুমি বাস করবে নতুন প্রাসাদে। প্রজাদের দেয় রাজস্বে, উৎপাদিত পণ্যের আয়ে তোমার রাজকোষ পূর্ণ হবে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের কোন সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি হবে রাণী, লোকমাতা। তোমার দেখাশোনা করবে সুমন্ত্র।

দশরথের কথা শুনতে শুনতে কৌশল্যা উদাস অন্যমনস্কতায় কেমন গম্ভীর এবং শান্ত হয়ে গেল। অসম্ভব পটুতার সঙ্গে দ্রুত নিজেকে সহজ করার শক্তি সংগ্রহ করল। নিরীহ মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল : শুধু এই নাটক করতে এত রাতে ছুটে এলে? আমি ভাবি কি না, কি! দুর্ভাগ্যের এই সুসংবাদ তো দিনেও দেওয়া যেতো। এজন্যে মিছিমিছি আরামের ঘুমটা কেন ভাঙ্গালে মাঝরাতে?

কেমন একটা অপরাধবোধে মলিন হল দশরথের মুখখানা। অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হল তার নিজের অবস্থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ গলায় বলল : সব আমার অদৃষ্ট। বিশ্বাস কর এক আশ্চর্য গল্প শোনাতে এসে আর এক গল্পের অবতারণা করতে হল।

আশ্চর্য গল্পই তো শুনলাম। তবু আক্ষেপ তোমার—

কৌশল্যা! বিশ্বাস কর, অন্য কথা বলতেই এসেছিলাম। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। যা বলতে চাইলাম, তা বলা হল না। একেই বলে নিয়তি।

ঠিক বলেছ, একথাটা আগে মনেই হয়নি। নিয়তিই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, আমি তুমি নিমিত্ত! খাসা যুক্তি। কী অদ্ভুত ছলনা। অথচ, তুমিও জান, আজ না হলে দুদিন পরে তুমি বলতে। কী দরকার এই মুখোশের।

কৌশল্যা তোমার বাক্য বড় নির্মম।

কৌশল্যার ঠোঁটে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। বিদ্যুতের মতো দুই চোখ মুহূর্তের জন্যে দপ করে জ্বলে নিভে গেল। শ্রাবণ মেঘের মতো সুনিবিড় ছায়া ঘনাল চোখের কোণে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর কাঁপল। বলল : কী পেয়েছি তোমার কাছে? সন্তান? সংসার? প্রেম? স্নেহ? আদর? সান্নিধ্য? কিচ্ছু দাওনি। তোমার প্রাসাদে একটা বাঁদী আমি। স্বামীর কোন্ কর্তব্য তুমি করেছ? স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার আর নির্লজ্জ কামাচারে আকণ্ঠ ডুবে আছ। তুমি পশু। নিজের সুখ আর স্বার্থে মত্ত। আমরা তোমার ঘরের সাজানো পুতুল। যখন ইচ্ছে হয় অনুগ্রহ আর কৃপা দেখিয়ে ধন্য কর। এ তোমার এক ধরনের সুখ আর বিলাসিতা। তোমার এই মজার খেলা যে কত নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর তুমি তার হিসাব রাখ না। নারী সব সইতে পারে, পারে না স্বামীর অবহেলা আর অপমান সইতে। প্রেমের অপমান আর দেহের লাঞ্ছনা সহ্য করা যে কত কষ্ট তা তুমি পুরুষ হয়ে জানবে কি করে বল? একনিষ্ঠ প্রেমের কি মূল্য তোমরা দাও? সমস্ত দিবস-রজনী যার কথা ধ্যান করে দিন কাটে, যার জন্য থাকে অধীর প্রতীক্ষা, যাকে জীবন সর্বস্ব করে সব সঁপে দেয়, বিনিময়ে তার কাছে কি পায়? অথচ একদিন পুরুষের মতো নারীও ছিল স্বাধীন। কিন্তু বহুপুরুষের রমণযন্ত্র হয়ে থাকার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য এক পুরুষের উপর নির্ভরশীল হল। এতে দেহের শুচিতা রক্ষা পেল কিন্তু মনের গ্লানি কাটল না। কৌশলে পুরুষ বহু নারী ভোগের অধিকার নিজের হাতে রাখল। লোভী, ক্ষমতাবান পুরুষ কৌশল বদলে নারীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাকে সেবাদাসী করল।

কৌশল্যা! তোমার অভিযোগ মর্মান্তিক! আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।

মহারাজ, আমার কথা শেষ হয়নি। আমাদের অনুভূতিটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করলে সমস্ত নারীর হয়ে আমি তোমার কাছে এক করুণ আবেদন রাখছি। পুরুষের এই বহুনারী বরণ নারীর প্রেমের অভিশাপ। অন্য নারীতে উপগত হয়ে কোন পুরুষ যখন আর এক স্ত্রীর প্রেমের মন্দিরে পা রাখে তখন একদিকে নারীর স্বামী সংস্কার অন্যদিকে তার প্রেম ও মর্যাদাবোধের যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও গোপন সংঘাত সুরু হয়ে যায় তার খোঁজ পুরুষ রাখে না। স্বামীকে বরণ করতে তার অন্তর ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়। ভীষণ অশুচি আর অপবিত্র মনে হয় তার প্রিয়তমকে। এক দুর্বিষহ অভিমান তার বুকের মধ্যে পাক খায়। তবু অসহায় নারী যখন তার সঙ্গে সহবাস করে তখন কষ্ট হয় তার। প্রেমের বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বামীর প্রতি তখন কোন দরদ, মমতা, প্রেম, প্রীতি থাকে না। অভ্যাসের বশে নিরুপায় সোহাগ দেখানোর অভিনয় করতে হয় এক দেহোপজীবিনীর মতো। তখন নিজেদের যৌনকর্মী মনে হয়। নিরুপায় এই আত্মদানের যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয় তার অন্তরাত্মা। বহুপত্নীক স্বামীর অংশীদারীকে স্বীকার করতেও তার কষ্ট। একমাত্র ভুক্তভোগী নারী ছাড়া এই মর্মছেঁড়া যন্ত্রনা কেউ বুঝবে না। তোমার কাছে এসব কথা বলার কোন মানে হয় না। তবু জেনে রাখ, তোমার নির্লজ্জ কামুকতাকে আমি ঘৃণা করি। তোমাকে করুণা কিংবা অনুগ্রহ করে আমি শুধু নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করি। আমার কৃপা গ্রহণ করে তুমি যখন অনুগত ভৃত্যের মতো খুশিও হও তখন ভীষণ মজা লাগে। নিজের আনন্দের জন্য আমি তোমাকে প্রশ্রয় দিই। কিন্তু আমার চোখে তুমি একজন কৃপাপ্রার্থী ছাড়া অন্য কিছু নও। তোমাকে করুণা দেখানোই আমার কাজ।

দশরথ শান্ত কণ্ঠে বলল : তোমার তিরস্কার আমার প্রাপ্য। কিন্তু আজ স্ত্রীর কাছে আমার অনেক দাবি। আমি চাই প্রেম; চাই তার কাছে একটি সন্তান। যার মধ্যে আমার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখব। মহাকালের বুকে অক্ষয় অমর করে রাখব আমার রক্তের বীজ। সেই গল্প শোনাব বলে চুপি চুপি তোমার কাছে আসা। কিন্তু ঘটনার স্রোতে খড় কুটোর মতো ভেসে গেল আমার সে ইচ্ছা। এখন এককূলে আমি, আর এক কূলে তুমি মাঝখানে বেজায় ফাঁক।

দশরথের কথায় কৌশল্যা চমকে উঠল। জিজ্ঞাসানিবিড় দৃষ্টি মেলে দশরথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিতে নির্বাক জিজ্ঞাসা। সন্তানোৎপাদনের শক্তি দশরথ রাতারাতি পেল কোথা থেকে? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা একবাক্যে বলেছে বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে অতিরিক্ত রমণী সম্ভোগের ফলেই তার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে। হৃত প্রজনন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই তার নেই। এই সংবাদ দশরথকে আরো অসংযমী ও স্বেচ্ছাচারী করল। সন্তান বাসনায় শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অসংখ্য রমণীর পাণিগ্রহণ করল। রাজ-অন্তঃপুর দশরথের শত শত স্ত্রীতে পূর্ণ হল। তবু কোন মহিষী প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না। পুরুষত্বহীনতার লজ্জা, গ্লানি ও পরিতাপের কষ্ট এড়াতে সে নতুন মহিষীদের ছায়া মাড়াত না। তাদের কক্ষেও যেত না। কৌশল্যার কাছে আসতে কেবল লজ্জা ছিল না তার। অকপটে নিজের মনকে একমাত্র তার কাছেই উন্মুক্ত করতে পারত। আর তাতেই কৌশল্যার দশরথকে নিবিড় করে পাওয়ার সাধ মিটত। তাতে ফাঁক-ফাঁকি যাই থাকুক অন্যাদের সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা করে কৌশল্যা গর্ব অনুভব করত। নিজেকে তার ভাগ্যবতী মনে হত। বিজয়ীর গর্ব ও সুখে মন ভরে থাকত। কিন্তু সেই সুখ ও আনন্দ থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হওয়ার অসহায় কষ্টকর অবস্থা কৌশল্যার বুকের ভেতর নারী মনের জটিল জিজ্ঞাসায় আর দ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে লাগল। দশরথের দ্বিধাহীন স্বরের প্রতিটি শব্দের মধ্যে এবং আমূল প্রোথিত রক্তের মধ্যে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা এবং দাবির বলিষ্ঠ প্রার্থনা শুনল কৌশল্যা। সহসা চমক খেয়ে প্রশ্ন করল : তার মানে?

দশরথের মুখে হাসি হাসি ভাব। মিষ্টি কৌতুকে কাঁপছিল ঠোঁট। বলল : তার মানে যা হয় তাই—

তৎক্ষণাৎ একটা মুগ্ধ মুহূর্ত, তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহের মধ্য দিয়ে, অনুরাগ বিরাগ, মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে শরীরী মত্ত আবেগের পূর্ণতায় উদ্ভাসিত হল চিত্ত। সুখানুভূতির আবেশে বিহ্বল হল শরীর। সত্তার শূন্যতা পূরণের জন্য শরীরের প্রতি কোষে যে এত উল্লাস ও যাতনা লুকিয়ে থাকে কৌশল্যা এত বয়সও জানতে পারেনি। হঠাৎ তাই বদলে গেল তার অভিব্যক্তি। চোখের চাহনিতে এখন তার সন্ধি স্থাপনের আর্তি। একমাত্র গর্ভস্থ সন্তান পারে দুটি উন্মুখ বিচ্ছিন্ন সত্তাকে এক করতে। কিন্তু দশরথের পুত্রোৎপাদনের ক্ষমতা কোথায়? অক্ষম পুরুষাঙ্গ চাঙ্গা হবে কোন মন্ত্রবলে? অবশ্য তার ভাবনা চিন্তার জগৎ গণ্ডিবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। দশরথের জগৎ বৃহৎ, বিস্তৃত, অবাধ, অনন্ত, কোন সীমায় বাঁধা নয়। সুতরাং কোথা থেকে কখন কী হয়, আর হতে পারে সে সম্পর্কে তার ধারণাই বা কতটুকু? নিজের মনের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে কৌশল্যা বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দশরথের দিকে অপলক চোখে তাকাল। মনে হল, দশরথ যেন অসীম আকাশ; আর সে এক ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মতো গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আকুল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দশরথের চোখেও একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ, যা তার অপরাধ বোধের দ্বিধা থেকে তীব্র কষ্ট দিচ্ছিল। কথা বলার সময় তার ভুরু কুঁচকে গেল, ঠোঁট কাঁপল। বলল : বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ যোগ বিদ্যাবলে পুরুষের নষ্টপুরুষত্ব ও তার হৃত প্রজনন শক্তি ফিরিয়ে আনার গুপ্ত বিদ্যা জানেন। তাঁর সাধন শক্তিতে বন্ধ্যা ধরিত্রী সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়। অনাবৃষ্টির দেশে বর্ষা নামে, মরুভূমি সবুজ শস্যে ভরে উঠে। ঋষ্যশৃঙ্গ বিশ্বাস করে, ধরিত্রীর মত নারী কখনও বন্ধ্যা হয় না। বন্ধ্যাত্ব একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা কোন কঠিন নয়। লোকের কাছে তিনি আজ প্রবাদ পুরুষ। তাঁকে নিয়ে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প আছে। সব গল্পই অদ্ভুত।

কৌশল্যার কালো ডাগর দুই চোখে স্বপ্নের বিহ্বলতা নামল। অজান্তে দশরথের আরো কাছে এসে দাঁড়াল।

সরযূতীরে নবনির্মিত প্রাসাদে কৌশল্যা চলে গেলে দশরথ পায়ে পায়ে কৈকেয়ীর কক্ষে এল।

স্বহস্তে কেশবিন্যাসে ব্যস্ত তখন সে। অসময়ে দশরথে অকস্মিক আগমন তাকে অবাক করল। দশরথের চোখ মুখে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। বোবা দৃষ্টিতে অশান্ত-অস্থিরতা। কৈকেয়ীর উৎকণ্ঠা তীব্র হল। দশরথের চোখে চোখ রাখল। বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল। বুকের কাপড় স্তনের ওপর টেনে দিতে দিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মূর্ছাবিকার আক্রান্ত রোগীর মতো দশরথের চোয়ালের হাড় শক্ত, নিশ্চল। কৈকেয়ী উদ্বিগ্ন হল। হঠাৎ একটা আবেগ জাগল বুকে। প্রশ্ন করতে গিয়ে থমকাল। দশরথের বন্ধ ঠোঁটে ঝড়ের স্তব্ধতা। কৈকেয়ী অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হল। একটা কিছু ঘটনার আশঙ্কায় আত্মরক্ষার মগ্নতাকে সে অন্যমনস্কতার রূপ দিল। মুখে কপট হাসির রেখা চিক্ চিক্ করতে লাগল। দশরথের কথা শোনার অপেক্ষায় কৈকেয়ী বিভ্রান্ত বড় চোখে একভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু দশরথ কোন কথা বলল না। কৈকেয়ীর বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিকে কৌশল্যা ঝলকিয়ে উঠল। কিন্তু সেজন্য কোন লাঞ্ছনার অনুভূতি স্পর্শ করল না; কিংবা কোন গ্লানি বোধও জাগল না তার অন্তঃকরণে। কেবল যা বিঁধে ছিল হৃৎপিণ্ডে তা হল মানবিক সহানুভূতি, বিবেক এবং অস্পষ্ট পাপাবোধ। স্মৃতি বিস্মৃতির দোলায় কৌশল্যা তার চেতনায় বাস্তব এখন।

আকস্মিক আবেগে কৈকেয়ীর অন্তঃকরণ দগ্ধ হতে লাগল। দমকা বাতাসে নিভে যাওয়া প্রদীপের দগ্ধ স্থান থেকে যেমন অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া নির্গত হয়, তেমনি একটা আত্মানুশোচনার কষ্ট তার অনুভূতির ভেতর পাকিয়ে ওঠল। নিজের অজান্তে সে দশরথের গা ঘেঁষে বসল। তার কাঁধে মাথা রাখল। তীব্র অপরাধবোধে তার বুকের ভেতব টাটাচ্ছিল। আর ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল।

দশরথ তার শিথিল হাতখানা মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আসলে সে একটা অবলম্বন খুঁজছিল। কৈকেয়ীর কোমল হাত তাকে ভিতরে ভিতরে সেই শক্তি দিচ্ছিল। নিজেকে চাঙ্গা করতে দশরথের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বিমর্ষ গলায় বলল : প্রাসাদ শূন্য করে কৌশল্যা চলে গেল। দাস-দাসীরা মাতৃহীনা হল। এ প্রাসাদের কর্ত্রী করে গেছে তোমায়। তোমার উপর তার কোন অভিযোগ বা বিদ্বেষ নেই। নিজের মন্দ ভাগ্যকেই সে শুধু দায়ী করেছে।

কৈকেয়ী কোন কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কেটে গেল। দশরথের বুকে কৈকেয়ীর নিঃশ্বাস লাগল। কাঁধে রাখা হাত দিয়ে গলা বেষ্টন করল দশরথের। শরীরের কোমল স্পর্শ দশরথের শরীরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চুঁইয়ে পড়ল। কৈকেয়ীর স্পর্শের মধ্যে এক অসহায় অপরাধবোধ আকাঙ্ক্ষায় স্ফুরিত হল। দশরথ বাঁ হাত দিয়ে তাকে। বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আচ্ছন্নস্বরে বলল : কৌশল্যা যাওয়ার সময় তোমার কুশল সংবাদ নিতে ভোলেনি। প্রতিদিন তোমার কুশল বার্তা পাঠাতে বলেছে। পিতা মাতার দেওয়া নাম তাব সার্থক। জীবনের সমস্ত দুঃখ আনন্দ হতাশা বেদনার মধ্যেও যে অবিচল থেকে অন্যের এবং বিশেষ করে তার—

কথা অসম্পূর্ণ রেখে দশরথ কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। তারপর, কাঁধ থেকে হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়ল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর উদাস বিষণ্ন গলায় প্রসঙ্গ শেষ করতে বলল : কুশল কামনা করে বলে ওর নাম কৌশল্যা।

অভিমানে দুঃখে, কৈকেয়ীর দুই চোখে জল টলটল করছিল। অভিমানে তার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হল। বলল : আমায় তুমি কি শুধু তিরস্কার করবে?

দশরথ নির্বিকার। বাতায়নের দিকে মুখ করে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল : এখন তুমি একা। হয়েছ সুখী?

কৈকেয়ীর দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। একটা দুরন্ত প্রতিবাদ তার চাহনিতে ফুটে বেরোল। সমস্ত শরীরটা তার কেঁপে উঠল। লুকোনো একটা যন্ত্রণার কষ্টে তার বুক চেপে ধরল। অনেক বর্ষা, অনেক শরৎ এবং বসন্তের গভীর অস্বস্তির দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছিল তার কৈশোর স্বপ্নে। বহুবল্লভা নরপতির কৃপাধন্য পত্নী হয়ে নয়, তার একমাত্র প্রিয়া ও মহিষী হওয়ার প্রবল বাসনা তার সমস্ত অনুভূতিতে সর্বদা ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভাগ্যের ছলনায় তার সাধ পূরণ হল না। মনে হল, জীবন, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ। স্বপ্নের রাজপুত্র, রূপকথার প্রেম, সোনার দেশ, সব মিথ্যে। নিজেকে

তার ভীষণ শূন্য লাগল। বুকের রক্তে আক্রোশের আগুন ধরে গেল। বুকের অতলে তুষের আগুন জ্বলছিল। নিতান্ত বাধ্য হয়ে, এক নিরুপায় অবস্থায় দশরথের পত্নীকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা কৈকেয়ী ভুলতে পারছিল না। তবু এক কঠিন কর্তব্যবোধের শৃংখলে বাঁধা পড়ল তার মন। মনে মনে অনুভব করল মানুষটাকে সত্যিই ভালবাসে সে। মেয়েরা বোধ হয় এই রকমই হয়। পুরুষের স্পর্শ পেলে তাদের মনের ভেতর প্রেমের ফুল ফোটে। কিন্তু অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে পা দিয়ে মনে হল, সব ভুল। এক সীমাহীন দীনতা তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হতে হতে বুকের ভেতর তৈরি হল সুবিশাল এক বারুদের স্তূপ। স্বামীর ওপর প্রেমের একাধিপত্য, সংসারে অবাধ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের পথে বাধাগুলো তাকে ক্রমেই অসহিষ্ণু করে তুলল। বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামান্য সুযোগের নিরন্তর সংঘর্ষ বুকের অতলে ছাই চাপা আগুনের ইন্ধন যোগাল। তুচ্ছ উপলক্ষে মনের আগুন আক্রোশে, ক্রোধে, ঈর্ষার জ্বল জ্বল করে ওঠল। তীব্র একটা কষ্টে অস্ফুট স্বরে কৈকেয়ী বলল : মহারাজ সুখ তো চাইনি। চেয়েছিলাম রাজ রাজেশ্বরী হতে।

হয়েছ রাজেন্দ্রানী!

আমি জয়ী শুধু।

কত গর্ব তোমার!

ব্যঙ্গ করছ?

না, সত্যি বলছি।

সত্যি বলার সাহস তোমার কোথায়? তোমাদের জাতের রক্তের মধ্যে পাপ আছে। সব জায়গার মেয়ে বিয়ে কর লালসা চরিতার্থ করতে। তোমার উপপত্নীর সংখ্যা নগণ্য নয়। পত্নীর কোন্ অধিকার, গৌরব, সম্মান তারা পায়? মোহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রমোদ কক্ষে পাঠাও। একদিন হয়তো আমারও ঐ দশা হবে। রূপ যৌবন কারো চিরদিন নয়। এই আছে এই নেই। তোমাদের মতো ক্ষমতাবান বহুপত্নীক পুরুষের কাছে রূপসী নারীরও কানাকড়ি দাম নেই। তোমাদের মত লোকেরা মেয়েদের রূপ যৌবন শুধু সম্ভোগ করে। তাদের নিংড়ে নেয়, কিন্তু তাদের প্রতি এতটুকু দরদ মমতা নেই। ভালবাসা নেই। এমন কি তোমাদের প্রতিশ্রুতিরও কোনো দাম নেই। পিতাকে তুমি যে কথা দিয়েছ তার কিছুই করনি। সত্যভঙ্গ করেছ তুমি। কৌশল্যা থাকতে সংসার সাম্রাজ্যে আমার যে কোন অধিকার নেই; একথাটা স্পষ্ট করে বুঝেছি। স্বামীর অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। আমি তাই পথের কাঁটা সরিয়েছি। নির্লজ্জের মতো দখল করেছি আমার সাম্রাজ্য। আমার অধিকার। যেমন, তোমরা পররাজ্য জয় করে নিজের কর্তৃত্ব ও রাজাধিকারকে প্রতিষ্ঠা কর। এতে যদি তোমরা লজ্জা না পাও, তা হলে আমারও কোন লজ্জা নেই।

খর যৌবনবতী কৈকেয়ীর দুই চোখ সাপের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছিল। ক্রোধে সাপের মতো হিস্ হিস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। তার উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে দশরথ স্তব্ধ হয়ে গেল। নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই চোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠল। তীব্র একটা অস্বস্তিতে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল তার অন্তঃকরণ। অকস্মাৎ কৈকেয়ীর কথার মধ্যে বুকফাটা আর্তচিৎকার করে উঠল দশরথ। আমি আর শুনতে পারছি না। তুমি চুপ কর। চুপ কর।

দশরথের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা আর্তস্বরে কৈকেয়ী কেঁপে উঠল। তার ব্যথিত বিহ্বল দুই চোখের তারায় একটা আর্তি ফুটে বেরোচ্ছিল। অমনি একটা কষ্টে সহানুভূতিতে কৈকেয়ীর বুকটা হায় হায় করে উঠল। নিজেকে ধিক্কার দিল। ক্রোধের বশে খামকা দশরথকে কতকগুলো কটু কথা বলে তাকে দুঃখ দিল। নিজেকেও অকারণ ছোট করল। এ সব কথার কোন মানে নেই, তবু মুখে এল। তাই নিদারুণ আত্মানুশোচনায় বুক জ্বালা করতে লাগল। কষ্টকর লজ্জা ও দুঃখের অনুভূতি অগ্নিদগ্ধ মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল। আকুল স্বরে বলল : জানো, নিজের উপর ক্রোধ হয়, দুঃখ হয়। কেন? কেন তোমাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়ার তৃষ্ণা জাগল বুকে? মন থেকে তোমাকে মুছে ফেলতে কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারেনি। নিজের কাছে যত হেরেছি ততই তোমাকে

জয় করার এক দুর্মর জেদ আমার বুকে কেশর ফোলা সিংহের মতো কেবল রাগে গজরাতে লাগল। আমি পারলাম না নিজেকে বশে রাখতে। আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা অনন্ত। তবু তোমার মন, দেহ, আত্মা আমার একার নয়। আরো অনেকের ভাগ আছে তাতে। এই শরিকানা আমার অসহ্য। তাই তোমাকে দেখলে আমি কেমন হয়ে যাই। আমি তখন আমার মধ্যে থাকি না। হিংস্র বাঘিনী যেমন অব্যর্থ লক্ষ্যে তার শিকারের দিকে এগিয়ে আসে তেমনি করে আমিও তোমার দুর্বলতার ওপর চোখ রেখে সন্তর্পণে এগিয়েছি। কিন্তু উত্তেজনাবশত ঠিক রাখতে পারিনি নিজেকে। নিষ্ঠুর কথায় ক্ষত বিক্ষত করতে একটা বর্বর আনন্দ পাই। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার মুখখানা করুণ হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণা ফোটে, অমনি কেমন একটা মায়াতে, কষ্টেতে আমার বুক টনটন করে।

আত্মানুশোচনায় কেমন ভিজে ভিজে মনে হল কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর। জলভরা দুচোখে একটা নিবিড় ব্যথা ঘনিয়ে উঠল। ধরা গলায় বলল : বিশ্বাস কর, বড় রাণীর জন্য আমারও কষ্ট হচ্ছে। বুকফাটা হাহাকারের মতো তার কথাগুলো শোনাল।

বিস্ময়ে দশরথের চোখদুটো ছটফট করে উঠল।

কৈকেয়ী দু'চোখ ছাপানো উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই যেন দ্রুত অস্থির পদক্ষেপে কক্ষান্তরে চলে গেল।

সরযূর নবনির্মিত প্রাসাদের সবটা কৌশল্যার এখনও ভাল করে দেখা হয়নি। তবু এখানে আসা থেকে ভীষণ অস্থির সে। অশান্ত মনকে কিছুতে শান্ত করতে পারছিল না। একা একা আনমনে কাটায় সর্বক্ষণ। কয়দিনে রোগা হয়ে গেছে। অনেক কান্নার চিহ্ন পড়েছে চোখের কোণে। চুলে এলোমেলো ভাব। পোশাক পারিপাট্য নেই। কেমন একটা দুঃখী-দুঃখী ভাব।

অযোধ্যার প্রাসাদ যে তার জীবনে কতখানি জুড়ে আছে তা যেন একদিনে খুব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করল। শূন্যগর্ভা একাকীত্বে ভরা দিনগুলো তার কাছে অযোধ্যার প্রাসাদের কত স্মৃতি বহন করে আনে। মনোরম কক্ষ, সুন্দর উদ্যান, প্রজাদের নীরব ভালবাসা, শ্রদ্ধার পূজা, নিজের হাতে রচনা করা সংসারে স্মৃতি এসব ছেড়ে এখানে থাকতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। প্রাসাদ তো শুধু ইট কাঠ পাথরে তৈরি নয়! মানুষের মমতা, স্নেহ ভালবাসা প্রেম দিয়ে তৈরি এক নীড়। ঐ প্রাসাদে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যেই একটা জীবন ছিল। এখানে সেসব কোথায় পাবে? বহুকাল ধরে একটা পরিবারের মধ্যে সুখ দুঃখে, আনন্দে বসবাস করতে করতে সেখানে একদিন প্রাণ জেগে উঠেছিল। আজ তার শূন্যতা বুক ভাঙা শোকের মতো অনুভব করতে লাগল।

হৃদয় মথিত করে কৌশল্যার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে এল। যে কান্না গিলে গিলে বিস্ময়ভরা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তবু অশ্রু বাধা মানল না। চোখ বেয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল।

সুমিত্রা কৌশল্যার সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ। কৌশল্যার বেদনাঘন করুণ মুখখানার দিকে পিপাসার্তের মতো করুণ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর নিজের মনেই কাপড়ে ফুল তুলতে লাগল। মুখ খানা শুকনো দেখাচ্ছিল।

কৌশল্যার আবেগমথিত কান্নার চাপা শব্দে সুমিত্রা চমকাল। অমনি সেলাই ফেলে ছুটে গেল তার কাছে। মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে চোখ মুছে দিল। ভেজা গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল : কেঁদ না মহারাণী।

কৌশল্যা আরো ফুঁপিয়ে উঠল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সুমিত্রার বুকে। সুমিত্রার দু'চোখ বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ল। দু'জনে দু'জনকে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল। কেঁদে হাল্কা হল। তারপর যখন আর কাঁদতে পারছিল না, তখন তাদের ভীষণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেখাচ্ছিল। কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুমিত্রা কান্না জড়ানো গলায় বলল : তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না। কৈকেয়ী নামে ওই হিংস্র রাক্ষসী তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।

সুমিত্রার বুকের উপর মাথা রাখল কৌশল্যা। ক্লান্ত স্বরে উচ্চারণ করল : তাকে যে আমি ছোট বোনের মতো বিশ্বাস করেছিলাম।

জানি দিদি। তুমি রাক্ষুসীর অন্তরে কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিমাপ করতে পারনি। অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুরে তোমার প্রভাব, মহিমা তাকে ঈর্ষায় হন্যে করেছে। তোমার গৌরব নষ্ট করার জন্য রতিপ্রিয় রাক্ষুসী চৌষট্টি কামকলায় রাজাকে একেবারে সাপের মতন দেহের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে তার মন প্রাণ, বুদ্ধি-বিবেক-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মায়াবিনীর খপ্পরে পড়ে রাজা অমানুষ হয়ে গেছে।

আমি সব জানি। গভীর কালো চোখ তুলে বলল কৌশল্যা। কাঁচা বয়স আর রূপের জৌলুষই ওর ঐশ্বর্য। আমরা তো রমণী, পারলাম কোথায় রাজাকে আমাদের করে নিতে? পুরুষকে বশ করার শক্তি নারীকে নরকুলে, দেবকুলে ধন্য করেছে। বিশ্বের অধীশ্বর ভোলা মহেশকে পর্যন্ত মহেশ্বরী তার পদপ্রান্তে দীন আশ্রিতের মতো রেখে দিয়েছে। মহারাজকে আপন বশে রাখার শক্তি কৈকেয়ী যদি দেখিয়ে থাকে তাহলে তাকে নিন্দা করব কোন্ দুঃসাহসে? বলিষ্ঠ উষ্ণবীর্য পুরুষের জীবনে যে নিরাত্মীয় শূন্যতা ছিল কৈকেয়ী হঠাৎ পূর্ণ করে দিল তাকে। তার প্রখর উত্তাপ আমার স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে প্রবল ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিল। ছোটর জ্বলন্ত যৌবনের আগুনে দগ্ধ হল মহারাজ। পতঙ্গের মতো সে আগুনে নিজেকে দগ্ধ করতে তিনি এক উল্লাস অনুভব করছেন। জীবনেরই অমোঘ অলিখিত দুর্বার অনিয়মে তিনি কৈকেয়ীর আকর্ষণে ধরা পড়েছেন। আর এক অজ্ঞান সম্মোহনের প্রভাবে তুমি আমি তুচ্ছ হয়েছি তাঁর কাছে। এই নির্লজ্জ উল্লসিত অধ্যায়ে আমরা কেউ নই তাঁর।

সুমিত্রা অবাক হল। কৌশল্যার কণ্ঠস্বরে রাগ নেই। শুধু বেদনা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল সুমিত্রা। তারপরে তার কণ্ঠে বিদ্বেষ ফুটে উঠল। বলল : তোমার বাণী তোমারই উপযুক্ত। তবু রাক্ষসী তোমার শত্রু। তোমার প্রতি তার ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা অশ্রদ্ধার কথা মনে রেখে কিছু কর। তোমাকে রাজপ্রাসাদ থেকে যে তাড়িয়েছে তাকে ক্ষমা করতে মন সায় দেয় না আমার।

মেজ, যে রাজ্য সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে এসেছি তাকে ফিরে পাওয়ার কোন লোভ নেই। ছোট রাণীর ভয় আমাকে। তার সুখের কাঁটা হয়ে তার সঙ্গে একসাথে বাস করা অপমানকর। তাই আলাদা গৃহ করে দিয়ে মহারাজ এক আসন্ন বিরোধ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখলেন। সংঘাতের অস্ত্ররূপে কৈকেয়ী মহারাজকে যাতে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আগে থেকে সে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে অকেজো করে দিলেন। কারণ, কৈকেয়ীর সঙ্গে বিরোধ বাধলে আমরা হেরে যাব। সেই হার ঠেকানোর জন্যে এই নয়া ব্যবস্থা।

তুমি খুব সরল দিদি। মহারাজ যাহোক একটা কিছু বলে তোমায় বুঝিয়ে দিল। আর তুমিও তা বিশ্বাস করলে। এর উল্টোটা যে হয় বা হতে পারে, সে কথা ভাবলে না কেন?

সংশয় বাড়িয়ে দিও না আর। আমি জানি কৈকেয়ী আসা থেকেই পারিবারিক অন্তর্বিরোধের অন্তঃস্রোতে রাজপরিবারের স্বাস্থ্য ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হচ্ছিল। তার সে সূক্ষ্ম ক্ষয় প্রথম প্রথম চোখে পড়ত না। তারপর, আমার ও তার রেষারেষিতে, ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রমে গভীর ও জটিল হল। আরো অবনতি হলে, রাজপরিবারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে। এ ধরনের বিরোধের প্রশ্রয় দেওয়া সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই সময় থাকতে থাকতে তাকে অকেজো করে দেওয়া হল। মহারাজ এসব আমায় খুলে বলেছেন। মহামাত্য সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠ আসেন আমাদের দেখাশোনা করতে। কর্তব্যের আহ্বানে তাঁরা যা করা উচিত বলে ভাববেন কখনো তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব না।

সুমিত্রার নীরব বিস্মিত চোখ কৌশল্যার চোখের উপর স্থির। তাদের নির্বাসনের পেছনে এতবড় একটা পারিবারিক কলহ লুকোন আছে আগে জানত না সে। ভাবেনি, তাদের ঘিরে এমন কুৎসিত আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে দশরথ। কিন্তু এ রাজনৈতিক কূটবন্ধনের মূল কোথায়? দশরথ আত্মরক্ষায় কেন অসহায় বোধ করছেন? কৈকেয়ীকেই বা ভয় কেন তাঁর? অনেক মিথ্যে, অনেক ছলনা দিয়ে কোন্ জয় তিনি চান? বিরোধের কোন্ ঘূর্ণিপাকে রাজঅন্তঃপুর এমন জড়িয়ে পড়ল যে, যার থেকে মুক্তির পথ খোলা নেই? বড় রাণী ছোট রাণীর রেষারেষি রাজনীতি হয়ে গেল কেন?

রাজপরিবারের বিরোধ রাজ্যের স্বাস্থ্যভঙ্গ করবে কেন? কেন রাজ্যের সঙ্গে রানীদের ব্যক্তিগত জীবনও রাজনীতি হয়ে উঠল? কেন?

এই সব প্রশ্ন সুমিত্রার বুকের ভেতর পাক খেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কথা বলতে পারল না। এক বিমর্ষ ভাবনায় গৌরবর্ণ মুখখানা তার পাণ্ডুর হয়ে গেল।

সুমন্ত্র বশিষ্ঠের মতো ধুরন্ধর মন্ত্রীদের গোপন অবস্থানের মূলে যে কূটরাজনীতি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রাজনীতির চেহারা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। বশিষ্ঠের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আছে। রাজমহিষীর প্রতি জননীসুলভ শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে। সুমন্ত্র অসাধারণ ধূর্ত। কর্মে ও সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষিপ্র। দশরথও জানেন এই দু'জেনর সঙ্গে হাত না মিলিয়ে অযোধ্যায় রাজত্ব করা যায় না। অথচ এঁরা দুজন কৌশল্যার অত্যন্ত প্রিয় ও অনুগত বান্ধব। এঁদের কাছ থেকে কৌশল্যা সর্বদা উঁচুদরের সহযোগিতা এবং পরামর্শ পাবে। সেকারণে এঁদের চটানো যায় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল হিসাবেই হয়তো তাদের কৌশল্যার রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা করে পাঠিয়েছে। রাজনীতির গোলক ধাঁধায় সুমিত্রা তার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল। বুকের ভেতর থেকে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তার। বিমর্ষ ভাবনায় মুখের হাসি বাঁকা হল। বলল : মহারাণী, রাজপুরীতে তোমার সম্মান, গৌরব খ্যাতি যে তোমার নিজের গুণে হয়েছিল, আজ বুঝলাম। তোমার দুর্বলতার যেমন শেষ নেই, তেমনি শক্তিতেও অসামান্যা তুমি। মহতের সঙ্গে মহৎ ব্যবহার কর। আবার কাঁটা দিয়ে পায়ের কাঁটাও তুলতে পার।

সুমিত্রার আন্তরিক স্পষ্ট ভাষণে চমকে উঠল কৌশল্যা। কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সুমিত্রার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তার বেশ সময় লাগল। তারপর ম্লান হেসে বলল : তুই আমার প্রিয় সখি। সমিত্রাও বটে। তোর কাছে কোন কথা গোপন করব না। রাজনীতির নোংরামি আমার সহ্য হয় না। তবু একটা ঠাণ্ডা লড়াই আমার ও কৈকেয়ীর মধ্যে ছিল। সেটা যে প্রকৃত কিসের লড়াই, আর কেন যে অপছন্দ তাকে, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। একদিন সুমন্ত্র চুপি চুপি আমায় বলল : অযোধ্যার রাজগৃহে আমার শত্রু অনেক। এখানে থাকা একটুও নিরাপদ নয়। রাজধানীর বাইরে প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে। কৈকেয়ীর দৃষ্টি এড়িয়ে থাকাই নাকি দরকার। রাজনীতি, দলনীতি বুঝি না। ওরা আমার সন্তানের মতো। প্রকৃতপক্ষে, ওরা ছাড়া নির্বান্ধব পুরীতে আর কোন বান্ধব নেই আমার।

হাসি হাসি মুখ করে সুমিত্রা বলল · তেমার কথা শুনতে বড় মজা লাগছে। বিস্ময় বাড়ছে।

কৌশল্যা নিঃশ্বাস চেপে নীরব হল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল খুব ধীরে। বলল : ভাগ্যের হাতে এক অসহায় বন্দী আমি। আশা, নিরাশা, হতাশা যন্ত্রণার কি গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি আমি, তার কোন হিসাব নেই। আমার ভয়ংকর মানসিক সংকট চলছে। আমি নিঃসহায় বেদনায় ক্লান্ত। আমার স্বার্থ কি উপায়ে নিরাপদ করা যেতে পারে তার ভাবনা মন্ত্রীদের। কিন্তু আমি তো এসব কিছু চাই না। তবে কাকে নিয়ে কিসের লড়াই? সে লড়াইর খেলায় কোন্ বিজয়মাল্য পাব আমি তাও জানি না। কেবল রাজমহিষীর কর্তব্যবোধে, রাজ্যের স্বার্থে এক কঠিন কাজ করছি।

সুমিত্রার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল : তোমার কোন কথা আমার মাথায় ঢুকল না। এক নারীকে নিয়ে ভাগ্যের এই লড়ালড়ি কেন? সর্বনাশিনীকে রাজা কেন দূর করে দিচ্ছে না?

কৌশল্যা চুপ করে ছিল। যে স্বামী নিজের হাতে তার জীবনের ঘরে খিল তুলে দেয় তার কাছে চেঁচিয়ে কোন লাভ হয় না। কবাঘাত করে লোক জানাজানি করা আরো লজ্জার এবং বিপদের। শরবিদ্ধ হরিণীর মতো অসহায় দৃষ্টিতে করুণ চোখে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইল।

স্বপ্নের মতো দিনগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল। দিনে দিনে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নামল কৌশল্যার প্রাসাদে। সর্বংসহা শান্তভাষিণী রাণী কৌশল্যার চোখে দিন দিন ফুটে উঠতে লাগল কৈকেয়ীর সর্বনাশিনী রূপ। মায়াবিনীর যাদুতে ভুলে আছে রাজা। কৈকেয়ীর কথা শুনলে কৌশল্যা ভয়ে শিউরে উঠে। আজকাল দশরথকেও তার সন্দেহ। দশরথকে দেখলে তার অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠে। স্বামীর

এত অনাদর, অবহেলা আর সইতে পারে না। এর চেয়ে মৃত্যু হল না কেন? প্রাসাদের শূন্য কক্ষের অত্যন্ত নির্জনতায় এক সব হারানোর আর্তনাদ গুমরে উঠল তার বুকে। পাগলের মতো বলল, ঠকেছি! তোমায় বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি রাজা।

বর্ষা নামল।

উপরে জমাট কালো মেঘ নিথর নিস্তব্ধ। নীল আকাশের চিহ্নমাত্র নেই।

অঝোরে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। অসহায়ের মতো গাছপালা, বন পাহাড়, নদী উদ্যান সব ভিজছিল। ছাই ছাই অন্ধকারের মধ্যে সবকিছু অস্পষ্ট। দূরে উদ্ভাসিত নদীরেখাও অস্পষ্ট। বট, শাল, মেহগিনি, অশ্বথের মতো বনস্পতিরা প্রবল বাতাসে এদিক ওদিক করছিল। তাদের পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় এক দুর্বোধ্য জটলা। প্রকৃতিতে বর্ষার সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস। মাটির ঢাল বেয়ে তর্ তর্ করে বৃষ্টির জলধারা গড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টোপা টোপা হয়ে ভেসে যাচ্ছিল ঘোলা জলে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় কক্ষসংলগ্ন ঢাকা ঝুলোন বারান্দায় বসে দশরথ রূপসী বর্ষার রূপ সম্ভোগ করছিল। নীরব অধরা রূপসী বর্ষার উদাস, শান্ত বিষণ্ণতা তাকে মুগ্ধ করল। দু'চোখে তার খুশি উপচে পড়ল। এই বিচিত্র বর্ষা ঋতুর সঙ্গে তারও যেন কোথায় একটা নিবিড় যোগ রয়েছে।

এক না-জানা পরম তৃপ্তির আবেশে মন ভরে গেল দশরথের। ভাষাহীনতার অনুভূতিতে কেমন উদাস অন্যমনস্ক সে। ভাষাহীন অতল স্তব্ধতার রাজ্য তার গহন অতল বুকে এক নির্বাক ভাবনা জাগিয়ে তুলল। নিজের অন্যমনস্কতায় ডুবে গিয়ে সে যে কখন নিজের কথা ভাবতে শুরু করেছিল নিজেই জানে না।

তিন রাণীই সন্তানসম্ভবা। তার ঔরসে গর্ভবতী তারা। এই দারুণ সংবাদে মন নবীন বর্ষার মতো খুশি হয়ে উঠল। একটা সুন্দর অনুভূতিতে বুক শিরশির করতে লাগল। স্নেহের আবেগে উথলে ওঠল বুক। তিনটে কাল্পনিক মুখ ভেসে উঠল তার চোখের তারায়। সন্তানকে কোলে করে রাণীরা শিশুর তুলতুলে কচি মুখপানে তাকিয়ে নিজের মনে কত কথাই রচনা করছে। শরীরে হিল্লোল তুলে কথা বলছে। কথা নয় জননীর প্রলাপ। ঠোঁটে মুগ্ধ হাসির ঝলক। জননীর স্তনভরা অমৃতধারা সন্তানের মুখে গুঁজে দিয়ে প্রসন্ন চিত্তে তার নরম দেহতে হাত বোলাচ্ছে। আর এক অসীম তৃপ্তিতে দুই চোখ বুজে আসছে। চুলগুলো হাত দিয়ে আঁচড়ে চূড়া করে বাঁধছে। চোখে কাজল পরাচ্ছে। কপালের মাঝখানে অসীম সুখে এঁকে দিচ্ছে ছোট্ট কাজলের টিপ। তারপর তার নরম গালের ওপর গাল রেখে আদর করে, চুমা দিচ্ছে। স্নেহ ঢালছে। তিন রাণীর ছায়া ছায়া মূর্তি যেন এক হয়ে গেল দশরথের কল্পনায়। পৃথিবীর সব জননীই বোধ হয় কতকগুলো জায়গায় এক। তাই তিন রাণীর পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না কল্পনার ভেতর। জননী সত্তাতে তারা প্রতিভাত হল। মাতৃস্নেহের কতকগুলো পরিচিত দৃশ্য তার মন ছুঁয়ে রইল।

দশরথের বুকে রাণীদের মতো স্নেহের ধারা নামল। তবে তার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। জননীর মতো নয়, কিন্তু স্নেহের আবেগের ধারা দুজনের এক রকম। দশরথের সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে আবর্তিত হল এক অদ্ভুত ভাবনা। নারী মাত্রই যে সন্তান গর্ভে ধারণ করে তার দেহ, আত্মা পুরুষের বীর্যে রক্তে তৈরি। এই হিসাবে সে একজন স্রষ্টা। একজন সার্থক বীর্যবান পুরুষ। অথচ কিছুকাল আগেও এই অনুভূতি তার ছিল না। পুরুষত্বের অভাবে তার ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। বর্তমান তার অস্তিত্বকে নিয়ে টিম্ টিম্ করে প্রদীপের মতো জ্বলছিল। মৃত্যুর পরেই সে আলো চিরতরে নিভে যেত। নিঃশব্দে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু রাণীরা সন্তানসম্ভবা হওয়ায় এক অদ্ভুত সুখ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সাধ তার ধমনীর মধ্যে তরল আগুনের স্রোতে বইছিল।

দশরথের মুখে আনমনা হাসি হাসি একটা ভাব। স্বপ্নের ঘোরে নিশ্চুপ, অকম্পিত স্থির দুই

চোখের তারায় কৈকেয়ীর মুখ। সে মুখ কোনকালে ভোলার নয়। কৈকেয়ীর স্বর, দৃষ্টি কৈকেয়ীর মতো ছিল না। দশরথ তাই থমকে অপ্রস্তুতের মতো চমকে জিগ্যেস করেছিল : তোমাকে এত অশান্ত তো কখনও দেখিনি ছোট রাণী? শরীর ভাল তো?

কৈকেয়ীর চোখের ছটায় আগুন ঝলকাল। মুখে কৌতুকপরায়ণতার অভিব্যক্তি নেই। উত্তেজিত আচ্ছন্নতায় তার ভুরু কোঁচকাল। দশরথের কথায় কৈকেয়ীর ক্রোধ দুর্বিষহ হল। সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটা তীব্র অতৃপ্তি মনের বীণায় ঝংকারে বাজছিল কেন? কেন? আর সেই বারংবার প্রশ্ন তার বুকে আঘাত হানছিল। অসহিষ্ণু আবেগে কাঁপছিল তার দুই অধর। কপট অবাক স্বরে ব্যঙ্গ করল। বলল ঃ মহান রাজার করুণার অন্ত নেই! সব দিকেই তার দৃষ্টি। কেবল মহিষীর অশান্তি দূর করার উদ্যোগ নেই।

কৈকেয়ীর বাক্যে দশরথ মর্মাহত হল। তবু কৈকেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে তার অকারণ রাগ বিতৃষ্ণার কারণ খুঁজল। অবাক জিজ্ঞাসু চোখে অপরাধীর মতো তাকিয়ে আপশোস করে বলল : ইদানীং তোমার কি হয়েছে যেন আমাকে মোটেই সহ্য করতে পার না!

কৈকেয়ীর ভ্রূকুটিমুখ শক্ত হল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। কঠিন গলায় ভর্ৎসনা করে বলল : স্বার্থ পুরুষ মানুষ শুধু নিজের সুখ আর তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রী কি চায়, কি পেলে তার সুখ হয়, মন ভরে ওঠে, তার খোঁজ নিয়েছ কখনও? আমি যে মা হতে চাই, এই কথাটা নিজের মুখে না বললে কি নয়, জননীত্ব নারীর রক্তের বীজ। এইটুকু না পেলে তার জীবন মরুভূমি হয়ে যায়। জীবনের অবলম্বন, আশ্রয় বলে কিছু থাকে না। বুক খাঁ-খাঁ করে। জীবনটা অভিশপ্ত মনে হয়। নিজেকে বড় অসহায় লাগে। নির্বীর্য পুরুষ নারীর জীবনে অভিশাপ।

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দশরথ শুনল। কোন জবাব দিল না। কেবল অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথা নাড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কাটার পর দশরথ হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অসহায় ভাবে বলল : তোমার তিরস্কার আমার পাওনা। প্রতিবাদ শোভা পায় না।

দশরথের নির্বিকার জবাব কৈকেয়ীকে অবাক করল। প্রথমটা তাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে তার মুখের ভাব, চোখের চাহনি বদলে গেল। নিষ্ঠুর উদাসীন স্বামীর ওপর তার প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা ক্ষণিকের জন্য তাকে উন্মাদ করে তুলল। দাঁতে দাঁত দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল : তোমার এই চিকিৎসা চিকিৎসা খেলা কবে শেষ হবে? বৈদ্যমশাই কি বলেন? তাঁর ওষুধে জননী-সাধ পূরণ হবে কবে? আর কতকাল অপেক্ষা করব আমি? তোমার মতো একজন অক্ষম পুরুষ স্বামী হওয়ার অযোগ্য। এতগুলো নারীর জীবন নষ্ট করার কোন অধিকার তোমাব নেই। তবু তুমি সেই কাজ করলে, কেন? তাদের সুখ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে কেন? এদের জন্য তোমার কষ্ট হয় না? তাদের শুকনো মুখে হাসি ফোটানোর কোন্ দায়িত্ব স্বামী হয়ে তুমি পালন করলে? আমরা শুধুই কি তোমার খেলনা? মেয়েমানুষ বলে কি আমাদের হৃৎপিণ্ড নেই, মগজ নেই, বোধশক্তি নেই?—সাধ-ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু থাকতে নেই? বল রাজা, বল?

কৈকেয়ীর জিজ্ঞাসা এত আকস্মিক ছিল যে দশরথ কথা বলতে পারল না। একরকম একটা প্রশ্ন সে প্রত্যাশা করেনি। কৈকেয়ীর জিজ্ঞাসার মধ্যে এমন একটা ইংগিত ছিল যা তার অযোগ্যতাকে বিদ্রূপ করছিল। আর ভিতরে ভিতরে একটা ভীষণ লজ্জা তাকে নুইয়ে দিচ্ছিল। ব্যর্থতা তার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে তাকে ব্যঙ্গ করছিল; কৈকেয়ী সব জেনেও তাকে অপমান করল কেন? এর অর্থ, তাব জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া। অনিবার্য ব্যথার মধ্যে এক অভূতপূর্ব লজ্জা আত্মানুশোচনার ঝংকারে বেজে উঠল তার ধমনীতে। আগেও বার বার বেজেছিল কিন্তু তার মধ্যে এত স্পষ্টতা ছিল না। কৈকেয়ীর আতপ্ত কামনা অনুভূত হয়েছিল তার প্রতি অঙ্গে। আর ভয়ে সংশয়ে প্রত্যাশায় সে নিজেকেও আবিষ্কার করল যে শরীরের প্রতি কোষে কোষে তারও যেন কোন এক অজ্ঞাত সত্তার উল্লাস যন্ত্রণা দিচ্ছে। মনে মনে এক অন্য পুরুষ হয়ে ওঠার সংকল্প জাগল।

কৈকেয়ী এক গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দশরথ নীরব। তার থমথমে মুখের

দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করল : কেন এই লোকটা ছাড়া সে আর কিছু ভাবতে পারে না। এই নিষ্ঠুর উদাসীন পুরুষটা তাকে যাদু করেছে। দশরথ তার জীবনে এক অদ্ভুত জটিল রহস্য।

দশরথকে তিরস্কার করে তার বুকটা হাল্কা হল। দশরথের কষ্টে তার বুক আবার চন্ চন্ করে উঠল। হঠাৎ কোথা থেকে বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা। সেই দুকূল ছাপানো ভালবাসার আবেগে তার বুকে অনুশোচনা জাগল। কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল তার মূর্ছনা। বল রাজা, এটা কি জীবন? জীবন আমাকে কি দিল, আমিই বা কি দিলাম তাকে? আমার বুকের ভেতর যে স্নেহসাগর টল টল করছে সেখানে আবগাহন করার সুখ কে দেবে আমায়? নারীর স্থান ছোট্ট গৃহকোণে। ধন নয়, মান নয়, ঐশ্বর্য নয়, সাম্রাজ্য নয়, শুধু মাতৃত্ব। বুকের ভেতর থেকে একটা কিছু নিষ্কণ্ডুল হয়ে পাক খেতে খেতে মুখের কাছে উঠে আসে। অথচ আমার স্বামী আছে। কথাটা যখন মনে আসে তখন মনে হয় কি জান? অনেক কিছু মনে হয় আমার। আর আমি নিজেও তার সব বুঝি না। তুমি যদি জিগ্যেস কব আমি বলতে পারব না।

কৈকেয়ী আবেগের ঘোর লাগা আচ্ছন্ন দুই চোখে দশরথের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর দশরথ বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে কৈকেয়ীর যন্ত্রনাকাতর আর্তি সম্যক উপলব্ধি করল। তথাপি কোন জিজ্ঞাসাই তার কণ্ঠস্বরে ফুটল না। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কোটে। কৈকেয়ীর এতো সাহসী প্রগলভতা দশরথ কল্পনা করেনি। জীবনের বাস্তব কি আশ্চর্য। স্থান ও কালের পরিস্থিতির এই মুহূর্তটি দশরথের কাছে অদৃষ্টের এক অমোঘ সংকেতরূপে আবির্ভূত হয়। নিজের অজান্তে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল, ছোট! ভুলে যাও আমি তোমার স্বামী। ভাববে আমি মৃত। ছায়ার মতো আছি তোমার সঙ্গে। আমরা জীবনের এক পিঠে তুমি, আর এক পিঠে মরণ। বলতে বলতে দশরথের গলার স্বর হারিয়ে যায়। রুদ্ধতা গ্রাস করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভাঙা গলার কাঁপা স্বরে বলল : বিশ্বাস কর এরকম চোরের মতো আর লুকিয়ে থাকতে পারছি না। আত্মগ্লানি, ধিক্কার প্রতিমুহূর্ত আমাকে মারছে। আমিও তোমাদের মতো দুঃখী। আমারই বা কে থাকল, বল? এই লুকিয়ে থাকা, পালিয়ে বেড়ানো থেকে আমিও নিষ্কৃতি চাই। কিন্তু পাচ্ছি কৈ?—হঠাৎ যেন ভিজে ওঠে দশরথের কণ্ঠস্বর। কালো চোখের কোণ জলে চিক্ চিক্ করছিল, যদিও কান্নায় চেয়ে যন্ত্রণা আর কষ্টেব ছাপ তার মুখে গভীর।

বাইরে ঝম ঝম করে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। পাতার মর্মরে, ঝিল্লীর স্বরে, ভেকের হর্ষে, বর্ষার নিজস্ব সঙ্গীতের এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হল। দশরথ একদৃষ্টে দূরের ঝাপ্সা দিগন্তের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। এক আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে মনে পড়ল ঋষ্যশৃঙ্গের মুখ। প্রভাতের নবোদিত সূর্যের মতো স্নিগ্ধ মনোরম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ঋষ্যিশৃঙ্গের সর্বাঙ্গ থেকে। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত কোন ঈশ্বরের মূর্তির মতো সুঠাম তনু তার। মসৃণ ত্বকবিশিষ্ট এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবা পুরুষ। ঢুল ঢুল দুই চোখে ধ্যানের ঘোর। শান্ত, নির্বিকার বেদনাহীন দুই চোখের দৃষ্টিতে কিসের একটা মুগ্ধতা। বিচিত্র এক শিহরনে দশরথের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত কেঁপে গেল। তরুণ তাপসের মাথা ভরা জটা চূড়া করে বাঁধার জন্য তাপস মূর্তিতে জ্বলজ্বল করছিল। তার কণ্ঠে, বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। রিক্ততার সৌন্দর্যেই অপরূপ লাগছিল তাকে। সম্মোহিতের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথের মনে হল, স্বর্গলোক থেকে যেন নেমে এসেছে দেবদূত। অলৌকিক যৌবনশ্রী। নারীসুলভ দেহসৌষ্ঠবের ভেতর কি যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য লুকোন ছিল যার দিকে একবার তাকালে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন হয়। স্নিগ্ধ, নম্র, শান্ত দুই চোখে এমন এক অপার্থিব দীপ্তি ছিল যা তার গোপন গভীর এক শক্তির সংকেত দিচ্ছিল। দশরথের সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বল স্বপ্ন। ঋষিপুত্র কোন যাদুমন্ত্রে তার অন্তরের ক্লেদ, পঙ্কিলতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে এক অনির্বচনীয়, শান্তি, সুখ আর তৃপ্তিতে তার হৃদয়পাত্র কেমন করে ভরিয়ে তুলল, চিন্তা করে পেল না। অভূতপূর্ব আবেগে আর আনন্দে তার দুই চোখ বুজে এল। আর বুকেতে তরুণ তাপসের মধুনিঃসৃত কণ্ঠের বাণীগুলো মন্ত্রের মতো নিঃশব্দে রণিত হতে লাগল।

রাজা, জনক হওয়ার সব লক্ষণ তোমার শরীরে আছে। নির্ভাবনায় রাজ্যে ফিরে যাও তুমি।

শীতের শেষে, নব বসন্তের প্রথমে তোমার রাজধানীতে যাব। বৎসরকাল ধরে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করব। ঐ সময় কতকগলো বিধি তোমাকে পালন করতে হবে। যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নারী সংসর্গ করবে না। কঠিন সংযমে থাকবে। স্ত্রীলোকের চিন্তা থেকে চিত্ত বিরত রাখবে। মোহের বশে কিংবা রিপুর তাড়নায় ভ্রষ্ট হলে যজ্ঞ ফল ব্যর্থ হবে। অগ্নিকুণ্ড নিভে যাবে। নিস্ফল অশুভ ফল ভয়ংকর। একমাত্র আত্মসংযমী এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এই যজ্ঞ করার অধিকার। তাদের উপর প্রতিনিয়ত আমার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

দশরথের সমস্ত সত্তার ভেতর দূরাগত স্নিগ্ধ গম্ভীর মন্ত্রস্বরের মতো বাজতে লাগল তার মধুস্রাবী কণ্ঠের সেই বাণী। রাজা তুমি সংযমী হও তা হলেই সন্তানের মুখ দেখবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ সত্যিই তার স্বপ্ন সার্থক করল। তার জীবনের এক নতুন গ্রন্থের সূচনা করল। জনকত্বের অনুভূতি, উপলব্ধি, আনন্দ বোধ হয় প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠা। আর তার উপক্রমণিকা ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প। গল্পই বটে। সাধারণ গল্প নয়, অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প। ছোট্ট একটা জীবনে কত ঘটনার ছায়া পড়েছে তার সীমা পরিসীমা নেই। ঋষ্যশৃঙ্গ সত্যিই তাকে এবং সকলকে অবাক করেছে। যা পাওয়ার কথা নয়, তাই পেল সে জীবনে। এক অদ্ভুত আশ্চর্য পাওয়া। এর স্মৃতি ভোলবার নয়। আর সকলের মতো একটা স্বপ্ন নিয়ে সেও ছিল মশগুল।

কিন্তু দিন যত গেল ততই অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলো আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠল বুদ্ধির বিশ্লেষণে। তার পুরুষত্ব অর্জনের গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অথচ কি সুন্দর ধর্মের মলাট লাগানো হয়েছে তাতে। মলাটটা না খুললে ভিতরের ছবি দেখা যাবে না। কিন্তু এই মলাট ব্যাপারটার সঙ্গে মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস এমন ওতপ্রোত মিশে আছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। তবু এক জিজ্ঞাসু মন তার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হল। বন্ধ মলাট ছিঁড়ে এর রহস্য দেখার কৌতূহল জাগল দশরথের। ঋষ্যশৃঙ্গের যাদুমন্ত্রই বা কি তার রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছে হল।

মুহূর্তে অসংলগ্ন চিন্তাগুলো কেমন শৃঙ্খলিত হয়ে গেল তার চেতনায়। চোখের তারায় ফুটে উঠল যজ্ঞের দৃশ্য।

পরিধানে কযায় বস্ত্র এবং গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে দশরথ প্রতিদিন সস্ত্রীক যজ্ঞ দর্শন করত। নিবিষ্ট মনে যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করত। তারপর, যজ্ঞ সম্পন্ন হলে ঋষ্যশৃঙ্গের স্বহস্তে প্রস্তুত চরু ভক্ষণ করত। এই চরু সোমলতা, দেশীয় গাছ গাছালির মূল ও পাতা, দ্রাক্ষারস, মধু, উৎকৃষ্ট তণ্ডুল সহযোগে পাক হতো। সুস্বাদু বলবর্ধক এই চরু রাণীদের সঙ্গে তাকে একত্রে ভক্ষণ করতে হতো। এইভাবে এক ঋতু কাটল। পূর্বের মতো ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ভাবটি দশরথের আর বোধ হল না। আরো একটি ঋতু গত হল। আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙতে লাগল। দেহের কোষে কোষে নিদ্রিত পুরুষত্বের ঘুম ভাঙার সব লক্ষণগুলি প্রকট হল। রক্তের মধ্যে এ তার কোন দ্বিতীয় সত্তার জন্ম হল? আর মাত্র অবশিষ্ট এক ঋতু। এ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা কাল। আশ্চর্য সেই স্মৃতি! অসিধারা ব্রতের মতো এক নিষ্ঠুর, কঠিন আত্মসংযমের খেলা করতে হল প্রধানা মহিষী কৌশল্যার সঙ্গে। তার নীরব নিস্পৃহ নিরাসক্তিকে কৌশল্যা ভাবল নিষ্ঠুর প্রত্যাখান। স্বামীর অবহেলা মনে করেই কৌশল্যা নিজের মনের আগুনে জ্বলতে লাগল। তার অভিব্যক্তি থেকেই দশরথ বুঝতে পেরেছিল। আর তাতেই তার বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠেছিল ছলো ছলো কান্নার ঢেউ। মনের যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তার বুকে। তবু চিত্ত চঞ্চল হয়নি দশরথের। পাষাণ মূর্তির মতোই সে নিষ্ঠুর আর বেদনাহীন ছিল। আগুনে পোড়া একটা সাপের মতো ছটফট করতে করতে কৌশল্যা বাইরের বারান্দার ঘন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হল।

পরের দিন গতরাত্রির স্মৃতির নিদারুণ একটা গ্লানিকর অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন কৌশল্যা। নারীত্বের লজ্জা, অপমানের কষ্ট তার ঘন কালো অয়ত দুটি চোখের তারায় থমথম করতে লাগল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল ঋষ্যশৃঙ্গ। স্নিগ্ধ হাসি পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার মুখাবয়বে। মৃদু ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল : জননী, তোমার চেতনার ভেতর সমস্ত সত্তার ভেতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পাকিয়ে ওঠছে। কিন্তু কেন? সাধ্বী রমণী তুমি। এটুকু বোঝ না কেন; তুমি হারলেই

মহারাজ জয়ী হবে, তার সাধনার সাফল্য হবে গৌরবময়। অনাচারে মহারাজ যা হারিয়েছিল, সদাচারে তা ফিরে পেল। সঠিক পথ থেকে তাঁর স্খলন ঘটানোর যন্ত্রণায় তোমার মন যদি বিদ্ধ হয়, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তাহলে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য যে যজ্ঞাশ্ব তুমি নিজে পরিচর্যা করতে তাকেই যজ্ঞে বলিদান করে আত্মগ্লানি মুক্ত হও। কামরূপী অশ্বকে বলি দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ কর। এ রকম একটা কিছু হতে পারে ভেবেই অশ্বপালনের দায়িত্ব প্রথানুসারে মহিষীকে করতে হয়। কারণ ভবিষ্যৎ অজানা, একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা মানব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। তোমার কাজের ফলশ্রুতিতেই তোমার ব্যর্থতা বা জয় আসবে। এটি নির্ভর করবে তোমার হৃদয়ের পবিত্রতার উপর। কাজের পরিণামেই আসবে গৌরব বা লজ্জা। এখন তোমার ভাগ্যে যা লিখিত তাই হবে। এটাই এ যজ্ঞের বিধি।

কৌশল্যার সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল। সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঋষ্যশৃঙ্গের রক্তপদ্মের পাপড়ির মতো পা দুটা জড়িয়ে ধরে কৌশল্যা অনেকক্ষণ কাঁদল, প্রণাম করল। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে চলল যজ্ঞবেদী পার হয়ে যূপকাষ্ঠের দিকে।

অকস্মাৎ মাথার ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। আলোড়িত হয়ে উঠল তার চেতনা। ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞের ব্যাপারটা নিছকই একটা তুকতাকের ঘটনা মনে হল। মানুষের সরল ধর্ম বিশ্বাসকে একটি দুরূহ জটিল চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে যুক্তি বুদ্ধির অতীত এক গল্প করে তুলল। লুকোন রহস্য দশরথের কাছে আচমকা ধরা দিল যেন। যাকে অলৌকিক স্বর্গীয় মনে হচ্ছিল তা যে একান্ত বাস্তব এবং সত্য এই অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসাই তীক্ষ্ণ সন্দেহে মস্তিষ্কের মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল। তালগোল পাকানো চিন্তাগুলো একটু একটু করে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হতে লাগল। আসলে কৈশোর থেকেই সে অতি স্বেচ্ছাচারী এবং অসংযামী। অতিরিক্ত রমণী সম্ভোগের ফলে তার প্রজনন শক্তি লোপ পেয়েছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ কার্যত তার হারানো প্রজনন ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান করল। ধর্মভীরু অসংযমী রাজাকে ধর্মের নামে সংযমী করতে বৎসর কাল ধরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করল। ধর্মীয় আচরণবিধি পালনের নাম করে প্রকৃতপক্ষে চলতে লাগল চিকিৎসা। রাণীদের সঙ্গে তাকেও একসাথে হবি দান করতে হতো যজ্ঞে। এর অর্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাকে আরো সজাগ ও সতর্ক করা। নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে আরো যত্নশীল করে তোলা। যজ্ঞাগ্নিতে প্রস্তুত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর চরু হল বলবর্ধনকারী ঔষধ। তার ও রাণীদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি এবং প্রজনন ক্ষমতা পুনরুদ্দীপিত করতে এই চরু ছিল অসাধারণ। বলবর্ধক এই ঔষধই প্রকৃতপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের যাদু। গোটা ব্যাপারটা ছিল চিকিৎসার অঙ্গ। কৌশল্যাকে দিয়ে অশ্ব বলিদানের ঘটনাও একটা প্রতীকী ব্যাপার। দশরথ যে রাণীদের গর্ভোৎপাদনে সক্ষম এই সত্যটি স্পষ্ট হওয়ার পর অশ্বকে বলি দেওয়া হল। অর্থাৎ তার দেহটা পুত্র উৎপাদনের উপযুক্ত হয়েছে। এই শুভ সংকেত দিল।

হঠাৎ অন্তঃপুরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। অন্যমনস্কতার ভেতর চমকে ওঠল দশরথ। স্বপ্নের ঘোর টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শঙ্খধ্বনি তার সমস্ত অনুভূতি ধরে নাড়া দিল। অন্তঃপুরের কোন্ দিক থেকে, কার কক্ষ হতে এই শব্দ ভেসে আসছিল, উদগত নিঃশ্বাস বুকে চেপে সে বাইরের দিকে তাকাল।

বৃষ্টি থেমেছে। রোদ ওঠেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের শাখা দুলছে, প্রজাপতি ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরে সরোবর থেকে রাজহংসীর ডাক ভেসে আসছে বাতাসে। পাখিরা আহারের অন্বেষণে আবার ডানা মেলে দিয়েছে শূন্যে। ঋতুরাজ বসন্ত প্রকৃতির রূপরাজ্যে রূপ রঙের পশরা মেলে দিয়েছে। দশরথের মনেও একটি পরম স্পর্শের স্বাদ এনে দিল যেন ঋতুরাজ বসন্ত।

অন্তঃপুরে কে যেন কাকে ডেকে কী বলছে! নিচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা যাচ্ছে। থমথমানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। সময়ের গতি তখন নিরন্তর, অবাধ্য। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা জাগে। তবে কি কোন রাণীর সন্তান হল? নবজাতক; পুত্র না কন্যা? এইসব প্রশ্ন তার কাছে

অর্থহীন মনে হল, এভাবে বসে থাকাটা, যেন লুকোচুরি খেলার লুকিয়ে থাকার মতো।

পায়ের খস্ খস্ শব্দ হচ্ছিল। ক্রমে শব্দ আরো নিকট এবং স্পষ্ট হল। খোলা দরজার দিকে তাকাল। বুকের ভেতর কেমন যেন দামামা বাজতে লাগল। বুকের দ্রুত স্পন্দন তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। পায়ে পায়ে সে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। দালানের বারান্দায় বশিষ্ঠকে দেখা মাত্র তার চোখের মণি দুটো যেন উদ্দীপ্ত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে চোখের পাতায় একটা নিবিড়তা নেমে এল। উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল : মন্ত্রীবর এ শঙ্খধ্বনি কিসের?

বশিষ্ঠের চোখে কৌতুকের ঝিলিক। কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসযোগ্য সহৃদয়তা। বলল : মহারাজ, ছোটরাণী কৈকেয়ীর যমজ পুত্র হয়েছে। মহিষী কৌশল্যারও নবদুর্বাদলশ্যাম বর্ণের এক পুত্র হয়েছে। সময়ের সামান্য হেরফেরে উভয়েই একসাথে সন্তান প্রসব করেছেন। মেজরানী সুমিত্রার এখনো কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। প্রসব বেদনার কষ্টভোগ করছেন।

॥ তিন ॥

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দশরথ কেমন যেন হয়ে যায়। তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কষ্টে ভারাক্রান্ত হয় বুক। শান্ত নীরব রজনীর মতো নিজেকে তার ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় মনে হয়।

পৃথিবী থেকে আলাদা করে নেওয়া মনটা অন্ধকারের মতো রহস্যময় হয়ে উঠল। কত দার্শনিক চিন্তা মনে এল। অবাধে ছড়িয়ে পড়ল মস্তিষ্কে।

ঘুম এল না চোখে।

ফুরফুরে হাওয়ায় অবিরাম সরযূর ঢেউ ভাঙার মৃদুমন্দ শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ঘরে দীপ জ্বলছিল।

থমথমে অন্ধকার নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করে তুলল। প্রবল অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল দশরথ।

সারারাত কি ভাবে, নিজেই ভাল করে বুঝতে পারে না। অদ্ভুত সব ভাবনা চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু কোন চিন্তাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না মস্তিষ্কে। শরতের যাযাবর মেঘের মতো মন জুড়ে বিচরণ করে। কোথাও থামার অবসর নেই। জমিয়ে বসার দায় নেই। আপন খেয়ালে ঘোরেফেরে, যায়-আসে। দশরথের ঘুমহীন দুই চোখের পর্দায় তেমনি জীবনের অসংখ্য ছবি ভাসে। অদ্ভুত সব স্মৃতি হানা দিয়ে রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

সরযূর বুক থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছিল। এলোমেলো হাওয়ায় মাথার চুল ওলোট পালোট হল। তবু মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরির মধ্যে যে প্রবাহ ধিক্ ধিক করে অঙ্গারের মতো জ্বলছিল তার জ্বালা জুড়োল না।

প্রকৃতি শান্ত নির্বিকার। সীমাহীন আকাশ নীরব। চরাচর স্তব্ধ। মাঝে মাঝে নিশাচর প্রাণীর কর্কশ কণ্ঠধ্বনি নিথর নিস্তব্ধ রজনীর বুকে প্রগাঢ় যন্ত্রণায় থাবা বসিয়ে দেয় যেন। বিমর্ষ আচ্ছন্নতার মধ্যে চমকে উঠল দশরথ। না, কোন ব্যাথা বা বেদনা নয়, জ্বালা নয়। বুকের গভীর অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার শরীর আকুল হল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

আকাশ নির্মেঘ। দেবতাদের চোখ কোটি কোটি নক্ষত্র হয়ে তার দিকে জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে আছে। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে নিজেকে দশরথের অপরাধী মনে হল। পুঞ্জীভূত অপরাধবোধ সুতীব্র আত্মভিমানের সঙ্গে মিশে সমুদ্রের মতো বুকে তোলপাড় করে উঠল।

কষ্টে শক্ত হল শরীর। চোখ জ্বালা করতে লাগল। কান গরম হল। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছিল। ভুরু কুঁচকে গেল। বিষাদে মলিন দেখাল মুখ। ঘৃণায় বেদনায় সর্বশরীর রি-রি করে উঠল। মানুষের লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে কোথায় যে তাকে নামিয়ে আনল, সে কথা মনে হলে দশরথের আর কিছু ভাল লাগে না। নিজেকে তখন

তার ভীষণ অপরাধী মনে হল।

কক্ষের আধ আলো অন্ধকারে হঠাৎ একটা ছায়া নড়ে ওঠল। অন্যমনস্কতার মধ্যে চমকে উঠল দশরথ। এক ধরনের নিস্পলক চোখে ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

অবয়ব এখন স্পষ্ট। ভয় পাওয়ার কিছু নেই দশরথের, তবু আশ্চর্য হয়। ছোট রাণী কৈকেয়ীকে মধ্য রাতে প্রত্যাশা করেনি। যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলে তার চোখ মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেল। সকৌতুকে চেয়ে রইল তার দিকে।

এই কৈকেয়ী থেকে তার যত দুর্ভাবনার উৎপত্তি! পুত্রদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও পুঞ্জীভূত হতে লাগল মনে। পল, নিমেষ, মুহূর্ত'র সূক্ষ্ম বিচারে রাম জ্যেষ্ঠ। কিন্তু তাও যে যথার্থ কতখানি তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। তবু এই ব্যাপারে কেকয়াধিপতি অশ্বপতির সঙ্গে তার একটা প্রচ্ছন্ন মন কষাকষি ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে হৃদয়ঙ্গম করার কোন উপায় ছিল না। রাজনৈতিক কূট খেলায় কে কাকে হারাতে সক্ষম তারই এক নীরব উত্তেজনাহীন গোপন প্রতিযোগিতা দশরথকে ভাবিয়ে তুলল। এ বিরোধ কার সঙ্গে? তারই এক সন্তানের সঙ্গে আর এক সন্তানের। পিতা হয়েও দুই সন্তানকে সে সমান চোখে দেখতে পারল না। ভরতকে কেমন যেন শত্রুর চোখে দেখতে লাগল। মনে হল, সে তার পথের কাঁটা। এক দুর্ভেদ্য বাধা। তাকে এড়ানোর জন্য কত প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে তাকে। অথচ যাকে নিয়ে এত বিরোধ, সংঘর্ষের আয়োজন সে কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গ জানে না। কোন ভ্রূক্ষেপও নেই তার। দশরথের বিরূপ পিতৃহৃদয় ভরতের প্রতি কোন মমতা দরদ অনুভব করে না। তাকে অবাঞ্ছিত মনে হল তার। কৈকেয়ীর এই সন্তানটি পুত্র না হয়ে কন্য হলে কোন ভাবনাই ছিল না। পুত্র হওয়াতেই একটা উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় তার মন ক্ষতবিক্ষত হয়। ভরতের কথাটা দশরথ ভুলে থাকতে পারল না। সব সময় মনে হয়, ভরত তার সুখ শান্তি, আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

ভরত ও রামকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক নাটক অযোধ্যার রঙ্গমঞ্চে জমে উঠল। কিন্তু তার মহড়া দশরথের মনে। নাট্যকার সে নিজে। দৃশ্যপট অযোধ্যার দরাবার কক্ষ। কুশীলব সে ও অশ্বপতি। রাজনীতির বিষবৃক্ষটি নিজের হাতে রোপণ করেছিল। শাখায় প্রশাখার আয়তনে তা আজ বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়ছে। ক্ষুদ্র লোভ, অসংযম আর হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ফাঁদে অশ্বপতিকে আটকাতে গিয়ে সে নিজের জালে জড়িয়ে পড়ল। এখন চারদিকে তার কারাগারের দেয়াল। নিষ্ক্রমণের পথ তার সামনে নেই। বিচিত্র রাজনীতির জটাজালে বন্দী হয়ে সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল।

দশরথ এখন এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি। রাজধানীতে কেকয়রাজ অশ্বপতির আকস্মিক আগমন তার আশঙ্কাকে জটিল করল। একে নতুন সংকটের শুধু পূর্বাভাস বলে মনে হল।

রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে কেকয় রাজ্যের সঙ্গে দশরথের, অযোধ্যার সঙ্গে অশ্বপতির সম্পর্কটা রেষারেষির হলো। দশরথ, পুত্র রামকে এবং অশ্বপতির দৌহিত্র ভরতকে সেতু করে অযোধ্যার সিংহাসনের কূলে পৌঁছতে চাইল। অযোধ্যার সিংহাসেনের ওপর অবিমিশ্র আর্য রক্তধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং রামকে সিংহাসনে বসাতে দশরথ গোপন চেষ্টা চালাল।

অপরপক্ষে, অশ্বপতি অযোধ্যার সিংহাসনের উপর নিজ কর্তৃত্ব ও অধিকার চিরস্থায়ী করতে কতকগুলি শর্তে কৈকেয়ীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে, কন্যা কৈকেয়ীকে সামনে রেখেই অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠার এক সুযোগ করে নিলেন অশ্বপতি। কিন্তু সে উদ্দেশ্য দশরথের কাছে গোপন নেই।

দশরথ ভালো করে জানে, তার ক্ষণিক দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে আর্যাবর্তের মাটিতে থাবা গেড়ে বসার ফন্দী করেছেন অশ্বপতি। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত হল তাঁর লক্ষ্য লাভের উপায়। শুধু এই কারণে ভরত সম্পর্কে সে নিস্পৃহ, উদাসীন এবং নির্বিকার।

আশ্চর্য তার ভাগ্য! কোনদিন সন্তানের জনক হতে পারবে এই বিশ্বাস ছিল না তার। তাই রূপসী সুন্দরী কৈকেয়ীকে জীবন সঙ্গিনী পাওয়ার জন্য সব শর্তই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সে যে,

এরকম অভিশাপ হবে জীবনে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। অশ্বপতির অদ্ভুত শর্তগুলো নিয়ে কৌতুক করতে প্রেম প্রেম খেলার মন নিয়ে অঙ্গীকার করেছিল। কখনও ভাবেনি, সে জনক হতে পারে একদিন। জনক হওয়ার চিন্তা করে কৈকেয়ীকে বরণ করেনি। কৈকেয়ী পুত্রবতী হবে একথা জানলে মোহের বশেও বিয়ে করত না তাকে। কারণ, অনার্য দেশের মাতৃতান্ত্রিক সমাজবিধি অনুসারে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারিত্ব কেকয়রাজ্যের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য বলে গণ্য হবে। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর কৈকেয়ীর সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব এবং স্বত্ব স্থাপিত হওয়ার অর্থ নিজের হাতে ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরবদীপ নিভিয়ে দেওয়া। আর অশ্বপতিকে বিনা রক্তপাতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি করে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া। তাই অশ্বপতি কৌশলে দশরথকে দিয়ে শপথ করে নিয়েছিল। নিজের সঙ্গে নিজের কৌতুকের পরিণতি এমন যে বিষময় হতে পারে স্বপ্নেও মনে হয়নি। অথচ আজ সবটাই বাস্তব। এই চিন্তা দশরথকে সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক করে রাখল। এক অস্বস্তিকর অবস্থার ভেতর দিবারাত্র সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

কৈকেয়ীর আগমনে তার কোন ভাবান্তর হল না। ভ্রূকুটিবদ্ধ দুই চোখের দৃষ্টি কেমন সুদূর হয়ে ওঠল।

অনিদ্রায় চোখের কোণ বসে গিয়েছিল। মুখে কালি পড়েছিল। একটা কষ্টের আর্তি সারা মুখাবয়বে প্রকট হল।

কৈকেয়ী এক পা এক পা করে কাছে এল। অন্যদিনের মতো দশরথ তাকে দেখে কলকলিয়ে ওঠল না। এগিয়ে এসে তার কুশল জিগ্যেস করল না। স্পর্শ করল না তার শরীর। অপলক চোখে নিরন্তর অর্ন্তদ্বন্দ্ব আর সংঘাতের ছায়া। ভাগ্যের এক অভূতপূর্ব অসহায়তার মধ্যে সে নিশ্চল। কৈকেয়ী তার মনের গভীর সংকটের কিছুই জানে না। দশরথের অস্বাভাবিক আচরণ তার মনে এক অজ্ঞাত ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করল। দশরথের মনের তল পেল না কৈকেয়ী। তার সমগ্র চেতনার মধ্যে অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উপেক্ষার মর্মবেদনা ক্রিয়াশীল হল! নিদারুণ আত্মাভিমানে ও দুঃখে তার চোখে জল এল। কিন্তু দশরথ সম্পর্কে উদ্বেগ কাটল না। নিঃশ্বাস বুকের কাছে আটকে গেল। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল : কী হল তোমার? এত মন-মরা কেন? কার জন্য এত ভাব? কে সে ভাগ্যবান? বড় রাণী তো তোমার চোখের মণি রামকে নিয়ে এই প্রাসাদেই বাস করছে। দু'বেলা তাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তবু তুমি অন্যমনস্ক কেন? এখন তো তোমার আনন্দ করার সময়। তোমার মতো ভাগ্যবান কে আছে যে একসঙ্গে এতগুলি পুত্রের চাঁদমুখ দেখল?

কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর চমকে উঠল দশরথ। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু অধরে তার কোন আভাস ফুটল না। বরং কণ্ঠস্বর থেকে কেমন একটা নিস্পৃহ গম্ভীর স্বর বেরোল। বলল : ঘুম ভেঙে গেছে, আর ঘুম আসছে না, তাই একটু—মানে, একটু আকাশ, নক্ষত্র নিঝুম রাত্রি, নিস্তব্ধ চরাচর, মৌন গাছপালা এ সব দেখছি। দেখতে বেশ লাগে।

কৈকেয়ীর হাসি হাসি মুখ করে বলল : তুমি নিজেকে লুকোচ্ছ। অথচ, তোমার কিছুই অজানা নয় আমার। রাত্রিগুলো তোমার জেগে জেগে কাটে। নিশিপাওয়ার মতো রাত্রে বারান্দায় পায়চারি কর। নিজের ভাবনার গভীরে ডুবে গিয়ে সর্বক্ষণ বিড় বিড় কর। আজ সহ্য করতে না পেরে কাছে এসেছি।

দশরথ অপ্রস্তুত হল। কৈকেয়ীর দিকে অপরাধীর মতো আড়চোখে তাকাল। তার সন্ধানী দৃষ্টির ওপর সভয়ে চোখ রেখে বিভ্রান্ত স্বরে বলল : সত্যি বলছি, ঘুম প্রতিদিন মাঝরাতে ভেঙে যায়। তারপর আর ঘুম আসে না। বয়স বাড়লে সকলের এরকম হয়।

মিছে কথা বলে আমাকে ঠকাতে পারবে না। তুমি অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছ। কৈকেয়ীর কথার মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। শান্ত অথচ গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর কিন্তু তার অপলক চোখের দৃষ্টি দশরথের দিকে। দশরথের দৃষ্টি নিজের অগোচরে তার সঙ্গে মিলল। এবং একটা অনুভূতির মুগ্ধতা নামল চোখের পাতায়। গভীর আচ্ছন্ন স্বরে দশরথ বলল : অযোধ্যার রাজগৃহ তোমার পদার্পণে শাপমুক্ত হল। পুত্রহীনতার অপবাদ তোমার কল্যাণে দূর হল! অথচ, একদিন পুরুষত্বহীনতার লজ্জা গ্লানিতে কষ্ট

পেয়েছি। পুত্রোৎপাদনের অক্ষমতার দাহে প্রতিমুহূর্ত জ্বলেছি। কি দুঃসহ ছিল সেই মর্মজ্বালা, রাণীদের দিকে ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না। নিদারুণ লজ্জায় মাথা নত হয়ে যেত। প্রতি দিনের সঙ্গম আমার ব্যর্থ হতে লাগল। একটি নারীর স্বামী হওয়ার যোগ্য নই, ধারণায় ক্ষতবিক্ষত হতো আমার অন্তঃকরণ। নির্বীর্য, ব্যর্থ পুরুষ আমি! সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা উজ্জীবিত করতে রাজবৈদের উদ্যম শ্রম সব বিফলে গেল। অবশেষে, তোমার বাক্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মন্ত্রী সুমন্ত্রর পরামর্শ চাইলাম। তাঁর ও বশিষ্ঠের নির্দেশে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গের শরণাপন্ন হলাম। বিশেষ যোগ চিকিৎসায় আমার যৌবন উদ্গম হল। মনে বল, বুকে সাহস যোগাল। ঋষির পরীক্ষায় জানতে পারলাম, পুরুষত্বহীনতার লক্ষণগুলি আমার গেছে।

কৈকেয়ীর চোখে সলাজ কৌতুক কটাক্ষ। মুখে কিছুই বলল না। কৈকেয়ীর বুকে চিকুর হানার মতো ঝলকিয়ে উঠল বিগতকালের স্মৃতি। আকস্মিক বিস্ময়কর চমকের এবং সেই সঙ্গে চমকের উৎসগুলি মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল। কিন্তু দশরথের নিস্পৃহ নির্বিকার মনোভাবের জন্য সেই সব ছবি স্থায়ী হল না। মস্তিষ্কেও বদ্ধ থাকল না, বরং দশরথের কথাগুলো কেমন যেন রহস্যজনক চুম্বক আকর্ষণের মতো অনুভূত হল।

দশরথের চোখ ছিল না কৈকেয়ীর উপর। গল্পের আকর্ষণকে সুতীব্র করার জন্য ধীরে সুস্থে বলল : তরুণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের অসাধ্য সাধনে আমি অভিভূত। এই সাধনালব্ধ চিকিৎসার গুণ আমার কাছে অব্যাখ্যাত। অলৌকিকতায় আমি বিশ্বাসী নই। তবু ঋষির আশ্চর্য ক্ষমতার অলৌকিকতা বলে মনে হল। মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তোমার মতোই কৌশল্যা সুমিত্রারও জননীত্বের সব লক্ষণ যখন দেখা দিল তখন পৃথিবী বিজয়ের মতোই এক বিশাল আনন্দ আমাকে রোমাঞ্চিত করল। পিতা হওয়ার এক দুর্লভ সুখ আনন্দের অনুভূতিতে আমার মন প্লাবিত হল। সাফল্যের পরিতৃপ্তি, সার্থকতার গর্ব, পুরুষত্বের শক্তি, সৃষ্টি সুখের উল্লাস মন ভরে পেলাম। শান্তিতে আনন্দে নিজেকে একজন সার্থক বীর্যবান পুরুষ বলে মনে করতে শিখলাম। বহুকাল পর নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা জাগল। বাৎসল্যভাবে আমার হৃদয় পরিপূরিত হল। তবু একটা সন্দেহে মন আমার উদ্বিগ্ন হল।

কথার মধ্যে কৈকেয়ী আচ্ছন্ন স্বরে প্রশ্ন করল : এ সব কথা তো আগে বলনি কোনদিন।

অনুভূতির কথা এত বেশি ব্যক্তিগত এবং নিজের যে তা নিয়ে গল্প হয় না। বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার উপলব্ধি জাগে না। ইদানীং সর্বক্ষণ এই সব কথা নিয়ে আমি চিন্তা করি! মনের মধ্যে তার নিত্য যাওয়া আসা। অতীত আমাকে সুখে থাকতে দেবে না।

কৈকেয়ী শান্ত গলায় বলল : তোমার দুঃখের কথা বল।

দশরথ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর বলল : যে কথা বলছিলাম অযোধ্যার জনগণ এবং রাজকর্মচারীরা সকলেই জানে অজপুত্র নেমির* কোন সন্তান নেই, অদূর ভবিষ্যতে হবেও না। তার অবর্তমানে এই সিংহাসন কার হবে, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না। স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী রাজকর্মচারীদের অনেকে যে যার অনুকূলে এই সব গল্পের ইন্ধন যোগাল। এ রকম একটা ঘটনা প্রবাহের ভেতর তোমাদের হঠাৎ সন্তানবতী হওয়ার সংবাদে চক্রান্তকারীরা থমকাল। তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এত সহজে থামবে বলে মনে হল না। আশংকা বাড়তে লাগল। এবার—তারা আমার পুরুষত্ব অর্জনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প তৈরী করবে। তাদের হীন সন্দেহে এবং কুৎসিত ইংগিতে রাণীদের সম্ভ্রম এবং রাজবাড়ির অতীত মর্যাদা ও গৌরব হানি করবে, এরকম একটা দুর্ভাবনায় ভুগেছি অনেককাল। ভবিষ্যতে এই মিথ্যা রটনা আমার সন্তানদের মনকে হীনম্মন্যতায় বিষিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। নিজেদের জন্ম সম্পর্কে সংশয়ের ক্লেশ আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করবে তাদের ব্যক্তিত্ব, পৌরুষদৃপ্ত অন্তবল। আমার স্বপ্নভঙ্গ হবে।

দশরথকে থামানোর জন্য কৈকেয়ী ভৎর্সনা করল! বলল : এ সব কল্পনা বিলাসিতা তোমাকে মানায় না স্বামী।

---

* দশরথের আর এক নাম।

দশরথের কণ্ঠস্বরে আকুল উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। না, ছোট রাণী তা নয়—তুমি সব জান না। ইক্ষ্বাকুবংশের এই সিংহাসনটির উপর এখন অনেকের লোভ। এই সিংহাসনটি বৃহৎ ভারসাম্যর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। তাই এর উত্তরাধিকারী নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই।

কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করল : কাদের সন্দেহ কর তুমি? তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা করেছ?

অদ্ভুত হাসি খেলে গেলে দশরথের অধরে। বুকের ভেতরে থেকে উঠে এল একটা লম্বা শ্বাস। মৃদুস্বরে বলল : সব আমার অদৃষ্ট। ভাগ্যের সঙ্গে কি যুদ্ধ করা যায়?

চিরদিন তুমি হেঁয়ালি করে কথা বল।

সহজ করে কথা বলা দারুণ কঠিন।

মোটেই না সহজ কথাটা স্পষ্ট করে বললে পাছে সত্যি কথাটা বেরিযে পড়ে তাই মনকে আগলে আগলে বেড়াও। কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে সত্যি কথাটা হঠাৎ যদি বেরিয়ে পড়ে সে জন্য সতর্ক থাক। আর সেজন্যই মনে হয় কথাগুলোকে নিংড়ে নিংড়ে বার করছ। কিন্তু এতে যে মনের কুট অভিপ্রায় আর চাতুরী স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্যের কাছে তার কথা ভাব না।

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথের মুখে হাসি হাসি ভাব প্রকাশ পেল। কৈকেয়ীকে ভোলানোর জন্য বলল : ঠিক বলেছ। তা হলে সত্যি কথাটা শোন। রাজপুত্রদের চিন্তায় আমি বিচলিত। তাদের মঙ্গলের কথা ভাবতে ভাবতে ঋষিদের তপোবনের আশ্চর্য আশ্চর্য শক্তি এবং মাহাত্ম্যের অদ্ভুত অলৌকিকক গল্পে আমার মন ডুবে রইল। মুনি ঋষিদের সমস্ত কথা ও কাজের প্রতি সব মানুষ শ্রদ্ধাশীল। তাদের কোন কাজই যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝার কেউ চেষ্টা করে না। ঋষির বাক্য অপার্থিব, দৈব এবং অলৌকিক। মানুষের এই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে আমি শত্রুর মুখে ছাই দিলাম। সকলে জানল মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের চরু ভক্ষণ করে রাণীরা গর্ভবতী হয়েছেন।

কথার মধ্যে কৈকেয়ী হেসে ওঠার একটা শব্দ করল। দশরথের কাঁধে হাত রেখে বলল : সত্যি, তুমি কি সুন্দর গল্প বানাতে পার। মানুষকে বোকা বানানোর যাদু আছে তোমার গল্পে। যা হোক একটা কিছু করে বুঝিয়ে দিতে চাইছ।

কৈকেয়ীর স্বরে তারল্য, ভঙ্গিতে কপট ধমক। দশরথ মুখে যাই বলুক অবচেতন মন কৈকেয়ীর প্রশ্নে সভয়ে চমকে উঠেছিল। দশরথ যেন অবাক মুগ্ধ চোখে মুখ তুলে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। কৈকেয়ীব উদ্দীপ্ত উন্মুক্ত দুটি চোখের তারা নির্নিমেষ লক্ষ্য করে স্বপ্নচ্ছন্নের মতো বলল : ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ তোমায় কি বলেছিল মনে আছে? হাতে চরু দিয়ে বলেছিল, এই চরু ভক্ষণে তোমরা জননী হবে। মহারাজের বংশ রক্ষা পাবে, শঙ্কা-দুর্ভাবনার অবসান হবে। আর ইক্ষ্বাকু বংশের সার্থক উত্তরাধিকারীর জন্মদাত্রী হয়ে তোমরা চিস্মরণীয় হবে।

পুরনো কথা উঠছে কেন? কি হয়েছে তোমার? কথা বলার সময় কৈকেয়ীর ঠোঁট ধনুকের মত বাঁকল। বিমর্ষ স্বরে উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হল।

কৈকেয়ীর কথায় দশরথ বিব্রতবোধ করল। অসহার চোখে তার দিকে তাকাল। ঠোঁটের দুটি কোণ শক্ত দেখাল, দৃষ্টি কঠিন হল। কিছুটা বিব্রত আর অপ্রস্তুত হল। কিন্তু তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। নিজের কথায় তন্ময় হয়ে গিয়ে বলল : আমার ঔরসে রাণীরা গর্ভবতী হল। কিন্তু লোকে জানল অলৌকিক চরু ভক্ষণ করে তোমরা গর্ভবতী হয়েছ। তেমাদের পুত্রেরা ঈশ্বরের সন্তান। তারা নাকি সবাই অবতার হয়ে জন্মেছে। তাদের সম্বন্ধে সাধারণের মনের এই বিশ্বাস সংগঠিত করছে বশিষ্ঠ, নারদ, জাবালি প্রমুখ মুনিঋষিরা। কিন্তু শান্তি পেলাম কী? একটা গোপন শঙ্কা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি। পুত্রেরা যত বড় হচ্ছে আমার বুক তত দুরু দুরু করছে। আমার সমস্ত চেতনা অনুভূতির মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে এক ঋষির অভিশাপ।

অভিশাপ! বিস্ময়ে চমকে উঠল কৈকেয়ী। কার অভিশাপ? কৈ, এত কাল তো শুনিনি।

কৈকেয়ী জানল না, দশরথই তার জিজ্ঞাসার স্রষ্টা। দশরথের ছলনা অসাধারণ কিছু ছিল না; কেন না, তা একান্ত অসহায় মানুষের ছলনা। কিন্তু কৈকেয়ীব জিজ্ঞাসানিবিড় দৃষ্টি বিষাদে মলিন,

উৎকণ্ঠায় চকিত। দশরথের অবস্থা ফাঁদে পড়া পাখির মতো। ধরা পড়ার ভয়ে ভীত তস্করের মতো উৎকণ্ঠায় ত্রস্ত হয়ে উঠল। মনের সত্যকার উৎকণ্ঠাকে আড়াল করে সে কৈকেয়ীর ব্যাকুল জিজ্ঞাসার মুখোমুখি উত্তর দিতে গিয়ে নিজের অজান্তে নিজেকে নিয়ে এ গল্প তৈরি করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল :

অনেককাল আগের কথা। ফাগুনের পূর্ণিমা তিথি। সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে বসন্তকালীন মৃগয়া উৎসবে যাত্রা করলাম। সূর্যোদয়ের সোনার আলোয় ঝলমল চতুর্দিক। আকাশে নীলের বন্যা। নিষ্পত্র গাছে শ্যাম-কচি চিকণ চিক্ চিক্ করছে। ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল দশদিক। ডালে ডালে পাতার প্রলাপ। ফুলের উচ্ছ্বাস। বিরহী পাখির আকুল আহ্বান। কোকিলের উদাস ডাক। ছোট ছোট পাখির জটলা। দু'পাশে ঘন বনসীমানার সঙ্গে আঁকা বাঁকা সংকীর্ণ পথ ক্ষুদ্রতর একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে হারিয়ে গেছে অরণ্যের গহনে। কোথাও বনভূমি ক্রমশ ওঠে গেছে পাহাড়ের দিকে; আকাশের পানে। এই অরণ্য ভেঙে শিকারের সন্ধানে গহন বনরাজ্যে প্রবেশ করা আদৌ নিরাপদ নয়। নধর ডোরাকাটা বাঘের রাজ্য সে। চক্র আঁকা চিতাও দেখা যায়। বন্য বরাহ, অজগর সাপ এ সব তো আছেই। তথাপি, এ বনপথে চলার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা আছে। শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা আর উৎকর্ণতা নিয়ে চলতে হয়। সতর্ক চক্ষুজোড়া আগুনের গোলার মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলে। গাছ-গাছালির ভিড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমার অশ্ব। কেমন উন্দাম বন্য একটা ভাব ফুটে উঠল আমার শরীরের মধ্যে।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। তবু কোন শিকারের দেখা নেই। চমক লাগানোর মতো কোন শিকার তখনও হয়নি। অপরাহ্নের ছায়া নামল বনে। নির্জন বনের দিকে তাকিয়ে ভাবছি আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না। নীরব, নিস্তব্ধ হঠাৎ একটা গম্ভীর শব্দ ভেসে এল। উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দের ধ্বনি অনুধাবন করতে চেষ্টা করলাম। বন্যপ্রাণীর জলপানের সময় যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেরকম এক শব্দ। অনেক বন্যপ্রাণীই জল খেতে আসে পড়ন্ত সন্ধ্যায়। সাধারণত হাতির জলপানের সময় অনুরূপ শব্দ হয়। শব্দ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ধনুতে শব্দভেদী বাণ যোজনা করলাম। এ এক অদ্ভুত অস্ত্র আমার। শব্দকে ধাওয়া করে এ বাণ লক্ষ্যকে আঘাত হানে। হানলোও তাই। কয়েকমুহূর্ত পরে। মানুষের কণ্ঠের এক আর্তচিৎকার জনমানবহীন জঙ্গল আকাশ বাতাস পাহাড়সীমা থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল। আমার বুকের ভেতর উৎকণ্ঠার ঝড়। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। শব্দভেদী বাণ কার কণ্ঠস্বর ভেবে কাকে আঘাত করল? এ তো বালকের কণ্ঠস্বর! নির্জন অরণ্যে বালক কোথা হতে এল? একি কোন মায়া? না মতিভ্রম? জোর কদমে অশ্ব ছুটিয়ে চললাম পাহাড়ের ঢালু পথে। আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে বালকের কান্না করুণ সুরে বাজতে লাগল। আমার চোখের কোণ থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলাম রক্তাপ্লুত শরীরে এক বালক মাটিতে যন্ত্রণায় হাত পা ছুঁড়ছে। অশ্ব থেকে লাফিয়ে নামলাম। বালকের বুক থেকে বাণটি সরিয়ে নিতে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। আমার কলেবর শোণিত-সিক্ত হল। বালকের চোখে তখন নেমেছে মৃত্যুর ছায়া। তবু কষ্ট করে বালক বলল, সে কার পুত্র, কোথায় থাকে, এই বিজন নদীতে কেন এসেছিল। হত্যাকারীকে তার পিতার কাছে নিয়ে যেতে বলল। অন্ধ পিতা মাতাকে কে দেখবে, বলে বিলাপ করতে লাগল। বালকের কথায় আমার বুক ভেঙে গেল। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হল। শব্দভেদী বাণের প্রয়োগ না জেনে আমি যে পাপ করলাম তা আমার যন্ত্রণা দিতে লাগল। বালককে বুকে নিয়ে তার পিতার কুটিরে পৌঁছলাম, সব শেষ তখন।

দশরথের বর্ণনা এমনই প্রাণবন্ত ও বর্ণনাময় যে শুনতে শুনতে কৈকেয়ীর চোখ ঝাপসা হল। একটা কষ্ট তার দুইচোখে নিবিড় হয়ে উঠল। দশরথের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ হল তার। দশরথের নীরব মুখে ফুটে ওঠে থমথমে ভাব।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর শ্বাস উঠে এল কৈকেয়ীর। শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল : তারপর, অন্ধমুনি আর তার স্ত্রীর কি হল?

যন্ত্রচালিতের মতো দশরথ উত্তর দিল : পদশব্দে ঋষিবরের কণ্ঠস্বরে স্নেহে কলকলিয়ে উঠল। ভাবলেন পুত্র ফিরে এসেছ তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন : পুত্র যজ্ঞের জল সংগ্রহ করতে এত দেরি হল কেন? অভিমান হয়েছে? বোকা ছেলে। অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে ঋষি বালককে শুইয়ে দিলাম অন্ধমুনির পদতলে। নিষ্প্রাণ দেহ স্পর্শ করে ঋষি চমকে ওঠলেন। সবিনয়ে সব কথা নিবেদন করে ঋষির করুণা প্রার্থনা করলাম। ঋষির সহানুভূতি অপরিসীম। আমি নিরপরাধী হলেও আমার ক্ষাত্রধর্মকে তিনি ক্ষমা করলেন না। তাপিত অন্তরে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন · রাজা, তুমি অপুত্রক। পুত্র বিয়োগের জ্বালা কি মর্মান্তিক জান না! আমার এই বুকটা খাঁ খাঁ করছে। এখানে এখন একটা ভীষণ দাবানল। একটা ভীষণ শূন্যতার কষ্ট। তুমি না জেনে পুত্র হত্যা করেছ ঠিক। কিন্তু পিতার মর্মবিদ্ধ তীব্র বিষজ্বালার যন্ত্রণা থেকে তুমিও মুক্ত থাকবে না। আমার এই অসহায় কষ্ট যন্ত্রনায় তেমারও বুকের ছাতি ফেটে চৌচির হবে। পুত্রের দুঃসংহ শূন্যতা একদিন তোমারও মৃত্যুর কারণ হবে। আর সেইদিন তুমি আমার কথা মনে করবে। আমার অনুভূতি তুমি পাবে। এ ঋষির অভিশাপ নয়, পিতার নিদারুণ বক্ষজ্বালা। তারপর থেকে শয়নে স্বপনে জাগরণে ঋষির কথাগুলো কিছুতে ভুলতে পারি না। কিন্তু প্রথম প্রথম অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে হয় তাঁর শাপেই বোধ হয় আমার পুত্রলাভ হয়েছে। অবিশ্বাস করে ঋষির কথা তাচ্ছিল্য করার মতো জোর পাই না আর। ঋষির অভিশাপ বর্ণে বর্ণে সত্য করার জন্য হয়তো ভাগ্যদেবতা আমার সঙ্গে এক নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতেছেন। একটা চরম দুঃখের জন্য প্রস্তুত হও রানী।

শান্ত নিথর আঁধারও কেঁপে উঠল দশরথের গলার স্বরে। কৈকেয়ীর দু'চোখে কেমন একটা নিবিড় সমবেদনা আর প্রীতির উষ্ণতার স্পর্শ লাগল।

বাইরে থেকে হঠাৎ একটা এলোমেলো ঝড় এসে ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে দিল। মেঘ ঢাকা আকাশের ফাঁকে ফুটে ওঠা তারার ম্লান দীপ্তির মতো মনের মাঝে দশরথের রামের মুখখানা জেগে উঠল।

তিন রানীর সন্তানদের মধ্যে কৌশল্যার পুত্র রাম অগ্রজ। কৈকেয়ীর যমজ পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং রাম একদিনে এক প্রহরে জন্মগ্রহণ করল। তবু দণ্ড, পল মুহূর্তের সূক্ষ্ম বিতর্কিত বিচারে রাম জ্যেষ্ঠ। কেকয়রাজ অশ্বপতি কিন্তু এই বিচারে সন্তুষ্ট হলেন না। একটা জটিল সন্দেহ তাঁর মনে পাক খেতে লাগল। আর্য অনার্যের সনাতন বিরোধের সঙ্গে রাম ও ভরত যে একদিন জড়িয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দশরথ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতখানি যত্নবান হবে তা নিয়ে অশ্বপতির দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। রাজপুত্রদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংকট ও সমস্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। বিশাল অযোধ্যা সাম্রাজ্যের উপরে কি উপায়ে তাঁর প্রভাব বিস্তার করা যায় তার বিভিন্ন মতলব এবং পরিকল্পনা তিনি রোজই করেন! কোনটাই তাঁর মনঃপুত হয় না বলে বারবার বদলান, আবার নতুন করে তৈরি করেন।

কূটকৌশলে অযোধ্যার সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা তাঁর খুবই আকস্মিক। কৈকেয়ীর সঙ্গে দশরথের বিবাহে তাঁর মত ছিল না। নিজের অনিচ্ছাকে জোর দিতেই তুরুপের তাসের মতো কৈকেয়ীকে ব্যবহার করলেন। কিন্তু অদৃষ্ট নিজের খেয়ালে চলে। এ এক অদ্ভুত ভাগ্যফল। নইলে, এমন ঘটনা হয় কি করে? তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় কৈকেয়ী আর এক পাল্লায় দশরথের বিশাল সাম্রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য, মর্যাদা, গৌরব। তবু দশরথের সব হিসাব ভুল করে দিল। জীবনের দাবি যে দশরথের কাছে এত বড়, অশ্বপতির চিন্তাতেও আসেনি।

সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না নীতি নিয়ে যে জয় চিন্তা অশ্বপতির ছিল, তা দশরথ উল্টেপাল্টে দিল। সেই অভাবিত প্রাপ্তির আনন্দে কিন্তু অশ্বপতি বিহ্বল হননি। নেপথ্য দরকষাকষিতে তাঁর বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। দশরথের মনোভাবকে বুঝে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি নিজের কর্মপন্থাকে দ্রুত ঠিক করে নিলেন। কৈকেয়ীর এই বিবাহ তাঁকে আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণা দিল। পিতা অশ্বপতি তাই কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য যত

প্রকার শর্ত হয় সবই দশরথকে দিয়ে অঙ্গীকার করে নিলেন। দশরথের রাজি হওয়াটা তার নিছক একটা খেলা, না খেয়াল, না উন্মত্ত লালসা তা বুঝে নেবার জন্যে এক সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার পথে তাঁকে টেনে আনলেন। এবারেও অশ্বপতির অবাক হওয়ার পালা। দশরথ অম্লান বদনে স্বীকার করল কৈকেয়ীর দেখাশোনার জন্য কেকয়রাজ তাঁর মনোমত লোককে অযোধ্যায় নিযুক্ত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, কৈকয়ীর পুত্রসন্তানই হবে অযোধ্যার রাজা। তৎসত্ত্বেও অশ্বপতি কোন ব্যক্তিকে অযোধ্যায় নিযুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। অকারণ অবিশ্বাসে মধুর আত্মীয় সম্পর্ক শুধু তিক্ত হয়। তা-ছাড়া অযোধ্যার উপর কর্তৃত্ব করার সময় তখনও হয়নি।

কৈকেয়ীর পুত্র জন্মের সংবাদে অশ্বপতির কল্পনা প্রবণতা দেখা দিল। স্বপ্ন-সফলের আবেগে থরথর করছিল তাঁর বুক। কৈকেয়ীর পুত্র তাঁর লক্ষ জয়ের ধনুঃশর। বিধাতারও ইচ্ছা অযোধ্যার বিশাল সাম্রাজ্যের উপর তাঁর কর্তৃত্বকে অক্ষুণ্ণ করা। নইলে এমন করে তাঁর আশাগুলি পূরণ হল কেন? যমজ সন্তানের জননী হয়ে কৈকেয়ী তাঁর আধিপত্যের দাবিকে অযোধ্যায় জোরাল করল। তবু অশ্বপতির মনে হল, অদৃষ্ট যেন কোথায় তার সঙ্গে একটু শত্রুতা করে রেখেছে। তিন রানী এক দিনে সন্তান প্রসব করলে কেন? এটাই কি জট পাকানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়? কৈকেয়ীর যমজ সন্তানও আর এক সংকটের কারণ হতে পারে। সিংহাসনের উপর দু'জনের সমান দাবি কি করে স্বীকার করা যায় এমন অনেক প্রশ্ন তাঁর মন ছুঁয়ে রইল। ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারে ঢাকা। সেই গভীর গহন অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চলে না। অন্ধ যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আঁধারকে অনুভব করে লাঠির সাহায্যে একটু করে এগিয়ে চলে তাঁকেও তেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। এ-ছাড়া আর কি-বা করার আছে?

অযোধ্যার সিংহাসনের ওপর তাঁর চিরস্থায়ী করার একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অবশ্য তাঁর আছে। অযোধ্যার রাজমুকুট কেকয়ের দিকে সরিয়ে নেবার জন্য এখন ব্যাকুল তিনি। যে মুকুটের জন্যে তাঁর লোভ অসীম, তাতে তাঁর নিস্পৃহতা দেখানোর কোন হেতু নেই। এখন ক্ষমতার লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে গেছেন অযোধ্যার সঙ্গে। জয় সম্পূর্ণ করার জন্য যে অনেক কৌশল, শঠতা, ছল, চাতুরি, কূটনীতির আশ্রয় তাঁকে নিতে হবে, এ তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। দশরথের পুত্রেরা যত বড় হবে তাদের অন্তরে ঘুমন্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো তত জেগে উঠবে, আর তখনই শাসনকার্য এবং সিংহাসন নিয়ে এক জটিল রাজনীতির সূচনা হবে। কিন্তু সে রাজনীতি আর্য-অনার্য রক্ত সম্পর্ক নিয়েই দানা বাঁধবে। সুতরাং অশ্বপতি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী তৈরির জন্য দৌহিত্রদ্বয়কে নিজের কাছে রাখলেন। স্বজাতি প্রেমই তাঁর রাজনীতি হয়ে উঠল!

ভরত শত্রুঘ্ন যমজ দৌহিত্র শিশুকাল থেকে মাতুলালয়ে মানুষ হল। ছোট থেকেই যাকে কেকয়ের মানুষ লোকাচার, প্রথা, ধর্ম সংস্কার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের সঙ্গে তারা ওতপ্রোত হয়ে যায়, অনার্যকৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তার জন্যই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

কিন্তু দশরথ ধূর্ত। অশ্বপতির অভিপ্রায় ও মতলব বুঝতে তারও বাকি ছিল না। অশ্বপতিকে নিরাশ ও হতাশ করা এক অদ্ভুত কূটকৌশল করল দশরথ। কৈকয়ীর অন্তরে অপত্যস্নেহের শূন্যতা এবং বাধা দূর করতে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন অযোধ্যার প্রাসাদে। সঙ্গে তাদের জননী কৌশল্যা এবং সুমিত্রাও এল। রামের সঙ্গে কৈকেয়ীর গভীর মাখামাখি কৈকেয়ীর স্নেহবুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে এক অপার আনন্দ সঞ্চার করল। ভরত শত্রুঘ্নের শূন্যস্থান দখল করল রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই। ভরত শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীর হৃৎপিন্ড। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ চোখের মণি। তাদের একদণ্ড দেখতে না পেলে মন চঞ্চল হয়। কৈকেয়ীর হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দশরথ তার প্রতিশ্রুতি এবং শপথ লঙ্ঘনের এক সুন্দর কৌশল করল। কৈকেয়ীর কাছ থেকেই রামের অভিষেকের কোন বাধা যাতে না আসে সে জন্যই এই ফন্দী। দশরথের উদ্দেশ্য কি করলে ব্যর্থ হয়, তার কথা চিন্তা করতে গিয়ে অশ্বপতির মন্থরার মুখখান মনে পড়ল।

মন্থরার দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব! ফরসা শরীরে তার দুর্নিবার যৌবন। গানের সুরের মতো দীর্ঘতন্বী চেহারা। গম্বুজের মতো বিশাল খোঁপার ভারে পিঠটা একটু নুয়ে পড়ে। ঘাড়ের কাছে দিগন্তরেখার

মতো বঙ্কিমভাবটুকু তাকে আরও সুন্দর করেছে। দীর্ঘ চেহারায় লালিত্য এনেছে! এটুকু বঙ্কিমভাব না থাকলে তাকে ভাল লাগত না। তনুসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেত না। মন্থরার আলগা শ্রীর মধ্যে এমন একটা আসাধারণত্ব আছে যা সব নারীকেই ঈর্ষান্বিত করে। এ জন্য অনেকে ঈর্ষাকাতর হয়ে তাকে ব্যঙ্গ করার জন্যে কুব্জা বলে ডাকে। তাতে রাগ করে না। বরং খুশি হয়। এমনিতে মন্থরা মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। প্রকৃতিতে সে খল হলেও তার আচরণ ও ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয়। রঙ্গালাপ করতে তার জুড়ি ছিল না। মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তিকে আপন করে নিতে পারত। কাউকে কটু কথা বলা কিংবা প্রত্যাঘাত করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সহজে ক্রুদ্ধ কিংবা উত্তেজিত হয় না। সে খুব ধীর, স্থির এবং শান্ত স্বভাবের রমণী। বুদ্ধিতে কূট রাজনীতিককেও হার মানায়। সব অবস্থাতে নিজেকে অবিচল রাখার এক আশ্চর্য সংযম আছে তার ব্যক্তিত্বে। এসব কারণে মন্থরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং আস্থাভাজন। তার সঙ্গে একটা গোপন হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কও আছে তাঁর। তাই কৈকেয়ীর রাজপ্রসাদে মন্থরা শুধু দাসী নয়, আরো কিছু। রাজার প্রণয়িনী। সুতরাং স্বার্থ সাধনে অশ্বপতি তাকেই নিযুক্ত করবে ভাবল। একমাত্র মন্থরাই প্রেমের জন্য অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুরে গভীর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলতে সক্ষম। সে সাহসী, বুদ্ধিমতী, বাকপটু, রঙ্গপ্রিয়, চতুরা, সর্বোপরি দর্শনীয়া। তার রূপ ও সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। এছাড়া গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য যে সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দরকার হয়, তার সব গুণ মন্থরার আছে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে সে কৈকেয়ীয় অভিভাবিকা, ভরত শত্রুঘ্নের ধাত্রী। অন্তঃপুরে তার প্রচ্ছন্ন রহস্যময় অবস্থান কারো মনে কোন সন্দেহ উদ্রেক করবে না। এই প্রত্যয় দৃঢ় হল অশ্বপতির মনে।

ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করে মাতুল যুধাজিৎ এবং মন্থরা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করল। অকস্মাৎ তাদের আগমনে দশরথের নিরবছিন্ন সুখশান্তির ব্যাঘাত ঘটল। পুত্রদ্বয় একটি গোপন জ্বালার মতো নিভৃত অবসরে তার মনকে দগ্ধ করে। এই দুই সন্তান সব সময় দূরে দূরে চোখের আড়ালে থাকলেই সে বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করে। তাই, বহুকাল পর ফিরে এসে তারা যখন সামনে এসে দাঁড়াল, বাবা বাবা বলে ডাকল তখন দশরথের বুকের ভেতর আনন্দের বাণ ডাকল না। পুলকে বুক কেঁপে উঠল না। তাদের কোলে করে আদর করতে ছুটেল না। ভাল করে মুখের দিকে তাকিয়েও দেখল না। প্রৌঢ় দশরথের দুই চোখে কেমন একটা বিব্রত বিহ্বলতা। গভীর দীর্ঘশ্বাসে উদ্বেলিত হল বুক। দুরন্ত আক্ষেপে সমস্ত শরীরটা তার পাক দিয়ে মুচড়ে উঠল। অসহায় স্বরে বলল : খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এলে কেন? বুকের ভেতর থেকে শব্দ করে নিঃশ্বাস পড়ল দশরথের।

সমস্ত ঘটনাটা বিদ্যুৎচমকের মতো মস্তিষ্কে ঝিলিক দিল মন্থরার। দশরথের সুরহীন স্বর, তার ভাবান্তর ও প্রতিক্রিয়া মন্থরার শূন্য মনে জোনাকির মতো টিপ টিপ করে জ্বলে। সেই চকিতে আলোর বিন্দুতে তার অনুভূতি নিজের কাছে সাড়া দিল। দশরথের মুখে ও-কিসের দুর্ভাবনা? ভরত শত্রুঘ্ন তার ঔরসজাত পুত্র। তবু তদের সঙ্গে তার এ ধরনের আচরণের অর্থ কি? ভরত শত্রুঘ্নের দিকে না তাকিয়ে রামের তৈলচিত্রে উপর তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ স্থির ছিল কেন? অপলক চোখে প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শব্দ করে যে নিঃশ্বাসটি ফেলল তা যেন 'হা রাম' ধ্বনি হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হল বাতাসের স্বরে। এর অর্থ কি? কৈকেয়ীর পুত্রদের দেখেই দশরথের মেজাজ কেন তিক্ত এবং কণ্ঠস্বর রুক্ষ হল? এই কেন'র প্রশ্নগুলো তীক্ষ্ণ-তীরের মতো তার বুকে বিঁধে রইল।

মন্থরার বুক জোরে ওঠানামা করতে লাগল। একসঙ্গে অনেক কথা তার মনে এল। কিন্তু সে সব জিজ্ঞাসা নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করার নয়। কেবল নিজের মনে পর্যালোচনা করে তাকে সত্যে পৌঁছতে হবে। সেজন্য খোলা চোখ আর খোলা মনের প্রয়োজন। কোনো পূর্বধারণা সত্য অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটায়। অশ্বপতি তাই কোন পূর্বধারণা নিয়ে তাকে অযোধ্যায় পাঠালেন না। ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে বিরোধ ও বিরোধিতার পাঠ গ্রহণ করতে বললেন। আর প্রথম দিনেই অনুদঘাটিত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের আকস্মিক পাঠ নিল সে। এর পাতায় পাতায় বিস্ময় এবং কৌতূহল। রাজপুরীর অভ্যন্তরে গোপন রাজনীতির রূপ একটু একটু করে তার কাছে ক্রমেই উদঘাটিত হতে লাগল।

আর এক আশ্চর্য আনন্দে সে গুপ্তচরবৃত্তির কার্যে আরো বেশি মনোযোগী ও নিষ্ঠাবান হল।

রাজঅন্তঃপুরে ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়ে যে এক ধরনের গোপন রাজনীতি চলছিল মন্থরা তার সহজাত কূটবুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করল।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সবার অলক্ষ্যে অযোধ্যার রাজপ্রসাদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে এক গোপন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কিন্তু লোকে জানল সে কৈকেয়ীর অন্যতম বিশ্বস্ত পরিচারিকা। তাই, সমাদরের কোন অভাব ছিল না তার। সকলে তাকে খাতির করল। তার সরস কৌতুকপ্রিয়তা, মিষ্টি আলাপ এবং শিষ্ট আচরণের জন্য এমনিতেই সকলের প্রিয় ছিল। রাজপ্রাসাদে মন্থরা বলতে সবাই অজ্ঞান। এই প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপনের দক্ষতাই ছিল তার রাজঅন্তঃপুরে খবর সংগ্রহের গোপন কৌশল। সামান্য আলাপে এবং কথাবার্তায় অন্যের মনোভাব বুঝে নিয়ে নিজের কর্মপন্থাকে সফল করে তুলতে পারত। কোন সময়ে কি কি কাজ করলে আরো বেশি খবর সংগ্রহ করা যায়, কিভাবে রাজ অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে জটলা পাকিয়ে তোলা যায় এবং সেই সংকট কি উপায়ে উত্তেজনায় পরিণত হয়, কাদের সঙ্গে সঙ্গোপনে কথা বললে কথাটি রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়, উত্তেজনায় পরিণত হয় এইব সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার বুদ্ধি মন্থরার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মতো জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে যেত। কিন্তু তার সুন্দর হাস্যদীপ্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে এমন তীক্ষ্ণ কৌশলজ্ঞানের অধিকারী সে। মন্থরার মেধাই তাকে অসামান্য সাফল্য দিল দাসী থেকে কূট রাজনীতিকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল সে। অথচ, কেউ তা ঘুণাক্ষরেও জানল না।

রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা নিয়েই দশরথ গোপনে যেসব কাজ করছিল তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর ছিল মন্থরার। অশ্বপতি তাকে কিছু না জানালেও বুদ্ধিমতী মন্থরা রহস্যটা ঠিকই অনুধাবন করেছিল। রাম দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান। সিংহাসন তারই পাওনা। তবু তার দাবি নিয়ে দশরথ নিজেই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন ছিল। অন্তঃপুরের পাঁচজনের মনে অযোধ্যার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নিয়ে এক জটিল সংশয় এবং দুরধিগম্য রহস্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে কে আগে আর পরে স্থির করা যায়নি। তাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়নি। পুরনারীদের কেউ শঙ্খধ্বনি দেয়নি। বেশ সময় নিয়ে রাজপুরোহিত ঘোষণা করল রাম জ্যেষ্ঠ এবং কৈকেয়ীর পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন যমজদ্বয় রামের জন্মের বেশ কিছুক্ষণ পর ভিন্ন নক্ষত্রে জন্মেছে। বিভ্রান্তির উৎপত্তি এখান থেকেই। তবু রাজরোষের ভয়ে তা চাপা রইল। দশরথের সিদ্ধান্তে সংশয়, দ্বিধা, রামের প্রতি তার পক্ষপাত পুষ্ট স্নেহ এবং ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবহেলা ও উপেক্ষা অনেকের মতো মন্থরার মনেও প্রশ্ন জাগাল। দশরথের মনের এই জটিলতা কেন, কি জন্য?

নিজের দপ্তরে বসে দশরথ সুমন্ত্রের সহায়তায় কয়েকটা চিঠিপত্রে খসড়া করছিল। এমন সময় দেখতে পেল একটি সুদৃশ্য কারুকার্য করা বৃহৎ শিবিকা রাজপ্রাসাদের সদর ফটক দিয়ে তার মহলের নিচে এসে থামল। একটু পরে একজন সংবাদবাহক সুমন্ত্রর কানের কাছে মুখ এনে খুব নীচু গলায় বলল : মহাতেজা বিশ্বমিত্র এসেছেন। মহারাজার সাক্ষাৎ অভিলাষী তিনি।

সুমন্ত্রর চোখের ইশারায় সংবাদদাতা সেখান থেকে প্রস্থান করল। সে চলে গেলে সুমন্ত্র বলল : মহারাজ, আপনার বার্তার পেয়ে ঋষিবর বিশ্বামিত্র নিজে এসেছেন। তাঁকে আমাদের ভীষণ দরকার।

দশরথের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল! সত্যিই খুব গভীরভাবে কি যেন এক চিন্তায় তন্ময় হয়েছিল দশরথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল : সুমন্ত্র, বিশ্বমিত্রকে বোধ হয় আমাদের আর প্রয়োজন হবে না। তাঁর আগমন নিরর্থক। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি হবে?

সুমন্ত্রর অবাক হওয়ার পালা। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে দশরথের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল : এসব আপনি কি বলছেন? তাঁকে আমন্ত্রণ করে অসম্মান করব কোন অধিকারে? আর আপনার মনে সে প্রশ্ন আসেই বা কেন?

দশরথ শান্ত কণ্ঠে বলল : দূতের মুখে তাঁর মতলবের কথা আগে জেনেছি। তাঁর সম্পর্কে

আর কোন কৌতূহল আমার নেই। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে সে যন্ত্রবৎ বলতে লাগল : রাম লক্ষ্মণের মতো বালককে তাঁর দরকার। নবীন রক্তের ডালিগ্রহণ করতে অযোধ্যায় এসেছেন তিনি। রাজরক্ত ছাড়া তাঁর দেবীপূজার বোধন হবে না। মানত রক্ষায় অযোধ্যা মহীপতির অযাচিত অনুগ্রহকে তাই বুকে তুলে নিতে এসেছেন। এই দুটি রক্তশতদল নাকি তাঁর বহু আরাধনার ধন। এরপর তাঁকে রাম লক্ষ্মণের অস্ত্রগুরু করতে আমার বুক কাঁপছে। আমার ভয় লাগছে। বিশ্বামিত্রের হাতে পুত্রদ্বয়কে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না। বহু আশা করে তাঁকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ আমার প্রতি।

মহারাজ, আপনি যা যা বললেন সব সত্য।

তুমিও তাহলে জান।

জানি রাজন। কিন্তু আপনি তাঁর সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হননি বোধ হয়। পুত্রদের অনিষ্ট আশঙ্কায় আপনি অত্যন্ত বিচলিত এবং বিভ্রান্ত। সংকেত থেকে আরো একটা অর্থ বেরিয়ে আসতে পারে তা আপনার মনে হয়নি। স্নেহের স্বভাবই অকারণ অনিষ্ট আশঙ্কা করা।

আরো স্পষ্ট করে বল।

মহারাজ, রাক্ষসদের অত্যাচারে মুনিরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তাদের নির্মূল করার সাধ্য বর্তমানে কোন ক্ষত্রিয় আর্য রাজার নেই। সকলে রাক্ষসরাজা রাবণের ভয়ে কম্পিত। রাবণকে চটিয়ে কেউ কিছু করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ, আর্য সাম্রাজ্যগুলি বহুধা বিভক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত। আত্মকলহে, বিভেদের অন্তঃস্রোতে, অন্তর্ঘাতে, অবিশ্বাসে, সন্দেহে, বিদ্বেষে, ঘৃণায়, শত্রুতায় দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তাদের আত্মবল, বাহুবল বলে কিছু নেই। তাদের এই দুর্বলতা। ভীরুতা, কাপুরুষতার সুযোগ নিয়ে রাক্ষসশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যে মুনি ঋষিরা আর্যসভ্যতার দীপবর্তিকা বহন করে বেড়িয়েছে দেশে দেশান্তরে; যাদের সাহসে তেজে, বুদ্ধিতে, অলৌকিক ক্ষমতায় আর্য সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপিত হয়েছে, তাদের মনোবল সাহস ভাঙার জন্য রাক্ষসেরা নানাভাবে উৎপীড়ন চালাচ্ছে,— যজ্ঞভূমি অপবিত্র করেছে। তপোবন তছনছ করেছে। অথচ, আর্যনৃপতিরাই মুনি ঋষিদের রক্ষক। কিন্তু তারা কেউ এগিয়ে এল না তাদের সাহায্যে। মুনি ঋষিরা অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায়বোধ করতে লাগল। এরকম একটা দুঃসহ অসহায়তা থেকে পরিত্রাণ পেতে রাজর্ষি বিশ্বমিত্র বালক, কিশোর ও তরুণ; যাদের মস্তিষ্কে স্বার্থচিন্তা ঢোকেনি, পাপ প্রবেশ করেনি, দুষ্টবুদ্ধি জাগেনি, আপন পর বিচার করতে শেখেনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে যাদের যৌবন চঞ্চল, তাদের নিয়ে এক বাহিনী গড়ে তুললেন সংগোপনে। এই সব নবীন বয়সের ছেলেদের কাছে আদর্শবাদ বড়। তাদের কাছে দেশ ও জাতির চেয়ে বড় কিছু নেই। এই তরুণ প্রাণকে আত্মনিবেদনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করা সহজ। এরাই পারে অকাতরে, নির্ভাবনায় প্রাণ দিতে। কিন্তু রাজবংশের কোন সন্তান বিশ্বামিত্রের গুপ্তবাহিনীতে ছিল না, রাম-লক্ষ্মণকে দিয়ে ঋষি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চান। রাজচক্রবর্তী ব্যতীত এই মহাযজ্ঞের ভার গ্রহণ করবে কে? তারা ছাড়া সশস্ত্র গুপ্ত বাহিনীর অধিনায়কত্ব করবে কে? সাংকেতিক ভাষায় ঋষিবর সেই কথাই বলেছেন : রাজরক্ত ছাড়া দেবীপূজার বোধন হয় না। আর সে পূজার অর্ঘ্য সাজাতে হয় রক্ত শতদল দিয়ে। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর বহু প্রতীক্ষার ধন, আর, অনেক প্রত্যাশার সম্পদ। সুতরাং, তাঁর কথায় ভয় পাওয়ার কি থাকতে পারে? ঋষি বিশ্বামিত্র এক কালের অপরাজেয় মহাযোদ্ধা। তাঁর শেখা বিদ্যার ধরে এখনও নষ্ট হয়নি। অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র নির্মাণে তাঁর বুদ্ধি ও মেধা অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। বহু দুর্লভ অস্ত্রের নির্মাতা তিনি। কিন্তু সে সব অস্ত্র তৈরির পদ্ধতি এবং প্রয়োগ কৌশল গোপন রাখার জন্য এক যোগ্য বীরের অন্বেষণ করছেন। মন্ত্র গুরু বশিষ্ঠের মুখে রাম-লক্ষ্মণের বিক্রম, অস্ত্র ক্ষেপণে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা, নিখুঁত নিশানার দক্ষতা, সাহস শক্তি, তেজের কথা শুনে বিশ্বামিত্র পরম প্রীত হয়ে অযোধ্যায় পদার্পণ করেছেন। মহাতেজা ঋষির বিশ্বাস তাঁর তেজ প্রতিহিংসা ক্রোধের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের বিক্রম এবং পৌরুষ যুক্ত হলে এক নতুন সুস্থ, সুন্দর বাসযোগ্য আর্যভূমি হয়তো

সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্বামিত্রের আদেশে, ইচ্ছায়, নির্দেশে সব কার্য সংঘটিত হবে, কিন্তু তিনি থাকবেন নেপথ্যে।

এতো সাংঘাতিক কথা। জেনেশুনে বালকদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে পারি না, সুমন্ত্র।

রাম লক্ষ্মণকে কৃতিত্বের যশভাগী করতে চান ঋষি।

তুমি কি পাগল হয়েছ? দুরন্ত রাক্ষসদের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি, সাহস যেখানে আর্য নৃপতিদের নেই, সেখানে দুই বালক কি করবে? মূঢ়ের মতো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণকে বীরত্ব বলে না। আমি পুত্রদের হঠকারিতা করতে পাঠাব না। বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য যাই হোক, রাম-লক্ষ্মণকে বাদ দিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। এরা ছাড়া, আরো অনেক রাজপুত্র আছে।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই সুমন্ত্র। তাঁকে আমি শুধু রামলক্ষ্মণের অস্ত্রগুরু করতেই চেয়েছি। ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মেলামেশা দিন দিন এত গভীর এবং আন্তরিক হয়ে পড়ছে যে, আমি আর বিচলিত না হয়ে পারছি না। এই ঘনিষ্ঠতা একদিন নিদারুণ সংকট হয়ে উঠবে। তাই রাম-লক্ষ্মকে কোথাও সরাতে চাই, চোখের আড়াল করার জন্যই বিশ্বামিত্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে পাঠানো। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, অস্ত্রশিক্ষার নামে এখনই কোন রক্তক্ষয়ী বৃহত্তর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে তাদের অমূল্য জীবনকে বিসর্জন দিক।

হাসি হাসি মুখ করে সুমন্ত্র প্রশ্ন করল, মহারাজের অভয় পেলে অধম তার কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে পারে।

উত্তম! সম্মতি দিলাম দিলাম।

অযোধ্যা থেকে রাম-লক্ষ্মণকে সরানোর কোন কারণ হয়নি। তবু, মহারাজ তাদের সরানোর প্রয়োজন বোধ করেন। এর গোপন রহস্য আমাদের জানার কথা নয়। কেবল অনুমানে মহারাজের অব্যক্ত অনেক অভিব্যক্তিকে বুঝতে পারি। মহারাজার মনের গতির উপর চোখ রেখেই আন্দাজে কাজ করে যাই। আর তাতেই নাগালে পাই তাঁকে। এখন আপনার মনকে বুঝতে আর কষ্ট হয়না। রাম ভরতের জন্মের আগেই যা একটু অসুবিধা হতো।

দশরথ সুমন্ত্রের কথায় চমকাল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে নিজের বিব্রত ভাব গোপন করল। মাথা নিচু করে ছিল দশরথ।

সুমন্ত্রর চোখে বিস্ময়। ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঝিলিক। একটু থেমে সুমন্ত্র পুনরায় বলল : রাজমহিষী কৌশল্যার পুত্রের প্রতি মহারাজের গোপন দুর্বলতা রাম ভরতের জন্মদিনেই জেনে ফেললাম। কেন অবশ্য বলতে পারব না। তবে, অনুভূতি আর বুদ্ধি দিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়াকে পরিমাপ করতে কোন কষ্ট হল না। দু'জনেই আপনার ঔরসজাত সন্তান তবু আপনার এই পক্ষপাতিত্ব কেন? বুকের অতলান্ত থেকে জিজ্ঞাসার জবাব পেলাম একসময়। রাম ভরতের মধ্যে একজন হল আর্য রমণীর গর্ভজাত, অন্যজন হল আনর্য রমণীর গর্ভ-সম্ভূত। বিভেদ, বিদ্বেষের বীজ এই আর্য আনার্যবোধের অঙ্কুরিত। অনার্যশ্রী কৈকেয়ীর পুত্র আর্য কুলতিলক দশরথের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক এটা আদৌ মহারাজের পছন্দ নয়।

দশরথ অবাক বিস্ময়ে সুমন্ত্রের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল : তুমি কেমন করে জানলে?

সুমন্ত্রের অধরে বিচিত্র হাসি বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। আস্তে আস্তে বলল : রানীরা গর্ভবতী হলে, মহারাজ নিজেই কৌতূহলী হয়ে আর্য-অনার্যর বিরোধ ও সমস্যা নিয়ে কত প্রশ্ন করেছেন, আজ অবশ্য সে সব কথা স্মরণে নেই আর। মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির এই প্রতিক্রিয়া কেন হতো ঘৃণাক্ষরে কখনো প্রকাশ করেননি। নিজের বুকেই তার নিদারুণ যন্ত্রণা দাহ এবং কষ্ট বয়ে বেড়িয়েছেন। অন্তরাল থেকে আমাদের প্রিয় রাজাকে সেই দুঃসহ কষ্ট ভোগ করতে দেখে নিজের মনে পরিতাপ করেছি। আর, তার কষ্ট লাঘবের জন্য কামনা, বাসনা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য এবং অদৃষ্টের কৌতুককে উপহাস করার জন্য মহারাজের পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছি। এজন্য ন্যায়ধর্ম, বিবেক কিছু মানিনি।

বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ বিস্ময়ে সুমন্ত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দশরথ। বোধ হয় তার কোন অনুভূতিই ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল। কেবল শুকনো অধর থর থর করে কাঁপছিল। সুমন্ত্র কথার জালে জড়িয়ে তাকে কি করতে চাইছে সে তার কূলকিনারা করতে পারল না। এই সব চিন্তা ক্রমেই তাকে দিশাহারা করল। মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হল।

সুমন্ত্র অন্যমনস্ক। চোখ বুজে সে অন্য কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কত কথা মনে পড়ে গেল। দশরথের চারপুত্রদের খুব সদ্ভাব। চার ভাই হরিহর আত্মা। কারো প্রতি কারো ঈর্ষা, বিদ্বেষ নেই। তাদের ভ্রাতৃপ্রেম দেখলে মনে হয় স্বর্গের পবিত্র ভালবাসা যেন নেমে এসেছে ধরায়। একের পর এক বক্তব্যকে মনের ভেতর গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় বলল : ভরত মাতুলালয় থেকে ফেরার পরেই মহারাজার মধ্যে আবার বিবিধ প্রতিক্রিয়া ও মানসিক অস্থিরতা নতুন করে চাড়া দিল। অঙ্কের মতো আমাদের মনের জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল।

মহামাত্য বশিষ্ঠর কাছে রাম লক্ষ্মণের মতো ভরত শত্রুঘ্নও একত্রে শাস্ত্র ও শস্ত্র অধ্যয়ন করত। চার কুমারেরই মেধা ছিল তীক্ষ্ণ। সর্ববিদ্যায় সমান পারদর্শী তারা। স্বভাবে আচরণে ভরত ছিল এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভ্রাতৃবৎসল, বিনয়ী, নম্র, শান্ত, তার বাণী মধুর সান্নিধ্য রজনীর চন্দ্রিমার মতোই মনোরম ও স্নিগ্ধ। কুমারদের কথাবার্তার মধ্যে ভরত-শত্রুঘ্নের কথা উঠলেই দশরথ নিজের অজান্তে অশান্ত ও অস্থির হয়ে পড়ত। হঠাৎ, একদিন রাম-লক্ষ্মণের শিক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের কাছে এক দূত গেল। কৈকেয়দের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে আলাদা করে দেখার এবং তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মধুর সম্প্রীতির মধ্যে একটা দেয়াল তোলার এই প্রবণতা তার মতো অনেকের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগাল। রাজার এই দুমুখো নীতি কেন? রহস্যের মনগড়া একটা কিনারা করেও নিলাম। এদিকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজানুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজা ভোগবিলাসীর পদ। তাদের কোন ত্যাগ নেই, দুঃখবরণের আদর্শ নেই। কৃচ্ছ্রতা বরণের মনোবল নেই। নির্বিকার আত্মসুখী। নিজস্ব জগতে তাদের বাস। বাইরে যে একটা বিরাট অচেনা পৃথিবী আছে তার কিছু জানে না তারা। সুতরাং রাজকুমারদ্বয়কে দিয়ে তাঁর কোন কাজ হবে না। তিনি চান নতুন প্রজন্ম। অবশেষে বশিষ্ঠের ইচ্ছেতেই তিনি রাজপুরীতে এলেন।

সুমন্ত্রর কথা শুনতে শুনতে দশরথ স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। ভ্রু কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্বেগ। চোখ দুটি প্রবল সম্মোহনে যেন আটকে আছে সুমন্ত্রর চোখে। কথাগুলো সব সত্য বলেই নীরব ছিল দশরথ। অকস্মাৎ বিশ্বামিত্রে আগমনে দশরথ একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। রামের বিপদের কথাই বেশি করে ভাবছিল। আর বুকের ভেতর কেমন একটা অস্থিরতা তাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে অনুচ্চস্বরে বলল : সুমন্ত্র তুমি আমার প্রিয় সখা। তবু কাজটা ভাল করনি। রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে পারি না।

কুমারদের মঙ্গলের কথা ভেবেই আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছি।

উত্তম। পাদ্য-অর্ঘ্য এবং উপযুক্ত দান-দক্ষিণা দিয়ে তাঁকে বিদায় কর।

মহারাজ!

আমি নিরুপায় সুমন্ত্র।

রাজন, আমি আপনার একান্ত বাধ্য অনুগত ভৃত্য মাত্র। প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। রাজাদেশ মান্য করাই আমার কাজ। তবু সখা বলে যখন স্বীকার করলেন তখন প্রশ্নের অধিকার জন্মেছে। আপনার আপত্তির কারণ জানতে পারলে সংশয় দুর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে সরযূর বহমানতার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দশরথ বলল : সুমন্ত্র আমার উৎকণ্ঠা যে প্রকৃত কোথায় তা ঠিক তোমায় বোঝাতে পারব না। আজকাল কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয়, সকলে আমার শত্রুতা করার জন্যে কেকয়রাজের সঙ্গে কোমর বেঁধেছে। বিশ্বামিত্রকেও আমার বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে। রাম-লক্ষ্মণের অনিষ্টের চক্রান্ত করতেই হয়ত এরকম একটা রাক্ষস নিধনের মতো দুরূহ কাজের ষড়যন্ত্র আর পরিকল্পনা হয়েছে। তোমাকে বলতে বাধা নেই, বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য আমার ভাল ঠেকছে না।

রাক্ষসদের নির্মূল করার জন্য রাজশক্তি রয়েছে। আর্যাবর্তের বহু শক্তিশালী রাজা আছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে যে কাজ করা যেত সহজে, তাকে এমন জটিল করে তুললেন কেন? রাক্ষস নির্মূল করার নাম করে তিনি রাম লক্ষ্মণকে কৌশলে বধ করার ব্যবস্থা করছেন বলেই আমার সন্দেহ। এই সংশয় দূর না হওয়া পর্যন্ত কুমারদ্বয়কে তাঁর হস্তে সমর্পণ করব না।

মহারাজ আপনার আশঙ্কার কথা শুনে আমি আতঙ্ক অনুভব করছি। বিশ্বামিত্রকে অবিশ্বাস করার মতো কোন কারণ ঘটেনি। তাঁকে কেকয়রাজের গুপ্তচর ভাবার কোন কারণ হয়নি। তিনিও আর্য রাজবংশের একজন। আপনার পরম বান্ধব। তাঁকে শত্রু মনে করছেন কেন? রাম-লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট চিন্তা তিনি কখনই করতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত কুমারদ্বয় কৈকেয়ীর অত্যন্ত প্রিয়। পুত্রাধিক স্নেহ করেন তাদের। তবু এসব কথা আপনার মনে এল কেন?

সুমন্ত্র, তোমরা আমাকে খুব ভালবাস তাই না?

মহারাজ।

সুমন্ত্র আমায় কি খুব ক্লান্ত লাগে? সব সময় বিমর্ষ ভাবনায় জর্জরিত। আমার বাইরেটা দেখে কি বুকের অস্থিরতা টের পাও?

মহারাজ, আপনার কষ্টের সঙ্গী হতে পারলে, দুঃখের ভাগ নিতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।

তুমি ঠিক বলেছ, আমি নিঃসঙ্গ। ভীষণ একা। আমার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কেউ সাথী নেই। আমি একাই সব ভার বয়ে বেড়াই।

আপনার মতো ভাগ্যবান কে আছে? তবু নিজেকে আপনি যখন দুঃখী বলেন তখন খুব আশ্চর্য লাগে। ভেবে অবাক হই, একি আপনার দুঃখ বিলাস? না নিজের সঙ্গে নিজের কৌতুক, না, কোন বিভ্রান্তি? কিংবা কোনটাই নয়!

সুমন্ত্র, একটা অপরাধবোধের দংশনে আমার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না।

রাজার সহস্র অপরাধে কিছু যায় আসে না। রাজা কোন অন্যায় করতে পারে না। তবু কেন একটা পাপাবোধের কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় কাতর আপনি?

তোমার কথা ঠিক। জীবনে আমিও অনেক অনিয়ম করেছি। স্বেচ্ছাচারী হয়েছি। কিন্তু সে সব নিয়ে কোন অনুতাপ আমার নেই। হঠাৎ, একটা বিরাট ভুলের কাছে মোহের বশে দাসখত লিখে দিলাম। সেই হল আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। নিজেকে নিয়ে এরকম বিব্রত হইনি কখনও!

মহারাজ, আপনার দুঃখ আর কষ্টের কথা বলতে যদি কষ্ট হয়, আপনার সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তা-হলে অবশ্যই সে কথা বলে বিড়ম্বনা ভোগ করবেন না।

না না। আমি একটুও তা মনে ভাবছি না। আমিও বুকের ভেতর চাপা কথার ভার সইতে পারছি না। তুমি আমার একান্ত আপনার। তোমাকে সব কথা বলতে পারলে আমি অন্তত একজন সঙ্গী পাব।

সুমন্ত্র হাসল। বলল : মহারাজ আপনার নিষিদ্ধ কথা শোনার কোন কৌতুহল আমার নেই। আমি বরং ঋষিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দান করে পরিতুষ্ট করি।

আরেকটু থাক। দশরথের বুকের মধ্যে একটা ঝোড়ো বাতাসের দোলা। মনে একটা আলো আঁধারির আবহাওয়ায় কত চিন্তার ছবি ভেসে উঠল। ছিঃ ছিঃ করে উঠল বুকের ভেতর। নিজের অজান্তে অপ্রতিরোধ্য লজ্জায় মুখ আড়াল করতে জানালার ধারে সরে গেল। তারপর গভীর গোপন কথা বুক তোলপাড় করে ছোট্ট একটা ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

জান সুমন্ত্র। তোমাকে খুব স্নেহ করি। সব কথা ভেঙে বলতে লজ্জা করে। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে দশরথ বলতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর যেন সাঁওতালি মাদলের মতো গুর্ গুর্ করে বাজতে লাগল। এক রহস্যময়ী নারীর দুর্বার আকর্ষণ আমি কাটাতে পারিনি। নিয়তির

মতো সে আমাকে টেনেছে। সম্মোহিতের মতো তাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে বরণ করেছি। আমার সাম্রাজ্য, রাজ ঐশ্বর্য সিংহাসন সব দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি তাকে। এমনকি তার গর্ভজাত পুত্র ছাড়া আমার অন্য পুত্রদের মোহবশত বনে নির্বাসিত করব তাও প্রতিজ্ঞা করেছি। বিগ্রহ সাক্ষী রেখে শপথ করছি। সেদিন কি জানতাম, দেবতা আমাকে নিয়ে কৌতুক করবে? বিশ্বাস কর, পুত্রের মুখ দেখব বলে এ রকম একটা অদ্ভুত শর্তে রাজি হলাম। কিন্তু এরকম কোন সমস্যার যে সৃষ্টি হতে পারে সেদিন মনে হয়নি। ভাগ্য বোধ হয় পুত্রের সাধ পূরণ করতেই এমন কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করল। তাই অক্লেশে জীবনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই কৈকেয়ীকে মহিষীরূপে বরণ করলাম। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আমার তিন রানীরই সন্তান হল। এখন আমি কি করব সুমন্ত্র? ভাগ্য আমাকে প্রতারণা করেছে। রাম আমার হৃৎপিণ্ড। তাকে উপড়ে ফেলে কেমন করে বাঁচব? কি নিয়ে থাকব? কেমন করে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাব? আমার জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করছে এই প্রতিজ্ঞা। আমার শপথের মধ্যবর্তী হয়ে যে দেবতা বিরাজ করছে তাকে কিছুতে বিস্মৃত হতে পারছি না। একদিকে আমার ধর্ম, অন্যদিকে আমায় আকাঙ্ক্ষা; এই দুয়ের সংঘাতে আমি জর্জরিত। কি করলে ভাল হয়, সংকট থেকে উদ্ধার পাই, বলতে পার?

সুমন্ত্র নির্বাক। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও বলতে পারল না।

দশরথ অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে রইল। এখন অনেক শান্ত, স্থির সে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গলাটা সামান্য নামিয়ে সুমন্ত্র বিব্রত ভাবে বলল : মহারাজ, সত্যিই বিধাতা বড় রসিক। এক হাতে দিয়ে অন্যহাতে নিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত জমাখরচের হিসাব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার অবকাশ থাকে না। ভাগ্যের কৌতুক বড় নির্মম। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পথ বন্ধ। লক্ষ্য জয়ের পথ আপনাকে কৌশলে তৈরী করে নিতে হবে। রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বার্থ ও সুবিধা। আদর্শ তারপরে। রাজনীতি কূটনীতির গোপন খেলায় লক্ষ্য জয়ের পথ তৈরী হতে পারে। ধর্ম, আদর্শ, ন্যায় বিবেক ওসব সাধারণ মানুষের জন্য। রাজনৈতিক খেলায় ওর কোন মূল্য নেই। এখন কি উপায়ে আপনার স্বার্থ নিরাপদ এবং বাধামুক্ত করা যেতে পারে তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। এ কাজে বিশ্বামিত্র আমাদের প্রচণ্ড সহায় হতে পারেন। তাঁকে বরং আপনার কাছে ডেকে আনি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুমন্ত্রের কথাগুলো গিলছিল দশরথ। বিশ্বামিত্রের কথা শোনা মাত্র সংবিৎ লাভ করল সে। নিজের এক অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। না, কক্ষনো না। রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে পারব না।

কেন পারবেন না? দুর্বলতা আপনাকে মানায় না। কঠিন সমস্যা জয় করার মনোবল চাই! কারণ আপনার সততা এবং ধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য প্রয়োজন বিনীত এক মুখোশ। রাম ভরতকে নিয়ে ক্ষমতার যে লড়াই, সে আপনার নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। পিতার সঙ্গে পুত্রের, স্বামী সঙ্গে স্ত্রীর, রাজার সঙ্গে রাজপুত্রের। এ সংঘাত ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের। এ এক অদ্ভুত আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ। শঠতার সঙ্গে শঠতা এবং মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যার। এর থেকে কারো পালানোর উপায় নেই। কারণ আমরাও কর্তব্যবোধে, প্রেমে আপনার নিজস্ব সংঘাতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব।

তোমার কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় করছে। তোমাকে আমার দুর্বলতার কথা জানিয়ে ভুল করেছি।

রাজনীতির এই কদর্য চেহারা দেখে লজ্জা বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসব না থাকলে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কোন মানে হয় না। সাম্রাজ্য, সিংহাসন অধিকার করতে গিয়ে কে কবে কোন নীতির পরিচয় দিয়েছে? নীতি দুর্নীতির চিরন্তন মাপকাঠি রাজনীতিতে কোনদিন নেই। রাজনীতির কারবার বাস্তব নিয়ে। বাস্তবে যা হতে পারে বা হওয়া সম্ভব তাই মনে রেখে আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। সংঘর্ষের যে আগুন আপনার বুকে অহরহ জ্বলছে একদিন তা সমগ্র অন্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়বে। রজ্যে রাজ্যে তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লেও আশ্চর্য হব না।

সুমন্ত্র আমার ভীষণ ভয় করছে! তুমি আমার সহায় হও।

মনের উদ্দেশ্যেকে গোপনে রেখে, বিরোধ এড়িয়ে লক্ষ্যের পথে যেতে হলে দরকার অনেক কৌশল, কূটবুদ্ধি এবং পরিকল্পনার। বিশ্বামিত্রের আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে মেলাতে পারলে আমরা এক বিরাট জয় আদায় করে নিতে পারব।

দশরথের সর্বশরীর থর থর করে কাঁপল। কণ্ঠ রুদ্ধ হল। দুই চোখে তার একটা অসহায়ভাব ফুটল। সুমন্ত্রর নির্নিমেষ চোখে তার অস্থিরতা ধরা পড়ল। দশরথ বড় বেশি দুর্বল এবং অসহায় এক মানুষ। আবার খুবই আত্মনির্ভরশীল এবং দুঃসাহসী। এক অদ্ভুত বিরুদ্ধ প্রকৃতির মানুষ। সুমন্ত্র কথা বলার মধ্যে পলকের জন্য একবার দেখল তাকে। দশরথকে রূঢ় বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যই বলল : উঁহু, মহারাজ বিচলিত হবেন না। রাজনীতিতে চিত্ত দুর্বলতার কোন স্থান নেই। ক্ষমতার উত্তাপে রাজনীতির গর্ভদেশ সর্বদা জ্বলে। তন্ত্র যাই হোক বাইরের লড়াই ছাড়া রাজনীতি নেই। বৃহস্পতির এসব রাজনৈতিক তত্ত্ব আপনার অজানা নয়। আপনাকে স্মরণ করে দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা অনায়াসে বিশ্বামিত্রের কল্যাণমূলক মানবসেবাকে রাজনীতি করে তুলতে পারি। রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে পাঠিয়ে আমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারব।

দশরথের মুগ্ধ চোখে বিস্ময়। সুমন্ত্রর কথাগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে গিলতে লাগল। দশরথের মুখ গম্ভীর এবং থমথমে। পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিল। তার দিকে একবার আড়চোখে তাকাল সুমন্ত্র। তারপর বলতে লাগল : এর ফলে ভরত শত্রুঘ্নর কাছ থেকে রাম লক্ষ্মণও দূরে দূরে থাকতে পারবে। অন্যদিকে বিশ্বামিত্রর অস্ত্রশিক্ষায় দিন দিন তারা দক্ষ ও বলশালী হবে। নতুন নতুন অদ্ভুত অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করে এক অসাধারণ যোদ্ধা হয়ে উঠবে। এটাও এক বড় লাভ আমাদের। অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর বিশ্বামিত্রের নির্দেশমতো গুপ্ত বাহিনীর সঙ্গে তারা একত্রে লড়বে। এই যুদ্ধ রাক্ষসদের অত্যাচার যদি নির্মূল নাও করে, তাদের উৎপাত অন্তত কিছুটা কমবে। আর্যশক্তির উত্থানে তারা ভীত ও বিব্রত বোধ করবে। রাক্ষস দমনের সব গৌরব খ্যাতি দলের অধিনায়ক রাম-লক্ষ্মণের প্রাপ্য হবে। কারণ গুপ্তবাহিনীতে তারাই একমাত্র রাজপুত্র। নেতৃত্ব ও বাহিনী পরিচালনার অধিকার বিশ্বামিত্র তাদের দুভাইকে যে দেবে তা বলা বাহুল্যমাত্র। লোকে ধীরে ধীরে জানবে রাম-লক্ষ্মণ দুর্গত এবং উৎপীড়িত মানুষেয় দুঃসময়ের বন্ধু ও সহায়। তাদের সেবা ও কল্যাণের জন্য রাজপ্রাসাদের বিলাস, আরাম, আনন্দ, সুখ সব ত্যাগ করেছে তারা। শুধু তাই নয়, রাম যে নিজের দেশ এবং দেশের মানুষকে বাস্তবিকই ভালবাসে এই বোধ যত প্রবল হবে, সিংহাসনে রামের দাবি ততই সুনিশ্চিত হয়ে ওঠবে। দেশের উত্তরাধিকার বইতে পারার মতো যে মানুষ বিশ্বামিত্র তৈরী করল আর্যাবর্তের নেতৃত্বে সে থাকবে না কেন? এই জিজ্ঞাসাই রামের সিংহাসন লাভের পথে সব বাধা ও বিরুদ্ধতাকে অনায়াসে জয় করতে পারে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে নিজেদের অনুকূলে ঘুরিয়ে নেওয়ার অস্ত্র হয়ে ওঠতে পারে আমাদের। কেকয়রাজের যে দাবি এবং যুক্তিই থাকুক এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্যাবর্তের নেতৃত্বের দাবিকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবে না। আপনাকেও সত্যভঙ্গের জন্য দায়ী হতে হবে না।

দশরথ নির্বাক। কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না তার। সরল দুই চোখে অগাধ বিস্ময়। বিভোর বিহ্বলতা। সমস্ত শরীর আর হৃদয় দপদপিয়ে উঠল এক অদ্ভুত স্বস্তির উল্লাসে। নিঃশব্দ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে উঠে এল তার। হাসি হাসি মুখ করে বলল : সুমন্ত্র, তোমার মন্ত্রণা চমৎকার। নামের সঙ্গে তোমার মন্ত্র ও মন্ত্রণার মিল অপূর্ব। তোমার তুলনা তুমি। আমাকে তোমার আলিঙ্গন দাও।

সকালের রাঙা আকাশ থেকে লাল রঙ গলে গলে পড়ছিল সরযূর জলে। সেইদিকে এক জ্বালাভরা চোখে তাকিয়েছিল কৈকেয়ী। ভোরবেলায় শান্ত সুন্দর শ্রী অনুভব করার মতো মন ছিল না। বুকের

জ্বালায় অক্ষম রাগ, আর এক অব্যক্ত গভীর বেদনা; সুন্দর-শান্ত-স্নিগ্ধ-মনোরম ভোরবেলাটা হয়ে উঠল বিবর্ণ।

আনমনেই বাইরের দিকে তাকিয়েছিল কৈকেয়ী। বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে কিছু ভাবছিল গভীর হয়ে। একা একা বিশাল বারান্দা জুড়ে ক্ষিপ্তপ্রায়ের মতো ঘোরাফেরা করছিল। পিঠের উপর ঝুলে পড়া খোঁপাতে মাঝে মাঝে হাত দিচ্ছিল। কখনও বা তপ্ত মাথাটা চেপে ধরছিল। দু'হাতে কখনো চুলগুলো মুঠো মুঠো করে খামচে ধরছিল। একটা বিপুল কিছু উৎপাত চলছিল তার বুকের ভেতর। মন্থরা এর স্রষ্টা।

প্রকৃতপক্ষে, সে রহস্যের পর্দাটা একটানে খুলে দিয়ে দেখাল, রাজ অন্তঃপুরে কৈকেয়ী কত একা! কী ভীষণ নির্বান্ধব সে! পুত্র ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়ে কি দারুণ ষড়যন্ত্র চলছে ভেতরে ভেতরে—অথচ তার বিন্দু বিসর্গও জানে না সে। মন্থরা তাকে দেখার চোখ এবং বুদ্ধি জোগাল! মন্থরার কাছে সব শোনা থেকে মেজাজটা তার তিক্ত ও রুক্ষ হয়েছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না। এক প্রগাঢ় যন্ত্রণা তার বুকে থাবা গেড়ে বসেছিল। থেকে থেকে মনের ভেতর প্রশ্ন জাগল, সে কি তবে শত্রুপুরীতে বাস করছে? সুদক্ষ নটের মতো দশরথ তার সঙ্গে অভিনয় করছে কেন? স্বজন পরিবেষ্টিত এ কোন জঙ্গলে সে বাস করছে!

একটা অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ভরে উঠেছিল বারান্দা। পায়ের নীচে মৃদু একটা কম্পন মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিল কৈকেয়ী! সারা শরীরে এক অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনার তরঙ্গ বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বয়ে যাচ্ছিল। আর, তাতেই হাঁটুটা থরথরিয়ে কাঁপছিল! তীব্র অপমানে আর উত্তেজনায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার মুখচোখ। গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে মন্থরার কথাগুলো এক প্রবল সম্মোহনে তাকে আটকে রাখল।

দশরথ পিতা হয়ে নিজের ঔরসজাত ভরত ও শত্রুঘ্নকে শত্রুর চোখে দেখল কি করে? ভাবতে কষ্ট হল না? বুক ফাটল না, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তাদের আলাদা করে দেখতে? দশরথ এত নীচে নেমে গেল কি করে? কেমন করে ভাবল তার পুত্রেরাই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী তার? রাম লক্ষ্মণের শত্রু? ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বিভেদের এই দেয়াল তুলছে কেন? পিতা হয়ে এক দুগ্ধপোষ্য বালকের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করতে তার লজ্জা হল না? আত্মগ্লানি অনুভব করল না? দশরথের আচরণ কৈকেয়ীর মর্মস্থল বিদ্ধ করল। সমস্ত অন্তর তার ঘৃণায় রি রি করে উঠল। মনে মনে তাকে ধিক্কার দিতে লাগল : ছিঃ ছিঃ মহারাজা, তুমি ইক্ষবাকুসিংহ অজের গুহার সিংহশাবক নও, এক ধূর্ত বৃদ্ধ শৃগাল। তুমি নৃপতিকুলে লজ্জা। তুমি স্বামী, কি বলব তোমাকে? কৈকেয়ীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। দশরথের ব্যবহার তার মনকে আরো খারাপ করে দিল।

কানের পর্দায় মন্থরার কথাগুলো তখনো ঝংকারে বাজছিল। আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে মা? ওঠ, একবার নয়ন খুলে দ্যাখ—দুনিয়ার হালচাল কি? কোথায় কি ঘটছে? যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছ তা মাটি, না চোরাবালি তাও তুমি জান না। এত ছেলেমানুষ তুমি। তোমায় নিয়ে আমি কি করব? কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করাই, স্বামীর কপট অভিনয়ে তুমি সম্মোহিত। নিজেকে তুমি কতকগুলো বিশ্বাসের নিগড়ে বেঁধে রেখেছ। গণ্ডির বাইরে যেতে চাও না। তাই চোখ থাকতে অন্ধ। কিন্তু তুমি এখন আর একা নও। সন্তানের জন্য তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। পিতা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে, কিন্তু জননী কখনও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। তোমারও থাকা উচিত নয় এই কথাটা বোঝার সময় হয়েছে।

মন্থরার কথাগুলো কৈকেয়ীর শুনতে খুবই কটু লেগেছিল কিন্তু তার অভিযোগ নিরর্থক ছিল না। একটি বর্ণও সে মিছে বলেনি। তার সব বক্তব্যই ঠিক! প্রত্যেকটি ঘটনার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের ভেতর তার যথেষ্ট যুক্তি ও বুদ্ধির ধার ছিল। মন্থরা নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং

বিচক্ষণতার গুণে কেকয়রাজ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিল। মহারাজ অশ্বপতি তার কাজে মুগ্ধ হয়ে নিজের সপ্তমাণিক্যের সাতনরী কণ্ঠহার দিয়েছিল তাকে। শুধু তাই নয়, বিশেষ যৌতুক স্বরূপ স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় দিয়েছিল। কেকয়রাজের সে যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং কাছের মানুষ এ অঙ্গুরী ছিল তারই প্রতীক। মন্থরার বিশ্বস্ততার সাক্ষী। এই আংটির জোরেই তাকে বিশ্বাস করা যায়।

মন্থরা সত্যি কৈকেয়ীকে অবাক করল। এত অবাক সে আর কখনও হয়নি। তাই কিছুক্ষণ থম হয়ে বসে রইল চুপচাপ। কি করে বিশ্বাস করবে দশরথ পিতা হয়ে ভরত শত্রুঘ্নকে তার অবাঞ্ছিত সন্তান মনে করে। পিতৃস্নেহ এবং পিতৃরাজ্য থেকে তাদের উভয়কে বঞ্চিত করার জন্য এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে আছে গোপনে? কেমন করে জানবে, তার গর্ভজ পুত্রদ্বয় অযোধ্যার অভিশাপ? তাদের নিঃশ্বাসে বিষ? তাদের সান্নিধ্য থেকে প্রিয়তমক ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মনকে দূরে রাখার জন্য বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তাদের পাঠানো হল? দুরন্ত ক্রোধে কৈকেয়ীয় ঠোঁট বেঁকে গেল। অবিশ্বাসভরা চোখে মন্থরার দিকে চেয়ে থাকল। কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো জোর পেল না।

কৈকেয়ীকে নিরুত্তর দেখে মন্থরা তার ক্রোধের ইন্ধন জোগাল। বলল : মেয়ে মানুষের চোখ বোধ হয় সবই দেখতে পায়। তবে, সব ব্যাপারটা ভীষণ গোপন। মহারাজের সব কাজকর্মই একটা নিয়ম শৃংখলায় বাঁধা। তাই বাইরে থেকে তার কাজের ধারা পরিমাপ করে ওঠা যায় না।

নিজের অজান্তে একটা বড় শ্বাস পড়ল কৈকেয়ীর। বুকের অতলান্ত থেকে উঠে আসা একটা কষ্ট আর্তনাদের মতো তার কণ্ঠস্বরে ঝংকারে বাজল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল— ও কি চায়? তারপরেই উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত লাগিয়ে উচ্চারণ করল : কুব্জা, তুই যা বললি, একথা আর কেউ বললে তার গলা টিপে ধরতাম। তোর কথা অস্বীকার করবে এমন জোর নেই মনে। আবার বিশ্বাস করতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক স্নেহের ভালবাসার। কিন্তু সে সম্বন্ধকে এমন কালিমালেপন করায় কি সুখ মহারাজের? একটা দুরন্ত অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণায় কেন আবিল হয়ে উঠবে পিতার হৃদয়? স্নেহের জায়গায় ঘৃণা? ছিঃ ছিঃ! মুখের ওপর রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে বলল : পুত্রকে পুত্র হিসাবে দেখতে কিংবা কল্পনা করতে পারছে না। এর চেয়ে দুঃখের যন্ত্রণার আর কি হতে পারে? আমাকে ঘেন্না করা খুব কঠিন, তাই বোধ হয় আমার ছেলেদের ঘেন্না করে শোধ নিচ্ছে। আর, এই বিদ্যেটা আমাকেও পরোক্ষে শেখানো হল। ঘেন্না করা খুব সোজা। একদিন আমিও কৌশল্যা-সুমিত্রাকে করেছিলাম। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে পেয়ে সব বিদ্বেষ ভুলেছি। কৈ তাদের তো আমি অন্য চোখে দেখি না? ভাবি না, তারা আমার পর। ভরত শত্রুঘ্নের মত রাম-লক্ষ্মণের শরীরেও আমার স্বামীর রক্তধারা বইছে। তারাও আমার সন্তান। আমি তাদের ছোট মা। আমার নয়নমণি রাম, আর হৃৎপিণ্ড ভরতকে নিয়ে এই কুৎসিত ষড়যন্ত্র করছে কারা? ভাইয়ে ভাইয়ে মধুর স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধকে তার বিষিয়ে তুলছে কেন? এতে তাদের কি লাভ? স্বার্থই বা কি? অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে বিভেদ আনতে কে বা কারা ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করছে?

কৈকেয়ীর মুখে চোখে সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে উঠল। কিন্তু মন্থরার অধরে ধূর্ত হাসি। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল। তার হাসিতে কৈকেয়ী চমকাল। তার বুক থর থর করে কাঁপল।

কথা বলার সময় মন্থরায় দুই ভুরু কোঁচকাল। চোখের তারায় বিদ্যুৎ ঝলক দিল। আস্তে আস্তে বলল : সব কথা বলতে নেই। জানতেও নেই। ধীরে ধীরে নিজেই সব জানতে পারবে। তবে, নিজের স্বার্থকে যে না বোঝে সে নির্বোধ। নির্বুদ্ধিতার কোন দাম নেই সংসারে। হাতের তীর ফস্কে গেলে তাকে পস্তাতে হয়—এটা তোমার জেনে রাখা ভাল।

কুব্জা কথায় রহস্য। স্পষ্ট করে কথা বলতে তোর কি কষ্ট হয়?

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মন্থরা বলল : মহারাজ তোমার স্বামী। আমি এক সামান্যা দাসী। ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই। যদি একান্ত না শোন, তাহলে বলতে হবে। কিন্তু পতি নিন্দা

সইতে পারবে কি?

ও সব কথা ভাবিস না কুব্জা। তুই বল। মনটাকে আমি পাথর করেছি।

মন্থরা একটু গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিল। তারপর ভণিতা করে বলল : মেয়েরা লোকনিন্দা করতে এবং শুনতে ভালবাসে। আমি কিন্তু সেরকম কিছু করছি না। মহারাজের ভাবগতিক ভাল নয়, মেজাজ যে ভাল যাচ্ছে না—এটা বোধ হয় তুমিও বোঝ। তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কেমন জানি না। তবে, মহারাজ নিজেকে বড় বেশি নিয়ম শৃঙ্খলায় বেঁধেছেন। বাইরে থেকে তাঁর সুচতুর অভিনয়ের কিছুই বোঝা যাবে না। আমি কিন্তু সন্দেহের বীজ ছড়াতে আসেনি। এখানকার বাতাসে যেসব বার্তা জানতে পারা যায়, তাই জানি আমি।

কৈকেয়ীর চোখ মুখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর গনগনে হয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : কি জানিস তাই বল। তার রক্তের বিশুদ্ধতার শুচিবাই আমি ভাঙব।

মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে মন্থরা কখনও সংকোচ বোধ করে না। তবু কথা বলার সময় তার সুন্দর মুখখানায় আক্রোশ ফুটে বেরোল। চোখ হিংসায় জ্বলজ্বল করতে লাগল। বলল : মহারাজ তোমার অনুগত আর অনুরক্ত থেকে তোমাকে বোকা বানাতে চান। আফিমের নেশায় যেমন সহজে ঝিমুনি কাটে না। তেমনি প্রেমের ঘোর যায় না সহজে। মহারাজের প্রেমে মেতে আছ তুমি। নেশায় নেশায় আচ্ছন্ন। কেমন করে বুঝবে যে, এ প্রেম নয়, ছেলে ভোলানোর খেলা। খেলা ছাড়া কি? তুমি না বললেও মহারাজ বড় রানীর কক্ষে যাওয়া বন্ধ করেছেন। তোমাকে সন্তুষ্ট করতেই কৌশল্যার প্রতি অনাদর অবহেলা তাঁর বেড়েছে। অথচ, তুমি জান না,এতে কি ক্ষতি তোমার হল? কৌশল্যার সব রোষ পড়ল তোমার উপর। তার দুর্ভাগ্যের জন্য প্রকারান্তরে তোমাকেই দায়ী করল সে। এক দিন তুমি তাকে গৃহছাড়া করেছিলে, আজ দ্বিতীয়বার স্বামী থেকে বঞ্চিত করলে তোমাকেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবল। তার চোখে তুমি চিরশত্রু হয়ে রইলে। কোন দিন সে তোমাকে ক্ষমা করবে না। সব দিন সমান যায় না। ভবিষ্যতে এই লাঞ্ছনার যন্ত্রণা অপমান সুদে আসলে আদায় করবে কৌশল্যা। তোমার প্রিয়তমা স্বামী অনার্য-বিদ্বেষ বুকে নিয়ে কি কৌশলে কৌশল্যার কাছে তোমাকে অপ্রিয় করে তুলল। তোমার চির শত্রু করে রাখল তাকে। তাহলে দ্যাখ কত সন্দুর অভিনয় করেন মহারাজ দশরথ!

কৈকেয়ী পাষাণের মতো স্তব্ধ। অভ্যন্তরীণ রাগ উত্তেজনায় তার বুক কেঁপে উঠছিল। মুখেতে সামান্য বিব্রতভাব। চোখের কোণে কান্না থম থম করে। এরকম একটা নিষ্ঠুরতার ভেতর মন্থরা একরকম তীব্র আনন্দ অনুভব করল। কৈকেয়ীর থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে আদর করল। বলল : বোকা মেয়ে। রাগ কান্না নির্বোধের অস্ত্র। ওদিয়ে হৃদয় গলানো যায়, কিংবা ভাগ্যের চাকা ঘোরানো যায় না! বিচলিত হবে কেন? রথের রশি তোমার হাতে। এখনও অনেক কিছু জান না তুমি।

কৈকেয়ী স্তিমিত চোখে মন্থরার দিকে চেয়ে রইল। বুক জুড়ে তার এক অসহায় সমুদ্রের তোলপাড়। কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। মন্থরার স্পর্শকাতর মন তার অবস্থা দেখে কষ্ট বোধ করল। এক চৌম্বক আকর্ষণ প্রবল বেগে কৈকেয়ীকে তার দিকে টানতে লাল। এক অদ্ভুত নৈকট্যের স্বাদ তার বুকের ভেতর তৃপ্তি ছড়াতে লাগল। দশরথ যে তাকে খেলা শেষে ভাঙা পুতুলের মতো ছুঁড়ে ফেলে খেলা ভেঙে উঠে যাবে এই সত্যটাকে জানার জন্য কৈকেয়ী কোনদিন মনোযোগ দেয়নি। কৈকেয়ীকে অযোধ্যায় অন্তঃপুরে এত কাছে থেকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে যে, তার প্রতি একটা সুতীব্র স্নেহ আর মমতা জন্মেছে। আর এই মুহূর্তে তা যেন মোমের মতো তার বুকের ভেতর গলে গলে পড়তে লাগল। নিদারুণ দুর্ভাবনায় কৈকেয়ীকে চোখের সামনে অঙ্গার হয়ে যেতে দেখে মন্থরা অস্থির হল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল : অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ? তুমি কি জান না মানুষে মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক বলে কিছু নেই। আত্মীয়তা একটা সংস্কার মাত্র। মহারাজকে স্বামী বলে ভাবলে সে তোমার স্বামী, আবার যদি শত্রু মনে কর

তাহলে শত্রু।

কৈকেয়ী বিস্ময়বোধে হতভম্ব হয়ে আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করল—কি করে সেটা সম্ভব?

ওসব কথা ভেবো না। অন্য চিন্তা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখ! অতীতের একটা ভুল শোধরানোর জন্য মহারাজের এত কাণ্ড। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর তোমার পুত্রের কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব থাক এটা নিজে থেকে মহারাজ কখনও চায় না। নিজে থেকে তুমি যদি দাবি কর কখনো, তাই প্রেম প্রেম খেলনা দিয়ে তোমাকে অন্যমনস্ক করে রাখা। রামের প্রতি তোমার স্নেহ-মমতা-দরদ-আবেগকে দুর্বার আর দুর্বল করার জন্যই কৌশল্যার খাসমহল থেকে রামকে এনে তোমার চোখে চোখে রাখল। ঐ এক কারণে কৌশল্যাকেও অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনল। তোমার চোখের উপর কৌশল্যাকে উপেক্ষা করে প্রকৃতপক্ষে তোমাকেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই চাওয়া মহারাজের প্রেমে নয়, ঘৃণায়। তোমাকে বিভ্রান্ত করার অদ্ভুত কৌশল। মহারাজ চক্রান্ত করে তোমার পুত্রকে মাতুলালয়ে পাঠিয়েছিল, সে শুধু তোমার শূন্য বুকের স্নেহ দিয়ে রামকে বড় করে তোলার জন্য। রামের প্রতি তোমার বুকে দুর্বল ভাবাবেগ জাগানো ছিল মহারাজের উদ্দেশ্য।

কৈকেয়ী খুব আশ্চর্য হল। বুকের ভেতর জমাট, শক্ত পাথরের মত অমোঘ এক শীতলতায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। মাথাটা গুলিয়ে গেলে বারে বারে। চোখের উপর নানারকম দৃশ্য ভেসে ওঠল। তার সবটার কোন অর্থ হয় না। তবু তার ভেতর হারিয়ে গেল তার সত্তা। মন্থরার কথাগুলোর সঙ্গে জীবনের নানারকম ছবি তোলপাড় করতে লাগল। আর একটা অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে দাঁত টিপে ভিতরে এক তীব্র জ্বালায় সে মাথা নাড়ল। সরল বিষণ্ণ একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল আচমকা। কুব্জা!

অবাক হয়ো না মেয়ে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে কষ্টই হয়। কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে তো ভোলা যায় না। আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে বলি না। কার্যকারণ মিলিয়ে তুমি শুধু প্রকৃত ঘটনাগুলো মেলালে অঙ্কের মতো তার একটা উত্তর অবশ্যই পাবে। আচ্ছা বলত, সিংহাসনের দাবিদার হিসাবে ভরতকে কখনও কল্পনা করেছ তুমি? অথচ, নেপথ্যে তাকে নিয়ে এক ষড়যন্ত্র হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নই তোমার অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে। সিংহাসনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার। নিয়মানুসারে রামই অযোধ্যার রাজা হবে। তাহলে এর মধ্যে ভরতের কোন প্রসঙ্গ আসে না। কিন্তু মহারাজের চিন্তায় ভবত রামের সিংহাসনের মধ্যবর্তী হয়ে আছে। কেন? যে সিংহাসনের উপর ভরতের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই, তার দাবি সম্পর্কে মহারাজের কেন এই আতঙ্ক? তাহলে নিশ্চয়ই এর ভেতর কোন গূঢ় রহস্য আছে। নইলে, মহারাজের অন্তরে কেনা সংকট দেখা দিত না। অযোধ্যার সিংহাসনের ওপর ভরতের এমন কোন অধিকার আছে, যার দাবি অস্বীকার করার সাধ্য নেই অযোধ্যাপতির। তাই ভবতকে নিয়ে তোমার স্বামীর দুর্ভাবনা। সিংহাসনে রামের দাবি নিষ্কণ্টক করার জন্য রাজ অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে তাদের জন্মের সময় থেকে সকলের অলক্ষ্যে চলেছে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রে খেলা। মহারাজ এবং তাঁর মুষ্টিমেয় কিছু বিশ্বস্ত কর্মচারী ছাড়া সে কথা কেউ জানে না। তাদের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা তাঁর নেই বলে দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছেন। নিজের তৈরি জালের মধ্যে বাস করছেন।

কৈকেয়ী বোবা বিস্ময়ে মন্থরার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল। তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগল। তার গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তি মন্থরার নজর এড়াল না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করল সে। অমনি নিস্তব্ধতা আরো গভীরতর হল। নিঃশব্দে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস কৈকেয়ীর বুক থেকে উঠে এল। একটা ভীষণ কষ্ট অনেকক্ষণ ধরে তার বুকের ভেতর পাক খাচ্ছিল! তাই কথা বলতে পারছিল না। চোখে মুখে একটা ব্যথা ফুটে উঠল। এক সময় অতি কষ্টে শান্ত নিরীহ গলায় মন্থরাকে প্রশ্ন করল : মহারাজ পিতা হয়ে ভরত ও রামকে আলাদা চোখে দেখবেন কেন? এই সহজ সরল কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

কৈকেয়ীর সরল প্রশ্নের বিস্ময় মন্থরার হাসি উদ্রেক করল। অধরপ্রান্তে তার ধনুকের মতো বঙ্কিম

হাসি ফুটল। অদ্ভুত বিচিত্র সে হাসি। ভুরু কুঁচকে বলল : প্রত্যেক দেশের এবং পরিবারের একটা নিজস্ব নিয়ম, প্রথা, লোকাচার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য আছে। কোন কারণেই মানুষ তাকে জলাঞ্জলি দেয় না। দৃঢ়হস্তে তাকে আঁকড়ে রাখে। এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। রাম থাকতে অনার্য জননীর পুত্র ভরতকে আর্য সাম্রাজ্যের অধিপতি করার কোন কারণ নেই। আর্য পিতার আর্যত্ববোধ ঘা খাচ্ছে। তাই এই কুটিল রাজনীতির অবতারণা। সেজন্যেই আমার সন্দেহ রাম কখনও জ্যেষ্ঠ নয়। যে দুজন দাই এই ঘটনা জানত, প্রমাণ লোপ করার জন্য তাদের হত্যা করা হয়েছে।

কৈকেয়ী পলকের তরে কেঁপে উঠল। তাকে চমকাতে দেখে মন্থরা বলল : কিন্তু কোথা থেকে একথা শুনলাম, সে প্রশ্ন কর না আমায়। করলেও পাবে না উত্তর। নিজেকে প্রশ্ন করলে তোমারও মনে হবে, রাম যদি সত্যি জ্যেষ্ঠ হতো তাহলে সিংহাসনে ভরতের দাবির কথা আসত না। রাম জ্যেষ্ঠ নয় বলেই ভরতের অধিকারের কথা আসছে। ভরতকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মূলে আছে আর্যত্ববোধ। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, মহারাজের আর্যসংস্কারকে উস্কিয়ে দিল। নানাভাবে তাতে ইন্ধান যোগাল। সেইমত এক চক্রান্তও মাথা চাড়া দিল।

হালছাড়া গলায় কৈকেয়ী বলল : কুব্জা, তোমর সব কথা আমি বুঝতে পারি না।

কেমন করে পারবে মেয়ে? তুমি তখন সূতিকা ঘরে। তোমার পক্ষে কখনই জানা সম্ভব নয় ভরত ও রামের মধ্যে কে আগে জন্মেছে। আর তখন থেকেই ষড়যন্ত্রের শুরু এসব তুমি জানবে কোথা থেকে? কি করে তুমি বুঝবে, ভরত রামের জন্মের অব্যবহিত পরেই তড়িঘড়ি করে পুরোহিত এবং জ্যোতিষীদের ডেকে একটা সভা বসেছিল। ভবিষ্যতে কৌশল্যার পুত্রে সিংহাসন লাভের ব্যাপারটা পাকা করার জন্য সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠ চক্র কৌশল করে রামকে জ্যেষ্ঠ বলে ঘোষণা করল। মহারাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কিন্তু মানুষ এক ভাবে, ঈশ্বর আর একরকম করে রাখে। প্রদীপের তলাতে যে ঘন অন্ধকার জমে আছে সুমন্ত্র বশিষ্ঠ তা টের পেল না।

কৈকেয়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে!

এত অল্পেতে ভেঙে পড়লে হবে? এখনও নিজেকে শুধু ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। ভাঙা-গড়ার কাজ সবে শুরু। মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য একটু কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, আত্মগ্লানি তো থাকা স্বাভাবিক। সোনা তো পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়। তোমাকেও অনেক পুড়তে হবে।

মন্থরা আড়চোখে কৈকেয়ীর থমথমে দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামল। বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস নামল ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে তার মুখের মাংসপেশী শক্ত হল। ভুরু কুঁচকে গেল। যাক। হাজার হোক মহারাজ তোমার স্বামী। তাঁর সম্বন্ধে এত কঠিন কথা বলা আমার শোভা পায় না। তবু বললাম, মহারাজ কেকয়ের ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যও একসূত্রে বাঁধা। সেইকথা সব সময় মনে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করেছি। আমার কোন অসতর্কতা এবং গাফিলতির জন্য তাঁর কন্যা এবং দৌহিত্রের কোনো বিপদ বা অসম্মান যাতে না হয় সেকথা বলে সাবধান করা আমার কর্তব্য। আমি শুধু সেই কর্তব্য করলাম। মনে রেখ, এ পুরীতে তুমি ছাড়া তোমার পুত্রদের আর কেউ আপনজন নেই।

মন্থরার কথাগুলো কৈকেয়ীর মস্তিষ্কে চিকুর হানা মেঘের মতো দপদপ করতে লগাল? কৈকেয়ী কিছু বলবার আগে মন্থরা প্রস্থান করল।

তারপর থেকেই সে ভীষণ অশান্ত এবং অস্থির। নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে মন্থরার কথাগুলোর নিরন্তর সংঘাতের কষ্ট তার বুকের ভেতর মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল।

জানলা দিয়ে প্রাসাদ চত্বরে ছোট্ট উদ্যানের দিকে চেয়ে রইল। রাঙা নরম রোদে স্বপ্নময় হয়ে আছে জায়গাটা। ঘাসফুল ফুটেছে অনেক। রজনীগন্ধা কুঁড়িগুলো ফোটার প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। নিঃশব্দ এক প্রাণের খেলা চলছে এই এক টুকরো উদ্যানের চৌহদ্দিতে।

ছোট পায়ে দশরথ আস্তে আস্তে ঢুকল। কৈকেয়ী তার চলার ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়েছিল। পায়ের

ধাপ ফেলাগুলো সমান মাপের নয়। একটু অস্বাভাবিক। জল ভেঙে চলার সময় যেমন পা ফেলে অনেকটা সেই রকম। শরীরটা একটু সামনের দিকে নুয়ে পড়েছ। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কৈকেয়ীর বুকে আশঙ্কার স্তব্ধতা নামল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার আহ্বানের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কৈকেয়ীর খুব কাছে দাঁড়িয়ে সে অপলক চোখে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। নিজের অজান্তেই একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল।

কৈকেয়ী চমকাল। একটা আবেগ আগে থেকেই তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। দশরথকে দেখে একটা দুরন্ত কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে প্রাণপণে কান্নার সঙ্গে লড়ছিল। অভিমানের সমুদ্র তার বুকে তোলপাড় করছিল।

দশরথ স্তিমিত চোখে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মৃদুস্বরে বলল : তোমাকে ভীষণ শ্রান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছে। কোথায় কি যেন ঘটে গেছে তোমার। ঝঞ্ঝা যেন ওলোট পালোট করে দিয়েছে তোমায়। তবু দুই চোখে কি এক অদ্ভুত মায়া জড়ানো। মোহ জড়নো। তুমি কি অনির্বচনীয়? কষ্টে-দুই-চোখ তোমার ছল ছল করছে। কেমন করে বলব, রাম লক্ষ্মণ একটু আগে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনে গেছে। সর্বাগ্রে সে খবর তোমাকে জানানোর কথা মনে হয়েছে।

কেন? খুব অবাক হয়েই প্রশ্ন করল কৈকেয়ী। হঠাৎ তার বুকের ভেতর থেকে কথাটা উঠে এল। নিঃশব্দ এক আর্তনাদের মতো শোনাল।

দশরথ তার আচমকা প্রশ্নে চমকাল। কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বরে ঝড়ের বার্তা। একটা বিদ্রোহ যেন গর্জন করছিল। বুকের আগুন বেরোনোর রন্ধ্র খুঁজে পাচ্ছিল না বলেই তার কণ্ঠস্বর এত গম্ভীর। দশরথ সাবধান হল। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। মুখ দেখে তার মনটাকে যথাসম্ভব পাঠ করল। তারপর গাঢ়স্বরে বলল : তুমি যে তাদের ভীষণ ভালবাস। অথচ যাত্রার সময় তারা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারল না। এই দুঃখটায় যাতে কষ্ট না পাও সেজন্যেই এসেছি। এই আর কি?

উদ্গত অশ্রু চোখের কোণে কখন মিলিয়ে গেল কৈকেয়ী নিজেও জানে না। বঞ্চনার কষ্টে চোখ ছলছল করছিল। একটা তীব্র অভিমানবোধে তার বুক টাটাচ্ছিল। এক ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে কথাগুলো বলল, ক্লান্ত ও কটু গলায়। তার মানে? পুত্রকে বনে পাঠাতে পিতার কোন কষ্ট নেই, তার অন্তর কাঁদল না, এ তো বড় আশ্চর্য ঘটনা। কেন মিছে নাটক করছ?

দশরথ শুধু চমকায় না, নিজেকে স্বাভাবিক রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। অবাক বিভ্রান্ত চোখে সে একবার অপরাধীর মতো কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। দশরথের চিত্তায় সাপের ফণার মতো একটি প্রশ্ন দোলে। কৈকেয়ী কি তা হলে তার ছলনা ধরে ফেলেছে? চমকিত বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল : পিতা হলেই যে সব সন্তানের জন্য সমান দুর্ভাবনা থাকবে, একথ তোমাকে কে বললে? যাদের জন্যে আমার প্রাণ পোড়ে, দরদ উথলে উঠে, মন মমতায় ভরে থাকে তাদের গায়ে কোন আঁচ লাগতে দিইনি।

কৈকেয়ী বিরক্ত হয়ে বলল : কিন্তু এই কৈফিয়তের কি প্রয়োজন ছিল কোন?

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে এই অপ্রিয় সত্য বলতে হল।

কৈকেয়ী ভুরু কুঁচকে অবাকস্বরে বলল : হাঁ, পুরুষের সাবধানী হওয়া একটু ভাল। কৈকেয়ীর কথায় দশরথের শরীর তীব্র আতঙ্কে শক্ত হয়ে উঠল। রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল : তার মানে?

সব কথার মানে খুঁজতে নেই। আমার মনটা আজ স্থির নেই। আমি যাই।

বলতে বলতে কৈকেয়ী ঝটিতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কৈকেয়ী চলে গেলে দশরথ ভ্রূকুটি করে তার গন্তব্যের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কৈকেয়ীর তীক্ষ্ণ সন্দেহ, প্রবল সংশয়, দৃঢ় অবিশ্বাস,—কেন? এই মূর্তিতে কৈকেয়ীকে আগে কখনও দশরথ দ্যাখেনি। এ এক স্বতন্ত্র কৈকেয়ী। আজ তার এই ভাবান্তর কেন? এই পরিবর্তন আকস্মাৎ কোথা থেকে এল?

॥ চার ॥

ন'বছর পরের ঘটনা।

অকস্মাৎ মিথিলা থেকে কেকয়াধিপতির রাজসভায় মহীপতি জনক সীরধ্বজের বার্তা বহন করে আনল তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনক ধর্মধ্বজ। ধর্মধ্বজের অগামন এতই অপ্রত্যাশিত যে অশ্বপতি তাকে কোনরূপ আপ্যায়ন এবং সমাদর করার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না। সেজন্য তাঁর মনস্তাপের অন্ত ছিল না। ধর্মধ্বজেরও দেবার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না। অল্প কিছুক্ষণের জন্য কেকেয় রাজসভায় ছিল। তার এই আসা যাওয়া নিয়ে এমন এক রহস্য ঘনীভূত হল যে তা নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা হতে লাগল। রাজসভায় মন্ত্রীর এবং অমাত্যেরা যে যার নিজের মতো করে তার আগমনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করল। কিন্তু তাদের কোন কথাতেই অশ্বপতির মন ছিল না।

ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা অশ্বপতিকে উদাস অন্যমনস্ক করেছিল! কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে দেখাল অত্যন্ত শান্ত, স্থির, গম্ভীর এবং নির্বিকার এক আত্মভোলা মানুষ। অশ্বপতি নিজেকে যত সংযত রাখার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ভেতরের অশান্ত অস্থিরতা প্রবল বেগে তাঁকে এক নির্জনতার দিকে টানছিল।

ধর্মধ্বজ চলে গেলে নিস্তেজ শরীরে অশ্বপতি সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাউকে কিছু না বলে রাজসভা থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। মন্ত্রীবর সুবীরও তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুসরণ করল। চলতে চলতেই শুধাল : মহারাজের আকস্মিক রাজসভা ত্যাগে বিচলিত বোধ করছি। আপনার সুকুমার মুখশ্রী অকস্মাৎ লাবণ্যহীন কেন?

সুবীরের প্রশ্নে অশ্বপতির একটি শ্বাস পড়ল। ভুরু কুঁচকে বলল : হওয়ারই কথা। শরীরটা আজ বশে নেই। মনটাও ভারি অস্থির।

সুবীর ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

ধর্মধ্বজের বাক্যে অশ্বপতি চিন্তাকুল হলেন। অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করেন। আর নিজের মনেই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেন। কূট রাজনীতির খেলায় তিনি এমন এক স্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেখানে সামনে এগোন কঠিন আবার পিছনে ফেরাও বিপজ্জনক। কিন্তু দশরথের পরিকল্পনা এমন নিখুঁত, নির্ভুল গোড়া থেকে তার কর্মপন্থার কোন আগাম অনুমান হয় না। সেই কথাটা এবার অশ্বপতির অনুধাবনের জন্য দশরথ স্বনামাঙ্কিত এক পত্র দিয়েছে তাঁকে। অশ্বপতি দশরথের পত্রখানি বারংবার চোখের সামনে মেলে ধরেন, আর তার সাফল্যের মাইলস্তম্ভটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তথাপি, দশরথের চিঠিখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া তাঁর বিরাম ছিল না। কখনও নীরবে কখনও বা সরবে পাঠ করছিলেন।

"কেকয়াধিপতি মহামান্য অশ্বপতি! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তার পিতৃবংশ ইক্ষবাকুবংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সে আমার গর্ব, আমার বংশের সুনাম। সে এখন ভারতবর্ষের গর্ব। তার আশ্চর্য মেধা, বিক্রম, রণকৌশল, দক্ষ নেতৃত্ব, বাহুবল, বীর্যবল, সাহস মনীষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে রাশি রাশি গল্প। সে সব কথা বলে শেষ করার নয়। রামের কৃতিত্বে পিতা দশরথ গর্বিত। নিজেই সেই গোপন আনন্দের সংবাদ একমাত্র পরম আত্মীয়ের কাছেই নিভৃতে উন্মুক্ত করা যায়। বলতেও ভাল লাগে। পত্রের মধ্যে নিজেকে আজ উন্মোচন করতে পেরে আমি যে কি সুখ অনুভব করছি তা আপনাকে বলে বোঝানোর নয়। আমার আনন্দের আবেগের আপনিও একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী এই কথা মনে করতে পুলক লাগছে।"

এই পর্যন্ত পড়ে অশ্বপতি থামল। মুখ কান তার ভীষণ তেতে উঠল। আগুনে ঝাঁ ঝাঁ করছিল সারা শরীর। রগের দুপাশ যন্ত্রণায় টাটাচ্ছিল। একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহে ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে কুটিল হয়ে উঠল মুখের অভিব্যক্তি।

কানের পর্দায় চিঠির কথাগুলো তারস্বরে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের হুল ফোটাতে লাগল। মনে তাঁব ধিক্কার জাগল। অপমানকর প্রশ্ন এবং কৌতূহল মস্তিষ্কের ভেতর কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় চকিত চিন্তা ঝিলিক দিল। মুহূর্তে দশরথের চিঠিখানা অর্থময় হয়ে উঠল।

অযোধ্যার সিংহাসনের দাবি ও অধিকার নিয়েই কিছু প্রশ্ন আর কৌতুক করেছে দশরথ। ভরতের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন ইংগিত নেই, তবু তার নিজের মনের ভেতর একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছুঁয়ে আছে। অশ্বপতির মনে হল, দশরথ ভুরু কুঁচকে তাকে কটাক্ষ করার জন্যই যেন চড়া গলায় শোনাল : রাম ইক্ষ্বাকুবংশের যোগ্য উত্তরাধিকার। তার সমকক্ষ নেই। বংশের খ্যাতি এবং সুনাম সে বহন করে আনছে। ঘটনার শেষ নয় এখানে। অযোধ্যার সিংহাসনে রামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দীর্ঘকাল ধরে যে গোপন ষড়যন্ত্র আর পরিকল্পনা হচ্ছে, গণস্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন এই কথাটা উপলব্ধির জন্য লিখেছে, "রাম জনগণের হৃদয়ের রাজা।" সিংহাসনের উপর জনগণের দাবি জোরদার করে রামকে সিংহাসনে বসানো নাটকের মহড়া মাত্র। রাম অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। সে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। এবং সে ক্ষমতা তার নিজের অর্জিত। আবার বহুমানুষ বিশ্বাস করে ভালবেসে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য রামকে তাদের পছন্দ। তাদের সে দাবি ও ইচ্ছার সামান্যতম অপব্যবহার তারা সইবে না। রামের জনপ্রিয়তা স্মরণ করে দিয়ে দশরথ তাঁকে সংযত থাকার ইংগিত করেছে। পত্রে পুত্রের গর্বে গর্বিত পিতার আবেগকে এমনই মর্মস্পর্শী আর রহস্যময় করে তুলেছে যে তা অশ্বপতির কাছে নিতান্ত ঠাট্টা আর বিদ্রূপের মত মনে হল। আশংকার চমক ও জিজ্ঞাসা যুগপৎ তাঁকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করল। দশরথের সুখানুভূতি, গর্বিত হাসি ও কটাক্ষের মধ্যে এক আসন্ন সর্বনাশা নাটকের দৃশ্য প্রস্তুতি দেখতে পেল। চিঠিখানা তাঁর মুখোমুখি হয়ে ভয়কে আরো বাড়িয়ে তুলল। তথাপি, চিঠির চুম্বক আকর্ষণ প্রবল বেগে তাঁর মনকে টানতে লাগল। নিশি পাওয়ার মত এক সম্মোহিত আচ্ছন্নতা নিয়ে পত্রে মনোনিবেশ করলেন।

"এক এক করে কত কথা মনে হয়। স্মৃতিভারাক্রান্ত মনের সেই বিচিত্র সংলাপ ভাল লাগবে কি? রাম ও ভরতকে আপনার কন্যা কৈকেয়ী কখনও আলাদা করে দেখেনি। রামও নিজের গর্ভধারিণী অপেক্ষা তার ছোটমাকে অধিক সমাদর ও শ্রদ্ধা করে। কৈকেয়ীর স্নেহনীড়ে সে প্রতিপালিত। ভরতও রাম বলতে অজ্ঞান। তারা একমন একপ্রাণ। তবু দূরবর্তী থাকার জন্য রামের সব কথা ভরত জানে না। ভ্রাতৃবৎসল রামের সাফল্য এবং কৃতিত্বের খবর ভরতকে প্রীত করবে জেনেই ন'বছর আগের বৃত্তান্ত থেকে শুরু করছি। যার জীবনটাই একটা গল্প, তাকে নিয়ে এই বৃত্তান্ত রচনা করা কোন কঠিন কাজ নয়।"

চিঠির মগ্নতা থেকে অশ্বপতি মুখ তুললেন। সদ্য ঘুমভাঙা চমকের মত কয়েকটা বিস্মিত জিজ্ঞাসা চকিতে তাঁর মনে ঝিলিক দিল। ভুরু কুঁচকে অবাক স্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করলেন : শয়তান!

অশ্বপতির বুকে সহসা বজ্রাঘাত হল। এবং তার ঝলকে দিশাহারা হয়ে গেলেন। কৈকেয়ীও ভরতের সঙ্গে তাঁর রক্ত সম্পর্কের সূত্রে পারিবারিক এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি করল, যাতে সম্পর্কের উল্লেখ থেকে তাঁর মনটা নরম হয়ে উঠে। রামের অনুকূলে তাঁর হৃদয় স্রোতকে প্রবাহিত করতে ভরত ও কৈকেয়ীর সঙ্গে রামের মধুর সম্পর্ককে ফলাও করে শোনানো হল তাঁকে। অথচ, রাম সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে পত্রে। কারণ, দশরথ ধরেই নিয়েছে, ভরত ও কৈকেয়ী অযোধ্যার সিংহাসনের উপর তাদের দাবি ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তিনি কখনও করবেন না। অযোধ্যা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে প্রকৃত বিরোধ তাঁর ও দশরথের ভেতর। ভরত কৈকেয়ী এই বিরোধের মধ্যবর্তী। তাই তাদের না-দাবির প্রসঙ্গ পত্রে এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে গোটা ব্যাপারটা তার মনের ভেতর ঝিলিক দেয়। মস্তিষ্কের মধ্যে স্থায়ী হয়ে অনবরত জিজ্ঞাসায় যেন অস্থির করে তোলে তাঁকে। দশরথের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সম্পর্ক, এবং তার পরিণতি কি? ভবিষ্যৎই বা কি? এই আভাসটুকু দিতেই মধুর পারিবারিক সম্পর্ককে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রামের সিংহাসনপ্রাপ্তির এক অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে দশরথের আস্থা ভেতরে ভেতরে অশ্বপতিকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। দশরথ বহুকালের মৌন গম্ভীর বিষণ্ণ যবনিকা ভেঙে দিয়ে যেন এক নতুন যাত্রা সূচনা করল। এই নতুন যাত্রা কিসের? কোথায় তার গন্তব্য? কি তার পরিণাম— কিছু জানা নেই। অথচ পত্রে তার কৌতুকছটায় ঝলকানো, নির্দোষ ঠাট্টা, বিদ্রূপে ভরা, আর রহস্যের আমেজ ধরানো এক আকর্ষণ। অশ্বপতি আবার পত্রপাঠে মনোনিবেশ করল।

"রামের বয়স তখন ষোল। প্রদীপ্ত তারুণ্যের কী অপূর্ব মূর্তি! আয়ত বিশাল নীল দুই চোখে কী আশ্চর্য মায়া জড়ানো! গায়ের রঙ তো নয়, যেন শ্যামল সবুজে ভরা প্রান্তর সে লাবণ্য চোখে দেখেনি কেউ। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তবু প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য আমাকে নির্দয় নিষ্ঠুর হতে হবে। কিন্তু স্নেহবশত রাম লক্ষ্মণকে ঘোর অরণ্যে নির্বাসনে পাঠাতে ক্রমাগত বিলম্ব হচ্ছিল। সত্যরক্ষা আর ধর্ম পালনের দ্বন্দ্বে আমার অবস্থা অসহায় অভিসম্পাতের মতো। কিন্তু কোন রন্ধ্র দিয়ে নিয়ত আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। আমার ক্ষেত্রে সে এল বিশ্বামিত্রের রূপ ধরে। ষোল বছর বয়সের রামকে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভিক্ষা চাইলেন। স্বজন হারানো প্রতিশোধ নিতে তাড়কা ভয়ংকর হয়ে উঠল। অরণ্যে অরণ্যে সে মুনি ঋষিদের বিভীষিকা। তাকে দমনের জন্য রাম লক্ষ্মণের বাহুবল প্রয়োজন হল। মনের প্রতিক্রিয়া যাই হোক বিশ্বমিত্রের খ্যাপামির ইন্ধন দিয়ে নিজের সত্যরক্ষার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলাম। কিন্তু পুত্রদ্বয়কে রাক্ষসের প্রতিহিংসার বলি করে পাঠাতে বুক আমার ভেঙে গেল। পিতা হয়ে পুত্রহন্তা হওয়ার আশঙ্কায় হৃদয় অস্থির হল। আত্মগ্লানিতে মন পুড়তে লাগল। হৃদয় দুঃখ সাগরে পরিণত হল। স্নেহ কি বিষম বস্তু সেদিন অনুভব করলাম। অন্ধমুনির পুত্র শোকের নিদারুণ কষ্ট, তাঁর অভিশাপ আমার আত্মানুশোচনার সঙ্গে মিশে গিয়ে বুকের মধ্যে নিঃশব্দে আর্তনাদ করতে লাগল। কৌশল্যা কৈকেয়ীর ঘৃণা মিশ্রিত জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টির ভাষা আমি স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম। তাদের ধিকৃত জিজ্ঞাসা প্রতিবাদের ভাষা কঠোর ও শাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমার কর্তব্য নির্ণয়ে ছিলাম অবিচল। পরিণতি ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে অলক্ষ্যে আবৃত। তথাপি এক পরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম যে, জীবনের অনিবার্যতাকে কখনও কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। দুর্লঙ্ঘ নিয়তি তার পাওনা তার নিজের পথে ঠিক আদায় করে নেয়।"

অশ্বপতি চমকে উঠলেন। চোখে তাঁর বিস্ময় নেই। একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহে দৃষ্টি ভ্রূকুটি কুটিল হলে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। রাগে, ক্ষোভে, অশ্বপতির ক্ষুব্ধ স্বর যেন পিষ্ট দাঁতের পাটি থেকে বেরিয়ে এল। মিথ্যে। শুধু ছলনা। ভণ্ড! প্রতারক! শঠ!

বিচ্ছিন্ন ঠোঁটের ফাঁকে লাল জিভের অগ্রভাগ তির তির করে কাঁপছিল। স্বাভাবিক উদগত নিঃশ্বাস বুকের কাছে বদ্ধ করে উচ্চারণ করল, হাঁ নিয়তি। নিয়তিই বটে। নিজেকেই তার আক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত বোধ হতে লাগল। অশ্বপতির দৃষ্টি অচিরাৎ আবার পত্রতে নিবদ্ধ হল।

"রামলক্ষ্মণ চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। তাড়কা বধের কোন খবর নেই। অকস্মাৎ একদিন অযোধ্যায় সংবাদ এল, বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রাম তাড়কাকে আক্রমণ করল। দু'পক্ষের প্রচণ্ড লড়াই হল। কিন্তু রামের বিক্রমের সম্মুখে তাড়কা বেশিক্ষণ দাড়াতে সমর্থ হল না। ঝটিকার মতো প্রবলবেগে, ক্ষিপ্র গতিতে রাম তাড়কার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব কৌশল ব্যর্থ করে দিল। অবশেষে, অসহায়ের মতো রামের হাতে প্রাণ দিল। তাড়কা রাক্ষসের পতনে রাক্ষসেরা দিশাহারা হল। রামের সঙ্গে তার সন্ধি করে শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করল। চতুর্দিকে রামের জয়জয়কার। তবু অযোধ্যায় ফিরল না রাম। অস্ত্র রাজশক্তির উৎস; এই নীতি জপমন্ত্র করে বিশ্বামিত্রের কাছে আরো অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য রয়ে গেল। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বামিত্র রামকে অস্ত্রবিদ্যা এবং রাজনীতি শেখাল। রাজনীতি দেশ শাসনের অঙ্গ। দেশ শাসনের গর্ভে জ্বলে ক্ষমতার আগুন, আধিপত্য আর প্রভুত্ব বিস্তারের লেলিহান শিখা, রাজনীতির তাপে দগ্ধ হয় দেশের অগণিত মানুষ। অথচ দেশের এই হাজার হাজার মানুষ শ্রমে, সেবায়, ত্যাগে, সাধনায়, রাজ্য ঐশ্বর্যে, সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়। দুর্ভাগ্য তাদের কাউকে আমরা সম্পদ ভাবি না। শাসকেরা নিজের সুখ, আরাম, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত। অথচ যাদের দৌলতে এ সব, তাদের কাছে টেনে এনে কখনও সমান আসন দিই না। রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে এমনই জড়িয়ে থাকে সব যে, তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক বা ফাঁকি থাকে। শাসনকার্যের মধ্যে তার চেহারা খুঁজে বার করবার অবকাশ কোথায়? বিশ্বামিত্র রামকে সেই ফাঁক আর ফাঁকিটাকে সকলের আগে দেখাতে ও শেখাতে রাজনীতি ও শাসননীতির বাইরে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। রাজা না হয়েও মানুষের পাশে দাঁড়ানো

যায়, কল্যাণ ও উন্নতি করে দেশ সেবা করা যায়। দেশের মানুষকে রামের নেতৃত্বের পতাকা তলে সমান সম্মানে সমবেত করে এক অসীম শক্তিতে সকলের উর্ধ্বে তাকে তুলে ধরলেন বিশ্বামিত্র। গত পাঁচবছর ধরে রাম-লক্ষ্মণ সমগ্র আর্যাবর্তে ঘুরে ঘুরে সেই জনসেবামূলক কাজ করে বেড়াল। মিথিলার অদূরে রুক্ষ, কাঁকুরে কঠিন মৃত্তিকায় হল্ কর্ষণ করে সোনার ফসল ফলিয়ে তাকে নবজন্ম দিল। হল কর্ষণের অনুপযুক্ত ভূমিকে আবাদযোগ্য করার গল্প লোকমুখে অহল্যার শাপ মুক্তিতে পরিণত হল। নিজের কর্মশক্তি ও সেবার সোপান বেয়ে সে উপরে উঠল। পথে সব বাধা দূর করে নিজের প্রতিকূল ভাগ্যকে জয় করল।''

অশ্বপতি মনে মনে অস্বস্তিবোধ করল। কূট রাজনীতির খেলায় দশরথ শঠতার সঙ্গে শঠতা করেছে, মিথ্যের জবাব মিথ্যে দিয়েই দিয়েছে। ইতিহাস বিচিত্র পন্থায় মানুযের উপর প্রতিশোধ নেয়। দশরথ শত্রুকে তার নিজস্ব অস্ত্র দিয়েই ঘায়েল করছে। রাজনীতির খেলাই এই। বিধাতাও কম রসিক নন। জীবন নদীর এক ঘাট পূর্ণ করতে অন্য ঘাটকে নিঃশেষে একেবারে শূন্য করে ফেলেন। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন। কিন্তু জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার সময় এখন তাদের কারোর হয়নি; তুরুপের তাস তাঁরই হাতে। তবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে উৎসাহ পাচ্ছেন না, কেন? একটা অজ্ঞাত ভয়ের আশঙ্কায় কেন দ্বিধাগ্রস্ত তিনি? পাঞ্জা লড়াইয়ের কাজটা এত অল্পেতে শেষ হয় কখনও? অশ্বপতি পুনর্বার পত্রপাঠে মনসংযোগ করল।

রামের বিক্রম দেখাতে বিশ্বামিত্র তাকে নিয়ে মিথিলাধিপতি জনক সীরধ্বজের মহাযজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন। সীরধ্বজ তাঁর নিজের নামের অর্থের সঙ্গে মিল রেখে কন্যার নামকরণ করলেন সীতা। রূপবতী কন্যা সীতাকে বীর্যশুল্কা করার জন্যে এক অদ্ভুত লৌহমঞ্জুষা নির্মাণ করেছিলেন। লৌহশকটে রক্ষিত দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হরধনু উত্তোলন করে যে এতে গুণ পরাতে সক্ষম হবে তার হাতেই সীতাকে সমর্পণ করবেন। সীতার রূপসৌরভ বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানতে পারল সীতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্রেরা সীতাকে পেতে মিথিলায় ছুটে এল রাজবেশে, যোদ্ধবেশে। কোন বীর বাদ রইল না কিন্তু কারো সাধ্যে কুলাল না সে ধনুক নড়ায়। ম্লান মুখে সব বীর ফিরে গেল। কিন্তু যে কাজ পৃথিবীর বড় বীরের করতে পারল না, সে কাজ রাম অনায়াসে করল। নিমেষে ধনুতে গুণ পরাল। রাম শ্রেষ্ঠ বীর বলে সম্মানিত হল। চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। পঁচিশ বছরের যুবক রামের কণ্ঠে অষ্টাদশী জনক কন্যা সীতা বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে বরণ করল তাকে।

রাম লক্ষ্ণণ, ভরত শত্রুঘ্নর অভিন্ন ভ্রাতৃপ্রেমকে একসূত্রে গেঁথে রাখার জন্যে জনক পরিবারের চার কন্যার সঙ্গে তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করেছি। সীরধ্বজের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম সীতা। কনিষ্ঠা হল উর্মিলা। ইতিমধ্যে পরম রূপবতী সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বীর্যশুল্কা সীতা রামকে পতিত্বে বরণ করেছে। কনিষ্ঠা উর্মিলার জন্য সীরধ্বজ ধনুর্বাণে অজেয় লক্ষ্ণকে জামাতা রূপে নির্বাচন করেছেন। এখন বাকি শুধু ভরত ও শত্রুঘ্ন। মানে মর্যাদায় জনক পরিবার ইক্ষ্বাকুবংশের সমতুল। অযোধ্যার রাজপরিবারের উপযুক্ত বধূ হওয়ার যোগ্য তারা। পুত্রদের অভিন্ন ভ্রাতৃবোধ যাতে অটুট থাকে সেজন্য সীরধ্বজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংকাশ্যার অধিপতি কুশধ্বজের দুই পরমাসুন্দরী কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে আমার নয়নমনি ভরত শত্রুঘ্নের জন্যে প্রার্থনা করেছি। সাংকাশ্যারাজ সানন্দে সম্মতি দানে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আগামী উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে চার ভ্রাতার একসঙ্গে যুগলমিলন সম্পন্ন করব। আপনি আত্মীয় স্বজন পারিষদ সহ ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে অবশ্যই মিথিলায় পদার্পণ করুন। মিথিলা এবং অযোধ্যায় যুগ্মভাবে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

অশ্বপতির বুক থেকে অস্ফুট শব্দ করে একটা গভীর শ্বাস নামল। নিজের আরাম যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে আর্তনাদ করছিলেন। তবে বোবা শব্দ। ভাষা ছিল না তাতে। আরাম কেদারার উপর আধশোয়া হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ তার চোখের তারায় স্থির। নীল উজ্জ্বল আকাশের গায়ে মাথা তুলে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল পাম গাছের সারি। সেদিকে আনমনে চেয়ে রইলেন অশ্বপতি। আর একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার ভেতর

ডুবে গিয়ে অশ্বপতি নিজের মনে ভাবছিলেন, রাম শ্রেষ্ঠ বীর। লক্ষ্মণ ধনুর্বাণে অজেয়। তাদের নিয়ে লোকের গল্প আর গর্ব। দীর্ঘ চিঠিতে দশরথের এসব কথা উল্লেখের অর্থ কি? সে কি চায় বলতে? তার মতলবই-বা কি? আভাসে ইঙ্গিতে দশরথ তাঁকে বোঝাল যে, রাম নিজের গৌড়বে গৌরবান্বিত। অযোধ্যার সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব চিহ্নিত হয়ে গেছে। আর কারো দাবি সেখানে গ্রাহ্য হতে পারে না। দশরথের প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতিও তুচ্ছ। জনগণ তার রক্ষাকবচ। জনতাও সুসংবদ্ধ। রাম নামে অজ্ঞান তারা। গণদাবি, জনস্বার্থ বিপন্ন হলে রাম নিজেই অস্ত্র ধরবে। তার মতো বীরশ্রেষ্ঠর সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধির কাজ নয়। তাই রামের শৌর্য, বীর্য বিক্রমের গুণগান করে তাঁর আচরণ এবং প্রতিক্রিয়াকে সংযত করতে বলার এক কূট প্রস্তাব এ পত্র। রামের ভীতির বীজ মনের গভীরে পুঁতে দিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে ভরতের উরাধিকারিত্ব থেকে রামের উত্তরাধিকারিত্বের অনুকূলে পৌঁছতে চাইছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে কত হাস্যজনক দশরথ নিজেও তা জানে ভাল করে। ফাঁকা আওয়াজ করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা তার। নিজের ভেতর যথেষ্ট শক্তি ও আস্থার যখন অভাব হয় তখন প্রতিপক্ষের অন্তরে ভয় জাগাতে চিৎকার চেঁচামেচি আস্ফালন, হুঙ্কার করা হল জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। বীর্যহীন আস্ফালন জীবের আত্মরক্ষার সাময়িক টোটকা। পরিত্রাণ লাভের কৌশল। অসহায় দশরথও নিজের অজান্তে জীবধর্ম পালন করেছে মাত্র। নিজের দুর্বলতা গোপন করতেই ছোট্ট একটুকরো চিঠি বাগড়ম্বর করে অকারণ দীর্ঘ করেছে। এ হল তার নিজের সঙ্গে ছলনা। সুতরাং এতে উৎকণ্ঠা বা ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হল অশ্বপতির।

অমনি বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল অশ্বপতির। মদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। গভীর এক প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তাঁর চেতনা। অস্ফুটস্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করল ঃ দশরথ তুমি এখনো বালক। প্রতিশ্রুতির শিকড় তোমার মনের মাটিতে গেড়ে বসেছে। তোমার সাধ্য নেই তাকে উপড়ে ফেল। প্রতিশ্রুতির কথা যতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার সঙ্গে তোমার লড়াইও শেষ হবে না। সমস্ত রকমের বিরুদ্ধাতাকে তুমি জয় করছ, সমস্ত প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিয়েছ তবু অবচেতনে আমার ছায়া তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি শান্তি পাচ্ছ না। তুমি অপ্রকৃতিস্থ অস্থির। তোমার দুর্বলতার রন্ধ্রপথ আমি দেখে ফেলেছি। বিজয়লক্ষ্মী আমার হাতেই বন্দী। ঠিক সময়ে ঠিক মতো তাকে শুধু ইন্ধন দিতে হবে।

নিজের আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে ডাকল : প্রতিহারী! প্রতিহারী! যুবরাজ যুধাজিৎকে বল।

ঝুলন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন অশ্বপতি। নির্মেঘ আকাশ থেকে অপরাহ্নের সূর্যের আলো চুঁইয়ে পড়ছিল। প্রকৃতিলোক শান্ত, স্তব্ধ। অশ্বপতি নির্বিকারভাবে ঊর্ধ্বমুখী আকাশ নিরীক্ষণ করছিলেন। মাথার ভেতর তাঁর এলোমেলো অনেক চিন্তা। সঠিক কোন মূর্তি ছিল না তার। তবু সব মিলে একটা ভাবনা তাঁর মস্তিষ্কের ভেতর ক্রিয়া করছিল। মাঝে মাঝে নিজের হাতের চেটোর দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে কি যেন একটা হিসাব করছিলেন নিজের মনে।

যুধাজিৎ কক্ষে প্রবেশ করে পিতাকে কোথাও দেখতে পেল না। এদিক ওদিক করতে করতে ঝুলন বারান্দায় গেল। সেখানে অশ্বপতিকে দেখে হতভম্ব হল। মুখ দিয়ে সহসা তার কথা বেরোল না। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে ডাকল : পিতা। আমায় ডেকেছেন?

অশ্বপতি হেঁট মাথা উঁচু করল। বিনা ভূমিকায় বলল, হাঁ পুত্র। এখনি ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় যাত্রা কর! অযোধ্যাপতি তাঁর পুত্রদের বিবাহের পাত্রী স্থির করেছেন। বিবাহের আচার অনুষ্ঠানাদি শেষ হলে বর কনে সহ পুনরায় কেকয়ে ফিরবে। দশরথ শত অনুনয় করলেও অযোধ্যায় যাবে না।

পিতা আপনার আদেশ বড় কঠিন। ভগিনী কৈকেয়ী যদি নবপুত্রবধূ সাক্ষাৎ অভিলাষী হয় তা হলে তাকে বঞ্চিত করব কেমন করে?

বৎস যুধাজিৎ, রাজনীতিতে স্নেহ, প্রেম, মমতা, ভালবাসা, কিছু নেই। এ এক জঙ্গলের আইন। অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়, হিংসা একমাত্র সত্য। হৃদয়াবেগের কোন স্থান রেখ না রাজনীতিতে।

অযোধ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাজনীতির। তাই, ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের বাধা অনেক। সে সব জটিল প্রশ্নে তোমার থাকার প্রয়োজন কি? সেনাপতির কাজ আদেশ পালন করা। প্রশ্নে কোন অধিকার তার নেই।

যুধাজিৎ একবার অসহায়ের মতো অশ্বপতির দিকে তাকাল। ভুরু কোঁচকাল। কথা বলতে না পারার অসহায় যন্ত্রণা ফুটল মুখে। বন্ধ ঠোঁটে প্রতিবাদ। কেমন যেন একটা দিশাহারা বোধ করল। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, চলে যেতে উদ্যত হল। অশ্বপতি কি ভেবে দু'পা পুত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে বলল :

শোন দশরথকে বলবে, হরধনু ভাঙলেই বিক্রম প্রকাশ পায় না। রাজা জনক কোন স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করেননি। কিংবা সীতাকে জয় করার জন্য অস্ত্রের পরুষ ঝঞ্ঝনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। চুপি চুপি কন্যাকে বীর্যশুল্কা করেছেন। প্রকৃত বীর যোদ্ধাদের বিক্রম প্রকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। বীর্যশুল্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্য রাজ্যে রাজ্যে কোন নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়নি। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের ইচ্ছা করেই সম্মান দেখানো হয়নি। রাজা জনকের ডাকে সম্মানিত মর্যাদাশালী কোন বীর নৃপতি মিথিলায় পদার্পণ করেনি। রামের বিক্রম স্বচক্ষে কেউ দেখিনি। এ অবস্থায় তাকে শ্রেষ্ঠবীর নামে অভিহিত করলেই সে শ্রেষ্ঠবীর হয়ে যায় না। দশরথের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। তোমার ভগ্নীপতিটিকে নির্জনে ডেকে বল হরধনুটির কোন দৈব রহস্য নেই। বীরদের বোকা বানানোর জন্য চুম্বকে তৈরি। অস্ত্রের ব্যাপারে রামের তীক্ষ্ণ মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। লৌহ শকটে রক্ষিত হরধনুটি দেখে প্রজ্ঞাবলে রাম তার কারণ নির্ণয় করতে পেরেছিল। ধনু ও শকট দুটিই শক্তিশালী চুম্বকে প্রস্তুত। বিপরীতমুখী আকর্ষণে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। রাম কৌশলে সম-মেরুর বিকর্ষণজনিত বলে লৌহশকট থেকে ধনুটিকে বিচ্ছিন্ন করে তাতে গুণ পরিয়েছিল। এতে কোন বাহাদুরি নেই। বলেরও কোন দরকার হয় না।

মুগ্ধ চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে যুধাজিৎ অস্ফুটস্বরে অকস্মাৎ প্রশ্ন করল : পিতা! রাম ভরতের মতো আপনারও প্রিয়। তার বীর গর্বের উপর কলঙ্ক লেপন করলে আপনার গৌরব বাড়বে না।

অশ্বপতির দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। চড়াগলায় প্রশ্ন করলেন : কলঙ্ক? কলঙ্ক কোথায় দিলাম? কথাটা তুমি ঠিক বলনি। নিজের লোকের ভুল ধরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। একে কলঙ্ক দেওয়া বলে না। কথাটা রামকে নিয়ে তবু রাম কিন্তু তার লক্ষ্য নয়, দশরথের কপটতার জবাব দিতেই কথাগুলো বলতে হল। দশরথ জানুক তার চাতুরী কপটতার ছদ্মবেশ আমার কাছে গোপন নেই। তা'হলেই তার আত্মবল, মনোবল ভেঙে পড়বে।

যুধাজিৎ সরল চোখের অগাধ বিস্ময় নিয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা খুঁজে পেল না। চুপ করে রইল। কিন্তু তারা মুখ একটু বিবর্ণ। অশ্বপতি তাঁর মতো বলে গেলেন কিন্তু কথাটা একজন নিকট আত্মীয়কে ঠিক ঠিক বলা যে কত কঠিন সমস্যা তা যাকে করতে হয় সেই জানে। যুধাজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমাকে তুমি শুধু নিমিত্তের ভাগী করতে চাইছ। ছোট হয়ে এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। যুধাজিতের বাক্যে অশ্বপতি চমকে উঠলেন।

দুই ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। বললেন : মানুষে মানুষে কোন স্থায়ী সম্পর্ক নেই আত্মীয়তা একটা সংস্কার মাত্র। দশরথকে ভগ্নীপতি বলে ভাবলে সে তোমার আত্মীয় কিন্তু যদি তা মনে না কর তাহলে অযোধ্যার রাজা সে। কেকয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যুধাজিৎ বার দুই ঢোঁক গিলল। তারপর মিন মিন করে বলল : কী করে বলি? তবে ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করব।

পুত্রের অবাধ্যতায় অশ্বপতি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বারান্দার মাথায় দাঁড়িয়ে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। যুধাজিৎ মাথা নত করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশ সমারোহে দশরথের চার পুত্রের সঙ্গে সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের কন্যাদের বিবাহ হল। উৎসবে

যোগ দিতে দূর দূরান্ত থেকে ছোট বড় বহু রাজা এলেন। তাঁদের আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার কোনা ত্রুটি করল না সীরধ্বজ। অতিথি অভ্যাগতদের থাকার জন্য বহু বাসস্থান নির্মিত হল। তাঁদের দাস দাসী ঘোড়া হাতি রথ প্রভৃতি থাকার জন্য পৃথক কুঠি নির্মিত হল। রাজপথ জনপথ সব পুষ্পে পতাকায় মালায় শোভিত করা হল।

বিবাহ শেষ হওয়ার দু'চারদিন পরে অতিথি অভ্যাগতেরা একে একে যে যার রাজ্যে ফিরে গেল। যুধাজিৎও ভরত ও তার নববধূ মান্ডবীকে নিয়ে কেকেয় অভিমুখে যাত্রা করল।

তাদের যাত্রাপথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথের বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস নামল।

দশরথের আকস্মিক ভাবান্তর সুমন্ত্রকে আশ্চর্য করল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সুমন্ত্র অপলক চাহনি চুম্বকের মতো টানছিল দশরথের দুই চোখ। চোখাচোখি হল। লাজুক অপ্রতিভতায় মৃদু হাসল। সুমন্ত্রের ওষ্ঠ স্ফুরিত হল। বলল : মহারাজ, ভরত শত্রুঘ্নকে এভাবে দূরে দূরে সরিয়ে রাখা বোধ হয় সমীচীন নয়।

দশরথের ভুরু কোঁচকাল। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করল · অকস্মাৎ তোমার এরূপ মনে হল কেন?

অশ্বপতি চতুর রাজনীতিজ্ঞ। আমাদের গোপন পরিকল্পনা যে তাঁর নখদর্পণে কেকয়রাজের মন্ত্রীপ্রধান সুবীরের সঙ্গে কথোপকথনে তা বেশ স্পষ্ট। অযোধ্যার রাজনীতির নিয়ে তাঁর কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিংবা দুর্ভাবনা নেই। এই চক্রান্তের কোন রাজনৈতিক গুরুত্বও তিনি দিলেন না বরং আমাদের প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে গেলেন। তাঁর মনোবল, সাহস, দৃঢ়তা প্রত্যুৎপন্নমতি আমাকে অবাক করল। তুরূপের তাস দিয়ে দান জিতে নেবার অপেক্ষায় আছেন। তাঁর সে আশায় ছাই দিতে দরকার ভবতকে। রাম ভরতের মেলামেশা গভীর ও অবাধ হলে তাদের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃপ্রেম জমবে। তাই বলছিলাম, ভরতকে কেকয়রাজ্যে পাঠিয়ে আপনি মোটেই ভাল করেননি।

দশরথের চোখ কপালে উঠল। চিন্তার বলিরেখাগুলি ললাটে গভীর হয়ে ফুটল। কথা বলার সময় দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : ভরত শত্রুঘ্ন আমার ভুলেই পর হয়ে গেছে। বোধহয় আমার ওপরেই তাদের যত রাগ আর অভিমান। অথচ রাম লক্ষ্মণের প্রতি তার কি গভীর মমতা আর টান, দেখলে হৃদয় জুড়িয়ে যায়।

তার সরল নিষ্পাপ ভ্রাতৃপ্রেমকে আমাদের লক্ষ্য জয়ে শাণিত অস্ত্র করে তুলতে হলে শীঘ্রই তাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনা ভীষণ দরকার।

তুমি ঠিক বলেছ। যা যা করলে ভাল হয় তার সব ব্যবস্থা কর। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমায় তুমি কক্ষে নিয়ে চল।

বিজয় তূর্য উচ্চরবে বেজে উঠল।

মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। পুরনারীদের কণ্ঠে উলুধ্বনির ঝড় উঠল। উন্মুক্ত ওষ্ঠের ফাঁকে জিভের লাল অগ্রভাগ সাপিনীর জিভের মতো লিক লিক করে খেলতে লাগল। আর সমুদ্র কল্লোলের মতো এক বিচিত্র শব্দতরঙ্গ নির্গত হতে লাগল। মত্ত বাতাসের লক্ষ করতালির মতো বাজতে লাগল উলু।

বহুদূর থেকে অগণিত অশ্বারোহীর হাতে বহুবর্ণের নিশানে ঝলমল করছিল রাজপথ। রথ, অশ্ব, গজের শোভাযাত্রা দেখতে বহুলোক রাস্তার দু'পাশে জড় হয়েছিল। ক্রমেই তাদের ভিড় বাড়ছিল। অবস্থা এমন হল যে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সৈনিকেরা হিমশিম খেয়ে গেল। রামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা মন্থরগতিতে রাজপ্রসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

রাজপ্রসাদের বিশাল চত্বরে অশ্ব, গজ, পদাতিক বাহিনী সব পৃথক পৃথক সাবিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সুসজ্জিত ও অলংকৃত দুটি বিশালকায় ঐরাবত মাহুত পরিচালিত হয়ে প্রবেশ দ্বারের মুখে দু'দিক

থেকে শুণ্ডের খিলান তৈরি করে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে দিয়ে একে একে দশরথ, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের রথ প্রবেশ করল। মুনি, ঋষি, এবং পুরোহিতের উচ্চৈঃস্বরে স্বস্তিবচন পাঠ করে তাদের আশীর্বাদ করল।

বধূদের নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীর ঘরে প্রবেশ করার আগেই মন্থরা কৈকেয়ীকে বলল : আশ্চর্য মেয়ে তুমি। এখনও নিজের সাজ গোজ নিয়ে ব্যস্ত। এদিক যে কি ঘটে যাচ্ছে তা ফিরেও দেখছ না? তুমি বড় সাদাসিধে আর বোকা।

মন্থরার কথায় কৈকেয়ী মজা পেল। মুখে তার একটা খুশির ভাব ফুটল। কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরে কৌতুক প্রকাশ পেল। ভুরু নাচিয়ে মৃদু হেসে বলল : বেশ তো আমি না দেখি, তুই তো দেখেছিস তাতেই হবে। হাঁ'রে বাইরে শঙ্খ, তুর্য বাজছে, ছেলেরা তবে কি বৌমাদের নিয়ে ফিরল?

মুখ ব্যাজার করে গম্ভীর গলায় বলল : তবে তোমায় বললাম কি? তোমার তো তাপ উত্তাপ কিছু নেই।

কৈকেয়ী হাসতে হাসতে মন্থরার দিকে ঘাড় ফেরাল। বলল : আজ রাগতে নেই। বড় আনন্দের দিন আজ।

আনন্দ না, ছাই।

তোর আজ কি হল কুব্জা? এমন করিস কেন?

তারপর, কৈকেয়ী নিজের কণ্ঠ থেকে একটি রত্নহার খুলে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল : আমার এই মুক্তার মালাটা রাখ। এটা আমার মায়ের ছিল। আজ খুশি হয়ে তোকে দিলাম।

মালার আমার দরকার নেই। তুমি চোখ থাকতেও অন্ধ। তোমাকে আমি কি করে বোঝাই, মানে রাজা তোমাকে একটুও ভালবাসে না। শুধু তোমার নশ্বর দেহটার প্রতি তার নজর। ওকেই স্বামীর সোহাগ বলে গর্ব কর। তুমি নির্বোধ।

কৈকেয়ীর মুখে সরল হাসি। মন্থরাকে চটানোর জন্য বলল : রাগল তোকে ভীষণ সুন্দর দেখায়।

ভুরু বাঁকিয়ে রাগত স্বরে মন্থরা বলল : ঢং রাখ। তোমার হিসেবের অঙ্ক বুঝে নাও। রাজবংশে জন্মেছ, রাজগৃহিণী হয়েছ, তবু রাজধর্মের ছলনা, প্রতারণা শঠতার কিছু বোঝ না। তোমাকে নিয়ে আমার মুশকিল।

কৈকেয়ী সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়াল। মন্থরার মুখ শক্ত হল। চোখে অকস্মাৎ আগুন জ্বলে উঠল। ভাষা বদলে গেল। গলার স্বরে চাপা গর্জন ফুটল। বলল : তুমি জান না, এক ঘোর বিপদ তোমার পিছনে উল্কার মতো ছুটে আসছে। তোমার আতঙ্কিত হওয়ার কথা। কিন্তু তুমি যে সব না বুঝে আমার সঙ্গে মশকরা করছ। এ কৌতুক তোমার কোথা থেকে আসছে? এত আনন্দই বা কার জন্যে? আজ তুমি কি পেয়েছ জান?

মন্থরা কৈকেয়ীর দিকে ঝলকানো চোখে তাকাল। তাতেই কৈকেয়ী একটু থমকে গেল। বিভ্রান্ত চোখে অসহায়ের মতো তার দিকে তাকাল। কৌতূহলের তীব্রতা আর একটা অভিমান বোধের প্রগাঢ়তায় তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। কারণ এরকম করে মন্থরা আগে কখনও কথা বলেনি। হঠাৎ মন্থরার বুকে এ কোন্ আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ? তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহে একটা উদগত নিঃশ্বাস বুকের পাঁজরের খাঁচায় আটকে যায়। আর তখনই নিশ্চিন্ত অনুমান করতে পারল প্রচণ্ড রাম-বিদ্বেষ তার বুকের ভেতর মোমের মতো গলে গলে পড়ছে। আর তার তীব্র তাপ স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। এই বিরাগ, অসহিষ্ণুতা তার অভিব্যক্তি বলে ভাবল।

কৈকেয়ীর হতচকিত ভাবটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূর হল। অসম্ভব পটুত্বের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে সহজ করার শক্তি সংগ্রহ করে বলল ; সে আবার কি কথা? আমার আবার হবে কি? কী জানি, আমি তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। তুই এমন হঠাৎ ক্ষেপে উঠলি কেন? কি হয়েছে তোর? কেউ কিছু বলেছে? তারপর একগাল হেসে বলল: ভরত শত্রুঘ্ন ছাড়া আর সকলে তোর চক্ষুশূল। কিন্তু আমি যে ওদের ছোট মা। ওদের অন্য চোখে দেখা কি আমার উচিত? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, রামের তেমনি করি। সপত্নীপুত্রদের নিজের শরীরের মতো মনে করি।

অপলক চোখে মন্থরা কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিতে তার শূন্যতা। গম্ভীরগলায় বলল : মায়ামোহ ঈশ্বরের দেওয়া এক অভিশাপ। সহজে কাটে না। আপন না পেলে পরকে আঁকড়ে ধরে। বেড়াল, কুকুরটাও পর্যন্ত মায়াতে আপন হয়। তোমার আমার অবস্থাও তাই। বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন উথলে ওঠার ভাব হয়।

হাঁ-হাঁ। ঠিক তাই। একেবারে মনের কথা বলেছিস।

সহসা মন্থরা গম্ভীর ভাবে ধমকে উঠল। না। বলিনি। এই মায়াটা স্বপ্নের মতো মিথ্যে। মরীচিকার মতো বিভ্রান্তিকর। মায়া ও মরীচিকাতে তাই প্রভেদ নেই। এসব মিথ্যে ছলনার পেছনে ঘুরে জীবনকে নষ্ট করার কোন মানে নেই।

কৈকেয়ী অস্বস্তিবোধ করল। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। গোটা পরিবারের মর্যাদাহানির ব্যাপার। তাই মুখখানিতে বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে মন্থরার দিকে তাকাল। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা একটা লম্বা নিঃশ্বাসকে চাপা দিতে আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়ল। মন্থরার সঙ্গে কথা বলতে সে একটা শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অনুভব করল। অকারণে লাল হয়ে উঠল তার মুখ। হাঁ-না কিছু বলল না। ধারালো এক ব্যক্তিত্ব মন্থরাকে এমন বিশিষ্ট করে তুলেছিল যে তাকে অমান্য করা কিংবা তার দিকে থেকে চোখের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া কঠিন হল কৈকেয়ীর। মন্থরার দুই চোখের দৃষ্টি তার সব গণ্ডগোল করে দিল।

নিজের মনেই মন্থরা চিন্তা করল, কৈকেয়ী তাকে সহ্য করতে পারছে না। প্রতিদিনকার দেখা জানা একটা অতিপরিচিত মানুষ বলে কৈকেয়ী অমান্য করতে লজ্জা পাচ্ছে তাকে। অথচ তারও সব কথা খুলে বলার হুকুম নেই। তার সব কাজটা একটা নিয়ম শৃংখলে বাঁধা। গণ্ডির বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কেবল কুমন্ত্রণা দিয়ে রামের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীর মনটাকে বিষিয়ে তোলা হল তার কাজ। বিয়ের পর থেকে খুব ধীরে সংগোপনে সেই কাজ করে আসছিল। সুকৌশলে কৈকেয়ীর ওপর যখন তা চাপান হচ্ছিল তখন থেকে তার মনে একটা সন্দেহ প্রবলতর হচ্ছিল। তবু অতীতের বদ্ধ ছলনার কপাটকে ঘটনার ধাক্কায় খোলেনি অশ্বপতি। সব কিছুকে এক অসাধারণ ছলনায় আবৃত করে আড়াল করে রাখল। সংঘাতকে এড়িয়ে চলাই হল অশ্বপতির রাজনীতির মূল কথা। মুখ্য অস্ত্র ব্যবহার করার আগেও দরকার আছে প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট দুর্বল করে তোলা এবং তার শক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়া। তাই অশ্বপতি তাঁর কৌশল সম্পর্কে খুব সাবধান।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ে তার বুক ওঠানামা করছিল। আচমকা একটা অনুভূতি তার মস্তিষ্ক ছুঁয়ে গেল। মন্থরা কৈকেয়ীর নিকটতর হল। নিরুত্তর কৈকেয়ীর দিকে স্নিগ্ধ ও স্মিত মুখে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। কৈকেয়ী নির্বাক, তার কোন প্রতিক্রিয়া বা ভাব বৈলক্ষণ্যও দেখতে পেল না। মন্থরার উদ্বেগ ও ব্যকুলতা যুগপৎ বৃদ্ধি পেল। হাতের মুঠোয় কৈকেয়ীর হাতখানা টেনে নিয়ে বলল ; তুমি চিরকাল একটু কেমন যেন। সামান্যতে মুখ ভার করে থাক। বাছা তোমার ভালর জন্যে বলা। এখন বুঝতে পারছি তোমাকে সাবধান করা আমার ঘাট হয়েছে। চল সোনা, আমরা বারান্দায় দাঁড়াই। ওখানে দাঁড়ালে সমস্ত অনুষ্ঠানটা দেখতে পাব।

মন্থরার বাক্যে উৎসাহিত হয়ে কৈকেয়ী রাজার প্রকাশ্য দরবারসভার সম্মুখে রাণীদের দাঁড়ানো এবং বসার জায়গায় এসে দাঁড়াল। গোটা স্থানটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

কৈকেয়ী এধার ওধার মাথা ঘুরিয়ে ভরতকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না তাকে। খুব অবাক লাগল। অযোধ্যাপতির সঙ্গে ভরত অযোধ্যার প্রত্যাবর্তন করল না কেন? এরকম উল্টো হওয়ার কারণ নেই। তবু হল কেন? কৈকেয়ী বেশ হতাশ হল। মুখে চোখে একটা তটস্থ ও সন্ত্রস্ত ভাব ফুটল। নিজের অজান্তে তার মুখের রঙ মুর্হুমুহু বদলাচ্ছিল। মনের উদ্বেগে সে মন্থরার সামনে রূপান্তর হতে লাগল। দু'চোখের পাতা গভীর ব্যথায় সুনিবিড় হল। থর থর করে কাঁপছিল তার অভ্যন্তর। খুব ভয়ে আর সংকোচে সে মন্থরার দিকে তাকাল। অমনি চোখ ফেটে জল এল। মন্থরার বুকে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল।

কান্না থামলে সে অবাক চোখে মন্থরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কথা বলতে গিয়ে বার কয়েক ঢোক গিলল। তারপর বলল : কুব্জা, ভরতের জন্য মন আমার চঞ্চল হয়েছে। সে কেন শত্রুঘ্নের সঙ্গে ফিরল না? এরা যে হরিহর আত্মা। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবু শত্রুঘ্ন ভরতকে ছেড়ে কেমন করে এল?

মন্থরা হাসল। কিছু ভাবল ও। কৈকেয়ীর স্বপ্ন বিশ্বাস ভেঙে খান খান হয়েছে। তার বুকের ভেতর একটা তোলপাড় দেখা দিয়েছে। তার বড় বড় ডাগর দুই চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। মন্থরা বেশ টের পাচ্ছিল, তীব্র একটা জ্বালা তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বয়ে যাচ্ছিল। মন্থরার চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল। নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে সে চুপ করেছিল। তাকে নির্বিকার এবং স্তব্ধ দেখে কৈকেয়ীর কান্না এল। ধরা গলায় স্তিমিত স্বরে বলল : কুব্জা! কথা বল, চুপ করে থাকিস না। মা'কে ছোট বেলায় হারিয়েছি। তুই আমাকে মায়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে মানুষ করেছিস। আজও আমার জন্য তোর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। রাগ করে তুইও আমাকে ত্যাগ করবি? তুই যা বলবি, আমি তাই করব।

কৈকেয়ীর কথায় মন্থরা যেন চমকে উঠল। কোথা থেকে হঠাৎ স্নেহ মমতার প্লাবন নামল তার বুকে। সারা শরীরের পেশী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গলে গলে তরল হয়ে মিশে গেল যেন সেই স্রোতে। কৈকেয়ীকে দু'হাতে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরল। মন্থরার বুকের উপর একটা শান্ত নদীর মতো পড়ে রইল কৈকেয়ী। পরিতৃপ্ত সুখী মন্থরারর কণ্ঠস্বর তীব্র আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল। : তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে অবস্থা যে ভাল নয় বুঝছি।

মন্থরার বাহুডোর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কৈকেয়ী প্রশ্ন করল : কিছু শুনেছিস না কি?

না। তবে ঘটনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তোমাকে হতাশ এবং দুঃখ দেবার জন্য একাজ করেছে কেউ।

তুই যা বলছিস, ঠিক বলছিস। কিন্তু কাজটা করেছে কে?

কী করে বুঝব?

আমাকে দুঃখ দিতে যে একাজ করল তাকে আমি ছাড়ব না।

মন্থরার ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। চোখেতে কৌতুক ঝিলিক দিল। তারপর একটু গম্ভীর গলায় বলল ; তুমি যা বললে তা কখনো করতে পারবে না। তোমার গভীর ভালবাসা আর অগাধ প্রশ্রয়ে তার সাহস কেবল বেড়েই চলেছে। কিছুতে সে মানুটোকে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না।

কৈকেয়ী অবাক স্বরে ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল : তাকে জানিস তুই।

অনুমান করতে পারি কেবল। তুমি তাকে অসম্ভব ভালবাস। অত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই। তোমার সরলতাকে সে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে অথচ, তার প্রতারণা, ছলনা, বঞ্চনার কিছু জান না তুমি।

কে সে? ধাঁধা রেখে সত্যি কথা বল।

ধাঁধা নয়। সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছি!

ভয়ের কিছু নেই। নিষ্ঠুর হলেও সইতে পারব।

তোমার স্বামীই এ কাজ করেছে।

কুব্জা! স্বামী আমার ধ্যান জ্ঞান। তাকে জয় করার জন্য আমি সব উৎসর্গ করেছি। স্বামীকে একান্ত করে পেতে গিয়ে, তাকে সন্তুষ্ট করতে আমি নিজেকে পুত্রস্নেহ থেকে বঞ্চিত রেখেছি। তুইও জানিস। মহারাজা আমাতে অনুরাগী, কখনও কষ্ট দেয়নি আমাকে। তবু তার নামে কলঙ্ক লেপন করলি তুই। কি দোষ করেছে সে আমাকে খুলে বল। অন্য কেউ হলে আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলে গালি দিতাম। কিন্তু তোর কথা বলে বিচারের ভার নিজের হাতে না নিয়ে তোর হাতেই তার ব্যাখ্যার ভার দিলাম। এত বড় একটা অসম্ভব কথা কেমন করে বললি তুই?

মন্থরার অধরে বিচিত্র হাসি। বলল : এক আর এক যোগ করলে দুই হয় এ হল অঙ্কের হিসাব।

যোগ বিয়োগের সঠিক জ্ঞান থাকলে নির্ভুল উত্তর তুমিও বাপু করতে পারতে। কঠিন কিছু নয়।

কৈকেয়ী মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রিয়ভাষিণী মন্থরার কথা শুনতে লাগল। এক অভিনব জিজ্ঞাসার জবাব শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হল। বোবা উৎসুক দুটি চোখ মন্থরার চোখের উপর অপলক স্থির। মন্থরার ওষ্ঠপ্রান্তে বক্রহাসি কুটিল হয়ে ফুটল। আস্তে আস্তে বলল : রাম ভরত আর শত্রুঘ্ন জন্ম একদিনে; ভরত শত্রুঘ্নের চেয়ে বড় সুতরাং শত্রুঘ্ন থেকে রামের ভয় নেই। লক্ষ্মণ রামের চেয়ে ছোট এবং তার অত্যন্ত অনুগত, অতএব সে কোনকালে রামের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না। ভরত এবং রামের যুগ্মভাবে সিংহাসনের উপর সমান অধিকার। তাই ভরতকে নিয়ে সমস্যা। রাম এবং মহারাজার দুশ্চিন্তার কারণ সে। ভরতকে দশরথ অযোধ্যার সিংহাসনে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। সেজন্য বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ক্ষাত্রতেজে রামকে অসাধারণ করে তৈরি করেছেন। ভরত রামকে শৌর্যে বীর্যে অতিক্রম করুক অযোধ্যাপতি এমন চিন্তা কখনও করেননি। জনগণের চোখে রামকে শান্তির রক্ষক করে তুলবার জন্য জনহিতকর কাজকগুলো তাকে দিয়ে করেছেন। রাম-লক্ষ্মণের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য মহারাজ যা যা করেছেন ভরত শত্রুঘ্নের জন্য তার কিছুই করেননি। পিতার কোন্ দায়িত্ব ভরত শত্রুঘ্নের জন্য করেছেন? তুমিও বা জননীর কি কর্তব্য করেছ? মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করার জন্যই অযোধ্যা থেকে তাদের সরানো হয়েছিল। সেজন্য মহারাজ অনেক ছল চাতুরি, অভিনয়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তোমাকে কতবার যে বোকা বানাল, তুমি তা জান কিন্তু বিশ্বাস করনি।

কৈকেয়ীর মুখে কথা জোগাল না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মন্থরা একটু উদাসভাবে উপরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর থমথমে মুখে গম্ভীর গলায় বলল : ভাগ্যিস! কেকয়াধিপতি ছিল, তাই ভরত শত্রুঘ্ন অনাদর থেকে রক্ষা পেল। রাজার পুত্রদের উপযুক্ত ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষার সব দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। আর সেজন্যে রাম অপেক্ষা নম্র, শান্ত, বিনয়ী কোমল স্বভাবের ভরতকে অযোধ্যাপতির ভয়। ভরত অযোধ্যায় ফিরলে কোন কারণে রামের সিংহাসনলাভ যদি অনিশ্চিত হয় তাই মহারাজ কৌশল করে সর্বদা মাতুলালয়ে রেখেছে তাকে। আজও তাই করল। তোমার আনন্দ সুখ এখানে কোন ব্যাপারই নয়। কেকয়রাজা সতর্ক নজর না রাখলে এই পৃথিবী দেখা শেষ হত ভরতের। এখনও সে সম্ভাবনা দূর হয়নি। তোমার পুত্রের অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট আশংকা করে আমি ভয়ে কাঁপছি।

কৈকেয়ীকে হঠাৎ ভীষণ বিষণ্ণ দেখাল। মুখ, যন্ত্রণা মেশানো আবেগে নিবিড় হল। নিশ্বাসের সঙ্গে ঢেউ উঠল বুকে। আর বুক খালি হয়ে যাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখ থেকে উচ্চারিত হল : ইস্ সব আমার ভাগ্য? বড় কাতর শোনাল কৈকেযীর স্বর।

মন্থরা বিষাক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কৈকেয়ী অনড় এক পুতুলের মতো মাথা নিচু করে বসেছিল। মন্থরা দেখল কৈকেয়ীর গণ্ড বেয়ে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মাটিতে পড়ল। মন্থরার সেই মুহূর্তে করুণায় হৃদয়টা গলে গলে পড়ছিল! বলতে ইচ্ছে করছিল, ওমা কাঁদছিস! ছেলেমানুষ! পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। ভিতরে এ তীব্র জ্বালা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহায় শিহরিত হল। মন্থরার বুকভাঙা একটা নিশ্বাস পড়ল। তার পর দাঁতে দাঁত চাপল। স্তব্ধতা ভেঙে বলল; ভাগ্য আবার কি? এত তোমার নিজের তৈরি দুর্ভাগ্য। সেদিন যদি আমার কথা ছিটেফোঁটা শুনতে তা-হলে মানুষ হয়ে যেতে। নিজেকে কাঁদতে হত না। স্বামীকে তুমি অসম্ভব ভালবাস। কিন্তু অত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই। নইলে বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে? তোমকে যদি সে একটু ভালবাসত তা-হলে তোমার সন্তানকে বঞ্চিত করে কখনও তোমাকে অসন্তুষ্ট করত না। তোমায় যে ভালবাসে না এটাই বড় প্রমাণ।

কৈকেয়ী অসহায়ের মতো মাথা নেড়ে বলল; অত কঠিন হোস্ না কুব্জা। নানা কারণে মন আমার অস্থির অশান্ত। এর মধ্যে তুই যদি ওরকম কঠিন করে বলিস তা হলে আমি কোথাই দাঁড়াই বল্?

মন্থরা উত্তেজিত ক্রোধে অকস্মাৎ ফেটে পড়ল। ভর্ৎসনা করে বলল : পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মাটি তোমার কোথায়? কৌশল্যার সব দুর্ভাগ্য আজ সৌভাগ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীর অবহেলার আড়ালে

সে পেয়েছে সত্যিকারের ভালবাসা। স্বামীর প্রেম তাকে করবে সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী! রাজরাজেশ্বরী হয়ে সে পরম আনন্দে ভোগ করবে রাজসুখ। আর তুমি স্বামী সোহাগের গর্ব করে ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বামীর অংকশায়িনী হয়ে ক্রীতদাসের মতো দিন যাপনের আত্মগ্লানি ভোগ করবে। কৌশল্যার পদসেবা করে ধন্য হবে।

মন্থরার কণ্ঠস্বর ক্রমশ প্রলয়ঙ্কর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল।

কৈকেয়ী এক ঝলক মন্থরার মুখের দিকে তাকাল। একটা তীব্র কষ্ট তার বুকের ভেতর পাকিয়ে উঠছিল অনেকক্ষণ ধরে। মন্থরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ কৈকেয়ীকে জর্জরিত করে তুলল। দাঁতে দাঁতে পিষে কৈকেয়ী প্রাণপণে নিজের কষ্ট সংবরণ করতে লাগল। আর অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মতো মাথা নাড়ছিল। অবশেষে কষ্ট দমনে অক্ষম হয়ে আর্তস্বরে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকারে ফেটে পড়ল। কান্না জড়ানো বিকৃত গলায় বলল : কুব্জা! চুপ কর। আর পারছি না সইতে। কৈকেয়ীর বুকে তীব্র জ্বালা তার মুখে চোখে ঝলকে উঠল। দু'হাত দিয়ে কান ঢাকল।

তারপর কতদিন হয় গেল। তবু কৈকেয়ীর মন থেকে সেদিনের স্মৃতিটা গেল না। ঘটনাটা ভেতরে ভেতরে কতখানি গুরুতর তা বুঝতে একটু সময় লাগল তার। মন্থরার কথাগুলো তার মস্তিষ্কের সকল সীমায় আবদ্ধ হয়ে বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে অনবরত পাক খেতে লাগল। আর সেই সব দৃশ্য ও অনুভূতি সকল ভিতরে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা সবই জীবন্ত চিত্রবৎ হয়ে উঠল তার চোখের পর্দায়। আর কৈকেয়ী মুহুর্মুহু চমকে উঠছিল নিজের জিজ্ঞাসায়। যন্ত্রণায় অন্যমনস্ক হয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গাছপালা, উদ্যান, সরোবরের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কৈকেয়ীর চোখে দশরথের মুখ ভাসে।

কৈকেয়ী জানত না, কিভাবে পলে পলে অন্ধভাগ্য তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। নিজের মনের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে নিজেরই অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করে। শিশুকাল থেকে পিতা ছায়ার মতো আছে তার সঙ্গে। জীবনটাকে বড় নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন করে রেখেছে। ঘটনাহীন হয়ে কেটেছে তার জীবন। মেয়েমানুষ এমনিতে নিরাপত্তা খোঁজে। নিরাপদ আর নিশ্চিন্ত আশ্রয় চায়। পেয়েছেও। ফলে চাওয়ার মধ্যে কোন মতলব বা অভিসন্ধি ছিল না। নিজের ভাললাগা, মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দ, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ঈর্ষা ঘৃণা, রাগ গর্ব, অহংকার অসহিষ্ণুতা সব নিয়ে সে এক অদ্ভুত খেয়ালী আর জেদী মেয়ে। যখন যা চেয়েছে তখন তা না হলে অনর্থ করে ছাড়ত। কিন্তু পেয়ে কখনও চেয়ে দেখেনি। কি থাকল তার কি হারাল তার হিসাবও করেনি। যোগ-বিয়োগের এই অঙ্কটা সে শেখেনি কখনও করতে। সেজন্যেই পিতার দুর্ভাবনা ছিল তাকে নিয়ে। বিয়ের পরে তাকে আগলানোর জন্য এবং নিরাপদে থাকার জন্য মন্ত্রণাকে মন্থরা দেবার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু মন্থরা তার ভেতর ঘুমন্ত খেয়ালী জেদী শিশুর ঘুম ভাঙানোর জন্য কত বলেছিল, নিজে যদি নিজেকে রক্ষা করতে না শেখে তাহলে কারো সাধ্য নেই বিরাট বিশ্বের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার। স্বামী-পুত্র উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারাও কেউ নয়। সংসারে স্বার্থটাই সব। তবু মন্থরার পরামর্শ সে নেয়নি। আজ নিজেকে দেউলে করে নিয়ে যখন তার হিসেবে বসেছে তখন নিজের ও পুত্রদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিপন্ন বোধ করছে। দেরিতে হলেও মন্থরা তার চোখ খুলে দিয়েছে। প্রতিক্রিয়া সুরু সেখান থেকে। নিজের ভেতর অন্যসত্তাকে আবিষ্কার করার এক অনুভূতি তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। রাম-ভরত, লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন, দশরথ ও কৌশল্যা সকলকে নতুন দৃষ্টিতে দেখল। কিন্তু পুরনো চোখ আর মন সব গন্ডগোল করে দিচ্ছিল। ভিতরে, খুব গভীরে বহুকালের বিশ্বাস ভাঙার একটা প্রতিক্রিয়া চলছিল। আর তাতেই সে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তার অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ঘরখানা ভরে উঠেছিল। এত বিষণ্ণ শব্দ আগে কখনো শোনেনি সে। তার অভিজ্ঞতাতেও ছিল না।

কৈকেয়ী বেশ বুঝতে পাচ্ছিল যে জায়গাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে তার মাটি খুব শক্ত নয়। পায়ের নীচে মৃদু ভূমিকম্পনের স্পন্দন অনুভব করল। আসলে এটা যে কোন ভূমিকম্প নয় তাও সে জানে।

বুকের ভিতরে এক অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল। আর তাতেই ঐরকম মনে হচ্ছিল।

নিজেকে নিয়ে বরাবর তার অহংকার ছিল। কিন্তু সে যে নির্বোধের চেয়েও মূর্খ তা জানত না। পুত্রদের বিবাহের পরেই অকস্মাৎ মোহভঙ্গ ঘটল তার। সেদিনই প্রথম জানল, মানুষ নিজের কাছেই সব চেয়ে অনাবিষ্কৃত। একটা চমকানো ব্যথায় তার ভুরু টান টান হল। অপলক দৃষ্টি নীল আকাশের বুকে স্থির। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর অস্ফুট স্বরে নিজেকে প্রশ্ন করল : বুদ্ধি কি? বুদ্ধির পশ্চাতে কি থাকে? সকলের বুদ্ধি সমান হয় না কেন? বুদ্ধিবলে নিজের ভবিষৎক কেন বুঝে নিতে পারল না? ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে বুদ্ধি সাহায্য করল না কেন? এর জন্য কে দায়ী? সে নিজে? না, তার অদৃষ্ট? অদৃষ্টকে চোখে দেখা যায় না। কল্পনার অনুভব করা যায় না তার পরিণাম। তার সঙ্গে সংগ্রাম করবে কি দিয়ে? সেই অদৃশ্য ভয়ঙ্করের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন কৌশল আছে কি? অতলান্ত বুকের গভীর তল থেকে তার উত্তর এল—বুদ্ধি! বুদ্ধি মানুষকে ভাগ্যের আক্রমণের সংকেত দেয়। কিন্তু ভাগ্যের সেরকম কোন মহত্ত্ব নেই। সংকেত না দিয়ে শিকারের অজান্তে আচমকা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বুদ্ধি অদৃশ্যের চক্রান্তের সংবাদ তার গোপন মনে আগেই পৌঁছে দিয়ে আগাম সতর্ক সাবধান কবে দেয় তাকে। কিন্তু সকলে সে সংকেতের অর্থ বোঝে না। জেগে ঘুমোয় বলে দুঃখ পায় তারা।

কৈকেয়ীর নিজেকে তাই দুর্ভাগা মনে হয়। কোন সংকেত না দিয়ে পুত্রদের দ্বিরাগমনে প্রথম জানতে পারল অদৃশ্য চক্রের হাতে সে এক বন্দী পুতুল। ভরতের দুঃসহ শূন্যতা উৎসবের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল তার দুই চোখে। ধূপ, দীপ, ফুলের গন্ধ বায়ুর মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। চারপাশের সবাইকে মনে হচ্ছিল কতগুলো ছায়া ছায়া হিংস্র শবভুক নেকড়ে। উল্লাসে তাদের চোখ জ্বলছিল, মুখব্যাদান হয়েছিল খুশিতে।

নিজের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হয়ে কৈকেয়ী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে গাছপালা, উদ্যান, সরোবর, প্রসাদের অন্যান্য অংশগুলো দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু সে সব দৃশ্যবস্তুর ওপর তার চোখ ছিল না। উদাস অন্যমনস্ক আয়ত কালো চোখের তারায় ভরতের মুখ কোথা থেকে ভেসে উঠল। আর অমনি উপচে পড়া কান্নায় তার দুই চোখ বেয়ে অজস্র জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

একা একা অনেকক্ষণ কাঁদল কৈকেয়ী। একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। তারপর এক সময় কেঁদে কেঁদে শান্ত হল। তার নির্বাক পাষাণমূর্তি, শূন্য অপলক চোখ, চিন্তাশূন্য মস্তিষ্ক কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে তখন আহত আক্ষেপে ছটফট করছিল। ভাঁটার টানের ঢেউয়ের মত কলকল ছলছল শব্দে সে অব্যক্ত কথা মনের মধ্যে এক দুর্বোধ্য ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছিল। নদীর মতো সেও সেই অশ্রুত বিলাপের এক নিঃসঙ্গ শ্রোতা।

দরজার বাইরে মানুষের জোড়া পায়ের শব্দ। দরজার কাছে এসে সে শব্দ থেমে গেল। দেয়ালের গায়ে দুটি ছায়া নড়ে উঠল। কিন্তু কৈকেয়ীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে নির্বিকার, নিস্তব্ধ। এমন কি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেখার ইচ্ছাও জাগল না। আত্মসমাহিতের মতো জানালার গরাদ ধরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে হল, ভরত মান্ডবীকে নিয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে জননীর দিকে তাকিয়ে আছে। চমকানো বিস্ময়ে টনটন করছিল তার বুকের ভেতর : কয়েকমুহূর্তে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কৈকেয়ীকে দেখল, তারপর পা টিপে টিপে কৈকেয়ীর দিকে এগোল। থমথমে স্তব্ধতার ভেতরে এক তীব্র উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা। বিস্ময়কর উত্তেজনায় ভুরু টান টান হল।

সত্তার গভীরে কৈকেয়ী অণুভব করল ভরত তার গায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে। নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগে এবং একযশ গন্ধ যা একান্ত ভরতের। বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডের ধক ধক শব্দ এবং নিশ্বাসের উত্থান-পতনের শব্দের সংমিশ্রণে এক অতিস্তিমিত গুরু গুরু শব্দের অস্পষ্ট কল্লোল সে শুনতে পেল। পেছন থেকে ভরত নীচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন অস্ফুট স্বরে ডাকল : মা!

কৈকেয়ীর জননীর হৃদয় কেঁপে উঠল। অমনি স্নেহ যেন বেগবান জলপ্রপাতের মতো পাহাড়, অরণ্য কাঁপিয়ে অজস্রধারায় ঝরে পড়ল বুকের ভেতর। ভরতের আহ্বান যেন তার সমস্ত সত্তার ভেতর

কাঁপন ধরিয়ে দিল। তাকে সহ্য করার জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে জানালার গরাদ আঁকড়ে ধরল। আর সেই দুই হাতের স্পর্শের মধ্যে তার সমস্ত শরীর স্পন্দিত হতে লাগল।

কৈকেয়ী নিরুত্তর। ভরতের বুকে অভিমানের সমুদ্র। ঘন নিঃশ্বাসের মধ্যে অস্ফুট উদ্বিগ্নস্বরে ডাকল, মা! আমি তোমার ভরত। দ্যাখ, কে এসেছে?

ভরতের অস্ফুটে কেঁপে যাওয়া গলারস্বর কৈকেয়ীকে স্থির থাকতে দিল না। আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল তার দিকে। চোখের কোণে বড় বড় জলের ফোঁটা চিকচিক্ করছিল। থির থির করে ঠোঁট কাঁপছিল। অস্থিরভাবে একবাব ভরতের দিকে আর একবার মান্ডবীর দিকে তাকাল। কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মুখ রাঙা হয়ে গেল।

কৈকেয়ী কল্পনায় দেখল মাণ্ডবী মাথা হেঁট করে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তৃপ্তিতে, আনন্দে, সুখে, স্বস্তিতে ভরে গেল তার বুক। দু'হাতে মাণ্ডবীকে কাছে টানল। অমনি বুকের মধ্যে অভিমানের তুফান উঠল। রুদ্ধ স্বরে ঢোঁক গিলে ভরতকে উদ্দেশ করে বলল : এতকাল আমায় ভুলে থাকতে তোর একটুও কষ্ট হল না বাবা? কত আশা নিয়ে তোমার পথ চেয়ে তাকিয়ে আছি। হতভাগ্য দুঃখিনী মায়ের পথ তাকানোই শুধু সার হল। সারা জীবনটা আমার একভাবে কাটল। স্নেহের সাগর আমার শুকিয়ে গেল। ভরতের মুখ বিবর্ণ হল। জবাব দেবার মতো কথা খুঁজে পেল না।

কৈকেয়ী চোখের জল মুছে, থমথমে মুখে মাণ্ডবীর দিকে তাকাল। তারপর তাকে নিয়ে পালঙ্কে বসাল। নিজেও বসল তার গা ঘেঁসে। মাণ্ডবীর হাতে হাঙরমুখো কঙ্কন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল : আমার দুঃখ কষ্টে ছেলের কিছু যায় আসে না। আমি ওকে শুধু পেটে ধরেছি। কিন্তু আমি যে ওর কেউ এটা মনেই করে না। পেটের কাঁটার মতো বড় শত্রু আর নেই।

মাণ্ডবী কি বলবে? অসহায়ের মতো একবার ভরতের দিকে আর একবার কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। অর্ধস্ফুট স্বরে বলল : আমি করব কি? তোমার ছেলেই আমাকে আনেনি। দোষটা তো তার।

ভরত একটু দ্বিধায় পড়ল। মলিন লাগল তার মুখ। কিন্তু চোখেতে একটু অনুগত ভাব। দোমনা করে ভুরু কুঁচকে বলল : কি করব বল? আমার হয়েছে সমস্যা। তোমাকে খুশি করতে গেলে দাদামাশাই অসন্তুষ্ট হয়। আবার তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে তুমি বঞ্চিত হও। এই সমস্যা এড়ানোর জন্যে মহামন্ত্রী বশিষ্ঠের পরামর্শে শত্রুঘ্ন তোমার কাছে এল, আমি গেলাম কেকয়ে। এটা আমার কর্তব্য। জন্মাবধি কেকয়ে আছি। দাদামশাই আমাদের সব। তার টানটা মায়ের চেয়ে কম নয়।

কৈকেয়ী চমকাল না! ছেলেদের এই মনোভাবের কথা সে ভাল করেই জানে। তার নিজেরও একথা মনে হয়। পিতৃস্নেহ কি, ভরত শত্রুঘ্ন তা জানে না। এক জায়গায় থাকলে ভাইয়ে ভাইয়ে মন কষাকষি যদি বাড়ে সেজন্য দশরথ একটা বিভেদ নীতি মেনে চলেছে সব সময়। ফলে রেষারেষি বাড়েনি। দশরথ জানে মন কষাকষি মানুষকে খণ্ডিত করে দেয়, ছোট করে দেয়। দশরথের এই মতলবের কথা মনে হতে সে একটু আনমনা আর উদাস হয়ে গেল। কয়েক পলক মুগ্ধ চোখে ভরতের দিকে তাকিয়ে রইল। বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে ভরতকে বলল : কিন্তু আমার অপরাধ কি, তা আজও জানি না। রাম লক্ষ্মণ পিতৃগৃহে থাকল, আর তোদের চিরকাল মতুলালয়ে কাটতে হল এই রহস্যের কোন কূলকিনারা খুঁজে পাই না। জননী হয়ে আমার সন্তানদের কেন কাছে পেলাম না? কেন আমার স্নেহসত্তাকে তিল তিল করে হত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হল? আমার পুত্রদের একসঙ্গে মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করা হল কেন? আমাদের মা-ছেলের এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ব্যথার দিকে কেউ কখনো ফিরে তাকাল না। আমরা অযোধ্যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলাম। যে লোকটা আমাদের আদরের নামে অবহেলা করল, আমাদের সুখ দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকাল না—তার আকাঙ্ক্ষা আমি একেবারে শেষ করে দিতে চাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আমার পুত্রেরা যে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। মায়ের কোন্ অধিকার আর দাবি নিয়ে তাদের কাছে আমি দাঁড়াব? আমার কি আছে? বলতে বলতে কৈকেয়ী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দেখতে দেখতে বারো বছর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নানারকম ঘটনা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। কোথা দিয়ে কিভাবে কাটল তার কোন হদিস খুঁজে পেল না দশরথ।

অযোধ্যা এখন চাঁদের হাট। চারপুত্র এবং বধূদের নিয়ে দশথের সুখের সংসার। কোন দুশ্চিন্তা নেই। রাজধানীতে রাম-লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন'র ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, বিক্রম নিয়ে নানারকম রসালো গল্প শোনা যায় সবার মুখে। এক অনাবিল, সুখ, শান্তি আনন্দ আর আমোদের ভেতর অতীত হারিয়ে গেল। পেছনের দিনগুলোর কথা মনে করতেও ইচ্ছা করল না। নিশ্চিন্ত অবকাশের মুহূর্তে কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতা তাকে বর্তমান ঘটনার আড়ালে টেনে এনে মনের জানলায় বসিয়ে যেন নিভৃত আলাপ সুরু করল। এ যেন নিজের মনের সঙ্গে নিজের কথা। সে কথার মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজের অজান্তে ভাবত; স্নেহ-মোহ আচ্ছন্ন দৃষ্টি হয়ত ঠিক জিনিসটা ঠিকমত ধরতে পারছে না। তাই ভেতরটা দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে, জীর্ণ হয়ে পড়ছে, একটা দুঃসহ ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর নুয়ে পড়ছে এটা বেশ বুঝতে পারে। এমনি করেই একদিন জীবনের স্পন্দন হঠাৎ থেমে যাবে। সেদিন আসবার আগে সিংহাসনের একটা সুব্যবস্থা করে যেতে হবে তাকে। পুত্রদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব এমন সুবিন্যস্ত করতে হবে, যাতে সবাই নিজের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিতে কাজ করতে পারে। পরস্পরের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারে। এরকম একটা ঘোর লাগা চিন্তার আচ্ছন্নতার ভেতর কেকয়রাজের মুখখানা পলকের জন্য তার চোখের উপর ভেসে ওঠল।

সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা দুইই শান্ত বর্তমানে। ক্ষমতাকে নিজের হাতে রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজকে কেবল দীর্ঘায়িত করেছে। এর ফলে উত্তাপ উত্তেজনা দুইই হ্রাস পেয়েছে। কারণ, তার জীবদ্দশাতে সিংহাসনের উপর কারো দাবি নেই। তাই উত্তরাধিকার নির্বাচনের কাজটা ক্রমাগত বিলম্ব করে গোটা ব্যাপারটা একরকম চাপা দেওয়া হল। তাতে উত্তেজনার আগুন নিভল। তারপর, ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে যে নোংরা রাজনীতি প্রাসাদে চলছিল তা বন্ধ করার জন্য কেকয় থেকে তাদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনা হল। খুব কৌশলে, কোনরকম রাজনৈতিক মূল্য না দিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারল দশরথ। সাফল্যের গৌরবতৃপ্তিতে মন তার ভরে উঠল।

এখন চারপুত্রের মেলামেশা গভীর, অবাধ ও অন্তরঙ্গ। পুত্রদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ-মুক্ত স্বর্গীয় ভ্রাতৃপ্রেম দশরথকে নিশ্চিন্ত এবং সুখী করল। এরকম যে কখনও হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি দশরথ। ভাগ্যই তার অনুকূলে সমস্ত ঘটনাস্রোত ঘুরিয়ে দিল।

সাঁইত্রিশ বছরে পদার্পণ করল রাম। অথচ এখনও অভিষেক হল না তার। ভরতের কথা চিন্তা করে কাজটা আটকে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে আর কোন ব্যাপার নয়। তাছাড়া, প্রাসাদের অভ্যন্তরে যে বিভেদ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস জমে উঠেছিল দীর্ঘকাল ধরে বারো বছরে তার উৎস শুকিয়ে যাওয়ার কথা। কতকাল বা একটা ইচ্ছাকে পোষণ করা যায়? অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার গণ্ডিতে মানুষ বদ্ধ থাকতে পারে কতদিন? দোটানার কষ্ট, প্রতীক্ষার ধৈর্য, শৃংখলার সংযম, অতৃপ্তির হা-হুতাশে বাধ্য হয়, পাগল ইচ্ছাকে জোর করে চাপা দিতে।

বারোটা বছর যে সব কিছু বদলে দিল দশরথ তা স্পষ্ট অনুভব করল। সময়টা এখন সব দিক দিয়ে শুভ। ভাগ্য এবার তাকে কিছু করার সংকেত দিল। জীবনের মোড় ফেরানোর এই ইংগিত কয়েকদিন ধরে বুকের গভীরে অনুভব করতে লাগল দশরথ। মনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য দশরথ মন্ত্রণাসভা ডাকল। দূরদর্শী রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, ধৌম্য, কাশ্যপ, গৌতম প্রমুখদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সভা বসল। ভারী মন নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করল দশরথ। রাজকীয় সৌজন্য আর শিষ্টাচার প্রকাশ করে জলদগম্ভীর স্বরে বলল : আপনারা জানেন, বহুবর্ষ ধরে আমি পুত্রতুল্য যত্নে প্রতিপালন করেছি আমাদের অযোধ্যাকে। এখন আমি বৃদ্ধ। কর্মে অশক্ত। রাজকার্য-পরিচালনায় পূর্বের উৎসাহ ও উদ্যম অনুভব করি না। দেহে আমার বার্ধক্যের

ক্লান্তি ও অবসন্নতা। সবদিক ঠিকমত নজর রাখা কিংবা কোন গুরুতর সমস্যার কথা সর্বদা বিস্মৃত হই। এ অবস্থায় শাসনকার্যের মতো দায়িত্বপূর্ণ প্রজাহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকা শ্রেয় মনে করছি না। বহুকাল পূর্বেই এই কর্তৃত্ব থেকে আমার অব্যাহতি পাওয়ার কথা। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সুযোগ হতে বঞ্চিত আছি। বর্তমানে এই পদে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। এখন আপনারা সব দিক বিচার বিবেচনা করে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে দিন। আপনারা আমার বন্ধু, হিতৈষী, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং এ রাজ্যের প্রকৃত পরিচালক। অযোধ্যার স্বার্থ, ইক্ষবাকু বংশের প্রাচীন গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে আপনারাও কৃতসংকল্প। আমার পূর্বপুরুষদের পন্থা অনুসরণ করে অযোধ্যার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে আমায় অবসর দিন। আপনাদের কাছে আমার এটুকুই নিবেদন।

দশরথের কথা শুনে সবাই অবাক হল। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। এরকম একটা অদ্ভুত বিষয় আলোচনার জন্য সভা আহ্বান হতে পারে ভেবে তাঁদের অনেকে বিস্মিত হলেন। এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা কক্ষে বিরাজ করছিল। তাঁদের কৌতূহলী চোখের অগাধ বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে অমাত্যপ্রধান সুমন্ত বলল : মহারাজের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সিংহাসন আঁকড়ে থাকার কথা নয়। অনেক আগেই সুযোগ্য পুত্রদের হাতে রাজ্যের ভার অর্পণ করে সুখে সকাল কাটানো উচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই তা হয়নি। আপনারাই তাঁকে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন তিনি অবসর চান। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করার কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আপনারা অবহিত। এখন সিদ্ধান্ত করুন কি করলে ভাল হয়?

সুমন্তের বাক্যকে সকলে সাধুবাদ দিল। প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেল। তাদের ভাবনা কল্পনা উদ্দীপিত করার জন্য ধৌম্য বলল : মহারাজার পুত্রদের মধ্যে রাম অগ্রজ। সিংহাসন তার প্রাপ্য। বীর্যে পুরন্দরের সমান, কূটকৌশল নির্ণয়ে ব্রহ্মার সমকক্ষ। এ হেন পুরুষশ্রেষ্ঠকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সংকল্প যদি সাধু বলে বিবেচিত হয় তাহলে আপনারা অনুমতি করুন।

বশিষ্ঠ বলল : এই প্রস্তাব আমাদের সকলের প্রিয়। তবু, এই প্রস্তাব সমর্থন করার আগে আপনারা ত্রিকাল সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে বলুন। দেখা গেছে, অনেক জটিল গভীর ব্যাপারে সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তিও কার্যকারণ ভুলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভুল করেন। আমরা তিনজনেই মহারাজের শাসনকার্যের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। নিরপেক্ষ হওয়া আমাদের মুশকিল। একমাত্র পক্ষপাতহীন ব্যক্তিদের বিচার শ্রেষ্ঠ হয়। এজন্যেই আপনাদের পরামর্শ প্রার্থনা করা। প্রতিপক্ষকে নিষ্ক্রিয় ভাবার কোন কারণ নেই। আড়ালে-আবডালে তারা সক্রিয়। একথা মনে রেখে ধর্মপ্রাণ রাজার ধর্মরক্ষার জন্য যা করলে ভাল হয় তাই করুন।

বশিষ্ঠের বাক্যে দশরথ চমকাল। দুই চোখে তার অবাক বিস্ময়। বুকের ভেতর প্রশ্নের সমুদ্র, সংশয়ের অজস্র ঢেউ তোলপাড় করতে লাগল। বশিষ্ঠের কথায় এ কিসের ইংগিত? কি বলতে চাইছে বশিষ্ঠ? তার কথাগুলো বিঘ্ন উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। জেনে শুনে বশিষ্ঠ এরকম কথা বলল কেন?

প্রত্যেকেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। নিঃশব্দ স্তব্ধতায় কক্ষ থমথম করছিল। শুধু নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর কাশ্যপ বলল : রাম অগ্রজ। সিংহাসন তারই প্রাপ্য। উত্তরাধিকার নিয়ে সংশয় বা দ্বিধা কেন?

গৌতম তৎক্ষণাৎ বলল : রামের সময়টা গ্রহ নক্ষত্রের বিচারে খুবই শুভ। কিন্তু সূর্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহের দশা যার আছে তার সঙ্গে জাতকের যদি কোন সম্পর্ক থাকে তাহলে জাতকের ভাগ্যফল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এটুকু ছাড়া আর কোন দুর্লক্ষণ নেই। রামের জন্ম-নক্ষত্রে কোন বিপত্তি নেই। কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সুমন্ত্র গৌতমের কথা লুফে নিয়ে বলল : অনুকূল ভাগ্যফল নিঃসন্দেহে শুভকার্য সম্পন্নে সময় বিচার্য। এখনকার আলোচনা সম্পূর্ণ আলাদা। রাম ভরত একই সময় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সময়ের চুলচেরা বিচারে রাম অগ্রজ। সিংহাসন তারই প্রাপ্য। তবু কেউ যদি ভরতের উত্তরাধিকার দাবি করে সংকট ডেকে আনে তাহলে আমাদের কর্তব্য কী হবে?

জাবালি বলল : একবার রামের সিংহাসনে অভিষেক হয়ে গেলে আর কারো দাবি গ্রাহ্য হবে না। যুদ্ধ করে তখন অন্যকে তার অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

বামদেব তৎক্ষণাৎ জবালিকে সমর্থন করে বলল : এক সিংহাসনের উপর দু'জনের অধিকার থাকতে পারে না। শাস্ত্রে আছে যমজ ভ্রাতার মধ্যে যে অগ্রজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব তারই। অতএব ভরতের কোন দাবিই গ্রাহ্য হতে পারে না।

গৌতম সংযোজন করল : রাম জনগণের একান্ত প্রিয়জন। জনসাধারণের কাছে তার যোগ্যতা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত। নেতৃত্ব করার আগে জনসেবার গুরুদায়িত্ব সে পালন করেছে। জনস্বার্থের সঙ্গে তার একটা নিবিড় অন্তরঙ্গ যোগ ঘটেছে। সে একেবারে অযোধ্যার মাটি থেকে উঠে এসেছে। রামের একটা ভাবমূর্তি রয়েছে জনগণের মধ্যে, দেশে এবং দেশের বাইরেও। রাজ্য শাসনের জন্য চাই জনচিত্ত অধ্যয়ন, জনস্বার্থের বিচার বিশ্লেষণ করার দক্ষতা। মহারাজের পুত্রদের ভেতর একমাত্র রামের এ গুণ আছে। চরিত্রে মহত্ত্বে, কর্মে, নৈপুণ্যে, জনসেবায়, মহান আদর্শে রাম শুধু মহান মানুষ নয়, সে একটা আদর্শ এবং মতবাদ। সুতরাং তার দাবিকে ন্যায়ত, ধর্মত, কার্যত নস্যাৎ করার অধিকার কারো নেই।

দশরথ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল : তাহলে আপনাদের বিবেচনায় রমাচন্দ্রই অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমি জানতুম আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন। আপনাদের উপর এটুকু আস্থা আছে বলেই এ বৃদ্ধ বয়সেও এ গুরুভার বইবার সাহস রয়েছে। আমার বল ভরসা যা কিছু সব আপনারা। রাজসভার সিদ্ধান্ত আমাকে একটা মহাসংকট থেকে বাঁচাল। এখন আমার কোন দ্বিধা সংশয় নেই। অযোধ্যার বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আপনারা যা করলেন তার তুলনা নেই। এখন আপনারা অনুমোদন করলে রামচন্দ্রের অভিষেকের ব্যবস্থা করতে পারি।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলে একবাক্যে অনুমোদন করলে দশরথ পুনরায় বলল : বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। যে কোন সময় একটা কিছু অঘটন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আমার জীবদ্দশাতে রামের অভিষেক দেখে যেতে পারব মনে হয় না। একমাত্র জরুরী ভিত্তিতে যদি এই কার্য দ্রুত নিষ্পন্ন হয় তাহলেই হয়ত নিজের হাতে তাকে অভিষেক করতে পারব। ভরত এখন রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে আছে। এখনই অভিষেকের উপযুক্ত সময়। আপনাদের অনুমোদন পেলে বিনা বাধাতেই রামের অভিষেক করতে পারি।

সহর্ষে দায়িত্বশীল রাজনীতিক সভাসদবর্গ দশরথের প্রত্যাশা পূরণের সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। দশবথ পুলকিত হয়ে তাদের সপ্রীতি অভিনন্দন জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করল।

সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি নিয়ে মন্ত্রণাসভা থেকে বেরিয়ে দশরথ নিজের কক্ষে প্রবেশ করল। কিন্তু এই কক্ষের প্রতিটি ইট কাঠ তার জীবনে অনেক ঘটনার সাক্ষী। তাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা। এ কক্ষের বাতায়ন তাকে জানিয়ে দেয়, প্রভাতে সূর্য ওঠার সময় আকাশে কোন রঙ ধরে, কেমন করে সে রঙ বদলায়। গাছের পাতাগুলি কেমন করে শীতে রিক্ত নিঃস্ব হয়, সন্ধ্যায় কিভাবে দিগন্তে রহস্য জমে ওঠে—সব তার জানা। তৃপ্তি সুখের উল্লাস নিয়ে দশরথ কক্ষে পা রাখল। অমনি চারদেয়ালে দরজা জানালা, কড়ি, বরগা সব মৌন, কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষ নয়নে দশরথকে দেখতে লাগল। কক্ষের প্রতিকোণ হতে অস্পষ্ট ধিক্কারেরর চাপা স্বর সে শুনতে পেল। শত শত প্রশ্ন যেন তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বোবা ভাষায় তাদের নীরব তিরস্কার দশরথের মন ছুঁয়ে রইল। বুকে তার অস্থির যন্ত্রণা। দশরথের কাছে জবাবের জন্য তাদের কোন জুলুম নেই, তবু দুঃসহ দৃষ্টির তীব্রতা সে সইতে পারছিল না। প্রতিক্ষণ যেন তার উপর চাবুক হানছিল। আর যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল সে।

নিঃশব্দতা ভয়ঙ্কর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল : অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে তোমার জীবন। অনেক ঘটনা নিয়ে তোমার অতীত। অথচ, কী আশ্চর্য ঔদার্যে আর ঔদাস্যে তাদের ভুলে গেলে তুমি। নতুন আস্বাদ বারংবার তোমার জীবনে উন্মাদনা এনেছে। কিন্তু তাতে জীবনের বঞ্চনা আর পাওনা শুধু বেড়ে গেছে। জীবন থেকে তুমি যা আদায় করে নিয়েছ তার অল্পই দিয়েছ ফিরিয়ে।

কিন্তু এক অসামান্য সম্পদকে অবহেলা করে তার গৌরব নষ্ট করলে। এর পুরো দাম না নিয়ে রামকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবে কেমন করে? কৈকেয়ীকে বিশ্বাস করে যে জয় সহজ ও অনিবার্য হত, তাকে ও তার পুত্র ভরতকে সন্দেহ করে তুমি সে জয়কে অনিশ্চিত করলে। ভরতকে কৌশলে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দেবার কি দরকার ছিল তোমার? অযোধ্যা থেকে তাদের দুভাইকে সরিয়ে মন্ত্রণাসভা ডাকতে গেলে কেন? নিজের আত্মজকেই অবিশ্বাস? তার মতো বাধ্য অনুভূত পিতৃভক্ত পুত্রকে তোমার ভয় পাওয়ার কি আছে? ছিঃ রাজা! যে মাটি থেকে রস টেনে গাছকে বেঁচে থাকতে হয়, সে মাটির রসটুকু শুকিয়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে? ভরতকে সরিয়ে রামকে সিংহাসনে বসান অনেকটা সে রকম গোছের ঘটনা। আজ না বুঝলেও ভবিষ্যতে জানতে পারবে। ছলনা বঞ্চনা প্রতারণা দিয়ে আপাতত যে জয়ের রাস্তা তৈরি হল তার ফাঁক ও ফাঁকি শূন্যতা ঢাকতে গিয়ে কাল তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে। জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে তৃপ্ত হওয়ার মত কোনো অবকাশ তুমি পাবে না।

দশরথের হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হল। মনের মধ্যে একটা নিবিড় ব্যথা জমে বসল, সঙ্গে খানিক ক্লান্তি। কিন্তু এখন তার ফেরার পথ বন্ধ। নিজের নৌকোকে ভরাডুবি থেকে এখন নিজেকেই বাঁচাতে হবে। বিজয়কে পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে এখন মনের বেশি ভাগ শক্তি তাকে কাজে লাগাতে হবে। মেজাজটাকে একটু বেশ চাঙ্গা করার জন্যে পানপাত্রে সুরা ঢালল।

খানিকটা পরিতৃপ্তি আর খুশির ভাব নিয়ে সে আপন মনে থরময় পায়চারি করতে লাগল। নিজের অজান্তে খোলা বাতায়নের সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়াল। এখন আকাশ আর নীল নেই। গাঢ় ধূসর রঙে ছেয়ে গেছে। চুপি চুপি সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারেরর কোমল স্পর্শে পৃথিবী স্নিগ্ধ হতে চলেছে। হাসনাহানার মিষ্টি গন্ধে বাতাস আকুল হয়ে উঠেছে। ঝিঁ ঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে দূরে। সন্ধ্যাতারা আকাশের এক কোণে একাকী ধক্ ধক করে জ্বলছে।

চৈত্রমাস।

নির্মল আকাশ।

পড়ন্ত রোদে তখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব জড়ানো।

কৈকেয়ী নিজের কক্ষে পালঙ্কে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে ভরতের মহলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

অপরাহ্নের শেষ আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। পাখিরা যে যার কুলায় ফিরছে। বলাকারা দল বেঁধে মালার মতো ভেসে চলেছে দিগন্তের কোন পারে? শান্ত অনুগত সন্ধ্যা তার পিছু পিছু এল নেমে।

আঁধার ঘন হল।

কক্ষে কক্ষে দীপ জ্বলে উঠল। রাজপুরী দীপালোক উদ্ভাসিত হল। কৈকেয়ীর বুকের ভেতর কি যেন এক হারানোর যন্ত্রণায় টনটনিয়ে উঠল। দিনান্তে ভরত শত্রুঘ্ন একবার করে তার কক্ষে আসে। বারো বছর ধরে এইভাবে চলে আসছে। কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাত্রি হলেই তৃষিত চাতকের মতো কী গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাদের পথের দিকে তাকিয়ে তাকে। কোন কারণে সময়ের এধার-ওধার একটু হলে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় সে ঘর-বার করতে থাকে। অজানা আশঙ্কায় বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। নিশ্বাস বন্ধ করে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন এল না? মুখে কষ্টের ছায়ায় একটা কাঠিন্য নামে। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চোখ ভিজে যায়। সংশয়ভরা ভয়ে নিশি পাওয়ার মতো সম্মোহনের ঘোরে এক পা এক পা করে তাদের কক্ষে গিয়ে ওঠে। ভরত শত্রুঘ্ন তার দুটি কলিজা। তাদের বিচ্ছেদ তার কাছে দুঃসহ। একবার তাদের না দেখে থাকতে পারে না। এসব জেনেও দশরথ ভরত শত্রুঘ্নকে হঠাৎ মাতুলালয়ে পাঠাল।

তারপর থেকে কক্ষে নিজেকে বন্দিনী মনে হয় কৈকেয়ীর। কৌতূহলের তীব্রতা বঞ্চনার কষ্টে,

তীব্র অভিমানে তার বুকের ভেতর টনটনিয়ে উঠে। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশায় ব্যথা লাগছিল দপ দপ করছিল বুক। এক অসহায় অভিসম্পাতের মতো মনে হয় নিজের অবস্থাকে। ভরত শত্রুঘ্নের অভাবে বুক খাঁ খাঁ করে। জীবনের কোন আকর্ষণ খুঁজে পায় না। একটা ক্লান্তিকর বোঝার মতো নিজেকে বয়ে বেড়ায়। বুকের মধ্যে একটা ভয়ের আশঙ্কার চমক, উদ্বেগ ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে তাকে কেমন বিভ্রান্ত করে তোলে। প্রাণটা যেন কিসের ভারে ভেঙে পড়ছে, যা প্রায় অসহনীয়।

কৈকেয়ীর নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে অকস্মাৎ মনে পড়ে দশরথের মুখ। এই লোকটা তার সুখের কাঁটা। তার জীবনের অভিসম্পাত। পুত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে তার আতঙ্ক। কেন এই আতঙ্ক তার? কি জন্য? জন্ম থেকে পুত্রেরা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত। নিজেও সাধ মিটিয়ে পুত্রদের পায়নি কখনও। ফলে মনের গভীরে এক জটিল সঙ্কট উপস্থিত, যার স্বরূপ সে নিজেও বোঝে না। স্বামী হয়ে দশরথও জানতে চেষ্টা করেনি। নিজের স্বার্থ এবং প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে দশরথ ভরত শত্রুঘ্নকে কখনও তার মায়ের কাছে রেখেছে, কখনও আবার সরিয়ে দিয়েছে। জননীর স্নেহের দাবিকে, অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে। এমনি করে তার জননী হৃদয় বারংবার রক্তাক্ত হয়েছে। স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমবশত নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করেছে নিজের কষ্টকে। তাতেই মনটা শ্মশানের মতো হয়ে গেছে। কোমল মন স্নেহপিপাসু জননী-অন্তর ভরত শত্রুঘ্নের অভাবে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। পুত্রদের হৃদয়ে তার কোন আশ্রয় থাকুক দশরথ চায়না। স্বামীর স্বার্থের অশোভন প্রকাশ তার মনে একটা অজ্ঞাতে উদ্বেগ আর অকারণ ভয় ছড়ায়।

কৈকেয়ী যেন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। বুকটা মোচড় দিল। নিজের অজান্তে ফুঁপিয়ে ওঠার মতো আর্তনাদ করে ওঠল : উফ্! আর পারি না। ঈশ্বর, আর কত শাস্তি দেবে? ডান হাত দিয়ে বুকটা খামচে ধরল। তখন তার চিন্তার মধ্যে যুক্তি-বিচার কাজ করছিল না। তথাপি ঘটনা পরম্পরায়, দৃষ্টির সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা থেকে তার মনের মধ্যে এক আশ্চর্য বোধ জন্মাল। মনে হল জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতায় সে একা। তার মধ্যে যে নিষ্পাপ জননী রয়েছে দশরথ তাকে তিল তিল করে হত্যা করছে। কৈকেয়ীর আরো মনে হল দশরথ নির্দয়, নিষ্ঠুর। তার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে দশরথের প্রতি এটা তীব্র ধিক্কার বুকের ভেতর গর্জে উঠল। দশরথের কপট স্নেহ, তার স্বার্থপরতা, বিভেদের মনোভাব কৈকেয়ীকে কুপিত করল। একট দুরন্ত ক্রোধে উন্মত্ত আক্রোশে তার ধমনীতে তরল আগুনের স্রোত বইছিল। কৈকেয়ীর জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। দশরথকে আঘাত করার জন্য তার কক্ষে যাবে বলে পালঙ্ক থেকে নামল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তে মনের মধ্যে সে ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেল। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে এক গভীর অভিমান তার মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল হল, যার স্বরূপ সে নিজেও ভাল করে বোঝে না। যা তার অচেনা এবং অব্যক্ত। যে কোন চিন্তার মুহূর্তে কৈকেয়ী ইদানীং অসহায় হয়ে পড়ে। পুত্রদের হারানোর একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আর ভয় তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছড়ায়। যাওয়ার আগ্রহ ফুরোয়। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে সে পালঙ্কের উপর আছড়ে পড়ল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে হু হু করে কাঁদল। কান্নায় কৈকেয়ীব শবীব ফুলে ফুলে উঠল। কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল। তারপর একসময় নিজেই চুপ করল।

হলুদ রঙের মোটা রেশমের কাপড়ের পর্দা সরিয়ে মন্থরা ঢুকল। গম্ভীর বিষণ্ণতায় কৈকেয়ীকে অন্যমনস্ক দেখল। আরো কাছে গিয়ে দেখল তার চোখ বোজা, গলিত অশ্রুতে গাল ভেজা। মন্থরা অবাক হল। ভুরু কুঁচকে গেল। মন্থরার অলঙ্কারের টুং টাং শব্দে, শাড়ির খসখস আওয়াজে সচকিত হয়ে সে ঘাড় ফেরাল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে দু'জনে দুজনের দিকে তাকাল! কৈকেয়ী এক চমকানো ব্যথায় কিছুটা বিব্রত হয়ে মন্থরার চোখে চোখ রাখল।

থমকানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতায় মন্থরার ভুরু টান টান হল। দুই চোখে একটা তীব্র সন্দেহ ধারাল ছুরির মতো চক্ চক করে উঠল। ভ্রূকুটি দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল। কিন্তু কৈকেয়ী মন্থরার দিকে তাকাচ্ছিল না। পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিল। মন্থরা অপলক চোখে তাকে খুঁটিয়ে দেখছিল!

বড় মায়া হল মন্থরার। কৈকেয়ীর মাথার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল। তারপর তার পাশেই

একটু জায়গা করে বসল। মুগ্ধ চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : তোমাকে অশান্ত দেখলে স্থির থাকতে পারি না। শরীরের মধ্যে এক অ প্রতিরোধ্য উন্মাদনা আমাকে অস্থির করে তোলে। তখন নিজেকেই প্রশ্ন করি : কি পেল মেয়েটা? স্বামী, প্রেম, সন্তান, মাতৃত্ব—সব আছে তার, তবু তার মতো রিক্ত, নিঃস্ব কেউ নেই দুনিয়ায়। কেন? কার জন্য তার এই অবস্থা?

আবেগে আনন্দে কৈকেয়ীর বুক থরথরিয়ে কাঁপল। অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। মন্থরার দিকে তাকাতে গিয়ে তার দুচোখ জলে ভরে গেল। ভেজা গলায় কাঁপা স্বরে বলল : ভরত শত্রুঘ্ন'র জন্য আমার মন কেমন করছে।

তুমি ছেলে দুটোকে ক দিন কোলে পিঠে নিয়েছ তাও আঙুলে গোনা যায়। তাদের কাউকে তো কখনো আত্মীয় করে তোলার চেষ্টা করলে না। তবু তোমার ওসব মনে হচ্ছে। এ তো আশ্চর্যের কথা!

কৈকেয়ী রাগল না। ধীর স্বরে বলল : ঠিক, আমার মতো সমস্যায় না পড়লে তুমি কখনোই আমার কথা বুঝতে পারবে না। আমকে ব্যঙ্গ করা খুব সোজা।

মন্থরা স্থির দৃষ্টিতে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর একটু অদ্ভুত হাসল। সেই হাসিতে রোজকার দেখা মন্থরা বদলে গেল হঠাৎ। ধীর স্বরে বলল : কে জানে? ভাবের কথা শোনার মতো মন নেই। এদিকে যে আর এক সর্বনাশ হতে চলেছে তার খোঁজ রাখ কি?

সর্বনাশ! সর্বনাশের কি হল?

আমি তো তাই মনে করি।

কি মনে কর?

মন্থরা গভীর এক দৃষ্টিতে কৈকেয়ীর দিকে চেয়ে স্নেহভরে বলল : তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর? তোমার কি মনে হয় মহারাজ এবং রাম লক্ষ্মণকে কালিমালেপন করায় আমার সুখ?

কৈকেয়ী বড় বড় চোখ করে তাকাল তার দিকে। স্নিগ্ধ গভীর সে দৃষ্টি ছলছল করছিল। বলল : এ কথা বলছ কেন?

এসব নিয়েই তো আমার কথা। তাই মনটা কেমন ঝাঁৎ করে উঠল। কেমন একটা সন্দেহে গুলিয়ে উঠল। একটা অস্বস্তিতে বুকের ভেতরটা আমার অস্থির হয়ে আছে। তাই আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব জানা দরকার ছিল।

কৈকেয়ী মন্থরার কথা শুনে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করল। ধরা গলায় বলল : নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর। আমি কি করেছি? কেন এই অবিশ্বাস? কেন সন্দেহ?

মন্থরা একটা শ্বাস ফেলে বলল : দুঃখে, রাগে, কষ্টে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। আমার অস্ত্রই আমার বশে নেই। অথচ, অযোধ্যা নাটকে কৈকেয়ীই সব। তার পর কণ্ঠস্বর বদলে বলল : আচ্ছা, তোমার কিছু জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না?

কৈকেয়ী হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। সম্মোহিতের মতো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল : আমার সব রাগ এখন তোমার উপর। কিন্তু রাগের তো কোন দাম নেই। নিজের মূর্খতাকে ঢাকব কি দিয়ে? জন্ম থেকে আমি একটা খেলার পুতুল। আমাকে নিয়ে তুমি, পিতা, স্বামী যা খুশি খেলছ।

মন্থরার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ টান টান করে বলল : হবেও বা। কিন্তু তুমি যদি একটু চতুর হতে তা হলে ওরকম ধারণার কথা কখনও মুখে উচ্চারণ করতে না। এ বাড়ির বাতাস শুঁকলে তো মানুষের মনোভাব টের পাওয়া যায়।

গভীর হতাশা মর্মরিত হল কৈকেয়ীর কম্পিত দীর্ঘশ্বাসে। আমি মেয়ে মানুষ। ঘর সংসার, স্বামী পুত্রকে নিয়ে আমার জীবনগণ্ডি। আর নিজের বলতে আছে এক অদ্ভুত খেয়াল আর জেদ।

মন্থরার ভুরু যুগলে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসার বিস্মিত অভিব্যক্তি। ওষ্ঠে বক্র হাসির ধার। বলল : তাই বুঝি? তবু জননী হয়ে পুত্রের স্বার্থ বুঝলে না। অনেককাল ধরে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। মনেতে তার একটা ধারণাও তোমার ঢুকিয়ে দিয়েছি। তবু

কৈকেয়ী বলল : বিপন্ন বিব্রত মুখে অসহায়ের মতো মন্থরার মুখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল : আমার সরল বিশ্বাস আমাকে ঠকিয়েছে। মেয়ে মানুষের জীবনের স্বামী সব! এই বিশ্বাসে মন আমার দুর্বল। স্বামীর দাবি ছাড়তে পারিনি বলে পুত্রদের স্বার্থ ভুলেছি! কিন্তু এখন আমরা চোখ খুলেছে। আর ভুল করব না।

মন্থরার দুই ভুরুর মাজখানে কুটিল জিজ্ঞাসার এক বিস্ময় ফুটে উঠল। গম্ভীর স্বরে বলল : ভুল তো এখনও করছ। চোখ থাকতেও দেখতে পাও না তোমার পায়ের তলায় মাটি নেই। মন্থরার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ফুটে ওঠল। উত্তেজিত স্বর উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে ওঠল। চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। একটু থেমে বলল : তোমার দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়? ভয়ঙ্কর সর্বনাশ তোমার আসন্ন। আর, তুমি কেমন নিশ্চিন্তে শয্যায় শুয়ে ভরত, শত্রুঘ্ন করে বিলাপ করছ। ছিঃ! দুর্বল অক্ষম মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ হল বিলাপ। বিলাপ করে কে কবে লাভবান হয়েছে? ওসব ঠুনকো ভাবপ্রবণতার কানাকড়ি মূল্য নেই। আগুনের মতো জ্বলে ওঠ। মুক্ত প্রভঞ্জনের মত বিদ্রোহ কর! ভুমিকম্পের মতো কাঁপিয়ে দাও।

দুঃসহ একটা কষ্ট আর উৎকণ্ঠা নিয়ে আকুল স্বরে কৈকেয়ী প্রশ্ন করল : কেন, কি হয়েছে?

মন্থরার মুখখানা আগুনের মতো গনগন করছিল। চোখের তারা মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল। বিরক্তিসঞ্জাত ক্রোধ তার গলার স্বর কাঁপছিল। বলল : হতে বাকি কি আছে? মহারাজ তোমাকে পথের ভিক্ষুকিনী করে কৌশল্যাকে রাজ্যৈশ্বর্য দিয়ে তার প্রেমকে পুরস্কৃত করছেন। কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পুরণ করতে ভরত শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে পাঠানো হল, তার খোঁজ রাখ কি?

কৈকেয়ী কি উত্তর দেবে? ডাক ভুলে যাওয়া পাখির নির্বাক জিজ্ঞাসা নিয়ে সে মন্থরার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কৈকেয়ী মনের জানলার এই বন্ধ কপাটটা খুলে কোনদিন তাকে দেখবার চেষ্টা করেনি। হঠাৎ একটা ঝড়ের ধাক্কায় তা যেন খুলে গেল। অমনি এক বিস্মৃত অতীত ঝিলিক দিল তার মনে। কৌশল্যার মুখখানা ভেসে ওঠল। কৌশল্যা যেন তার মুখোমুখি স্থির অপলক চোখে দাঁড়িয়ে। ঘাতকের মতো রহস্যময় তার চাহনি। অধরের হাসি বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে ওঠে। হৃৎপিণ্ডের সর্ব শক্তিকে কণ্ঠে সংহত করে চিৎকার করে বলল : প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! সংগ্রামমত্ত দুর্গা প্রতিমার মতো চোখের তারায় প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল কৈকেয়ীর। পরক্ষণেই স্বপ্নাবিষ্টের মতো অস্পষ্ট স্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করল : না। না। কিন্তু তার সেই নিঃশব্দ আর্তনাদ কেউ শুনতে পেল না। আতঙ্কে তার নিঃশ্বাস বদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের শব্দ দ্রিমি দ্রিমি করে বাজতে লাগল।

মন্থরার উত্তেজিত জিজ্ঞাসা কৈকেয়ী আত্মবিস্মৃতি ঘটাল। সম্মোহিতের মতো তার বাদামী রঙের চোখের তারা দুটি স্থির হয়ে থাকে মন্থরার চোখের উপর। পরস্পরের দৃষ্টিবদ্ধ মুহূর্তগুলো মহাকালের বেগে যেন প্রবলভাবে ঘূর্ণিত হতে লাগল। কৈকেয়ী খানিকটা অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল। বলল : আমি জানি না। কারো সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা আমার মনে আসে না। যা মনে করতে পারি না তা বলব কেমন করে? স্বপ্নের মধ্যে শুধু বড়রানীর মুখ ভাসে চোখে। কৈকেয়ীর স্বরে গভীব আতঙ্ক।

মন্থরার দৃষ্টিতে উদ্বেগ ফুটল। গভীর চিন্তামগ্ন মৌন মুখের পেশী ও রেখায় কাঠিন্যের ঢেউ জাগল। চোখের দৃষ্টিতে তার আগুন ছুটল। বিরক্তি, ক্ষোভ, প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল তার অন্তরঃকরণ। গলার স্বর চড়িয়ে বলল : তোমার অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের কথা চিন্তা করে আমি আতঙ্কে কাঁপছি। ভরত শত্রুঘ্নকে অযোধ্যার বাইরে পাঠিয়ে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হচ্ছে। কেন জান? সে শুধু তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য। তা না হলে কখনও শুনেছ ঘরের ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে কেউ উৎসবের আয়োজন করে? ভরত শত্রুঘ্নের মতো রামের অনুগত ভাইদের ওপর এই অবিশ্বাস সন্দেহ কেন? কেন প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠের অভিষেকের উৎসবের যোগদান থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল? তারা দু'ভাই কেকয় রাজ্যে পৌঁছনোর পর রামচন্দর যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন গোপনে এবং চুপি চুপি করা হল কেন? এই গোপনীয়তা কার স্বার্থে? কোন উদ্দেশ্যে? জান? রামের নিষ্কণ্টক

রাজ্যলাভের পথের কাঁটা তুমি আর আমি। রাম রাজা হলে তোমাকে ও আমাকে কয়েদ করবে। ভরত শত্রুঘ্নকে কেকয় থেকে আর কোনদিন অযোধ্যায় ফিরতে দেবে না। অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনা ছল করে হয় তাদের হত্যা করবে, নয়ত নির্বাসনে পাঠাবে।

কৈকেয়র চোখে এক সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা তাকে ক্রমে শক্ত ও সচেতন করে তুলছিল। তথাপি মন্থরার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে কেমন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। মন্থরার কথার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। তবু মনের ভেতর কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে ফুটছিল, আর নানান অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা প্রতিবাদ ঠেলে উঠল। হৃৎপিণ্ডের সর্বশক্তিকে কষ্ট সংযত করে কৈকেয়ী তীক্ষ্ণস্বরে বলল : তুমি বড্ড আজেবাজে কথা বল। রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমায় অধিক সেবা করে, রাম মহৎ উদার। তাকে এত নরাধম মনে করার আগে আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়।

দাঁতে দাঁত দিয়ে মন্থরা তার যন্ত্রণাবিদ্ধ অপমান রাগ সামলাল। হঠাৎ ফণা তোলা সাপের মতো ঘাড় ফিরিয়ে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। দু চোখ তার খদ্যোতের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ভ্রূকুটি দৃষ্টি ও মুখ পলকের জন্য শক্ত হল। অধরে কুটিল হসি খেলে গেল। কৈকেয়ীর দুর্বলতার রন্ধ্রপথগুলি মন্থরার নখদর্পণে। কখন কোন কথা, কিভাবে বললে কৈকেয়ীকে তার অনুকূলে টানা যায়, মন্থরা তা জানে। তথাপি সেই ক্ষণের মধ্যে আপন কর্তব্যে সে স্থির করল তার করণীয়। যা অনিবার্য ছিল বর্তমানে তাই হয়েছে। আত্মগোপনের অবকাশ অতিক্রান্ত। কৈকেয়ীর কথা শুনে তাই সে থমকাল। কিন্তু বিচলিত কিংবা লজ্জিত হল না। নাকের হীরায় দ্যুতি ছড়িয়ে কঠিন কর্কশ স্বরে ফুঁসে উঠল। বিদ্রূপে শাণিত হল তার কথা। বলল : প্রাণে লাগল কথাটা, তাই না? তুমি বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসতে পার কিন্তু আমি তো আর চোখের মাথা খেয়ে বসিনি। এ বাড়ির কোথায় কে কি করে বেড়াচ্ছে সব আমি জানি। আমাকে তুমি জ্ঞান দিও না। তোমার নির্বুদ্ধিতা আমাকে লজ্জা দেয়। তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ হয়। তুমি রাজার কন্যা, রাজার মহিষী হয়েও রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুঝতে পার না? সপত্নীপুত্র রাম কেন তোমার দুঃখের কারণ হবে? সৌভাগ্যের গর্বে একদিন তুমি সপত্নী রাম জননীকে অগ্রাহ্য করতে। অনেক দুঃখ, লাঞ্ছনা সে পেয়েছে। সে কথা রাম ভুলে গেলেও কৌশল্যা ভোলেনি। কৌশল্যা তোমরা মতো নির্বোধ নয়। রাম রাজা হলে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে! রামের কাছে তার জননীর চেয়ে তুমি বড় কখনই না। মায়ের প্ররোচনা কতদিন অগ্রাহ্য করবে রাম? জননীর প্রতিহিংসার সাধ অবশ্যই পূরণ করতে হবে তাকে। লক্ষ্মণও নিশ্চিন্তে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। অনুগত প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণের বাক্য ও প্ররোচনা রাম কেমন করে উপেক্ষা করবে? হিংসার আগুন একবার জ্বাললে তা নেভে না সহজে। তুমি আমি সে আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হবো। আমি সেই অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি। আমার তোমার ধ্বংস অনিবার্য। সময় থাকতে শুধু সাবধান হওয়া ভাল।

কৈকেয়ী চমকে উঠল। মন্থরার মুখের দিকে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর একটা প্রবল আতঙ্কে সে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল। বুকের ভেতর ক্রমবর্ধমান একটু ভয়ের অস্থিরতা তাকে উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট করে রাখল। ভাষাহারা কৈকেয়ী বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসায় মন্থরার মুখের প্রতিটি রেখায় তার জবাব সন্ধান করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারছিল এক অজ্ঞাত অলৌকিক ভয় যেন তার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছিল। তথাপি মুখে কোন জিজ্ঞাসার স্বর ফুটল না। প্রকৃতপক্ষে কৈকেয়ী একটা আতঙ্কের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন নিঃশব্দে পরিত্রাণের জন্য চিৎকার করছিল।

কৈকয়ীকে নিরুত্তর দেখে মন্থরার জিজ্ঞাসার রূপ বদলাল! মন্থরা জনে, ভাষার শক্তি কি অপরিসীম! কী তীব্র তার প্রতিক্রিয়া, কত ভয়ঙ্কর তার আঘাত হানার ক্ষমতা। আর সেই জানার অভিজ্ঞতা অনেকখানি পেয়েছে কৈকেয়ীর কাছ থেকে। মন্থরা উত্তেজিত। আত্মরক্ষায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সে। তার উষ্মা অতি তীব্র হয়ে তার মুখের ভাষাকে আরো তীক্ষ্ণ ও মর্মস্পর্শী করে কৈকেয়ীকে আক্রমণ করল। বলল : এখন কি করবে? প্রতিকারের কিছু কি দেখছ? রামের অভিষেক মানে তোমার সর্বনাশ। তোমার ভুলের জন্যে তোমাকে সপরিবারে বিনাশ হতে হচ্ছে। এখন তোমার উপকার করতে এসে আমিও বিপদাপন্ন হলাম। ওতে কি, তোমার হিতার্থে সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছি।

কিন্তু শঠ, প্রতারক, অধার্মিক স্বামীর কপট প্রণয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে তুমি আমার সব কথাই সন্দেহের চোখে দেখেছ। মরে গেলেও আমার এই আত্মগ্লানি যাবে না। অথচ দ্যাখ, বাস্তব কি আশ্চর্য! নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! স্থান কালের পরিস্থিতিতে সেই অবিশ্বাসিনী হলো তোমার পরম নির্ভর, একান্ত আশ্রয়। কিন্তু আমিও বা কি করতে পারি? শুধু উপায় বলতে পারি। তাকে কার্যে পরিণত করা, না করা তোমার মর্জি।

কৈকেয়ী অকূলে কূল পেল যেন। কিন্তু দুঃখে, অভিমানে, কষ্টে, যন্ত্রণায়, ভৎর্সনায় সহসা তার দুচোখ ছাপিয়ে জল এল। দাঁতে দাঁত চেপে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা প্রবল আবেগকে প্রাণপণে সামলাতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে। তারপর, স্খলিত ভেজা গলায় কম্পিত স্বরে বলল : আমার এক পিঠে তুমি আর এক পিঠে জীবন। আমাকে তুমি ক্রোধের বশে ত্যাগ কর না। আসন্ন ভরাডুবি থেকে আমাকে ও আমার সন্তানদের বাঁচাও।

কৈকেয়ীর কথায় মন্থরা একটুও অবাক হল না। বরং এরকম একটা কিছুর জন্য তার প্রতীক্ষা ছিল। তবু কৈকেয়ীর কথার মধ্যে এমনই একটা অনিবার্যতা ছিল যা তার সমস্ত অনুভূতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। পলকের মধ্যে তার চেতনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। দায়িত্ব সচেতন হয়ে ওঠার জন্যে মন্থরা সহসা গম্ভীর হলো। আত্মরক্ষার ভিতকে শক্ত করার চেষ্টায় সে আস্তে আস্তে বলতে লাগল : তুমি জান না; বহুকাল ধরে আমরা একটা মিথ্যের জালে বাস করছি। তাই ভুলের বোঝা আমাদের ভারী হয়েছে। তোমার সরলতা এবং বুদ্ধিহীনতার জন্য ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠেছে। অযোধ্যাপতি নিজেও তোমার ভালোমানুষী এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রবঞ্চনা করেছে তোমাকে। এসব কথা বলার কোন অর্থ হয় না। মনগড়া গল্প যে নয় এই সত্যটা বোঝানোর জন্যে বলতে হচ্ছে।

মন্থরা এক মুহূর্তে জন্য থামল। কৈকেয়ীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকাল। একটা আতঙ্কিত অসম্মানের ছায়া তা মুখে থমথম করছিল। চোখের চাহনিতে কষ্টের আচ্ছন্নতা। ঘটনার গুরুত্ব ও বিপদ সম্বন্ধ সে এখন বেশ সচেতন। প্রতিকারের প্রত্যাশায় সে যেন একান্তভাবেই তার শরণাপন্ন। তার উৎকণ্ঠিত রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা মন্থরাকে উদ্বুদ্ধ করল। বলল : নিজেকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়েই বোধ হয় অযোধ্যাপতি মহারাজ কেকয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। সেই চুক্তি অনুসারে তোমার পুত্র ভরত হবে অযোধ্যার রাজা।

কৈকেয়ী চমকে উঠল। পলকের জন্য শিহরিত হলো তনু। থর থর করে কম্পিত হলো তার বুক। সাগর তরঙ্গের উল্লসিত হলো তার বুকের নিরুদ্ধ আবেগ। বিস্মিত বিহুল দুই চোখের তারা থমকানো জিজ্ঞাসায় রহস্যময়। কৈকেয়ীর চমকানো বিস্ময় ভ্রুক্ষেপ করল না মন্থরা। নির্বিকারভাবে বলল : হ্যাঁ, ধর্মানুসারে অযোধ্যার রাজা হওয়ার কথা ভরতের; ন্যায়ত, ধর্মত অযোধ্যার সিংহাসন তার প্রাপ্য। এমন কি ভ্রাতাদের মধ্যে ভরত সর্বাগ্রজ। কারচুপি করে রামকে অগ্রজের আসনে বসানো হয়েছে। আর্য-অনার্যত্ববোধের দ্বন্দ্ব, সংস্কার থেকে মহারাজের মন এই বিভেদের বিষবৃক্ষের জন্ম হল। আর্যত্বের অভিমানে তিনি ধর্ম বিসর্জন দিলেন, বিবেককে হত্যা করলেন। পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর হতে তাঁর একটুও কষ্ট হল না। পুত্র ভরতকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্য তোমাকে নানাভাবে ঠকিয়েছেন। আয-অনার্যত্ববোধের পাদপ্রদীপে দাঁড়িয়ে কিন্তু কেকয়রাজ সেই সমস্যাকে বিষিয়ে দিয়ে রাজনীতির সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলেননি। যথেষ্ট ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কিন্তু অযোধ্যাপতি সত্যকে বড় মিথ্যা দিয়ে ঢাকলেন। মিথ্যে এমন এক জিনিস যার মধ্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেবার বিষ থাকে। অযোধ্যাপতি সেইভাবে এক মিথ্যে থেকে আর এক মিথ্যেয় গিয়েছেন। ক্রমেই তার পরিধি বেড়েছে। আরও বড় হয়েছে। এইভাবে একটা মিথ্যে মাথা তুলতে তুলতে কোথায় কোন চূড়ায় ঠেকল মহারাজের নিজেরও তা জানা ছিল না। প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার জন্যে রামের গল্প আর তার চারণগীতি দিয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল। কারণ, কেকেয়দেশে ভরতের জনপ্রিয়তা তার বিরাট দ্বিগ্বিজয়ের সাফল্য মহারাজ দশরথকে ভাবিয়ে তুলছিল। ভরত রমের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর মন সর্বদা তটস্থ। তাই ভরতের

কাছে এবং ভারতবর্ষের নৃপতিদের চোখে রামের শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, এবং মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এত আয়োজন। অথচ কেউ তাঁর সে কৌশল বুঝতে পারল না। তুমিও না। তারপর, মিথ্যের সৌধ গড়া শেষ হলে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করা হল। কিন্তু দশরথ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝল ভরতকে অযোধ্যায় রেখে রামের অভিষেক করা সম্ভব নয়। সত্য ও মিথ্যের পাশাপাশি সহাবস্থান কখনও সম্ভব নয়। তাই সত্যকে বিসর্জন দেবার জন্যে ভরত শত্রুঘ্নকে কেকয়ে পাঠানো হল। অথচ কি আশ্চর্য দ্যাখ, রামের অভিষেক হচ্ছে জেনেও ভরত শত্রুঘ্নকে একবারও কেকয়ে যেতে বাধা দিলে না। কিংবা পিতার কাছে সেরকম কোনও আবেদনও রাখল না। ভরত শত্রুঘ্নের কাছে ঘুণাক্ষরে তার অভিষেকের সংবাদও প্রকাশ করেনি। অভিষেকের দিনে ভরত শত্রুঘ্ন রাজধানীতে যে থাকছে না, সেজন্য তার কোন দুঃখ নেই। তাদের অনুপস্থিতির জন্য কোন আক্ষেপ কিংবা খেদোক্তিও প্রকাশ করলেন না। কেকয় থেকে তাদের ফিরিয়ে আনারও কোন ব্যবস্থা হলো না। এর পরেও তুমি রামকে বিশ্বাস করবে? এ কি তার জ্যেষ্ঠের মতো আচরণ? রাম কতখানি ভ্রাতৃবৎসল, ধার্মিক, সৎ, আদর্শবান—তুমি বিচার কর? রাম মহারাজ দশরথের মতই চতুর, খল, অভিসন্ধিপরায়ণ। আর্য-অনার্যত্ববোধে তার হৃদয় সংকীর্ণ। রাম যদি সত্যিকারের ভ্রাতৃবৎসল হতো তাহলে ভরতকে কখনও শত্রুর চোখে দেখত না। মুখে সে ছোটমা, ছোটমা করে। আদর্শের কথা বলে। সবটাই তার অভিনয়। তার বাক্য মধুর স্বভাব মিষ্টি বলে শঠতা, ক্রূরতার পরিমাপ করতে পার না। তুমি ভ্রমবশে ভু-জঙ্গের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে ক্রোড়ে তুলেছ। কিন্তু সর্প কখনও তার স্বভাব বদলায় না। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে তুমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছ। তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে রাম শুধু এই অভিষেকের সুযোগ পেল। নইলে এই অভিষেক রামের পরিবর্তে ভরতের হতো। ধর্মানুসারে অযোধ্যার সিংহাসন ভরতের। ভরত এই রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী। তাকে বঞ্চিত করে মহারাজ দশরথ রামকে সিংহাসনে বসাতে চায়। এতবড় অধর্ম, মিথ্যা ভারতরাজ্যে ইতিপূর্বে হয়নি।

মন্থরার কথায় কৈকেয়ী চমকাল। বহুকালের একটা ধারণা বিশ্বাস ভেঙে খান খান হল। মন্থরার অভিযোগের মধ্যে কোথাও মিথ্যের ছিটে-ফোঁটা খুঁজে পেল না। কথাগুলো তার বুকের ভেতর উথাল পাথল করছিল। আর তার ফলেই কৈকেয়ীর শরীর বিবশ হয়ে আসছিল। চোখের কোলে এক গভীর শূন্যতা নামল। ভেতরে ভেতরে ঘুণপোকার মতো কি যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আর কেমন একটা অশান্ত অস্থিরতায় সে ছটফট করছিল। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতি বুকের মধ্যে কষ্টে খামচে ধরছিল।

বুকটা একটু কেমন করছিল। সমস্ত মনটা দশরথের উপর বিষিয়ে উঠল। সে হল তার সবচেয়ে বড় শত্রু। একটা কঠিন ঘৃণায় তাকে বিরূপ করে তুলল। দশরথের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ কৈকেয়ীর অন্তরে এক নীরব বিদ্রোহ জাগাল। স্বাজাত্যবোধের অহঙ্কারে উন্মাদ হয়ে সে তাকে প্রতারণা করেছে, তার সুখ, দুঃখ মনোবেদনার দিকে কখনও ফিরে তাকায়নি। সেই আর্যত্বের গর্ব অহঙ্কার শেষ করে দেবার সঙ্কল্প জাগাল তার মনে। তপ্ত মাথাটা অসহায়ের মতো ক্ষণে ক্ষণে চেপে ধরছিল দুহাতে। কৈকেয়ীর বারংবার মনে হতে লাগল একটা বিপুল প্রতিক্রিয়া যে কোন সময় একটা অদ্ভুত কিছু ঘটাবে তার জীবনে। অবশ্যই একটা কিছু হবে। হয়তো উন্মাদ হয়ে যাবে সে। যদি তা না হয় তাহলে একটা সাংঘাতিক কিছু হয়ে উঠবে; সে—ডাইনি, রাক্ষসী অথবা পতিহন্তা। মোট কথা একটা কিছু লণ্ডভণ্ড করতে এরকম একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া তার চিত্ত যখন উদ্‌ভ্রান্ত, অশান্ত, তখন মন্থরার কণ্ঠে রামের প্রতি প্রবল ধিক্কার চড়াগলায় বাজল। সহসা তার মগ্নতা ভেঙে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে একজন আত্মসচেতন নারী হয়ে উঠল। তার সমস্ত শরীর যুগপৎ আনন্দ বিস্ময়ে মুহুর্মুহু শিউরে ওঠল। আশ্চর্য এক সুখানাভূতির মধ্যে ডুবে গেল তার চেতনা। স্বপ্নের আরামে দু'চোখ বুজে এল। একটু আগেই তার নিজের জন্য ভরতের জন্য কি উৎকর্ণ উৎকণ্ঠাই না ছিল। এই মুহূর্তে তার মস্তিষ্ক ভাবনাশূন্য।

মাথার ভেতর মেঘের মতো টুকরো টুকরো চিন্তা ভেসে যায়। তার মধ্যে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন জেগে ওঠে। ছেলেকে নিয়ে মা যে স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন। মন্থরার কথায় তার ভাবতে ভাল লাগছিল

সে রাজমাতা হবে। পুত্র তার আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর হবে। সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে কানন বিহার করবে। শত্রুদল সঙ্কুচিত হবে। আর রাম দীন কৃপাপ্রার্থীর মতো তার চরণতলে এসে দাঁড়াবে। কৌশল্যা, সুমিত্রা তার অত্যন্ত অনুগত ও বাধ্য থাকবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রফুল্লিত ভরতের মুখ মনে পড়ে। বাদামী রঙের চোখের মণিতে ফুটে ওঠে শত্রুঘ্নের মুখ। জ্যেষ্ঠ সহোদরের মস্তকে রাজছত্র ধরে জননীর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে শত্রুঘ্ন। এদের মধ্যে মন্থরার হাসি হাসি মুখখানাও দেখল। সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে যার কথা সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে গভীরভাবে ভাবল, তার মতো বড় শত্রু, আর দ্বিতীয় নেই। সে শত্রুর নাম দশরথ।

কৈকেয়ীর বুকের ভেতর বহুকালের পুরনো নদীর পাড়-ভাঙা শব্দ। যে আবেগটা দশরথ নামে একটা সীমানায় আবদ্ধ ছিল, তার বাঁধ ভেঙে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন বিরাট ফাঁক। দশরথ নিজেই সেই ফাটল সৃষ্টি করেছে। মেরামতির দায় যখনই এড়িয়ে গেছে তখনই ফাটল অপনার নিয়মে ভেঙে চৌচির হয়েছে। সেজন্য কৈকেয়ীর কোন দুঃখ হয় না, রাগ হয় না, অভিমানও না। কেবল বন্ধন ছিন্ন হওয়ার কষ্ট বুকের ভেতর কান্নায় পাক খায়।

গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু অনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল তার মুখাবয়বে। আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল। মন ভেঙে দিয়ে এমন করে প্রলোভন দেখাচ্ছ কেন? কৈ এতকাল তো এসব কথা শুনিনি। আজ তবে শোনালে কেন?

মন্থরা কৈকেয়ীর চোখের উপর চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : প্রলোভন বলছ কেন? যা সত্য, তাই বললাম। মহারাজ দশরথের কাছে কেকয়রাজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, যথার্থ সময় ছাড়া অথবা, একান্ত অপরিহার্য না হলে সে কথা কখনও প্রকাশ করা যাবে না। মহারাজ অশ্বপতি তাঁর প্রতিশ্রুতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘটনা এমনই দাঁড়াল যে এখন তোমাকে সব না বললে শেষ রক্ষা হবে না। তুমিই কেকয়রাজের শেষ অস্ত্র।

কক্ষে কৈকেয়ীকে না পেয়ে দশরথ বিস্মিত হল।

জিনিসপত্তর সব লণ্ড ভণ্ড হয়ে এখানে ছড়িয়ে আছে। মূল্যবান শাড়ি অলঙ্কারও ছিল মেঝের উপর ছড়ানো। গোটা ঘরখানা কৈকেয়ীর ক্ষিপ্ত ক্রোধে তছনছ হয়ে আছে। অথচ কৈকেয়ী নেই কোথাও?

দশরথের বুকে যেন সহসা বজ্রপাত হল এবং তার ঝলকে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। কৈকেয়ীর সঙ্গে দাম্পত্য প্রণয়ে এবং কলহে এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো তাকে দাঁড়াতে হয়নি।

দশরথ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শূন্য শব্দহীন কক্ষে। অপলক দুই চোখ বিস্ময়ে জ্বল জ্বল করছিল। আকস্মিক বিস্ময়কর চমকের উৎস কোথায় তা নিয়ে দশরথের মনে নানবিধ মিশ্র অনুভুতির জটিল প্রতিক্রিয়া তাকে অস্থির করে তুলল। কৈকেয়ীর কি হল? সে এখন কোথায়? কোথায় গেলে পাবে তারে? এমন কি ঘটল অজ্ঞাতে যে তাকে গৃহছাড়া হতে হল? কোন বাসনা অপূর্ণ তার? পৃথিবীতে এমন কি আছে যা চেয়ে পায়নি কৈকেয়ী? তথাপি, কার উপর অভিমান করে কক্ষছাড়া হল সে? কার উপর? এসব ভাবতে ভাবতে ক্রোধাগারের দ্বারের সম্মুখবর্তী হল দশরথ।

কক্ষের অভ্যন্তরে কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছিল? কার যেন চুপি চুপি শ্বাস পতনের শব্দ শুনল। দশরথের চোখের উপর আত্মাভিমানী কৈকেয়ীর মুখখানা ভেসে উঠল। কল্পনায় দেখল দুই চোখে তার মুক্তোর মতো অশ্রু টলটল করছে। দৃষ্টিতে দশরথের নিবিড় জিজ্ঞাসা কেন্দ্রীভূত হয়, যা একটি উদ্বেগ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই স্বর, এই শ্বাস কৈকেয়ীর। কিন্তু ক্রোধাগারে কেন সে? এমন কি ঘটল যার জন্যে ক্রোধাগারে যেতে হল? তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহে দুই চোখের ভুরুর মাঝাখানটা কুঁচকে গেল। একটা অশুভ আশঙ্কায় আতঙ্কিত হল তার মন। রামের অভিষেকের মাত্র আর একটা দিন বাকি। এ সময়ের কৈকেয়ীর ক্রোধ নানান আতঙ্কিত সংশয়ে ও জিজ্ঞাসায় তার মস্তিষ্ক পূর্ণ করে তুলল। কৈকেয়ীর এই ক্রোধ কার জন্যে? কার ওপর?

দ্বার ঠেলে কক্ষের অভ্যন্তরে যেতে তার কেমন ভয় করছিল। অনেক ঘটনা কথা বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মনে ঝলকিয়ে উঠল। নিজের মনেই চমকে উচ্চারণ করেছিল : জীবনের গতি কি বিচিত্র! আর কি বিপরীত! সুখের মুহূর্তে এ কোন বিদ্রোহ কৈকেয়ীর?

নানা অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা দ্বিধা তাকে সংকুচিত করে রাখল। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল। এই ভীরু সংশয় তার আসছে কেন? অকারণ সন্দেহে অন্তঃকরণ বিদ্ধ হওয়ার হেতুই বা কি? মনের এই যন্ত্রণাকাতরতার মধ্যে কেকয়ের হরপার্বতীর মন্দিরে ছবি তার চোখে ভেসে উঠল। কৈকেয়ীর ভালবাসার সমস্ত প্রতিবন্ধতাকে জয় করার একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা সেদিন তাকে ভেতরে ভেতরে শক্তি যুগিয়েছিল। জয়ের সেই গৌরব তৃপ্তির উন্মাদনা আর তো রক্তে কল্লোল জাগাচ্ছে না। কেন? বুকের ভেতর দুরন্ত বেপরোয়া সাহসকেও কোথাও পেল না খুঁজে? কেমন একটা উদ্বিগ্নতায় সে থমকে ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

অনেকটা জোর করেই অশান্ত প্রাণের তাড়নায় নিজেকে নির্ভর করার তাগিদে দশরথ প্রচণ্ড জোরে কপাটে ধাক্কা দিল। দেয়ালে ঠোক্কর লেগে শব্দ হল। রুদ্ধ কক্ষের থমথমে স্তব্ধতাকে ভেঙে শব্দ যেন অলৌকিক হয়ে উঠল। ভয়ার্ত আর্তনাদের মতো কক্ষের অভ্যন্তরে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল। গম গম করে বাজতে লাগল।

দশরথের অনুভূতি সমূহ তখন তীব্র আলো অন্ধকারে চিকুর হানা মেঘের মতো। আশঙ্কায় আর আতঙ্ক যেন পলকে পলকে তাকে আলোয় উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। একটা চমকানো আবেগে থির থির করে কাঁপছিল তার বুক। আশার সঙ্গে হতাশার যে এত নিবিড় বন্ধন দশরথ আগে কখনও জানত না। এ তার নতুন অভিজ্ঞতা।

কক্ষের মধ্যস্থলে, ভূমিতে বাম বাহুর উপর মাথা রেখে কৈকেয়ী নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিল। তার চুল খোলা। উস্কখুস্ক চুল ফুরফুরে হাওয়ায় মাটিতে ঝাপ্টাচ্ছিল। কখনও মুখের উপর পড়ে খামচে ধরছিল। বসনও অত্যন্ত মলিন, এলোমেলো অগোছালো। নিরাবরণ দেহে নেই কোন রত্ন আভরণ। এক দীন নিঃস্ব রমণীর মতো ভূমিতলে শুয়েছিল। চোখের তারায় আগুনের ফুলকি, মুখে উত্তপ্ত অঙ্গারের রক্তাভ, কোমল ঠোঁটে পেশীর কাঠিন্য। দাঁতে দাঁত দিয়ে হাতের মুঠোতে কি যেন সমানে পিষতে লাগল, আর পায়ের পাতা ভূমির উপর ঘষছিল।

দশরথের আগমন কৈকেয়ীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। চোখের সামনে দশরথকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কৈকেয়ী কথা বলল না। তার কোন ভাবান্তর কিংবা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

দশরথের অবাক জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হল। চুপ করে বোকার মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে সে ঘামছিল। কৈকেয়ীর এই ভাবে ভূমিতে শায়িত থাকাটা তার চোখে একটা ভয়ঙ্কর স্পর্ধা বলে মনে হল। ভিতরে ভিতরে সে বেশ বিরক্ত এবং অসহিষ্ণু হল। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটা প্রতিবাদ তীব্র ঝংকারে বাজছিল। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। দশরথ উত্তেজিত আচ্ছন্নতার চেতনায় ত্রস্ত হয়ে ভয়ে ভয়ে কৈকেয়ীর পাশে বসল। তার মাথায়, চুলের ভেতর, গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল অনেকক্ষণ। সপ্রেমে গাঢ় গলায় বলল : আমার বুকের মানিক ধুলোয় পড়ে, কেমন করে সইব? এ দৃশ্য দেখার আগে আমার দৃষ্টি শক্তি অন্ধ হল না কেন? কঠিন কঠোর এই ভূমিতল তো তোমার যোগ্য শয্যা নয়। তুমি কেন শুয়ে আছে এখানে? শুভ্র ফেননিভ কোমল তনু তোমার কত না ক্লেশ পাচ্ছে? এই দৃশ্য আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কষ্টে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে ধুলামলিন এই ভূমিশয্যা ত্যাগ কর রানী। রাজা দশরথের এ মিনতিটুকু রাখ।

দশরথের কথার ভেতর এমন একটা আন্তরিকতা এবং সম্মোহন আকর্ষণ ছিল যে কৈকেয়ীর সারা শরীরে শিহরন জাগল। বুকের গভীরে তার সুর বাজছিল। চকিতবিদ্ধ একটা ব্যথার সঙ্গেই যেন দুর্বল আবেগ কষ্টে ও পুলকে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু প্রাণের গভীরে তখন যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল।

কৈকেয়ীকে তুলে ধরার জন্যে দশরথ তার দিকে দু'হাত বাড়াল। অমনি একটা লাঞ্ছিত অসম্মানের ছায়া কৈকেয়ীর মুখে নেমে এল। প্রবঞ্চনার দুঃখ, আত্মভিমানের কষ্ট তার বুকে এত গভীরভাবে বেজেছিল যে ফুঁসে ওঠা ঝংকারে দশরথ চমকাল। হাতদুটো ঠেলে দিয়ে বলল : কে চেয়েছে তোমার সোহাগ? আমার কেউ নেই, কিছু নেই। তুমিও না। সব থাকতেও আমার মত দুঃখী, নিঃস্ব, রিক্ত কে আছে? সন্তান গর্ভে ধরেছি মাত্র; কিন্তু তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতে দাওনি। মা ছেলের কোন সম্বন্ধই তৈরি হয়নি। কেন? তুমি সব কিছুর মূল। তুমি আমার ভালোবাসাকে ঠকিয়েছ। শঠ, প্রতারক লম্পট, চলে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না আমি। তুমি কেউ নও আমার। এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে দীনতম দীন কে আছে?

দশরথ স্তম্ভিত। কৈকেয়ীর তীব্র বিরক্তি আর ঘৃণার স্বর তাকে অনেকটা অপরাধী করে তুলেছিল। তবু সে আচ্ছন্নের মতো কৈকেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব খুঁজছিল। চিন্তিত স্বরে আপন মনে বলল : ঘাট হয়েছে আমার। দয়া করে কক্ষে চল তুমি। এই ভূমিতলে অযোধ্যার রাজেশ্বরীকে মানায় না। এই দীন বেশবাস নিরাভরণ তনু ইক্ষ্বাকুবংশের কুললক্ষ্মীর শোভা পায় না। স্বর্ণ পালঙ্কের শুভ্রফেননিভ কোমল শয্যা, চারু চিত্রিত কক্ষ ছাড়া রাজমহিষী কৈকেয়ীর কোন গৌরব প্রকাশ পায়? পর্বত গুহাতেই সিংহ সুন্দর। সেটাই তার স্বক্ষেত্র। যার যেথা স্থান সেখানে ছাড়া মানায় না তাকে। তুমি রাজনন্দিনী, রাজবধূ, রাজমাতা এর অধিক কি বলব তোমায়?

কৈকেয়ীর কিন্তু তাতে মন গলল না। একটা তীব্র অভিমানবোধে তার মন টাটাচ্ছিল। বুকের মধ্যে একসঙ্গে অসংখ্য কথা উথালি পাথালি করছিল। তথাপি, একটা কথাও বলতে পারল না। মন্থরার মুখ মনে পড়ল। অমনি বুকের ভেতর একটা ঝড়ের কম্পন অনুভূত হল। কৈকেয়ীর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের কোণে কেমন একটা হাসি যেন চিক চিক করে উঠল। বুকের ভেতর তার অশান্ত অস্থিরতার চমক তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। ঠোঁট টিপে টিপে বলল : রাজা, তোমার মতো ঠক, প্রতারককে আমার স্বামী বলে ভাবতে কষ্ট হয়। তুমি আমার সরল বিশ্বাস নিয়ে খেলা করেছ, আমার মহান প্রেমকে ঠকিয়েছ। তেমাার মুখ দর্শন করাও পাপ। আমরা সুমুখ থেকে চলে যাও তুমি। কৈকেয়ী কথাগুলো রাগে, অভিমানে, দুঃখে, ক্ষোভে মরিয়া হয়ে বলল।

দশরথ সেই মুহূর্তের আকস্মিকতায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কারণ, দশরথ বেশ বুঝতে পারছিল কৈকেয়ীর রহস্যের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসছে। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার চিত্ত অস্থির হল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল : কৈকেয়ী, ক্রোধের বশে কি বলছ, তুমি জান না?

কৈকেয়ীর অধরে হাসি, চোখে আগুন নিয়ে দশরথকে প্রশ্ন করে : বটে। আমার ক্রোধের কারণ জানতে চেয়েছ কখনও? একবারও প্রশ্ন করেছ কেন ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, বিদ্রোহী আমি? আমার কি হয়েছে, কি চাই, তার কোন খোঁজ নিয়েছি তুমি?

সে সুযোগ তো আমাকে দাওনি। তোমরা সন্ধানে এসে পেলাম শুধু লাঞ্ছনা। অথচ তুমিও ভাল করে জান, কি না করেছি তোমার জন্য? শুধু তোমাকে খুশি করতে কৌশল্যা সুমিত্রা থেকে দূরে থেকেছি। রাজপ্রাসাদে তারা অত্যন্ত অনাদরেই থাকে। তবু তুমি আমাকে কটাক্ষ করছ। ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে, শ্লেষে জর্জরিত করছ। তুমি যা যা কামনা কর আমাকে বল। তোমার কষ্ট ভোগের প্রয়োজন কি?

ওটাই তো তোমার নাটক। আমাকে বোকা বানানোর কৌশল। লোককে বিভ্রান্ত করার একটা সুন্দর উপায়।

ছিঃ ছিঃ, এসব কথা তোমার মুখে কোনদিন শুনতে হবে ভাবিনি। তোমার এত কালের শ্রেষ্ঠত্বকে কেন নীচে নামিয়ে আনলে রানী? তোমার বাক্যতে যা হতো অমৃত তাকে গরল করলে কেন?

নিস্পৃহভাবে কৈকেয়ী উত্তর দিল : স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হয়েছে বলে।

কৈকেয়ীর কথায় উত্তেজনা ছিল না। সে শান্ত। অনেকটা অকুণ্ঠভাবে নিজেকে প্রকাশ করল। কিন্তু তার অপলক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দশরথের চোখে বিদ্ধ। দশরথ একটু অবাক হল। চকিতের জন্যে ভুরু কোঁচকাল। আশাভঙ্গের বেদনা, বিস্ময় ও সংশয় সৃষ্টি করল। গভীর অন্যমনস্কতায় দশরথ

কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা স্খলিত অস্পষ্ট স্বর আবেগে গাঢ় হল। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল :— কৈ আমি তো কখনও মনে করি না। বরং কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি, তোমার জন্যেই আমি সন্তানের পিতা হতে পেরেছি। তোমাকে না পেলে এ সাধ পূর্ণ হতো না আমার। আমাকে তুমি পূর্ণ করেছ। এক নতুন পৃথিবী দিয়েছ, আমার নবজন্ম হয়েছে। আমার জীবন কাণ্ডারী হয়ে যেভাবে চালিয়েছ সেভাবে চলেছি। আর এক দিক থেকে তুমি আমার জীবনদাত্রীও বটে। তোমাকে আমি ভুলব কেমন করে? তুমি যে আমার! একান্তভাবেই আমার। সেখানে আর কারো স্থান নেই।

দশরথের স্বর কৈকেয়ীকে মুগ্ধতার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু দাবির আশ্বাস পূরণ হয় না বলেই তার কণ্ঠে শ্লেষ বিদ্রূপের বিস্মিত ঝঙ্কার। চমৎকার! অপূর্ব তোমার অভিনয়।

কৈকেয়ীর আচরণকে দশরথের জটিল মনে হল। দশরথের সমস্ত চিন্তায় দিগন্তেকে সে বিস্ময়াবিষ্ট করল। হতাশ গলায় বলল : এত আন্তরিকতা সব মিথ্যে। সত্যি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা হয়।

কৈকেয়ী খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল ; তুমি ঠিক বলেছ। এতকাল এই কথাটা আমার না বোঝার সুযোগ নিয়েছ তুমি।

কৈকেয়ী!

অবাক হয়ো না রাজা। আমাকে ঐ নামে ডেকে তুমি দুর্বল করে দিও না। তোমার মুখে ঐ ডাক শুনলে আমি স্থির থাকতে পারি না। আমাকে বলতে দাও। জানতে দাও। আমায় বুকের ভেতর আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙছে। তোমার সম্মোহনী বিদ্যা দিয়ে তাকে যাদু কর না। রুদ্ধ কর না তার গতিমুখ। বলার সময় কৈকেয়ীর মুখে রঙের ছটা লাগল।

দশরথ ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। অবাক স্বরে বলল : তোমাকে বাধা দেব এমন কথা মনে হল কেন? নিভৃতে দুটো কথা বলার জন্যই তোমার কাছে এসেছিলাম। কক্ষের শ্রী দেখেই বুঝলাম, তোমাকে এখানে পাব। এখন বল, কে তোমায় অপমান করেছে, কে ভর্ৎসনা করেছে?

কৈকেয়ী আস্তে আস্তে উঠল। দশরথের চোখের উপর চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখ দিয়ে তেজ বিকীর্ণ হতে লাগল। কথা বলার সময় তার গলার স্বর কাঁপল। বলল : আগে কথা দাও আমার কথা রাখবে, তা হলেই বলব।

তোমাকে অদেয় কিছু নেই রানী।

বেশ, আমার প্রশ্নের তা-হলে উত্তর দাও।

বল, তুমি কি জানতে চাও?

মহারাজ, ইক্ষ্বাকুবংশের সিংহাসনে কার অধিকার?

দশরথ চমকাল। ভেতরে ভেতরে সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। একটা ভীরু জিজ্ঞাসা তার চোখে থম থম করছিল। তথাপি, দশরথ নিজেকে শক্ত রাখল এবং নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলল গাম্ভীর্য্য তার দৃঢ়তাকে। মনের সমস্ত দৃঢ়তাকে একত্র করে সহজ গলায় বলল। এমন অসংগত প্রশ্নের আবশ্যক কি?

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

দশরথের নিঃশ্বাস সহসা বুকের কাছে আটকে গেল যেন। বিরক্তিকর অস্বস্তিতে ছটফট করছিল। পাছে মুখের অভিব্যক্তিতে সে অস্থিরতা ফোটে গলার স্বর বদলে বলল ঃ পৃথিবীর সব রাজবংশেই জ্যেষ্ঠ সন্তানের সিংহাসনে অভিষেক হয়।

তোমার পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনে হয় কাকে?

কৈকেয়ীর উজানমুখী কথার উল্টোস্রোত দশরথের বুকের ভেতর ছলাৎ করে উঠল। দ্বিধাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় বলল ঃ তুমি তো এই বংশের বধূ একজন। সন্তানদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ? তার উত্তর আমার চেয়ে তুমি ভাল জান। এসব'ত মায়েদের জানার কথা। পিতারা জানবে কোথা থেকে? তোমরা যাকে জ্যেষ্ঠ বলে স্থির করেছ তাকেই জ্যেষ্ঠ বলে জানি।

-স্বামী। প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেও না। যা জানতে চাই, বল।

আমি তো বুঝতে অক্ষম, জ্যেষ্ঠ নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ কেন? কে বা কারা তোমাকে রামবিদ্বেষী করে তুলল? রাম তোমার পুত্রাধিক প্রিয়। তাকে ঈর্ষা করা জননীর শোভা পায় না।

কৈকেয়ীর ভুরু কুঁচকে গেল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে মনের কষ্ট চেপে বলল ঃ ঈর্ষা! ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হাসি ফুটল। কৈকেয়ীর সমস্ত বুক জুড়ে তখন দশরথের বিবেকহীন মূঢ়তার প্রতি ধিক্কার। নিষ্কুণ্ডল হয়ে পাক খেয়ে গলার কাছে উঠে এল যেন। বলল ঃ আমার কথার উত্তর হলো না। মিছেমিছি আমাকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করছ। কিন্তু তোমার কোন কৌশলে আমি বিভ্রান্ত হচ্ছি না। তোমার ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি না।

কৈকেয়ীর কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দশরথের ব্যক্তিত্ব এবং বিবেককে বিদ্ধ করল। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। কেমন যেন হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। অসহ্য একটা গ্লানিতে দশরথের কান জ্বালা করছিল। শরীরে ঘাম ফুটে উঠেছিল। সাহস সঞ্চয় করে নিষ্পলক চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর অবাক স্বরে বলল ঃ ছোট রানী, আজ তোমার মন ভাল নেই। তুমি উত্তেজিত। অপ্রকৃতিস্থ। এখন এসব নিয়ে আলোচনার সময় নয়। তোমার অসংলগ্ন এবং, অসংগত প্রশ্ন আমার চিত্তদাহের কারণ হচ্ছে।

কৈকেয়ীর মুখ রাগে. ক্ষোভে পাংশুবর্ণ হলো। নিজেকে সংযত করে বলল ঃ আবার শুরু হল মিথ্যের খেলা। যখন নিজেকে বাঁচানোর দরকার হয়, মানুষ কি না করে। নির্বিচারে মিথ্যে সাজাতেও তার ক্লান্তি থাকে না। তোমারও নেই। তাই, তোমাব মুখেতে শুনব জ্যেষ্ঠকে, আর কাকেই বা জ্যেষ্ঠ করা হয়েছে?

কৈকেয়ীর তিরস্কারে দশরথের বুক এত ভারী হয়ে উঠল যে সে নীরব রইল। নিজের মিথ্যায় নিজেকে এভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে ভাবেনি দশরথ। তাই অপমানে, যন্ত্রণায় তার দুই চোখ প্রায় বুজে এল। তবু কৈকেয়ীর মুখের দিকে বোকার মতো কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ তা হলে শোন। পুত্রদের মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ। অযোধ্যার সিংহাসন তার প্রাপ্য। লোকে রামের গুণকীর্তন করে। আমিও করি।

কৈকেয়ীর ভ্রূকুটি চোখে কেমন একটা তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠল। অবাক স্বরে প্রশ্ন করল ঃ ধর্মানুসারে অযোধ্যার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী কে?

কৈকেয়ীর নির্বিকার মুখে বিজয়িনীর হাসি দীপ্ত হল। চোখে প্রতিশোধের ঘৃণা। বলল ঃ ভরত যদি দাবি করে এ সিংহাসনে তার ন্যায্য অধিকার তাহলে কী উত্তর দেবে তুমি?

কৈকেয়ীর প্রশ্নে দশরথের মুখ চকিতে পরিবর্তন হল। তাকে গম্ভীর বিষণ্ণ দেখাল। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়েন দশরথ। তার মনের আহত সংকুচিত দৃষ্টিতে বিরক্তি কিংবা বিরূপতা ছিল না। বরং কেমন কোমল করুণ, আর অসহায় দেখাল। কিন্তু বুকের ভেতর এক অশান্ত অস্থিরতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। তীব্র অপরাধবোধের কষ্ট প্রবল হল। উৎসুক চোখে তাকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বলল, না, না, ভরত সে রকম ছেলেই নয়। আমার পুত্রদের মধ্যে সে সর্বাধিক ধার্মিক, নির্লোভ সাধু চরিত্রের। ভ্রাতৃবৎসল ভরতের রাম হল জপতপ। সে কখনও জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। রামকে বঞ্চিত করে, ভ্রাতৃত্বের বিশ্বাস ভেঙে রাজসুখ গ্রহণে অভিলাষী নয় সে। অন্তত ভরতের কাছে আমি সেরকম প্রত্যাশা করি না।

কৈকেয়ীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝিলিক দিল। ঠোঁট দুটি ধনুকের মতো বাঁকল। ভ্রূকুটিতে। বিস্ময় বলল, মহারাজ তোমার জবাবে জোর কোথায়? ভরতের সিংহাসনের দাবিকে এক কথায় নাকচ করতে পারলে না। কেন জান? মানুষের বিবেক কখনও তার ইচ্ছায় চলে না। তাই চেষ্টা করেও তুমি মিথ্যে বলতে পারলে না। নিজের অজান্তে ভরতের অধিকার স্বীকার করলে। মানুষের অপরাধের পাল্লা যখন ভারী তখন অপরাধ সচেতন মন তার তাল সামলাতে পারে না। তাই ভরতকে তোমার ভয়। ভরতকে সৎ, ধার্মিক, দয়ালু, ভ্রাতৃবৎসল, ত্যাগী এইসব গালভরা মিষ্টি কথায় তোয়াজ করে তাকে ভুলোচ্ছ। ভ্রাতৃবৎসল ভরত কখনও রামকে বঞ্চিত করে সিংহাসনের অধিকার নেবে না, এ কথা আবার বিশ্বাসও কর। কেন? সে কি শুধু ভরত জ্যেষ্ঠ বলে?

দশরথ বিমর্ষ স্বরে প্রশ্ন করল : এ সব কী বলছ তুমি?

আমি বলব কেন? বলতে বাধ্য করছ তুমি। ভরতকে সৎ-ধার্মিক ভ্রাতৃবৎসল জেনেও তাকে বিশ্বাস করতে পার না। ভয় পাচ্ছ তাকে। পিতা হয়ে পুত্রের সঙ্গে কেমন নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছ, অবাক হয়ে তাই শুধু দেখছি। ধন্য তোমার ধর্মবোধ। তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র আদর্শ নেই। তুমি সৎ নও— প্রতারক, প্রবঞ্চক মিথ্যেবাদী। চতুর, নীচ, নিষ্ঠুর ধর্মহীন, বিবেকহীন এক অমানুষ। অপরাধ করতে করতে তুমি একটা শয়তান হয়ে গেছে। নইলে, কোন পিতা তার ধার্মিক, নির্লোভ সাধু চরিত্রের পুত্রকে অবিশ্বাস করে?

দশরথ বিব্রত বিস্ময়ে ডাকল : প্রিয়তম রানী আমার।

কৈকেয়ীর ঠোঁটের কোণ শক্ত দেখাল। দৃষ্টি কঠিন হলো। বলল : ঐ সম্মোহন স্বরে আমাকে ডেক না তুমি। তোমার ডাকে আর মন গলবে না। আমাকে থামাতে পারবে না। ভরতের চিন্তা তোমার বিবেককে সকল সময় দংশন করছে। তাই তুমি সর্বদা অশান্ত, অস্থির, অপ্রকৃতিস্থ। তুমি তোমার দুর্বলতা জান না। একদিন ভরত সম্বন্ধে তোমার উৎকণ্ঠা দেখে আমি খুশি হতাম। কিন্তু সে যে তোমার বিবেক দংশনের প্রতিক্রিয়া, কেমন করে জানব?

দশরথ মৌন বিস্ময়ে মাথা নত করল। কৈকেয়ী তার খুব গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চিবুকে হাত দিয়ে উঁচু করে ধরল তার মুখ। নিজের চোখের উপর দশরথের চোখ ন্যস্ত করে বলল : মহারাজ এই চোখ দেখে ভুলেছিলে একদিন। মনে পড়ে সে বিস্মৃত অতীত? এই নারীর আশ্চর্য সেবায় মুগ্ধ হয়ে কি বলেছিলে সে কথা মনে আছে? আমাদের পবিত্র প্রেমের নামে শপথ করে বল রামের অভিষেকের সময় ভরত-শত্রুঘ্নকে দূরে পাঠালে কেন? তারা থাকলে রামের অভিষেকের ক্ষতি হত কি? রামের অভিষেক নিয়ে তোমার গোপনীয়তা কেন? তোমার ভাষায় প্রিয়তমা রানী আমি, তাকেও সে বার্তা শোনাতে ভুলে গেলে? এতো ভারি আশ্চর্য!

দশরথ প্রায় খানিকটা অসহায় চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে বলল : কৈকেয়ী তোমার সন্দেহ ভয়ানক। বাক্য তীক্ষ্ণ। নির্মম তোমার পরিহাস।

মহারাজ ততোধিক নির্মম তোমার কপটতা। ভরতের প্রতি তুমি অকারণ নিষ্ঠুর হলে কেন? সেও তোমার পুত্র। তবু জ্যেষ্ঠের সম্মান সে পেল না। ইক্ষ্বাকুবংশের প্রথা তো পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজা হওয়ার। তা হলে ভরতের বেলায় তুমি সে নিয়ম মানলো না কেন?

রানী! ভুল ভুল। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তোমার নয়নমণি রাম।

মহারাজ, ঘটনা তা বলে না। রাম নিজেও জানে, ভরত অযোধ্যার রাজা হবে। তাই প্রিয়তম ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে সে অভিষেক্ রাজি হলো। ভরতের প্রতি তোমার অহেতু সন্দেহ নিয়ে রাম কোন প্রশ্ন করল না। এর অর্থ কি? সন্দেহের শেষ কিন্তু এখানে নয়। শুধু সূচনা। অভিষেক অনুষ্ঠানের ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত নেই। একথা জেনেও রাম একটু ও দুঃখিত নয়। তার চিত্ত ভ্রাতাদের জন্যে কাতর হয় না। কিংবা কেকয় থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার কোন কথাও তোমায় বলেনি রাম। তুমিও কিছু করলে না। চুপিচুপি অভিষেক করছিলে। অভিষেকের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের তালিকা থেকে তাই কেকয়রাজ এবং ভরতের শ্বশুর সাকাংশ্যরাজ কুশধ্বজ বাদ পড়ল। শুধু এঁদের আমন্ত্রণ করতে ভুল হল কেন? এ ভুল তোমার ইচ্ছাকৃত নয়তো?

কথার শেষ কৈকেয়ীর জ্বলন্ত দৃষ্টি পলকে দশরথের বিব্রত মুখ ছুঁয়ে গেল; দশরথকে সংকুচিত দেখাল। অপ্রস্তুত হয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল: তোমার অহেতু বিষ সন্দেহের কোনো জবাব হয় না।

কৈকেয়ীর দৃষ্টি ঝলকে উঠল তৎক্ষণাৎ। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম হলো। ক্রোধে গরগর করতে করতে বলল: জবাব নেই বলে দিতে পারছ না! থাকলে ছেড়ে দিতে না। কেননা তুমিও জান ধর্মানুসারে অযোধ্যার সিংহাসন ভরতের প্রাপ্য। দু'ভাবে এই সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। প্রথম তুমি তাকে জ্যেষ্ঠ না বললেও, ঘটনার পারম্পর্যে সে জ্যেষ্ঠ; এই সন্দেহ রাজপ্রসাদের সকলের। দ্বিতীয়ত, কেকয় রাজের কাছে তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তাঁর দৌহিত্রকে অযোধ্যার রাজা করবে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি

পালনের কোন সততা তুমি দেখাওনি। সত্যকে লুকোনো অপরাধে তুমি ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে।

বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে দশরথ কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। করুণ কণ্ঠে বলল: কৈকেয়ী, অহেতুক আমার উপর নিষ্ঠুর হয়ো না। এত আয়োজন পন্ড করে সবার সামনে আমাকে অপদস্থ কর না। আমাকে তুমি করুণা কর।

কৈকেয়ীর চোয়াল শক্ত হলো। স্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। বলল : রাজা নিজের সঙ্গে নিজে ছলনা করছ তুমি। ভরতও তোমার ঔরসজাত পুত্র। তথাপি, সে তোমার স্নেহ সমাদর পেল না। অদৃষ্টে তার পিতার পক্ষপাত লেখা। ভরতের এই দুর্ভাগ্যের কোন পরিমাপ হয় না। আচ্ছা তুমিই বল না, ভরতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছ কেন? ভরত তোমার কি অনিষ্ট করেছে? রামকে হতাশ করতে তোমার যেমন বুক ফাটছে তেমনি ভরতকে বঞ্চিত হতে দেখে আমারও মন পুড়ছে। তুমিই আমার বুকে আগুন জ্বালিয়েছ, সে আগুনে শান্তি পুড়ে ছাই হবে।

কৈকেয়ী তুমি শান্ত হও। অশান্ত হৃদয়াবেগে সংযত কর। রামের প্রতি প্রসন্ন হও।

কি করে শান্ত হব রাজা? তুমি তো জান না আমার জ্বালা কোথায়? রাম ভরত দুজনেই তোমার দেহজ, আত্মজ। কিন্তু রাম আমার কে? আমার সপত্নী পুত্র ছাড়া তো কিছু নয়? তোমাকে নিয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ। আমি তার গর্ভধারিণী নই। তবু তার প্রতি মমতা, স্নেহ ছিল অসীম। কিন্তু রাম তার মর্যাদা রাখেনি। রাজা হওয়ার লোভে আমাকে কপট শ্রদ্ধা ভক্তি করত সে। তাই অভিষেকের সংবাদটা বিশ্বাস করে প্রিয় ছোট মা'কে বলতে পারে নি। আমার স্নেহ ভালবাসার উপর তার বিশ্বাস নেই। সন্দেহ আছে। আমাকে সে শুধু 'ভরতের মা' মনে করে। আমার উপর তার দাবি নেই, জোর নেই। অথচ তার ছোট মা'কে ভাল করেই চেনে। তবু তার পিতার মতই কপট। বিমাতাকে বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে, অবিশ্বাস করে ঠকা অনেক ভাল তার কাছে। এই দুঃখ প্রকাশ করার প্রকাশ করার ভাষা নেই আমার। রাম তার অভিষেকের কথা যদি একবার জানাত কিংবা দাবি করত তা হলে খুশি মনে ভরতের সব অধিকার তাকেই দিতাম। কিন্তু মর্যাদা হারানোর পর তা। আর হয় না। ভরতের প্রতিও রাম যথেষ্ট উদার নয়। ভরতকে প্রতিপক্ষ ভাবে সে। তাই তার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার উপর রামের কোন আস্থা নেই। লক্ষ্মণের প্রতি রামের যে বিশ্বাস, ভরতের উপর তা কৈ? রাম আমাদের উভয়ের উপর যথেষ্ট অবিচার করেছে। তার আচরণ পুত্রসুলভ নয়। ভ্রাতৃসুলভও হয়নি। আমরা তার চোখে শত্রু। শত্রুকে বিশ্বাস করে না কেউ। রাম করেনি। অভিষেকের সংবাদ তাই গোপন করেছিল। রামের আচরণে আমার হৃদয় জুড়াবে কি দিয়ে? অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, পর আপন হয় না কখনও-। আমার সরল বিশ্বাস নিয়ে তুমি এবং রাম ছিনিমিনি খেলেছ। তোমাদের আর বিশ্বাস নয়। এবার চাই প্রতিকার।

প্রিয়তম রানী আমার! রাম ছেলেমানুষ। কি করতে কি করে ফেলেছে। এসব জটিলতা সে বোঝে না!

উত্তম। তাহলে তুমি কেন অপ্রিয় কাজ করলে? আমাকে তোমার কিসের ভয়?

বেশ আমি দোষ করেছি। অকপটে স্বীকার করছি, আমার অপরাধ হয়েছে। এবার তুমি ক্ষান্ত হও। আমাকে কৃপা কর। আমি কখনও কারো করুণা ভিক্ষা করিনি। কোন ব্যাক্তির দ্বারা পরাজিত কিংবা অপমানিত হইনি। আজ তোমার কাছে আমার মিনতি—

রাজনীতিতে কোন মিনতির স্থান নেই। শত্রু কালসর্পের মতো। তাকে কখনও অল্প পীড়ন করে ছেড়ে দিতে নেই। একদিন পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার পুত্র হবে অযোধ্যার রাজা। আর অন্য রানীদের পুত্রসন্তান হলে তারা যাবে নির্বাসনে। আমি সেই প্রতিশ্রুতি পালনের আহ্বান করছি। ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা করে রাম-লক্ষ্মণকে নির্বাসনে পাঠাও। এবং এখনি।

কৈকেয়ী, দয়া কর।

কোন কথা বল না রাজা। সত্যরক্ষায় তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রেমের দেবতা হরপার্বতী তার সাক্ষী। আর প্রমাণ তোমার বিবেক।

কৈকেয়ী শোন আমার কথা। অত নিষ্ঠুর হয়ো না

রূপসী রাজবধূর ভিতর থেকে যেন এক বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে ফণা তুলল। কৈকেয়ীর বিষদাঁত যেন সুড়সুড় করে উঠল। ভ্রুকুটি করে বলল : মহারাজ তোমার কপটতার তুলনায় আমার নিষ্ঠুরতা সামান্য। আমি কোন হীন সন্দেহে, কিংবা অবিশ্বাসে আমার প্রেমের স্নেহের অপমান করেনি। আমার মনেও রামের প্রতি কোন ঈর্ষা বা ঘৃণা নেই। তবু আমরা তার চোখে চিরশত্রু। রাম শত্রুর যম একথা তো প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে শোভা পায়। রাজা হয়ে গৃহশত্রুর বীজ সে ধ্বংস করবে। শত্রুকে রাম ক্ষমা করে না। রাম সিংহাসনে বসলে আমরা নিশ্চিহ্ন হব। নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ তাকে দেব না। একবার যখন তার চোখে বিনা কারণে শত্রু হয়ে গেছি, তখন কোনদিন আর মিত্র হতে পারব না। তাই শত্রুর মতই আচরণ করব। শত্রুর সঙ্গে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই তার নির্বাসন প্রার্থনা করছি।

রানী! তুমি কি জান না রামের অধিক প্রিয় আমার কেউ নেই।

মহারাজ, তুমি একমুখে দুরকম কথা বল। একটু আগে বলেছ পুত্রদের মধ্যে ভরতকে সর্বাধিক স্নেহ কর। এখন বললে, রাম তোমার প্রিয়। তোমার কোনো কথাই বিশ্বাসের নয়।

দশরথ কথা খুঁজে পেল না। কেমন একটা অসহায়বোধ সে আচ্ছন্ন। ইতস্ততঃ করে বলল: রানী তুমি তো নিষ্ঠুর নও। লোভী নও। রামের কোন ক্ষতি তোমার সহ্য হয় না। তা-হলে আজ তার অনিষ্ট চাইছ কেন? আমিও বা প্রিয়তম পুত্রকে কোন অপরাধে ত্যাগ করব?

মহরাজ কোন্ অপরাধে মায়ের বুক থেকে তার সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে দূরে রেখেছে? তোমার কি ক্ষতি করেছি বল। কেন, তুমি স্নেহশূন্য করলে আমাকে? আমার বুকের সাগর সেঁচে আজ কোন্ শুক্তি তুমি সন্ধান করছ?

কৈকেয়ীর কথায় দশরথের চোখ মুখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম আর গনগনে হয়ে উঠল। হতবুদ্ধির মতো চুপ করে সে, কৈকেয়ীকে এড়াতে চাইল। তাকে নিরুত্তর দেখে কৈকেয়ী বলল: তোমার মনে রক্তের বিশুদ্ধতার শুচিবাই রয়েছে, তাই এত দ্বিধা। এ সংস্কার আমাকে ভাঙতেই হবে।

দশরথ করুণ চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল: তোমাকে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য দিচ্ছি রানী তুমি শান্ত হও।

পুত্র আমার ঐশ্বর্য। আমার বিশাল সাম্রাজ্য। তার তুলনায় তোমার দান তুচ্ছ! পুত্র তার পিতার অনুগ্রহ চায় না। সিংহাসনে তার ন্যায্য অধিকার। সে অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করলে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গকে জনে জনে শুধাব দশরথ সত্যভঙ্গকারী, আদর্শহীন রাজ। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক, সে শঠ, প্রতারক, প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করে না।

দশরথ হতভম্বের মতো কৈকেয়ীর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। খুব চিন্তিতভাবে চোখ টান টান করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: কিন্তু এই অপ্রিয় কার্য করলে আমি কৌশল্যাকে কি বলব। অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করেছি তার অন্যথা কেমন করে করব? নানা দিক থেকে আগত নৃপতিদেরও বা কি কৈফিয়ত দেব? আমার অনুগত প্রজাকুলের কাছে কোন মুখে দাঁড়াব? রামের অভিষেকের সব আয়োজন সমাপ্ত। কল্য প্রভাতে শুভলগ্নে সিংহাসনে আরোহন করবে। এখন কেমন করে তাকে বনগমন করতে বলব?

এতো তোমার সমস্যা। কি ভাবে সমাধান করবে সে তো তোমাকে ঠিক করতে হবে।

কৈকেয়ী আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর।

মহারাজ, তুমি নিজেকে সত্যবাদী বলে থাক। তাহলে স্নেহান্ধ হয়ে সত্য ধর্মলঙ্ঘন করবে কেন? সবার উপরে ধর্ম। ধর্ম লঙ্ঘন করলে লোকে নরকগামী হয়। এসব জেনেও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করতে চাও কেন?

রানী, আমি বৃদ্ধ। শেষ দশায় এসেছি। দীনভাবে বিলাপ করছি তুমি করুণা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই রাজ্য তুমি একহাতে গ্রহণ করে অন্যহাতে রামকে দান করে পরম যশ লাভ কর।

কৈকেয়ী হাসল। গালে তার টোল পড়ল। বাদামী রঙের কটা বড় বড় চোখ দশরথের মুখে স্থিরভাবে স্থাপন করে বলল: আশ্চর্য তোমার ধর্ম জ্ঞান। অযোধ্যার সিংহাসনের রক্তের বিশুদ্ধতা

রক্ষায় এই শুচিবাই তুমি ত্যাগ কর। ধর্মজ্ঞানীরা বলেন সবার উপর ধর্ম; সত্যই পরম ধর্ম, আমি তোমার সহধর্মিণী হয়ে সেই সত্যধর্ম রক্ষার পরামর্শ দিচ্ছি। রামকে ডাক। তাকে বনে পাঠিয়ে ভরতকে অভিষেক কর। সত্য রক্ষা হোক। সত্য রক্ষার জন্যে শ্যেন পক্ষীর সঙ্গে কপোতের বিবাদ উপস্থিত হলে রাজা শিব প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য স্বীয় মাংস দান করেছিল। রাজা অর্কও প্রতিশ্রুতি পালনের নিজ চক্ষুদ্বয় অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করে দিব্যগতি লাভ করেছিল। অন্ধ স্নেহ মোহ ধর্মত্যাগ করে, রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা কখনো উচিত হবে না। সত্যের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় তোমাকে জয়ী হতে হবে। সত্যধর্ম পালন না করলে তুমি নরকগামী হবে।

বামুনের ছদ্মবেশ বিষ্ণুর দানবরাজ দানবরাজ বলি যেমন কথার জালে জড়িয়ে পড়েছিল তেমন দশরথও কৈকেয়ীর বাক্য জালে জড়িয়ে পড়ল। অশ্বকে তীক্ষ্ণ কশাঘাত করে যেমন আজ্ঞাধীন রাখা হয় তেমনি কৈকেয়ীর নির্মম বাক্যে দশরথও বশীভূত হয়ে রইল। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল : অদৃষ্টের বন্ধনে আবদ্ধ আমি। এর থেকে আমার মুক্তি নেই। আমাকে নিয়ে তাই যা খুশি করতে চাইছ। ব্যাপারটা এখানে শেষ হওয়া দরকার। এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে এবং পুত্র ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে সব সম্বন্ধ অস্বীকার করলাম। তোমাদের সঙ্গে আমার ধর্মবন্ধন শেষ হল। তুমি আমার কেউ নও। প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্বও আর রইল না।

আচমকা এরকম একটা কথায় কৈকেয়ী অবাক হলো। দপ্‌করে জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। আকস্মিক এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে কিন্তু সে কথার খেই হারিয়ে ফেলল না। শুধু অস্থিরভাবে বার কয়েক তার মুখের দিকে কটমট করে তাকাল। তারপর তেজের সঙ্গে ঝাঁঝাল স্বরে বলল ; মহারাজ আমি কি তোমার খেলনা? ইচ্ছে হল খেললে, পছন্দ হল না ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এত সহজলভ্য কিন্তু আমি নই। ক্রোধে তোমার মাথা ঠিক নেই। কী বলছ ভাল করে জান না। মুখ ফস্কে কথাটা একবার বেরোল অমনি সব চুকে বুকে গেল। স্ত্রী ত্যাগ করা এত সহজ ঘটনা? রীতিমত অগ্নি সাক্ষী রেখে মন্ত্র পাঠ করে পাণিগ্রহণ করেছ, হরপার্বতীর পাদস্পর্শ করে আজীবন দায়িত্বভার গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে। সাত পাকের ফেরে ফেরে বাঁধা পড়েছে সে প্রতিশ্রুতি। সে বাঁধন ছেঁড়া তাই সহজ নয়। বিয়ের মতো শক্ত বাঁধন আর কি আছে? এক অগ্নিসাক্ষী রেখে আমরা মিলেছি, আর এক অগ্নিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এই মিলনের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই। সুতরাং ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে কৈকেয়ীকে ভয় দেখানো যায় না। অনাদর করে ফেলে দেবে সেও আমি নই। তোমার দুর্মতি হয়েছে, তাই মুখে এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না। তুমি ধর্মত্যাগ করে অধর্মের পথে রামকে রাজ্য দিয়ে কৌশলার সঙ্গে সুখে বিহার করতে চাও। আমি তোমার পথের কাঁটা এখন। আমাকে নির্মূল করতে চাও। বেশ, প্রতিশ্রুতি যদি না রাখ তবে আজই তোমার সামনে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব। বেঁচে থেকে স্বামীকে সত্যভ্রষ্ট দেখার চেয়ে মরণ অনেক ভাল।

পাপ সংকল্প ত্যাগ কর রানী।

পাপ হবে কেন রাজা? পাপ অভিপ্রায় ছিল তোমার মনে। পুত্র ভরত অনার্য জননীর সন্তান বলে আর্য পিতার সাম্রাজ্যের কোন অধিকার তাকে দিতে চাও না। তোমার নিজের লড়াই চলছে আর্য অনার্যের সংস্কারের। উত্তরণের জন্য দীর্ঘ-কাল ধরে তার প্রস্তুতিও চলেছে তোমার মনের অভ্যন্তরে। আজ ধরা পড়ে গেল তোমার গোপন অভিপ্রায়। নিজের পাপ, অপরাধ, অধর্ম ঢাকতে তুমি আমাকে মিথ্যে তিরস্কার করছ। কিন্তু ভেবে দেখ রাজা ইক্ষ্বাকুবংশে পাপ অধর্ম কে ঢুকিয়েছে? তোমার কর্মফলের জন্য দায়ী তুমি। আমি তোমাকে সেই অন্যায় অধর্ম থেকে নিবৃত্ত করছি। আমার পাপ কোথায়? আমার প্রার্থনা তো কিছু অন্যায় নয়। তোমার প্রতিশ্রুতি তোমাকেই রক্ষা করতে বলা। একে পাপ সংকল্প বলছ কেন রাজা? তোমারই ঔরসজাত আর এক পুত্রকে ধর্মানুসারে রাজা করবে। সিংহাসনে তোমার আর এক সন্তান ভরতের ন্যায্য অধিকার। সেই অধিকার থেকে তাকে জোর করে বঞ্চিত করতে চাইছ বলে, তোমাকে ধর্ম-সত্য-বিবেক ত্যাগ করতে হচ্ছে। আর তার জন্য নিজের মনে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছ। অথচ, প্রতিজ্ঞা পূরণ হলে সত্যরক্ষা পায়। এসব জেনেও আর্য-অনার্য সংস্কার বশে ভরতের ন্যায্য অধিকার মেনে নিতে পারছ না। তোমার মধ্যে পিতার নিরপেক্ষতা

কোথায়? রামকে নির্বাসনে পাঠাতে তাই তোমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে ভরতকে অযোধ্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তোমার কোন কষ্ট দুঃখ অনুতাপ নেই। আশ্চর্য তোমার বাৎসল্য! শুনে রাখ রাজা, জেদ রাখতে তুমি যেমন কৃতসংকল্প, আমিও তেমনি প্রতিজ্ঞা পুরণে তোমাকে বাধ্য করব।

কৈকেয়ী তুমি মানুষ নও। স্ত্রী জাতির কলংক। শঠ স্বার্থপর মেয়েমানুষ। নৃশংস, দুষ্টচরিত্রা। কুলনাশিনী, পাপিনী। রাম ও আমাকে বিনাশ করতে চাও রাক্ষুসী। রাগে ও উত্তেজনায় দশরথের দুই চোখ লাল হলো। উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল: ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার।

কৈকেয়ীর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। অবিচলিত স্বরে বলল : মহারাজ, তুমি স্বামী। স্ত্রীদের যা খুশি করা এবং বলার অধিকার স্বামীদের একচেটিয়া। নারী হয়ে জন্মেছি। সমাজ তো নারীকে অবলা সাজিয়ে রেখেছে। পুরুষের মতো নারী অশালীন হতে পারে না। এসব অমার্জিত কথাবার্তা কিন্তু তোমার প্রেমের গৌরব প্রকাশ করে না। তোমার বুকের অন্তঃস্তলে লুকোনো ইচ্ছেকে শুধু প্রকাশ করে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সাক্ষী তোমাকে আমি অপমান করেনি। কটু কথাও বলেনি। শুধু স্ত্রীর কর্তব্য করেছি। ধর্মের প্রতি স্ত্রীজাতির একটা অন্ধ আনুগত্য আছে। আমি তোমাকে সেই ধর্মপালন করতে বলেছি।

কৈকেয়ীর বাক্য দশরথের শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল দামামার মতো। সেই রণবাদ্য যা অবশম্ভাবী হলো দুই বিপরীত মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্বন্দ্ব সংঘাতে ও সংঘর্ষে। মুখে চোখে তার বিহ্বলভাব। বুকের ভেতর অকস্মাৎ যন্ত্রণার সূত্রপাত হলো। মাথার ভেতর বিশ্বব্রহ্মান্ড পাক খেতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পায়ের তলায় মাটি দুলছিল। দেহ টলছিল। চোখের চাহনিতে কেমন একটা অস্বাভাবিক অপ্রকৃতিস্থতা। তবু সে কষ্টের ভেতর কথাগুলো টেনে টেনে বলতে লাগল। তোমার বুদ্ধি অল্প নয়। ব্যাধ যেমন বধের আগে হরিণকে গানের দ্বারা আকৃষ্ট করে বধ করে তুমিও সেরকম প্রিয়বাক্যে আমাকে মুগ্ধ করে বধ করতে উদ্যত হয়েছে। এই অপ্রিয় কাজ করলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। তখন আমার ও রামের অভাবে তুমি আকুল হয়ে পড়বে। নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা ভোগ করবে। অনুতাপে দগ্ধ হবে তোমার হৃদয়। রামের নির্বাসন যদি তোমার একান্ত অভিপ্রেত হয় তা হলে আমার মৃত্যু অবধারিত। রামের বনগমন হলে তুমি বিধবা হবে। তুমি কি সেই মৃত্যু দেখতে চাও? কৈকেয়ীকে নিরুত্তর ও অধোমুখী দেখে দশরথ কাঁপতে কাঁপতে বলল: তা হলে শুনে রাখ, আমার মৃত্যুর পর ডাইনির পুত্র ভরতের প্রেতকার্যের কোন অধিকার থাকবে না। তুমি বিধবা হয়ে পুত্রের সঙ্গে সুখে রাজ্যভোগ কর। —একথা বলতে বলতে দশরথ অকস্মাৎ ছিন্ন তরুর মতো ভূতলে পতিত হলো।

অনেকক্ষণ পর দশরথের মূর্চ্ছা ভাঙল। জবাফুলের মতো লাল টকটকে দুই চোখে তখনও অপ্রকৃতিস্থতার ঘোর। স্বপ্নাতুর ঘোলা ঘোলা দুই মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। এক এক করে চোখ রাখল সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, কৌশল্যা, সুমিত্রার মুখের উপর। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে কোথাও দেখল না। তাদের না পেয়ে হতাশ হলো। কষ্টে দশরথের দুই চোখ বুজে এল। বোজা চোখ ফেটে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে অধীর হৃদয়াবেগ সংবরণ করল। তারপর ভেজা গলায় কাঁপা স্বরে বলল : সুমন্ত্র, আমার প্রাণাধিক রাম কোথায়? তার সব কুশল তো?

সুমন্ত্র হাঁটু গেড়ে দশরথের সামনে বসল। বিভ্রান্তের মতো দশরথের দিকে তাকাল। অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে দেখল দশরথকে। তারপর বলল: মহারাজ আপনি শান্ত হোন। কুমার তার নিজ গৃহেই আছে।

দশরথের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে বলল: তোমরা তো কেউ আমার খবর রাখ না। আমার আজকের দিনটা মোটে শুভ নয়।

দশরথের অসহায়তা সুমন্ত্রের হৃদয় স্পর্শ করল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল : আপনার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে দিনও ভাল কাটবে না।

সুমন্ত্রর কথা শুনে অদূরে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কৈকেয়ী যেন একটু খুশি হলো। একটা দৃষ্টি ক্ষণেক খেলা করে গেল তার মুখে। কৌতুক দৃষ্টি মেলে উত্তরটা বেশ উপভোগ করল সে।

কিন্তু এ কথা দশরথ মুখ তুলে তাকাল সুমন্ত্রর দিকে। ভুরুকুঁচকে গেল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় কাঁপতে কাঁপতে জ্বরাগ্রস্ত রোগীর মতো ভাঙা গলায় বলল : মনের আর দোষ কি সুমন্ত্র? নিজের মতো করে থাকবার উপায় নেই। কোন্ পাপে অজ্ঞানবশে আমি কেকেয় রাজকন্যার কণ্ঠলগ্ন হলাম বলতে পার? কে জানত, এই ছোট রানী থেকেই আমার সর্বনাশ?

বাতায়নে পাশে দাঁড়িয়ে শুনল কৈকেয়ী। কিন্তু দশরথের কথা উত্তর দিল না। এক পা এক পা করে এগোল দশরথের দিকে। তার ব্যাক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা নীরব গাম্ভীর্যে ঢাকা ছিল যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কটু মন্তব্য করতে পারল না। কৈকেয়ী ভ্রুকুটি করে বলল : আমাকে গালমন্দ করা তোমার কাজ। কিন্তু এ গালমন্দ করার কি কারণ হলো, তা তো ওদের শোনালে না! আমার দোষের কথা ওদের শোনাও। স্বামী বলে যা খুশি অপমান করতে পার না তুমি। অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কিছু বললে আমি মানব না।

দশরথ কথা খুঁজে পেল না। রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে গেল তার মুখ। কৈকেয়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা একটু ভেবে নিল। তারপর নির্ভয়ে সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করল। দশরথের কপটতার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুকেব তার হাসি দাঁতের ঝিকিমিকির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। বলল : মহামাত্য সুমন্ত্র, জ্ঞানহারা হয়ে মহারাজ প্রলাপ বকছেন। তিনি প্রকৃতিস্থ নন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের বিভ্রান্তি বাড়ে। আপনি রামকে একবার ডাকুন এখানে।

সুমন্ত্র কৈকেয়ীর দিক থেকে দশরথের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : দেবী, আমাকে অপরাধী করবেন না। আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। রাজাদেশ ছাড়া রামকে এখানে ডেকে আনার হুকুম নেই। মহারাজ আদেশ না করলে, আমি নিরুপায়—

কৈকেয়ী কিছুটা অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে বলল : তা-হলে, আমাকেই যেতে হয়।

দশরথ বার দুই ঢোঁক গিলে তৎক্ষণাৎ বলল : সুমন্ত্র, আমি রামকে দেখতে চাই। তাকে শীঘ্র ডেকে আন এখানে।

কৈকেয়ী হাসল। দারুণ উত্তেজনার ভেতর তার মনে হলো এই লোকটার তার প্রতি একটা প্রবল দুর্বলতা আছে। নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সেটাকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে সে। তাই, জুলুমের অন্ত নেই তার। প্রকারান্তরে দশরথের জন্য তার জেদ অগাধ প্রশ্রয় পেয়েছে। এই মানুষটার জন্য নিজেকেও সে উজাড় করে দিয়েছে। দেবতাকে যেমন উৎসর্গ করে তেমন নিজেকেও নিবেদন করেছে সে। কিণ্ড তার আত্মনিবেদন স্বার্থে কলুষিত নয়। দশরথের স্বার্থপরতা তার প্রেমকে অপমান করেছে। দশরথের অবিশ্বাস, সন্দেহ, শঠতা, প্রবঞ্চনা তার কাছে বেদনাময় হয়ে উঠেছে। তাই তার আঘাত নির্মম এবং কঠিন হল।

রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে সুমন্ত্র খুব দ্রুত বেগে রাজপথ অতিক্রম করে রাজভবনে উপস্থিত হল। রাম দশরথের কাছে গিয়ে দেখল তার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। রামকে দেখামাত্র দশরথের বুক ঠেলে একটা চাপা কান্না বেরিয়ে এল। ঠোঁট টিপে মুখ বিকৃত করে সে প্রাণপণে শব্দহীন কান্নার বেগ সামলাতে লাগল! একটা দারুণ ব্যর্থতা এবং পরাভবের গ্লানিতে তার কষ্ট নিদারুণ হলো। পিতার বিহ্বলতায় রামের বক্ষ বিদীর্ণ হলো। ব্যাকুলভাবে সেও নিঃশ্বাস ফেলছিল। পিতাকে প্রশ্ন করে রাম তার মর্মজ্বালা বৃদ্ধি করল না। অবাক চোখে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দশরথের দিক থেকে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল সে। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে ধরে ব্যাকুল উৎঠায় জিজ্যেস করল : ছোট মা, পিতার কি হয়েছে? অমন করছেন কেন? অজ্ঞানবশে পিতার কাছে কি কোন অপরাধ করেছি আমি? কুমার ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে ভাল আছে তো?

কৈকেয়ীকে নিরুত্তর দেখে রাম পুনরায় প্রশ্ন করল : মাত, তুমি অভিমানবশে পিতাকে কোনো রূঢ় কথা বলেছ? তুমি চুপ করে থাকলে যে, জবাব পাই না। কথা বল। আমাকেই বা এখানে ডাকলে কেন?

রামের কথা শুনে দশরথের বুক কাঁপছিল। কৈকেয়ীকে নিয়ে দশরথের ভয় সব সময়। রাম জানে না, কৈকেয়ী কেন ডেকেছে? সরল মনে রাম তার মনোভাব ব্যক্ত করে যে, মারাত্মক ভুল

করল তা থেকে কৈকেয়ীর চিন্তা ও দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে আনার জন্যে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠল। একবার 'হা-রাম' উচ্চারণ করে মূর্ছা গেল। আর কোন কথা বলতে পারল না। মূর্ছা নয় মূর্ছার ভান করল দশরথ। মহারাজার অবস্থা দেখে রাম চিন্তিত ও বিমর্ষ হলো। আর্ত গলায় বলল : পিতাকে কষ্ট দিয়ে আমি এক মুহূর্ত বাঁচতে ইচ্ছা করি না। আমিই বোধ হয় তাঁর মনোকষ্টের এবং আত্মগ্লানির কারণ। এখানে থাকলে মনোকষ্ট তাঁর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমি বরং এস্থান ত্যাগ করে যাই ছোট মা।

কৈকেয়ীর পাষাণ হৃদয় দশরথের জন্য একটুও বিচলিত হল না। তার মূর্ছা যাওয়া ঘটনার প্রতি কোন আগ্রহ নেই কৈকেয়ীর। অবাক চোখে সে দৃশ্যটা দেখল। বুকের ভেতর তখন তার প্রমত্ত বাতাসের অস্থিরতা। এক পলক তাকাল রামের দিকে। রামের কথা মধ্যে যে গভীরতর ইঙ্গিত ছিল তা সে বুঝল। কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন করল না। তবে, তার কৌতূহলহীন নির্বিকার ভাবটা কেটে গেল। ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাব থেকে কৈকেয়ী যেন জেগে উঠল। অনুচ্চস্বরে রামের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলল : কোথায় যাবে? এত ব্যস্ত কেন? অভিষেকের শুভ লগ্ন এখনও দেরি অনেক। ঝড় ঝাপ্টা তো বাড়ির বড় ছেলেকে সামলাতে হল। প্রবাদ আছে, বড় গাছেই ঝড় বাধে। সবে ঝড়ের সূচনা। মহারাজার আশা ভরসার দীপ ঝড় না বইতেই নিভে যাবে? কৈকেয়ীর মৃদু স্বরে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষের ঝাঁজ।

কৈকেয়ীর বাক্যে রাম মর্মাহত হলো! ধীর স্বরে বলল : আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলছ কেন? তুমি কি আমার ছোট মা? তোমার স্বর শুনে আমি চিনতে পারছি না কেন? তুমি কে? তোমার কণ্ঠে ও কার স্বর?

রামের আতঙ্কিত উদ্বেগে হঠাৎ কৈকেয়ীর মুখ রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে উঠল। রাগলেও সেই রাগ রামের উপর প্রকাশ করল না। কিছুটা সময় নিয়ে সামলে নিল সে পরিস্থিতিটা। একটু ভাবলও। কথাগুলো কিভাবে সাজালে ভাল হয়, ধার ভার দুই বাড়ে—এ সব মনে মনে স্থির করে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল : মহারাজের তোমাকে কিছু বলবার আছে। কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করতে পারছে না তিনি। আর সে জন্যই একটা দুর্বিষহ কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অস্ফুট একটা শব্দ করল রাম। তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: পিতার মনস্তাপ দূর করার জন্যে যা যা করা দরকার আমি করব! তাঁর কষ্ট আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। পিতার জন্যে আমি সব করতে পারি। কোন কিছুতে ক্লেশ বোধ করব না।

কৈকেয়ীর উজ্জ্বল চোখে কৌতুক খেলা করছিল। রাম বড় বড় চোখে চেয়ে কৈকেয়ীকে নিঃশেষ করে দেখল। রাম টের পাচ্ছিল, একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, তার স্বরূপ হয়ত বুঝতে পারছিল। আবার পারছিলও না। আলো আঁধারের সীমারেখায় সে দাঁড়িয়েছিল। তাই ভেবে কূল কিনারা করতে পারছিল না।

লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে দশরথ পাথর হয়ে গিয়েছিল। বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছুক্ষণ তার কোন জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ আত্মসম্বিৎ পেয়ে তীক্ষ্মস্বরে কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করে বলল: মানুষের মনের নোংরামি দেখলে আমার ভারি ঘৃণা হয়। পৃথিবীতে তোমার মতো কুশ্রী মানুষের কোন সমাজ নেই। তবু তোমরা জন্মাও। সুখের সংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দাও।

সকলের সম্মুখে দশরথ কৈকেয়ীকে তিরস্কার করলে তার মুখ লজ্জায় রাঙা হলো। অবাক স্বরে বলল : রাজার পাপেই নগর পোড়ে এ কোন নতুন কথা নয়। তুমিই বহু কিছুর জন্য দায়ী। তোমার লোভ, পক্ষপাতিত্ব, কপট স্নেহ, কূট রাজনীতি, রক্ত সংস্কার, বিভেদ নীতি, এ সব না থাকলে সমস্যার কথা কেউ বুঝতে পারত না। এই পরিবারের ভিতর ভিতরে যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ও অবিশ্বাস জন্মেছে বহুদিন ধরে তা তোমার তৈরি। তুমি এর স্রষ্টা! আজকের এই অবস্থার জন্যে আমার কোন দায়িত্ব নেই। তোমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান, ন্যায়বোধ যে কেমন, তা আমি জানি। তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না।

কৈকেয়ীর কথায় দশরথ চুপ করে রইল। তার বুকের ভেতর ধড়ফড় বাড়তে লাগল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। মুখ চোখ রাগে লাল হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে একটি প্রতিবাদও করল না। খুব শান্ত হয়ে রইল। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং থমথমে।

পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল রাম। সে বুঝতে পারছিল, এতদিন যা জানত সে, তার সব যথার্থ নয়। কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সে গভীর রহস্যের উৎস কোথায়, পরিষ্কার হচ্ছিল না তার। রাম কৈকেয়ীর দিকে তাকাচ্ছিল না। জানলার ধারে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতির মৌন শান্তরূপ দেখছিল। কুয়াশার অন্ধকার ভুতুড়ে ছায়ায় মতো তেড়ে এল চারিদিক থেকে। বাস্তব হারিয়ে গেল এক রহস্যময় কুহেলিকায়। সরযূর বুকে থেকে হু হু করে এক ঝলক বাতাস এসে ঘরে ঢুকল। দূরে এক পাল শেয়াল গলা মিলিয়ে ডেকে উঠল প্রহর জানাতে।

রাম নিজের মনেই চমকে উঠল। অমঙ্গল আশংঙ্কায় তার বুক তোলপাড় করল। বোবা বিস্ময়ে সরল চোখে কৈকেয়ীকে পলকের জন্য দেখল। কৈকেয়ীর দেহে দুকুল ছাপানো যৌবন অটুট এখনও। একদিন ঐ রূপের চুম্বক আকর্ষণে পিতা মজেছিল। আর, তার নগদ দাম আদায় করতে কেকয়রাজ পিতাকে এক অলিখিত শর্তে দায়বদ্ধ করল। এ কথা বশিষ্ঠ তাকে ইংগিত করেছিল মাত্র। কিন্তু সব ঘটনা জানে না। তবে পিতার উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা, ভয়, সংশয় দ্বিধা, অনুশোচনা, আপসোস থেকে অনুমান করতে পেরেছিল যে, অযোধ্যার সিংহাসন ভরতের। কিন্তু সে অধিকার ন্যায়সংগত কিংবা ধর্মসম্মত ছিল না। পিতার নিছক একটা মারাত্মক মোহ, আর তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের একটা বেপরোয়া কৌতুকের ফলশ্রুতি ছিল। সেই বিষফল ভক্ষণের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কক্ষের পরিবেশের ভেতরে ঘটনার বিষণ্ন রেশটুকু সে খুঁজতে থাকল। অগাধ বিস্ময় নিয়ে সে একবার দশরথের দিকে একবার কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। কৈকেয়ী আর জননী নেই। দুই চোখ তার অঙ্গারের মতো ধক্‌ধক্ করছিল। মুখেতে নেই প্রসন্ন ত্যাগের সুখ ও শান্তির প্রশান্তি। ভাষাতেও নেই নিজের ভেতরের মহত্ত্বে জেগে ওঠার বাণী। তার উক্তিতে নগ্ন স্বার্থপরতা আর ধূর্ততা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু আবেগবশত সে তা না বুঝে পিতার কষ্ট লাঘবের জন্য যে কোন ত্যাগ এবং দুঃখ বরণ করতে প্রতিশ্রুত। নির্বোধের মতো তার অভীষ্ট লাভের পথকে প্রশস্ত করে দিল। নিজের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য ভেতরে ভেতরে তার অনুতাপ হচ্ছিল। আর তখনই মনে হলো নিয়তিই হয়তো কৈকেয়ীরূপে তাকে রাজ্যহীন করতে এসেছে। এ তার ভাগ্য। বিশ্বামিত্রও বলেছিল, বনবাস তার অদৃষ্টের লিখন। সীতাও পরম সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলত ঃ এত সুখ কি সইবে স্বামী? সব সময় আমার ভয় করে। ভাগ্যে আমার বনবাস আছে। তুমি থাকলে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু চোখে তার জল এসে যেত। এ কি সেই বনবাসের সংকেত? তার অদৃষ্টের লিখন? এ থেকে কি তার মুক্তি নেই? তবু বিধিলিপির বঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত করার স্বপ্ন সাধ দুইই ছিল তার। বীরভোগ্য বসুন্ধরা। তাই আত্মশক্তি, সাহস পৌরুষত্ব এবং বীর্য দিয়ে প্রতিকূল অবস্থাগুলি সে একে একে জয় করছিল। তারপর পিতা যখন গুরুভার চাপাতে চাইল তখন ভাবল ভাগ্য প্রসন্ন। কিন্তু অবস্থা দেখে রামের মনে হলো নিয়তি কৌতুক করছে তার সঙ্গে। নইলে, নিজের জননী অপেক্ষা ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে যাকে জয় করল সেই ভরত জননী কেন এত পাষণ্ড হলো? কৈকেয়ীর চণ্ডালিনী রূপ সে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

রাম স্থির চিত্রের মত দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা থম থম করছিল। কৈকেয়ী অপলক চেখে রামের দিকে তাকিয়ে সে নিস্তব্ধতা অনুভব করল। দূরে শিয়ালের প্রহর ঘোষণার ডাক এই নিস্তব্ধতাকে আরো গভীর ও বিষণ্ণ করে তুলল।

প্রসঙ্গটা খুব লজ্জাজনক, তাই কৈকেয়ী একটু দ্বিধাগ্রস্ত। ভেতরে ভেতর সে শক্তি সংগ্রহ করার জন্য চুপ করেছিল। এই নীরবতার মধ্য দশরথ গলার স্বর নামিয়ে মিন মিন করে বললঃ ভরত জননী, আমাদের দাম্পত্য কলহের মধ্যে রামের কোন স্থান থাকার কথা নয়। ওকে যেতে দাও। স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে অনেক কিছুই হয়, সবটা পুত্রদের কানে না যাওয়াই ভাল।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ার মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল কৈকেয়ী। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললঃ হ্যাঁ, পুত্রদের নিয়ে যখন কথা, তখন অবশ্যই থাকতে হবে তাদের। অপ্রিয় হলেও রাম জানুক, অযোধ্যার সিংহাসন তার নয়, ভরত এ রাজ্যের রাজা। তার দীনতম প্রজা হওয়ারও অধিকার নেই রাম লক্ষ্মণের।

ভরতকে তারা শত্রুর চোখে দেখে। ভায়ে ভায়ে শত্রুতার পরিণাম ভয়ংকর। সুতরাং রাম লক্ষ্মণের বনে যাওয়াই ভাল। মহারাজ নিজের মুখে সেকথা বলতে আত্মগ্লানি অনুভব করছেন। এই মুহূর্তে বল্কল পরে পিতার আদেশ মত বনে গমন কর। বৎস রাম, এই পুরী না ছাড়া পর্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার, পান কিছু করছে না।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হল সেখানে। দশরথ আর্তস্বরে ককিয়ে উঠল। দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললঃ উঃ কি ভীষণ নিষ্ঠুর। কি মর্মান্তিক বাক্য। হৃদয় আমার বিদীর্ণ হচ্ছে। বক্ষ জ্বলে যাচ্ছে। উঃ বড় কষ্ট। ধিক্ ধিক্। রামচন্দ্র পালাও—পালাও। এ মানুষের আবাসস্থল নয়, রাক্ষুসীর বাসস্থান। আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, অসহায় পিতা তোর। সাধ্য নেই রাক্ষুসীর মুঠি থেকে মুক্ত করব আমাকে অভিশাপ দিয়ে তোরা চলে যা। মতলব বাজ লোভী পিতাকে তোরা ঘৃণা কর। অবজ্ঞা কর। আত্মধিক্কার আর ঘৃণায় পাগলের মতো আচরণ করতে লাগল দশরথ। পুঞ্জীভূত অনুতাপে, আত্মানুশোচনায় মাথায় করাঘাত করতে লাগল। আমি কী করেছি। উঃ, এ আমি কি করলাম। ঈশ্বর, কোন্ পাপে আমার এই সর্বনাশ হলো?

রাম নির্বাক পাথরের মূর্তি। দেহে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই, সমস্ত মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই। মুখেতে কঠিন রেখা পড়েছিল তার। অনুভূতিশূন্য মূর্তির মতো তাকিয়েছিল রাম। সে কিছু ভাবছিল না। শুধু দাঁড়িয়েছিল। তার নির্বাক ক্ষমাহীন দুই চোখে মরুভূমির জ্বালা। শূন্য দৃষ্টি ধূ ধূ করছিল। আর বুকের ভেতর মনে হচ্ছিল হাড় পাঁজরগুলো ধরে ধরে যেন ভাঙছে কেউ।

রামের এমন পাথর মূর্তি আগে কেউ দেখিনি। কিন্তু রামের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে শুধু চেয়ে আছে কৈকেয়ীর দিকে। কয়লার টুকরোর মতো জ্বলছিল তার দুই চোখ।

কৈকেয়ী রামের দিকে তাকিয়ে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। থেকে থেকে তার মনে হতে লাগল রাম নিঃশব্দে অভিযোগ জানাচ্ছে তার প্রতি। তাকেই সে যেন দায়ী করছে। রাম এরকম একটা ভাবছে মনে হতেই সে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। নিজেকে তার ভীষণ একা এবং অসহায় মনে হল। দুঃসহ একাকীত্ব থেকে উত্তরণের পথ খোঁজবার জন্য বললঃ মহামাত্য সুমন্ত্র, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রামের জন্য আপনি অত্যন্ত কাতর হয়েছেন। কিন্তু আপনার এই ভাবালুতা শোভা পায় না। দ্রুতগামী অশ্বে ভরতকে মাতুলালয় থেকে আনতে এখনি দূত পাঠানোর সব আয়োজন করুন। রামের স্থলে ভরতকে অভিষিক্ত করে মহারাজের সত্যরক্ষা করুন।

কৈকেয়ীর বাক্যে রাম সম্বিৎ পেল। বুকের অতলান্ত থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস নামল। বুকের ভেতরটা তার মোচড় দিল। মনে মনে অবিরাম একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজল রাম। কেন? কেন, কৈকেয়ীর এই বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে তার এ ক্ষোভ? এর মূল কোথায়? বুকের ভেতরে এসব কোনদিন লুকানো ছিল না তার ছোটমার। থাকলে সে তার আভাস পেত। রাম ভাল করে জানে ছোটমা কোন কথা লুকোতে জানে না। তাহলে, এসব কে বলল তাকে? রাম তার নিজস্ব প্রজ্ঞাবলে বুঝল, রাজঅন্তঃপুরের খুব গভীর ষড়যন্ত্রের শিকড় ছড়ানো নইলে, পিতাকে এমন করে দাঁড়িয়ে অপমান করার মানুষ নয় কৈকেয়ী।

কৈকেয়ী বক্তব্যের পর আরো কয়েকটা মুহূর্তে কাটল। রাম বিভ্রান্তের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার চুল এলোমেলো বাতাস এসে লাগল। ঊর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে কি যেন ভাবল। একটা আবেগ তার ভাবনার ভেতর গলায় উঠে এল। বলল : জননী রাগ কর না। এই কেলেঙ্কারিটা না করে ভরতের অভিষেকের কথাটা আমাকে বললে না কেন? পিতার আজ্ঞায় কেন, তোমার আজ্ঞাতেই ভরতকে আমি নিঃসঙ্কোচে সিংহাসন, রাজ্য, ঐশ্বর্য সব দিতে পারি। এমন কি নিজের এই তুচ্ছ প্রাণটা পর্যন্ত। শুধু একবার আদেশ করে দেখলে না কেন?

কৈকেয়ীর ওষ্ঠে আচমকা তড়িৎপ্রবাহের মতো একটা হাসি খেলে গেল। মনের সমস্ত জোর দিয়ে সে উচ্চারণ করলঃ চমৎকার অভিনয় জানো রামচন্দ্র। তোমার ভরত প্রেম কোথায়? তাদের বাদ দিয়ে তো চুপি চুপি নিজের অভিষেক সেরে ফেলছিলে। এখন ধরা পড়ে মহত্ত্বের অভিনয় করছ। সুন্দর তোমার অভিনয় জ্ঞান। আমার পুত্রদের প্রতি যার এত উপেক্ষা, এত উদাসীনতা তার কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন

মর্মান্তিক দুঃখের এবং যন্ত্রণার। নিজপুত্রের এই অপমান, অবহেলা চোখে দেখতে না পেরে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। এই পরিবারে এবং রাজ্যে আমার পুত্রদের যে একটা স্থান আছে, তুমি বা তোমার পিতা কখনও মনে কর না। আমি শুধু তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আবেদন করেছি। প্রতিশোধ কিংবা প্রতিহিংসা বশে কিছু করিনি। মনেতেও সে অশুভ চিন্তা স্থান দিইনি। দাবির ধাক্কায় পরিবারের বহুকালের নিয়মটা ভেঙে গেল। তোমার পিতার কপটতার মুখোশ খুলে গেল। এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানটির ছত্রচ্ছায়ায় যে নব কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রাচীনপন্থা, প্রগতিবিরোধী, সংকীর্ণমনা মতলববাজ বাস্তু ঘুঘু আছে তাদের বাসস্থানটি ভেঙে অযোধ্যাকে মুক্ত করেছি। তার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছি। এ রাজ্যে শুধু আর্যর নয়, মিলিত আর্য-অনার্য রক্তধারায় গঠিত এক অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর দেশ। এ-দেশ শাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারিত্ব ভরতের পাওয়ার কথা। দেরিতে হলেও মহারাজ সেই দায়িত্ব ভরতকে দিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

কৈকেয়ীর বাক্য রামচন্দ্রকে পুনরায় নীরব করে দিল। কিন্তু লক্ষ্মণের গলায় বাজ ডাকল। এইভাবে গোটা পরিবারের সম্মান বিপন্ন করে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের কোন অধিকার তোমার নেই।

কৈকেয়ীর অবিচলিত স্বরে দৃঢ়তা। কেন লক্ষ্মণ, বাঁচার অধিকার সকলের আছে। আমি তা বাঁচার অধিকারে নিরুপায় হয়ে তোমার পিতাকে সত্যভ্রষ্ট হতে দিইনি। অধর্ম থেকে তাকে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছি। এতে আমার কোন অন্যায় হয়নি। পুত্রের দাবি প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করা মাতার তো কোন গর্হিত কর্ম নয়। নিত্য পরিবর্তনশীল রাজধর্মে রাজাও স্থায়ী নয়। যে কেউ হতে পারে। সব সময় বংশধারা প্রথা মেনে চলতে হবে তার কি মানে আছে? মহারাজ যযাতি তো কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনের যোগ্য মনে করে ছিলেন। তোমার পিতা যদি মত বদল করেন, তা হলে কোথায়? ভরতের যোগ্যতা রামের চেয়ে কোন অংশে কম?

কিন্তু অগ্রজের জন্যে তোমার একটুও মায়া হলো না।

এই মায়া দেখানোর চেয়ে জননীর কাছে তার নিজ সন্তানের দাবি অনেক বড়। তার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব জননী কৈকেয়ীকে কর্তব্য সচেতন করেছে। তাই বারংবার মনে হয়েছিল রামের উপর মায়া দেখাতে গেলে মহারাজের ধর্ম রক্ষা হয় না, ভরত তার ন্যায্য অধিকার হারায়। রাজনীতিতে মায়া, স্নেহ, ধর্ম বলে কিছু নেই।

লক্ষ্মণ কি জবাব দেবে? কৈকেয়ীর কথার মধ্যে যে গভীরতার ইঙ্গিত ছিল তা বুঝে সে নিরুত্তর হলো।

অতঃপর রাম জননী কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য পরিজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, প্রভূত ধনরত্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সেবক, বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ এবং বন্ধুদের বিতরণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে মহারাজ দশরথের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করল।

লোকমুখে রামের আকস্মিক অযোধ্যা পরিত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক রামের প্রাসাদের সামনে ভিড় করল। জনতা ভেদ করে পদব্রজে দশরথের প্রাসাদে যাওয়া রামের কঠিন হল। সেনাধ্যক্ষরা বিমর্ষ বিষণ্ণ জনতাকে ঠেলে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতার পথ করে দিতে লাগল।

রাম রাজপুরীতে পৌঁছলে সুমন্ত্র তাকে নিয়ে দশরথের কক্ষের দিকে গেল। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে। অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করে, লম্বা লম্বা বারান্দা পার হয়ে দশরথের কক্ষে এল। কক্ষের অভ্যন্তরে দশরথের কণ্ঠস্বর পেয়ে থমকে দাঁড়াল। বিষণ্ণ গলায় দশরথ কৈকেয়ীকে বলছিল, কোনদিন তুমি আমার কোন অসুবিধা বুঝলে না। কোনটা ভালবাসি আর বাসি না সেটা জেনেও অপছন্দের কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও। এই যে কাজটা করলে, এতে তোমার গৌরব বাড়ল কি? তুমিও ছোট হলে, আমারও মাথা হেঁট করলে। বাইরে থেকে যে অতিথিরা এসেছেন তাঁরা বা কি ভাবলেন বল? তাঁদের কী বলে ফেরাব? কোন মুখে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব? ইক্ষ্বাকুবংশের সব গৌরব, খ্যাতি আমার হাতে ধূলিসাৎ হলো। দুঃখ রাখার জায়গা আমার নেই। তুমি একী করলে? একবার তোমার শ্বশুরকুলের কথা ভাবলে না? যে মাটি থেকে রস শোষণ করছ সেই মাটির রস শুকিয়ে

গেলে কি করে বাঁচবে? এখনও সময় আছে, এ হঠকারিতা কর না। তোমার সব অভিযোগ আমি মেনে নিয়েছি; তুমিও রামকে নির্বাসনের দন্ড দিয়েছ। রাম তা মেনে নিয়েছে। সত্যধর্মের মুখ রক্ষা হয়েছে। ব্যস্, এখানেই সব চুকে বুকে যাক, এবার সব ক্ষমা করে রামকে সিংহাসন অভিষেক কর, তা হলেই সব কুল রক্ষা পায়। তুমি নিজের হাতে তাকে রাজবশে পরিয়ে ললাটে রক্ত তিলক এঁকে সিংহাসনে অভিষেক কর। চতুর্দিকে তোমার জয়জয়কার পড়ে যাবে। অযোধ্যার সম্মান বাড়বে, তোমার গৌরব এবং যশ অমলিন থাকবে। তুমি শুধু প্রসন্ন হও রানী। তোমার করুণার সাগর থেকে রাম যদি একমুঠো ফেনা নিয়ে যায় তা হলে সাগর কি রিক্ত হবে?

কৈকেয়ীর মুখে কিছু কোমলতা ফুটল। যেমন শিশুর প্রগলভতা দেখে মায়ের মুখে কৌতুক সঞ্চার হয় অনেকটা সেরকম। তাতে অপরূপ হয়ে গেল কৈকেয়ীর মুখ। শুধু চেয়ে থাকল দশরথের চোখের দিকে। কক্ষ নীরব। নিঃশ্বাস পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়।

এই অবকাশে সুমন্ত্র ঢুকল। রাজপুরীতে সুমন্ত্রর ছিল অবাধগতি। সব কক্ষেই তার যাওয়া আসা অবারিত। তাই, নির্বিকারভাবেই সে কক্ষের ভিতর পা রাখল। কৈকেয়ীকে দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না। ত্রস্তভাবে বললঃ মহারাজ রাজকুমার রামচন্দ্র আপনার দর্শনপ্রার্থী। দ্বারের বাহিরে লক্ষ্মণ ও সীতাসহ তিনি অপেক্ষারত। অনুমতি করলে এখানে তাঁদের আনতে পারি।

অকস্মাৎ উচ্চকিত রক্তের চাপে দশরথের চোখ মুখ রাঙা হয়ে গেল। দুরন্ত আবেগে ও উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। বুকের ভেতর একটা অস্থিরতা। চকিতে শয্যার উপর উঠে বসল। কৈকেয়ীর দিকে রক্ত নয়নে তাকিয়ে বললঃ এ তুমি কী করলে রানী? আমার বুকের পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। তাকে বনবাসে পাঠিয়ে আমি কেমন করে বাঁচব? আমার ইহ বল অর ইষ্ট বল—সব রামচন্দ্র। তাকে ত্যাগ করলে আমার আর কী রইল? তুমি শুধু একবার আমাকে করুণা কর আমাকে ক্ষমা কর। একজন পিতার কাছে রাজধর্ম, সত্যধর্মের চেয়ে পিতৃধর্ম বড়। আমাকে সে ধর্মভ্রষ্ট করে অপরাধী কর না, তুমি দয়া কর কৈকেয়ী। আমি পিতা।

কৈকেয়ী প্রস্তর মূর্তিবৎ আচ্ছন্ন। তার অটল ইচ্ছের উপর খিল তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন। বন্ধ দরজার ওধারে যেন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কোন চাঞ্চল্য নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। কৈকেয়ী যেন দশরথকে দেখতে পাচ্ছে না, তার স্বর শুনতে পাচ্ছে না। দশরথও তার অশক্ত দেহটা নিয়ে বন্ধ দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার খিল ভাঙতেও পারছে না। মাথা কুটেও সাড়া পাচ্ছে না যেন। নিদারুণ অসহায়তা বোধে মুষড়ে পড়ে সে কৈকেয়ীর ইচ্ছের দরজার উপর মাথা রেখে মৃদু গলায় মিনতি করতে লাগল।

দশরথের আকুল আকুতির সুস্পষ্ট কোন উত্তর কৈকেয়ীর জানা ছিল না। তার নির্বিকার ভাবলেশহীন মূর্তির কঠোরতার দিকে তাকিয়ে দশরথ চমকে উঠল। বুকের ভেতর থেকে একটা শ্রান্ত নিঃশ্বাসের ভার নামল। দশরথকে অবসন্ন ও বিমর্ষ দেখাল। দুই চোখে তার কী করুণ অসহায়তা, কী গভীর মায়ায় ছলছল। অথচ তার কিছু করার নেই। নিদারুণ অসহায়তাবোধে ছটফটিয়ে উঠল বুকের ভেতর। কৈকেয়ীর নিথর নীরবতায় তার কান্না পেল। চোখ ভেঙে নামল অশ্রুর বন্যা। ভেজা গলায় দশরথ সুমন্ত্রকে বললঃ সুমন্ত্র, ক্রোধের বশে বৃশ্চিক বিষপুচ্ছ শিরে হেনে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। তেমনি আমার ভুলেই আমার সর্বনাশ হচ্ছে। এই মনস্তাপে কষ্ট পাচ্ছি। বুকে আমার হলাহলের জ্বালা। ছোট রানীর কাছে আমার সব আবেদন, মিনতি নিষ্ফল। এখন একমাত্র ভরসা তুমি। রামকে ফেরাও। তার বনবাস বন্ধ কর। তাকে এখানে আন। সে আমার দেহজ, আত্মজ। আমার অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। তার ক্ষমা কিংবা করুণা না পেলে আমার হৃদয় জ্বালা জুড়োবে না। তুমি তাকে শীঘ্র ডাক এখানে।

দশরথ থরথর করে কাঁপছিল। পালঙ্কের বাজুতে পিঠ রেখে সে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ। চোখের পাতায় একটা হাল্কা নীল রঙের ছোপ পড়েছে। ঠোঁট শুকনো, মুখ সাদা। নরম বিছানায় আধশোয়া ডুবন্ত শরীরটা স্খলিত, শীর্ণ শান্ত, স্থির। ফর্সা সুন্দর দেহটার কি দশা হয়েছে।

দৃশ্যটা দেখে। রামচন্দ্র শিউরে উঠল। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। মুহূর্তে ঘোর কেটে গেল। রামচন্দ্র দৃষ্টি সরাতে পারছিল না। কৈকেয়ীও নির্নিমেষ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। রামচন্দ্রের

মনে হলো কৈকেয়ী তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। তাই বাক্‌শক্তি লুপ্ত হচ্ছে। ইচ্ছে সত্ত্বেও কথা বলতে পারছে না কেন? জিহ্বা আড়ষ্ট, ঠোঁট শুকনো কেন?

রাম শয্যার খুব কাছে সরে এল। অসহায়, বিকারগ্রস্তের মতো ডাকলঃ পিতা!

দশরথ চোখ খুলল। অবসন্ন শরীরটা বিছানার উপর নড়ে উঠল। রামের দিকে তাকালে কী! দু'চোখ তার জলে ঝাপ্সা হয়ে গেল। রামের দিকে দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্খলিত ভেজা স্বরে বললঃ আয়, বাবা, কাছে আয়। বুক আমার খাঁ-খাঁ করছে। মরুভূমির মতো শূন্য এই বুকে তোরা আমার মরুদ্যান। তোদের ছেড়ে আমি থাকব কী নিয়ে? কার উপর অভিমান করছিস বাবা? আমি তোর বৃদ্ধ অক্ষম অসহায় পিতা। আমাকে কাঁদিয়ে কোথায় যাবি? তোকে ছেড়ে থাকব কেমন করে?

রামের মুখ বিবর্ণ হলো। পিতার ব্যাকুলতায় তার ছিল না। তবে, বুকে তার এক প্রগাঢ় যন্ত্রণার থাবা গেড়ে বসেছিল। কোন ব্যথা বেদনা কিংবা জ্বালা তার এক প্রগাঢ় দুঃসহভারে হৃৎপিন্ডটা যেন ঝুলে পড়ছিল। এক মর্মবিদারী কষ্টে তার শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হলো। আসন্ন বিচ্ছেদের একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছিল কক্ষে। রাম একটা দূরত্ব রচনা করার জন্য যথাসম্ভব নিজের হৃদয়াবেগকে সংযত করল। গম্ভীর মুখে চেয়ে রইল দশরথের দিকে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল। সহসা স্বরভঙ্গ ঘটল তার। ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বললঃ পিতা সময় বয়ে যাচ্ছে, আমাকে বিদায় দাও। আশীর্বাদ কর বনবাসান্তে তোমার কাছে আবার ফিরে আসতে পারি।

দশরথের কণ্ঠ থেকে এক অদ্ভুত আর্তস্বর নির্গত হলো। একমাত্র পরিজনহীনতার চরম বিচ্ছেদের কষ্টে হাহাকার করে ওঠা বুকের শূন্যতা থেকে অমন স্বর শুধু বেরোয়। শিশুর মতো অসহায় সে কান্না।

এরকম শূন্য অসহায় বিষণ্ণ কান্নার শব্দ রাম আগে শোনেনি। তার পায়ের নিচে মৃদু একটা ভূকম্পন টের পাচ্ছিল। অপ্রতিরোধ্য হৃদয়বেগ হতে উৎসারিত স্বরে এক প্রবল সম্মোহন ডাকঃ পিতা!

সরু স্বরে কেঁদে উঠল দশরথঃ রাম। কত আদরের তুই আমার—

পিতা, ধর্ম সবার বড়। আমাকে রাজ্যত্যাগের অনুমতি দাও—

পুত্র, শৈশব গেছে, যৌবন গেছে এখন এল বার্ধক্য। এই বার্ধক্যে তোমার বিচ্ছেদ আমি সইতে পারব না। আমি অশ্বপতিকে মোহগ্রস্ত হয়ে শপথ করেছি। তাতে শুধু কৌতুক ছিল। সত্য ছিল না। তাকে লঙ্ঘন করলে ধর্মের অমর্যাদা হয় না। ধর্ম কি খেলার বস্তু?

সুমন্ত্র বিষণ্ণ মুখে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়েছিল। অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ তার মনের ভেতর তোলপাড় করছিল। দশরথের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল। একটা বড় শ্বাস পড়ল। জড়তা বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। বলল : ঠিক কথা ; রাজ্য কারো খেলার সম্পদ নয়। যাকে খুশি তাকে দান করতে পারে না রাজা। রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করতে হলে রাজাকেও তার মন্ত্রণা পরিষদের অনুমতি নিতে হয়। রাজ্য বহু স্বার্থের মিলিত এক মঞ্চ। রাজার অধিকার নেই, নিজের মর্জিতে যা খুশি করার।

কৈকেয়ী তার নীরব স্তব্ধ গাম্ভীর্য থেকে জেগে উঠল যেন। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। সুমন্ত্র দিকে চোখ টান টান করে বলল : আমাত্য প্রধান সুমন্ত্র, রাজনীতি শাস্ত্রে আপনার জ্ঞানের দীনতা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে আমিও অনভিজ্ঞ নই। রাজতন্ত্রে রাজা একেশ্বর। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের কাজের জন্য কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না তাঁর, কিংবা কোন কৈফিয়ত দিতেও বাধ্য নন তিনি। রাজতন্ত্রের রাজাই সব। তার মুখের কথাতে ওলোট পালোট হয়। মহারাজ হরিশচন্দ্র নিজের প্রতিশ্রুতির মর্যাদায় বিশ্বামিত্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে ভিখারি হলো কার অনুমতি নিয়ে? বামনের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে বলিরাজ কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নির্বাসন মেনে নিল; তথাপি তার আমাত্যদের কেউ প্রশ্ন করল না ;এ ছলনা, ও প্রতারণা মানতে বাধ্য নয় রাজা। রাজার কার্যের প্রতিবাদ করার অর্থ হলো আনুগত্যহীনতা। এ বেয়াদবী কোন বীর্যবান তেজস্বী রাজা সহ্য করে না। নির্বীর্য অযোধ্যা নরপতিরই সে সহিষ্ণুতা আছে কেবল।

কৈকেয়ীর নগ্ন আক্রমণাত্মক জবাব সুমন্ত্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে আর কোন কথা বলতে পারল না। প্রগাঢ় বোবা যন্ত্রণার তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে বিরক্তি, ঘৃণা ফুটে উঠল। কৈকেয়ীর কথাগুলো ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো লক্ষ্মণকে নাড়া দিল। তার সর্বশরীর আলোড়িত হলো। উত্তেজনায় কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল

তার। চাপা গর্জন করে বললঃ ছিঃ। ছিঃ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না হয়। তুমি মা ডাকের অযোগ্য। নির্বোধ, অহংকারী, ক্ষমতালোভী। স্নেহ, দয়া, মায়া, করুণা, প্রেম তোমার শরীরের নেই। তোমার নিঃশ্বাসে দেহের রক্ত শুকিয়ে যায়। চোখের আগুনে রাজ্য পুড়ে যায়। তুমি ডাইনী হয়েছ। ডাইনীর বাঁচার কোন অধিকার নেই। ডাইনীর পাপে রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল হয়। তোমাকে তীক্ষ্ণ শরে বধ করে আমি অযোধ্যার কলুষ দূর করব। যারা ভরতের পক্ষে আছে তাদের সকলকে বধ করব। যা ন্যায়ত রামের প্রাপ্য তার উপর অন্যের অধিকার আমার জীবন থাকতে হতে দেব না।

লক্ষ্মণের মুখচোখ লাল হলো। সর্বশরীরে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। ধনুঃশর হাতে করে সে কাঁপছিল। অনলবর্ষী তার দু চোখের দিকে তাকিয়ে কৈকেয়ী নির্বিকারভাবে গম্ভীর স্বরে বললঃ পুত্র তীর, ধনু দিয়ে সব কিছু ফয়সালা হয় না। সত্য কখনও চাপা থাকে না। বৃথা আস্ফালন না করে রামকে প্রশ্ন কর—এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী কে?

লক্ষ্মণের কাঁধের উপর রামের হাত। মৃদুস্বরের ভৎর্সনা করে বলল : ছিঃ। জননীকে হত্যা করতে তোমার হাত উঠল?

লক্ষ্মণ সক্রোধ বলল : জামদগ্নমুনির আজ্ঞায় পুত্র পরশুরাম মাতা রেণুকার শিরচ্ছেদ করেছিল। আমিও জ্যেষ্ঠের সম্মানে বিমাতাকে যদি হত্যা করি অপরাধ কোথায়? শাস্ত্র বলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য।

রাম লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তিতে বিমোহিত হয়ে মৃদুস্বরে ভৎর্সনা করে বলল : ছিঃ লক্ষ্মণ। গুরুজনকে কটুবাক্যে অসম্মান করা তোমার মতো বীরের শোভা পায় না। আমার প্রতি তোমার গভীর স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আছে জানি। কিন্তু সে ভালবাসা অন্যকে অসম্মান করে কখনও নয়। পিতা একবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করতে পারেন না। আমাদের বংশেই মহারাজ সগরের আদেশে তাঁর পুত্রেরা ভূমি খনন করতে গিয়ে প্রাণ হারাল, তবু পিতৃ আজ্ঞা কোন অজুহাতে কেউ লঙ্ঘন করেনি। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমন্তপঃ—একথা ভুলে গেলে? আমার দুর্ভাগ্য অদৃষ্টের লিখন। ছোট মা, শুধু উপলক্ষ। দৈবের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে?

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সিংহের মতো গর্জন করে উঠল। বললঃ পুরুষ তার পুরুষকার দিয়ে দৈবের চক্রান্ত ব্যর্থ করে। দৈব নিবীর্যের সান্ত্বনার মন্ত্র, দুর্বলের আত্মরক্ষার ধর্ম। কিন্তু বীর কখনও দৈব বিড়ম্বনার অবসন্ন হয় না।

রামের অধরে বিচিত্র হাসি। চাহনিতে মুগ্ধ বিহ্বলতা। পৌরুষ মানে দম্ভ নয়, বলাবাহুল্য নয়, বলপ্রকাশের শক্তিও নয় ;অন্তর্নিহিত এক অব্যক্ত শক্তির আশ্চর্য তেজ—সাহস দৃঢ়তা, বিক্রম, প্রভৃতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এক অদ্ভুত সমন্বয়। হীরকের দ্যুতিই পুরুষের পৌরুষ। দৈবও তদ্রূপ। তাকে চোখে দেখা যায় না। কর্মফল ছাড়া তাকে নিরূপণ করা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, তার সঙ্গে যুদ্ধ করব কি দিয়ে?

রামের বাক্য মুগ্ধ করল কৈকেয়ীকে। নিজের নিষ্ঠুরতায় সেও ক্লান্ত নিজেকে তার ভীষণ একা লাগছিল। তথাপি, নিজের অসম্মান, অমর্যাদার বেদনা ভুলতে পারছিল না। আবার, রামকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভরত যে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেও সহ্য হচ্ছিল না তার। রামের অবিশ্বাস, সন্দেহ, কপটতা, দশরথের প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, ক্রূরতা যতক্ষণ মনে থাকবে ততক্ষণ তার সঙ্গে মনের লড়াই শেষ হবে না;এটা বেশ বুঝতে পারছিল কৈকেয়ী। লড়াইটা তার নিজের সঙ্গে বহু কিছুর। অনুভূতিশীল মনের মধ্যে এইরকম একটা ভাবাবেগ ক্রিয়া করছিল। চোখে একটু বিস্ময় বোধও ফুটেছিল।

আকস্মিক ঘটনার গভীরতা চিন্তার জগতে আলোড়ন জাগাল। নিজেকে তার এক অদৃশ্য বন্ধনের ক্রীড়নকে মনে হলো। কারণ, যে ঘটনায় তার নিজের কোন কার্যকরী হাত নেই, অথচ তারই দায়িত্ব এসে কাঁধে ভর করল, প্রতিটি আকস্মিক ঘটনার মধ্যে একটা রহস্য ছিল যা তার জ্ঞান হওয়ার মুহূর্ত থেকেই দেখতে পায়। একদিন যে নারী তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন—শ্রদ্ধাপূর্ণ, স্নেহস্নিগ্ধ হঠাৎ তার আচরণ এমন বিপরীত হল কেন? কৈকেয়ী তো এত অনুভূতিহীন নয়। তাহলে? একটা বিদ্বেষ অনিবার্যভাবেই তার মনে গ্লানির সৃষ্টি করল। তাই, কথা বলতে বলতে থেমে গেল। ভীষণ যন্ত্রণাকর মনে হলো নিজের অবস্থা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। ঐ সময়টুকু ধরে কক্ষে নিথর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। লক্ষ্মণের ভ্রূকুটি তীব্র চোখের দিকে তাকিয়ে রাম অসহায়ভাবে বলল ঃ পিতা, পিতৃসত্য রক্ষা এবং বিমাতার নির্দেশ পালন করতে লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যহারে আমি বনে যাচ্ছি। আপনারা উভয়ে আমাকে অনুমতি করুন। বনবাস অন্তে আবার পুনর্মিলিত হই এই আশীর্বাদ করুন।

দশরথের বক্ষপিঞ্জর বিদীর্ণ হলো। একটা দম আটকানো কষ্টে বুকটা খামচে ধরল। হু-হু করে প্রবল কান্না বুকের তল থেকে ঠেলে উপরের দিকে উঠে এল যেন। দশরথের মুখ অশ্রুতে মাখামাখি হলো। মস্তকে করাঘাত করে বললঃ হায় পুত্র, আমার কর্মফলের জন্য তোমার এই নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে। আমি মোহগ্রস্ত হয়ে কি বলতে কি বলেছি, জানি না। কিন্তু সে আমার প্রাণের কথা নয়। এক নিষ্ঠুর মিথ্যে। তবু সেই কথাই সত্য হবে? অপ্রকৃতিস্থ মাতালের সঙ্গে কামপরবশ পুরুষের কোন প্রভেদ নেই। উভয়ের শপথ সমান অগ্রাহ্য। তা-হলে তুমি অকারণ বনে গমন করবে কেন?

রাম দশরথের যুক্তি শুনে নতুনতর অস্বস্তিবোধ করল। সিংহাসন নিয়ে এই দ্বন্দ্বে জমে উঠবার আগে পর্যন্ত একটা সুন্দর কোমল অনুভূতির স্নিগ্ধ আবেশ তাকে মুর্হূমুহু চমকে দিচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানের বাস্তব অবস্থা তাকে এক চরম সংকটের মুখোমুখি করল। সিংহাসনের ব্যাপার নিয়ে প্রতিটি কথাই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর সংবাদের মতো। যা তার অপরাধকে কৈকেয়ীর কাছে কেবল বাড়িয়ে তুলছিল। কৈকেয়ীর চোখে সে লোভী, স্বার্থপর আদর্শহীন এক শঠ প্রতারক হয়ে উঠছে এটা আন্দাজ করতে পারছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করে চুপ করানো ছিল আরো শক্ত। কারণ কোন যুক্তি, কৈফিয়ত তারা শুনতে চায় না। রামচন্দ্র সে চেষ্টা করল না। অপ্রস্তুত হাসিতে তার অপরাধবোধের ছায়া পড়ল। বিষণ্ণ স্বরে বললঃ পিতা, স্নেহবশে সত্যভ্রষ্ট হয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমিও তা পারব না করতে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যের জন্য প্রিয়তমা পত্নী ও একমাত্র প্রিয়তম পুত্র-রোহিতাশ্বকে ত্যাগ করেছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ। আপনার ব্যাকুলতা শোভা পায় না। আমাকে অনুগ্রহ করে হাসিমুখে বিদায় দিন।

অমন কথা মুখে উচ্চারণ করা পাপ। এরাজ্যের এখনও পর্যন্ত আমি রাজা। তুমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভুজবলে অযোধ্যা জয় করে তুমি বন্দী কর আমায়। তারপর এরাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ কর। সিংহাসন তোমার হোক। আমিও সত্যভ্রষ্ট হব না।

দশরথের যুক্তিতে রাম বিব্রত বোধ করল। অসহায়ভাবে বলল : পিতা প্রলোভনে আমাকে বন্দী কর না। সিংহাসনে আমার মোহ নেই। অরণ্য আমাকে ডাকছে। আমাকে বিদায় দাও।

দশরথের হৃৎস্পন্দনের তালে বেজে উঠল রামের কথাগুলো। অরণ্য আমায় ডাকছে। অবাক জিজ্ঞাসু চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। রুদ্ধশ্বাসে বললঃ কৈকেয়ী শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি বধির? একথা শোনার পরও তোমার হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না? রামকে ফেরাও। অভিমানী পুত্র আমার তার ছোট মা'র উপর অভিমান নিয়ে চলে যাচ্ছে, এদৃশ্য তুমি দেখতে পাচ্ছ? একবার ওকে নিষেধ কর। বল, ফিরে আয় আমার নয়নমণি।

দশরথের আকুল আবেদন কৈকেয়ীর বুকে সঞ্চারিত হলো। কিন্তু তা আপাতত আড়াল করে নারীর নিজস্ব অহংকার ও আত্মভিমান জেগে উঠল। মনের নেপথ্য যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল যার খবর নিজেও জানত না সেই আগুন মূর্ত হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। নির্বিকার মুখে চতুর হাসির ধার। বলল : তোমরা সকলে রামকে সিংহাসন বসাতে ব্যস্ত। ফেরানোর জন্য কত টানাটানি করছ, তবু সে ফিরছে না। আর আমার কথায় সে রাজি হবে, এরকম ধারণাটা হলো কেন? রাম তো কারো কৃপা চায় না। তবে, কৃপা দেখিয়ে তাকে অপমান করব কেন? আমাকে অসম্মান করার সুযোগ রামকে দেব কেন? তার যেমন আত্মসম্মানবোধ আছে, আমারও আছে। আমি জননীর সম্মান চাই, বিশ্বাস চাই ভালবাসা চাই। কিন্তু যেখানে বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই, ভালোবাসা নেই সেখানে কিসের দাবিতে দাবি করব। রাম ও আমার মধ্যে বিশ্বাসের যে সেতু ছিল তা ভেঙে গেছে। আমরা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছি দুই পাড়ে। রামের মনে আমার কোন আশ্রয় নেই। প্রাসাদের চৌহদ্দির বাইরে দিনযাপনে সে ব্যগ্র। রাজধানীতে থাকার আগ্রহ তার কমেছে। আত্মসম্মানের প্রশ্ন তার কাছেও বড় হয়ে উঠেছে। তাই বোধ হয় সাহস করে, আমার কাছে তার দোষ কবুল করতে

পারল না। জোর করে আমার স্নেহের সিংহদ্বারে আঘাতে হেনে তার দাবির কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না। কেন পারল না? তোমার সবাই চাইছ রামকে। কিন্তু কারো কথা সে শুনছে না, শুনবেও না। তার হৃদয়ে আমাদের জন্য সে ভালবাসা কোথায়? পিতার প্রতি তার কর্তব্য, মায়ের ওপর তার বিশ্বাস কোথায়? থাকলে করত। অরণ্য তাকে ডাকছে। তাই, তোমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওকে ফেরার কথা বলতে পারছি না। আমার কাছে ওটা তত বড় মনে হচ্ছে না।

চুপ কর। ধমকে উঠল দশরথ।

দশরথের কথা শুনে কৈকেয়ীর মনে প্রতিশোধ আগুন জ্বলে উঠল। তিক্ত কণ্ঠে বললঃ রাজা, বনবাস রামের অদৃষ্টের লিখন। পুত্র বিরহের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা তোমার অন্ধমুনির অভিশাপ। রামের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তুমি চিরকাল ভরত শত্রুঘ্নকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এই যন্ত্রণা দিয়েছ। আজ চোখের সামনে তোমাকে যখন সেই আগুনে পুড়তে দেখছি। তখন ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এত সুখ, তৃপ্তি জীবনে কখনও পাইনি।

যাকে নিয়ে এত কান্ড, সে কিন্তু নির্বাক। মাথা নিচু করে ঝড়ের ঝাপ্টা সামলাচ্ছিল। কৈকেয়ীর অভিযোগগুলির এমন একটা নির্মম সত্য ছিল যা অগ্রাহ্য করা শক্ত। তার কথাগুলোর ভেতর একটা প্রবল জ্বালা ছিল। একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। যা বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা নয়, রাগ বিরাগ বা হিংসা নয়। তবু তার ঝাঁঝ অগ্রাহ্য করা শক্ত। তার মুখের ভাব ভাষা একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হলো বিশ্বাস: বিশ্বাস ভঙ্গের জ্বালায় জ্বলছে কৈকেয়ীর স্নেহ ভালবাসা। কী অপূর্ব জ্যোতির্ময়রূপ কৈকেয়ীর। রাম মুগ্ধ হলো। মনে হলো তার স্নেহের ধারায় অবগাহন করে যে তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছিল, আজ তা অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল তার জীবনে। এই প্রাপ্তিকে কিছুতে ছোট হতে দেবে না সে। মুগ্ধতাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে লোভীর মতো সিংহাসনের জন্য ব্যবহার করতে রামের পৌরুষে, আত্মসম্মানবোধে এবং মনুষ্যত্ববোধে বাধল। তাই নিরাবেগ চিত্তে নির্বাসনকে মেনে নেবার জন্য যন্ত্রবৎ পিতাকে প্রণাম করে বললঃ পিতা, কর্তব্যপালনের জন্য আপনাকে ছেড়ে যেতেই হবে। আমারও মন কেমন করছে। বিশেষ করে আপনার জন্য, মাতা কৌশল্যা এবং মাতা সুমিত্রার জন্য। কিন্তু স্বার্থের সংঘাতে পিতা পুত্রও তফাত হয়ে যায়। তফাতটা সময়ে না হলে তিক্ততা সৃষ্টি হবে। সেই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগে আমি এই স্থান ছেড়ে যেতে চাই। একটা বৈরাগ্য এসেছে আমার মনে। এই বৈরাগ্য আমাকে শক্তি দিচ্ছে লোভ জয় করতে। ত্যাগের মধ্যেও যে একটা আনন্দ, সুখ আছে তাও নিবিড় করে অনুভব করতে পাচ্ছি! বনবাসে আমার কোন কষ্ট হবে না। অরণ্যভূমি বিরাট। যে কোন মানুষ সেখানে নিজের স্থান করে নিতে পারে। আমরাও পারব।

রামের কথায় সকলের মুখ গম্ভীর, বিষাদগ্রস্ত দেখাল, কেউ কোন কথা বলল না। কৈকেয়ীর চোখে মুখে আর উত্তেজনা নেই। দশরথের মধ্যেও নেই পূর্বের অস্থিরতা। কিন্তু অশ্রুতে তার দুই চোখ ঝাপ্সা হয়ে গেল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে দশরথেরর গলা থেকে স্খলিত অস্পষ্ট স্বর উচ্চারিত হলো। উত্তেজিত ক্ষুব্ধ স্বরে বললঃ সুমন্ত্র, কর্তব্য বড় নির্মম। রাম তার সঙ্গে কোন সন্ধি করল না। নিরাপত্তার জন্য রামের সঙ্গে চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিয়ে দাও। অরণ্য বিশেষজ্ঞ ব্যাধদের তার সঙ্গে পাঠাও। রামের সঙ্গে উত্তম আয়ুধ, শকট, অশ্ব, ধন রত্ন দিতে ভুলো না যেন। ঋষিদের উপযুক্ত দানদক্ষিণা দিয়ে তাদের আশ্রমে রামের দিনযাপনের ব্যবস্থা কর।

হৃৎপিন্ডের কষ্টকে সর্বশক্তিতে নিশ্বাসে সংহত করল দশরথ। বুকের ভেতর ধক্ ধক্ করে বেজে যায় জীবনের স্পন্দন, কিন্তু নিশ্বাস পড়ে না। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। চেতনা। চোখের তারায় কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতা। ক্ষণেকের জন্য চোখ দুটো বড় বড় হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দেহটা একবার দোল খেল এধার ওধার। তারপর মৃগী রোগীর মূর্ছা যাওয়ার মতো ধপ করে নরম বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল।

পাঁচ

রামের বনগমনের ছয়রাত্তির পর দশরথের প্রাণবিয়োগ হল। কেকয় থেকে ভরত শত্রুঘ্ন তখনও প্রত্যাবর্তন করেনি। পুত্রদের কেউ রাজপুরীতে ছিল না বলে দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিলম্ব হচ্ছিল। অবশেষে বশিষ্ঠের পরামর্শে রাজার শবদেহ বিবিধ আরকে ভিজিয়ে স্ফটিকপাত্রে রাখা হলো।

অযোধ্যার থেকে কেকয় ছয় দিনের পথ। অযোধ্যার রাজদূত কেকয়ে পৌঁছনোর পর দশরথের মৃত্যু হলো। কিন্তু অশ্বপতি দূতের আগমন বৃত্তান্ত আগেই জেনেছিলেন। তাঁর গুপ্তচর বাহিনীর দৃষ্টি খুবই সজাগ। গোপন পথে তারা তীরন্দাজ সংবাদাতার মাধ্যমে অশ্বপতিকে অযোধ্যার সব খবর পাঠিয়েছিল। এমন কি দশরথের মৃত্যু অবধি।

ভরত-শত্রুঘ্ন যখন অযোধ্যায় যাত্রা করল তখন তাদের সঙ্গে ছোট-খাট এক চতুরঙ্গ বাহিনী পাঠাল অশ্বপতি। ভরতের তাতে আপত্তি ছিল কিন্তু অশ্বপতি তার কোন আপত্তিই শুনল না। উত্তম হস্তী, দ্রুতগামী অশ্ব, পদাতিক, অশ্বারোহী সৈনিক, রথ, বাছা বাছা বীর যোদ্ধা, ভীষণদন্তী কুকুর, বেশ কিছু পদস্থ, বিশ্বস্ত কূট রাজনৈতিক কর্মী ও অমাত্য তার সঙ্গে পাঠাল। এত সব কান্ড অশ্বপতি করল কেন, ভরত তার কিছুই জানে না।

বহু নদী, পর্বত, অরণ্য, জনপদ অতিক্রম করে ছয় রাত্তির পর ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় প্রবেশ করল। কিন্তু তাদের আগমনের জন্য অযোধ্যার কোন সাজসজ্জা চোখে পড়ল না। কৌতূহলী জনতার ভিড় ছিল না পথে। বলতে গেলে রাজপথ ফাঁকা। দু'চার জন দর্শক যা চোখে পড়ল, ভরতকে দেখে তারা অধোবদন হলো। কেউ মাথা নিচু করে দ্রুত স্থানান্তরে গমন করল। অনেকে দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। কেউ বা অশ্রু গোপন করতে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকল। জনতার এরকম অস্বাভাবিক আচরণ ভরতকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। আশ্চর্য হয়ে ভাবল, রামচন্দ্রের মতো সেও প্রজাগণের প্রিয়। কিন্তু তারা এমন বিমর্ষ কেন? তাদের অন্তর থেকে হর্ষ, উল্লাস কে বা কারা হরণ করল? তাদের মুখশ্রী মলিন কেন? অকস্মাৎ তাদের হলো কী? সকলে নিরানন্দ, নিঃশব্দ, গম্ভীর দুঃখে মুহ্যমান কেন? তাদের বোবা চাহনি নীরব প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে? অথচ অযোধ্যায় থাকা কালে এইসব নামহীন সাধারণ মানুষের দল তার মিষ্টি স্বভাব ও মধুর আলাপের জন্য কত না উল্লাসিত হতো? আজ তাদের এই পরিবর্তন কেন?

রথ যথাসাধ্য দ্রুতবেগে চলছিল। তবু ভারতের মনে হলো, সময়ের গতি দীর্ঘ আর মন্থর। পথ যেন ফুরোতে চায় না। রথ চলছে না যেন। বড় ধীর বড় শ্লথ। ভরত অধৈর্য হলো। অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় ভিড় করল। তার ভেতর দশরথের চিন্তাটা স্থায়ী হলো। যত ভাবে তত বুকটা বিপদের আশঙ্কায় উথাল পাথাল করে আর চোখ ভরে যায় জলে। পিতা বৃদ্ধ হয়েছে। তার জন্যই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। অকস্মাৎ কিছু হওয়া তাঁর আশ্বর্য নয়। হয়তো বা তাই হয়েছে, নইলে, অযোধ্যার এই শ্রীহীন অবস্থা হবে কেন? ভরত দুরু দুরু বুক হাত দিয়ে চেপে ধরল। ভিতরে ভিতরে সে ভীষণ অধের্য হয়ে অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল : সারথি, আরো জোরে, আরো জোরে।

অমনি সপাসপ, চাবুক পড়ল অশ্বের পিঠে। চাবুক খেয়ে অশ্ব বিপজ্জনকভাবে দৌড়তে লাগল।

সরযুর ধার ঘেঁষে সটান যে সড়ক গেছে সেই রাস্তা বরাবর রথ ছুটিল। এই দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সে অন্যমনস্ক হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপ দেখছিল। অনিদ্রা-জনিত জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, প্রকৃতি কেমন শান্ত, নির্বিকার, নিজের আনন্দে মশগুল। মানুষের বিপদ, উদ্বেগ, অশান্তি, দুঃখ, যন্ত্রণার প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এক কণা সহানুভূতি পর্যন্ত না। গাছপালা, নদী, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, পাখি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গের এমন উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা শঙ্কা কিংবা উদ্বেগ থাকে না। কেবল মানুষের যত দুর্ভাবনা, আর কষ্ট।

শহরে ঢুকে ভরতের মন আরো খারাপ হলো। এ দিকটা আরো নির্জন। পথি-পার্শ্বের গৃহগুলো থেকে নারীদের আর্তহাহাকার ভেসে এল। পুরুষেরা বাতায়নে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্য কটু কথা উচ্চারণ করল। পথচারীকে থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুত ধাবমান রথের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে বললঃ ফিরে যাও রাজপুত্র। অযোধ্যার কেউ নও তুমি। অযোধ্যার কোনকালে তুমি থাকনি। এ দেশের প্রতি

তোমার দরদ, মমতা কিছু নেই। অযোধ্যা এই শ্রীহীন হলো কার পাপে? কে দোষী? হীন মাতার কপট পুত্র তুমি। তোমাকে ধিক্কার। তোমার কৃতঘ্নতার তুলনা তুমিই।

শহরের মানুষের এরকম অসৌজন্য, অশোভন বাক্যে ভরত মর্মাহত হলো। অপমানে মুখ-চোখ রাঙা হলো। লজ্জাও পেল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্তিমিত গলায় দূতকে জিগ্যেস করলঃ শহরের মানুষ এসব কথা বলছে কেন? তাদের কথা শুনে আমার মন বড় অস্থির আর উতলা হয়েছে। আমার ভীষণ ভয় করছে। পিতার কিছু হয়েছে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। তুমি সত্য করে বল, পিতা কেমন আছে?

দূত হঠাৎ কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মাথা নিচু করল। কুণ্ঠার সঙ্গে বলল : বৃদ্ধ পিতার ভাবনায় আপনার মনটা উদ্বেগে অধীর হয়ে আছে।

ভরত শশব্যস্ত হয়ে বলল। চিন্তার কারণ তো বটেই। একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত মনটা কেমন করে ঠাণ্ডা হয় বল?

আর কোন কথা হলো না। কেবল উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল ভারতের। মনের ভেতর দুর্ভাবনার বর্ষণ নামল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। চাপ চাপ অন্ধকার নামল। আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকার গভীর, গাঢ়, নিরেট। নীলাকাশ জুড়ে অসংখ্য তারারা মৌন বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে পৃথিবীর তমিস্রার অলৌকিক রূপ। থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। নিঝুম নিস্তব্ধ চারদিক। অন্ধকারে বুকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ঝিল্লীর ঝংকারে নিরন্তর বুকফাটা হাহাকার। অন্ধকার বৃক্ষশাখার অন্তরালে নিশাচর বিহঙ্গের পাখা ঝাপটানোর শব্দ সব মিলিয়ে একটা অলৌকিক ভয় ভয় ভাব। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ পরিবেশ। ভরত শত্রুঘ্ন দুজনে নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। দু'জনের মুখে এক অসহায় উদ্বেগ ফুটল। একটা চকিত বিদ্ধ কষ্ট তাদের আচ্ছন্নতার মধ্যে স্থায়ী হলো। এ এক আশ্চর্য কষ্ট। যার কোন অভিজ্ঞতা তাদের নেই। এবং তার সঙ্গে একটা ভয় ভয় ভাব তার বুকের মধ্যে আমূল প্রোথিত হলো। উৎকর্ণ জিজ্ঞাসার স্তব্ধ অন্ধকারে আশঙ্কা জাগল।

অযোধ্যার প্রাসাদে রথ থামল। ভরত শত্রুঘ্নকে অভ্যর্থনা করতে কেউ এগিয়ে এল না। সে সব ভ্রূক্ষেপ না করেই দু'ভাই রথ থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একরকম দৌড় অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

পিতাকে গৃহে দেখতে না পেয়ে ভরত জননী-গৃহে প্রবেশ করল। স্বর্ণ পালঙ্কে কৈকেয়ী নীরব হয়ে বসেছিল। পরিচারিকাদের একজন চামর ব্যাজন করছিল, অন্যেরা পদসেবা এবং চুলবিন্যাস করে দিচ্ছিল। তাদের পরিচর্যা, সেবা ও আরামের মধ্যে ডুবে গিয়ে কৈকেয়ী তার সান্ধ্য তন্দ্রায় মগ্ন রইল। অকস্মাৎ ভরতকে সেখানে উঁকি দিতে দেখে কৈকেয়ী মুখের রূপ ও রঙ বদলে গেল। নিজের অজান্তেই বেশ হাস্যময় প্রশান্তিতে তার চোখ ও মুখ দীপ্ত হলো। অন্ধকারের ভেতর সহসা আলো দেখলে যে ভরসা জাগে অনেকখানি সেরকম একটা আনন্দ ঝল্‌কে উঠল তার মনেতে।

ভরতের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকারা প্রস্থান করল। ভরত কৈকেয়ীর সামনে দাঁড়াল। মুখে তার অদ্ভুত শান্ত হাসির অভিব্যক্তি। দুই অপলক কালো চোখের বড় বড় পাতার ছায়ার মধ্যে হাসি তার উপ্‌চে পড়ল। ঠোঁটের কিনারায় দিঘির জলের মতো খুশি টলটল করছিল।

ভরত অল্প সময়ে বেশ খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে থাকল। তার মুখ উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় কাতর। তাকে খুব উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। চোখে মুখে একটা আশ্চর্য বিহ্বলতা। কষ্টের ছায়া তার নিশ্চল স্তব্ধ মূর্তিটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যেন। তাই, তাকে খুব স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন একটা নিষ্প্রাণ ছবির মতো মনে হচ্ছিল। তার চোখে মুখে কোন আবেগ ছিল না। তার শান্ত, স্তব্ধ, নির্বাক চোখের দিকে তাকাতে কৈকেয়ীর ভয় ভয় করছিল। মনের অসহায় অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল : এত দেরি হল কেন বাবা? পথশ্রমে তোকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। এখন হাত মুখ ধুয়ে স্নান করে বিশ্রাম নাও। তারপর, কেকয়ের সংবাদ শুনব। পিতা অশ্বপতি এবং ভ্রাতা যুধাজিত কুশল তো?

ভরত নির্বাক। আতঙ্কিত শঙ্কা ও উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় বিহ্বলতা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখল যে জননীর প্রশ্ন তার মনকে স্পর্শ করল না। কোন সাড়া দিল না সে। নিজের জিজ্ঞাসায় স্তব্ধ ; নির্বাক।

তার দৃষ্টি ছিল কৈকেয়ীর মুখের ওপর।

কৈকেয়ীর প্রশ্নে কক্ষের গাম্ভীর্য কিছুমাত্র নষ্ট হলো না। বরং তা স্বাভাবিক হয়ে এল। ভরত শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। বুকের ভেতর থেকে একটা পাষাণ ভার যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নামল। কিন্তু তাকে খুব বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছিল। অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল ঃ পিতা কোথায়? ভরতের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ সন্দেহে দৃঢ় গম্ভীর ও কঠিন।

কৈকেয়ীর বুকটা থরথর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বুকটা তার হঠাৎ কেমন করে উঠল। বারবার মনে হচ্ছিল, এবার একটা কিছু হবে, কিছু ঘটবে, জীবনে একটা মোড় ফিরবে। কিন্তু কোন দিকে ঘুরবে, সেটাই কেবল জানে না। জানবে কোথা থেকে? পুত্রদের সঙ্গে একসাথে থাকলে যেভাবে মায়ে পোয়ের বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্নেহ ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় নিবিড় হয় পুত্রদের সঙ্গে তার সে হৃদয় বন্ধন হয়নি বলে মনের ভেতর একটা সর্বদা আতঙ্ক আর শংকা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সন্তানের উপর জননীর যে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এবং সরল আস্থা থাকে কৈকেয়ী চেষ্টা করেও বুকের ভেতর তার ভরসার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারছিল না। আর সেজন্যই একটা কুণ্ঠা আর সংকোচে তার মনটা দীন হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা নত হলো। নিজেকে মনে হলো জননী হিসাবে সে কত নিঃস্ব, কত অসহায়, আর কি ব্যর্থ ভরতের ছোট্ট জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়া যে এত নিদারুণ হয়ে উঠবে জীবনে ও মনে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। পুত্রের মঙ্গল এবং করুণার কথা চিন্তা করে যা করেছিল তা যেন এই মুহূর্তে সব অপরাধ বলে বোধ হল তার কাছে। ভরত তাকে অপরাধী আসামী করেই যেন প্রশ্নটা কর। মনের সে কষ্টে চোখ বুজতেই চোখের কোল ভরে গেল জলে।

নির্বাক জননীর অশ্রুভেজা মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিজের মনও আর্দ্র হলো। ভেজা গলায় বলল : কি হলো জননী ; কথা বলছ না কেন? অযোধ্যা এত বিষণ্ন কেন? সে কি পিতৃহীন হয়েছে?

কৈকেয়ী সহসা নীরব হয়ে গেল। কারণ ভরতের মধ্যে পিতা সম্পর্কে তার নিজের স্নেহ, মমতা, উৎকণ্ঠার একটা অনুভূতি কাজ করছিল। এখন ভরতের মুখোমুখি হয়ে যে জায়গায় সে দাঁড়িয়ে সেখানে একটু অসতর্ক হওয়া বিপজ্জনক। ফলাফল কি হবে বা হতে পারে যে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ভরতের বুকে উৎকণ্ঠার সমুদ্র উদ্বেলিত। কৈকেয়ী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিল পিতাকে ঘিরে আশঙ্ক, চাঞ্চল্য অস্বস্তি, বেদনা আরো কত কিছুতে টাটাচ্ছিল তার বুক। এই অবস্থার ভেতর কৈকেয়ী কি করবে? কিভাবে কথা বললে পরিণাম সুখের এবং আনন্দের হয় তা সে ঠিক করতে পারছিল না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। এ রকম নীরব অপেক্ষা তার কাছে এবং ভরতের কাছেও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠল। কৈকেয়ী বেশ খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে থাকল। কৈকেয়ী কথা বলছে না দেখে ভরত অভিভূত গলায় প্রশ্ন করল : মাগো, পিতার কী হয়েছে? নিজের কক্ষে নেই, তোমার কক্ষেও নেই ; তা-হলে কোথায় তিনি? রাজপুরী এমন প্রাণহীন কেন? সমগ্র অযোধ্যাতে শ্মশানের স্তব্ধতা। তুমিও চুপ করে আছ, কথা বলছ না ; আমাদের প্রিয়তম অগ্রজ রামচন্দ্রই বা কোথায়? ভরতের গলা বেশ ভার হয়ে গেল।

ভরতের প্রশ্নে কৈকেয়ী বিব্রত বোধ করল। ভয়ে মুখখানি বিবর্ণ হলো। মাতা পুত্রের অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ঘরখানা সহসা ভরে উঠল। কক্ষের মধ্যে এমন একটা স্তব্ধ বিহ্বলতা সৃষ্টি হলো যে কৈকেয়ী নিজেকে খানিকটা সংযত করে সচেতনভাবে। বিষণ্ন গলায় বলল : পুত্র, পৃথিবীতে কোন কিছুই নিত্য নয়। মায়ামোহে বদ্ধ জীব, তবু ভাবে সব কিছু চিরকাল ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু কালের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। মৃত্যু একদিন তার দ্বারে অবশ্যই হানা দেবে। সেই দিনটা মানুষের সব চেয়ে কষ্টের, দুঃখের এবং যন্ত্রণার। প্রিয়তম মানুষটির মৃত্যুর কথা মুখে বলা যে কত মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা তা তোমাকে বোঝাই কি করে? সব জীবনের যে গতি হয়, তোমার পিতারও সে গতি হয়েছে, এ কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবু তোমার তৃপ্তির জন্যই সে কথা বললাম। কৈকেয়ীর গলার স্বর সহসা ভঙ্গ হলো।

অমনি ভরতের বুকে একটা প্রগাঢ় যন্ত্রণা থাবা গেড়ে বসল। বুকের ভেতর এক অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রণার

আন্দোলন তার শরীর অস্থির করে তুলল। দু'চোখের তারায় জল টলটল করতে লাগল। টেপা ঠোঁটের কোণে চাপা কান্নার কুঁই কুঁই আওয়াজ।

কৈকেয়ীর ভুরু কুঞ্চিত মুখে যথাযথ উদ্বেগ। দশরথের বিয়োগজনিত শূন্যতার অনুভূতিতে কৈকেয়ীর মন টাটাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সে ভরতের দিকে সরে এল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : পুত্র নিজেকে আজ ভীষণ একা লাগছে। তোমরা তো আছ, তবু আমাকে একলা মনে হচ্ছে কেন?

ভরতের বুকের ভেতর হাহাকার বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে কৈকেয়ীর হাতখানা বুকের মধ্যে টেনে নিল। তৃপ্তিতে, সুখে, আনন্দে কৈকেয়ীর দু'চোখ বুজল। ভরতের হাতে হাত রেখে বলল : মৃত্যু মাত্রেই খারাপ। মৃত্যু মানে একাকীত্ব। দুঃসহ দুঃখে বুকটা পাষাণের মতো ভার হয়ে যায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্বর্গীয় আত্মা কি একমুহূর্তের জন্য টের পায়?

মাতা পুত্র কথা বলে না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। ভরতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কৈকেয়ী। ভরত বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। কৈকেয়ীর কেমন একটা বিহ্বলতার এল। ডান হাতটা আস্তে করে ভরতের কাঁধে রেখে নরম গভীর গলায় ভরতকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : পুত্র, মৃত্যুতে একটা জীবনের পরিসমাপ্তি বটে, কিন্তু মৃত্যুই শেষ নয়। মানুষ বেঁচে থাকে তার বংশধরের ভেতর। বংশ পরম্পরায় সেই স্রোত বয়ে নিয়ে যায় সে। মা হল জন্মদাত্রী। মার কাছ থেকে সন্তান তার রূপ পায়, পিতা মায়ের সেই রূপকে ভাব দেয়, তাকে গড়ে তোলে। তোমার পিতার মৃত্যুতে তোমাদেরও সব শেষ হয়ে যায়নি। মহারাজের সব রয়েছে তোমার ভেতর, আমার মধ্যে। আমার সমস্ত স্নেহ মমতা ভালবাসা দিয়ে তোদের দু'ভাইকে ঢেকে রাখব। ভালবাসা দিয়ে এই সংসারের সব কিছু যদি দেখিস, বিচার করিস তা হলে কোথাও কোন ভুল হবে না। কোন কিছুর জন্য কষ্ট হবে না। কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, সংযত এবং চিন্তিত।

কৈকেয়ীর কাঁধের উপর মাথা রেখে ভরত নিশ্চল চোখে তাকিয়ে রইল প্রদীপ শিখার দিকে।

সমস্ত ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা আড়ষ্টতা নেমে এল।

ভরতকে এমনই উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল যে, কৈকেয়ীর মনে হলো ভরত যে কোন সময় শোকে উন্মাদ হয়ে একটা কিছু করে ফেলতে পারে। এই ভয় ও আশাঙ্কায় কৈকেয়ী স্বস্তি পাচ্ছিল না। ক্রমাগত চিন্তার ফলে তার মাথায় কেমন যেন এক তালগোল পাকানো অবস্থা হল। কপালটা ভারী এবং জমাট লাগছিল।

ভরত সামান্য সময় নীরব থাকল। চোখের জল মুছে জিগ্যেস করল : প্রিয়তম অগ্রজ রামচন্দ্র কোথায় মা? আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়েও তিনি এলেন না কেন? তিনি কি তবে অযোধ্যায় নেই?

কৈকেয়ীর বুকের ভেতর থর থর করে কেঁপে ওঠল। সাহস সঞ্চয় করে পুত্রের মুখের দিকে তাকাল। ঘটনার আকস্মিকতায় ভরতকে সব কথা জানানোর এক সুন্দর সন্ধিক্ষণ অজান্তে সৃষ্টি হল। সুতরাং তার অপেক্ষা করা ঠিক মনে হল না। ভরতের কূল থেকে নিজের কূলে পৌঁছনোর জন্য একটা সেতু স্থাপনের প্রয়োজন। ভরতে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলল ঃ তোমার অনুমান যথার্থ। রামচন্দ্র বর্তমানে অযোধ্যায় অবস্থান করছে না। তোমার প্রতি তার কোন স্নেহ নেই। তোমার সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তোমাদের প্রবঞ্চনা করছিল সে। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে মহারাজ তাকে বনে নির্বাসিত করেছে।

জননী! আর্তযন্ত্রণায় ভরত চিৎকার করে উঠল।

পুত্র, তোমার বিবেক এতটা কাতর হচ্ছে কেন? সে কিন্তু তোমার জন্যে উতলা হয়নি, তার বিবেকও কাতর হয়নি। তোমার বিশ্বস্ততায় তার সন্দেহ। চোখের সামনে তার এই মিথ্যাচার সইতে পারলাম না। পুত্র তুমি অধীর হয়ো না। তুমি অন্তত বোঝবার চেষ্টা কর। আমি মা।

ছি ছি জননী, এ তুমি করেছ কি? মাথায় তোমার দুর্বুদ্ধি এল কেন?

কৈকেয়ীর সব চিন্তা ভাবনা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। ভরতের অভিযোগ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কৈফিয়তের সুরে বলল : ভরত আমি তোদের মা। সন্তানের জন্য মায়ের কোন লজ্জা, সংকোচ, অপমান থাকে না। এই পুরীতে আমার ছেলেরা অনাথ, পরিত্যক্ত হয়ে থাকবে তা জননী হয়ে আমি

সইব কেমন করে? সংসার বড় নিষ্ঠুর জায়গা। এখানে স্বার্থই সব। মহারাজ স্বার্থের বশে মিথ্যেকে আকাশচুম্বী করে তুললেন। একটা বড় মিথ্যেকে আরো বড় মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে হয়। আর মিথ্যে এমন জিনিস, যার মধ্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করার বিষ থাকে। তোমার পিতা নিখুঁতভাবে সেই বিষ ঢালছিল। আমি সেই বিষক্রিয়ার নীল হয়ে যেতে দিইনি আমার পুত্রদের। এটাই আমার অপরাধ? সব মা' তার পুত্রর জন্য এটুকু করে। আমিও করছি। এ নতুন কিছু নয়।

ভরতের বুকে কৈকেয়ীর প্রতি যুগপৎ সহানুভূতি এবং তীব্র ঘৃণা জেগে উঠল। বিদ্যুৎ হানার মতো প্রবল ধিক্কার আর অপমানবোধ বুক চিরে বেরিয়ে এল তার। বলল : ছিঃ মা, ক্ষুদ্র ঈর্ষায় তুমি আমার ঋষিতুল্য ভাইকে স্বর্গ থেকে আবর্জনায় নামিয়ে আনলে? এত বড় কলঙ্ক আমায় দিলে কেন? তুমি জান না, কী ক্ষতি করলে আমার?

কৈকেয়ীর দু'চোখ ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল : কে তোমার ঋষিতুল্য ভাই? রামচন্দ্র? নিজের লোভ ছাড়া, ক্ষমতা ছাড়া যে কিছু চেনে না, জানে না, তাকে বল ঋষিতুল্য ভাই? রামের সঙ্গে ঋষির তুলনা করে, ঋষিদেরই ত্যাগ, তিতিক্ষা, দয়া, মমতাকে ছোট করলে। রামের মতো লোভী, স্বার্থপর, ভণ্ড, কপট, প্রতারক আর কে আছে?

ভরত প্রায় আর্তস্বরে কাঁপা গলায় চিৎকার করে বলল ঃ জননী, তুমি কি জ্ঞান হারালে? ক্রোধে উন্মাদিনী হয়ে কি বলছ, জান না?

আমি সব জেনে শুনে ভেবেই বলছি পুত্র। কেন বলছি শোন। রাম সিংহাসনের লোভে তোমাদের দু'ভাইকে বাদ দিয়ে চুপি চুপি তার অভিষেকটা সেরে ফেলছিল। এ কি প্রবাসী ভাই'র প্রতি তার বিশ্বাসের নিদর্শন? সততার কোন পরিচয় রামচন্দ্র রেখেছে তার কাজে? ভারতবর্ষের ছোট বড় সব নৃপতিই অভিষেক সভায় আমন্ত্রিত হলো কেবল বাদ থাকল বৈবাহিকী সাংকাশ্যরাজ কুশধ্বজ জনক আর তোমার মাতামহ অশ্বপতি। কপট পিতার হীন দুরভিসন্ধি অবগত হয়েও রামচন্দ্র লোভীর মতো পিতার বাধ্য ও অনুগত থেকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হতে চেয়েছে। রামচন্দ্রের লোভ কপটতা, অবিশ্বাসের স্বপক্ষে এটাই যথেষ্ট বলা। রামচন্দ্রের এই সংকীর্ণ কপট ভ্রাতৃপ্রেম উচ্চাসন পাওয়ার অযোগ্য।

ভরতের মুখ সহসা মলিন হলো। কি যেন ভেতরে ভেতরে তাকে অস্থির করে তুলল। কৈকেয়ীর কথাটা ফেলতে পারল না, আবার বিশ্বাস করতেও তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। কৈকেয়ীর কথায় ভরত স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, তার অনুপস্থিতিতে অযোধ্যায় এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে যার আলোড়ন উত্তেজনার ব্যাপ্তি, ব্যাস, বেধ আর পরিধি অযোধ্যার সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর আবৃত করেছে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে যার কূল মেলে না। এই মুহূর্তে তার কোন বিচারশক্তি ছিল না। দৃষ্টির অতীত ঘটনার অনুভবের বিষাদে নিঃশব্দে আন্দোলিত হচ্ছিল তার বুক। ভরত অসহায় বোধ করছিল। প্রচণ্ড একটা বেদনা বুকে নিয়ে সে আর্তস্বরে বলল : জননী আমার সরল ভ্রাতৃপ্রেমে এনো না সংশয়। তুমি চুপ কর।

ভরতের হৃদয় যেন গলে গলে পড়ল তার কণ্ঠস্বরে। চোখের মণিতে তার রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা কিছু নেই। একটা ভয় পাওয়া আড়ষ্ট ভাব তাকে কেমন শান্ত ও নির্বিকার করে রাখল। মুখ ফ্যাকাশে। ভরত বিবেচক ছেলে। সে জন্য উদ্বেগে কৈকেয়ীর মনটা কেমন হয়ে গেল যেন। হঠাৎ তীব্র আত্মাভিমানে মরিয়া হয়ে বলল : কেমন করে চুপ করি বৎস। বুক আমার অহর্নিশি জ্বলছে। মনকে বোঝাতে পারছি না। ভুলতে পারছি কৈ রামের প্রতারণা? আমার নির্মল মাতৃস্নেহের উপর তার তীব্র সন্দেহ জাগল কেন? তার অবিশ্বাস, সন্দেহের তীরে বিদ্ধ আমার হৃদয়। রক্তঝরা সে বেদনায় ভাষা আমি বোঝাই কারে? আমার কে আছে? হতভাগ্য বলেই গর্ভজ পুত্রের কাছে মায়ের চেয়ে ভাই বড় হল! ভাইর দুঃখ কষ্টে তার বুক ফাটে, অথচ মায়ের দুঃসহ জ্বালা, যন্ত্রণা, তার প্রাণ কাঁদে না। সমবেদনা কষ্টে মন টলে না। এর চেয়ে জননীর বড় দুর্ভাগ্য কি থাকতে পারে? হাউ হাউ করে কাঁদল কৈকেয়ী। অনেকক্ষণ ধরে অসহায়ের মতো কাঁদল।

ভরত কৈকেয়ীকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল। মুখের উপর ঝুলে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে অপলক চোখে জননীর চোখে চোখ রাখল। কৈকেয়ীর বুকটা আপনা থেকেই থর থর করে কেঁপে উঠল। আরামে দু'চোখ বুজল। চোখের কোল ভরে গেল জলে। জননীর আঁচল

দিয়ে সে জল ভরত নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছিয়ে দিল। তৃপ্তিতে শান্তিতে কৈকেয়ী ভরতের বুকের উপর মাথা রাখল। মনটা আবেগে নুয়ে গেল। গলা ভিজে গেল আনন্দে। অস্ফুট স্বরে বলল ঃ জননীর কাছে সন্তানই সব। স্বামী থেকেও সন্তান জননীর কাছে বড়। জননীর স্নেহ অপার, অসীম। সমুদ্রের মতো স্নেহধারা বইছে তার বক্ষ জুড়ে। স্বপ্ন, কামনা বাসনা, আকাঙ্ক্ষার ঊর্মিতে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে জননীর হৃদয়। জননীর অন্তরে সে স্নেহ ঝর্নার মতে কখন শীর্ণস্রোতা আবার কখনো ব্যাপ্তিতে, বিশালতায় গভীরতায় মহাসমুদ্রের মতো অসীম, অনন্ত, অতল। আমার বুকেতেও তেমনি এক স্নেহের মহাসাগর ছিল পুত্র। সে ছিল মুক্ত, স্বাধীন। রাম লক্ষ্মণের জন্য ছিল অবারিত। সপত্নী পুত্র বলে আলাদা চোখে দেখিনি কখনও। আমার আত্মজ বলেই ভাবতাম। আমার দুই নয়নমণি ছিল তারা। তবু আমার স্নেহ ভালবাসার উপর তাদের দু'ভাই'র অবিশ্বাস সন্দেহ প্রবল। সব অদৃষ্ট পুত্র!

ভরত কোন কথা বলল না। তার দৃষ্টি ফাঁদে পড়া পাখির মতো। জিজ্ঞাসা নিবিড় দৃষ্টি কৈকেয়ীর চোখে বিদ্ধ হয়ে রইল। নিজের অজান্তে বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর শ্বাস আস্তে আস্তে নামল। কৈকেয়ী ভরতের মনের তল খুঁজে পেল না। চমকানো বিস্ময়ে তার বুক টন টন করল। ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনের ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সম্মোহিতের স্বরে বলল ঃ তোমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্য তুমি দায়ী নও। কারণ যে বিশ্বাসের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, সংস্কার বশে সম্মান করে এসেছ তাকে। হঠাৎ সেই বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কারের থিত ভিত্ যদি ভেঙে চৌচির হয়ে যায় তাহলে ভাঙা মনের এই আর্তিটুকু তো থাকবেই। তাই তো যন্ত্রণায় বেদনায় একরকম পাগল হয়ে গেছি। যারা আমাকে ও আমার পুত্রদের অবহেলা করল অনাদর দেখাল যাদের উপেক্ষা, ঘৃণা, বঞ্চনা আমাদের অপমান করল তাদের আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছি আমি। শেষ করবে তুমি। সিংহাসনে তোমার অভিষেক না করা পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না।

কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল ভরত। বুকে তার নৈঋতের মেঘ। ঝড়ের সংকেতে যেন শাসাচ্ছিল তাকে। নিজের বিবেকের জিজ্ঞাসা সে স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার গম্ভীর। ভুরু কোঁচকাল। তার মনে হলো, কৈকয়ী জননী হয়ে বিভ্রান্ত করছে তাকে। তার কানে বিষ বর্ষণ করে মনকে বিষিয়ে তুলছে অগ্রজের প্রতি, পিতার প্রতি এবং পরিবারের প্রতি। অন্ধ পুত্রস্নেহে জননী তার অনেক নিচে নেমে গেছে। ঘোর স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিতে তার বুক টাটাচ্ছিল। জননীর প্রবল আত্মাভিমানের যে আগুন মনের নেপথ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, হঠাৎ যেন তার চোখে মূর্ত হলো তার নীল শিখা। মায়ের রোষ-ভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভয় পেল ভরত। ঠোঁট কাঁপছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শ্বাসে তার কম্পন। চোখের দৃষ্টিতে অসহায় বিহ্বলতা। ভরত দুর্বল বোধ করছিল। কৈকেয়ীর দিকে বিমূঢ়ের মতো অপলক স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। ভুরু কোঁচকাল। স্তিমিত গলায় অস্ফুটস্বরে ডাকল ঃ মা, মাগো! জননী হয়ে যে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তুমি বয়ে আনলে সে যে আমার জীবনের কত বড় দুর্ভাগ্য তা তুমি জান না। নির্দোষ নিরপরাধী ভরতের জীবনে এই সিংহাসনে আরোহণের মতো বড় কলংক আর কিছু নেই। আমার সব সুকৃতি ঢেকে দেওয়ার পক্ষে এই কলঙ্কটুকু যথেষ্ট। আমার ভাবমূর্তি এভাবে নষ্ট করে দিলে কোন্ অধিকারে?

কৈকেয়ী উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। তবু ভরতের রূঢ়বাক্য শোনা মাত্র সে চমকে উঠল। কৈকেয়ী স্থির চোখে দেখল তাকে। বড় নিশ্বাস ফেলল একটা। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তেজ তার গলার অন্তঃস্তলের এক অব্যক্ত অধিকার বোধে উৎস থেকে নির্গত হলো। ধীর, শান্ত কণ্ঠে বলল ঃ জননীর অধিকারে। জননীর কাছে সন্তানের থেকে বড় কেউ নয়। শিশুকাল থেকে রোগের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে নৈতিক মৃত্যু কিংবা অধঃপতন থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে জননী। বাঁচবার অধিকারে সন্তানকে বড় করে তোলা জননীর শ্রেষ্ঠ কাজ। হীনতার লজ্জা থেকে, মনুষ্যেত্বের অপমান থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছি। বাঁচাবার অধিকার সকলেরই আছে। সব মা চায় ছেলে বড় হবে, এতবড় যে সহজে যার নাগাল পাবে না কেউ। সেদিন রত্নগর্ভা জননী হয়ে সে বেঁচে থাকবে ছেলের মধ্যে।

ভরতের বুকের ভেতর এক বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ জাগল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণে

একটা দুরন্ত ভয়ে সে বিব্রত ও স্থির হয়ে পড়ল। ভর্ৎসনা করে বলল ঃ কিন্তু এভাবে তোমার কাছে বাঁচতে চাওয়া ভীষণ অন্যায়। নিন্দে অপবাদের মুখে আমাকে এরকম করে ঠেলে দিতে তোমার একটুও বিবেকে লাগল না, আমার জন্য তোমার এতটুকু মায়া হল না?

কৈকেয়ীর দু'চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঈষৎ বিস্মিত মুখে ভরতের দিকে তাকিয়ে সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল তার অস্বস্তিকে। আর মনে মনে অবিরাম সে তার প্রশ্নের জবাব খুঁজছিল। স্নেহের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এখন সে একটা আত্মঘাতী দাহে জ্বলছে। কৈকেয়ী এখন নিজের কথা ভাবছে না, ভরতের কথা ভাবছে। ভরত তাকে কেন বুঝতে চেষ্টা করছে না? কেন মনের এই জিজ্ঞাসার জানলায় দাঁড়িয়ে কৈকেয়ী বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার কাছে সরে এল। ঠোঁট কাঁপছিল। চোখ জ্বালা করছিল। গম্ভীর গলায় বলল ;মায়ার থেকে তোমার অধিকার রক্ষার দায়িত্ব আমার কাছে বড় ছিল। মায়া করলে সে চেষ্টা করা যেত না। পুত্র, সংসার বড় নিষ্ঠুর জায়গা। সেখানে স্বার্থই সব। তোমার পিতা অবিমিশ্র আর্যরক্ত সংস্কারের বশে রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর পুত্র বলে গ্রহণ করেছিল। আর তোমরা হলে তাঁর স্নেহবঞ্চিত এক দুর্ভাগা সন্তান। মহারাজার কাছে রামচন্দ্রের স্বার্থ ছিল বড়। আমার কাছে তোমার স্বার্থ বড়। এর মধ্যে বিবেকের কথা আসবে কেন? অযোধ্যাপতিকে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে বলে কি অন্যায় করেছি? পিতার বাক্য ও প্রতিশ্রুতির যথোচিত মর্যাদা দেওয়া তো পুত্রের কর্তব্য। রামচন্দ্রের বনে যাওয়া, তাই কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। এসব ঘটনায় তুমি উতলা হচ্ছ কেন? যা সত্য তাই তো ঘটেছে। তবু দুঃখু কেন? মনে রেখ, সত্য সব সময় গৌরবের হয় না। মহারাজের সত্যভঙ্গ ঠেকাতে আমার কঠোর হওয়াটা মোটেই গৌরব হানি হয়নি। কিন্তু সত্যটা প্রকাশ হয়েছিল। সোনার অযোধ্যা আমি ভাঙতে বসিনি, একে শ্রীহীনও করেনি। তবু মানুষ নানারকম স্বার্থে আমার নামে অপবাদ দিচ্ছে। এটা যে সত্যি নয়, তোমারও বুঝতে হবে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার কথা তোমার ভ্রাতৃত্ববোধে ও পিতৃত্ববোধে সংস্কারে ঘা খাচ্ছে। তাই, তোমার দ্বিধা ও সংশয়। কিন্তু সেই মিথ্যে সংস্কারকে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সত্যকে অস্বীকার করলে তোমার গৌরব বাড়বে না। বরং পদে পদে বিপদ বাধা আসবে। তুমি একবার দুর্বল প্রতিপন্ন হলে খেলার বস্তু হয়ে ওঠবে না। সাবধান!

আজ বুঝতে পারছি সংঘর্ষ কেন হয়। মানুষ হয় দু'রকমের। একদল শান্তিতে থাকতে চায়, আর একদল লোক চায় প্রভুত্ব। এরাই নেয় দেশ পরিচালনার ভার। সমস্ত কিছুকে নিজের কর্তৃত্বে আনতে চায়। ফলে সংঘর্ষের উৎপাতে জীবন ঘুলিয়ে যায়। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, এক ধর্মের সঙ্গে অন্যধর্মের সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে এইসব ক্ষমতালোভী ধনলোভী মানুষ জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশকে ক্রীতদাস করে। নির্যাতিত করে। সংঘর্ষ ধর্মে আর ধর্মে হয় না, হয় মানুষে মানুষে। ইতিহাস কোন রাজা বা রাজপুত্রের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দ্যূতক্রীড়া হতে পারে না।

তুমি চিরকাল আবেগপ্রবণ বিবেকবান, সরল, কল্পনাপ্রিয় বাস্তব বুদ্ধিহীন এক আশ্চর্য সুন্দর পুত্র আমার। তোমার আয়ত চোখেব উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে তেজোময় ব্যক্তিত্ব, আত্মিকশক্তির আভাস। তুমি বীর। রাজা এবং নেতা হবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মেছ। কেকেয়রাজ্যে তোমার কার্যের জন্য তুমি সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। জাতি ও ধর্মের পরিত্রাণের, জন্য জাতিনির্বিশেষে তুমি সকল কেকয়বাসীকে একমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছ। এটাই ছিল তোমার পিতার দুর্ভাবনার বিষয়। অযোধ্যার মাটিতে সেরকম কোন বীজ থেকে যদি তার চারাগাছ জন্মায় তা হলে অযোধ্যায় আর্যত্বের অভিমান বিপন্ন হবে। এই ভয়ে তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক হয়নি। তোমাদের দু,ভাইয়ের মধ্যে তার একটা ব্যবধান তিনি তৈরি করেছিলেন। রামের মনে এই বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত। তার শিক্ষাই সেজন্য দায়ী। রামচন্দ্র কোনদিনই আর্য-অনার্যবোধের প্রাচীর ভাঙতে পারবে না। বরং তার দেয়ালকে আরো শক্ত ও মজবুত করে গড়বে। আমি অনার্য কন্যা হয়ে তা সইতে পারছি না।

কৈকেয়ীর কথায় অসহিষ্ণু হয়ে ভরত বলল ঃ তোমার সামাজিক নীতিবোধ অতি সংকীর্ণ। তাই রামচন্দ্রের মতো ধার্মিক, পুত চরিত্রের লোককে অবিশ্বাস করছ। সবদিক দিয়ে তার মধ্যে ব্যক্তিত্বশালী লোক আমাদের ভারতবর্ষে নেই। তার মত ভ্রাতা পাওয়া গৌরবের। তার বিপক্ষে আমি যাব না।

ভরতের কথায় কৈকেয়ী চমকে উঠল। হঠাৎ একটু দিশাহারা হয়ে পড়ল। বুকের বাঁ-ধারে একটা অবোধ যন্ত্রণা বোধ করল। নিঃশব্দ এক আর্তনাদ বুক থেকে ওঠে এল। হতাশ গলায় ডাকল ঃ পুত্র।

কৈকেয়ীর মুখের দিকে খানিক হতভম্বের মতো চেয়ে রইল ভরত। তারপর আস্তে আস্তে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল : মাগো, কেন বোঝ না মানুষের মনের ভেতর যে দেবতা আছে সে বদলায় না। সেই মনটার উপর দাঁড়িয়ে আছে সমাজ, সংসার, মানুষের সভ্যতা। হঠকারিতা করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। সংসারে থাকতে হলে একটা আপোষ করে চলতে হয়। নইলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না।

কৈকেয়ীর কণ্ঠে আশাভঙ্গের ধিক্কার উৎসারিত হলো। ছিঃ, ছিঃ! কেকয়ের দিগ্বিজয়ী বীর এত ভীরু, কাপুরুষ তো জানতাম না। আমাকে তোমার পুত্র মনে করতে ঘৃণা হচ্ছে। পৌরুষ এবং আত্মসম্মানবোধের নাম মনুষ্যত্ব। কিন্তু তোমার সেই পৌরুষ, মনুষ্যত্ব কোথায়?

মাগো, তোমার ক্ষোভ যেন আগুনের শিখার হয়ে জ্বলছে। স্বার্থ, রাজনীতি, ধর্ম, আদর্শ, দুর্নীতি, সুনীতি সব যেন এক হয়ে তোমার বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তুমি মশাল হয়ে পুড়ছ। তোমার হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলো পুড়ছে। নিজের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছ আর জ্বালাচ্ছ। একেই সত্যের জ্যোতির্ময় মূর্তি ভাবছ। কিন্তু একসময় ইন্ধন ফুরোবে। তখন দেখতে পাবে স্বার্থের অশোভন প্রকাশ তোমাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে। সিংহাসনের জন্য তোমার এই নির্লজ্জ হ্যাংলামি আমার ভাল লাগবে না। তোমার এই কাজের ভেতর আমার মন কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না। আমি কারো করুণা কিংবা কৃপা চাই না, কারও আছে। নিজের চরিত্র গৌরবে আমি সবার পুজো পেতে চাই। ভালবাসার দাবিতে নিঃশেষে সমর্পণ করতে চাই নিজেকে। ভাইর বিশ্বাস ভেঙে তার মনে কষ্ট দিয়ে সিংহাসন, রাজ্য আমি কিছু চাই না। আমাকে তোমার অযোগ্য পুত্র মনে করে ক্ষমা কর।

ভরত আর দাঁড়াল না সেখানে। দ্রুতপদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কৈকেয়ী স্তব্ধ নির্বাক। মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভরতের কথার সত্যটুকু তার হৃদয় স্পর্শ করল। চোখের দৃষ্টির দিয়ে যে আগুনের ঝলক বেরিয়ে ছিল হঠাৎ তার তেজ যেন দপ্ করে নিভে গেল। কৈকেয়ীর মুখে চোখে বিহ্বলভাব।

কৈকেয়ী বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কি। ভরত রাজা হবে এই প্রস্তাব তার ভেতরে যে রোমহর্ষ রহস্যময় আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল তা এক ফুৎকারে নিভে গেল। তীব্র অপমান, লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার মুখ চোখ।

ভরতের ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ কি? একটা চক্রান্ত! একটা গণ্ডগোল! অথবা একটা অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা কি তার মনে জাগল? নইলে, সিংহাসনে অভিষেকের কথা শুনে অমন সাদা হয়ে গেল কেন? অমন বিমর্ষ দেখাল কেন? একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল কৈকেয়ীর মনে।

মন্থরা শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ভরত অভিষেক রাজি হলো না। রামচন্দ্রের অভাব অযোধ্যাকে শ্রীহীন করল। সমগ্রপুরী নিরানন্দ। রাজধানীতে ভরতকে নিয়ে জল্পনা কল্পনার বিরাম ছিল না। শুধু অযোধ্যায় নয়, সমগ্র আর্যাবর্তে সে এখন সর্বাধিক সমালোচিত ব্যক্তি। বিতর্কিত মানুষ। তাকে নিয়ে জলঘোলা হলো অনেক। রাজনৈতিক ঘোলাজলে অবগাহন করে সিংহাসনে বসতে ভরতের রুচি, শিক্ষা এবং বিবেকে বাধল। রাজ্য ও সিংহাসনের ঘূর্ণাবর্তে তার হৃদয়দেশ অস্থির হলো। অস্তিত্বের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। একদিকে মানুষের সন্দেহ, অবিশ্বাস ঘৃণা, ভাগ্যের কলঙ্ক, নিয়তির অভিশাপ, অন্যদিকে জাগ্রত বিবেক, মহান ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃসত্য জননীর আকুতির মধ্যে এক প্রবল সংঘাত উপস্থিত হলো। এরকম দারুণ চিত্ত সংকটে ভরত কখন পড়েনি জীবনে।

কর্তব্য নির্ণয়ে ভরতের কোন সংশয় ছিল না, বাইরের প্রবল চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা দিতে হলো যেন। বারংবার মনে প্রশ্ন জাগল : স্বার্থের লোভে জননী কৈকেয়ী এ কোন পাতালে নামল? জননীর সঙ্গে তাকেও পাতালে নামতে হলো। মাতা পুত্রের ভাগ্য গর্ভস্থ শিশুর মতো চিরকাল কি একসূত্রে বাঁধা থাকে? মায়ের কর্মফলের পরিণাম পুত্রকে ভোগ করতে হয় কেন? রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে কোন মুখে মায়ের ইচ্ছেতে তার স্বপ্নের সিংহাসনে বসাবে সে? জননী তো

কোনদিন সংকীর্ণমনা ছিল না? তার মতো অসাধারণ জননী বিরল। রামচন্দ্র তার নিজের পুত্রের চেয়ে অধিক প্রিয়। তাই রামচন্দ্র তার নির্মল জননীত্বকে সন্দেহ করেনি। তবে, কার প্ররোচনায় জননী এমন বিবেকহীন হলো? কে সে? নিজ পুত্রের স্বার্থের দাবি মেটাতে গিয়ে অযোধ্যাকে সে নিঃস্ব রিক্ত করে ফেলল। রামের অভাবে অযোধ্যাবাসী শুধু নিরানন্দ নয়, নিজেকে তারা অবলম্বনহীন মনে করতে লাগল। নিরাপত্তার অভাব বোধ করল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ছবি তাদের মনে ছিল না। উদ্বিগ্ন অসহায়তাবোধে তারা কিছুটা অশান্ত। এরকম একটা ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক এবং মানসিক অস্থিরতার মধ্যে সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে কখনও ভাল হয় না, তাতে তার গৌরবও বাড়বে না। মায়ের আশা পূর্ণ হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সে ভীষণ ছোট হয়ে যাবে। রামচন্দ্র অযোধ্যার জনগণের হৃদয়ের রাজা সেখানে থেকে তাকে নির্বাসিত করার সাধ্য নেই কারো। আর সে ইচ্ছাও তার মনে কখনও জাগেনি। কেবল বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব বুঝতেই চিন্তাসূত্রে কথাটা মনে এল মাত্র।

রাজা হওয়ার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা ছিল রামচন্দ্রের। কোনোকালে এসব স্বপ্ন দেখেনি। কোন উচ্চাশা নিয়ে রাজনীতিও করেনি। তুচ্ছ ক্ষমতালোভের উন্মাদনায় পারিবারিক কলহে ইন্ধন দিয়ে সিংহাসনে বসার নোংরা রাজনীতিতে তার রুচি নেই। আপন কুলের গৌরব হেঁট করে দিয়ে ভরত কোন রাজকীয় গৌরব, মর্যাদা চায় না—এই কথাটা অনেক দাম দিয়ে লোককে জানাতে হবে তার।

জননী কৈকেয়ীকে হতাশ করতে ভরতের খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সে নিরুপায়। অযোধ্যায় সিংহাসন তার কাছে শৃঙ্খল। জেনে শুনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করতে পারবে না। মাতৃ আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে নিজেকে শুধু কষ্টের শৃঙ্খলে বাঁধা। বন্ধন মানে বিড়ম্বনা আর যন্ত্রণা। কিন্তু জীবন বন্ধন স্বীকার করার নয়। বন্দীত্ব জীবনের অভিশাপ। জীবন মানে চলা। ঝর্নার মতো অফুরান চলা। সে চলা হবে অনন্ত। কখনও থেমে থাকবে না। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য থাকবে তাতে। দুহাতে আনন্দের ধন বিতরণ করতে করতে রাজর্ষির মতো চলবে। তবেই সে চলাতে অবসাদ থাকবে না। রামচন্দ্র এমন করে চলতে আরম্ভ করেছিল। সংগ্রামী যোদ্ধার মতো রাক্ষসদের ভয় ভীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সে যাত্রা শুরু করেছিল। চলাতেই রামচন্দ্রের আনন্দ। তাই বিমাতার দেওয়া বনবাসের দুঃখ, দুর্ভোগের কষ্ট তার চলার পথে বাধা হলো না। মুক্ত পুরুষ নির্বিকারচিত্তে মায়ের নির্বাসনকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করল। আশাহত হওয়ার দুঃখ, বঞ্চনার কষ্ট তার চিত্ত ভারাক্রান্ত করল না। কারণ সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কৈকেয়ীর উপর তার কোন রাগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, অভিযোগ কিছুই ছিল না। রামচন্দ্র মহান। অসাধারণ এক আশ্চর্য মানুষ। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভরতের মাথা নুয়ে গেল।

রামের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে এমন একটা জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো তাকে দাঁড়াতে হয়নি। তাই একটা জিজ্ঞাসার আর্তি ছিল তার অন্তরে। নিরপেক্ষ বিচারে জননী তার একা দোষী নয়, পিতার মতো রামচন্দ্রও দোষী। এই জটিল সংকট রামচন্দ্রের ভুলে এবং লোভেই হলো। জননীর প্রতি রামচন্দ্র যথেষ্ট উদার হতে পারেনি। জননীর মাতৃত্বের অভিমান তার জন্যে পীড়িত হয়েছিল। সিংহাসনের অভিষেক বার্তা রামচন্দ্র যদি নিজের মুখে কৈকেয়ীকে জানাতো তা হলে এই বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হতো না। রামচন্দ্র বিবেচক, জ্ঞানী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী হয়েও ক্ষমতা লোভ জয় করতে পারেনি। রাজ্যলোভীর এই কলঙ্ক কোনদিন তার চরিত্র থেকে মুছবে না। তার সব ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, মহত্ত্বের উপর চাঁদের কলঙ্কের মতো ঐ দাগটুকু অম্লান থাকবে। তবে কি নিজের কলঙ্ক গোপন করতে রামচন্দ্র বনবাস মেনে নিল? না অন্য কিছু?

রামের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিণতি কী, ভবিষ্যৎ কী—এই নিয়ে তার মনে নানা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগল। বাইরের সঙ্কট জনরোষ. রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির আঘাত যেন তাকে তাড়া করে আসছিল। যা তার মনকে অজ্ঞাত ভয়ে অস্থির করে তুলল। তাই ভরত নিজেকে প্রশ্ন করল ঃ রামচন্দ্রের এই যাত্রা কিসের? পিতার সহস্র বাধা নিষেধ, আপত্তি তুচ্ছ করে, প্রজাদের ব্যাকুল আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, মরণাপন্ন পিতাকে ফেলে রেখে রাম বনগমন করল কোন স্বার্থে? তার উদ্দেশ্য কী। কোথায় তার গন্তব্য? এই সব জিজ্ঞাসার রহস্য ভেদ করতে অসমর্থ হলো ভরত। রামচন্দ্রের প্রতি প্রেম ও ভয় যুগপৎবোধের দ্বারা তার চিত্ত আচ্ছন্ন। স্থান ও কাল এবং পরিস্থিতি এই মুহূর্তে রামচন্দ্রকে তার

জীবনে নিয়তির এক অলঙ্ঘ্য সঙ্কেত রূপে মনে হল। রামচন্দ্র একটু উদার আর বিবেচক এবং দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হলে বোধ হয় এই বিপদ বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যেত। বৃদ্ধ পিতার প্রতি সে তার যথোচিত কর্তব্য করেনি। অন্তত তাঁর কথা চিন্তা করে বনগমন বিলম্ব করতে কোন বাধা ছিল না। তার এবং শত্রুঘ্নের আগমন পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করত উল্টোপাল্টা ঘটনা আর হতো না। তবে কি রামচন্দ্র এই বিপর্যয় মনে মনে চেয়েছিল? বিপাকে ফেলে তাকে শাস্তি দেবার জন কি এই আয়োজন? রাম সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথা তার বুকে বিস্ময়ের ঢেউ তুলল। আর অভাগিনী জননীর কথা মনে পড়ল। ভরত এই প্রথম সহসা নিজের অজ্ঞাতেই জননী সম্পর্কে একটি আবেগ অনুভব করল বুকের ভেতর। আর কেমন একটা অপরাধবোধে চিত্ত পীড়িত হতে লাগল।

ভরতের অপরাধ বিমর্ষ চোখে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। অসহায়তা এত গভীর যা ক্রমে তাকে অযোধ্যার পরিস্থিতির মধ্যে টেনে আনল। রামের বনগমন কিন্তু কৈকেয়ীর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। যে জয়ের জন্য জননী লালায়িত সেই জয় পতাকা অত্যন্ত অবহেলায় জননীর হাতে দিয়ে বিজয় গৌরবে সে বনে যাত্রা করল। হাসিমুখে নিজেকে রাজসুখ, ঐশ্বর্য, বিলাস, আরাম থেকে বঞ্চিত করে বনবাসের অশেষ দুঃখ, কষ্ট, সহ্য করার যে মনোবল, দৃঢ়তা দেখাল তাই রামচন্দ্রকে এক মহান মানুষ করল। তার ত্যাগ সুন্দর। সংযম, কঠোরতা অসাধারণ। বনযাত্রা যেন সকল বন্ধন থেকে মুক্তি, বেপরোয়া, দুর্নিবার। রামচন্দ্রের দৃঢ় মনোবল, কঠিন কর্তব্য, অসাধারণ ত্যাগ সীমাহীন সহিষ্ণুতা ভরতের চোখে এমন রহস্যময় হয়ে ওঠল যে ত্যাগের আদর্শের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নেওয়ার কথা মনে হলো বারংবার। তার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়, এক গভীর অনুভূতিতে বেঁচে ওঠার মতো মহিমান্বিত হয়ে উঠল।

নিঃশব্দে অমাত্যবর সুবীর ভরতের কক্ষে ঢুকল। খোলা জানলার দিকে মুখ করে ভরত প্রকৃতি দেখতে মগ্ন ছিল। সুবীরও আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশের উঁচুতে বিন্দু বিন্দু কয়েকটা পাখি। প্রাসাদের পশ্চিম দিকে এক ফালি অপরাহ্নের রোদ।

ভরত কি ভেবে ঘাড় ফেরাল। সুবীরকে দেখে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে চমকিয়ে উঠল। মুখে সৌজন্যের হাসি।

সুবীর একটুও অবাক হলো না ভরতের আচরণে। চিরকালই সে এইরকম। ভরতের হাবভাব কেমনতরো। মুখটা শুকনো। চোখের চাউনিতে গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসা। সুবীরকে দেখে ভরতের কুঞ্চিত ভুরু সটান হলো। সুবীর তীক্ষ্ণ চোখে ভরতের হাবভাব লক্ষ্য করছিল। ধীরে ধীরে বলল ঃ রাজকুমার নিদারুণ কষ্টে কাটছে আপনার দিনগুলো। আপনার ঐ করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু অনেকদিন হলো। এতদিন নিজের মনেই কথাগুলো রেখেছিলাম। এখন একেবারেই না বললে নয়। কর্তব্যবোধে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে। আপনি অনুমতি করলে, নিবেদন করতে পারি।

ভরত স্পষ্ট করে চোখ বড় বড় করে সুবীরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মনে তারও নানা প্রশ্ন জাগে, যা উচ্চারিত হয় বুকের ভেতরে। ভরত ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে বলল ঃ বেশ বলুন।

সুবীর ব্যস্ত ও দায়গ্রস্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : পুরোহিতেরা আপনার অভিষেকের শুভদিন স্থির করেছিল। কিন্তু আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার আমার নেই। শুধু সবিনয়ে বলব, রাজা ছাড়া রাজ্য চলে না, এতো আপনি জানেন। এ রাজ্যের পরিচালনা আপনাকে করতে হবে। কষ্ট হলেও কর্তব্যবোধে রাজ্যচালনার ভার আপনাকে নিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

ভরতের চোখে অপরিসীম বিস্ময়, জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত ভুরু। দাবিসূচক কথাগুলো তার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হয়। চোখে মুখে বিব্রত লজ্জা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ভরতের অভিব্যক্তি অনুমান করতে সুবীরের কষ্ট হলো না। কিছু বলার আগেই সুবীর তার বক্তব্যকে কিঞ্চিত অপ্রতিভতায় সংশোধন করে নিচু স্বরে বলল : আপনার দ্বিধা কোথায় আমি জানি। কিন্তু কর্তব্যে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া ঠিক নয়। নীতিতে ভীষণ কঠোর আপনি। সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে তা আর পরিবর্তন করেন না, আমি জানি। তবু কি জানেন, ত্যাগী নির্লোভ চরিত্রের মানুষেরা স্বভাবত হৃদয়বান হয়। সব পরিস্থিতিতে তারা নির্দয় হয় না।

প্রশংসা এমনি এক জিনিস যা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকেও দুর্বল করে। ভরতের গৌরবর্ণ মুখে রক্তের ছটা লেগে যায়। চোখে মুখে একটা বিব্রত লজ্জার ভাব ফোটে। চোখের পাতা নত হয়। তাকিয়ে

থাকতে পারে না সুবীরের দিকে। সুবীরের দৃষ্টিতে চতুর হাসির অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি। চকিতে গলার স্বরে একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। গলাটা ভারী ভারী করে বলল : না, না, আমি আপনার স্তুতি করছি না। তাতে আমার লাভ নেই। আমি আপনার মন্ত্রণাদাতা কেকয়রাজের প্রতিনিধিমাত্র। স্তুতি আপনাকে বিচলিত করবে না সেও জানি। চিরকালই আপনি না বৈরাগী, না সংসারী। আপনি যে কি চান স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না। মানুষ হিসাবে আপনি আমার নমস্য। কিন্তু রাজনীতিতে কঠোরতা ও বাস্তবতা আপনার চেয়ে আমি বেশি বুঝি একথা বলার অধিকার আমার আছে। কিন্তু মানুষের মনের গতিপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মন রাখা রাজনীতির কলাকৌশল নির্ণয়ে আপনার দক্ষতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। আপনাকে কথাতে ভোলাবো এ স্পর্ধা করি না।

ভরত সুবীরের স্পষ্ট ভাষণের চমৎকৃত হলো। উদ্দীপ্ত চোখে চমকানো শঙ্কা অপসারিত হলো না। নিজের সত্তার গভীরে অবগাহন করে মন্দ্রিত স্বরে বলল : মহামাত্য যে অনুভূতি ক্ষমতার উত্তাপে ঘুমন্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো জাগিয়ে তোলে তার প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে উন্মাদ না করাই ভালো। আমি সিংহাসন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাই। অযোধ্যার স্বার্থ কেমন করে নিরাপদ করা যায় তার কথাই বলুন।

রাজকুমার বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে আপনার ভাবপ্রবণতা শোভা পায় না। পরিস্থিতির কঠোর সমালোচক হয়ে নিরাবেগ চিত্তে রাজনৈতিক সঙ্কটকে বিচার করা উচিত।

ভরতের মনে হলো সুবীরের কথাগুলো অতি স্বাভাবিক এবং অনিবার্য, তথাপি, সে গভীর কাতরতা বোধ করল। কারণ এ জিজ্ঞাসার জবাব তার জানা নেই তা নয়, তবে বলতে পারছে না। তাই না বলার কাতরতা তাকে ব্যথিত করে তুলল। স্তিমিতি স্বরে বলল ঃ জননীর ইচ্ছের সঙ্গে আমার যে সংঘাত ভয়ে নয়, কর্তব্যবোধে। আমাদের ভায়ে ভায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন এতই দৃঢ় যা আমার মনকে রামচন্দ্রের দিকে প্রবলভাবে টানছে।

সুবীর নিঃশব্দে হাসল। বলল : কুমার, আপনি অযোধ্যার জনরোষ এবং ষড়যন্ত্রের ভয়ে সিংহাসন গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। কিন্তু আপনার ভয় কাকে? কেকয়ের চতুরঙ্গ বাহিনীর আপনার সাহায্যে প্রস্তুত। এছাড়া অযোধ্যার নিজস্ব সৈনিক আছে। তারাও রাজাদেশ মানতে বাধ্য। সৈনিকের নিজস্ব নিয়ম শৃঙ্খলা এবং আনুগত্যবোধ তাদের অন্তরে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এ ভীতি আপনাকে মানায় না।

সুবীরের কথায় চমকাল ভরত। তার মুখের উপর জবাব দেবার মতো কোন কথা তার ছিল না। নির্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুবীরের দিকে। কিছুক্ষণ পর তার চোখের পাতা নত হলো। মনেতেও একটা ভয় ক্রিয়া করছিল। মুখে প্রকাশ না করলেও অস্বস্তিতে তার বুক খামচার্চ্ছিল। সুবীরের চিন্তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল : মানুষের লোভ, মোহ, ভোগ, অধিকার, সুখের কামনা, ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা, ধনের লালসার অমীমাংসিত রহস্যের কোনকালে মীমাংসা হবে না। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, বৈরিতা, বিশ্বাসঘাতকতা। এসব ছোট স্বার্থের সংঘাতে গোলমাল বাধে। পদে পদে স্খলন অনিবার্য করে তোলে। তখন মহাকাল তার বিচার করে কঠিন দণ্ড দেয়।

সুবীর একটু চুপ করে থেকে বলল : মহাকালের কালদণ্ডের ঘূর্ণিপাকে আপনি জন্ম থেকে এমন জড়িয়ে আছেন যে তা থেকে মুক্তির পথ বুঝি আর খোলা নেই।

সুবীরের দিকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ভরত। লোকচরিত্র অনুধাবনের অভ্যাস তার নেই। তবু, তার মুখ দেখে তার চরিত্র ও প্রকৃতির অভিব্যাক্তি বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল : আপনার কথার তাৎপর্য কিছু বুঝতে পারলাম না।

পারার কথা নয়। নিঃসঙ্কোচে বলার অনুমতি পেলে তবে, জানাতে পারি।

ভরত একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গাঢ় স্বরে বলল: অযোধ্যার সিংহাসনের উপর মোহ সৃষ্টি হয় এমন কোন কথা আমায় বলবেন না।

সুবীর একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল। অধর প্রান্তে ফুটে উঠল একফালি রহস্যময় হাসি। বেশ বুঝতে পারল ভরতের মনের মধ্যে রাম সম্পর্কে এমন কিছু প্রত্যয় শিকড় গেড়ে বসেছে যা সহজে ওপড়ানোর

নয়। তার শিকড় রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধের একটি আবেগে। তবু অসন্তুষ্ট হলো না সুবীর। নিজের অজান্তে কেবল ভুরু কুঁচকে গেল। সুবীরের মনে হলো, ভরতের ভ্রাতৃত্ববোধের আবেগকে সরাসরি ঘা দেওয়া ভাল হবে না। তাই একটা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য খুব নিরীহভাবে বলল : আপনার মাতার প্রার্থনা নির্মল। তবু ভর্ৎসনা তিরস্কার তাঁর ভাগ্যের লিখন। মহিষী কৈকয়ী লোভের বশবর্তী হয়ে রামকে বনবাসে নির্বাসন করেছেন এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। তবু মায়ের প্রতি আপনার নিজের কর্তব্য সম্পাদন করলেন না। কিন্তু রাজকুমার রামচন্দ্র বনযাত্রার প্রাক্কালে জননীর প্রতি পুত্রের সমুচিত কর্তব্য করে গেছেন। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতির সময় মহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রা নিরাপত্তা ও তাদের দেখাশোনার ভার অর্পন করলেন বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের উপর।

ভরত প্রায় বিষণ্ণ স্বরে বলল : আপনি আমাকে এরূপ শ্রুতিকটু কথা বলে পরিতাপিত করবেন না। আমি আবার বলছি, আমার রাজ্যভিষেক ও রামের বনবাস বিষয়ে জননী যা করেছে তাতে আমার অনুমোদন নেই। তাই তাঁর কোন কথাই স্বীকার করতে পারছি না।

সুবীর খুব একটু মলিন হেসে চোখ টান টান করে বলল : রামচন্দ্রর ভ্রাতৃভক্তি আপনার মতো উঁচুদরের নয়। তিনি কল্পনাপ্রবণ আবেগপ্রবণ মানুষও নন। কঠিন বাস্তবজ্ঞান তাঁকে কিছু রূঢ় ও সচেতন করেছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে। রাজপ্রসাদে কাউকে বিশ্বাস করেন না তিনি। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আগাম দান হিসাবে দিয়ে নিজের মনোমত চর নিযুক্ত করেছেন। বশিষ্ঠ পুত্র সুযজ্ঞের উপর মহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে দেখাশোনার ভার দেবার ছলে তাকে রাজপ্রসাদে রাখলেন গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। বনগমনের প্রাক্‌কালে দুঃখী দরিদ্র প্রজাদের প্রচুর ধনরত্ন বিলিয়ে তাদের হৃদয় জয় করলেন সে শুধু কুমার সম্পর্কে তাদের মনে বিদ্বেষে বীজ বপনের জন্য। রামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুমার ভরতের নিন্দায় নিন্দায় মুন্ডুপাত করেছে তারা। আপনি সুখে শান্তিতে রাজ্যপরিচালনা করুন, রামচন্দ্র এটা চান না। তাই অশান্তির বীজ বপন করে গেছেন অযোধ্যার মাটিতে। আপনার সঙ্গে একটা কুটনীতি লড়াই যাতে অব্যাহত থাকে রামচন্দ্র তার সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন করে গেছেন। আপনি বৃথাই মায়া মোহে কষ্ট পাচ্ছেন।

ভরত অবাক হয়, চমকায়। কিন্তু কথা বলতে পারে না। চোখে মুখে একটা ভয় ফুটে উঠল। মনে একটা কষ্ট হতে লাগল। বিশ্বাসের আঘাত লাগে বলে ভুরু কোঁচকাল। নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসায় তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। গলাটা ভারী শোনাল। বলল : মহামাত্য সুবীর। আপনি কি এই সংসারটাকে এক ভয়ঙ্কর জঙ্গল করে তুলতে চান? এতে আপনার কি লাভ? অস্বাভাবিক কোন কথা বলা আপনার শোভা পায় না।

সুবীর ভরতের মৃদু ভর্ৎসনা বাক্যে বিমর্ষ হলো। বিব্রত হয়ে বলল : কুমার আপনি রাজপুত্র। রাজনীতি আপনার রক্তে। রাজনীতিতে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই, আদর্শবাদের কোন মুল্য নেই। আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে আসলে আপনি ভয়, ভীরুতা ব্যাক্তিহীনতাকে ঢাকতে চাইছেন।

মহামাত্য। ভরতের কণ্ঠে ভয়ঙ্কর ক্রোধ গর্জে উঠল।

রাজকুমার! যে বীর, যার যোগ্যতা আছে সে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ন্যায় ধর্ম রক্ষা করে। আপনার অবগতির জন্য বলি যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছে তাতে যদি হার স্বীকার করেন তা হলে পরাজয়ের পরের দিনগুলি ক্লান্তি আর অবসাদ আনবে।

আমি ক্ষমতার লড়াইয়ের জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী নই। জিতবার কোন আগ্রহও নেই আমার। আপনি দয়া করে আমাকে উত্তেজিত করবেন না।

আপনার উত্তেজিত করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জন করেছেন মান, যশ, সুনাম। তাকে এরকম কয়ে নয়-ছয় করছেন এই কষ্ট ভুলতে পারছি না।

মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা, প্রেমের এখনও মৃত্য হয়নি মহামাত্য সুবীর। এসব হত্যা করে আমি রাজনীতির জন্য রাজনীতি করতে চাই না। আমি অযোধ্যায় ইতিপূর্বে কোন রাজনীতি করেনি। তাতে অযোধ্যার কোন ক্ষতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু জননী যেই সিংহাসন চাইল, অমনি গোলমাল বাধল। অথচ তারে আগে পর্যন্ত পিতা সুখে রাজত্ব করছিল। রামচন্দ্র পরমানন্দে দেশ সেবা করছিল।

কোথা থেকে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসে সব কিছু গোলমাল করে দিলাম। রাজনীতি আর নয়।

কুমার, জননীকে দুঃখ দিয়ে কেউ কোন দিন বড় হয় না।

আশ্চর্য মানুষ আপনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার প্ররোচনা সত্ত্বেও রাজনীতি আমার সবটুকু সত্তা গ্রাস করিনি। আপনি এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয়ত আমি দানব হয়ে উঠব। আপনার মতো বিপজ্জনক মানুষের এস্থানে থাকার কোন অধিকার নেই। এখনি এরাজ্য ত্যাগ করে চলে যান। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

দশরথের অন্ত্যেষ্টির পর চোদ্দ দিন কাটল, এর ভেতর ভরত শত্রুঘ্নের কেউ একবারও কৈকেয়ীর কক্ষে এল না। তাদের সঙ্গে দেখাও হলো না কৈকেয়ীর। অথচ প্রতিদিন কৈকেয়ী তাদের আশায় আশায় দিন কাটায়। তারা কেমন আছে, কী করছে কে জানে? লোকজনের কাছে মায়ের-প্রাণ খবর নেয়, কিন্তু তাতে মন ভরে না। চিন্তাও যে ঘোচে তাও নয়। স্পর্শকাতর মনটি তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। অথচ, সেকথা কারোকে জানানোর মানুষ নেই। মন্থরাকে শত্রুঘ্ন কেকয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সে সঙ্গীহীন। একা। ভীষণ একা। তার নিঃসঙ্গতার কেউ সাথী নেই। একা একা এক অন্ধকুপের ভেতর সে তলিয়ে যায়। তখন আর কোন আত্মজন বা সুহৃৎকে নয়, নিজের অদৃষ্টকে মনে পড়ে।

অপমানবোধের কষ্ট যেন বুকে থাবা গেড়ে বসে। তীক্ষ্ম নখ বিঁধিয়ে যন্ত্রণা ছড়ায়। অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। দু'হাতে বুক চেপে ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলে। পায়ের আঙুল শক্ত করে মাটি চেপে ধরে মনের কষ্ট দমন করে। সমস্ত শরীরে একটা কষ্টের ঝাপ্টা তাকে মাঝে মাঝে নিশ্চল করে দেয়। কখনও তার জ্বালায় অস্থির হয়ে ছটফট করে ঘরময়। অনুভূতি জুড়ে তোলপাড় করে ভরত সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন। ভরতের এধরনের মাতৃ অবজ্ঞা কেবল অবিশ্বাস্য নয় চিন্তার অতীত। ভরতের এ স্পষ্ট পশ্চাদপসরণের পশ্চাতে আছে তার দায়গ্রহণের অস্বীকৃতি। ভরত ছোট থেকে সব তাইতে কেমন নিস্পৃহ উদাসীন। তার চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে কোনদিন নিজেকে মেলাতে পারেনি সে। বোধ হয়, তার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য এরকমটা হয়। মাতা পুত্রের মনের গ্রন্থিবন্ধনটা দৃঢ় এবং মজবুত হয়নি তার। একটা আহত বিষণ্ণতা তার প্রাণ জুড়ে বিরাজ করতে লাগল।

ভরতের মুখখানা অকস্মাৎ চোখের উপর ভেসে ওঠল। অমনি বুকের ভেতর কেমন হু হু করে ওঠল। তাকে একান্ত বুকের কাছে পেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে তার আপন জগতের মধ্যে এমন লুপ্ত হয়ে আছে যে একটা আড়াল তাকে ঘিরে থাকে, যাকে ভেদ করা কিংবা স্পর্শ করা যায় না। জননী হয়ে পুত্রের স্বভাব ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ জানতে না পারার একটা লজ্জা তাকে সঙ্কুচিত করল। মুখে বিব্রত অপরাধবোধের ছায়া পড়ল। কৈকেয়ীর মনের বিষণ্ণতা দুঃখে রূপান্তরিত হল।

কিন্তু চলমান মুহূর্ত মনের উদ্বেগকে আরো গভীরতর করল। নির্জন কক্ষের স্তব্ধতা, একাকীত্বকে আরো ভয়ঙ্কর করল। নিজেকে এক অদৃশ্য বন্ধনের ক্রীড়নক মনে হলো। দারুণ একটা কষ্ট দীর্ঘশ্বাস হয়ে যেন বুক থেকে বেরিয়ে এল। কণ্ঠস্বরে তার হাহাকার বাজল। ভরত! শত্রুঘ্ন! তোরা কোথায়?— আর্তকান্নার স্বরে বলল : ভরত! তোর অবহেলায় আর অবজ্ঞায় আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল! তোর ভাল করতে গিয়ে আমি সব হারিয়ে বসে আছি। বোধ হয়, তোদের দু ভাইকেও।

কৈকেয়ীর দৃষ্টির কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হয়, নাকের হীরা কেঁপে যায়। জিজ্ঞাসার অভিব্যাক্তি ফোটে বোবা ঠোটে। আটকে যাওয়া স্বরকে মুক্ত করার জন্য জানলার কাছে যায়। নিঃশ্বাস ফেলে নির্বিকার প্রকৃতিতে জিগ্যেস করে : কি অপরাধে এত কষ্ট দিচ্ছ? আমার দুঃখ বেদনাকে এত বড় করে তুললে কেন?

কৈকেয়ীর অসহায়তা এত গভীর যা ক্রমে তা পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে এবং জীবন সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা দেয়। জীবনের গতি সরলরেখার মতো নয় ; সর্পিল। তার অজ্ঞাত বাঁকের মুখে ভরত এক বিস্ময়ের চকিত হুঙ্কার। সন্তানের উপর মায়ের অধিকারবোধের দাবি কখনো তার প্রানের মূল ধরে নাড়া দিল না। পরিবর্তে মায়ের প্রতি তার একধরনের বিজাতীয় ঘৃণা অবিশ্বাস তার প্রাণেতে

এত গভীর দাগ কাটল যে জননীকে হৃদয় থেকে নির্বাসিত করতে একটুকুও কষ্ট হলো না। এই আবেগের গভীরে ডুবে নিঃশব্দে মাথা কোটে সে।

ব্যর্থতাজনিত অপমান আর বিষাদ তার মাথায় ভেতর অনুভূতির ভেতর কি যেন কুরে কুরে খেতে লাগল, আর কৈকেয়ীর সমস্ত বাস্তববোধ ওলোট পালোট হয়ে যেতে লাগল। অথচ, চোখের সামনে যা ঘটে, তাও বাস্তব। হয়তো, অতি ভয়ঙ্কর কিংবা বীভৎস তা। তাই পুরনো বাস্তববোধের সঙ্গে মেশানো যায় না। কোন এক অদৃশ্য থাবা যেন পুরনো বাস্তববোধকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় বর্তমান মুহূর্তে কৈকেয়ী নিজেকেই আক্রান্ত এবং বিপদগ্রস্ত ভাবল : ডাগর চোখ দুটির দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তার ভয়। কৈকেয়ীর অসহায়তা গভীর হয়। তার সমগ্র অনুভূতি অবশ হয়ে আসে। অবচেতনের গভীরে তলিয়ে যাওয়া মনটা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি কি করেছি? কেন এই কলঙ্ক? নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারল না। "না আঁ আঁ" এই তীব্র দীর্ঘ আর্তনাদের সঙ্গে কৈকেয়ীর নিজের কষ্টকে মুক্ত করার প্রয়াসে স্খলিত স্বরে অধিকতর উচ্চ ও দুরন্ত হয়ে উঠল। ভরতের উপর তার অভিমান। নিজের মনে বলল : নিষ্ঠুর। কার প্ররোচনার এমন কঠিন হলো তোর হৃদয়? তোর কি চোখ নেই, মন নেই, অনুভূতি উপলব্ধি কিছু নেই? তুই কি পাষাণে তৈরি? নির্জন কক্ষে তার আকুল কান্না প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নিজের দুঃখে যে মানুষ কত একা ও নিঃসঙ্গ, কৈকেয়ী অনুভব করল। মনেতে প্রশ্ন উদয় হলো তবে কি স্নেহ ভালবাসা মমতা সবই চোখের ভ্রম? সংসারে এর কি কোন মুল্য নেই? মানুষের সঙ্গে জঙ্গলের জীবের তাহলে তফাত রইল কোথায়? নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায় ভয়াবহ অনুভূতি কারোকে বোঝানোর ছিল না কৈকেয়ীর। এ শুধু তার নিজের। নিজের হাতে তৈরি অভিশাপ। একসঙ্গে ইহকাল পরকাল খুইয়েছে। পাপী তাপী হয়ে বেঁচে থাকার ভয়ঙ্কর কষ্ট এক অপরাধে অভিশপ্ত। মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। স্বস্তিও পায় না। একটা কলঙ্কজনক সর্বনাশের ভাবনা তার উদ্বেগকে গভীরতর করে তুলল। বুকের ভেতর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়। দশরথের উপর তার রাগ অভিমান একটা অজ্ঞাত ভয় ও উদ্বেগে দুর্বল হলো তার অন্তঃকরণ। বিস্ময় বিভ্রান্তি অসহায়তায় কৈকেয়ী শিশুর মতো কেঁদে ফেলল। আর্তকান্নার স্বরে বলল : স্বামী! তুমি আমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে। কি কুক্ষণে তুমি কেকয় গিয়েছিলে? তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হতো?

রাতের শেষ প্রহরে কৈকেয়ী ঘুমোলো। সকালে তাকে জাগাল সূর্যের আলো আর পাখির ডাক। কোকিলের ডাকে হু হু করে উঠল তার বুক। খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি তার দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু সে দৃষ্টি স্থির এবং শূন্য। কিছুই নজরে পড়ছিল না। কেবল স্মৃতি ভাসছিল।

নিস্তেজ শরীরে ওঠে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করল কৈকেয়ী। তারপর ধীরে ধীরে দশরথের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিঃশেষ করে দেখল। আবেগে বুক থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখ ভরে গেল জলে। ঠোঁট চেপে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর একটা উচ্ছসিত কান্নার আবেগে সব অর্গল খুলে গেল। মর্মন্তুদ হাহাকারের মতো কণ্ঠস্বরে বাজল : আমার জীবনটাকে তুমিই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিলে? তোমার জন্য আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলেরা পর হয়ে গেল। তুমি ষড়যন্ত্র করে পুত্রদের আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। কেন? আমি তো কোন দোষ করিনি তবে, তুমি নিষ্ঠুর হলে কেন? আমি তোমার কি করিছি? উঃ উঃ—। দশরথের মর্মর মূর্তির উপর মাথা রেখে কাঁদল কৈকেয়ী। অভিমানে তার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল।

দিন রাত্রি কিভাবে কাটে কৈকেয়ী টের পায় না। শূন্যতা যে কতখানি ভয়ঙ্কর আর দুঃসহ হতে পারে নির্জন কক্ষে বসে কৈকেয়ী তা অনুভব করল আর একটা অব্যক্ত কষ্ট মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল তার বুকে। রুদ্ধ অভিমানের তুফান ওঠে। চোখের কোণ জলে ভরে যায়। ফোঁপানীতে কেঁপে ওঠে বুক। লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনে একা একা বকে। স্বামীর মৃত্যু আর রামের বনগমনের জন্য আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হলাম? যার জন্য এইসব করা সে এর মধ্যে থাকল না। তবে, না বুঝে না জেনে এই সব অপ্রীতিকর ঘটনা কেন করলাম? ঐসবের ভেতর কোনদিনই ছিলাম না, থাকতেও

চাইনি, তবু অদৃষ্ট সেখানে এনে দাঁড় করল আমাকে। এ যে কত বড় দুর্ভাগ্য বোঝাই কাকে? যারা সব চেয়ে আমার নিজের তারা কেউ বুঝল না আমার অন্তরের কথা। শুনল না আমার প্রার্থনা। রাগ করে, অভিমান করে আমাকে ত্যাগ করল। কিন্তু আমি যে মা! তারা আমার সাম্রাজ্য, আমার জীবন। সন্তানকে জড়িয়ে মায়ের যত স্বপ্ন, সাধ, সাধনা। মায়ের এই দুনিয়া ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকব? আমার হৃদয় যে তাদের জন্য কেঁদে আকুল হয় সে খোঁজ কি রাখে তারা? দুঃখে, অনুতাপে, অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে দিবসরাত্রি যে জ্বলছি ; তার জ্বালা কি টের পায়? শুনতে পায় আমার কান্না? আমার প্রয়োজন কি তাদের ফুরিয়ে গেছে? অভাগী মাকে দেখতে কি তাদের একবারও ইচ্ছে করে না? কেমন আছে, এই খবরটুকু পর্যন্ত দাস দাসীর কাছে খোঁজ করেনি কোন দিন। আমি কি শুধু ঘৃণার পাত্র ভরতের?

কৈকেয়ী আর স্থির থাকতে পারল না। হু হু স্বরে কেঁদে উঠল। উচ্ছ্বসিত কাতর কান্না তার মর্মন্তুদ আর্তনাদের মতো শোনাল। মাতৃত্বের বন্ধনটা তার যত জ্বালা যন্ত্রণা আর কষ্টের জন্য দায়ী। সে কষ্ট ভীষণ ভয়ংকর এবং মর্মান্তিক। পুত্ররা তাকে ত্যাগ করেছে, সংসারেও তার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের যে প্রয়োজন বলে কিছু আছে তার দাবিও ফুরিয়েছে।

নির্জনে আত্মসমালোচনা করতে করতে তার মনে হলো সে হয়ত ভুল করেছে। হয়ত তার জীবনের যোগ-বিয়োগের ভুল। সংসার থেকে বনে পালিয়ে এ ভুল শোধরানো যাবে না, সংসারে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েই তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার অসাধারণ মাতৃত্বের গায়ে যে কলঙ্ক লেগেছে তাকে মুছে ফেলার প্রায়শ্চিত্ত করে নির্মল শুভ্র মাতৃত্বের গৌরব রক্ষা করবে। পুত্রের সঙ্গে সুখকর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে যা যা করার সব করবে। তার নিজের যন্ত্রণা সকলের কল্যাণ হয়ে সকলকে অভিষিক্তি করুক এটাই এখন একমাত্র কামনা।

বুকের ভেতর নিদারুণ অবহেলার দুঃখ ভুলতে পারে না। অপমান বুকের ভেতর নিরন্তর পাক খেতে লাগল। তার বাদামী রঙের আয়ত দুই চোখে অপলক দৃষ্টিতে কেমন একটা সকরুণ ভাব ফুটল। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন।

ভরতের জন্য সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু পবিত্র মাতৃত্বের গায়ে কলঙ্ক লেপন করে ভাগ্যের কি সুখ হলো? পৃথিবীর সব কিছু বদলে যায়, কেবল কলঙ্ক কখনও বদলায় না। তার ক্ষয় নেই। সে স্থবির। অনন্তকাল ধরে পর্বতের মতো অচল অনড়, তাকে নড়ানো যায় না! প্রকৃতপক্ষে, ভরতের জন্যে সে ছোট হয়ে গেল। পেটের কাঁটার মতো বড় শত্রু আর কে আছে? অথচ জননী হয়ে সে তার ভাল চেয়েছিল, তার শুভ কামনা করেছিল। সে বড় হোক, সুখী হোক, যশস্বী হোক এই মঙ্গল সে চেয়েছিল। কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে তার কোন পাপ কিংবা ছলনা ছিল না। অধর্ম কিংবা অসত্যও নয়। তবু ভরত ভ্রাতৃপ্রীতিবশে এমন আচরণ করল যাতে সত্যবাদিতা পাপ হল। অসত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে বিদ্রোহ করা হল পাগলামি। তাই সত্য মিথ্যা কৈকেয়ীর গন্ডগোল হয়ে গেল। মনের অতলান্ত থেকে বারংবার একটি কথাই তাকে আকুল করল জননীর স্নেহ কি পাপ? মানুষকে ভালবাসা, বিশ্বাস করা পুত্রের শুভ ও মঙ্গল কামনা করা কি অন্যায়? দোষ? অপরাধ! তবু এই মুহূর্তে কৈকেয়ীর নিজেকে দোষী, অপরাধী মনে হল।

তার অপরাধের শাস্তি দিতেই ভরত তার কক্ষে ঢোকে না। এখানে নিজের বিবেকের কাছে বন্দিনী। মনের কাছে নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগে কৈকেয়ীর। দুঃসহ একাকীত্ব তাকে নির্বাসনের যন্ত্রণায় কাতর করে। যেন কেউ নেই তার। এমন কি পুত্র ভরত শত্রুঘ্নও নয়। কিন্তু এই সম্পর্কসুত্রটা জট পাকানোর জন্য তার দায়িত্ব কতখানি সে তো এর বিন্দুবিসর্গও জানত না? তবু সব অপরাধ, দোষ তার হয়ে গেল! সারা জীবন একাই তাকে কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু কেন? আর পাঁচটা মেয়ের মতো সেও স্বামী, সন্তান, সংসার নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজনীতির ঘূর্নিঝড়ে সব ওলোপালোট হয়ে গেল। সন্তানের জননী হওয়ার দিন থেকে তার সূচনা । বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গা শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা এসে তার কাছ থেকে সন্তান, স্বামী, সব দূরে সরিয়ে দিল। অন্যদিকে তেমনি বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা উত্তাল হলো। দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, ভাষার সঙ্গে ভাষার, কালোর সঙ্গে সাদার। তারপর সেই বিরোধ চুপি চুপি এসে ঢুকল পরিবারের ভেতর। বিরোধ বাধল পরিবারের পতি ও পত্নীতে, পিতা ও পুত্রে, ভাইয়ের

সঙ্গে ভাইয়ের। শেষ সংঘাত বাধল মাতাতে পুত্রতে। এ কি কম বিপর্যয়! এই বিপর্যয় ওলোটপালোট হয়ে গেল তার জীবন। এখন শুধু নিজের সঙ্গে নিজের সংঘর্ষ। নিরন্তর সংঘর্ষে তার মনের ভেতর কেমন একটা রূপান্তর চলেছে।

দর্পনের সম্মুখে দাঁড়াল কৈকেয়ীর। এ কী চেহারা হয়েছে তার? একেবারে ভোল পাল্টে গেছে। নিজেরই নিজে চেনা তার দায় হলো। গালের সেই মোহন টোলটা একটা গর্ত ছাড়া আর কিছু নয়। শরীরের কাঁচা সোনার রঙ পুড়ে তামার মতো হয়েছে। চোখের কোণে কালির দাগ। দৃষ্টি নেভা মুখ চোখ থেকে নিদারুণ ঘৃণা, বিদ্বেষ নিঃশেষে মুছে গেছে। তপস্বিনীর মতো দেখাচ্ছে তাকে।

চৈত্রের শেষ। আকাশ নীল। বাতাস স্তব্ধ। গাছপালা শান্ত। প্রকৃতিলোক নির্বিকার। নিশ্চল গাছের পাতারা একটি একটি করে ঝরে গেছে। ডালপালা মেলে কঙ্কালসার কান্ডখানা আকাশের দিকে মুখ তুলে কার জন্য দিবারাত্র প্রার্থনা করছে যেন। প্রকৃতিও তার মতো যোগিনী সেজেছে। বৈরাগীর একতারা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। তার উদাস করা গানের সুরে বাতাস উতলা হয়, পৃথিবী বিরহী হয়। নদীর জলে লাগে ভাঁটার টান। ছোট ছোট ঢেউয়ের বাজে বৈরাগী খঞ্জনী।

বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে কৈকেয়ী পিপাসিত অনুভূতির প্রতি রন্ধ্র দিয়ে গ্রহণ করল প্রকৃতির আশ্চর্য তপস্বিনী মূর্তিকে। সম্মোহিতের মতো স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হতে লাগল, চৈত্রের প্রচন্ড তাপে যেন কোমল অনুভূতিগুলোর রক্ত মাংস নিঙড়ে নিয়ে তাকে বিবেকহীন এক অমানুষ করেছে, তাই রামচন্দ্রের উপর এত নিষ্ঠুর হওয়া তার সম্ভব হয়েছে। একগুঁয়ে হৃদয়হীনতা স্বামীর মৃত্যুকে শুধু শুধু ত্বরান্বিত করেছে। বুকের ভেতর হাহাকার গুর গুর করে উঠল। কিন্তু কৈকেয়ী জোর করে চাপা দিল সেটা। কষ্টটা চাপতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখের অবশম্ভাবী জলটুকু আঁচলে মুছে নিল।

অস্থির কৈকেয়ীর কতবার যে ঘরবার করল তার ইয়ত্তা নেই। বালিশের মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। অপলক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো : চৈত্রের কালবৈশাখী ঝড় সে। আর ভরত রাজগৃহের পুরোন ভিতের মতো। সে বন্য দুরন্ত টগবগে আর ভরত স্থির শান্ত, স্থবির গৃহের মতো। তথাপি, তার স্নিগ্ধ ছায়া আছে; আছে সুনিশ্চিত আশ্রয়। তার শান্ত সংযত ব্যাক্তিত্বের সান্নিধ্যে সব কিছুই নিরাপদ। জীবনের ও স্বভাবের ছন্দপতন করা তার ধর্ম নয়। যক্ষের মতো সে আগলায়; বৃক্ষের শিকড়ের মতো মাটি কামড়ে ধরে ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। আর কৈকেয়ী কালবৈশাখীর প্রমত্ত ঝড়ের মতো রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকস্মাৎ চঞ্চল অস্থির করে তোলে রাজবাড়ির পুরোনো ভিতকে। তার উন্মাদ আক্রমণে শুধু গৃহের ছাদখানা উড়ে গেছে। কিন্তু পুরোনো ভিতের কিছু হয়নি। নির্বিকারভাবে ভরত বাইরের তান্ডব সহ্য করল কিন্তু বিচলিত হলো না।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠল মুখখানা। বুকের ভেতর জ্বালা ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখের কোন অনুভূতি নেই। থেকে থেকে কেবল মনে হতে লাগল : ভরতের শরীরে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত। আর্য ভরত অনার্য বিদ্বেষ নিয়ে অনার্যমাতার উপর প্রতিশোধ নিল, একি তার কম গৌরব! পুত্রের এ গৌরবে সেও একজন অংশীদার! পুত্রের জয়ের গৌরবতৃপ্তিতে কৈকেয়ীর মন উদ্ভাসিত হলো।

এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল কৈকেয়ী, এমন সময় ভরত এল সেখানে। পিছন থেকে ডাকল : মা! মাগো।

ভরতের ডাক শুনে কৈকেয়ীর প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। তার অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। ঘন ঘন বিদ্যুৎচমকের মতো বুকের বুকের ভেতর নানা অনুভূতি, সংশয়, জিজ্ঞাসা ঝলকিয়ে উঠল। আশার নাকাড়া যেন বুকের ভেতর খুব উচ্চরবে বাজতে লাগল। তার শরীর ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো নিমেষে সোজা হয়ে উঠল। পালঙ্ক কাঁপিয়ে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসল। প্রকৃতপক্ষে, বুকের দ্রুতস্পন্দন তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। পড়ি মরি করে পালঙ্ক থেমে নেমে ছুটে গেল ভরতের দিকে। শত্রুঘ্নও ছিল তার পাশে।

কৈকেয়ীর দৃষ্টি স্থির। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। ভরত শত্রুঘ্নের চোখের উপর চোখ রাখতে ঠোঁট কাঁপল থিবথির করে। একটা অশান্ত আবেগের ঘূর্ণি বুকের ভেতর উৎসারিত হয়। মুহূর্তে তা আনন্দ সাগরে রূপান্তরিত হয়ে উথাল পাথাল করতে লাগল। ঢেউ শুধু ঢেউ। সারা শরীরে ঢেউ তুলে ধেয়ে এল যেন। দৃষ্টিতে উদ্বেগের রূপ বদলায়, প্রাণের উদ্বেলতায় ভাসিয়ে দিল সব কিছু।

কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর তার মাতৃত্ব গলে গলে পড়ছিল। আধবোজা দুই চোখ ফেটে অশ্রুর নির্মল সলিলধারা পূতপ্রবাহিনী গঙ্গার মতো ধেয়ে আসছিল। কৈকেয়ীর কান্নার কোন শব্দ ছিল না। কেবল মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ে বুক ওঠা নামা করছিল। চিবুক কাঁপছিল।

জননীর নিঃশব্দ কান্নার ভাষা ভরতের পাঠ করতে কোন অসুবিধা হল না। সে আরো অনুভব করতে পারল ; জননী এবং তারা দুভাই যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ফাঁকটুকু কৈকেয়ী কিছুতে অতিক্রম করতে পারছে না। তার বিমর্ষ মুখে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। ব্যাকুল নয়নে তার আবেদন আর করুণ মিনতি। ভরত আরো অনুভব করল তার দুই ওষ্ঠের ফাঁকে সাজানো দাঁতের সারি যেন প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে তার বুকের ভাষা আটকে রেখেছে। চাহনিতে তার লজ্জা ও আত্মগ্লানির কষ্ট। চোখে অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। একটা মুগ্ধ মুহূর্ত ভরতকে জননীর দিকে টানতে লাগল। অলৌকিক একটা অনুভূতি অজ্ঞাতে মনের মধ্যে নিবিড় হয়ে নেমে এল। অন্তর্চেতনার স্রোতে বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা। শিশু বয়সের সেই দুকুল ছাপানো আবেগ নিয়ে সে 'মা' বলে কৈকেয়ীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল।

বুকের মধ্যে ভরতকে চেপে ধরে কৈকেয়ী ফুঁপিয়ে ওঠার মতো আর্তনাদ ক'রে উঠল এবং সেই মুহূর্তে মনে হলো জননীর হৃদয়ে মহোত্তম আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার একটা সুখানুভূতি তার হৃদয়প্লাবিত করে গেল। শরীরের প্রতি কোষে মাতৃত্বের স্নেহধারা ক্ষরিত হলে যে, এত উল্লাস আর যাতনা থাকতে পারে জানা ছিল না কৈকেয়ীর। অনির্বচনীয় মহিমময় সুখের অনুভূতি মন থেকে রাগ, বিরাগ, মান অভিমানকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জীবনে আর একটি পথ খুলে দিল যেন। জীবনের গলিপথ থেকে রাজপথে এসে দাঁড়াল যেন। অবারিত পৃথিবীর দিকে চলে গেছে মহ-নিষ্ক্রমণের সে পথ। বাঁকে বাঁকে তার কতরকম বিস্ময়।

কৈকেয়ীর বুক থেকে একটা উৎকণ্ঠিত কষ্টের ভার নেমে গেল। মুখের ও চোখের রূপ বদলে গেল। কেমন একটা খুশি আর গৌরব বোধ জাগল মনে। মুগ্ধতা এবং স্নেহ কৈকেয়ীর চোখে নিবিড় হয়ে এল। আচ্ছন্ন স্বরে ডাকল : ভরত! বাবা আমার!

ভরতও কম অবাক হল না। জননী যেন আমূল বদলে গেছে।

ধরাছোঁয়ার বাইরে এক অন্য মহিয়সী মহিলা। কাদার পিণ্ড থেকে এক দেবী বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। উচ্চকাঙ্ক্ষার আগুনে যে জ্বলে উঠেছিল প্রত্যাখ্যানের আগুনে পুড়ে সোনার মতোই খাঁটি হল সে। কৈকেয়ীর দৃষ্টির ও বাক্যের যন্ত্রণার গভীরে ডুব দিয়ে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জননীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভরতের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হলো।

ঘটনার আকস্মিকতার মধ্যে ভরতকে ভাল করে দেখা হয়নি কৈকেয়ীর। সহসা তার চোখ পড়ল ভরতের বসনে, উত্তরীয়তে, অবশেষে চূড়া করে বাঁধা চুলের উপর। স্বপ্নের ঘুম তৎক্ষণাৎ ভেঙে গেল। বুকের নিঃশ্বাস মেঘ আবর্তিত হলো। প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীরের প্রচণ্ড ঝাপ্টাতে লাগল। আকাশ দিনমানে অন্ধকার বোধ হলো। পৃথিবী মাথার মধ্যে বনবন করে ঘুরতে লাগল। তীব্র ব্যথায় বুক টনটনিয়ে উঠল। বুকের স্পন্দন তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল ঃ এ সাজে সেজে কোথায় চলেছ পুত্র?

ভরত কৈকেয়ীর দিকে না তাকিয়েও মায়ের অনুসন্ধিৎসু নিবিড় উৎসুক দৃষ্টির গভীরতা প্রতি অঙ্গে অনুভব করতে পারছিল। শঙ্কিত বিহ্বল অনুভূতির মধ্যে নিজেকে হারাল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলল ঃ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। এ রাজ্য আমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে! রামচন্দ্রের জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়েছে। তাকে রাজ্য দিয়ে আমি বনবাসে যাব।

ভরত! কৈকেয়ীর বিস্মিত স্বরে উদ্বেগ ও আতঙ্ক বেজে উঠছিল।

মা! আচ্ছন্ন স্বরে ডাকল ভরত। পরমুহূর্তেই চোখের পাতায় তার নিবিড়তা নেমে এল।

কৈকেয়ীর চোখের তারা দুটো সহসা উদ্দীপ্ত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন। আবেগের ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে একটা সুন্দর অনুভূতি তাকে বৃহত্তর ত্যাগের প্রস্তুতির সংকেত দিচ্ছিল। ভরতের চোখের তারায় কৈকেয়ী যে রহস্যের দ্যুতি দেখতে পেল তাতে তার নিজের প্রাণও দ্যুতিময়ি হয়ে উঠেছিল। নিখাদ আবেগে তার মন পূর্ণ হল। মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখমণ্ডল। বিগলিত কণ্ঠে বলল : আজ আমার আনন্দের দিন, মুক্তির দিন।

এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিক দিল ভরতের মনে। মায়ের ব্যাপারটা তার অদ্ভুত লাগল। স্মৃতিচকিত হয়ে উঠল ভরতের জিজ্ঞাসা। বলল : মা তোমার কি হয়েছে আজ? আমি তোমার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না!

কৈকেয়ীর শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল বিসর্জনের বাজনা। তার বুকে রাগ অভিমান অহংকার কিছু ছিল না। প্রাণের সমস্ত দিগন্ত মুক্তির আনন্দের ঝলমল করছিল। ভরতের বিস্ময়ে সে নিঃশব্দে হাসল। আমি যা পারিনি, পুত্র হয়ে তুই তা করলি বাবা। আমাকে সব অপরাধ থেকে, পাপ থেকে মুক্ত করলি। আমার মনে আর কোন গ্লানি নেই।

ভরত চমকাল। তার বুকে আবেগ শির শির করে উঠল। সম্মোহিত হয়ে অবাক স্বরে ডাকল : মা!

ভরত তুই আমার মহাপ্রাণ পুত্র। আমার গর্বের ধন। বিধাতার আশীর্বাদ। ত্যাগ তোকে সুন্দর আর বড় করেছে। বোধ হয়, রামের চেয়েও।

ভরতের বিস্ময়ের অন্ত নেই। জননীকে এতো প্রগলভ হতে দেখেনি কখনও। জীবনের বাস্তব কি আশ্চর্য, স্থান কালের পরিস্থিতির এই মুহূর্তে কৈকেয়ী প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মতোই অপরূপ হয়ে উঠল। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভরত বলল : মাগো, আমাকে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ হয়ে থাকতে দাও। ছোট হয়েই যেন তাকে পুজো করতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।

অপূর্ব! কৈকেয়ীর পুত্রের উপযুক্ত কথা। পুত্রের এত বড় জয়ের পাশে মায়ের পরাজয় কি মানায়? বড় আদর্শের আলো যখন আমার মত ছোট মন ছোট প্রাণ মানুষদের উপর পড়ে, তখন তার ছটায় আমরও ভেতরটাও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সমস্ত পাপ, অন্যায়, স্খলন-পতন সার্থকতা নিয়ে আদর্শের পতাকাতলে আমিও কিছু বড় হয়ে উঠি। কলঙ্ক, কালিমা, দুর্বলতা হঠাৎ কেটে যায়।

মা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

না, বাবা আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। হৃদয়ে আজ মুক্তির প্লাবন। আমাকে তুমি সবার সামনে বড় হবার অপূর্ব-সুযোগ এনে দিয়েছ। মানে, সম্মানে, ক্ষমতায় বড় হওয়া নয়—ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে বড় হওয়া। মহান হওয়া। কলঙ্কের কালিমা আমার মুছে যাবে। তখন লোকের চোখে, মানুষের মনের মন্দিরে আমি হয়ে উঠব এক সার্থক রত্নাগর্ভা জননী। পুত্র তুমি নীরব কেন? চাঁদের কলঙ্কে তার গৌরব। শুভ্র নির্মল আলোর তুলনায় তার কলঙ্ক কত সামান্য। লোকে তো চাঁদের আলো পছন্দ করে, কলঙ্ককে নয়। তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় কবির অলস কল্পনা। সুন্দরের আরাধনায় কলঙ্ককে দরকার পড়ে কবির পূজার নৈবেদ্য করে। আমাকেও মাতৃত্বের মহিমা নিয়ে চাঁদের মতোই আলোকোজ্জ্বল হতে হবে, কলঙ্ক গৌরব না হোক, অগৌরবের কালিমায়-জীবনকে সে অন্ধকার করতে পারবে না।

ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ভরত কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে ছিল। দৃষ্টিতে কোনো প্রশ্ন ছিল না। যেন এমনিই একটা দার্শনিকতা, যা সব প্রশ্নের অতীত। দেহের মৃত্যু সত্য। কিন্তু অমরত্বের তৃষ্ণা নিরন্তর। তাই মানুষের আত্মনাশ কখনও একেবারে হয় না। বাঁচাবার তীব্র ইচ্ছা তাকে অমরত্বের প্রতি লোভী করে। অমরত্বের পিপাসা কৈকেয়ীর অনুভূতি উপলব্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাকে এক অন্য মানবীতে রূপান্তরিত করল। অপ্রস্তুত বিস্ময়ে ভরত তাই থমকে গিয়েছিল। স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। চিন্তান্বিত মুখে খুব শান্ত স্বরে বলল : সত্যি বলছো নাকি? এমন চিন্তা আগে করলে না কেন? এ যদি তোমার প্রাণের কথা হতো তাহলে এ ভুল করতে না কখনও। দোষের ভাগী হয়ে থাকতে হতো না তোমাকে।

ভরতের কথাটা কৈকেয়ীর পুরনো ক্ষতে ব্যথা দিল। মায়াবী চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে ভরত শত্রুঘ্নকে দেখল। কৈকেয়ীর বুকে অভিমান জমল। বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় বলল : আচ্ছা ভুল কি শুধু আমার? তোদের কারো কোন দোষ হয়নি?

কৈকেয়ীর প্রশ্নে ভরত একটু উদ্বিগ্ন হলো। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা, ভাবনা-চিন্তা এবং যে মতগুলো আছে তা কখনো অন্যের কাছে ব্যক্ত করে না। তর্ক করতে ভরতের ভাল লাগে না। স্থান-কাল-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জননীর প্রশ্ন এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে ভরত মৃদুস্বরে তার উত্তর করল : না, আমরা সবাই তোমার নির্মল শুভ্র মাতৃত্বকে অপমান করেছি। তাই এ দোষ আমাদের সবার। এখন বুঝতে পারি রামচন্দ্র নিজের ভুল, অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করে প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্রুত বনে গিয়েছিল।

কৈকেয়ী ভরতের উত্তরে অপ্রতিভ হয়ে একটু হাসল। তবু তার বুকের পুরনো ক্ষতটা বড় জ্বালা দিচ্ছিল। ব্যথিত ও বিমর্ষ কৈকেয়ী শরবিদ্ধ হরিণের মতো কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ভরতের মুখের দিকে। ভরত তার অস্বস্তি কাটানো জন্য বলল : তবু বলি, তোমার জননীত্বে অভিমান আর অহঙ্কার দুই আছে। বিধাতা অহঙ্কার সইতে পারে না। বোধ হয় তোমার মাতৃত্বের অভিমানের উপর এমনি করে এক কলঙ্ক লেপে দিল।

কৈকেয়ীর মুখখানা সহসা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত কষ্টে আর ব্যথায় তার বুক টনটন করতে লাগল। শরীরও কাঁপল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দেয়ালে শরীরের ভর রেখে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। চোখ বুজতেই দেখতে পেল রামচন্দ্রের মুখ। বনবাসের কষ্ট, পথ শ্রান্তিতে সে মুখ শীর্ণ, সাদা। এবং ঠোঁট শুকনো। চোখের কোণে কষ্টের হাল্কা নীল ছোপ পড়েছে—তৎসত্ত্বেও সে মুখ বড় সুন্দর। আশ্চর্য মায়াময়। দৃশ্যটা তার বুকের যন্ত্রণাকে আরো তীব্র করল। চোখ খুলল। বিস্ফারিত চোখে চাইল ভরতের মুখের দিকে। একটা বড় শ্বাস ফেলল। কষ্টটা অনেকখানি বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে।

ভরত মাথা হেঁট করে তাকে প্রণাম করতে আসছিল। পিছনে তার শত্রুঘ্ন। পায়ের পাতাতে মাথা ঠেকিয়ে ভরত প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। প্রবল সম্মোহনে কৈকেয়ীর পা দুখানা যেন তাকে আটকে রেখেছিল। চোখের জলে যেন মাতৃপদ তর্পণ করল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : মা, আমাকে বিদায় দাও। আশীর্বাদ কর, আবার তোমার এই রাঙা দুচরণ যেন প্রণাম করতে পারি। রামচন্দ্র না ফিরলে আমি আর অযোধ্যায় ফিরব না। জানি না রাক্ষুসী অযোধ্যা কি চায়!

ভরতের কথায় কৈকেয়ীর কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগল। একটা বিষণ্ন ব্যথায় টনটন করছিল তার! কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা তার দুই চোখে। বিস্ময়ের মধ্যে আনন্দ এবং মুগ্ধতা যুগপৎ তার মুখে বিরাজ করছিল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ রামচন্দ্রের কাছে আমাকেও নিয়ে চল, বাবা। আমি না গেলে সে ফিরবে না। আমার উপর রাগ করে অভিমান নিয়ে সে চলে গেছে। বড় অভিমানী রাম আমার।

শত্রুঘ্ন সহসা অবাক হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল : তুমি কোন মুখে দাঁড়াবে তার সামনে?

শত্রুঘ্নের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নেয় কৈকেয়ী যেমন অবাক, তেমনি বিপন্ন। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। প্রতিবাদের উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল কৈকেয়ীর শরীর। আত্মপ্রত্যয়ে ভ্রুকুটি দৃষ্টি ও মুখ পলকের জন্য শক্ত হয়ে উঠল। একটু ব্যস্তভাবে জোর দিয়ে বলল : মায়ের দাবি আর অধিকার নিয়ে দাঁড়াব তার সামনে। সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা থাকে না। জননী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়ালে কোন পুত্র ফেরাতে পারে তাকে?

উপেক্ষিতা শূর্পণখা



প্রীতিভাজনেষু
শীলা দত্ত
অরবিন্দ দত্ত
দীপক-দা।

দৃষ্টিকোণ

রামায়ণ কাহিনীতে মহাকবি বাল্মীকি রাবণ ভগিনী এবং ব্রাহ্মণ কন্যা রাণী শূর্পণখার উপর অনেক অবিচার করেছেন। শূর্পণখা শিশুপাঠ্য কাহিনীর হাঁউ মাউ খাঁও, মানুষের গন্ধ পাঁও এক রাক্ষসী। সত্যি কি সে তাই? এ প্রশ্ন করে না কেউ। তাকে নিয়ে যে মিথ এবং রূপকথার কল্প কাহিনী রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে জায়গা করে নিয়েছে তাতে শূর্পণখা নামক মানবীটি ঢাকা পড়ে গেছে। রামায়ণে সে একটি কমিক রিলিফ চরিত্র। হাসির খোরাক করে তাকে দিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের চিত্ত বিনোদন করা হয়েছে। বাস্তবিকই একঘেয়েমিতা থেকে পাঠককে চাঙ্গা করতে শূর্পণখার গল্প কবির এক সুন্দর সৃষ্টি।

ভাঁড় কিংবা বিদুষক হয়ে যে মানুষ অন্যকে হাসায় আনন্দ দেয় সে মানুষটার জীবনের অন্ধকারের খোঁজ কেউ করে না। শূর্পণখার বেলায় তাই হয়েছে। সে ভাঁড় কিংবা বিদুষক নয় কিন্তু তাকে নিয়ে অনেক খোশ গল্প সৃষ্টি হয়েছে। আদি কবির লেখনীতে শূর্পণখা চিরদিন আমাদের উপহাসের পাত্র। মানবিক করুণা এবং সহানুভূতি বঞ্চিতা, কাব্যে উপেক্ষিতা এই নারীর জীবনের অনুদ্ঘাটিত জীবন রহস্যের উপর সহানুভূতির আলো ফেলে তার মনে কোথায় কত রকমের ব্যথা, বঞ্চনা, হতাশা, দুঃখ, কষ্ট কিংবা কোন প্রাপ্তি ও সুখের প্রত্যাশায় দিন গুনছে; অসীম যত্নে তাকে সময় ও দেশ কালের পরিধিতে ধরার চেষ্টা করেছি।

লঙ্কাযুদ্ধের মতো একটা বিরাট যুদ্ধের নেপথ্যে শূর্পণখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি এ উপন্যাসে যত্নের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের পটভূমিটি শূর্পণখার সৃষ্টি। তার কূট কৌশলটা ছিল অদ্ভুত রকমের। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি নিয়ে সে রাবণের পরম শত্রু রামের সঙ্গে রাজনৈতিক সদ্ভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাবণবধই ছিল শূর্পণখার একমাত্র সঙ্কল্প। তাই, ভগিনী হয়েও যৌথভাবে রামের সঙ্গে রাবণ বধের জমি তৈরি করেছিল। ভ্রাতার প্রতি এই বিরূপতার নেপথ্যে আছে তার পতি প্রেম। তার প্রেমের একনিষ্ঠতা। রাবণের হাজার অনুনয় সত্ত্বেও যে রমণী বিয়েতে রাজি হয়নি তাকে মায়াবিনী, স্বৈরণী বলতে দ্বিধা হয়। কামুকী চরিত্রে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি। স্বামী বিরহের প্রতিকারহীন জ্বালা, যন্ত্রণা তার বুকে যে প্রতিহিংসার অনল সৃষ্টি করল সেই আগুনে লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

শূর্পণখার নাক-কান কাটার গল্পটি অবাস্তব, রূপকথায় পরিণত হয়েছে। নাক-কান কাটা কথাটি বেসরম, লজ্জাহীনা এই অর্থে ব্যবহৃত করে তার এক নতুন মাত্রা দিয়েছি। কারণ, সভ্যজাতির প্রতিভু রাম-লক্ষ্মণ এরকম নৃশংস অমানবিক কাজ করবে বলে বিশ্বাস হয় না। বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন আধুনিক পাঠক পাঠিকাদের কাছে ঐ গল্প বাতিল হয়ে গেছে। তাই, শূর্পণখার নাক কান কাটার গল্পের উপর যুক্তি তর্কের এক ঝলক আলো ফেলে পঞ্চবটী বনে রামের সঙ্গে কী ধরনের চক্রান্ত হয়েছিল বিভিন্ন ঘটনা সুত্রে তার এক গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছি।

যাই হোক, পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র পদার্পণ না করলে শূর্পনখা রাবণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ পেত না। শূর্পণখার প্রতিহিংসার রন্ধ্রপথ ধরে রামচন্দ্র রাবণের অদৃষ্ট হয়ে জন্মস্থানে প্রবেশ

করল। নাক কান কাটার গল্প তৈরি না করলে খর ও দূষণের আকস্মিক মৃত্যু হতো না। সীতা হরণের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় রাবণের কোন ভূমিকা থাকত না। এই একটি গল্পের ফাঁদে আটকা পড়েছে রাবণের ভাগ্য।

রাবণের বিরুদ্ধে রাক্ষস জাতির মধ্যেই একটা বিরোধী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটছিল। শূর্পণখার তাপিত অন্তর স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে গোপনে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাবণের সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হলো।

ঘরশত্রু শূর্পণখাকে না পেলে রামের লঙ্কাবিজয়ের অভিলাষ পূর্ণ হতো না। প্রতিহিংসাপরায়ণ শূর্পণখার বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী ঢাকতে আদিকবি বিতৃষ্ণা, বিরূপতা ও ঘৃণার বিষ উগরে দিয়ে তাকে মনুষ্য পদবাচ্যহীন এক হাস্যকর আজব প্রাণী করে চিত্রিত করেছেন। ফলে তার দোষ রামায়ণ পড়ুয়াদের নজর কেড়ে নিতে পারেনি। রামায়ণে শূর্পণখা উপেক্ষিতা থেকে গেছে চিরকাল। কিন্তু আজ যখন চারদিকে নারীমুক্তির হাওয়া বইছে তখন শূর্পণখার মন ও ব্যক্তিত্বের পুনর্বিচার হওয়া উচিত বলে মনে হয়েছে।

কোনরকম উচ্চকিত শব্দ না করে শববাহিত শকটটি মন্থরগতিতে রাজপ্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করল। প্রহরীরা দৌড়ে এল। চোখে মুখে বিস্ময়। দারু নির্মিত সুদৃশ্য কারুকার্যযুক্ত পালঙ্কে হলুদ বর্ণের রেশমী কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত ও শব কার? ফুলে ফুলে শরীরটা ঢেকে গেছে। মুখখানা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবু প্রহরীদের চোখ ছলছল করতে লাগল।

বারান্দা অতিক্রম করার সময় কোন দাসী শকটে শায়িত বিদ্যুৎ-জিহ্বর নিষ্প্রাণ দেহ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। হঠাৎই সরু স্বরে কেঁদে উঠে ভিতর বাড়ীতে ছুটে গেল। সব হারানো চকিত কান্নার হাহাকার অন্দরমহলের আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী এবং প্রহরীদের বর্হিবাটিতে টেনে আনল। মুহূর্তে জায়গাটা মানুষের ভীড়ে ভরে গেল। বিষণ্ণ স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল। মনে হল প্রাণের প্রবাহমানতা থেমে গেছে। তারা স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শূর্পণখার কানে পৌঁছল। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে বর্হিবাটিতে তাকে দেখতে যাওয়ার শক্তি ছিল না তার। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। জড়বৎ দেহটা শয্যার সঙ্গে আটকে রইল। মনেতে তার প্রশ্ন : রাবণ তো উত্তর-পশ্চিম ভারতের আরো উত্তর দিকে রসাতলে যাত্রা করেছিল, আর বিদ্যুৎজিহ্ব তো গিয়েছিল গোদাবরী তীরে অশ্মরাজ্যে মৈত্রী সফর করতে। তা-হলে? দাসীরা চিনতে ভুল করেনি তো? মনের উৎকণ্ঠাকে সে এভাবেই চাপা দিল। তবু মন শান্ত হল না। বিদ্যুৎজিহ্বর জন্য মন ব্যাকুল হল।

আশ্চর্য! বিদ্যুৎজিহ্বর জন্য তার চোখে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত নেই। কান্নাও পাচ্ছে না। একটা থমথমে বিষণ্ণতা মুখে মেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইল। শূর্পণখার মনে হচ্ছিল কোথায়, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ভেতর সে তা টের পাচ্ছে। মন অবুঝ হলেও বুদ্ধি দিয়ে ঠিকই বুঝতে পারছিল, এটা ভূমিকম্প নয়, অন্য এক অপ্রতিরোধ্য শরীরী বিক্ষেপ। শূর্পণখা আসলে যুদ্ধে নিহত স্বামীর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বীভৎস মূর্তি দেখতে চাইল না। বিদ্যুৎজিহ্বর সুঠাম পেশীবহুল দৃপ্ত পৌরুষের এই দশা সে দেখবে কেমন করে? মানুষ কত নিষ্ঠুর হলে, আর একজন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে? রক্তমাখা হাতে বর্বরের মতো উল্লাস করতে তার কষ্ট হয় না? নিজের মৃত্যুর অমোঘতার কথা, অপরকে হত্যার সময় তার কী মনে পড়ে না? যে মানুষের বুকে এত প্রেম, রক্তের তৃষ্ণায় সে এমন নিষ্ঠুর হয় কী করে?

দু একজন দাসী ও প্রহরী উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে প্রবোধ দেবার সাহস হচ্ছে না। মাঝে মাঝে অন্তর্ভেদী শ্বাস পড়ছে। বুকে প্রগাঢ় যন্ত্রণার থাবা গেড়ে আছে। কী একা লাগছে তার! কী আত্মীয় পরিজনহীন মনে হচ্ছে। মৃত্যু মানেই কী একাকীত্ব? প্রেমহীনতা? ওই মৃত মানুষটা কী তার মতো অনুভব করছে প্রেমহীনতার কষ্ট, একাকীত্ব, যন্ত্রণা। ও কী ভাবছে, তার পুত্র আছে, স্ত্রী আছে। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে স্বার্থপরের মতো একা একা চলে যাচ্ছে। এভাবে সকলকে ফেলে চলে যাওয়ার ভেতর সত্যি কী সুখ আছে কোন? নিজের অভ্যন্তরে দু:খ আর্তিগুলো তার বেশি করে মনে হচ্ছিল।

নিস্তব্ধ ঘরে রাবণ চুপিচুপি ঢুকল। অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। শূর্পণখা ভুরু কুঞ্চিত মুখে ভয়চকিত বিস্মিত জিজ্ঞাসা নিয়ে রাবণের দিকে অপলক চেয়ে রইল। বুক তোলপাড় করছিল। মুখে চোখে একটা তটস্থ ভাব।

রাবণেরও কেমন একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল। আস্তে আস্তে বললঃ মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বোধ হয় প্রিয়জনকে আঘাত করার।

অমনি একটা ভয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল শূর্পণখা। না-আ-আ—। আমি বিশ্বাস করি না। এ কখনও সত্য হতে পারে না।

মনে হল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপানো তার আর্ত হাহাকারের সঙ্গে বিদ্যুৎজিহ্বর প্রাণটাও বুকের খাঁচা ছেড়ে মাঝ আকাশ বরাবর উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল অনন্তের বুকে। সব প্রতিরোধ ভেসে গেল। কুলের উপর আছড়ে পড়া সমুদ্রের স্রোতের মতো শূপর্ণখা রাবণের বুকে মুখ গুঁজে আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগল। কান্না জড়ানো গলায় বলল : এ সর্বনাশ আমার করল কে? কোন পাপে আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল?

রাবণ শূর্পণখার গায়ে হাত রাখল। পিঠভর্তি কোঁকরানো কালো চুল। শোক জ্ঞাপন কিংবা সহানুভূতিও নয় বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর কথাটা কীভাবে বললে ভালো হয় সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা রাবণের সম্ভব হচ্ছিল না। রাবণের মুখে চোখে গভীর বিষাদ। ভিতরে ভিতরে নিজেকে দোষী মনে হয়। স্বামীহারা ভগিনী যদি তাকে দোষী ভেবে খানিকটা স্বস্তি পায় তো পাক। সত্যিই তো তার দোষে বিদ্যুৎজিহ্বর প্রাণ নিতে হয়েছে। কিন্তু শূর্পণখার কাছে সে কথাটা কবুল করবে কি করে? অন্তত এই মুহূর্তে তো কিছুতেই নয়। স্বীকারোক্তি শূর্পণখার মনে কতদূর ডালপালা ছড়াবে সেই ভেবে রাবণ কিছুটা বিচলিত। রাবণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। নিজের নিঝুম শরীরে এক ধরনের শীতলতা টের পাচ্ছে। শূর্পণখার কথা ভেবে সে কিছুটা উদ্বিগ্ন। শীত নয় কেমন একটা স্থবিরতায় অনড় অবশ তার দু হাত। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে বারবার। চোখের সামনে নানারকম দৃশ্যাবলী ভেসে যাচ্ছে। স্নায়ুর ভেতর আগুন ছুটছে। রসাতল থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের গ্লানিটা ভুলতে পারছিল না। প্রত্যাবর্তনের পথে পিছন থেকে অশ্মরাজ্য আক্রমণ করল। আর তাতেই বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যু হল। তার মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তথাপি স্পর্শকাতর মনটা সবচেয়ে কষ্ট দেয় তাকে।

শোকহীন দুচোখে রাবণের জল এল। ভিতরে নিষ্ঠুরতার যে শক্ত জমি ছিল শূর্পণখার চোখের জলে তা পিছল হয়ে গেল। রাবণ দাঁড়াতে পারল না তার উপর। অসহায়ের মতো মাথা নাড়ে। তার মাথার উপর চিবুক রেখে দুঃখিত ভাবে ধরা গলায় বলল: অমন করে কাঁদতে নেই বোন। আমার ভেতরটা তোর মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যাবেও চিরকাল। আমিও কী কম লড়াই করছি নিজের সঙ্গে। এ লড়াই যে কী সাংঘাতিক তা যদি জানাতে পারতাম তা-হলে তোর মতো আমিও হাল্কা হতে পারতাম।

শূর্পণখা কী বুঝল সেই জানে। রাবণের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল: ওসব শুনতে চাই না। জানি।

রাবণ মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল: জানা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে যেটা দুঃখের কথা তা হলো, তার মৃত্যুর সঙ্গে আমিও জড়িয়ে গেছি। সে যে আমার কত প্রিয় আর আপনার তা তোর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। সে জন্যই তো এত কষ্ট।

শূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। বহির্বাটি দরজার গোড়ায় সে একবার একটু থমকে দাঁড়াল। কাপড় দিয়ে চোখ মুছল। তবু চোখের জল বারণ মানে না। ফোঁপানিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক। বুকের মধ্যে শোকের সাগর উথলে উঠল। বিদ্যুৎজিহ্বর প্রাণহীন শরীরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। অজস্র কথা বলল। কত অভিযোগ, অনুযোগ করল। অভিমান জানাল বুক চাপড়ে, কপাল থাবড়ে, দারুণ হাহাকারে।

রাবণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। সে দেখছে বিদ্যুৎজিহ্বকে। কিন্তু অনুত্তেজিত, উদ্বেগশূন্য। হঠাৎ রাবণকে দেখে শূর্পণখার সব কান্না থেমে গেল। চমকাল। কেমন একটা সন্দেহ হল। রাবণকে ভীষণ সুখী আর নিরুদ্বিগ্ন মনে হল। তবে কি বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুটা তার কাছে খুব একটা শোকবহ ঘটনা নয়? রাবণ কী মনে মনে বিদ্যুৎজিহ্বর আত্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছিল? শূর্পণখার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত বোবা ভাব। রাবণ অস্বস্তি বোধ করল। অভিভূত গলায় বলল: এক একটা মানুষকে ঘিরে কত স্মৃতি। একটা মৃত্যু এসে তার সব ওলট পালট করে দিয়ে যায়। কেবল প্রিয়জনের অন্তরে রেখে যায় সফলতা অথবা ব্যর্থতা, কিছু কিছু অস্থিরতা, কিছু

কিছু ক্ষতি, ভুলভ্রান্তি, ঋণ এবং ভালোবাসার দ্যুতি।

শূর্পণখা একথায় কেমন যেন হয়ে গেল। বুঝতে পারছিল তার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে রাবণ সান্ত্বনার জল ঢেলে দিচ্ছে। আর সে একটু একটু করে নবীন হয়ে উঠছে। ভারাক্রান্ত আচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আমার চোখ থেকে সব আলো মুছে যাচ্ছে। আমি কি নিয়ে বাঁচব? আমার জন্য ও-কি রেখে গেল?' বিবশ হয়ে চেয়ে রইল বিদ্যুৎজিহ্বর অন্তিম যাত্রার দিকে।

পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্যের আলো তেরছাভাবে পড়েছে বিদ্যুৎজিহ্বর অন্তিম যাত্রার উপর। মনে হল, স্বর্গ থেকে সোনালী আলো আশীর্বাদের মতো বিদ্যুৎজিহ্বর উপর পড়েছে। আর কী অসামান্য সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। শূর্পণখার হঠাৎ-ই মনে হলো, আলোর সরণী বেয়ে বীর তার স্বর্গলোকে চলেছে। আর, ঈশ্বর তাঁর দামাল ছেলের দিকে দুহাত মেলে দিয়েছে যেন।

লম্বা শ্বাস পড়ল শূর্পণখার। সম্মোহিতের মতো অভিভূত গলায় রাবণকেই প্রশ্নটা করল। মৃত্যু কী রকম গো? খুব অন্ধকার, না. আলোয় আলো।

রাবণ সহসা জবাব দিতে পারল না। শূর্পণখার চোখের ওপর তার দৃষ্টি স্থির। খানিকটা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ পরে থমথমে ভেজা গলায় বলল : তোমার মতো এত গভীর করে ভাবিনি কোনদিন। এখন মনে হচ্ছে কথাটা কি আশ্চর্য এবং অলৌকিক। নিয়তির মতো অমোঘ সংকেতে রহস্যময়।

একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিতে গিয়ে শূর্পণখার সর্বশরীর কেঁপে গেল।

।। দুই ।।

শূর্পণখার অন্তরে শোকটা গেঁথে রইল। যতদিন যেতে লাগল মনেতে প্রত্যয় জন্মাল, বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। এটা রাবণের পরিকল্পিত একটা হত্যাকাণ্ড। তার ধারণার কথা মুখ ফুটে রাবণকে বলেনি কোনদিন। এমনকি রাগের মাথায়, বেফাঁসে মুখ থেকে বেরোয়নি। মাঝে মাঝে বুক জুড়ে এখটা ঘৃণা, রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যায় বুকের অভ্যন্তরে,. তবু রাবণকে টের পেতে দেয়নি তার সন্দেহ।

কিন্তু রাবণ শূর্পণখার নিশ্বাসে, চাহনিতে অনুভব করে কোথায় তার জ্বালা, কতরকমের ব্যথা। তার শূন্যতা যে কোথায় তাও রাবণ জানে। বিশেষ করে সেই শূন্যতা যখন শূর্পণখা আড়াল কবে বেড়ায় তখন রাবণও কষ্ট পায়।

বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর পরে ভগিনীর খবরাখবর করতে কালকেয় রাজ্যে রাবণের যাওয়া আসা বেড়েছে। তার সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। রাবণের কুশল প্রশ্নের উত্তরে, মাঝে মধ্যে শূর্পণখার প্রায়ই বলে একজন মেয়েমানুষের জীবনে একজন পুরুষের যে কী দাম, তা পুরুষ হয়ে তুমি জানবে কেমন করে? পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর জীবনের কোন দাম নেই। ওই মানুষটা না থাকার পরেই গভীরভাবে অনুভব করেছি। কতখানি যে হারাল আমার তা তোমাদের কাউকে বোঝাতে পারব না।

শূর্পণখার কথা শুনলে রাবণের মন খারাপ হয়ে যায়। চোখে কষ্টের ছায়া ফোটে। বিষাদমাখা মুখে অপরাধীর মত বলেঃ আমাকে কষ্ট দিয়ে তোর খুব আনন্দ হয় তাই না? একবারও মনে হয় না, কতদূর থেকে পথের ধূলো মেখে, ভূত হয়ে তোকে দেখতে আসি। বিনিময়ে তুই আমাকে মুগ্ধ না করে দুঃখ দিয়ে ফিরিয়ে দিস।

ফাঁপড়ে পড়ল শূর্পণখা। আমতা আমতা করে কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় বললঃ সত্যি, আমি কি যেন? তোমাকে কাছে পেলেই বুক ঠেলে অভিমান আর অভিযোগই বেরিয়ে আসে। কেন যে আসে, তাও জানি না। অথচ ভাইদের ভেতর তুমিই একজন মানুষের মত মানুষ যে, সকলের থেকে আলদা। ছোট থেকে আদর ভালোবাসা তোমার কাছেই বেশি পেয়েছি। তাই বোধ হয় অভাগী ভগ্নীর সব নালিশ তোমার কাছে।

রাবণ চমকাল। কানে কথাটা খচ্ করে বিঁধে গেল। গভীর অপমানে কালি হয়ে গেল মুখ। বুকের ভেতর নালিশের ভাষাটা ছিঁড়ে যাওয়া বীণার তারের মতো রিণ রিণ করে বাজতে লাগল। শূর্পণখা যে তাকেই সন্দেহ করছে এই বুঝেই রাবণ বিব্রত বোধ করল। শূর্পণখার কথাবার্তা, আচার-আচারণের মধ্যে একটা পরিবর্তন দিন দিন প্রকট হচ্ছিল। থমথমে মুখ করে রাবণ কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে শূর্পণখার দিকে চেয়ে রইল।

শূর্পণখা ভয় পেল। অস্বস্তিতে পড়ল। মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্য সহসা কেঁদে ফেলল। একটা ভয় যেন কণা কণা জল হয়ে তার দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল : যখন বড্ড একা লাগে তখন কান্না পায়। তোমার জন্য মন ব্যাকুল হয়। নিজেকে কিছুতে আর সামলাতে পারি না। সত্যিই তো, সব সময় অভিযোগ, নালিশ, কান্না কার ভালো লাগে? প্রতিবার তো ভালো লাগেই না।

রাবণ অসহিষ্ণু হল। চোখে মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে ওঠার আগেই সে নিজেকে সংযত করল। নিরাবেগ চিত্তে সহজভাবে বলল: অত উতলা হলে চলে? তুমি তো আর সাধারণ মেয়ে নও—রাজমহিষী এবং রাজভগিনী। রাজার অবর্তমানে রাজ্য পরিচালনার ভার তোমার। স্বামীর রাজ্য রক্ষা করা, শাসন করা, সম্প্রসারণ করা, শত্রুকে ধ্বংস করার দায়িত্ব তো তোমার। সব কিছু সামলাতে হবে। নিজেকে শক্ত কর! নাবালক পুত্র শম্ভুর হাতে পিতার রাজ্য যতক্ষণ সমর্পণ না করছ ততক্ষণ তোমার কোন ছুটি নেই। চারপাশে তোমার বিপদ। বিদ্যুৎজিহ্বর শত্রুরা ঘুমিয়ে নেই। তারা প্রতীক্ষায় আছে। তুমি কী ভুল করছ, জান না। কাঁদলেই কী প্রমাণ হবে তুমি দাদার উপর নির্ভরশীল। দাদা তোমাকে রক্ষা করবে? যে নিজেকে বাঁচাতে জানে না, তাকে বাঁচানোর সাধ্য কারো নেই। আমি তোমার আনুগত্যের কিংবা নির্ভরতার কোন প্রমাণ চাই না। তুমি আত্মনির্ভরশীল হলে বরং খুশি হব। তোমার রাজ্য রাক্ষসদের স্বাধীনতা রক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ হলেই তবে দক্ষিণভারত রামচন্দ্রের অবাধগতি রুদ্ধ করে দিতে পারবে।

শূর্পণখা একটু অবাক হওয়ার চেষ্টা করল। বলল: কান্না-কাটি করার সত্যি কোন মানে হয় না। চোখের জলের কানাকড়ি মূল্য নেই। আমিও কী কাঁদতে চাই? তবু চোখ ভরে জল আসে। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুটা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। ঐ মৃত্যুটা যতকাল মনে থাকবে ততকাল ঘরে বাইরের শত্রুর শত্রুতার সঙ্গে আমাকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এ এক কঠিন খেলা। শত্রুকে চিনেও তার সঙ্গে না চেনার ভান করতে হবে। এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে সে চটে যায়। নিজের সঙ্গে ভণ্ডামি করার তো দরকার হয়নি আগে। তাই এক অশেষ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। স্বামীর আত্মার তৃপ্তির জন্য, তার পুত্রের নিরাপত্তার জন্য এবং আমার নিজের জন্য অনেক কিছু করতে হবে। আমার মধ্যে এক নতুন শূর্পণখা সৃষ্টি করতে হবে।

রাবণ সন্দেহের গলায় বলল : তোর কথাবার্তা অনেক বদলে গেছে। কী একটা বলি বলি করেও বলছিস না। এই গোপনীয়তার কোন মানে হয় না। তবে বুঝতে তো পারি, তোর কটাক্ষের লক্ষ্য আমি। সন্দেহের তীরগুলো আমাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হচ্ছে।

শূর্পণখা চুপ করে রইল। রাবণই বলল : এত গোপনীয়তার কী আছে? মানবিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনেককে সন্দেহভাজন হতে হয়। নিহত বিদ্যুৎজিহ্বকে, রাজকীয় মর্যাদায় যদি প্রাসাদে না ফিরিয়ে আনতুম তা-হলে সন্দেহের উর্দ্ধে থাকা যেত, কিন্তু মানবিক কর্তব্য করা হত না।

দাদা, তোমার কর্তব্যজ্ঞান বড় নিষ্ঠুর। পুরুষ জাতটা নিজের স্বার্থে নির্দয় হতে ভয় পায় না। ভণ্ডামির অভিনয়ে, মিথ্যে ছলকলায় মোহিনী রমণীও তাদের কাছে হার মানে। তোমার স্নেহ মমতা থাকলে, আমার কথা ভাবতে। আমরা সবাই তোমার স্বার্থের খেলার পুতুল। অভাগী শূর্পণখাকে নিয়ে তুমি এক অন্য পুতুল খেললে আজ।

চমকানো বিস্ময়ে রাবণ উচ্চারণ করল : শূর্পণখা!

হঠাৎই শূর্পণখা বলল : দাদা, আমার উপর এত নির্দয় হতে তোমার কষ্ট হল না? আমার অপরাধ কী? কী করেছিলাম তোমার? বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করে তুমি ছোট হয়ে গেছ। তোমার

ভীরুতা, দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছে। অযোধ্যার রামচন্দ্র জনস্থানের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এটা তোমার পছন্দ ছিল না। তার অবাধ গতিবিধি তোমাকে ভীত করে তুলেছিল। তোমার মনের অভ্যন্তরে সে শুধু গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেনি, সাহসের দুর্গেও আঘাত হেনেছিল। তার ওপর তোমার বিশ্বাসের ধার ক্ষয়ে গেছিল। আস্থার জায়গায় সন্দেহ দেখা দিল। রামচন্দ্রের অরণ্য চষে বেড়ানোর সুফল ফলতে আরম্ভ করেছিল। বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করে তুমি নিজের কাছেই হেরে গেলে। এ যে তোমার কত বড় পরাজয় কল্পনাও করতে পারবে না।

রাবণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : শূর্পণখা বিশ্বাস কর, আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি। তবু আমার তীরে অতর্কিতে বিদ্ধ হলো। নিমিত্তের ভাগী হয়ে তোর কাছে চির অপরাধী হয়ে থাকলাম। প্রকৃত ঘটনাটা বলি বলি করেও বলা হয়নি। শুধু তোর কষ্টের কথা ভেবে বলতে পারিনি।

বানানো গল্পটা আর নাই বা বললে। যা জানবার আমি জেনে ফেলেছি। তোমার গল্পে তার হেরফের হবে না।

শূর্পণখা!

তুমি ভুল করছ দাদা। বিদ্যুৎজিহ্ব তোমার শত্রু ছিল না। তার সঙ্গে তোমার মতে মিলত না ঠিক, কিন্তু তোমাকে সে শ্রদ্ধা করত খুব। তুমি ছিলে তার গর্বের পাত্র, অহংকারের মানুষ। রাক্ষসজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তুমি যা করছ, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল তার। তোমার দাদাগিরিকে সে পছন্দ করত না, কিন্তু তোমার নীতিকে মান্য করত। তুমি তার বাইরের অবাধ্যতা আর বিপক্ষাচরণকে বড় করে দেখলে। তার গর্ব, অহঙ্কারকে দেখলে না। বিদ্যুৎজিহ্ব কোনদিন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু তার প্রখর আত্মসম্মানজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বই তোমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পাছে তোমার আদেশ নির্দেশ না মানে, তোমার সংস্রব ত্যাগ করে বিদ্রোহ করে, রামের সঙ্গে হাত মেলায় তাই ঝুঁকি নাওনি। পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিলে। কিন্তু সে ছিল বিশ্বস্ত মিত্র এবং পরম আত্মীয়। তাকে চিনতে ভুল হয়েছিল তোমার। আর সে ভুলের মূল্য সারাজীবন তোমাকে দিতে হবে।

রাবণ সহসা চুপসে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না। মুখস্থ করা বুলির মত বলল: ভুল দেবতারও হয়। আবার তা শুধরে নেয়। আমাকে তুই এবারের মত ক্ষমা করে দে। যা হয়ে গেছে তার জন্য অনুতপ্ত আমি। অপরাধীর মত কথাগুলো আস্তে আস্তে বলল।

প্রত্যুত্তরে শূর্পনখা বিমর্ষগলায় বলল, তুমি যা হারালে অনুতাপ করে কোনকালে ফিরে পাবে না। তোমার অবিশ্বাসের ফাটল দিয়ে যে তীরটি আমার স্বামীর বুকে বিঁধল তার মরণ আঘাত থেকে তুমিও পরিত্রাণ পাওনি। আমার বীরের প্রাণ বিয়োগের সঙ্গে তোমারও একধরনের মৃত্যু হলো। তোমার এই মৃত্যু খালিচোখে দেখার নয়, প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিতে হয়। সবার সে চোখ থাকে না, কিন্তু রামচন্দ্রের আছে। সে তোমার আত্মার অপমৃত্যু দেখতে পেয়েছিল। তার মতো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অবশ্যই বুঝতে পেরেছে তুমি ভয় পাচ্ছ তাকে। দণ্ডাকারণ্যে তার আগমনকে অন্যদের মতো মেনে নিতে পারছিলে না। সেটাই ছিল তোমার দুশ্চিন্তা। বনে বনে তার পরিভ্রমণকে তুমি সন্দেহের চোখে দেখছিলে। তুমি তো সকলকে সন্দেহ কর। আমাকেও। নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস কর না। তোমার মনের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে বিশ্বাসের এবং সাহসের এক আশ্চর্য মৃত্যু হয়ে গেছে। বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করে দণ্ডকের দখল নিয়ে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে দেয়াল স্বজন হারানো শ্মশানের মাটির উপরে তৈরি করলে তার প্রতিটি পাথরের গায়ে বিশ্বাসঘাতকতার নাম লেখা আছে। তুমি পালাবে কেমন করে? তোমার চরিত্রে এ কলঙ্ক মুছবার নয়।

মা-মা করতে করতে শম্ভু ঢুকল ঘরে। তার আচমকা মা ডাকে শূর্পণখার ভেতরটা চমকে গেল। অপত্য স্নেহ হঠাৎই বাঁধ ভাঙা নদীর মতো উন্মত্ত উৎসারে শম্ভুর দিকে ধেয়ে গেল। কিন্তু সে কিছুই করল না। থম ধরে বিছানায় বসে রইল। তার খুব অবাক লাগল, এতক্ষণ যার সঙ্গে এত ঝগড়া করল সেই রাবণ ঘরে কোথাও নেই। শম্ভুই তার সামনে একমাত্র বাস্তব সত্য। ঘরে সে ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় প্রাণী নেই। তা-হলে এই বিরূপতা, কাল্পনিক অভিযোগ, অনুযোগ, সবই

কী তার মনের অভ্যন্তরের প্রতিক্রিয়া? ভীষণ আশ্চর্য লাগল শূর্পণখার। অবাক অভিভূত আচ্ছন্নতায় সে কেমন জড়বৎ হয়ে রইল।

শম্ভুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শূর্পণখা। অভিমানে শম্ভুর হঠাৎ চোখ ভরে জল নামে। আদরের বদলে অবহেলার দুঃখটা সে সইতে পারে না। ঠোঁট ফুলিয়ে অসহায়ের মতো কাঁদল। চকিতে শূর্পণখা তাকে বুকে টেনে নিয়ে আদরে আদরে ভরে দিল। শূর্পণখারও চোখ ভিজে গেল। হাত দিয়ে মুছে নিয়ে কান্না বিজড়িত গলায় বলল : কাঁদে না বাবা, কাঁদতে নেই। কাঁদলে সব হাল্কা হয়ে যায়। চোখের জলে বুকের আগুন নিভে গেলে কী নিয়ে বাঁচব? ঐ আগুনটুকু তোর বড় হওয়া পর্যন্ত আমার বুকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে শম্ভু ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করল: মা, তুমিও তা-হলে বাবার মতো পুড়ে যাবে। আমি তখন কার কাছে থাকব?

শূর্পণখা ছেলেকে বুকে জাপ্টে ধরল। নিবিড় হয়ে মিশে গেল তার সঙ্গে। কোমল পেলব বাহুর পেশী ফুলে উঠল। বিদ্যুৎজিহ্বর এই স্মৃতিটুকু তার প্রেমের, মিলনের, আনন্দের। একে সে বুকে ধরে রাখবে। সব কিছু দিয়ে আগলাবে। শম্ভু তাদের জীবনের অসংখ্য স্মৃতি-সূত্র দিয়ে গাঁথা একটি মালা। সে কাছে থাকলে বিদ্যুৎজিহ্বর সঙ্গে মনে মনে কত কথা বলে। শম্ভুর মধ্যে বিদ্যুৎজিহ্বাকে দেখে। ছেলেও হয়েছে বাপের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

আস্তে আস্তে শূর্পণখার হাতের বন্ধন শিথিল হল। কোলের উপর বসিয়ে তার দু'চোখের উপর আঁখিযুগল মেলে ধরল। অনাবিল খুশির প্রসন্নতায় ভরা মমতামাখানো দুটি চোখে কী গভীর মায়া তার। শম্ভুও মায়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজে। হঠাৎ মায়ের বক্ষযুগলের মাঝে মুখ গুঁজে প্রচণ্ড জোরে আঁকড়ে ধরে তাকে—ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, না আনন্দে শূর্পণখা বুঝে উঠতে পারে না। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় শূর্পণখাও কুঁকড়ে যায়। শম্ভুর মাথার উপর গাল রেখে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তার মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য অভয় দিয়ে বলেঃ দূর বোকা! কোন দুঃখে আগুনে পুড়ে মরব? এ আগুন কি, সে আগুন! মনের ভেতর যা ধিক ধিক করে জ্বলে তা আগুন নয়—একধরনের প্রতিকারহীন অক্ষমতার যন্ত্রণা, গ্লানি, অপমান আর বিদ্রোহের জ্বালা। বড় হলে বুঝতে পারবি। মনের এ আগুন, সত্যিকারের আগুনের মতোই অনেক কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

শম্ভুর ভয় কাটে না। বরং আরো ভয়ে বুক ভার হয়ে যায়। চোখের চাহনিও বদলে যায়। দুই চোখ বড় বড় করে সে মার দিকে তাকায়। তারপরেই একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে চোখ বন্ধ করে। ভয় পাওয়া গলায় বলে : মা, তুমি চুপ কর। আগুনের কথা বল না। আগুনের নাম শুনলে আমার ভয় করে। মন খারাপ হয়ে যায়। আমার অমন সুন্দর বাবা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঐ আগুনে তুমিও পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আমার যে আর কেউ থাকবে না। কাকে মা বলে ডাকব? চোখের আড়ালে পুড়ে মরতে তোমার কষ্ট হবে না? আমার কথা তোমার একটুও মনে হবে না? বাবার মতো তুমিও আমাকে ভালবাস না।

শূর্পণখা কথা বলতে পারে না। চোখ ভরে জল নামে। তাকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। তার আতঙ্কিত রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের উপর মুখ ঘষে। চুমু দেয়। আদর করে। চুলে বিলি কেটে দেয়। শম্ভুও মায়ের মমতায়, সোহাগে একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভেতরটা দৃঢ় হয়। দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে চুমু দিল। চুমু দেয়ার আগে তার ঠোঁট দুটো কুঁচকে গোলাকার এবং ছুঁচলো হয়ে যায়। ছুঁচল অধরদ্বয় মায়ের ঠোঁটে চেপে ধরে সশব্দে চুম্বন করে। শূর্পণখা তার ঐ সশব্দ চুম্বনটি পাওয়ার জন্য গালটা পেতে দেয়।

শম্ভুর কুঞ্চিত বর্তুলাকৃতি ওষ্ঠদ্বয় শূর্পণখার গালের উপর স্থির হয়ে আছে। শূর্পণখার শরীরের মধ্যে হঠাৎই শিহরণ খেলে গেল। বুকে নূপুর বাজছিল যেন।

অনন্ত সময় চলে যায়। ডুবে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে তার শরীরে মধ্যে। কী ভালো লাগছিল তার। অনির্বচনীয় আনন্দে ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। চোখের পাতা দুটো আরামে বুজে এল। মনে মনে বলল, হে ঈশ্বর! এই ক্ষণটুকু শেষ না হয় যেন। অনন্তকাল ধরে এমনই থাকুক।

দেয়ালের গায়ে বিদ্যুৎজিহ্বর আঁকা তেলরঙের ছবি সুদৃশ্য লতাপাতার ফ্রেমে আটকানো। ক্যানভাসে নীল আকাশ জুড়ে মস্ত বড় সাতরঙা এক রামধনু। তুলোয় পেঁজা সাদা সাদা মেঘ আলতো ভাবে নীল আকাশ ছুঁয়ে আছে। একঝাঁক সাদা বক ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে নীল আকাশ ছুঁয়ে। তাদের সাদা পালকের গায়ে বেলা শেষের সূর্যের হলুদ রঙ লেগেছে। আর অদূরে নীল নদী দেখা যাচ্ছে। পাড়ে সবুজ তাল, নারকেল এবং খেজুর গাছের সারি। ক্ষেতভরা সবুজ ফসল বাতাসে নুয়ে আছে। দূরে ছোট কুটীর দেখা যাচ্ছে। সব ছবিতে কুটীর আঁকার কাজটা শেষ হয়নি। রঙের কাজটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। একজন মহিলা কুটীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কার তরে অপেক্ষা করছে। পাশেই কাপড়ের খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে একটি বালক। তারও স্বপ্নের নীল চোখে কার তরে প্রতীক্ষা যেন। এ হলো বিদ্যুৎজিহ্বর নিজের স্বপ্নের ছবি। স্বপ্নের ক্যানভাস ভরে উঠেছে রঙে রঙে। কেবল ঘরেই রঙ টানতে বাকী। অর্ধসমাপ্ত ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শূর্পণখার চোখে জল এল হঠাৎ-ই। দুফোঁটা অশ্রু শম্ভুর খোলা পিঠের উপর পড়ল। শূর্পণখার নিবিড় বাহু বন্ধনের মধ্যে নড়ে উঠল সে। শূর্পণখার সম্বিৎ ফিরল। মাতা ও পুত্রের মধ্যে নীল আকাশ থেকে যে স্বপ্নের স্বর্গ নেমে এসেছিল মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে তা মিলিয়ে গেল।

মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখখানা শম্ভু তার ছোট্ট দু'হাত দিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরল। মুগ্ধ বিস্ময়ে কী যেন খুঁজল তার কালো চোখের তারায়। আস্তে আস্তে বলল : মা তুমি কাঁদছ।

শূর্পণখা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বলল : কাঁদব কেন বাবা?

বাবার আঁকা ছবিতে অনেক দূরে দাঁড়ানো ঐ মা আর ছেলেটা তো আমরা।

হ্যাঁ বাবা।

একদিন বাবা যখন তোমার ছবি আঁকছিল তখন আমিও চুপি চুপি তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

মনে আছে তোর? ঘরটাই কেবল রঙ দিয়ে শেষ করা হলো না তার। মাথার উপর চাল নেই। ছবির বিশাল ক্যানভাসের মতো আমরা দু'জন একা। শম্ভুর চিবুক ধরে বলল : তুমি বাবার সেই স্বপ্ন। তোমাকে নিয়ে তার কত আকাঙ্ক্ষা; কত কল্পনা—সব ছবির মতো। কবে তুই বড় হবি, আদৌ সে পর্যন্ত পৌঁছবি কিনা কে জানে?

কথাগুলো বলতে বলতে শূর্পণখার বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস পড়ল। মার মন অমঙ্গল আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে উঠল। দু'চোখে জল টল টল করতে লাগল। শম্ভুকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে দু'হাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। মৃদু মন্থন ঢেউয়ে তার বুক ওঠা নামা করতে লাগল। চুলের মধ্যে গভীর মমতায় বিলি কেটে দিতে লাগল শূর্পণখা। থমথমে গলায় অস্ফুট স্বরে ডাকল : শম্ভু! বাবা আমার। সোনা আমার। গভীর সুখানুভূতিতে দু'চোখ বুজে গেল তার।

বিদ্যুৎজিহ্বর আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেবলই মনে হতে লাগল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। তার কীর্তির মধ্যে, প্রিয়জনের অনেক স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকে সে। তারও একটা জাগতিক অস্তিত্ব আছে, তবে ভিন্ন এক সত্তার মধ্যে। বিদ্যুৎজিহ্ব নেই, কিন্তু তার সন্তান আছে। সে তার আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এক প্রাণ, তার শরীর থেকে জাত এক সত্তা। তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎজিহ্ব থাকল না, কিন্তু তার প্রাণের, তার আনন্দের অম্লান শিখা রয়ে গেল শম্ভুর মধ্যে। এই ভাবনায় সারা শরীর হঠাৎই পুলকে, গৌরবে, কন্টকিত হতে লাগল। স্বপ্নাতুর চোখে শূর্পণখা শম্ভুকে দেখতে লাগল। আর এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে তার অভ্যন্তরটা টৈটুম্বর হয়ে যাচ্ছিল।

॥ তিন ॥

মনের যন্ত্রণায় নিজেকে কষ্ট দেওয়া সহজ, কিন্তু মন খারাপ করা বিষণ্ণতার বোঝা বয়ে বেড়ানোর ভেতর সত্যি কোন আনন্দ, শান্তি কিংবা সান্ত্বনা নেই। এ হল এক ধরনের আত্মহনন। তাই, মানুষের সংসারে এর কানাকড়ি মূল্য নেই। নিজের অযোগ্যতার এবং অক্ষমতা নিয়ে মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান শুধু নয়, নিজের সঙ্গে নিজের ছলনা।

বিদ্যুৎজিহ্বর তিরোধানের এক বছর পর ভস্মাধারের বেদীতে প্রণয়ের পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে এসে কথাগুলো আচম্বিতে শূর্পণখার মনে ভীড় করল। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার ভস্মস্তূপের উপর কতধরনের গাছ-গাছালি এবং ঘাস হয়েছে। কী তাজা আর সবুজ গাছ। লাবণ্য চুঁইয়ে পড়ছে তাদের পাতায় এবং কান্ডে। পাতায় পাতায় খুশির হিল্লোল। মুগ্ধ করা মন নিয়ে গাছগাছালির ভেতর কী দেখল সেই জানে। সবুজ রঙের নধর পাতাগুলো হাত দিয়ে ছুঁলো। করতলের উপর মেলে ধরে তার উপর গাল রাখল। মমতায় চুম্বন করল। নিবিড় ঘুম পাওয়া চোখের মত কী এক গভীর আরামে চোখ দুটো বুজে থাকল অনেকক্ষণ। বুকের গভীরে বিদ্যুৎজিহ্বর স্মৃতিগুলো ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। অনেক দিন, মাস, বছর ধরে জমানো বিদ্যুৎজিহ্বর ভালোবাসা অস্থি-মজ্জার রস শুষে গাছ গাছালির ডালপালায়, পাতায় পাতায় অস্ফুটে কথা কওয়ার জন্য নড়ে চড়ে উঠল যেন। বলল: তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ। কী করে তোমায় বোঝাই বলত? নিষ্ফল পরিতাপের আগুনে শুধু নিজেকে পুড়তে হয়। তাতে সুখ কী? সম্মান কী? তোমার বুকে যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনে লঙ্কা পুড়ে যদি ছারখার না হল, তাহলে ওর দাম কী? প্রিয়তমা তুমি প্রতিশোধ নেবে না। বোনে বোনে কিংবা ভাই-এ ভাই-ভাই-এ লড়াই পুরনো হয়ে গেছে। এবার ভাই ভগিনীর নতুন লড়াই হোক। ভাইর দল যেমন পুরুষ, ভগিনীর দল তেমনি নারী। নারী দুর্বল বলেই তার কাছ থেকে কোন বড় রাজনৈতিক আঘাত কিংবা বড় রকমের শত্রুতার কথা কেউ ভাবে না। প্রিয়তমা, নারী বলে তুমি দুর্বল নও। স্বামী না থাকলে মেয়েরা অনাথ হয়ে যায় না। বরং আরো সংগ্রামী হয়, সাহসী হয়। দুর্দিনে নারী সাহস হারায় না। শক্তিমান হয়। ভেতরের তেজ, দৃঢ়তা মনোবল তাকে সংগ্রামে দুর্জয় করে। ভাইরা ভগিনীদের সেই শক্তির কথাটা ভুলে থাকে। ভাই-ভগিনীর রাজনৈতিক বিবাদের ক্ষেত্রটা আগে কোথাও হয়নি। তোমাকে দিয়ে সে যুদ্ধের সূচনা হলে আমার অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত হবে। প্রিয়তমা, আমাকে যদি সত্যি ভালবাস তাহলে সকল অপশক্তির বিপক্ষে, নির্যাতনের বিপক্ষে তুমি দাঁড়াও। কেউ তোমাকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলে করুক। নিশ্চিহ্ন হওয়া মানেই দুর্বিনীত হওয়ার চিহ্ন রেখে যাওয়া। সেই চিহ্নটা কোনদিন মোছে না। ইতিহাস সযত্নে তাকে তুলে রাখে। প্রিয়তম তোমার বুকের আগুন থেকে দীপ জ্বালিয়ে নিয়ে মহাপৃথিবীর দিকে বেরিয়ে পড়।

হঠাৎ শকুনের কর্কশ ডাকে চমকে উঠল শূর্পণখা। শ্মশানে ফুল হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে একা। গাছ-গাছালির ডাল-পাতা দুলছে মৃদু হাওয়ায়। তাহলে এ-সব কথা অস্ফুট স্বরে তার কানে কানে বলল কে? এ হয়তো তার গভীর মনের অভ্যন্তরে কথা। বিদ্যুৎজিহ্বর ভস্মস্তূপের উপর বেড়ে উঠে গাছ গাছালি মৃদু দোলায়িত পাতা রোষে ক্ষোভে যেন নালিশ জানাল তাকেই।

চৈত্রের কড়া রোদে তেতে উঠেছে বাতাস। জ্বালা ধরা রোদের তাপে ত্বক জ্বালা করছে। তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল শূর্পণখা। রোদকে অগ্রাহ্য করে ফুরফুরে বাতাসে কান পেতে সে হৃদয়ের অভ্যন্তরের কথা শুনতে লাগল। বাতাস বলে, অন্তঃপুরের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে তুমি খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়েছ। তোমার সামনে আর কোন আড়াল নেই। আকাশের সীমারেখা অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে। রোদ ঝলমলে দিনের আলোর ভালোবাসা বুকে করে ঘরে ফিরে গেলে আর কষ্ট থাকবে না।

পায়ে পায়ে ধুলো মাড়িয়ে শূর্পণখা কখন রথে উঠল নিজেই জানে না। একটা ঝাঁকানি দিয়ে রথটা যখন চলতে শুরু করল, তখনই ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাবটা তার কেটে গেল। একটা ক্লান্ত উদাস অন্যমনস্কতা নিয়ে প্রকৃতি দেখতে লাগল।

গাছগুলো একের পর এক পিছনে সরে যাচ্ছে। আর নতুন নতুন নানা দৃশ্যপট ফুটে উঠছে চোখের সামনে। চড়া রোদে পুড়ে মাটির রঙ হয়েছে সিঁদুর রঙা পোড়ানো লোহার মতো। উৎসাহী চোখ মেলে দেখতে লাগল, লাল ধুলো ও ঝরাপাতার ঘূর্ণি তার পিছন পিছন অনেকখানি দৌড়ে এল একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য। রাস্তার দুধারে সারি সারি কত নাম না জানা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মাথা উঁচু করে উঁকি দিয়ে দেখছে তাকে। তাদের বিস্ময় যেন সে।

বিস্ময় শূর্পখারও কম নয়! প্রকৃতির মধ্যে সবুজের কতরকমের বৈচিত্র্য। এক এক গাছের পাতার আকৃতি এবং সবুজ রঙ একরকম হয় না। কেন হয় না, এই রহস্য স্বয়ং বিধাতাও ভেদ করতে

পারেন না। যারা প্রতিদিন এই পরিবেশের ভেতর বাস করছে, সব সময় দেখছে তাদের কাছে রঙের এই হেরফের, তারতম্যের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু শূর্পণখার সৌন্দর্যপিয়াসী মন এসব দেখে মুগ্ধ হয়।

মাঠে কতকগুলো বুনো পাখি চরে বেড়াচ্ছিল। মনের আনন্দে ওদের কেউ ধুলো মাখছিল সারা গায়ে। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে, ডানা ঝাপ্টিয়ে ধুলো ঝেড়েও ফেলছিল। শূর্পণখা অবাক হয়ে পাখিগুলো দেখছিল। একসময় তারা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। এক আশ্চর্য ভাললাগা বোধে তার ভেতরটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ-ই মনে হল রাক্ষসদের পূর্ব পুরুষ এই পথ দিয়ে হেঁটে এসেছিল একদিন উত্তর থেকে দক্ষিণে। তখন এ জায়গাটা ছিল ঘনজঙ্গল। পথ ছিল কাঁচা এবং সরু। শ্বাপদসঙ্কুল সে অরণ্য আর নেই। সেই পরিবেশও বদলে গেছে। সব কেমন নতুন দেখায়। ছোট ছোট গ্রামের ভেতর মুনি ঋষিদের তক্‌তকে আশ্রম, জঙ্গলের রূপটাই বদলে দিয়েছে। ছোটবেলায় এই পথে কত যাতায়াত করেছে। সর্বক্ষণ একটা ভয়লাগা রহস্যে গা ছমছম করত। তখন পথ হাঁটতেই অন্যরকম লাগত। মনে হত এ তার স্বভূমি। কিন্তু আজ একবারও তা মনে হলো না। বরং একধরনের আশঙ্কায় উদ্বেগে মনটা ভার বোধ হল। নিজেকেই প্রশ্ন করল, মাটির বুকে ওই থাবার চিহ্ন কার? কার? মনের উদ্বেগ, আশঙ্কা দুর্ভাবনা এক সঙ্গে আঁ-আঁ করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল যেন। কত জায়গা থেকে হু-হু করে হাওয়া ছুটে এসে বনজঙ্গলের আদিম উপজাতিদের প্রশ্ন চিহ্নিত জিজ্ঞাসা তার কানে কানে ফিস ফিস করে গেল।

বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর পরে এই বসতি নতুন গড়ে উঠেছে। বাসিন্দারা কেউ দক্ষিণদেশীয় নয়। আর্যও নয়। তারা কৃষ্ণাঙ্গ এদেশের মানুষ। উত্তর দেশ থেকে এসেছে। এই অঞ্চলের মাটির সঙ্গে তাদের নাড়ীর বন্ধন নেই। তাদের বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষদের মনের কোনো সম্পর্কও গড়ে উঠেনি। তবু এরা অবাধে নীড় বেঁধেছে। জঙ্গল কেটে চাষ-আবাদের জমি তৈরি করেছে। বন্ধ্যা মাটিতে সবুজ শস্যের সমারোহ।

কিঙ্কুক্ষণের জন্য রথটা একটা গাছের ছায়ায় রেখে সারথি অশ্বদ্বয়কে জল পান করাল, ঘাস পাতা মুখের কাছে ধরল। শূর্পণখাও রথ থেকে নেমে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখল। রাস্তার ধারে ধারে মুনি-ঋষিদের আশ্রম এবং তপোবনের স্নিগ্ধ মাধুর্য পবিত্রতা শূর্পণখার নজর কেড়ে নিল। এঁদের সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আরামে রাখার জন্য কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো নানাভাবে সেবা করছিল।

একজন তরুণ তাপস শূর্পণখাকে দেখে কুটির থেকে বেরিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। যত্ন করে বসাল। পানীয় জল দিয়ে পরিতৃপ্ত করল। তারপর কুশল বিনিময় করে শুধাল: আমরা রামচন্দ্রের সেবক। অগস্ত্যমুনির শিষ্য। ঋষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশেই এখানে এসেছি।

শূর্পণখা বেশ একটু অবাক হয়ে বলল : আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

সৌম্য দর্শন তরুণ তাপস বলল : মহান রামচন্দ্র সারা ভারতবর্ষের পতিত, অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার এক মহান ব্রত নিয়ে এই বনভূমিতে সম্প্রতি পদার্পণ করেছেন। রামচন্দ্র বিশ্বাস করেন একটা দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে তার কৃষির উপর। কৃষিকার্য ভালো হলে অন্যান্য পণ্যোৎপাদনের সৃষ্টি হয়। এভাবেই দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

শূর্পণখা ভুরু যুগল সহসা কুঞ্চিত হল। বলল: আমার দেশ সমৃদ্ধশালী হলে তাঁর উপকার হবে কী? বিনা স্বার্থে এ পৃথিবীতে কেউ কিছু করে না। রামচন্দ্রও তাঁর ব্যতিক্রম নন। আমার রাজ্যের জন্য তাঁর এই গায়ে পড়া উদ্বেগ কেন? তাঁকে তো আমার রাজ্যে আমন্ত্রণ করেনি। বিনা অনুমতিতে কারো রাজ্যে ঢুকে পড়াটা অপরাধ। রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়। অযোধ্যার নর চন্দ্রমার তো একথা অজানা নয়। তা-হলে সাধারণ শিষ্টাচার এবং সৌজন্য দেখাতে তিনি কুণ্ঠিত কেন?

দেবী, গোটা ভারতবর্ষকে তিনি নিজের দেশ মনে করেন। ভারতবর্ষ তাঁর ধরিত্রী। কোন সঙ্কীর্ণ চিন্তা নিয়ে ধরিত্রীকে এক এক অঞ্চলের ভেতর খণ্ডিত করে দেখতে চান না তিনি। ছোট ছোট গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য ভারত জুড়ে রাজনৈতিক অশান্তির ঝড় নিজের নিজের সীমার

ভেতর লড়াই করছে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে। প্রকৃতপক্ষে এ হল রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, দানবদের নিজের ভেতর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। এর ফলে, দেশের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং সংহতির সংহার হলো। বৃহৎ ভারতীয় জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠার পথে অন্তরায় হল গোষ্ঠীযুদ্ধ। একে থামানোর জন্য এবং জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র, রাজ্য, সিংহাসন, আরাম, বিলাস ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর মতো নিঃসম্বল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে তার এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলছেন। দেশের মানুষকে বোঝাচ্ছেন, ছোট ছোট গন্ডীতে আবদ্ধ থাকার জন্য জাতীয় সঙ্কট উদ্ভব হচ্ছে। মন ছোট হয়ে গেলে দেশ ছোট হয়ে যায়! আর তখনই বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ দেখা দেয়। গোটা সম্পর্কটা বদলে যায়—বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা, মৈত্রীতে বৈরীতা, আত্মীয়তায় দৈন্য, প্রেমে সন্দেহ মানুষে মানুষে এক মস্ত ব্যবধান সৃষ্টি করে। শ্রীরাম এই ঘটনা থেকে এক ঐতিহাসিক পাঠ নিয়ে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতার এবং শ্রদ্ধার এক নতুন ভূমিকা নিয়েছেন। শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্র গড়ার কাজে হাল ধরতে হলে সকল সঙ্কীর্ণতা থেকে আগে নিজেকেই মুক্ত রাখতে হয়। বিশাল পৃথিবীকে নিজের ভাবতে হয়। নিজের কর্তব্য মনে করেই মন প্রাণ ঢেলে তা সম্পন্ন করতে হয়।

তাপস কয়েক মুহূর্ত থেমে শূর্পণখার মনের গতি বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর প্রসঙ্গ বদলে বলল : বড় মন আর বড় ত্যাগ ছাড়া বড় কাজ হয় না। বড়র মহত্ত্ব, মহানুভবতা, উদারতা তো আর এমনি তৈরি হয় না। সকলে মিলে তাকে তৈরী করতে হয়। সেজন্য দরকার এক সম্পদশালী এবং সমৃদ্ধশালী দেশ। দুঃখ, দারিদ্র, অভাব, অনটন যে দেশকে স্পর্শ করে না সে দেশই স্বর্গ। দারিদ্র্য আর অভাবের জন্য মানুষ দেবতা হতে পারল না। পৃথিবীও স্বর্গ হলো না! অথচ দেবতা আর মানুষে কোন তফাৎ নেই। মানুষের নীচতা, ক্রূরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, শাঠ্য, লাম্পট্য, দেবচরিত্রেও বিদ্যামান। কর্তৃত্ব, আধিপত্য, প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াই সেখানেও আছে। কিন্তু সেই বিবাদকে সকলের মধ্যে টেনে এনে দেবলোককে তারা হেনস্তা করে না। দেবলোকে সবাই অধীশ্বর, তাদের কোন প্রজা নেই। দেবলোকের ঐশ্বর্য প্রাচুর্য, সম্পদ, সমৃদ্ধি মানুষের করায়ত্ত হলে এ পৃথিবীও স্বর্গ হয়ে উঠবে। শ্রীরাম মানুষের পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্য করার স্বপ্ন দেখেন। রামচন্দ্রের মতো বড় মাপের মানুষকে মন ভর্তি সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষ নিয়ে মাপা যায় না। দেবী, সন্দেহ শুধু সন্দেহ বাড়ায়।

কথাগুলোর ভেতর এমন একটা মুগ্ধতা ছিল যে শূর্পণখা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। তরুণ তাপসের অধরে অনির্বচনীয় জয়ের হাসি, চোখে কৌতুক। শূর্পণখা নিজের বিহ্বল ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বলল : তবু সন্দেহের কারণ অবিশ্বাস। কীভাবে, এবং কেন মানুষ অবিশ্বাসী হচ্ছে তা জানার চেষ্টা যদি না থাকে তা-হলের মন ভরানো কতকগুলো ফাঁকা বুলি আওড়ালে রামের স্তুতি করলে তো আর বিশ্বাসের জমি তৈরী হয় না। তার জন্যে শ্রীরামের উদ্যোগ কোথায়?

তরুণ তাপস কোমল কণ্ঠে বলল : দেবী! পূর্ব পুরুষদের কার্যকলাপের ফলে, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের মনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে শ্রীরাম তার আত্মগ্লানি এবং খেদ দূর করার জন্য নিজের রাজ্য, সিংহাসন, রাজসুখ, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস ত্যাগ করে একজন দীন সন্ন্যাসীর মত দেশ দর্শনে বেরিয়েছেন। পাছে কোন অবিশ্বাস, সন্দেহে মন আবিল হয়ে উঠে, বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাই রাজবেশ ছেড়ে, শস্ত্র ত্যাগ করে, স্ত্রী ও ভ্রাতার সঙ্গে কুটীরে কুটীরে ঘুরে মানুষের প্রেম ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছেন। তাদের অতিথি হচ্ছেন। বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করছেন। এর পরেও কী তাঁর সততা সম্পর্কে অবিশ্বাস করা যায়?

শূর্পণখা হাসল, অবিশ্বাসের হাসি। বলল : বাইরে দেখে কী একটা মানুষের আসল-নকল বোঝা যায়। একজন মানুষকে চেনা কী এতই সহজ! রামচন্দ্র এই যে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কুটীর নির্মাণ করে দীন-দরিদ্রের মতো বাস করছেন, কালো মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন তাতেই কী প্রমাণ হয়ে যায় তিনি কালো মানুষদের আস্থাভাজন হয়েছেন। এটুকু দিয়ে কারো আন্তরিকতা মাপা যায় না! যদিও এভাবেই চারপাশের অসংখ্য নর-নারী তাঁকে বিশ্বাস করে ধন্য হচ্ছে তবু একে মানুষের সন্দেহ দূর করতে সফল হয়েছেন বলে না। সাধারণ মানুষ রামচন্দ্রকে কতটুকু জানে?

জানলে এমন করে বোকা বনত না। অনুগত হওয়ার বদলে বিদ্রোহ করত। কিন্তু রামচন্দ্র নানা কথায় এবং অঙ্গীকারে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দিয়ে তাদের এমন করে ভোলাল, আদর্শের তপ্ত আলোকে মন এমন রাঙাল যে নিজের ভালোমন্দ বোধটাই তারা হারিয়ে বসল। আমার তো তাদের মতো হলে চলবে না। নিজের বিশ্বাসে অটুট থেকেই রামচন্দ্রকে চিনতে হবে।

তাপস বিস্ময়ে শূর্পণখার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল : আপনিও চাইলেও শ্রীরাম সংঘাত পরিহার করে চলবেন। আপনার বিশ্বাস ও কর্তব্য নিয়ে যদি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে না পারেন তা-হলে তাঁকে বিপদে ফেলে নিজের সঙ্কট ডেকে আনবেন না। আগুনে হাত রাখলে হাত পোড়ে ভুলে যাবেন না যেন। আমি ঋষি বালক, একটুতে ভয় পাওয়া আমার অভ্যাস। তাই, অল্পেতেই দুশ্চিন্তা হয়।

আমার জন্য দুশ্চিন্তা হয়। হাসালে।

একথা বলছেন কেন? মানুষ হয়ে মানুষের জন্য একটু দরদ, মমতা, সহানুভূতি ভালবাসা যদি দেখাতে না পারি তা-হলে জানোয়ারের সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়?

জানোয়াররা মানুষের মতো ভণ্ড নয়। তাদের ভেতর ছলচাতুরির বালাই নেই। একটা জানোয়ারকে মানুষের চেয়ে চেনা সহজ। বিশ্বাস, ভালোবাসার দাম মানুষ দেয় না, জানোয়ার দেয়। এটাই হল মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ।

তাপস যুবক একটু থমকাল। কথায় শূর্পণখাকে হারাতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজে হেরে না গিয়ে তাকে হারানো যাবে না। হয় তো বা এক্ষেত্রে হেরে যাওয়াটা তার কাছে এক বড় জেতা হয়ে উঠতে পারে। আস্তে আস্তে বলল : দেবী কোন জানাই বোধ হয় অভ্রান্ত নয়। জানার জগৎ প্রতিদিনই বদলে যায়। আজ যেটাকে অভ্রান্ত এবং সত্য বলে মনে হচ্ছে সেটা কয়েক মুহূর্তের ভেতর ভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হতে পারে। হয় তো এমন না হলে সকলের জীবন এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকত। সেটা হয় না বলেই এই জানার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে চেনাও শেষ হয় না কোনদিন!

তোমার শূন্যগর্ভ কথাগুলোর কোন মানে হয় না। একটু আগেই তুমি বলেছ, শ্রীরামের বিরুদ্ধাচরণ করার বিপদ আছে। তাই সাবধান হওয়ার হুমকি দিয়েছ। এভাবেই স্তুতিকাররা কৌশলে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সাধারণের মনে।

তাপস বিব্রত বোধ করল। অপরাধীর মতো বলল : দেবী, আমার ভুলের জন্য ক্ষমা করে দিন। তাঁর মহিমার কথা আমি বোঝাতে পারনি এ আমার অক্ষমতা, আমার দৈন্য।

শূর্পণখা তার ক্ষমা প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে কিছুই বলল না। তপোবনের দিকে চেয়ে বলল : আমাদের ভাবনা, চিন্তা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনাগুলো যে কোন স্তরে তুমি বুঝবে না। তোমরা ধর্মচর্চা করতে অন্যের রাজ্যের সীমানার ভেতর ঢুকে পড়ে ক্ষতি করছ তাদের। সাধকের ধর্মসাধনা দেখা দিচ্ছে রাজদণ্ড রূপে। ধর্মপ্রচার ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের চেহারা নিচ্ছে। আমাদের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদই আমাদের বৈরী।

বিনীতকণ্ঠে তাপস বলল : দেবী আপনার অসন্তোষের কারণ আমি বুঝি। কিন্তু এজন্য শ্বেতাঙ্গদের দোষ দিচ্ছেন কেন? কালো মানুষেরা যদি সাদা মানুষদের হাতে তাদের দেশ তুলে না দিত, মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের সাধ্য কী তাদের অধিকারে ভাগ বসায়?

প্রতিবাদ করার সময় শূর্পণখার দুচোখ জ্বলে উঠল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল: মিথ্যে কথা।

দেবী, কালো মানুষদের দেশে শ্বেতাঙ্গরা মুষ্টিমেয়।

শূর্পণখার তেজের সঙ্গে বলল : গোরাদের সাম্রাজ্য ক্ষুধার অনলে কালো মানুষেরা নির্বোধের মতো আহুতি দিয়েছে। গোরাদের বিশ্বাস করে তারা ঠকেছিল। তাদের গোষ্ঠী কোন্দল উস্কে দিয়ে গোরারা নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে চলল। যখন চৈতন্য হল তখন তারা অধিকার, সম্পদ, সম্পত্তি সব হারিয়ে বসেছে। এমন কি তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ঐতিহ্যও বন্ধক দিয়েছে। নিজের দেশে কালারা পরবাসী হল। দাসে রূপান্তরিত হল। অবিচার অত্যাচার জর্জরিত কালা মানুষদের অন্তরে ধূমায়িত বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ পাচ্ছে। এখানে সেখানে ছোটখাট অভ্যুত্থান গোরাদের ঘুম কেড়ে

নিয়েছে। নিজেদের ঘর গোছানোর জন্য শ্রীরাম এক নতুন নাটক শুরু করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে মৈত্রী সফর, সম্ভাবনার অভিযান। বিদ্রোহের পরিবেশে শ্রীরামের নয়া অভিষেকের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কেমন করে বুঝব তিনি কালো মানুষের আপনজন, তাদের ঘরের লোক। বিশ্বাস যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তাকে বৈরীর চোখে দেখব।"

দেবী অতীতের কথা ভুলে যান।

অতীতকে ভোলা কী অতই সহজ। অতীত যে ইতিহাস জীবনকে দেখার দর্পণ। অতীত থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। কারণ, মানুষের স্বভাব চরিত্র খুব একটা পাল্টায় না বলেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। যে মানুষ বা দেশ অতীত থেকে শিক্ষা নিতে শেখেনি, সে মানুষ বা দেশকে সর্বনাশের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। সর্বনাশের আগাম সংকেত তো বাক্যে বাচ্যে তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ। এটাই তো ইতিহাসের সতর্ক বার্তা।

দেবী ভ্রম বশে যা বলেছি, সে আমার দোষ। আমাকে অপরাধী করে মিছে কষ্ট পাচ্ছেন নিজে। দেবী, আমার একটা অসতর্ক কথার জন্য তো আর ইতিহাস থেমে থাকবে না। নদীর মতো নিরন্তর তারও গতি বদলায়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস অলক্ষ্যে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে। বর্তমান প্রতিমুহূর্ত ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। এ ভাঙা-গড়া চোখে দেখা যায় না। তবে, কালচক্রের আবর্তনে প্রতিমুহূর্ত ঘূর্ণিত ও চূর্ণিত হচ্ছি। কালচক্র থেমে নেই। থেমে থাকা মানে অবসান। বংশগতির মধ্যে সৃষ্টি প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। বন্য প্রাণীও কত বদলে গেছে। দুর্বার কালস্রোতের টানে প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের জীবনধারা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এককালে একবার কী ঘটেছিল বলে তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে এর কোন মানে নেই। পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কায় নিরাপত্তার জন্য যদি গর্তের মধ্যে সিঁধিয়ে থাকি তা-হলে গর্তের বাইরে যে বিশাল পৃথিবীটা রয়ে গেল তাকে চেনা জানা কোনদিন হবে না। দেবী মাটির সঙ্গে চাকার নিরন্তর ঘর্ষণে রথ যেমন চলে তেমনি সংঘাতের ভেতর দিয়ে আমরাও অনবরত চলেছি। নিজেরাও তা জানি না। চলাটাই সত্য। চলাটা জীবনের ধর্ম বলে সবাই চলতে চায়। পৃথিবীর এই গতিতত্ত্ব যারা বোঝে না তারা বাঁচতেও জানে না। বাঁচা মানে লড়াই করা। একটা ক্ষুদ্রতম কীটও প্রাণধারণের জন্য পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো একজন স্বচ্ছল মানুষও সংগ্রাম করছে নিজের সঙ্গে, চারপাশের পরিবেশ ও পরিজনের সঙ্গে এবং সর্বশেষে নিজের অসংখ্য চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার সামান্য সংগতি ও সামর্থ্যের সঙ্গে নিরন্তর সংঘাত হচ্ছে। সংঘাত থেকে মুক্ত নয় কোন মানুষ। সংঘাতটা বেঁচে থাকার লক্ষণ। যেদিন জীবনে সংঘাত করার মতো পরিবেশ থাকবে না, সেদিন বেঁচে থাকার অর্থ এবং আনন্দটাও ফুরিয়ে যাবে।

শূর্পণখা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাপসের দিকে। ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ে। বলল: কিন্তু সেটা হবার নয়।

তাপস বলল : কারণ বিরোধটা আমরা জীইয়ে রাখতে চাই। শান্তিপূর্ণ সমাধান আমার চাই না। রাজার ছেলে হয়ে শ্রীরাম কাঙালের মত ভালোবাসা ভিক্ষে করছে বলেই তার আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করছি। চিন্তা-ভাবনায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের এই তফাৎটা তো কোনকালে ফুরোবে না। জীবন পথে চলতে চলতে পথিক যখন চৌ-রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়, তখন তাকেই ঠিক করতে হয় কোন পথে গেলে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। দেবী, আপনিও তেমনি এক চৌরাস্তার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। এক পথে আপনি আর এক পথ রাবণের দিকে গেছে। আর আপনার সম্মুখে যে রাস্তা পড়ে আছে সেটা স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বর স্মৃতি ও প্রেমের প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ গ্রহণের রাস্তা. আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এবং অবশিষ্ট পথটি গেছে রামের দিকে চলে। আপনি বিভ্রান্ত। চার রাস্তাই আপনাকে সমানভাবে টানছে। আপনাকেই স্থির করতে হবে কোন পথে যাবেন?

শূর্পণখা চমকাল। কথাগুলো তার মনে ভীষণভাবে দাগ কাটল। এমন অদ্ভুত কথা এত স্পষ্ট করে তাকে কেউ বলেনি আগে। বয়সে তাপস তার চেয়ে ছোট। কিন্তু সে একেবারে মনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। এ তাপস জাদু জানে। কথা কাটাকাটির খেলা করা তার সঙ্গে বিপজ্জনক। কথার

কোন জবাব না দিয়ে শূর্পণখা রথে উঠল। সারথিকে বলল : প্রাসাদে চল।

অশ্বখুরের আকস্মিক শব্দে অনেক পাখি একত্রে কলরব করে ওঠল আনন্দে, আবেগে, খুশিতে, না বিরক্তিতে শূর্পণখা চেষ্টা করেও বুঝতে ব্যর্থ হল। তার সামনে দিগন্তহীন উন্মুক্ত নীল আকাশ। এখানে ওখানে ছোট বড় সাদা মেঘের খন্ড নোঙর করে আছে যেন। বিশাল আকাশের নীড়ে ওরা বেশ নির্ভাবনায় এবং সুখে আছে। সুখ কথাটা অবশ্য আপেক্ষিক। সত্যিকারের সুখ যে কোথায় এবং কিসে মানুষ নিজেও ভালো করে জানে না। সকলের সুখ একরকম নয়। প্রত্যেকের সুখের ঘর আলাদা আলাদা। সুখ বলে সারা জীবনটা যার পিছনে কাটিয়ে দিল সে যে মরীচিকা হয়ে কখন তার জীবনটা গ্রাস করল অন্তিম মুহূর্তের আগে জানতে পারল না। তবু সুখের মায়ামৃগের পেছনে মানুষ ছুটছে নিরন্তর। এই ভবিতব্য থেকে মানুষের মুক্তি নেই। থাকবে কী করে? কাঙালের মতো সুখ চায় বলেই সুখ তাকে ছলনা করে?

বনপথে সারথি রথ থামাল হঠাৎ। শূর্পণখার চিন্তার ছেদ পড়ল। সারথিকে কিছু প্রশ্ন করার আগে একটা অদ্ভুত দৃশ্যের উপর তার চোখ জোড়া স্থির হয়ে গেল। বড় বড় শিঙওয়ালা এক বুনো মহিষ বিশাল একটা গাছকে অকারণে অনবরত গুঁতিয়ে চলেছে। তার ধাক্কায় ক্ষণে ক্ষণে গাছের ডাল যেন শিউরে উঠছে। আশ্রিত পাখির দল সন্ত্রস্ত হয়ে এ ডাল ও ডাল করছে। কেউ কেউ ভয়ে উড়ে গেল অন্য কোথাও। কিন্তু মহিষের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। একার চেষ্টায় ঐ গাছটাকে উপড়ে ফেলার খেলায় সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে তার শক্তি সামর্থ মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত যেন। শিঙ-এর খোঁচায় গাছের ফাটা ফাটা ছাল ছিন্নভিন্ন হতে লাগল। মহিষও অক্ষত রইল না। শিঙের অগ্রভাগ ভেঙে গেছে তার। সেখান থেকে ঘন রক্ত ঝরছে। শিরা উপশিরার মতো চোখের ধার বেয়ে নাকের চারপাশ ঘিরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াচ্ছে। গাছের ছালে গা ঘষে গিয়ে অনেক জায়গায় চামড়া কেটে ভেতরের লাল মাংস বেরিয়ে পড়েছে। তবু মহিষটা ক্ষান্ত হচ্ছে না। দু চোখের চাহনি ব্যথা এবং যন্ত্রণায় আর্ত। তবু গোঁ ছাড়ছে না। একটু করে বিশ্রাম নিচ্ছে পরক্ষণেই তেড়ে যাচ্ছে আক্রোশে। ওরকম খ্যাপা জানোয়ারের সামনে দিয়ে রথে যাওয়া নিরাপদ নয়। যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে মহিষ রণে ভঙ্গ দিচ্ছে ততক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে।

দেহরক্ষীরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে ঐ বুনো জানোয়ারটা খতম করতে উদ্যত হল। শূর্পণখা চিৎকার করে নিষেধ করল। খবরদার, ওর গায়ে একটি তীরও ছুঁড়বে না। ওর ভেতর আমি রুক্ষ, উগ্র প্রকৃতির, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা এক রোখা রাক্ষস জাতিকে দেখছি। ওর সব সংগ্রাম যেন আর্যসাম্রাজ্যের প্রতিভূ ঐ মহীরুহের বিরুদ্ধে। এ মাটির রস নিঙরে নিয়ে ঐ গাছ মহীরুহ হয়েছে। তবু ওর কচি পাতার উপর মহিষের কোন দাবি নেই। অধিকার নেই। বনের প্রভু হয়ে কত পশুপাখিকে আশ্রয় দিচ্ছে তার ছায়ায়। রক্ষীরা মন দিয়ে শোন : অনেক কাল আগে আমাদের এই জংলী মানুষদের মধ্যে সাদা মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটল একদিন। মহীরুহের মতো তারা আর্যসাম্রাজ্যের শিকড় চাড়িয়ে দিল এদেশের মাটিতে, সম্পদে। কালো মানুষেরা জানতে পারল না তাদের নিঃশব্দ বিচরণ। বিশাল সাম্রাজ্য যখন মহীরুহের আকার নিল তখন চৈতন্য হলো তাদের। কালো মানুষেরা বড় দেরী করে বুঝল। ঐ বুনো মহিষের মতো সমূলে তাদের উৎপাটিত করার চেষ্টা করছে এখন। কিন্তু জংলী মহিষের মতো ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে তারা। তবু উদ্যমের অভাব নেই। ক্ষত বিক্ষত মহিষের মতো রাক্ষস জাতিও আক্রোশে ফুঁসছে, গজরাচ্ছে। জয়-পরাজয়ের কথা নয়, নিজের অধিকারের জন্য জীবন পণ করে আমৃত্যু লড়াইর এই সঙ্কল্প সাম্রাজ্যবাদী আর্যদের শান্তিতে রাজত্ব করতে দেবে না, এটাই সুখের কথা।

শূর্পণখার এসব কথা কতটা বুঝল দেহরক্ষীরাই জানে। কিন্তু কথাগুলোর চৌম্বক আকর্ষণ তাদের মনে গেঁথে রইল। মুগ্ধ চোখে তারা শূর্পণখাকে দেখতে লাগল। এই কথার ভেতর শূর্পণখার যন্ত্রণার ঝঙ্কার যেন দৈববাণীর মত তাদের কানে স্পন্দিত হতে লাগল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। তার শান্ত মুখ, দীপ্ত দুটি চোখ যেন বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে উঠল। আর তাকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মতো দুর্জয় আর অপরূপ দেখাল। দেহরক্ষীদের সম্মোহিত দৃষ্টি তার কালো দুই চোখের তারার উপর স্থির হয়ে রইল।

॥ চার ॥

শূর্পণখার জন্য অপেক্ষা করছিল খর ও দূষণ। সম্পর্কে খর হলো বৈমাত্রেয় ভাই আর দূষণ হল দেবর। বিদ্যুৎজিহ্বর সহোদর। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর পর রাবণ কার্যত সে সাম্রাজ্য দেখাশোনার ভার অর্পণ করেছিল দুজনকে। রাজকার্যের বাইরেটা সামলাতো দূষণ আর অভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের ব্যাপারে শূর্পণখাকে সাহায্য করা এবং বিবিধ মন্ত্রণা দেয়ার দায়িত্ব ছিল খরের ওপরে। দুজনের আলাদা আলাদা গুপ্তচর সংস্থা ছিল। এবং আলাদা আলাদা ভাবে তারা তা নিয়ন্ত্রণ করত। কে কার গুপ্তচর হয়ে কাজ করছে তা নির্ণয় করা ছিল অসম্ভব। তাই ভ্রম নিরসনের জন্য একত্রে শূর্পণখার সম্মুখে দেশের রাজনীতি এবং বিবিধ সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা আলাপ আলোচনা করত। শূর্পণখার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দুভাই প্রতীক্ষা করছিল।

বালক শম্ভু তাদের সঙ্গ দিচ্ছিল। কথাবার্তার সময় বালকমনের কতরকম কৌতূহল, জিজ্ঞাসা শম্ভুকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মার মুখে রাক্ষসবংশের এবং এদেশের কালো মানুষদের সংগ্রামদৃপ্ত জীবনের যেসব কাহিনী শুনেছিল সেটাই মনে পড়ে যায়। সঙ্কোচে দূষণকে জিগ্যেস করে : মামা, গায়ের রঙ কালো হলে যদি অনার্য হয় তা-হলে রামচন্দ্র আর্য হয় কী করে? তাঁর গায়ের রঙ কালো কেন? লোকে বলে কালোদের পরিত্রাতা হয়ে জন্মেছেন তিনি। তা যদি হবে, তা হলে রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া কেন? আমাদের অপরাধ কী?

বালকের প্রশ্নে অবাক হয় খর। ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। বিহ্বল ভাবটা কেটে যাওয়ার পরে বলল : ভাগ্নে, বড় শক্ত প্রশ্ন। অপরাধটা শুধু কালো বলে নয়, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া। এ ঝগড়া কালো মানুষদের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে চলেছে। গোটা আর্যাবর্তের কালো মানুষদের তারা শৃঙ্খল পরাতে পেরেছে। কু হোক সু হোক সারা দেশের কালো মানুষগুলোকে একটা শাসনের আওতায় তারা এনেছে। দাক্ষিণাত্যকেই বাগে আনতে পারছে না। প্রবল পরাক্রান্ত, স্বাতন্ত্রপ্রিয়, স্বাধীনচেতা রাক্ষসজাতিই তাদের পথের কাঁটা। এই কাঁটা তুলতে পারলে আর কোন বাধা রইল না। গায়ের কালো রঙের জন্য শ্রীরাম অল্পেই কালো মানুষদের আস্থাভাজন হচ্ছেন। আর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের কাজে তাঁর গায়ের ঐ রঙ খুব সহায় হয়েছে। আর্য সাম্রাজ্য যত বিশাল হচ্ছে অনার্য রাজাদের সীমানা তত হারিয়ে যাচ্ছে।

শম্ভু অবাক অভিভূত গলায় বলল : আশ্চর্য তো!

আরো আশ্চর্যের কথা, বিশাল জনসংখ্যার একভাগ মাত্র গৌরবর্ণ আর্য। বাকি তিনভাগ হল এদেশের কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, দানব, নিষাদ, ধীবর প্রভৃতি। আবার এর মধ্যে সাদা কালোর রক্তের সংমিশ্রণে একভাগ নতুন বর্ণসঙ্কর আছে। এরাই আমাদের সমস্যা। শ্রীরামের গায়ের রঙ নিয়ে তাই অনেক জল্পনা কল্পনা। কেউ বলে তাঁর পূর্বপুরুষের গায়ে কালো রমণীর রক্ত ছিল। শ্রীরাম সেই বংশধারা বহন করে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন। বিশ্বামিত্রর নেতৃত্বে ঋষিকুল রামের গায়ের রঙকে মূলধন করে আর্যরা কালা আদমির দেশ দক্ষিণ ভারতে আর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখছে। দুর্ভাগ্য কালো মানুষেরা বুঝছে না, গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ হলেও তিনি কালো মানুষদের কেউ নন।

খর বলল : এই আর্যরা এক অরাজকতার দিনে এসেছিল। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর রাজার লড়াই লেগেছিল। কোথাও শাসন শৃঙ্খলা ছিল না। সাধারণ মানুষরা বিভীষিকার মধ্যে বাস করত। তাদের কথা কে শোনে? কেই বা তাদের দুঃখ দুর্ভোগের কথা ভাবে। এরকম একটা বিশৃঙ্খলা বছরের পর বছর চলছিল। রাজায় রাজায় মিল নেই, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সদ্ভাব নেই। এরকম একটা সন্ধিক্ষণে সাদা মানুষেরা এল। সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়। কিন্তু শৌর্যে, বীর্যে, সাহসে, তেজে, বুদ্ধি ও কৌশলে অদ্বিতীয়। সুশ্রী, সুঠাম চেহারা আর গায়ের রঙের শুভ্রতা ঔজ্জ্বল্য, অল্পেই নারী-পুরুষের মন হরণ করে নিল। কালো মানুষের বিস্ময়, অনুরাগকে মূলধন করে তারা ওদেশের মাটিতে শিকড় গেঁড়ে বসল। গোষ্ঠীগত লড়াই এবং বিবাদের মধ্যস্থতা করার নাম করে তারা সেই অঞ্চলের অধিপতি হয়ে বসল। সবাই তাদের মান্য করায় বহুকালের গণ্ডগোল, উৎপাত, অশান্তির

অবসান ঘটল। সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ও সুখ ফিরল। দেশে তারা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কিংবা জাতিতে জাতিতে যে বৈষম্যই থাক একটা শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় আনতে কৃতকার্য হয়েছিল তারা।

শম্ভু প্রশ্ন করল : তারপর।

তারপর একদিন তাদের উপর আর্যদের ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কার প্রথা চাপিয়ে দেবার জন্য জোর জুলুম শুরু হল। জোর করে আর্যদের ধর্মীয় দেব-দেবীর পূজা করতে কালো মানুষদের বাধ্য করা হল। তাদের ধর্ম বিশ্বাসের থানগুলোর উপর মন্দির গড়ে উঠল। মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে নতুন নতুন দেব ভাষা তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল। নতুন নতুন আর্যশব্দ বেশি করে ঢুকিয়ে কালো মানুষদের মুখের ভাষাকে বদলে ফেলা হল। একটু থেমে খর পুনরায় বলল : এর সব দোষ কালো মানুষের। তাদের ভীরুতা এবং লোভের জন্য জাত ভাষা ধর্ম সব কলুষিত হল। সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা এবং ধর্মের উপর আর্যদের এই হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এক শ্রেণীর স্বাধীনচেতা এবং অত্যন্ত স্বাতন্ত্র প্রিয় রাক্ষস, অসুর এবং দৈত্য জাতি। এরকম এক দৈত্যরাজের গল্প শোন।

জম্ভ দৈত্যের পুত্র সুন্দ পিতার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আর্যঋষিদের সন্দেহজনক কার্যকলাপ সুন্দকে অসহিষ্ণু করল। কিন্তু নিরস্ত্র মুনি-ঋষিদের উপর তো আর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া চলে না। আপোস মিট-মাটের একটা রাস্তা বার করার জন্য আলাপ আলোচনা করতে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে হাজির হল। একা এসেছিল সুন্দ। অগস্ত্য ছিল চতুর এবং কৌশলী। সুন্দকে একা পাওয়া মাত্রেই তাঁর মনের ভেতর সুন্দ নিধনের এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল।

অগস্ত্যের আন্তরিক আতিথেয়তা ও বিনয় বচনে সুন্দ মুগ্ধ হল। অগস্ত্যের প্রতি তার বিরূপ ভাবটা অন্তর্হিত হল। সুস্বাদু সোমরসে অগস্ত্য সুন্দকে আপ্যায়িত করল। উত্তেজক নেশার এক রঙীন স্বপ্নের ভেতর সুন্দ একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগল।

যজ্ঞাগ্নির লাল আলো পড়েছে সুন্দের গায়ে। আগুনের শিখা তার অর্ধমুদ্রিত চোখের সামনে উদ্দাম নৃত্য করছে। সুন্দ এসব কিছুই দেখছিল না। বুঁদ হয়ে বসেছিল। তার ভেতরে জ্ঞান ছিল। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে দিতে অগস্ত্য সুন্দকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করার জন্য বলল : দৈত্যবর সামান্য মুনির প্রতি আপনার বিরূপ হওয়া শোভা পায় না। আপনার রাজ্যে আমি এক আগন্তুক মাত্র! রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার মতো আমার শক্তি কোথায়? অসুখী মানুষকে সুখী করার জন্য ধর্মের সুভাষিতবলী তাদেব বিতরণ করি। দৈত্যেরা বড় সন্দেহপ্রবণ। মুনি-ঋষিদের উপর তাদের ভীষণ রাগ। মুনি-ঋষিদের দুর্নাম করে তাদের ক্ষেপিয়ে দেয়। দৈত্যদের অনেক দুষ্কর্মের মধ্যে এটিও একটি অপকর্ম।

অতিরিক্ত সুরাপানে সুন্দের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল। শরীর মৃদু টলছিল। অগস্ত্যের মুখে স্বজাতি নিন্দে শুনে মুহূর্তে তার নেশার ঘোর কেটে গেল। তীর বিদ্ধ বাঘের মতো ভয়ঙ্কর যন্ত্রনায় এবং ক্রোধে আর্তনাদ করে উঠল। বাজখাই গলায় বলল : ঋষি স্তব্ধ হও। দৈত্যদের সম্পর্কে কোন বাজে কথা বললে তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। এই মুহূর্তে এই দুটো হাত দিয়ে তোমার শীর্ণশ্রান্ত দেহখানা ছিন্নভিন্ন করে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে পারতাম। কিন্তু করলাম না দয়া করে।

অগস্ত্য সুন্দকে চটানোর জন্য বলল : দৈত্যরা চিরদিনই অমার্জিত উদ্ধত বর্বর। শিষ্টাচার সভ্যতার কোন ধার ধারে না। তোমার কটু কথাগুলো তার প্রমাণ। দোষ তোমাদের রক্তের। দৈত্যরক্তে আছে শুধু হিংসা, লালসা, পাশবিকতা, দম্ভ এবং বর্বরতা। দৈত্যদের কোন্ মানুষটা ভালো? রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত সকলে এক।

সুন্দ ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জন করে উঠল। দাঁতে দাঁত টিপে অসহ্য আক্রোশে উচ্চারণ করল : অগস্ত্য!

উন্মাদের মতো অগস্ত্যের দিকে তেড়ে যেতে কাপড়ে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল। আর তাতেই সুন্দ একটা পাক খেয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ল। এক আশ্চর্য মৃত্যু তার। অগস্ত্য তৎক্ষণাৎ তাকে

এক অলৌকিক উপাখ্যান করে তুলল। মুনি-ঋষির তপোবলের মহিমা হয়ে লোকের মুখে মুখে তা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। লোকে বিশ্বাস করল ঋষির অবাধ্যতার জন্য ক্রুদ্ধ অগস্ত্যর নয়নবহ্নিতে সুন্দ ভস্ম হয়ে গেল।

সুন্দের স্ত্রী তাড়কা এ গল্প বিশ্বাস করল না। সুন্দ হত্যার বদলা নিতে সে কৃত সঙ্কল্প হলো। মুনি ঋষিদের ব্রহ্মাতেজ যে মিথ্যে, ভাঁওতা সেটা প্রমাণ করতে মুনি ঋষির আশ্রম ভেঙে তছনছ করল। যজ্ঞস্থান অপবিত্র করল। যজ্ঞবেদী ভেঙে দিল। তপোবন ছারখার করল। তাড়কার নিত্যনতুন উৎপাতে দৌরাত্ম্যে মুনি ঋষিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারা বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। নিরুপায় মুনিরা আর্য নরপতিদের শরণাপন্ন হল। কিন্তু তাড়কার বিপক্ষে দাঁড়াতে কোন নরপতির সাহস হল না। অগত্যা ঋষি বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বে তারা জোটবদ্ধ হল।

তাড়কার জেহাদ ঘোষণায় ঋষিরা হারাল অনেক। সাধারণ মানুষের মনে ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের টান ধরল। তাঁদের চোখে যে আগুন জ্বলে না, কিংবা তাঁদের গালমন্দ ও অভিশাপে যে সত্যি কোন ক্ষতি হয় না সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে শিখল। ঋষিরা তাদের সমতলে নেমে এল। তাড়কার জেহাদে, ক্রোধে বরং তারাই বিপন্ন এবং কোনঠাসা হলো। আর্য সাম্রাজ্য একটা বড় ঢাক্কা খেল। তাড়কা গোটা আর্যাবর্তের বিভীষিকা। সুন্দ যা পারেনি তাড়কা তাই করল। আর্যনরপতি এবং মুনি ঋষিদের ঘুম কেড়ে নিল। সে হল দিনের বিভীষিকা, রাতের দুশ্চিন্তা।

তাড়কা হারতে জানে না বলেই সুন্দর মৃত্যুতে কিশোর দুই পুত্রকে নিয়ে কিছু হারাল না। শঠের সঙ্গে শঠের মতো আচরণ করে তার জয় এবং অবাধ কর্তৃত্ব আদায় করে নিল। কাঁটা দিয়ে কি করে কাঁটা তুলতে হয় আর্যদের ভালো করে সেটা বোঝানের জন্য রাবণের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত করল। এক ভয়ঙ্কর স্নায়ুযুদ্ধের মুখোমুখি হল দুই মহাশক্তি। একদিকে অযোধ্যা, অন্যদিকে লঙ্কা। তবু শেষ রক্ষা হল না। কথাগুলো বলার সময় খরের বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল।

শম্ভু চমকে জিজ্ঞাসা করল : কী হলো তাড়কার?

খর নির্বিকারভাবে বলল : দাশরথী রামের হাতে তাড়কা নিহত হল।

শম্ভু সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল : শ্রীরাম তাড়কাদেবীকে বধ করলেন! একজন শ্রেষ্ঠ বীর হয়ে নারীর গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে তাঁর একটু শরম হল না? ছিঃ। ধিক্ শ্রীরামকে।

খর বলল : আর্যদের কাছে জয়ের চেয়ে বড় কিছু নেই। যে কোন মূল্যে জয়লাভ করা তাদের লক্ষ্য। জয়ের জন্য তারা শুভ্র মাতৃত্বকে পর্যন্ত কলঙ্কিত করতে পারে। নারীর সম্ভ্রম, মর্যাদা কালো মানুষরাই দিয়ে থাকে। দেবীর আসনে বসিয়ে মাতৃজ্ঞানে তাকে পুজো করে!

মাঝে মাঝে এক একজন বালক বয়সের চেয়ে হঠাৎ বড় হয়ে যায়। বয়স্কদের মতো কথা বলে আশ্চর্য করে দেয়। ত্রয়োদশ বছর বয়সের শম্ভু হঠাৎ বালকত্ব পেরিয়ে বয়স্ক ব্যক্তির মতো বলল : করবেই তো। জন্মেই শিশু মাকে দেখে। মা তার আশ্রয়, তার রক্ষক, তার পালক তার মতো এমন আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যে হাত দিয়ে মা শাসন করে, পরক্ষণেই সেই হাত দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে। তাই, শিশু প্রথম 'মা' বলতে শেখে। তার কণ্ঠ থেকে প্রথম মা উৎসারিত হয়। জননী আর জন্মভূমিতে কোন প্রভেদ নেই। ভূমিষ্ঠ হয়েই যে ভূমি স্পর্শ করল সেও আর এক মা। এই মাকে রক্ষার জন্য সব সন্তানের কিছু কর্তব্য থাকে। দেশের প্রতি তাড়কা সন্তানের কর্তব্য করেছে। আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ না করে শুধু ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে যদি দেশের মাটি থেকে বিদেশী চরদের বিতাড়িত করতে পারে তাহলে দোষ কোথায় তাড়কার? স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য তাড়কা যা করেছে তার ভেতরে কোন অপরাধ নেই মাতুল। নিজের ক্ষুদ্র চৌহদ্দীর মধ্যে নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। ঋষিদের চরবৃত্তি যদি দেশের নিরাপত্তা বিঘ্ন করে তাহলে দেশের মাটি থেকে তার শিকড় উম্মূল করার জন্য তাড়কা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক তাকে অন্যায় বলা চলে না।

খর ও দূষণ বড় বড় দুই চোখ করে তার দিকে চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। শম্ভুর মুখে এ কার কথা উচ্চারিত হলো? বিদ্যুৎজিহ্ব তাড়কার মৃত্যুতে বলেছিল : রামচন্দ্র পাষণ্ড। একজন

জননীস্থানীয়া নারীকে কোন প্রাণে বধ করল? এতে রামের বীর খ্যাতি কি খুব বাড়ল? নারীজাতিকে যে শ্রদ্ধা করে না সে তো দুর্বৃত্ত। কর্তৃত্ব প্রভুত্বের জন্য সে শুধু গায়ের জোর খাটায়। তার ভেতর দেশপ্রেমের ছিটে ফোঁটা নেই। প্রকৃত যে দেশপ্রেমিক অন্যের দেশপ্রেমকেও সমান মর্যাদা দেয় সে।

শম্ভুর কণ্ঠে বিদ্যুৎজিহ্বর কথাগুলোই অনুরণিত হল যেন।

হঠাৎ অশ্বখুরের শব্দ শোনা গেল বাইরে। চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ দ্বারের কাছে থেমে গেল। শম্ভু উৎফুল্ল হয়ে বলল : ঐ মা এল! তোমরা মার সঙ্গে গল্প কর। আমার ছুটি।

ঘরে পা দিয়ে খর দূষণকে দেখল শূর্পণখা। অমনি একটা খুশিতে চমকে উঠল তার কণ্ঠস্বর। বলল : তোমরা! এক সঙ্গে দুজনকে দেখব ভাবতে পারনি। কী ভালো লাগছে! কেন জানি না, তোমাদের কথা ভীষণ মনে পড়ছিল। বড় একা লাগলে তোমাদের কথা মনে পড়ে। হয়তো আমার মন তোমাদের টেনে এনেছে।

কথাগুলো বলে অদ্ভুত হাসল শূর্পণখা। তারপর হাসি হাসি মুখ করে বলল : একটু বসো। কাপড় ছেড়ে আসছি। অনেক কথা আছে।

অল্পক্ষণ পরে শূর্পণখা ফিরল অন্য মানুষ হয়ে। আগের উচ্ছলতা নেই, মুখে নেই খুশির ঝলক। দুই চোখের চাহনিতে কেমন একটা থমথমে ভাব। মনে হল ভীষণ বিপর্যস্ত। শূর্পণখার আকস্মিক রূপান্তর খর ও দূষণকে উদ্বিগ্ন করল। ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হল তাদের।

অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল দূষণ। কিছু বলার জন্য ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠল অজান্তে। কপালটা কুঁচকে গেল। কী ভাবছে শূর্পণখা? জনস্থানের আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় তার ভেতরটা কী অশান্ত? জাতিত্বের অস্তিত্বের সঙ্কট নিয়ে রাবণের মত সেও কী ভাবছে কিছু? রাবণের কথাগুলো কানের ভেতর ঝঙ্কারে বেজে গেল : আগে আমি রাক্ষস তারপরে মানুষ। জাতিত্ব মরে গেলে, ধর্ম গেলে একজন মানুষ কোন পরিচয় নিয়ে বাঁচবে? আর্যরা বলে প্রত্যেক নারীর একমাত্র কাজ ভালো আর্য-সন্তানের জন্ম দেয়া। অনেক ঠকে তাদের কাছ থেকে শিখেছি রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা না পেলে তারা না হয় জাতের, না হয় দেশের, না হয় ধর্মের, না হয় সমাজের। তারা এক শিকড়হীন মানুষ। সমাজে তাদের জারজ বলে। অচ্ছ্যুৎ মানুষের কাছে কোন অধিকার, কোন দাবি থাকে না সমাজের। এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা তারা। এই মানুষদের কী দাম দিচ্ছে মহান মানবধর্ম? সমাজে তাদের পরিচয় কি? মানুষ জন্মগ্রহণ করে তারা মর্যাদা পেল কী? মানবধর্মের উদার প্রচারক আর্যরাই তাদের কানাকড়ি মূল্য দিল না। কোন সম্মান পেল না তাদের কাছে। মানুষের ধর্ম বলে কোন ধর্ম নেই। সবটাই আর্যদের ধোঁকা। গালভরা মিথ্যে বুলি। মানুষের পরিচয় মানুষ নামে নয়, তার একটা জাতি পরিচয়, ধর্ম পরিচয়, সামাজিক পরিচয় এবং পিতৃ পরিচয় আছে। সেই পরিচয় নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এই পরিচয়টাকে যে রক্ষা করতে না শেখে মানুষ হিসেবে সে বাঁচতে শেখেনি। মানুষের বড় পরিচয় মানুষ হয়ে ওঠায় নয়, কতখানি সে রাক্ষস, দানব বা অসুর হয়ে ওঠতে পারল তার ওপর নির্ভর করে। তাকে কোন একটি ধর্মের, সম্প্রদায়ের কিংবা জাতির মানুষ হতে হবে সর্বাগ্রে। সেটাই জাতি হিসাবে তাকে শানাক্ত করবে। যে বীজ থেকে ধান হয় সেই বীজ থেকে আখ হয় না। দুটো আলাদা বীজ। তার চাষও আলাদা তেমনি আর্যদের সংস্কৃতি রাক্ষস, অসুর দানবের সংস্কৃতি থেকে আলাদা। পাশাপাশি থাকতে পারে, কিন্তু মিলতে পারে না। একটাকে নির্মূল না করে আর একটা টিকে থাকতে পারে না।

শূর্পণখার ডাকে দূষণের হুঁশ ফিরে এল। চমকে শূর্পণখার দিকে তাকাল। বলল : আমাকে ডাকছ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দূষণকে পর্যবেক্ষণ করল শূর্পণখা। বলল : তুমি ভাবছ কী? কিছু বলতে চাও মনে হচ্ছে। মনের কথা বুকের ভেতর পুষে না রেখে খুলে বল।

খর বিব্রত লজ্জায় সহসা একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। শূর্পণখার কৌতূহলী জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। শূর্পণখাই বা কী ভেবে তার সম্পর্কে ওরকম একটা মন্তব্য করল বুঝতে পারল না। তাই অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। তারপর সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বলল : শুনতে পেলাম লঙ্কেশ রাবণ এসেছিলেন কদিন আগে। অধমের

সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ার দুঃখটা ভুলতে পারছি না।

শূর্পণখা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। ভেতরটা তার নির্দয় হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে অভিমানের সমুদ্র দুলে ওঠল বুকে। বলল : তুমি ভুল শোননি। তবে দুঃখ ঘোচানোর কোন সংবাদ তার কাছে ছিল না। দেখা হলে মনকষ্টই বাড়ত।

খর ঢোক গিলে বলল : তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না। যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বল। হেঁয়ালি কর না।

শূর্পণখার অধরে রহস্যের হাসি খেলে যায়। সকৌতুকে বলল : দেবরকে রাক্ষসরা দ্বিতীয় বর বলে। স্বামী গত হলে তাকে বিবাহ করা রাক্ষসদের সামাজিক বিধান। দাদা সে কথাই বলতে এসেছিল। কী দেবর, বিয়ের কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলে! কনে রাজি হয়নি। অগত্যা অন্য কাউকে বিয়ে করার জন্য জোরাজুরি করল। কিন্তু বিদ্যুৎজিহ্বকে এত তাড়াতাড়ি ভুলি কেমন করে? তার প্রেম যতকাল আমার বুকে থাকবে ততকাল অন্য কাউকে তার আসনে বসাতে না পারা কী খুব দোষের? কথাগুলো বলার সময় শূর্পণখার চোখে মুখে একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠল।

দূষণ বড বড় চোখ করে শুনছিল। হঠাৎ আবেগে তার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, রাবণের ভগিনীর মতো কথা বলেছ।

শূর্পণখার চোখটা দপ করে জ্বলে উঠল। মুখের রঙও নিমেষে পাল্টে গেল। না, রাবণ ভ্রাতার মত নয়, স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বর মত। রাবণের অনেক স্ত্রী আছে। কিন্তু বিদ্যুৎজিহ্বর শূর্পণখা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বীরের মৃত্যুটা আমি ভুলতে পারি না। সে কথা মনে হলে আমার রক্তের মধ্যে আগুন ধরে যায়। বিদ্যুৎজিহ্ব বড় স্বপ্ন দেখত। তার কোন স্বপ্নই পূরণ হয়নি। তার অসমাপ্ত ইচ্ছে আমাকেই শেষ করতে হবে। আমি ছাড়া কে আছে তার? আবেগ সংযত করার জন্য শূর্পণখা একটু থামল। তারপর আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, দেবর, তোমরা আমার কাছে কী প্রত্যাশা কর? সাম্রাজ্য, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, না আনুগত্য? কোনটা?

খর ও দূষণ একসঙ্গে বলল : আমরা তোমার হুকুমের দাস।

উত্তর শুনে শূর্পণখা খুশী হল। গদ গদ কণ্ঠে বলল : ছিঃ। দাস হবে কোন দুঃখে? তোমরা আমার আত্মীয়, ভাই, বন্ধু। আমার দুই বাহু। আমার গৌরব, দেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদের কাছেই আমার প্রত্যাশা। অনেক চাওয়া রয়েছে। আমার সে সব পেতে হবে ভাই। যেভাবে হোক আদায় করে নিতে হবে। জান, দূষণ—

থামলে কেন?

একা একা অনেকখানি ঘুরে এলাম। একটা নতুন অনুভূতি নিয়ে ফিরলাম। বলতে পার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। অরণ্যের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় এক নতুন তপোবন হয়েছে। জায়গাটা জনস্থানের ভেতর। একটা তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহ বুকের ভেতর সাঁড়াশির মত চেপে ধরল। গুটিগুটি পায়ে আশ্রমের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বিভিন্ন বয়সের মুনি ঋষিরা আশ্রমের নানা কাজে ব্যস্ত। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। অবাক বিভ্রান্ত চোখে দেখতে লাগলাম, একদল শিক্ষার্থী যুদ্ধবিদ্যা শিখছে। অস্ত্র-চালনার বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন করছে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। একজন তাপস যুবক যে আমাকে অনুসরণ করছিল টের পাইনি। হঠাৎ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল সে। আমাকে আড়াল করে তর্ক করতে লাগল। কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে বড় রাস্তার উপর এসে পড়লাম। এই প্রথম বিদ্যুৎজিহ্বর জন্য আমার গোটা বুকখানা হাহাকার করে উঠল। কর্তব্যে অবহেলার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। বিদ্যুৎজিহ্বর সদাসতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি ফাঁক দিয়ে কোন শ্বেতাঙ্গ জনস্থানে ঢুকতে পারেনি। বিদ্যুৎজিহ্ব আজ নেই বলে রাজ্যের অভ্যন্তরে তারা ঢোকার সাহস পেল। হয়তো আমার ঔদাসীন্য এবং আত্মমগ্নতা সেজন্য কিছুটা দায়ী। বিবেক দংশনে আমার ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দায়িত্ব অবহেলা করার অপরাধ ক্ষমা করতে পারছিলাম না। সেই প্রথম আত্মসচেতন হলাম। আমার ক্রটিগুলো দেখতে পেলাম। মনে মনে শপথ করলাম, বিদ্যুৎজিহ্বর অনেক অসমাপ্ত কাজ আমাকে করতে হবে। দেবর, রামচন্দ্রের থাবার ছাপ

মুছে ফেলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত কর। বড় দুঃসময়ের মধ্যে আমাদের দিনগুলো কাটছে। মনে হচ্ছে, আমরা আক্রান্ত, বিপন্ন।

দূষণ বলল : এত উতলা হওয়ার কিছু নেই। দুর্ভাবনার মতো কিছু ঘটেনি। বিশাল সীমান্তে অমন ছোটখাট অনুপ্রবেশ হয়েই থাকে। অরণ্য পাহাড়ের বাধা পেরিয়ে সব দিকে সমান নজর রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। স্থানীয় বাসিন্দারা সহযোগিতা না করলে, তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলে দেশের রাজার পক্ষে এত বড় অঞ্চল সামাল দেওয়া কঠিন।

দূষণের কথায় শূর্পণখা চমকাল। দেবর, এটা কোন যুক্তি নয়। পদস্থ রাজকর্মচারী থেকে এ রাজ্যের রাণী পর্যন্ত সকলে কিছু দিন অন্তর এক এক অঞ্চল পরিদর্শন করবেন। সেই সেই অঞ্চল রক্ষার দায়িত্বও তাদের ভেতর বণ্টন করে দাও। আরো বেশি চর নিযুক্ত কর। তাহলে অনুপ্রবেশ যেমন বন্ধ হবে, দেশের কোথায় কী হচ্ছে, প্রজারা কে কী করছে, তাদের অভাব-অভিযোগ দেশের শাসনকর্ত্রীর গোচরে থাকবে এবং এক অস্বস্তিকর দুর্ভাবনা নিয়ে মনের অভ্যন্তরে নিরন্তর সংঘর্ষে তাকে কষ্টভোগ করতে হবে না। এর ফলে রানী ও প্রজার সম্পর্ক ভালো হবে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খুলে যাবে।

খর বলল : তোমার ইচ্ছে ও নির্দেশের কোন অমান্য হবে না। মুনি ঋষিরা কোন্দল পাকিয়ে তোলার রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়ে তপোবন নির্মাণ করতে পারে। এরাই আর্য উপনিবেশ সম্প্রসারণের অগ্রবর্তী শান্তি বাহিনী। ওদের বিশ্বাস না করাই ভালো। ওদিকে রামচন্দ্র গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটী বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। খুব ধীরে সুস্থে শত্রু জাল গুটিয়ে আনছে। যে কোন মুহূর্তে একটা বড় আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। এখনই তার জন্য তৈরি হওয়া দরকার।

দূষণ বলল : তোমরা আশঙ্কা অমূলক। অনুমান সর্বস্ব। অনুমানের উপর নির্ভর করে কিছু করা বিপজ্জনক।

খর বলল : একটা কিছু ভেবে বা আশঙ্কা করে পূর্বাহ্নে নীতি নির্ধারণ করতে হয়। যে তা করে না আপৎকালে তাকে বাঁচাতে পারে না কেউ। সব রকম দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা খারাপ কিছু নয়। প্রস্তুত হওয়া মানে কিন্তু প্রয়োগ করা নয়। প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় লাগে। অনেক আয়োজন আছে। সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরে পস্তাতে হয়। দীর্ঘসূত্রতার কোন স্থান নেই অস্তিত্বরক্ষার সংঘর্ষে। বিলম্বের অর্থ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া। এক ধাপ এগিয়ে থাকা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে শূর্পণখা তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাটিকে দেখতে লাগল। বলল : খর ঠিক বলেছে। কূটবুদ্ধির লড়াইতে আর্যরা অনেক এগিয়ে। রামচন্দ্রও চুপ করে বসে নেই। নীরবে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে চলেছে। কী অদ্ভুত কৌশলে মানুষের চিত্ত জয় করে, তাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা, আনুগত্য আদায় করে নিচ্ছে। দেবর, সেই পরাজয় কোন গোপন পথে আসবার আগে, প্রতিশোধের উল্লাসে আমাদের চিত্ত জাগাতে হবে। যতদিন না রামচন্দ্রকে এই দণ্ডকারণ্য থেকে বিতাড়িত করতে পারছি ততদিন মনের অভ্যন্তরে শপথের দীপটুকু জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তার উত্তাপ থেকে সব তেজটুকু নিঙরে নিয়ে মহাবল দানবের মতো ভয়ঙ্কর বিক্রমে জেগে উঠতে হবে। তাদের কাছ থেকে আঘাত আসার আগেই আমরা আঘাত হেনে শত্রুর মনোবল, সাহস ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারি। বিদ্যুৎজিহ্বর কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অথচ কী আশ্চর্য সে বেঁচে থাকতে এসব কথা একবারও ভাবতাম না। আজ সে নেই বলে রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে ঢুকতে সাহস করল। এর আগে এ মাটিতে পা রাখার সাহস হয়নি তার।

দূষণ বলল : দেবী আমি বুঝি; ভ্রাতা বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর শূন্যতা অসহায়তা, অভিমান তোমার বুকে তীরের মতো বিঁধে আছে। একটু ব্যথা লাগলে বিদ্যুৎ চমকের মত তার কথাটা বারংবার মনে পড়ে। তার অভাবটা তোমার আস্থার পাত্রকে শূন্য করেছে। তাই তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না।

মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করে শূর্পণখা বলল : ছিঃ দেবর! নিজেকে ছোট কর না। অবিশ্বাসের কোন কাজ তুমি করনি। তা-হলে এ অভিমান কেন? দেবর-ভাজের মধুর প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবিশ্বাস, সন্দেহে আবিল করে দিও না। আমরা পরস্পরের পাশে আছি এবং থাকব।

খর বলল : সাধু! সাধু!

শূর্পণখা লাট্টুর মতো ঘুরে দাঁড়াল জানলার দিকে। নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। বিড় বিড় করে নিরুচ্চারে বলল : স্বামী অন্তরীক্ষ থেকে আমাকে রক্ষা কর। তোমার অসমাপ্ত কাজের মধ্যে আমাকে ডুবে থাকার শক্তি দাও। তোমার পথে চলার মত করে গড়ে নাও আমাকে। তোমার ভালোবাসা আমার পাথেয়। স্বামী, তোমার অকাল মৃত্যুটা যতদিন আমার মনে থাকবে ততদিন তোমার অদৃশ্য ঘাতকের সঙ্গে, আমার ছায়ার লড়াই শেষ হবে না। তোমার অভাবে বুক আমার খাঁ খাঁ করছে। স্বস্তি পাচ্ছি না।

দূষণ শূর্পণখাকে দেখতে লাগল কী ভীষণ স্তব্ধ, শান্ত, সমাহিত। দৃষ্টিতে তার ঋষির তন্ময়তা। দেখে শ্রদ্ধা হল দূষণের। এক আশ্চর্য ভালোলাগার অনুভূতিতে মন রাঙিয়ে গেল। খুশি খুশি ভাব ফুটল মুখমণ্ডলে। শান্ত এবং মধুর গলায় ডাকল : দেবী! আমার উপর রাগ করে কি তুমি মুখ ফিরিয়ে আছ? আমাকে ক্ষমা করবে না, দেবর বলে একবার ডাকবে না?

দূষণের ডাকে শূর্পণখা ঘুরে দাঁড়াল। টেপা হাসি মুখে নিয়ে বলল : দেবর! পৃথিবীটা প্রচণ্ডবেগে ঘুরছে। অথচ তার ঘোরাটা বিন্দুবিসর্গ টের পাচ্ছি না। ঘুর লেগে আমরা কেউ ছিটকেও পড়ছি না। সবাই ঠিকঠাক আছি। এ এক আজব ঘোরা।

কী ভেবে কথাগুলো বলল শূর্পণখাই জানে। খর দূষণ না বুঝেই বোকার মতো হাসল এবং সমঝদারের মতো মাথা নাড়ল।

॥ পাঁচ ॥

শীতের বেলা পড়ে আসছে। বেলা শেষের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। পাখীরা নীড়ে ফিরছে। দীর্ঘ রাতের জন্য তৈরী হচ্ছে। জোরে রথ ছোটাল রাবণ। শিশিরে চাপ চাপ ধুলো উড়ছে চাকায় চাকায়। রাবণের সারা শরীর ধুলোয় ভরে গেল।

শূর্পণখার প্রাসাদে পৌঁছেতে রাত হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকার ঘন নয়। সপ্তমীর চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে চরাচর। রাবণের রথ পৌঁছেতে দ্বারীরা ফটকের বিশাল দরজা উন্মুক্ত করে দিল।

প্রাসাদে প্রবেশ করে রাবণের খেয়াল হল সব কক্ষেই নরম দীপের আলো জ্বলছে, কেবল শূর্পণখার ঘর অন্ধকার। কেন? তবে কি শূর্পণখা নেই? অন্য কোথাও চলে গেল?

কক্ষের কাছে গিয়ে মনে হলো ভেতরে দীপ জ্বলছে। ক্ষীণ আলোয় ঘর ভর্তি অন্ধকার। গা ছমছম পরিবেশ। রাবণ দরজার কপাটে মৃদু আঘাত করল। ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। দরজাও বন্ধ। মৃদু করাঘাত করল পুনর্বার। এবার ভেতর থেকে শূর্পণখার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বলল : দরজা ভেজান আছে। একটু ঠেললে খুলে যাবে।

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে রাবণ বলল : শূর্পণখা আমি। আমি এসেছি।

গলার স্বর শুনেই রাবণকে চিনতে ভুল হল না তার। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। আগে থাকতে সংবাদ দিয়েই রাবণ আসে। এবার ব্যাতিক্রম হওয়ায় শূর্পণখা একটু শশব্যস্ত হয়ে ওঠল। শয্যা থেকে দৌড়ে এসে দ্বার খুলে দিল নিজের হাতে। বলল : দাদা! তুমি! অসময়ে হঠাৎ এলে যে বড়? কোন খারাপ খবর নয় তো। কণ্ঠস্বরে শূর্পণখার উদ্বেগ ফুটে বেরোল।

রাবণ একটু বিব্রত বোধ করল। অপ্রস্তুতের মত শূর্পণখার চোখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বলল : বড় অসময়ে এলাম, না?

শূর্পণখা তাড়াতাড়ি কথাটা শুধরে নিয়ে বলল, তোমার আসা আমার কাছে সব সময় সুসময়। এভাবে ধূমকেতুর মতো তো আগে আসনি, তাই বিস্ময়ের ঘোরে মুখ দিয়ে হঠাৎই কথাগুলো বেরিয়ে গেল। মুখের কথা বড় শত্রু। একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলে সংশোধনের আর পথ থাকে না।।

তখন কত কী বলে শোধরাতে হয়।

দীপের নেভা আলোয় শূর্পণখার মুখখানাও ভালো করে দেখা গেল না। তবু চোখের আলোয় রাবণ শূর্পণখার চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। বলল, তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। তাই-ই—

খুব ভালো করেছ। ক'দিন ধরে আমিও তোমার কথা ভাবছিলাম। কত কথা জমে আছে তুমি জান না। এ রকম একটা অভাব আর শূন্যতার মধ্যে যখন দিন কাটছে অতর্কিতে তুমি এসে আমার সব বিষাদকে দূর করে দিলে। বাইরে চাঁদের আলোর মত অনাবিল এক খুশি আমার মনের কোটরের ফাঁক ফোকরের ভেতর নিঃশব্দে চারিয়ে গেল। ভীষণ ভালো লাগছে। শূর্পণখার কণ্ঠে যেন কৈফিয়ৎ রাখার জায়গা নেই।

রাবণের হাতখানা দু'হাতে ধরে তাকে টানতে টানতে শূর্পণখা নিজের বিছানায় বসাল। বলল, এখানে বস। আমি ক'টা দীপ জ্বেলে দিই। ঘরটা বড় অন্ধকার।

দীপ জ্বেলে দিয়ে শূর্পণখা রাবণের পাশে বসল। রাবণ হাসতে হাসতে বলল, পাগলি। আমাকে কী দেখার মত?

তা জানি না। তবু অনেককাল পরে নিজের প্রিয়জনকে দেখতে ভালো লাগে। এটা বোধ হয় ভালোবাসার ধর্ম।

পাগলি! তোর ঘরটা এমন অন্ধকার করে রাখিস কেন? এমন নিঃশব্দ আঁধারের ভেতর বিষণ্ণ মন নিয়ে একা থাকতে ভালো লাগে!

আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। একা থাকার ভেতর একটা মজা আছে। পৃথিবীতে আমরা একা আসি আবার একা যাই। একা থাকাটাই জীবনের নিয়তি। আসা যাওয়ার মাঝখানটা অনেক ঘটনা, যন্ত্রণা, রাগ অনুরাগ দিয়ে ভরা থাকে। কিন্তু তার একাংশকেও ধরে রাখতে পারে না মানুষ।

আসা যাওয়ার মাঝখানে এই পৃথিবীর বুকের মধ্যে বাস করে তার ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য সম্পদ এবং আনন্দ দুঃখ বেদনার ভাগীদার হতে না পারার মত ব্যর্থ জীবনও আর নেই। একজন মেয়ের পক্ষে একা একা জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। মেয়েদের বিপদ অনেক রকমের। বলল রাবণ।

দাদা। ও সব বাজে কথা থাক। মেয়েদের জীবনটা পুরুষের মতো বল্গা ছাড়া নয়। একটা খোঁটায় বাঁধা। সেখানে সব মেয়েই একা।

রাবণের বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। বলল : আমি বুঝি না তোকে। একজন মেয়ের আর একটা বিয়ে করা রাক্ষস সমাজে অন্যায় নয়। নতুন কিছু নয়। দেশ জুড়ে এসব হয়।

শূর্পণখা চুপ করে থাকল। মুখখানা তার বিষণ্ণ হল। বলল : বিয়ে করা ছাড়া কী একজন মেয়ের বাঁচতে নেই?

মেয়েদের যে অনেক বিপদ । অনেক রকমের সমস্যা হয় তাদের নিয়ে।

আমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।

হবে। যারা তোকে সাহায্য করবে, স্বার্থের ফাঁসে এমন করে জড়াবে যে তার থেকে মুক্তি নেই। একটা মেয়ে স্বাধীনভাবে নিজের মতো বেঁচে থাকতে চাইলেও এই স্বার্থপর পৃথিবী আর ক্ষমতাবান পুরুষেরা তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কুমারী আর বিধবাকে বেওয়ারিশ জিনিসের মতো ভোগ দখল করতে চায়।

দাদা, এ কথা শোনানোর জন্যই কী এসেছ?

এ আমার উদ্বেগের কথা। যারা সংস্কার আঁকড়ে থাকে, সতীত্ব কৌমার্য রক্ষার সঙ্কল্প করে জীবনটা একা কাটিয়ে দেবার কথা ভাবে, সারাজীবন তাদের একা থাকার মূল্য দিতে হয়। তখন একা থাকার মূল্যটা খুঁজে পায় না।

তুমি কী মনে কর শারীরিক পবিত্রতা এবং প্রেমের অমর স্মৃতির কোনও দাম নেই?

সত্যি, কোন দাম নেই। ওটা একটা অলস ভাবনা। সুখী কল্পনা। কিছু বোকা মেয়েমানুষ ওসব মেনে চলার কথা ভাবে।

শূর্পণখা একটু চুপ করে রইল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল হঠাৎ। বলল : বোকারা স্মৃতি আগলে

বসে থাকে। কেন যে বসে থাকে তারাই জানে। স্মৃতির ডালি নিয়ে নিজেকে নিবৃত্ত করার মধ্যেও তীব্রতর সুখ লুকনো থাকে। বলতে বলতে শূর্পণখার গলা বুজে এল। সামলে নিয়ে পুনরায় বলল : বিয়ের বন্ধনে নিজেকে আমি জড়াব না। বিয়ে করলে আমি একজন মেয়ে মানুষ হয়ে থাকব শুধু। কিন্তু আমার ভেতর একজন মেয়ে মানুষ ছাড়াও আরো অন্য অনেক মানুষ আছে। আমার পুরো আমিকে কোন এক বধূর মধ্যে ধরে না। দ্বিতীয়বার বিয়ে না করেও একজন স্ত্রীলোক নিজেকে পূর্ণ করে কিংবা অপূর্ণ রেখে উপছে যাবে তার নিজের আদর্শের পথে, লক্ষ্যের দিকে। এমনিতে জীবনে কিছু করতে পারলাম না, করাও হলো না অনেক কিছু। অন্তত এভাবে একা থাকলে হয়তো এক অমর মানুষ হয়ে যেতে পারি। তুমি আমার ইচ্ছেয় বাদ সেধ না। মন খারাপ করে দিও না। রাবণ ভগিনী শূর্পণখা নিজের মতো করে বাঁচতে জানে। দাদা, আর একটা বিয়ে করলে যে নিরাপদে থাকব, তার নিশ্চয়তা স্বয়ং দেবতাও দিতে পারে না। নিজের নিরাপত্তা নিজে খুঁজে নিতে যে জানে না তাকে নিরাপদে কেউ রাখতে পারে না। তোমার বিশাল বাহিনীর সমর্থন তাড়কার পিছনে ছিল। তবু নিজের ভুলেই তার বিপদ এবং ধ্বংস হল।

রাবণ লজ্জায় মাথা হেঁটে করল। মনে মনে বলল: ভগিনী। তোমার সঙ্গে তর্ক করে পারব না। নিজেকে তুমি দেবী করে তুলেছ। আমার কাছে তো নিশ্চয়ই। তোমার তুলনায় আমি কত সাধারণ পুরুষমানুষ। প্রতিমুহূর্ত রাজ্য, জাতি এবং নিজের নিরাপত্তা নিয়ে এত ভাবি যে সব সময়ে ভয়ের ঘরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এবং আশঙ্কা নিয়ে বাস করছি।

অপলক চোখে রাবণ চেয়ে থাকে শূর্পণখার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ চুপ পরে থেকে শূর্পণখার মন্থর গলায় বলল: রাত গভীর হচ্ছে। খাবে চল। অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছ। বিশ্রাম কর। খুশি মনে একটা লম্বা ঘুম দাও। তারপর. কাল সকালে প্রাতরাশ খেতে খেতে অনেক গল্প করব।

সে রাত্রে শূর্পণখার ঘুম হলো না। চোখ দুটি খোলা, শূন্য দৃষ্টি। স্থির দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে আছে। উদ্গাত অশ্রু বাষ্প হয়ে আটকে আছে তার গলার কাছে। ক্লান্ত চিলের মতো সকরুণ স্বরে বুকের মধ্যে চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ তুমি। স্বামী, আমার বীর, আমার রাজা!

হঠাৎ কী মনে হতে শয্যার উপর ওঠে বসল। পাশের ঘর দুয়ার রুদ্ধ। শূন্য দৃষ্টি মেলে সে দিকে চেয়ে রইল। নিঃশব্দে কয়েকটি মুহূর্তে কাটলে তারপর আস্তে আস্তে পালঙ্ক থেকে নেমে রুদ্ধ কপাটে হাত দিল। এই কক্ষটি বিদ্যুৎজিহ্বর। তার মৃত্যুর পরে এই ঘর ব্যবহার করে না। কিন্তু ঘরটি প্রতিদিন নিজের হাতে পরিষ্কার করে, বিদ্যুৎজিহ্বর ব্যবহৃত আসবাব পত্র, পোশাক পরিচ্ছদ, অস্ত্র, বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। এটা হল শূর্পণখার স্মৃতির মন্দির। তার শয়নের পালঙ্কটি পর্যন্ত তেমন ভাবে রাখা আছে।

দীপ হাতে ঢুকল শূর্পণখা। দীপদানের দীপগুলি এক এক করে জ্বেলে দিল। অনেককাল মাঝরাতে এঘরে বাতি জ্বলে না। ঘুরে ঘুরে বিদ্যুৎজিহ্বর ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রীতে হাত বোলাল, নরম শয্যার উপর মুখ রাখল। শয্যায় রাখা তৈলচিত্রের প্রতিকৃতির ওপর ঝুঁকে দেখতে লাগল। ঠোঁটটা নিজের অজান্তে কেঁপে গেল। যেন বিদ্যুৎজিহ্বর তৈলচিত্রকে কোনো গোপন কথা জানাল কানে কানে। অস্ফুট স্বরে বলল : তুমি কি কেবলই ছবি? পটে আঁকা! তুমি কী সত্যি নেই? তা কি হতে পারে?

শূর্পণখার সচেতন মনটা তো জানে, ঐ প্রতিকৃতি তার ডাকে সাড়া দেবে না। তবু তাকে ডাকতে ইচ্ছে করে। মনটা দীন হয়ে যায়। তবু বিবেচক মনটা তাকে প্রবোধ দিয়ে যেন বলে, অসম্ভবের পরেও তো আরো অসম্ভব থাকে। সেই একান্ত অসম্ভবটা কী বাস্তব হয়ে ওঠতে পারে না? কিন্তু তার অনস্তিত্বটা যখন দুঃসহ হয় তখন কল্পনায় সে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে। অজস্র প্রলাপের মতো কত কথা একা একা বলে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে এই অনুভূতি তাকে এক অদ্ভুত সুখ দেয়। অনেককাল পরে বিদ্যুৎজিহ্বর বিছানায় এলিয়ে দেয় দেহটা। বিদ্যুৎজিহ্বর

শরীরের ঘ্রাণ নিতে বালিশে, চাদরে শয্যায় মুখ ডুবিয়ে দেয়। এক অতীন্দ্রিয় স্পর্শ অনুভব করে দেহে মনে। এক অদ্ভুত সুখের শিহরণ বয়ে গেল সারা অঙ্গে। বিদ্যুৎজিহ্বর গায়ের গন্ধ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ঘরে ঘরে দীপ জ্বেলে দিল। উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল নরম শয্যার কোমলতা। ভালো লাগায়, ভরন্ত কলসের মতো ভরে উঠতে লাগল। সারা শরীর গান গেয়ে ওঠল। শূর্পণখার মনে হতে লাগল দীর্ঘ তপ্ত গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টি নামল। ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে এল সমস্ত চেতনা। বড় সুখের ঘুম নামল চোখে। একটা লম্বা ঘুম দিল বিদ্যুৎজিহ্বর শয্যায়।

ঘুমের ভেতর দেখল বিদ্যুৎজিহ্বর সঙ্গে রথে যাচ্ছে। সারথি নেই। সে নিজে দুহাতে ঘোড়ার রাশ ধরে আছে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটছে। তার খুরের শব্দে শরীরের দোলায়িত ছন্দ মিশল। বেশ লাগছিল। লাগামটা বিদ্যুৎজিহ্বর হাতে দিয়ে সে তার কাঁধের উপর দু'হাতের মালা করে থুতনির ভর দিয়ে কাজল টানা চোখ মেলে স্বামীর চোখে চোখ রাখল। কিন্তু সে চাহনি বিদ্যুৎজিহ্বকে ছাপিয়ে চারপাশের দৃশ্য ও ঘটনাবলীর সঙ্গে মিশে গেল।

রাস্তার দু'পাশে যেখানে মানুষের বসতি সেখান দিয়ে যেতে যেতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছবির মতো পল্লীর ছোট বড় কুটীরগুলো দেখা যাচ্ছিল। পায়ে চলা রাস্তা এসে মিশেছে বড় রাস্তায়। পুষ্করিণী থেকে গ্রামের মেয়ে কলসী কাঁখে করে জল নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা শূন্য কলস হাতে ঝুলিয়ে কোমর দুলিয়ে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে পুকুরে নাইতে আসছে। জলে নামছে শাড়ি ভিজিয়ে। কেউ বা কলসী ভাসিয়ে জলে সাঁতার কাটছে। যুবক যুবতী দাপাদাপি করছে। সান বাধানো দীঘির ভাঙা চাতালে বসে এক অন্ধ মনের আনন্দে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। পুণ্যলোভী স্নানার্থীরা দু চার পয়সা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ভিজে কাপড়ে মন্দিরে ঢুকছে।

রথ তো থেমে নেই। দৃশ্যপটও বদলে যাচ্ছে। কোথাও লম্বা প্রান্তর। আকাশচুম্বী পাহাড়। এখানে ওখানে গাছপালা, দু'একটা কুটীর, চাষীর খেত। আর কিছু গরু, ছাগল, মহিষ ঘুরে ঘুরে ঘাস খেয়ে চরে বেড়াচ্ছে। কোথাও একদল কৃষ্ণবর্ণ বালিকা আদুল গায়ে এ ওর কোমর ধরে একসঙ্গে দল বেঁধে নৃত্য করছে। যারা নাচের আনন্দ থেকে বাদ পড়েছে তাদের ভেতর কেউ আবার আঙুল উঁচিয়ে সাথীদের সঙ্গে কোন্দল করছে। এ সবই নিঃশব্দ ছবি হয়ে তার চোখ জুড়ে বিরাজ করছে।

পাহাড়ের দিকে বসতির তুলনায় ফাঁকা জায়গাই বেশি। আবার কোথাও অসংখ্য গাছ জড়াজড়ি করে আছে। মাঝে মাঝে নিবিড় বন। এই সব দৃশ্য আগেও দেখেছে অনেকবার। কিন্তু এমন করে নজর কাড়েনি, মন ছোঁয়নি আগে। আজ তার দীপ্তিময়ী মুখ, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ।

পথের ধারে ঋষির আশ্রম চোখে পড়ল। গাছের নিচে যোগাসনে ঋষি দুচোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। রথ থামিয়ে শূর্পণখা ঋষির সমাধিস্থ ভাবটা দেখতে লাগল। একটা কাঠবিড়ালী ঋষির গায়ের উপর চলা ফেরা করছে, কিন্তু তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে তাঁর কাঁধে বসে কানের কাছে কিচির মিচির করল। সেই দৃশ্য দেখে শূর্পণখা মুগ্ধ কণ্ঠে বিদ্যুৎজিহ্বকে বলল : দ্যাখ, দ্যাখ, কাঠবিড়ালী ঋষির কানের কাছে মুখ এনে হয়তো আমাদের আগমনের শুভ বার্তা জানাল। ঋষিকে বারংবার ডেকে বলছে চোখ খোল. দ্যাখ; কারা এসেছে! কিন্তু ওর কথা শুনে কী, ঋষি বুঝবেন? সমাধি থেকে সত্যি সত্যি জেগে উঠবেন কী?

বিদ্যুৎজিহ্ব শূর্পণখার ভাবান্তর এবং অদ্ভুত কথা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল। তারও চোখে অবাক মুগ্ধতা। ঋষিকে নয়, শূর্পণখাকে দেখতে লাগাল।

অশ্বটা হঠাৎই চিঁহি করে ডেকে উঠল। চমকে কাঠবেড়ালী লেজটা পিঠের উপর খাড়া করে ঋষির কাঁধ থেকে নেমে দৌড়ে গাছ বেয়ে তর তর করে উঠে গেল। ঋষি চোখ মেলল। কী গভীর তন্ময়তা তাঁর দুই চোখে। মনে হল, ঐ দুটি চোখ কাউকে দেখছে না, তাদের দিকে চেয়ে থেকেও অন্য কিছু দেখছে। অন্য কোন ভাবনায় মানুষের মন যখন আচ্ছন্ন থাকে তখন বোধ হয় তার দৃষ্টি এমন হয়। কিছুক্ষণ পর ঋষির দু'চোখ বুজে গেল আবার। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন পুনরায়।

বিদ্যুৎজিহ্ব অভিভূত গলায় বলল: ঋষিরা কী জানতে চান কে জানে? সাধনায় সিদ্ধ হয়ে কী

জানবে তার ধারণাটা বড় রঙিন? তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর স্বপ্ন, আশা, মনোভঙ্গ!

শূর্পণখা বিদ্যুৎজিহ্বর হাতের উপর হাত রাখল। বেশ শক্ত করে চেপে ধরল। আস্তে আস্তে বলল : এই হাতের নির্দেশেই জনস্থান তোমার শাসনে চলবে। কিন্তু তোমার অঙ্গুলি নির্দেশে মুনি ঋষিরা জায়গা ছেড়ে যাবে না। তপোবনও ওঠে যাবে না। তবু তাদের ভবিষ্যৎ তোমার হাতেই। কারণ জনস্থানের লাগাম তোমার হাতে।

বিদ্যুৎজিহ্ব ঠোঁট টিপে হাসল। বলল : আমি যুবরাজ বিদ্যুৎজিহ্ব। আমার দুই হাতে তাগদ। মগজে বুদ্ধি। হয় আমি দুশমনের শির নেব—নয়তো তারা আমার শির নেবে।

অমনি বিদুৎজিহ্বর ধড় থেকে মুন্ডুটা ছিন্ন হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বিদ্যুৎজিহ্বর ধড়টা মাটিতে পড়ে এলোপাথাড়ি হাত পা ছুড়ছিল। শূর্পণখার সারা শরীর রক্তে ভিজে গেল। কণ্ঠ থেকে এক ভয়ার্ত ভয়ঙ্কর আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে শয্যার উঠে বসল। দেখল, ভোরের আলোয় ঘর ভরে গেছে। আর তার সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। ভীষণ শ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

।। ছয়।।

একটা বছর দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটার পর বিদ্যুৎজিহ্বর সিংহাসনে বসল শূর্পণখা। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। তার এখন বিরাট ক্ষমতা। তার ইচ্ছেই কালকেয়র ইচ্ছা। সে যা চাইবে, কালকেয় তাই দেবে তাকে। তার কথাই এখন আদেশ ; কালকেয় রাজ্যের আইন। তার কথা, কাজ, হুকুম সব ইতিহাস। সে আর মানবী নেই, দেবী হয়ে গেছে। দেবীর ক্ষমতা তার। দেশের মানুষ দেবীর মতো তাকে পূজা করে, বিশ্বাস করে। তাই অজস্র দর্শনার্থীকে প্রতিদিন দর্শন দিতে হয়। এমন এক জায়গায় তাকে দাঁড়াতে হয় যেখান থেকে ছায়া গিয়ে পড়বে রাণীর নামে মানত করা জলে। আর তাতেই জল পবিত্র হয়ে রোগমুক্তির দাওয়াই হয়ে যাবে। কত রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে, কত ব্যর্থ মানুষ সফল হবে। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখবে। এ ছাড়াও কত প্রার্থী কত আব্দার, আর্জি, নালিশ নিয়ে তার জন্য ধর্ণা দেবে। কাউকে অপূর্ণ রাখবে না, সবার ইচ্ছে পুরণ করে তাদের সত্যিকারের রক্ত মাংসের দেবী হয়ে উঠবে সে। নিজেকে তার একজন মানুষের মতো মানুষ মনে হয়। মানুষের চেয়েও বেশী তার ক্ষমতা।

মন থেকে বিষাদের ছায়া কেটে গেছে। সেই রাতের ঘটনার পর থেকে সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎজিহ্বর স্মৃতি তাকে আর ক্লিষ্ট করে না। তার কথা ভাবার সময় কোথায়? বিদ্যুৎজিহ্বর অনেক অসমাপ্ত কাজ একা করতে হবে তাকে।

বিদ্যুৎজিহ্বর চতুরঙ্গবাহিনী অশ্মকরাজ্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাবণের বাহিনীর দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়, বেশ কিছু ঘোড়া এবং হাতিও মারা যায়, ঘোড়া সওয়ার এবং মাহুতও বিষ তীরে খতম হয়েছে। বীরশূন্য সে জায়গাগুলো নতুন সৈন্য নিয়োগের কথা অনেক কাল ধরে বলছে দূষণ। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। যা হয়েছে তা খুবই সামান্য। শূর্পণখা কাজে গতি আনল। শূন্য জায়গাগুলোতে নতুন ঘোড়া, নতুন হাতি এবং তাদের চালক ও বহু সৈন্য নিয়োগ হল। রাজ্যকে সুরক্ষা করতে পুরনো ভাঙা দুর্গগুলো দ্রুত সংস্কার করা হল। বিশাল বনাঞ্চলের মধ্যে ছোট ছোট সৈন্য ছাউনি তৈরী হল।

সব আয়োজন শেষ হলে শূর্পণখার মনে হল কাজে নামলেই পথ আপনা থেকে পায়ের তলায় জেগে ওঠে। আমার কী হবে? আমি কী করতে পারি এটা ভেবে পথের সুরাহা হবে না। সাহস করে পথে নামলেই আপনা থেকেই পায়ের তলায় রাস্তা জেগে ওঠে। বিদ্যুৎজিহ্বর স্মৃতির বোঝাটা কাঁধ থেকে যেদিন ঝেড়ে ফেলল সেদিন থেকে কী করব প্রশ্ন না করে কাজ করতেই গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল। সেই তার এগিয়ে চলা শুরু। আর পিছন ফিরে তাকায়নি। থমকে দাঁড়ায়নি ও। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুতে যেখানে কাজটা থেমে গিয়েছিল সেখান থেকে শুরু করল শূর্পণখা। একাকীত্ব কিংবা নিঃসঙ্গতা তার চলার গতি থামিয়ে দেয়নি। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর শোক তার হৃদয়ের গভীরে

সপ্তবীণার তারের মত রিণ রিণ করে। সেখানে পথ চলার সুর জন্ম নেয়। সেই সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে কোন দেবলোকের দিকে চলে যায় তার মন। পথ চলার গান দুর্বার যাত্রার উদ্দাম গতিতে আদুল পায়ে উদলা গায়ে দৌড়ে চলে এক মিথ্যে জীবনের শূন্য অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে, সাগরে যাওয়া নদীর চলকানো স্রোতের মতো তার গানের সুর আগে আগে এগিয়ে চলে। আর পিছনে পিছনে সে চলে। হ্যাঁ, বিদ্যুৎজিহ্বর পথ চলার অনুপ্রেরণা তার হাতের পতাকা হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দূষণ বলে, আমার চিরচেনা ভাবিকে আর তোমার মধ্যে খুঁজে পাই না। এক অচেনা শূর্পণখাকে তোমার ভেতর দেখি। যে একই সঙ্গে দিনের মৃত্যু, রাত্রির আশঙ্কা, প্রভাতের অপেক্ষা।

শূর্পণখার ওষ্ঠাধরে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠল। বলল, দেবর আমার কান জুড়ে তোমার জ্যেষ্ঠের কথাগুলো ঝঙ্কার তোলে, আমার সমস্ত মন, মস্তিষ্ক তাকেই খোঁজে। আজও যখন ভোরের পাখি ডাকতে ডাকতে নীল আকাশের বুকে পাখা মেলে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, নিজের অজান্তে পৌঁছে যাই তার খুব কাছে।

দূষণের দুই চোখে এক অদ্ভুত তন্ময়তা। অভিভূত গলায় বলল, ধ্বংস দেখেছি, অপচয় দেখেছি, বিভীষিকা দেখেছি কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা এমন যন্ত্রণা মুক্তির এরকম ব্যাকুলতা আগে দেখা হয়নি। জ্বলজ্বল করা উজ্জ্বল তারার মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছে তোমার প্রেম।

কোথা থেকে একখন্ড কালো মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিল। ঐ দিকে চেয়ে শূর্পণখা বলল : দেবর ঐ কালো মেঘটার স্পর্ধা দেখেছ। সূর্যের মুখ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে দেবর, পারবে ঐ রক্তচক্ষু কালো মেঘের গ্রাস থেকে সূর্যের আলো ফিরিয়ে আনতে?

দূষণ কী বুঝল কে জানে! শূর্পণখার জ্বলজ্বল করা একজোড়া চোখ আকাশের দিকে চেয়ে অভিভূত গলায় বলল, ঐ মেঘটা দিনের সব আলো মলিন করে দিয়েছে। ওর বিষাদ মাখা মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে তো আকাশ আবার আলোয় ঝলমল করে উঠবে না।

শূর্পণখা মাথা হেঁট করে বলল: দেবর! বিদ্যুৎজিহ্বর হত্যাকারী হলো আমার অগ্রজ। বেইমানী, কে কার সঙ্গে করল জানি না। কিন্তু আমার স্বপ্নকে প্রেমকে খুন করেছে আমার অগ্রজ। তাই সব আয়োজন শেষ হয়ে গেলে মন জুড়ে একটা প্রশ্ন আমাকে আকুল করে। আমার শত্রু কে? প্রস্তুতিটা কার স্বার্থে করলাম? প্রকৃত যুদ্ধটা কার বিরুদ্ধে? কে লাভবান হচ্ছে? এসব করলে আমি শান্তি পাব কি? বিদ্যুৎজিহ্ব তৃপ্ত হবে কি? দেবর! আমার ভেতরটা বড় অশান্ত।

দূষণ হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুটা ভয়, কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে শূর্পণখাকে দেখতে লাগল। শূর্পণখার এসব করার মানে কি? রাক্ষসের রক্ত তার দেহে। মাল্যবান থেকে রাবণের আমল পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলে অনার্যদের কর্তৃত্বের যে বাতাবরণ সে শুনেছে এবং দেখে এসেছে সেটাই তার মনের ভেতর রয়ে গেছে। বিদ্যুৎজিহ্বও এই অনার্যসংস্কৃতির বাহক। রাবণের একজন অনুগামী। তবু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে কত তফাৎ!

বিদ্যুৎজিহ্ব বিচারবুদ্ধিপ্রবণ যুবক। আবেগের চেয়ে যুক্তি তার কাছে বড়। তথ্যের বিচারে আর্যরা রক্তের শুদ্ধতা রক্ষা করে চলেনি। তাই মুনি ঋষি এবং ক্ষত্রিয়ের রক্তের সঙ্গে অসুর, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসের রক্ত মিশেছে। সে কাউকে প্রত্যাখান করেনি সবাইকে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে। গুণ কর্মানুসারে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করে এক নতুন সমাজ গঠন করেছে। সেই সমাজের শিরোমণি তারা। এই শ্রেষ্ঠত্বের জোরে আর্যরা ভারতবর্ষের তিন চতুর্থাংশ অঞ্চলের মানুষের মনে রেখাপাত করেছে, এত বড় জয় এবং সাফল্যকে জাত্যাভিমানবশত তুচ্ছ করে দেখার কোন মানে হয় না। শুধু কী তাই, একজন আর্য অনার্যদের সম্পর্কে যত জানে, একজন অনার্য কিন্তু তার নিকটতম প্রতিবেশী আর্যদের ধর্ম-প্রথা সংস্কার-বিশ্বাস, কৃষ্টি সম্পর্কে কিছু জানে না। অনার্যদের এই প্রসারতার অভাবেই তারা হারাচ্ছে একে একে অনেক জনপদ। এভাবেই এ দেশের মানুষ পরবাসী এবং ক্রীতদাস হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাবণের বক্তব্য অন্য। কৃষ্ণবর্ণ অনার্য অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

অন্যের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের বাসনা, অন্যের ধর্ম, সংস্কৃতিকে গ্রাস করে তার ওপর নিজের ধর্ম জাতিসত্তা চাপিয়ে দিতে অনার্যরা চায়নি। আর্যদের আগ্রাসী মনোভাব তাদের নেই। কৃষ্ণবর্ণ মানুষেরা গায়ের জোরে কারো জাতিসত্তা ধর্মকে গ্রাস করেনি। আবার অন্যের সংস্কৃতিকে নিজের ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়নি। বরং জাতি, ধর্ম, রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তারা কঠোর সামাজিক বিধি নিষেধের প্রাচীর সৃষ্টি করে নিজের কৃষ্টিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। নিজের জাতিসত্তাকে বাঁচাতে চেয়েছে। কারণ জাতের অন্য বর্ণের এবং ধর্মের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্রের মতো বাইরের সম্পর্ক বা বন্ধন হলেও হতে পারে কিন্তু অন্তরের আত্মীয় বন্ধন কখনই হয় না। দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের কন্যা দেবযানীকে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। কচের প্রত্যাখ্যানে তার প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুক্রাচার্যের নিজের জীবনও ব্যর্থ করে দিয়েছে ইন্দ্রের পুত্রী জয়ন্তী। মন থেকে তারা এবং ঘৃণাকে মুছে ফেলতে পারেনি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবলোকের জয়ন্তী ও কচ কিছুদিন কৃষ্ণাঙ্গ শুক্র ও কৃষ্ণাঙ্গ কন্যা দেবযানীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য দিতে পিতা পুত্রীর দুটি জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। এসব গল্প ভুলে রাবণ বিদ্যুৎজিহ্বর মতো শ্বেতাঙ্গ গুণকীর্তন করতে পারেনি। রাক্ষসকুলে বিদ্যুৎজিহ্বর মত মানুষদের নিশ্চিহ্ন করতে রাবণকে কঠোর হতে হয়েছিল। তার কাছে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতির চেয়ে বড় কিছু নেই। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাবণ একা অনার্য কৃষ্ণবর্ণদের জন্য আর্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। রাবণের মতো এমন একজন মানুষের অনুগামী এবং অনুগত সেবক হওয়া দুষণের কাছে গর্বের। তাই রাবণ ভগিনী শূর্পণখার মুখে সংশয়ের কথা শুনে সে একটু চমকে যায়। তাই শূর্পণখার হেঁয়ালি কথার প্রত্যুত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। শূর্পণখা তার কাছে কী চায় সেটা ভালো করে বোঝার জন্য হেঁয়ালি করে বলল: দেবি, ভরসা হারিও না। প্রতিদিনই ভোর হয়। কিন্তু একরকম হয় না। সমস্ত দক্ষিণদেশীয় অনার্য, অসুর, রাক্ষস দৈত্য দানবের রক্তে স্নান না করে আমরা থামছি না। থামব না। জীবনের জন্য, সত্যের জন্য, আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব, অস্থিরতা নতুন কিছু নয়। মানুষ হলেই তার কোন না কোন ঝগড়া থাকবে নিজের সঙ্গে, তার চারপাশের মানুষের সঙ্গে। তাই তো মন জুড়ে অহরহ কলহ। তার কোন সমাধান হয় না। সিদ্ধান্তের বেলাতে তাই দোমনা ভাব। আসলে আমরা সবাই দেশ, জাতি, পরিবার, ধর্মের মধ্যে বাঁচি। এই বাঁচার মতো সত্য আর কিছু নেই।

শূর্পণখা বাঁকা চোখে তাকিয়ে দুষণকে দেখল। লজ্জায় চোখের পাতা নত হল না, দৃষ্টিও কাঁপল না। উদাস বিষণ্ণ গলায় বলল: কী জানি? সর্বত্র বিশ্বাসহীনতা, কপটতা। কেউ প্রকৃত বন্ধু নয়, আত্মীয় বলে কেউ নেই। সবাই নিজের জন্য ভাবছে। নিজে কি পেল তার হিসাব করছে। মানুষ বড় স্বার্থপর। স্বার্থের দাম দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেছে। লোভাতুর হাতে সে শুধু চায়। কাঙালের মতো দু'হাত ভরে নিতে তার লজ্জা নেই। কথাগুলো বলতে বলতে তার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

দুষণ হাঁ করে শূর্পণখাকে দেখতে লাগল। কত বছর ধরে ভ্রাতৃবধূকে দেখেছে, কিন্তু কখনো মনে হয়নি তার বুকে একটা লুকোনো ব্যথা আছে। মুখ দেখে তার বুকের ব্যথা, ভাবান্তর কিছু বোঝা যায় না। হঠাৎই সে বদলে গেছে। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে কিছু একটা করতে চাইছে। শূর্পণখা সম্পর্কে দুষণের মনে এই প্রথম সন্দেহ দেখা দিল।

।। সাত ।।

বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর পরে একটা বছর ধরে শূর্পণখা কালকেয় রাজ্যে কোথায় কী ঘটছে চেয়েও দেখেনি। সব কিছুর ভেতর সে ছিল ভীষণ নির্লিপ্ত। আসলে প্রচ্ছন্ন থেকে জটিল রাজনীতি বুঝে নিচ্ছিল নিঃশব্দে। রাবণ তার ভাই বটে, কিন্তু বিদ্যুৎজিহ্বর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই স্বার্থের চেহারা কূট মতলব কার কি জানা ও বোঝা যেমন দরকার, তেমনি যাদের হাতে প্রশাসন, রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার ভার তারা কে কোন মতলবে এবং স্বার্থে কাজ করছে, কিভাবে তার অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে শূর্পণখার সব দৃষ্টি তার ওপরে ছিল। এছাড়া দেশের মানুষ কী চায়, কোথায় তাদের অভাব

তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যই মাঝে মাঝে রাজ্যের অভ্যন্তরে একা একা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে দেখা হত এর নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, চাষের ক্ষেত, মানুষ সব। কারো সাহায্য ছাড়া শূর্পণখার বুঝে ফেলল কূটরাজনীতি কাকে বলে।

রাজনীতি জিনিসটা এদেশের মানুষদের চেয়ে শ্বেতাঙ্গরা বেশি বোঝে। বোঝে বলেই মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ ভিন দেশ থেকে এসে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সঙ্গে আত্মীয়, বন্ধু সম্পর্ক স্থাপন করে নিঃশব্দে এদেশের মানুষদের উপর তাদের অধিকার ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলল। কালো মানুষদের ধর্ম, প্রথা, সংস্কারকেও গ্রাস করে ফেলল। নিজের দেশে পরবাসী হয়ে গেল তারা। এর পেছনে আছে মুনি ঋষিদের পরামর্শ ও বুদ্ধি। তাদের সাহায্য ছাড়া হিমালয় বরাবর আর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হতো না। মুনি ঋষিদের বুদ্ধি দাতা আবার হিমালয়বাসী দেবগোষ্ঠীর লোকেরা। তাদের উভয়ের মধ্যে বেশ একটা ভালো বোঝাপড়া আছে। প্রেম, প্রীতি, শান্তি মৈত্রী এবং মানবকল্যাণ ও সেবার অধিকার নিয়ে জনতার সঙ্গে তারা মিশে গেল শুধু নয়, আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী নিয়ে মোক্ষাভিলাষী করল। তাদের প্রবল কর্মক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে দিল। নীতি হিসেবে কী ভয়ঙ্কর খেলা তাদের! কী সাংঘাতিক বঞ্চনা সরল বিশ্বাসী মানুষগুলোকে। নিজের অজান্তে তারা পাল্টে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ক্ষয় হয়ে গেল। দেশের নরপতিরা আপাত মোহে এবং সুখের লোভে সাম্রাজ্যবাদী আর্যশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখতে লাগল। মুনি ঋষিরা তাদের শেখাল আর্যরাই মর্তের দেবতা। দেবতার মতোই শক্তিশালী। কালের রথের রশি তাদের হাতে। তারাই সারথি। যেভাবে চালাবে, সেভাবেই চলবে। তাদের ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম, কৃষ্ণাঙ্গদেরও ধর্ম ও ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। গায়ের জোরে তাদের জাতীয়তাকে পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এ কাজটা মুনি ঋষিরাই করছে। তারা ভালোই জানে, মানুষের জীবনে ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রভাব কত গভীর। এ প্রভাবকে কী করে ব্যবহার করলে মানুষের নাম আর তার সমাজের পরিচয় মুছে যায়, দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্যের মাঝের যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে একটা গোটা জাত তার ঐতিহ্য সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিন্নমূল হয়ে যায়। আগে কী ছিল, পরে কী হলো তার কথা ভুলিয়ে দেয়ার বিদ্যাটা মুনি ঋষিরা জানে বলেই আর্য নরপতিদের কাছে তাদের কদর খুব বেশি। তাঁদের প্রভাব আর কৌশলেই তো উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নিজেদের সমাজ গোষ্ঠী ও পরিবেশের বাইরে অন্য এক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কেবল, রাক্ষসরাই যা একটু আলাদা। যতই ভাগ্য বিপর্যয় হোক, এদেশের মানুষের মনোবল আর সাহস অটুট আছে। ভারতের সবচেয়ে দৃপ্ত, পৌরুষসম্পন্ন, দেশভক্ত জাতি হওয়ার জন্য রাক্ষসদের একটা গর্ব আছে। নিজের দেশ ও জাতি সম্পর্কে রাক্ষসেরা বড় অহঙ্কারী। নিজেদের জীবনযাত্রার মধ্যে সর্বপেক্ষা আত্মসন্তুষ্ট জাতি। অভাব থাকলেও অন্য জাতির চেয়ে সুখে আছে। যদিও মানুষ বড় লোভী। জীবকুলের ভেতর সবচেয়ে অসন্তুষ্ট মানুষ। তবু রাক্ষসরা নিজেদের সমাজের ভেতরেই বেঁচে থাকতে চায়। তারা রাক্ষস পরিচয়ের ভেতরেই বাঁচে। এই বেঁচে থাকাটা সাম্রাজ্যবাদী আর্যশক্তির পছন্দ নয় বলেই তাদের সমগ্র জাতির প্রতিনিধি রাবণের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

তেরোটা বছর আর্যকুলতিলক রামচন্দ্র দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন মুনি ঋষির আশ্রমে বাস করে, অবশেষে, তার রাজ্য সীমানার খুব কাছে পঞ্চবটীতে কুটির নির্মাণ করল। অতিথি থেকে শ্রীরামের গৃহী হয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত শূর্পণখাকে ভাবিয়ে তুলল।

চারদিকে অফুরন্ত জায়গা পড়ে থাকতে রামচন্দ্র জনস্থানের পঞ্চবটীতে কুটির করল কেন? প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে রাম পঞ্চবটীতে বসবাস করছে এটা বিশ্বাস হয় না। কারণ, একজন সফল রাজনৈতিক ব্যক্তি খেয়াল খুশিতে হঠাৎ কিছু করে না। তার সব কাজের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। রামের মতো নিরাবেগ চিত্তের রাজনৈতিক মানুষ পরিকল্পনা ছাড়া কিছু করতে পারে না। রামের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে শূর্পণখার এরকমই ধারণা হল।

রামচন্দ্রর সব কাজটা সন্দেহজনক। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে এসে এতদঞ্চলের ঋষিদের সঙ্গে

একটা সংযোগ গড়ে তুলল। দীর্ঘ দ্বাদশ বছর ধরে তাদের আশ্রমেই থেকেছে। কিন্তু কোন একস্থানে বেশিদিন কাটায়নি। ঘন ঘন স্থান বদলের ফলে তার উপর নজর রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার এই নিরন্তর স্থান পরিবর্তনের মূলে ছিল কিছু একটা খোঁজা। রহস্যজনক খোঁজার ব্যাপারটা খুব গোপন ছিল। সাবধানতা অবলম্বনের জন্য কয়েকজন মুনি ঋষিই ব্যাপারটা জানত। যতদিন যেতে লাগল রামচন্দ্রর স্থান পরিবর্তন একটা উত্তেজনার দিকে মোড় নিল। তাদের ধারণা হলো রামচন্দ্র এই দেশের মাটিতে পা রাখার জন্য ছটফট করছে। তাই রামের আগমনের পরেই দাক্ষিণাত্যের রাজনীতি নতুন দিকে মোড় নিল। বনবাস হল রামের রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস। অফুরন্ত সম্পদ থাকার এই বিপদ। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে আসতে বিন্ধ্যাচল পর্বতের মত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটাও আর্যরা একদিন অতিক্রম করল। রামচন্দ্র এলেন মুনি ঋষিদের সম্ভাবনার পতাকা এগিয়ে নিয়ে যেতে। এদেশের নিরীহ কালো মানুষদের সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র সম্ভাবনার যাত্রা সুরু করল। কালো মানুষরা আবেগের বশে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে নানা তথ্য যোগাল। এরা কেউ চিন্তা করল না, একজন বিদেশীর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে সাহায্য করছে কেন? কোন স্বার্থে রামচন্দ্র তাদের সঙ্গে মিশছে এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। মুনি ঋষিরা তপোবনে কী করে? রামচন্দ্র অধিকদিন কোন ঋষির আশ্রমে কাটাচ্ছে না কেন কাটাচ্ছেন এ সম্পর্কে তাদের কৌতূহল নেই।

থাকবে কী করে? ছোট ছোট মানব গোষ্ঠী বিশাল দক্ষিণারণ্যের এক একটি ছোট ছোট অঞ্চল দখল করে পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো করে রাজত্ব করছে। তাদের রাজশক্তি সীমিত। তাই রাবণ তাদের এক বৃহৎ রাষ্ট্রের তত্ত্বধানে এনে নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দক্ষিণারণ্যে বিদেশী অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য তারা এককাট্টা হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কিন্তু রামের আগমনের পর সে চিত্র বদলাতে লাগল। বিভেদ সৃষ্টি না করে রাম মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে তাদের কাছে টানল। তার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত করল। জাত পাতের এক অভিনব রাজনীতি করে রামচন্দ্র সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেল। তাদের অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে মুনি ঋষিদের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ বিদ্যা ও চাষ আবাদ শিখল। তাতে রামের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেল না, কিন্তু রামচন্দ্র রাতারাতি একজন মহান ব্যক্তি হয়ে উঠল। অভাবী মানুষদের পরিত্রাতা বলে গণ্য হলো। রামচন্দ্রের খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

রামের কুট কৌশল শূর্পণখাকে অবাক করে। মনে মনে যত পর্যালোচনা করে ততই বিস্ময় বাড়ে। বিভেদের রাজনীতিতে কাউকে প্ররোচিত না করেও জাতপাতের প্রীতি ও দাক্ষিণ্য দেখিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে দূরত্ব বাড়ানো যায়, সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে মানবপ্রীতির নামে রাজনীতি করা সহজ হয়, সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়েও যে একটা অঘোষিত যুদ্ধ প্রতিপক্ষের মনের অভ্যন্তরে বাঁধিয়ে তোলা সম্ভব রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য নীতি প্রসঙ্গে শূর্পণখার সেই কথাটা বারংবার মনে হতে লাগল।

এতকাল কৃষ্ণবর্ণ মানুষরা রাবণকে তাদের দুর্দিনের বন্ধু এবং রক্ষক বলে সম্মান করে এসেছে। কিন্তু রামের সহমর্মিতায় তারা সব ভুলে গেল। ছোট ছোট রাজ্যের অধিপতিরা আর্যকুলতিলক রামের সঙ্গে হাত মেলাল। কৃষ্ণবর্ণ আর্যেতর মানুষদের সঙ্গে ক্ষমতাশালী রামের বন্ধুত্ব রাজনীতির দিক থেকে যে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা শূর্পণখা সেটা ভালোই বোঝে। কোনরূপ প্ররোচনামূলক রাজনীতি না করে রামচন্দ্র নিঃশব্দে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে রাবণকে কোণঠাসা করে ফেলল। কালো মানুষদের আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে কৌশলে রাবণকে বান্ধবহীন করল। কালো মানুষরা নীরবে রাবণের কাছ থেকে সরে গেল। তাদের নিঃশব্দে প্রস্থান রাবণের মনের অভ্যন্তরে নির্বান্ধব হওয়ার এক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল। অনার্য গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ হয়ে ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা রাবণের শোভা পায় না। আবার রামের বিরোধিতায় নামলে এই মানুষগুলি নির্বোধের মত তাকে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে যুদ্ধ হবে আর্যতর গোষ্ঠীর সঙ্গে রাবণের। এই যুদ্ধে এক ফোঁটা আর্যরক্ত খরচ হবে না। যে রক্ত ঝরবে তা অনার্যের। ক্ষতি যা হবে সব

কালো মানুষের উপর দিয়ে। আর্যেতর মানুষের বিপুল ক্ষতির কথা ভেবে রাবণ সংযত থাকল। রাবণের এই স্বজাতি প্রেম এবং মহত্বের যে মূল্যই থাক রামের তুলনায় আর্যেতর মানবগোষ্ঠীর কাছে তা নগণ্য।

রাজনীতির এই মেরুবদল শূর্পণখাকে ভাবিয়ে তুলল। রাম জেনে শুনেই তার রাজ্যের কাছে কুটির নির্মাণ করল। রাবণের ঘনিষ্ঠ দুই আত্মীয় তার রক্ষায় নিযুক্ত। তারা বিশ্বস্ত দুই বাহু তার। সন্দেহজনক কাজকর্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে যে কোন সময় রামকে আক্রমণ করতে পারে। তবু রাম কোন সাহসে এবং কার ভরসায় পঞ্চবটীতে কুটির করল? কোন উদ্দেশ্য এবং মতলবে সীতাকে নিয়ে শত্রুর নাকের ডগায় বাস করছে, সেটাই শূর্পণখার গবেষণার ব্যাপার। তার মন ভাঙানোর মতলব নিয়ে যে রাম তার রাজ্যের কাছে বাস করছে না, কে বলতে পারে? রাক্ষসদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে রাবণকে ফাঁপরে ফেলা তার উদ্দেশ্য। দাক্ষিণাত্যে রামের শত্রু শুধু রাবণ। রাক্ষসদের অন্তরে রাবণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা, অনুরাগ কত গভীর? তার শাসনযন্ত্রের দুর্বলতা কোথায়? কিংবা কারা তার বিপক্ষে? স্বার্থের সংঘাত কেন? এ সব সংবাদ সংগ্রহ করে জনগণের প্রতিকূল ভাবাবেগকে রাবণের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে তার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করা এবং বিরূপ করার মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে হয়তো রামচন্দ্র এসেছে। রাক্ষসদের শক্ত ঘাঁটি লঙ্কাকে বিপর্যস্ত করতে হলে দরকার রাবণকে স্বজনহীন করা। রাবণের পরাভবকে সুনিশ্চিত করতে অগস্ত্যমুনির পরামর্শে রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে বাসস্থান করেছে। শূর্পণখার নিজস্ব গুপ্তচরবাহিনীর প্রধান অকিঞ্চন তাকে এ খবর দিয়েছে।

রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণ মানুষের কোন কৌতূহল কিংবা দুর্ভাবনা নেই। কেবল রামের হাতে তাড়কা রাক্ষুসীর মৃত্যুটা তারা মেনে নিতে পারেনি। তাড়কা বধের গল্পটা তাদের কাছে খুবই ভীতিপ্রদ। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে তর্ক ও আলোচনা করে। নানারকম বাদ বিসম্বাদ হয়। এভাবেই রাম কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসদের আলোচনার পাত্র হয়ে উঠে। তাদের জিভের ডগায় কেবলই রাম নাম। রাম বোধ হয় এটাই চেয়েছিল। তারা ভয় করুক তাকে। মান্য এবং সমীহ, করুক। নিজেদের অগোচরে তাদের মনোবল ভেঙে গেল। সাহসের জায়গায় তাদের প্রাণে ভয় ঢুকল। ভয়ে শক্তি ক্ষয় হল। ইদানীং সব রাক্ষসের মনের জোরে টান ধরেছিল। শত্রুর মনের অভ্যন্তরে পরাভবের জমি তৈরি করতে রামের কৌশল শূর্পণখাকে আলোড়িত করল। ললাট কুঁচকে গেল। চেতনার রঙে তার ভেতরটা উজ্জ্বল হল। নিরুচ্চারে বলল : শত্রুর অন্তরে ভীতি ও আতঙ্ক উৎপাদনের কৌশল যে জানে না, সে নিজের রাজ্য রক্ষা কবতেও শেখেনি। যাকে রাজ্য চালাতে হয় তাকে অবশ্যই লোকে ভয় করবে, সমীহ করবে মান্য করবে—নইলে সে কিসের রাজা? রাজাকে শক্ত হাতে রাজদণ্ড ধরতে হয়। সে দন্ড একটুও শিথিল হওয়ার উপায় নেই। শিথিল হওয়া মানেই রাজার দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া। রাজাকে তাই কঠোর ও নির্দয় হতে হবে। রাজ্যের চার পাশে একটা ভয় বিরাজ করবে। ভয়ই রাজার শক্তির উৎস। এই আলোড়িত চিন্তা শূর্পণখার ভেতরে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সর্বময়ী রাণীর কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে জেগে উঠল। একজন সফল সম্রাজ্ঞী হওয়ার রঙীন স্বপ্ন তার দুই চোখে।

শূর্পণখার মনে হলো এখন ভেবে স্থির করতে হবে কি চায় সে? রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্তি, না প্রতিহিংসা? মনে হলো, সবগুলো মিলিয়ে একটা বিরাট কিছু হোক। চাওয়াটা সহজ, কিন্তু পাওয়া কঠিন। এক একজন মানুষ সারা জীবন ধরে চেয়ে কিছু পায় না, আর একজন কিছু না চেয়েই পেয়ে যায় সব। তার অদৃষ্ট মন্দ। তাই, পেয়ে হারাল। হারানোর কথাটা মনে হলে বিদ্যুৎজিহ্বর জন্য মনটা টনটন করে। আর তখনই তার ভেতরটা নির্দয় হয়ে ওঠে। প্রতিহিংসার উন্মাদনায় তাকে হিংস্র করে তোলে। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, বঞ্চনার বেদনায় ছিন্নভিন্ন করে নিজেকে।

বিদ্যুৎজিহ্বর প্রেম থেকে যারা তাকে বঞ্চিত করল, ইচ্ছে করে হোক আর ভুলক্রমে হোক তাদের ক্ষমা করবে না সে। বিরহের ভেতর এত তাপ লুকোনো ছিল যে, তার উত্তাপে মমতার সমুদ্র শুকিয়ে গেল। আর নিজের অগোচরে দিন দিন তার প্রকৃতি হিংস্র আর উগ্র হয়ে উঠল। কারণটা বোধ হয় রাবণ। এই ভ্রাতার উপর তার যত রাগ এবং আক্রোশ। এই মানুষটা তার দুর্ভাগ্যের

কারণ। রাবণের জন্য নিঃসঙ্গ এবং একাকী সে। একটা সুন্দর দাম্পত্য প্রেমকে হত্যা করে রাবণের লাভ কী হল? তাকে বধ করার আগে প্রিয়তম ভগিনীর কথা একবারও মনে পড়েনি তার? নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভাই যখন ভগিনীর ঘুম কেড়ে নেয়, তার নীড় ভেঙে দেয় তাকে নিরাশ্রয় করে তখন সে আর ভাই থাকে না শত্রু হয়ে যায়। ভাই রাবণ তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। রাবণের শত্রুতা ভোলে কী করে? বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর কথাটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন রাবণকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। ভ্রাতা ও ভগিনীর সঙ্গে এক প্রচ্ছন্ন সংঘাতের সূচনা হলো। এতকাল সিংহাসনের অধিকার এবং রাজ্যের দাবি নিয়ে বিবাদ হতো ভাইতে ভাইতে। এবার সেই সংঘর্ষের বীজ ভগিনীর অন্তরে অঙ্কুরিত হল।

রাবণকে শত্রু মনে করতে শূর্পণখার ভীষণ কষ্ট হল। বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। তবু রাবণের জন্য অনাথ সে। কোন যুক্তি দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারল না। আবার তার দোষ, অপরাধ, কৈফিয়ৎ, ক্ষমা করতে পারল না। ভ্রাতার প্রতি তার প্রচন্ড রাগ, বিরাগ, বিদ্বেষ এবং বিতৃষ্ণা। তার অভিমানী নারীমনকে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ করল। নিজের অজান্তে চোখ ভরে জল নামে। ভীষণ অসহায় লাগে। তখন রামের কথা মনে হয়। জনস্থানের এত জায়গা থাকতে তার রাজ্যের কাছে রাম কুটীর করল কেন? তার কাছে রাম কী কোন প্রত্যাশা করে? এরকম একটা কৌতূহলী জিজ্ঞাসায় তার ভেতরটা চঞ্চল হয়। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা হয় সারা দক্ষিণ দেশের মানুষের হৃদয় জয়ে যিনি সমর্থ হয়েছেন সেই অদ্ভুত মানুষটি না জানি কেমন! রাক্ষস ছাড়া, অন্য নরগোষ্ঠীরা বলে তিনি আত্মার তৃপ্তি, মনের শান্তি, তাঁর সান্নিধ্য মধুর হতে মধুর। কথাগুলো তার বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। একটা আকুল করা যন্ত্রণা কুরে কুরে খেতে লাগল তাকে। এক কুটিল জিজ্ঞাসা জাগল শূর্পণখার মনে।

পুরুষসিংহ লঙ্কেশ্বর রাবণ একজন নিরস্ত্র ভবঘুরে সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হতে এত ভয় পাচ্ছে কেন? রামের কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপের সাহস পর্যন্ত তার নেই। প্রচন্ড রাম বিদ্বেষী হয়েও রাবণ ক্লীবের মতো আচরণ করছে কেন? জনস্থানে রামের আগমনের পরে দেবতাজয়ী রাবণের স্বভাব ও আচরণ ভীষণ বদলে গেছে। রাত দিন প্রমোদ ভবনে সুন্দরী ললনাদের মধ্যে বিরাজ করে। তাদের কবোষ্ণ সান্নিধ্যে দিন শেষ হয়ে কখন সন্ধ্যা হয়, রাত গভীর হয় কিছু জানতে পারে না। ভ্রাতার এই রামভীতির কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না শূর্পণখা। হঠাৎ-ই তার মনে হলো রামচন্দ্রের বিপক্ষাচরণের পথ ধরে ভারত রাজনীতির পুরোভাগে নিজের জায়গা করে নেয়া কোন শক্ত কাজ নয়। রাবণ যা করতে পারে না, সেই সাহস দেখাতে পারলে সে সহজে অন্যের নজর কেড়ে নিতে পারবে। নারী হওয়ার হীনমন্যতার অবিরাম যন্ত্রণা, উপেক্ষার কষ্ট, অবজ্ঞার দুঃখ এবং করুণার আত্মগ্লানি থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। ভাই হলেও রাবণ নারী বলেই অনুগ্রহ করে তাকে। খর ও দূষণ অযোগ্য মনে করে নানা পরামর্শ দিয়ে থাকে। নিজেকে বড় কৃপার পাত্র মনে হয় তখন। নারী বলেই তাকে করুণা করে সবাই। এই আত্মযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা কঠিন কিছু করে প্রমাণ করতে হবে তাকে, সে করুণা চায় না। সে মর্যাদা চায়। নিজের শক্তিতে এবং বিচারে বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা পুরুষের মতো তারও আছে। ভগবান রাবণের থেকে তাকে কম করে কিছু দেয়নি! সে চাইলেই একজন দ্বিতীয় রাবণ হতে পারে। অমনি বুকের ভেতর কি যেন ঢেউ দিয়ে গেল। শূর্পণখা কল্পনা করে রাক্ষসদের পরম শত্রু রামচন্দ্র থেকেই তার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব। অমনি কত বিচিত্র চিন্তা, বিচিত্র কথা, স্বপ্ন—কল্পনার ভেলায় ভেসে ভেসে স্বপ্নলোকের দিকে চলল। স্থান, কাল, পরিবেশ কোন কিছু সম্বন্ধে তার আর হুঁশ রইল না। শয়ে শয়ে কল্পনার পায়রা উড়তে লাগল যেন। পাখা ঝাপটা ঝাপটি করতে করতে অদৃশ্য কল্পনার পায়রার মনের আগুনে সুখের তাপ পোহাতে লাগল।

দেয়ালে টাঙানো বিদ্যুৎজিহ্বর তৈলচিত্রের উপর চোখ পড়তে তার আত্মবিস্মৃতির অবসান হলো। বড় বড় শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগের চোখ মেলে শূর্পণখার দিকে চেয়ে আছে যেন। বিদ্যুৎজিহ্বর চোখের পলক পড়ছে না। অধরে প্রেমমুগ্ধ হাসি। চোখে কৌতুক। শূর্পণখার চোখের পাতা সহসা কেঁপে

গেল। ভিজে গেল মুহূর্তে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সেই চোখ, সেই মোহন হাসি তেমন আছে বিদ্যুৎজিহ্বর। কেবল মানুষটি নেই। তবু এই দুঃখময়তার মধ্যেও সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। নিজের দুঃখটাকে, কষ্টটাকে একমাত্র কষ্ট মনে করে না। কারণ সে তো বেঁচে আছে তার স্বপ্নের মধ্যে। প্রেমের ফুল নিয়ে স্বপ্নের ফিনফিনে সুতো দিয়ে দিয়ে সে স্বপ্নমালা গাঁথে। মুখে এক আশ্চর্য সমর্পণ তন্ময়তা লেগে থাকে।

স্বামীর প্রতিপ্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল বিদ্যুৎজিহ্ব যেন ফিস ফিস করে বলছেঃ প্রিয়তমাসু! বর্তমান অবস্থায় বড় সমস্যা কি জান? দায়িত্বহীন, নীতিবর্জিত, মানসিক শূন্যতা মানুষকে দেউলে করে দিয়েছে। তাই লোভের পেছনে, স্বার্থের পেছনে অনুগত ভৃত্যের মতো ছুটে যাচ্ছে। এরা কী করে দেশের মানুষের কথা বলবে? কী করে নিজের এবং অন্যদের মেরুদণ্ড টানটান রাখবে?

শূর্পণখার ভাবনা থমকে যায়। নিজেকে বোঝাতে মনে মনে বলল, বিদ্যুৎজিহ্ব একটা পাগল। ভীষণ ছেলেমানুষ আর সরল। মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল জানে না বলেই বোকার মতো মরেছে। সবার উপরে থাকতে হলে একটু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কৌশলে সবাইকে বিভ্রান্ত করে বোকা বানানো সহজ। রামচন্দ্র মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল জানে বলেই দক্ষিণারণ্যের মানুষগুলো অনুগত ভৃত্যের মতো ছায়ার মতো আছে তার সঙ্গে। এটা কোন অপরাধ নয় তার। বরং বলা যায় রামের কৃতিত্ব। ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণেই তার চারপাশে অনেক মানুষ জড় হয়। দেশের সব জায়গা থেকে লোক আসে। রাম এভাবে সবার কাছে নিজেকে আলোচনার বস্তু করে তুলেছে। এটাই রামচন্দ্র চায়। সবার জিভের ডগায় রামচন্দ্রের নাম ঘোরে। তার কথাবার্তা কাজকর্ম নিয়ে অকারণে অনেক তর্ক জমে উঠে, প্রত্যেকে নিজের মত করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে স্বমতে আনার চেষ্টা করে। না পারলে কারো প্রতি কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই। এমন কি তার নিজের প্রতিও না।

বিদ্যুৎজিহ্বর প্রতিকৃতির উপর গভীর কাজল কালো দুই চোখ পেতে রাখে শূর্পণখা। সময় বয়ে যায়। সঘন নিঃশ্বাস ফেলে বললঃ নিজের মনের আবরণ খুলে তুমি আমাকে এবং জীবনকে দেখতে ও দেখাতে শিখিয়েছিলে। কত কীই তো চিনিয়েছিলে। ভয় শুধু মানুষকে। মানুষের নিজের মনের মধ্যে যে সব ভয়াবহ, বীভৎস, স্বার্থপর, লোভী মানুষ বাস করে তাদের হাত থেকে নিজেকে পাহারা দেওয়া কঠিন কাজ। সেটা যদি আগে থেকে বুঝে সতর্ক, সাবধান না হও তা-হলে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। নিজের পাহারার ব্যবস্থা নিজে করা প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা অত্যন্ত জরুরী শর্ত। প্রত্যেককে নিজের যোগ্যতায়, একে অর্জন করতে হয়। ঠিক সময়ে ঠিক ব্যক্তি আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার চেয়ে বড় শিক্ষা কিছু নেই।

সহসা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল সে। উৎকণ্ঠার গভীর থেকে আর কারো কথা নয় মারীচের নামটা স্বতস্ফূর্ত ভাবে সর্বাগ্রে মনে পড়ল অজানতে। সবরকম সাবধানতা নিয়ে মারীচের কাছে দূত পাঠানোর কথা ভাবল।

।। আট ।।

শূর্পণখার যখন একা লাগে, মনটা অস্থির হয় তখন বীণাটা কোলে নিয়ে নিজের মনে বাজাতে থাকে। রেওয়াজের মুহূর্তে সব ভুলে যায়। বীণা বাদনের ঐ ক্ষণটুকু বোধ হয় তার কাছে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। কিন্তু সব কিছুরই একটা শেষ থাকে। তারও সুর ফুরিয়ে যায় এক সময়। ধ্বনির উতরোল থেমে যায়। রেশটুকু অনেকক্ষণ থাকে মন জুড়ে। আঙুলগুলো তার ছুঁয়ে থাকতে চায় যেন। ফুরিয়ে যাওয়ার পরে এই নিঃশব্দে শব্দময়তার মুহূর্ত বোধ হয় যন্ত্রসঙ্গীত বাদকের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির মুহূর্ত। সেই রেশটুকু কেটে যাওয়ার আগেই সে টের পেল পা টিপে টিপে মারীচ ঘরে ঢুকছে।

মারীচ দেখল নকশাকাটা পশমের জাজিমের উপর শূর্পণখা বসে আছে ধ্যানস্থের মতো। পিঠময়

তার কালো চুল থৈ থৈ করছে। ভীষণ ভালো লাগে তাকে। শ্রদ্ধা মিশ্রিত চোখে শূর্পণখাকে দেখতে লাগল। মনে হলো, সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে দেবলোকের দিকে চলে গেছে সে। নিজের ভেতরে পুরোপুরি সমাহিত হয়ে আছে। তার সেই শান্ত, সৌম্য ভাবটি মারীচ বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগল।

শূর্পণখাও চেয়েছিল মারীচের দিকে। সেও স্তব্ধ হয়ে গেছে। চোখ দুটি স্থির হয়ে আছে তার মুখের উপর। মুখটি হাঁ হয়ে গেছে। মারীচকে চিনতে অনেকক্ষণ লাগল। চিরচেনা মারীচ আমূল বদলে গেছে। চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে তার চেহারায়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সে সৌন্দর্য আর চেহারায় নেই। রোগা হয়ে গেছে। দড়ির মতো পাকানো শরীর। গায়ের রঙ একটু বেশি তামাটে। মাথায় জটা। ঋষির মতো চূড়া করে বাঁধা। মুখময় দাড়ি। আদুল গায় গেরুয়া রঙের উত্তরীয়। পরনে আধ ময়লা গেরুয়া রঙের ধুতি। বুকের হাড়গুলো গোনা যাচ্ছে। চোয়ালের দুদিকের হাড় একটু উঁচু। গাল তুবড়ে গেছে। কোটরগত দুই চোখ খদ্যোতের মতো জ্বলছে। কিন্তু কী শান্ত, স্নিগ্ধ, দ্যুতিময়।

কথা বলার সময় শূর্পণখার ভুরু কুঁচকে গেল। অবাক গলায় উচ্চারণ করল: আশ্চর্য! চেনার উপায় রাখনি। চেহারা পোশাক সব পাল্টে ফেলেছ। সব ছেড়ে শেষে সন্ন্যাস নিলে? ভীরুর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছ? পালিয়ে বাঁচতে পারবে? যে ভয়ে তুমি পালাতে চাইছ সেই ভয় তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। তোমার মুক্তি নেই। তুমি কী বলত? প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলে?

মারীচ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল শূর্পণখার দিকে। অধরে তার বঙ্কিম হাসি। শূর্পণখার সামনে বিছানো গালচের উপরে বসে বলল: কতকাল পরে দেখা। কোথায় দুটো ভাল কথা বলবে, তা না গালমন্দই করছ? অভিযোগের তুবড়ি ফুটছে। এত উত্তেজনার কী আছে!

বোকার মতো কথা বলো না। কী বলতে চাই, বোঝার ক্ষমতা তোমার আছে। কিন্তু তোমার পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি যেন কী? ঝঙ্কার দিয়ে কথাগুলো বলল শূর্পণখা!

আমি আবার কী? আমার মতই।

পাগলামি কর না।

একগাল হেসে মারিচ বলল: পাগল হয়েছ। পাগলামির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবে যে, চিরদিন যারা ভালোমানুষ, বোকা এবং মানুষকে বিশ্বাস করে তারাই পাগল। পাগল বলেই তারা বঞ্চিত ও লুণ্ঠিত হয় আর যারা খারাপ, ধূর্ত, বঞ্চনাকারী, লুণ্ঠনকারী তারা কোনদিন পাগল হয় না। কৌশলে করে তারা অন্যদের পাগলা গারদের দিকে ঠেলে দেয় তিল তিল করে। একথাটা যে আগে না বোঝে তাকে পস্তাতে হয়। অনেক ঠকে শিখেছি।

শূর্পণখা সহসা কথা খুঁজে পেল না! কথাগুলো তার মর্মে বিঁধে গেল। অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয় থেকে অভিভূত গলায় বলল: তুমি অনেক বদলে গেছ। জীবনকে নিয়ে কত বিদ্রূপ এবং রসিকতা করতে পার। তোমার কথায় সুধা ও বিষ দুই আছে।

একধরণের অপ্রকাশ্য খুশি মেশা আনন্দ ছিল মারীচের অধরে। বলল: ঘরের বাইরে পা না দিলে জীবন দেখা হয় না। অভিজ্ঞতাও হয় না। এমন কী জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম, বিভিন্ন মানুষী আবেগ, সুখ দুঃখ, যন্ত্রণা-বেদনা, আনন্দ-বিষাদেও দুই জীবনের মস্ত বড় ভাগ।

একধরনের অপ্রকাশ্য খুশি মেশানো আনন্দ ছিল মারীচের অধরে। শূর্পণখার দিকে চেয়ে মিট মিট করে হাসছিল। তার ঐ হাসি শূর্পণখা সহ্য করতে পারছিল না। তার ভেতরটা রাগে গর গর করছিল। তিরস্কার করে বলল: ছিঃ! তুমি হাসছ। হাসতে পারছ? তোমার পিতা-মাতার মৃত্যুর জন্য দায়ী যারা তাদের তুমি ক্ষমা করে দিলে। রাক্ষসের রাগ তোমার কোথায়? সাধু হতে তোমার কষ্ট হলো না? মা বাবার প্রতি সন্তানের কোন্ কর্তব্য করেছ? সাধু সেজে তুমি আমাকে হতাশ করলে। তোমাব কাছে আমার কোন প্রত্যাশাই নেই। তুমি সাধু বেশে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন কায়দায় রাক্ষসদেব পরাস্ত করতে চাইছ। এর আগে কোন রাক্ষস রাজ্যে যা হয়নি, এবার তুমি তাই করতে যাচ্ছে। বড় আশা করে তোমার কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম।

মারীচের কোন ভাবান্তর নেই। আস্তে আস্তে বলল : কৈফিয়ৎ দিলে তো তোমার অভিযোগের উত্তর হবে না সখী। ছোট্ট করে বলি, আমার পূর্বপুরুষদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি মাত্র।

শূর্পণখা চমকালো। চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল, প্রায়শ্চিত্ত! পূর্বপুরুষরা কোন ভুল করেনি। ভুল হচ্ছে তোমার। কর্তব্য ভুলে কর্তাভজা নীতি নিয়েছ।

মারীচ তাকে বাধা দেবার জন্য বলল: সখি! তার ডাকে এমন কিছু ছিল যে শূর্পণখা মুখের কথা মুখে রেখে চমকে তাকাল তার দিকে। সমস্ত শরীরের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য কাঁপুনি টের পেল। শরীরের ভেতর এত শীতের কাঁপুনি লুকিয়ে ছিল, জানা ছিল না তার। মারীচ এ সব কিছুই দেখল না। হাসি হাসি মুখ করে গম্ভীর গলায় বলল: ভুল হওয়ারই কথা। রামচন্দ্রর ব্যক্তিত্ব একটু আলাদা। সাধু অসাধু ব্যক্তিও চিনতে ভুল করে তাঁকে? এটা দোষ বা অপরাধ নয়, তাঁর মতো অদ্ভুত, অসাধারণ মানুষকে পরিমাপ করা সহজ নয়। কোন চৌহদ্দির মধ্যে তাঁকে ধরে না বলেই রহস্যময় পুরুষ তিনি।

শূর্পণখার ভেতর ভয়ের ভাবটা আর নেই। ঠোঁট উল্টে, মুখ ঘুরিয়ে চোখ জোড়ায় বিদ্যুৎ হেনে বলল: মাতৃহন্তা, পিতৃরাজ্য হরণকারী রামের স্তুতিতে তুমি গদগদ। তোমার এত অধঃপতন হয়েছে? অমন মায়ের সন্তান হয়ে তুমি রাম স্তুতি করতে পারছ? তোমার বিবেক মরে গেছে কি? গুরুভক্তি দেখাতেই কী রাজার সাজ ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজেছে? শত্রুর গুণগান করতে তোমার লজ্জা করল না? তুমি এত স্বার্থপর।

সখি, বিচার বুদ্ধি সকলের এরকম হয় না। কেউ দাবিও করে না। আমাকে তুমি মিথ্যা তিরস্কার করছ। এই দেশ, দেশের মাটি আমার আপনজন। এদের প্রত্যেককে আমি ভালোবাসি। শ্রদ্ধা করি। এর আকাশ, বাতাস, ধুলোর গন্ধ আমার নিশ্বাসে ভরে আছে। আমার যা কিছু আবেগ, উত্তেজনা সবই এই দেশ ঘিরে! আসমুদ্র হিমাচল হলো আমার সেই স্বদেশ। খলদ কারুষ রাজ্যের ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে বেঁচে থাকাটাই হত স্বার্থপরের মত বাঁচা। আমার চারপাশেও ছোট ছোট দেশ ও মানুষ আছে তাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য বাঁচা-মরা, উত্থান পতনের সঙ্গে আমিও যে যুক্ত হয়ে আছি, সেই কথাটা রামচন্দ্র আমাকে শেখাল। আমরা কেউ একা বাঁচি না, সকলের সঙ্গে বাঁচি। এই মহৎ বোধের আলো পড়ে আমার চিত্তের অন্ধকার যিনি দূর করলেন তিনিই আবার পথদ্রষ্টা। আমার গুরু। আমার ইহলোক, পরলোক।

শূর্পণখা আকণ্ঠ ধিক্কার উগরে দিয়ে বলল : ছিঃ মারীচ! তুমি গোল্লায় গেছ। তুমি কেমন পুরুষ মানুষ?

সখি, কুয়োর ব্যাঙ সাগর দেখেনি। সাগরের বিশালতা কী করে জানবে? একদিন তোমার মতো সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে বুকের ভেতর প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম। কবে সে আগুন নিবে গেল জানতেও পারলাম না।

মারীচ, তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। তোমার চাওয়াটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তোমার বুকের আগুন নিভে গেছে। আমার কোন কাজে লাগবে না তুমি। বৃথাই তোমাকে পথের কষ্ট দিলাম।

সখি, রামচন্দ্র মানুষটি বড় ভালো।

আমি তাঁর কথা তো শুনতে চাইনি। কী হবে শুনে? তিনি আমাদের কে?

তুমি না চাইলেও আমাকে বলতে হবে। কারণ তোমার অনুযোগ অভিযোগ, তিরস্কার তো তাঁর জন্য। তোমার জানতে ইচ্ছে হয় না, প্রতিহিংসা, শত্রুতা ভুলে কী করে মারীচ তাঁর একজন অনুরাগী এবং ভক্ত হয়ে গেল।

তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমার কৌতূহল নেই।

আছে বলেই দূত পাঠিয়ে তলব করেছ। বুঝতে চেষ্টা করেছি অনেক কাল আগের ছেঁড়া সম্পর্কের এই জোড়াতালি কেন? নিজের অজানতে মনে হলো, লক্ষ্যটা রামচন্দ্র আর আমি নিমিত্ত।

শূর্পণখা একটু চমকে উঠেছিল। তীব্র প্রতিবাদ করল: মিথ্যে কথা। ধারণাটা তোমার, যা খুশি

ভাবতে পার। আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আমিই, তুমি তুমিই, আমাকে তোমার মত ভাবছ কেন?

উঁহু সত্যের অপলাপ করতে নেই। বন্ধুর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার জন্য লজ্জা সংকোচ করতে নেই। আমি তো জানি, তুমি এক দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছ। নিজেব সঙ্গে একা লড়ছ। লড়াইটা যাদের বিরুদ্ধে তারা এক পক্ষ। নতুন কায়দায় তাদের পরাস্ত করার অভিসন্ধি তোমার মনে। নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য রাম বিদ্বেষী হয়েছ। এটা তোমার মনের কথা নয়। কথায় বলে দেয়ালেরও কান আছে। তাই একটু বেশি সতর্ক। মুখ দিয়ে অসাবধানে তাই কোন কথা বেরোয়নি তোমার। পাছে সন্দেহভাজন হও তাই অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে তোমার মনের গোপন অভিলাষ পরোক্ষে আমাকে বুঝিয়েছ। ভালো করেই জান, আমাকে সেতু করে তুমি নিজের কুল থেকে রামের কুলে যেতে চাইছ। আর সেজন্য অকিঞ্চনকে দিয়ে এই তলব। মুখে যাই বল, মনের সংগ্রামে জিতবার জন্য আদর্শ, ন্যায় নীতি, জনস্বার্থ সব ছাড়তে প্রস্তুত। প্রতিহিংসার বিষ জ্বালায় তোমার ভেতরটা জ্বলছে। তুমি এখন নিজের অধীনে নও।

বিস্ময়ে হতবাক হল শূর্পণখা। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল : সবই তোমার মনগড়া। আমর মনের অভ্যন্তরে ঝড় তুলতে চাইছ। আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ। বন্ধু হয়ে তুমিও শত্রুতা করছ।

শূর্পণখার বিস্মিত বিহ্বল ভীত দুই চোখের ওপর চোখ রেখে মারীচ বলল: স্বামীহন্তার পরাজয় চাওয়া কোন অপরাধ নয়। তাঁকে ভালোবাস বলেই এ পরাজয় চাইছ। এ পরাজয় রাবণের প্রয়োজন আছে। তার পরাজয় ছাড়া রাক্ষসজাতি এবং লঙ্কার মঙ্গল হবে না।

মারীচের দুই চোখের গভীরে নিজের দু'চোখ ডুবুরীর মতো নামিয়ে দিয়ে একেবারে স্থির হয়ে রইল শূর্পণখা। মারীচের কথার মধ্যে এমন একটা ইংগিত ছিল যা বুঝতে তার অসুবিধে হল না। লঙ্কার শ্রী, সমৃদ্ধি, উন্নতির স্বার্থে রাবণ করেনি এমন কাজ নেই। রাক্ষসদের স্বাধীনতা, সুখ, আনন্দ, শান্তি ছিল যে মানুষটার স্বপ্ন; সেই মানুষটার পরাজয় এবং ধ্বংস চায় তারই স্বজন, স্বজাতিদের কেউ কেউ। নিজের শ্বাসে মৃদু কম্পনে এক অজানা আতঙ্ক অনুভব করল মারীচ।

রাবণও জানে তাঁর বিরুদ্ধে একটা নিঃশব্দ চক্রান্ত চলছে। তবু তার প্রতিরোধ কিংবা প্রতিকার করার কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। আগের মতো রাবণ আর উদ্ধত নয়, সে দম্ভও তার নেই। নিজের সঙ্গে সময়ের সঙ্গে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে নিরন্তর একটা আপস করে চলছে। রামচন্দ্রের দক্ষিণারণ্যে আগমনের পর রাবণ তার কৌশল ও নীতি বদলেছে। কাজে কর্মে সে অনেক বেশি সতর্ক সাবধানী, ধীর, স্থির এবং সংযত। দক্ষিণারণ্য নিষাদ, ধীবর, বানর নাগ প্রমুখ আর্যেতর গোষ্ঠীর সঙ্গে রামচন্দ্রের সুসম্পর্ক স্থাপনের খবর রাবণকে ক্রোধে অস্থির করে না। এই মৈত্রীকে কোন গুরুত্ব দিল না সে। রাবণের এই অদ্ভুত আচরণ এবং নীরবতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। হয়তো নির্বিকার থেকেই কে শত্রু আর কে মিত্র চিনে নিতে চাইছে। এও তার এক ধরণের কৌশল। শূর্পণখার হঠাৎই মনে হল, রাবণ ভক্ত মারীচ সন্ন্যাসী সেজে তাকে পরীক্ষা করছে না তো? এ কি মারীচের কোন ছলনা, না তার নিজের মনের কথা? মানুষকে চেনা বড় শক্ত। কে যে কী মনে, কার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে সেটা জানা না থাকলে ফাঁপড়ে পড়তে হয়। বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে অবিশ্বাস করে ঠকা অনেক ভাল। শূর্পণখা সাবধান হল। বলল : পৃথিবীতে এত ফল থাকতে কেউ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে যায়? তেমনি নিজের দেশের সঙ্গে, জাতের সঙ্গে, দুশমনী করতে কেউ চায়? শূর্পণখা চায় না। কথাগুলো বলতে পেরে বেশ একটা স্বস্তি পেল শূর্পণখা। মনে মনে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল: শূর্পণখা! একটু হলেই মরেছিলে তুমি। এক চুলের জন্য বেঁচে গেলে এই মাত্র।

মারীচ বলল : দুশমনী বলছ কেন? দুশমনও দোস্ত হয়ে যায়। এই হয়ে যাওয়াটাই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। এমনও হতে পারে তুমি রাম সম্পর্কে যা ভাবছ তা ঠিক নয়। কারো কোন জানাই অভ্রান্ত নয়। জানার জগৎ প্রতিদিনই বদলে যায়। আজ যেটাকে দুশমনী বলে বোধ হচ্ছে কাল সেটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। রামের জীবনেও তাই হয়েছিল। হয়ত এমন না হলে জীবনটা একটা নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকত। কিন্তু তা হওয়ার নয় বলেই রাম মর্ম দিয়ে.

অনুভব করল রাক্ষস, অসুর, দানবদের বিদ্রোহ বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে এরাই প্রকৃত দেশের জনগণ। কিন্তু মুনি ঋষির যোগসাজশে ক্ষত্রিয় রাজারা আযাবর্ত থেকে এদের মুছে ফেলতে সক্রিয়। তরুণ বয়সে রাম না বুঝে বিশ্বামিত্রের খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর প্ররোচনায় তাড়কাকে হত্যা করার পর সে অনুতপ্ত। আর্যাবর্ত থেকে আনার্যগোষ্ঠীর কালো মানুষদের জন্য কিছু করা কঠিন। তাই অনুগত কিছু ব্যক্তির সহায়তায় অযোধ্যা ছাড়ার একটা নাটক করল। পাছে তাদের চক্রান্ত এবং উদ্দেশ্য কেউ টের পায় তাই মন্থরার সাহায্য নিয়ে কৈকেয়ীকে রামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করল কিন্তু কালো মানুষেরা রামচন্দ্রের এতবড় মহত্ব ও ত্যাগের কোন মূল্য বুঝল না। রামচন্দ্রই প্রথম অনার্যকুলের জন্য উপলব্ধি করল, জাত-বিভাজিত রাজনীতিতে ভবিষ্যতে টিকে থাকতে হলে অনার্য দের সম্পর্কে আর্যাবর্তকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে। সংঘ বা জোট নীতি বদলাতে হবে। গ্রাস করার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু মনের কথা কাউকে খোলাখুলি জানানো হয়নি। জানালে হয়তো দেখতেন কেউ তাঁর কথা অনুমোদন করছে না। ব্যাপারটা বহুদূর গড়াতে পারে। এই আশঙ্কা করেই বিশ্বাসভাজন মানুষদের সহায়তায় হঠাৎই অযোধ্যা ছেড়ে আমাদের মধ্যে চলে এলেন নতুন দায়িত্ব নতুন কর্তব্য মাথায় করে নেয়ার আনন্দে। যোগ্যতা অযোগ্যতা সব কিছু নিয়ে রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যের মানুষের আত্মোন্নতির জন্য কিছু করতে চান। জননী নিহত হওয়ার পরে এটাই ছিল তাঁর মনের কথা। আজ তাঁর উপস্থিতি যতই অস্বস্তি লাগুক, তাঁর সান্নিধ্যে এলে তুমিও আমুল পাল্টে যাবে। মানুষ হিসেবে রামচন্দ্রের কোন তুলনা হয় না। তাঁর কথাবার্তায় কাজকর্মে কালো মানুষদের প্রতি কিছু দরদ ও মমতার ছাপ আছে। তাঁর কাছ থেকে সর্বদা একধরনের নিশ্চিত সংরক্ষণ পাওয়া যায়। অনেকটা বিরাট বটগাছের নীচে বসে থাকার মতো।

শূর্পণখা সহসা একগাল হেসে বলল : ও বাবা! রামচন্দ্রতো তোমার মগজ ধোলাই ভাল করেছে। মাতৃহন্তা রামের প্রশংসায় তুমি তো গদগদ। দীর্ঘশ্বাসের মনে উচ্চারণ করল—কিন্তু দুর্ভাগ্য কি জান, বটগাছ পথিককে, আশ্রিতকে নিজের চেয়ে অনেক ছোট ভাবে। তাই ছায়া থেকে, করুণা থেকে বঞ্চিত করে না। কেবল রাক্ষসরাই কারো করুণা চায় না। বেঁকা হয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন সুখ নেই। তোমার অদ্ভুত পরিবর্তনে আমি খুশি হইনি।

মারীচ শূর্পণখার দিকে চেয়ে রইল গভীর বিস্ময়ে। তাকে বেশ একটু হতাশ দেখাল। আস্তে আস্তে বলল : আমাকে ডেকে পাঠানোর রহস্যটা বুঝলাম না। তুমি কী চাও, নিজেও ভালো করে জান না। তবে, একটা কথা জেনে রাখ মৈত্রী এবং সম্প্রীতির নামে রাম কারো রাজ্য গ্রাস করেনি। নেতৃত্বের রাশ আর্যাবর্তের হাতে না রেখে অনার্যদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জমি প্রস্তুত করছে। সে চায় মানুষের কল্যাণ। কথায় কাজে আচরণে রাম সততার এক আদর্শ স্থাপন করেছে। প্রেমে জয় করেছে, করুণায়, মহত্বে বশীভূত করেছে। আর্যাবর্তে রামচন্দ্র যা করতে পারেনি, দাক্ষিণাত্যে তাকে সম্ভব করেছে। এটাই তার কৃতিত্ব।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মারীচের দিকে তাকিয়ে শূর্পণখা বলল : কী আশ্চর্য বদলে গেছ তুমি। রাম তোমার মাতৃহন্তা। তবু তাকে ক্ষমা করেছ। তার সান্নিধ্যে ধন্য হয়ে গেছ। করুণায় ভরে গেছে তোমার অন্তঃকরণ। আশ্চর্য লাগছে, পুরোপুরি এখন আমি তোমার মতো হয়ে উঠতে পারেনি। নিজেকে মুছে ফেলে অন্য মানুষ হয়ে উঠতে সময় লাগে। রামচন্দ্র বোধ হয় সেই জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত মনোযোগী। নিজে যা নয়, অন্তত পোশাকে তাই হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সত্যি কি তাই হয়? যে লোকটা মনে প্রাণে রাজা, সন্ন্যাসীর পোশাক পরলে কি সে নির্লোভ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যায়? আচ্ছা মারীচ যে লোকটা ইতর প্রকৃতির, সে মহতের পোশাক পরলেই কি তার ব্যক্তিত্ব স্বভাব বদলে যায়? বোধ হয়, সহজ নয় অত। ময়ূরপুচ্ছ পরা কাকও ময়ূরের কাছে ধরা পড়ে যায়, আর আমরা তো মানুষ! দুর্ভাগ্য; নিজের অতীতকে তুমি ভুলে গেলে?

মারীচ দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল : অতীতকে ভুলিনি। কিন্তু আমার মাতা ও ভ্রাতাকে হত্যার জন্য রামকে দায়ী করি না। গুরু বিশ্বামিত্রের নির্দেশেই এই অপ্রিয় কাজ রাম করেছিল বলে প্রায়শ্চিত্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি এসেছেন।

আশ্চর্য তোমার বিশ্বাস। রাম রাক্ষসদের মধ্যে বিভেদের রাজনীতি করতেই এসেছে দাক্ষিণাত্যে এবং সেভাবেই কাজ করছে। রাক্ষসদের সঙ্গে তার বিরোধ কিংবা সংঘর্ষ চায় না ওটা বোঝানোর জন্য তোমাকে দরকার তার। ভাবতে অবাক লাগছে তোমার মতো লোক চরিত্রজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান কূট রাজনীতিবিদ্‌কে রাম বিভ্রান্ত করল কোন মায়ায়? কী জাদু আছে তার ব্যাক্তিত্বে? খুব জানতে ইচ্ছে হয়। দেখতে মন চায়। কিন্তু তোমাকে দেখে সাহস হয় না। মনে ভয় জন্মে।

মারীচ হো হো করে প্রাণ খুলে হাসল। বলল : সখি শেষ পর্যন্ত এই অদ্ভুত সখ জন্মাল। আশ্চর্য! মনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে একা উল্টো-পাল্টা লড়াই করে অবশেষে ধরা পড়ে গেলে নিজের অজান্তে। মনের অয়ন পথ বড় বিচিত্র। বেশির ভাগ মানুষ তা জানে না বলেই বিপত্তি ঘটে।

শূর্পণখা সহসা জবাব দিতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে বলল : ধরাপড়ার আছে কী? রামচন্দ্র যেভাবে মানুষের হৃদয় জয় করে দাক্ষিণাত্যের আধখানা সাম্রাজ্য গিলে বসল, তাতে ভয় হওয়া কোন অন্যায় নয়। সত্য বলতে কি, আমি হারানোর ভয়ে বিচলিত।

মারীচ তাকে অভয় দিয়ে বলল : তোমার হারানোর কিছু নেই। যে মানুষ নিজের কাছে আগেই হেরে বসে আছে নতুন করে তার হারানোর আছে কী? এই জীবনটা দু'দিন বৈত কিছু নয়। যতক্ষণ বেঁচে আছ; দিয়ে নিয়ে, নিয়ে দিয়ে নিজেকে ভরপুর করে চলে যাও। এটাই সব মানুষের মনের কথা। তার একান্ত অন্তরের কথা। কারণ, একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে কোনো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে। তোমার সামনেও তেমন একটা প্রত্যাশা আছে। তোমার প্রাপ্তির ঘরে অশেষ শূন্যময়তা। নিজেকে অপূর্ণ, অসার্থক রেখে, জীবনের সব প্রাপ্তিকে অপ্রাপ্তিতে গড়িয়ে দিয়ে নিজের সঙ্গে তামাশা করে কী সুখ পাবে মনে করেছ? বেঁচে থাকার মজাটাও ফুরিয়ে যাবে তাতে। সেজন্য কেউ অশ্রুপাত করবে না। নির্বোধ বলে উপহাস করবে, গালমন্দ দেবে।

শূর্পণখার বলতে ইচ্ছে হল তুমি খুব ভাল মারীচ। মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। বুকের গভীরে ডানা ঝাপ্টানো কথাগুলো তুমিই বার করে আনলে? কিন্তু মুখ থেকে একটি কথাও বার হলো না। কী ভেবে জানলার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে আসা ফুরফুরে হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়তে লাগল। মুখে চোখে জড়িয়ে ধরল সোহাগে, খুশিতে। পড়ন্ত রোদের মরা আলোর লম্বা ছায়া পড়ল ঘরের মেঝেতে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল মারীচ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা শূর্পণখার দিকে। মারীচের উদাস উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি যেন শূর্পণখার পার্থিব শরীর ভেদ করে দূর দিগন্তে নীলাভ পাহাড়ের আলোকিত সবুজ গাছের দিকে ছুটে গেল।

।। নয় ।।

জীবনটা যে কত জটিল তা শুধু বিদ্যুৎজিহ্বর মহিষী হয়ে বোঝেনি। জনস্থানের সম্রাজ্ঞী হয়ে বুঝল খানিকটা। বিদ্যুৎজিহ্ব যখন ছিল ঘব সংসার, স্বামী পুত্রের ঘেরাটোপের মধ্যে ছিল। নিজেকে তখন বিরাট করে চিন্তা করা যেত না। স্বাধীনভাবে উপলব্ধি করার কোন দরকার হয়নি। তখন সে কারও স্ত্রী, জননী, বোন এবং বৌদি। কিন্তু এখনও সে সম্পর্কগুলো বদলায়নি তবু মনে হতে লাগল রাজ্যের কতৃর্ত্ব লাভের পর তার চারপাশের জগতের সীমানাটা অনেক বড় হয়ে গেছে। এখানে সে ছাড়াও অনেক অচেনা, অদ্ভুত সব মানুষ আছে তার চারপাশে। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনের নানা স্রোত, ফেনার মতো ঘটনা প্রবাহের ভেতর দিয়ে বহু দূরে সরে যাচ্ছে। বিদ্যুৎজিহ্বর শূর্পণখা এখন অন্য এক শূর্পণখা হয়ে গেছে। এ শূর্পণখার বুকে প্রেমের সমুদ্র শুকিয়ে গেল দ্রুত প্রতিহিংসাব তীব্র জ্বালার উষ্ণ লুতে।

প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ নেয়াটা নরম মানুষের জন্য নয়। আঘাত দেওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত করতে হয় নিজেকে। যার সে যোগ্যতা নেই তার পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার বড়াই করা উচিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা রামের চেয়েও রাবণের বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ আছে। আভিযোগ

অনুযোগের রন্ধ্র পথ ধরে একদিন শত্রুতা মনকে অধিকার করে ফেলে। গভীর গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয় সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে।

একা থাকলেই শূর্পণখাকে চিন্তায় পায়। জীবনের গতিপ্রকৃতি কত বিপরীত আশ্চর্য ও রহস্যময়। শূর্পণখা তার মর্ম এমনই অনিবার্য ভাবে অনুভব করল যে অসহ্য আবেগে আর উত্তেজনায় তার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। তার শরীরে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে এ কিসের বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। কার জন্য চিত্ত এত অস্থির হল। এ ব্যাকুলতার রহস্য কোথায়?

মারীচের মুখে রামের প্রশস্তি কেন? আর্যাবর্তের রাম আর দক্ষিণারণ্যের রাম দু'জন এক নয়। দুয়ের মধ্যে ব্যবধান শুধু দেশ কাল পরিস্থিতিগত নয়, আরো অনেক কিছুর। সত্যিই রামের হৃদয়ে আর্যত্বের অভিমান কিংবা অহঙ্কার নেই। তার কাছে কালো ধলো সমান হয়ে গেছে। অনার্য কৃষ্ণকায় মানুষদের সমতলে নেমে এসে সে তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সমাদর বেশি করে পেয়েছে। আর্যত্বের অহমিকা থাকলে এই মিলন হতো না। শুধু ছলনা কিংবা শঠতার দ্বারা এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। নিষাদ, কিরাত, গৃধ্র, যক্ষ, নাগ, বানর প্রমুখ দক্ষিণারণ্যবাসী শক্তিতে বীর্যে শ্রেষ্ঠত্বে আর্য এবং রাক্ষসদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাদের মধ্যেও যথেষ্ট বীর ও কূট ব্যক্তি আছে। তারা কেউ রামের শঠতা কপটতা নিয়ে সন্দেহ করেনি। রামের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং সংঘর্ষ বাঁধেনি। রাম তাদের বন্ধু মাত্র। পারস্পরিক বিশ্বাস, সৌভ্রাত্র এবং মৈত্রীবোধের মজবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক।

বিশাল ভারতবর্ষে হরেক-রকম মানুষ, বিভিন্ন জাতের এবং গোত্রের। আর্যদের বর্ণাশ্রমভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কৃষ্ণাঙ্গদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের সরল বিশ্বাস, গোষ্ঠীপ্রীতি এবং জাত্যাভিমানের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা কলহের বিষ ঢেলে দিয়ে জাতপাতের প্রশ্ন তুলে আর্যরা তাদের শুধু অবজ্ঞা অবহেলা করেনি ঘৃণাও করেছে। শ্বেতাঙ্গ আর্যদের বংশধর হয়েও রামচন্দ্র স্বতন্ত্র। কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে প্রেম বিশ্বাস ও সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক গড়ে তোলার সদিচ্ছা নিয়ে তাদের ভেতর এসেছে। কৃষ্ণাঙ্গদের দারিদ্র্যের জন্য অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সামাজিক পশ্চাদপদতার জন্য আর্যরা দায়ী একথাটা অকপটে শুধু স্বীকার করেনি তাদের সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলার জন্য যা করা দরকার অনুগত মুনি-ঋষিদের সহয়তায় তা করে প্রমাণ করল যে কৃষ্ণাঙ্গপ্রীতি রামের বিলাস নয়। তাদের মনের বাধা এবং জীবনের ভার সরিয়ে দিয়ে একটু একটু করে বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে। তাদের প্রিয় মানুষ হয়েছে। জনস্থানের বিশালত্বে সে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত মানুষ নাকি রামচন্দ্র। একা একা বসে এই মানুষটার কথা ভাবে। রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে কত আকাশ পাতাল চিন্তা করে। কোথাও পৌঁছয় না সে চিন্তা। না পৌঁছক, কিন্তু তার কথা ভাবে কেন?

আলসের গায়ে সবুজ রঙের গিরগিটি সামনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে একটা ফড়িংকে অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিল। খুব সন্তর্পণে একটু একটু করে পোকার দিকে এগোচ্ছিল ফড়িংটা পিঠের উপর ডানাটা ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে গিরগিটির দিকে চেয়ে বসেছিল। একটু একটু করে গিরগিটিটা এগিয়ে গেল তার দিকে। তবু সে নড়ল না, উড়ল না। আশ্চর্য লাগল শূর্পণখার। ফড়িংটা কি সম্মোহিত? না, এ তার পাগলামি? অথবা গিরগিটির সঙ্গে একটু মজা করছে। নাগালের ভেতর এসে পড়লে পোঁ করে উড়ে গিয়ে গিরগিটিকে হতাশ করে দেবে। শূর্পণখা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না। কারণ ঐ পোকার নিজের বিপন্ন অস্তিত্ব আঁচ করার মতো ক্ষমতা আছে। আছে জৈব অনুভূতি, ক্ষুধা, প্রজনন, হয়তো আছে সন্তান পালন করার দায়। তবু একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছিল তার বোধবুদ্ধি। আর ঐ গিরগিটি প্রবল সম্মোহনী ক্ষমতা দ্বারা তাকে আকর্ষণ করছিল ছোট্ট উদরে তাকে পুরে ফেলবে বলে।

শূর্পণখার খুব অবাক লাগে। কি করে এটা হয়? কে ঘটায় এই সমন্বয়? কে আছে এই রহস্যের অন্তরালে? সতর্ক চোখে শূর্পণখা তাকে দেখতে লাগল। কুর্সিতে বসেই ঘুমে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তন্দ্রার মধ্যে দেখল গিরগিটি ও ফড়িং-এর স্থানে সে আর রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে।

বিনীতভাবে নমস্কার করে গ্রীবা উন্নত করে রামচন্দ্র বলল, আপনি তো রাবণ ভগিনী শূর্পণখা। আপনি এই জনস্থানের গৌরববৃদ্ধি করেছেন। সামান্য বনবাসী হয়ে আমি কী প্রতিদান দিতে পারি? কত সামান্য আমার ক্ষমতা। পঞ্চবটীর তো আলাদা করে কোন গৌরব ছিল না। আমার আসার সুবাদের সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল। লোকে বলে এ হল রামের রাজ্য। ওরা বোঝে না বলেই এসব বলে। এ হলো আপনার স্বামীর সাম্রাজ্য। আমার আসাতে এই স্থানের গৌরব বেড়েছে ছাড়া কমেনি। আপনিও এ সত্য স্বীকার করবেন।

শূর্পণখা অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করল। অস্ফুট স্বরে বলল : গৌরব! গৌরবের কী আছে? আপনি যা করেছেন তাতো নিজের জন্যে করেছেন সামান্যই করেছেন। কত কী পারেননি।

রামচন্দ্র হেসে বলল : কৃতিত্ব পরিমাপ করার শিক্ষা তো সকলের সমান নয়। জঙ্গলের মানুষ, সহজ সরল। একটুতেই বর্তে যায়। বঞ্চিত জীবন অল্পেতেই ভরে উঠে। আমি প্রভুত্ব চাই না। মানুষের ভালোবাসা চাই। লোকে আমার কথা শুনুক, বুঝুক বিশ্বাস করুক। আমি তাদের মঙ্গল চাই। তাদের জন্য চাই একটা সবুজ শস্যভরা পৃথিবী। যাতে ভাবীকালের মানুষেরা তাদের জন্মদাতা পিতা মাতাকে কিংবা দেশের শাসককে অভিশাপ না দেয়।

রামের কথাগুলো শূর্পণখাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। মনটা কেমন হয়ে যায়। অদ্ভুত রামের ভাষা। আবেগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে রামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রামচন্দ্র এখন মস্ত মানুষ। তার শক্তিও অনেক। তাই বিস্ময়টা কিছুতে কাটছিল না।

শূর্পণখার চোখে চোখ পেতে রাখল রামচন্দ্র। এমন করে মেলে ধরল যেন দৃষ্টি একটুও উপছে বাইরে না পড়ে। মুখে মুচকি হাসি। বিজয়ের হাসি। আস্তে আস্তে বলল : ক'দিন আর পঞ্চবটীতে আছি, এই বিশাল জনস্থানের কোথায় না গেছি। আমার জীবনের বোধটাই তৈরি হয়েছে এখানে।। জংলী মানুষদের শিকার ছেড়ে চাষ আবাদে মন দিতে বলেছি। শিকার বড় অনিশ্চিত। শিকার না জুটলে উপোস করে কাটাতে হয়। আমি বলি যে মাটিতে তুমি জন্মেছ, বিচরণ করছ, সেই মাটির গাছ তোমাকে ক্ষুধার ফল জোগাচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে। সেই মাটির বুকে সবুজ ফসল ফলিয়ে তোমার ক্ষিদের খাবারটা জোগাড় করা কিছু কঠিন কাজ নয়। মানুষ হয়ে জন্মেছ কিছু করার জন্য। তোমাদের জীবনে কত কী করার আছে। পৃথিবীর বুক থেকে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা যতক্ষণ দূর না হয় ততক্ষণ তোমার আমার বিশ্রাম নেই, থামাও নেই।

ঘুমে আচ্ছন্ন দেহটা শিথিল হয়ে ক্রমেই নুয়ে পড়ছিল। পড়তে পড়তে আচমকা সামলে নিল নিজেকে। আর তাতেই বুজে আসা চোখ দুটো খুলে গেল। থম ধরা অবাক বিস্ময় নিয়ে দেখল রামচন্দ্র কোথাও নেই। গিরগিটিটা ড্যাবড্যাব চোখ করে পোকাটাকে দেখছে। ফড়িংটা তার একেবারে নাগালের মধ্যে। একটা ভয় এবং অসহায়তা বোধ তাকে ভীষণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই বোধ হয়, নড়াচড়া করার শক্তি রহিত তার। সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে ফড়িং-এর শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠা-নামা দেখতে পায়। গিরগিটিটা হঠাৎ ফড়িংটাকে ধরল। নিমেষে গপ্ করে গিলে ফেলল।

শূর্পণখার বিস্ময়ের অন্ত নেই। মনের ভেতর এলোমেলো নানা চিন্তার উত্তরটা গিরগিটি আর ফড়িং এর মধ্যে পেয়ে গেল। গোটা দাক্ষিণাত্যের বর্তমান সঙ্কটের বাস্তব ছবি যেন ঐ গিরগিটি আর ফড়িং। উসকো খুসকো চুলে হাত দিয়ে মাথায় চেপে বসানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল : অনাত্মীয়কে যতই আপন করতে চাও না কেন, সুযোগ পেলেই সে তোমাকে ফাঁকি দেবে। কিংবা গ্রন্থী ছিঁড়ে ফুরুৎ করে উড়ে যাবে। মারীচের মতো করে ভাবলে দুনিয়াটা বদলে যেত; খারাপ মানুষ বলে কেউ থাকত না, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না বলেই যত গণ্ডগোল। মানুষের জানার বাইরেও এক অচেনা পৃথিবী আছে। সেখানে আছে অচেনা, অদ্ভুত চরিত্রের লোকজন। তাদের সম্পর্কে ভালো করে কিছু জানা নেই। সেই জন্য ভয় করে, ভাবনা হয়। মেয়ে বলেই একটু বেশি সতর্ক আর সাবধানী। মারীচের তো আর নিজের বলে কিছু নেই। তার হারানোরও নেই কিছু।

শূর্পণখার কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। তার সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে এ যেন এক বাড়তি উৎপাত এসে তার জীবনটাকে মসীময় করে দিচ্ছে। যা কিছুই হয়েছে বা হচ্ছে তাতো বাইরের জগৎ থেকে

এসে হানা দিচ্ছে। রাম সম্পর্কে মারীচের কথাগুলো একটা বিপদ সংকেতের মতো তার কানের পর্দায় বাজতে লাগল। ওর কথাগুলোর মধ্যে রামের সঙ্গে হাত মেলানোর যে প্রচ্ছন্ন আর্জি ছিল সেটা বুঝতে শূর্পণখার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কী করবে সে? বরাবরই সে খানিকটা অসহায়। আজ আরও বেশি অসহায় লাগছিল।

আশাভঙ্গের বেদনায় শূর্পণখাকে বড় বিমর্ষ লাগল। মারীচ তাকে হতাশ করল। অথচ, অনেক প্রত্যাশা করেছিল তার উপর। কিন্তু সব বৃথা হয়ে গেল। মারীচ ফুরিয়ে গেছে। তার ভেতরকার সব আলো নিভে গেছে। নিভন্ত পরিত্যক্ত আগ্নেয়গিরির মতো বিশাল আকাশের নীচে সে ভীষণ একা এবং নিঃসঙ্গ। সে এখন শান্ত, নির্বিকার, ভাবলেশহীন এক মানুষ। বিশাল পৃথিবীতে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, একজন ব্যক্তির গণ্ডিবদ্ধ জীবনেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। মানুষ নিজেও তার মনের খবর রাখে না। কখন কী ভাবে কেন যে দ্রুত বদলে যায় আগে থাকতে তার আঁচ পর্যন্ত টের পায় না। হঠাৎ একদিন বদলে যায়। এই মারীচ একদিন রামের হাতে নিহত জননী তাড়কার নিষ্প্রাণ রক্তমাখা শরীর ছুঁয়ে শপথ করেছিল : মাগো তোমার মৃত্যুটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার হত্যাকারী রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হবে না। আশ্চর্য, মায়ের মৃত্যুর কথাটা মারীচ বেমালুম ভুলে গেল। মায়ের কথা কেউ ভোলে?

বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর কথাটা এতদিনেও সে ভোলেনি। এমন কি স্বামীহন্তা প্রিয়তম ভ্রাতাকেও ক্ষমা করতে পারল না। তার কথা মনে হলে বুকের ভেতরে কষ্ট হয়। যন্ত্রণার মতো ভয়ঙ্কর কিছু ছড়িয়ে পড়ে মনের ভেতর। নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে ক্রমে তা জটিল হয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারছিল তার ভেতর ঘুমন্ত রাজমহিষীর ঘুম ভাঙছে। গৌরব প্রতিষ্ঠিত না হলে কেউ সম্মান করে না। যোগ্যতা তো আর মুখের কথায় হয় না, তার প্রমাণ দিতে হয়। রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে নেতৃত্ব করার আগে জনসেবা করেছে। মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছে। রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জনের জন্য, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন শক্তিশালী নির্ভরযোগ রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নেয়া জরুরী। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী সে। আর্যাবর্তের সব নৃপতিই তার নামে কম্পিত হয়। সুতরাং সে নিরাপদেই আছে। কিন্তু তার মতো বৈরী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। বাইরে থেকে এ বৈরীতা চোখে দেখা যায় না। গোপন মনে তার আগুন জ্বলছে। রাবণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, বৈরীতার প্রতিশোধ নিতে হলে রামের মতো ব্যক্তির সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক স্থাপন করাই শ্রেয়। ঘুরে ফিরে মারীচের কথাই বারংবার মনে হতে লাগল। আর তাতেই বুকের মধ্যে একটু অধীরতা জাগল। দিশেহারা হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। শুভ্র মেঘের পাল তুলে রাশি রাশি মেঘ মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে কোন দিগন্তে, কে জানে? অফুরন্ত চলাতেই তার সুখ। তার কোন বন্ধন নেই, প্রতীক্ষা নেই, প্রত্যাশা নেই।

শূর্পণখার চোখে সহসা স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়। বিদ্যুৎজিহ্বর সঙ্গে এখানে বসে শরতের আকাশে মেঘ ভেসে যাওয়া দেখত। আজও আকাশে তেমন করে মেঘেরা ভেসে যায়, শরত আসে, প্রকৃতিও রূপসী হয় কিন্তু তার সঙ্গে দেখার সেই মানুষটি নেই। অথচ, কি আশ্চর্য! তার জাগতিক সব অস্তিত্বই আছে, কেবল সে নেই। এখন তার বুকে বিদ্যুৎজিহ্বর প্রেম, ভিন্ন আর এক সত্তার মধ্যে অন্যরূপে সে বিরাজমান। সে সত্তা তার নিবেদিত প্রেমের ফসল। তার শরীর আনন্দের জ্যোতি, আত্মার স্ফুলিঙ্গ। তার আত্মা থেকে, তৃপ্তি থেকে, পরিপূর্ণ হওয়ার সুখ থেকে প্রাপ্ত এক প্রাণ। যার ভেতর দিয়ে সে এক নতুন নারী হয়ে উঠেছিল। বিদ্যুৎজিহ্বর সংস্পর্শে তার নারীত্বের নবজন্ম হল। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তার মন। পরক্ষণেই তীব্র আক্রোশে, দুঃখে, ক্ষোভে তার ভেতরটা তীর বিদ্ধ পশুরাজের মতো গর্জন করে উঠল। আকাশের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বলল : রাবণ, তুমি ভণ্ড। তোমার বুকে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা বলে কিছু নেই। আমার জীবনের সুখ, স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছ। আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিনিয়ে নিয়েছ। তুমি মানুষ নও, দৈত্য। তোমার জন্য স্বামী হারিয়েছি। ভাগ্যহীন হয়েছি সেও তোমার জন্য। ভাই হয়ে তুমি আমার সর্বনাশ করেছ। তোমার সর্বনাশ করে আমি এর শোধ নেব। তোমার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমার বুকের জ্বালা মিটবে না। আমার ভেতর প্রিয় ভগিনীকে দেখেছ, কিন্তু সাপিনী দেখনি।

কয়েকমুহূর্ত ধরে কথাগুলো তার মনে তোলপাড় করল। অসহনীয় সুখবোধ তার দেহ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে আরামে চোখ বুজল। চারদিক থেকে উদ্দাম হাওয়া ছুটে এল তার দিকে। চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে তৃপ্তিদায়ক ফুরফুরে হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করছিল। একটু একটু করে সে হারিয়ে যাচ্ছিল তার সত্তার মধ্যে।

নীড়ে ফেরা পাখির ডাকে তাকে চমকে দিয়ে গেল। বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল। চোখ মেলে দেখল চারদিক থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার গড়িয়ে আসছে। জলস্থল অন্তরীক্ষের যা কিছু বাহ্য এবং দৃশ্য তা হারিয়ে যাচ্ছে। একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতা থমথম করছে চারদিক। প্রকৃতি গাছপালা সব স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে যেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। আচমকা একটা অনুভূতি হল। রাবণের পতন, ধ্বংস, সর্বনাশ, মৃত্যুর কথায় হঠাৎ মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অমনি বুকের গভীরে অনেক নীচে থেকে গুরগুর করে উঠে এল একটা কান্না। বুকখানা মুচড়ে উঠল কান্নায়। ভাইর জন্যে ভগিনীর বুক ভাসিয়ে এল করুণা, গভীর এক মমতা। কান্নাটা তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে উৎসারিত হল 'দাদা' শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অজানিতে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো শূর্পণখা কাঁদতে কাঁদতে আবারও বলল দাদা, তুমি বড় নিষ্ঠুর! তোমার হৃৎপিণ্ড নেই, নরদেহে এক পাথরের মূর্তি। তুমি একজন ক্ষমতালোভী রাজা। শুধু একটি জাতির নেতা। আর কিছু নও।

।। দশ ।।

পঞ্চবটীতে রামের আগমন উপলক্ষ্য করে যে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে দিন দিন তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খর ও দূষণ শূর্পণখার দু'বাহু এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি রামের আগমনকে তারা ভালো চোখে দেখল না। কার্যত তাদের সতর্ক পাহারা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের জন্যেই রামের অগ্রগতি থমকে রইল। রাবণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে রাক্ষস শক্তির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সংগ্রাম খুবই জরুরী ছিল। এই যুদ্ধটা হবে রাবণের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ যুদ্ধের মহড়া। এই মহড়া সম্পন্ন করার জন্য রাবণ ভগিনী শূর্পণখাকে বেছে নিল। কারণ, রাক্ষসরা ভালো যুদ্ধ জানে। তাদের ভাণ্ডারে অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুদ্ধাস্ত্র আছে। বহুকালের অধ্যবসায় এবং গবেষণায় তারা এমন সব অস্ত্র প্রস্তুত করেছে যা আর্য নরপতিদের কল্পনাতেও আসে না। অমন যে শক্তিশালী হিমালয়বাসী দেবরাজ্য তারাও পর্যন্ত রাবণের হাতে পর্যুদস্ত। সুতরাং রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে রাবণের আশ্রিত এবং সাহায্য পুষ্ট জনস্থানকে কৌশলে হস্তগত করা ছিল রামের লক্ষ্য। রাবণের অস্ত্রে রাবণকে ধ্বংস করাই রামের নীতি। কিন্তু খর ও দূষণ তার অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায়। শূর্পণখাকে আগলে রেখেছে তারা। তাদের দু'জনকে শূর্পণখার কাছ থেকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করা সর্বাগ্রে দরকার। শূর্পণখাকে জয় করার উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প নিয়ে সে পঞ্চবটীতে এসেছে। কিন্তু শূর্পণখার কাছে পৌঁছনোর বাধাটা কিছুতে অতিক্রম করতে পারল না।

মনেতে যে সঙ্কল্পই থাক দক্ষিণাবণ্যে মানুষের মনে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ছাপ পড়তে দেয়নি রাম। সংযমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অনেক ধৈর্য ধরেছে। মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছে। তাদের চোখে যে গৃহহীন, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল এক মানুষ। রাজার ঐশ্বর্য থাকতেও স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছে। দেখতে দেখতে তেরোটা বছর হয়ে গেল দক্ষিণারণ্যে। তেরোটা বছর সকল সন্দেহের বাইরে রেখেছে নিজেকে। নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ পালনে কোন ত্রুটি করেনি।

কিছুকাল আগেই যা একটা ভুল করেছিল। রামের ধারণা, হত্যা করা তার মারাত্মক ভুল হয়েছে। হঠাকারিতার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছে করলে হয়তো এই হত্যকাণ্ডটা এড়ানো যেত। কিন্তু কি করে বুঝবে অরণ্যে তার চলাচলকে অবাধ নির্বিঘ্ন কবার জন্য আর্যাবর্তের নরপতিরা দেবরাজ্যের সঙ্গে মিলে তার অজান্তে মুনিঋষিদের সহায়তায় একটা নজরদারি বাহিনী তৈরি করেছে।

তারা সর্বক্ষণ ছায়ার মতো পাশে পাশে ঘুরেছে। দেহরক্ষী হয়ে তারা দূর থেকে সর্বদা নজর রাখছে এটা জানা থাকলে ভুল হতো না। প্রহরীরা সবাই বেতনভুক অরণ্যের আদিম উপজাতি। বাছাই করে নেয়া সশস্ত্র বলিষ্ঠ জোয়ান। কালো মানুষদের সঙ্গে মিশে আছে। শিকারী হয়ে বনে বনে শিকার করছে, কাঠুরিয়া হয়ে কাঠ কেটে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ ফল মূল খোঁজাখুজি করছে। সাধারণ মানুষের মতোই চারপাশে ঘুরছে ফিরছে। কিন্তু সশস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে এরা কারা রামের জানা ছিল না। জানবে কেমন করে? এক জায়গা তো বেশিদিন কাটায়নি। যখন যেখানে গেছে, সেখানে অন্য মানুষকে একই উদ্দেশ্যে নিজের মতো ঘুরতে ফিরতে দেখছে। এদের কাউকে আলাদা করে দেহরক্ষী মনে হয়নি তার। তেরো বছর ধরে এইভাবে চলেছে। অথচ সে জানে না। জানতে পারল যেদিন, মুষ্টিমেয় অনুগত রাক্ষস নিয়ে বিরাধ পথরোধ করে দাঁড়াল। জানাটা বড় দেরীতে হল। আগে জানলে হয়তো বিরাধকে বধ করা দরকার হত না। তবে, বিরাধের মৃত্যুর জন্য দায়ী অবশ্যই তার বর্বরতা, আর্যবিদ্বেষ এবং ঘৃণা।

বিরাধের মৃত্যুটা নিছক একজন সাধারণ রাক্ষসের মৃত্যু নয়। এই মৃত্যুর সঙ্গে তার দাক্ষিণাত্য নীতির সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুই যুক্ত হয়ে আছে। তাই কোন সংকট উপস্থিত হলে ঐ মৃত্যুর চিন্তাটা তার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিরাধের মৃত্যুর জন্য কিছু মাত্র দায়ী না হয়েও দায়ভাগী হতে হয় তাকে। বিরাধই নিয়তিই অনিবার্যবেগে তাকে রামের দিক আকর্ষণ করেছে। বিরাধ তাকে সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আঘাত হানতে বাধ্য করেছে তাকে।

কিন্তু বিরাধের মৃত্যুটা জানাজানি হয় এমন সূত্র রাখেনি। অনুচরদের সঙ্গে তাকেও কবরস্থ করেছিল। তবু তার মৃত্যুটা কিভাবে জানা জানি হয়ে গেল সেটাই রামের কাছে রহস্য। আরো রহস্যের কথা হল, বিরাধ রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়, প্রাণহীন এক দৈত্য। এই দৈত্যের সব কিছুই অদ্ভুত। দেখতেও কিম্ভুত কিমাকার। কেশহীন মাথার উপর গোল গোল দু'চোখ আগুনের গোলার মতো ধক ধক করে জ্বলছে, নিবছে। তার অবয়ব, উদর এবং পশ্চাৎদেশ মনুষ্যাকৃতি নয়। মুখে গরগর আওয়াজ করতে করতে বন মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হল। রামের পথ আগলে দাঁড়াল। তারপরেই বিশাল দু বাহু মেলে সীতাকে এবং লক্ষ্মণকে নিমেষে মাটি থেকে তুলে নিয়ে চলতে শুরু করল। বুনো মহিষের মতো আগাছা পায়ে দলে বিরাধ গহন বনের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। দৈত্যের শক্তি সাহস, বিক্রম এবং বেপরোয়াভাব রামকে অবাক করল। সীতা ভয়ে কাঁপছিল। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। লক্ষ্মণও তার শক্ত মুঠো থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। দৈত্য প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে রামচন্দ্র ঘনঘন শরবর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তার কঠিন গাত্রাবরণ বিদ্ধ করতে ব্যর্থ হল রাম। তখন আগুনের মতো জ্বলন্ত দুটি চোখ লক্ষ্য করে রামচন্দ্র শক্তিশালী ইন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করল। তাতেই দৈত্য আর্তচিৎকার করে থমকে দাঁড়াল। তার গতিরুদ্ধ হল। এক জায়গার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ্মণ ও সীতা তখনও তার হাতে ধরা অবস্থায় ছিল। হস্ত ছিন্ন করে রাম মুক্ত করল তাদের। তারপর দেহটাকে খন্ড খন্ড করে বনে সমাহিত করল। এরকম একটা অদ্ভুত গল্প রামকে মহিমান্বিত করল।

গল্পের শেষটা আরো অপূর্ব। ঐ অদ্ভুত আকৃতি প্রাণীটি দেবলোক থেকে এসেছিল দক্ষিণ দেশে রামের সদ্ভাব এ সম্প্রীতির অভিযান ব্যর্থ করতে। অনার্যদের সঙ্গে রামচন্দ্রের মাখামাখি দেবলোকের নরপতিদের পছন্দ হচ্ছিল না। তাই লক্ষ্মণ-সীতাকে হরণ করে রামের কার্যে ব্যাঘাত ঘটানো ছিল উদ্দেশ্য। যন্ত্রটি রামের হাতে নিশ্চল হলে গর্ভদেশ থেকে মনুষ্যদেহী তুম্বরু বেরিয়ে এল। তাকে দেখে রাম তো অবাক। প্রাণভয়ে ভীত তুম্বরু নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে রামের ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করল। তুম্বরুর সহায়তায় রামচন্দ্র ঐ যন্ত্রদানবকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে মাটিতে প্রোথিত করে লোকচক্ষের আড়াল করল। তুম্বরু মুক্ত হয়ে দেবলোক প্রত্যাবর্তন করল।

এ এক অদ্ভুত গল্প। রামচন্দ্র নিজেও কম অবাক হয়নি। এ গল্পের স্রষ্টা যে হোক তাতে রামচন্দ্রের ভাবমূর্তির গায়ে কোন আঁচড় পড়ল না। কিন্তু রাক্ষসদের সঙ্গে তার কোন মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠল না। এক অদৃশ্য লড়াই লেগে থাকল। প্রতিমুহূর্ত সেখানে এক গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার সংঘর্ষে

ছিন্নভিন্ন হতে থাকল তার ভেতরটা। রাবণকে জয় করার পটভূমি তৈরি করতে তেরোটা বছর অরণ্যে কেটে গেল, তবু রাক্ষস সম্প্রদায়ের একজনের সঙ্গেও তার রাজনৈতিক আঁতাত গড়ে ওঠেনি। একজনকেও রাবণের দিক থেকে তার দিকে টানতে পারেনি। কেবল, রাবণের আগ্রাসী রাজনৈতিক অভিযান থমকে রয়েছে, রাজনৈতিক খবরদারির চাপ সংযত করেছে। কিছু কিছু নরগোষ্ঠীর নরপতি রামের অনুরাগী হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তারা দেয়নি। তাই নিজের চেষ্টায় রাম এক অনুগত সৈন্যবাহিনী গড়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে। গভীর অরণ্যে মুনি-ঋষিদের তত্বাবধানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তাদের সমর শিক্ষা দিয়েছে। তপোবনগুলো হয়ে উঠল এক একটা ছোট ছোট সৈনিক শিবির। সারা দক্ষিণারণ্যে তাদের ছড়িয়ে রাখা হল। বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। অধ্যাত্মশিক্ষার নামে বিদ্যার্থীদের সমরশিক্ষা দেয়া হয়। আশ্রমের বাইরে কোন বিদ্যার্থীর যাওয়ার অনুমতি ছিল না। কড়া পাহাবা এবং কঠিন অনুশাসনের মধ্যে তাদের থাকতে হত। সৈন্যসংগ্রহের অভিযান শেষ করে রাবণ দমনে মনোনিবেশ করল রামচন্দ্র। আর সেজন্য গোদাবরী নদীতীরের সন্নিকটে পাহাড়ঘেরা পঞ্চবটীকে যথার্থ স্থানরূপে নির্বাচন করল। এর ভৌগোলিক অবস্থান রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। লঙ্কার দূরত্ব এখান থেকে যেমন অল্প তেমনি রাক্ষস অধ্যুষিত এলাকার ভেতরে বসে সবদিক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তারা কি চায়, এসব জানা সহজ হবে। দুর্বল প্রকৃতির লোভী, সুযোগসন্ধানী কিংবা ক্ষুব্ধ রাক্ষসদের সঙ্গে সহজেই একটা যোগসূত্র গড়ে তোলা যাবে। লোভী, স্বার্থপর মানুষদের প্রলোভন দেখিয়ে একটা দেশ ও জাতির সর্বনাশ ডেকে আনার কুট রাজনীতির খেলায় রামচন্দ্র নামল। বিবাদ বিভেদের এক আত্মঘাতী যুদ্ধের বীজ বপন করে নিজেব স্বার্থকে নিরাপদ, বিঘ্নহীন করা এবং রাবণের পরাভবকে সুনিশ্চিত করার জমি তৈরির এক আদর্শস্থান বলে পঞ্চবটী বনকে মনে হলো তার।

লঙ্কার স্বর্ণসিংহাসনে রাবণ প্রজ্বলিত দীপ শিখার মত শৌর্যে, বীর্যে সম্ভ্রমে, গৌরবে, মর্যাদায় উজ্জ্বল। তবু, প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মত সিংহাসনের পাদদেশে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমা হয়ে আছে তা নিয়ে রাবণের কোন চিন্তা নেই। যেখানে যারা আছে তারা সকলে রাবণের বিশ্বস্ত, অনুগত এবং একান্ত আপনজন, এরা হল ভ্রাতা, ভগিনী এবং পুত্র। রক্তের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে। রামচন্দ্রের ধারনা, সেই অন্ধকার তামসের গর্ভদেশে কেউ না কেউ আছে যে লোভী, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর এবং রাবণের প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন। তাদের মনের গহনে লোভের আগুন জ্বলছে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন বাসনার ইন্ধন দিয়ে তাকে শুধু জ্বালিয়ে তুলতে হবে। তাদের পথের কাঁটা দূর করার জন্য সংগোপনে রাবণ ধ্বংসের বীজ বপন করতে হবে তাদের মনের অভ্যন্তরে। নিজের ঘরে আগুন লাগানোর এই সর্বনাশা খেলায় যাদের দরকার তাদের একজনকে অন্তত পঞ্চবটীর কাছাকাছি পাবে। এই কারণে পাহাড়, অরণ্য, নদী ঘেরা মনোরম জায়গায় কুটীর করেছে। এখানকার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের স্বপ্ন, বাসনা, খ্যাতি প্রতিপত্তি, সম্মান এবং গৌরব।

একদিন বহু স্বপ্ন নিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিল রামচন্দ্র। রাক্ষসরাজ রাবণের আধিপত্য ও দৌরাত্ম্য থেকে আর্যাবর্তকে মুক্ত করার সঙ্কল্পের বীজ বিশ্বামিত্র তার তরুণ মনে রোপন করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ রামের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক অভিলাষকে সমর্থন করতে পারেননি। দশরথের অতিরিক্ত বিশ্বামিত্র নির্ভরতা কুলগুরু বশিষ্ঠ ভালো মনে গ্রহণ করেননি। বিশ্বামিত্র চিরদিন বাইরের লোক। রাক্ষস বিদ্বেষ ও বৈরীতা সম্বল করে অযোধ্যার রাজনীতিতে ঢুকে পড়ার অভিসন্ধি বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্র বিদ্বেষী করল। কিন্তু সে বিদ্বেষ মনের গোপন অন্ধকারে ঘায়েল করার কৌশল খুঁজছিল। বিশ্বামিত্র আর্যাবর্তের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সমস্যাটি নিয়ে দশরথের শরণাপন্ন হলেন। সরাসরি তার বিরোধিতা করা বশিষ্ঠের পক্ষে কঠিন হল। আর্যাবর্তের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব তা-হলে একটা বড়রকম ধাক্কা খেত। রাক্ষসবৈরীতাকে মূলধন করে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেতেন। বিশ্বামিত্রের ফাঁদে বশিষ্ঠ পা দিলেন না। বরং তাঁর জালে যারা ধরা পড়তে চায় তাদের কিছুই বলার ছিল না তাঁর। বশিষ্ঠ কৌশলে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সংঘাতের নীতি এড়িয়ে

গেলেন। বিশ্বামিত্রের মুখ্য অস্ত্রটি অকেজো করে দেয়ার উদ্দেশ্যে দশরথের স্নেহ বৎসল পিতৃহৃদয়কে ব্যবহার করলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র অত সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তাই, রামের তারুণ্য দীপ্ত বীর হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে নিজের জয় আদায় করে নিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষুসীকে হত্যা করল। প্রিয়তম রামচন্দ্রের উপর কুলগুরু বশিষ্ঠের প্রভাব মুছে ফেলার জন্যই রাজপরিবারের অনুমোদন ছাড়াই রাম-লক্ষ্মণকে জনকরাজ সীরধ্বজের দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। বিশ্বামিত্র ক্রমাগত রামচন্দ্রকে বশিষ্ঠের কাছ থেকে টেনে নিতে লাগলেন। তাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য দূরত্ব গড়ে উঠল। রামের ওপর বিশ্বামিত্রের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

নিজের কাছে এই হারকে বশিষ্ঠ মেনে নিতে পারলেন না। বিশ্বামিত্রের অভ্যুত্থান তাঁকে ঈর্ষান্বিত করল। ফলে, তাঁদের উভয়ের ভেতর এক নিঃশব্দ ক্ষমতার লড়াই সুরু হল। রামচন্দ্রকে মাঝখানে রেখেই তাদের বিবাদ। রামের বীর্যাবত্তাকে উৎসাহিত করে বিশ্বামিত্র তার তরুণ হৃদয় জয় করে নিলেন। বিশ্বামিত্রর অনুগত অস্ত্রটি যখন তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া অসম্ভব মনে হলো তখন তাঁর মুখ্য অস্ত্রকে অকেজো করে দেয়ার নীতি নিলেন বশিষ্ঠ। আর সেজন্য বশিষ্ঠ তাঁর পুরনো অবস্থান থেকে সরে গিয়ে বিশ্বামিত্রকে অযোধ্যা এবং আর্যাবর্তের রাজনীতি থেকে একেবারে উৎপাটিত করার এক কুটনীতি গ্রহণ করলেন। বিশ্বামিত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য প্রিয়তম রামচন্দ্রকে ঠকানোর এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সেজন্য বশিষ্ঠের মনে একটা কষ্ট হলেও সঙ্কল্পে কঠিন হলেন। মনকে প্রবোধ দিতে বললেন, লড়াইটা তাঁর ও বিশ্বামিত্রেব মধ্যে। রামচন্দ্র ও দশরথ কেউ নয়। তা ছাড়া এরা কেউ তাঁর বশে নেই। তাঁর কর্তৃত্ব থেকে অনেক দুর সরে গেছে। রামের প্রতি অভিমান হলো তাঁর।

বশিষ্ঠের গোপন কার্যকলাপ টের পেয়ে বিশ্বামিত্র খুব গোপনে দশরথকে দিয়ে রামের রাজনৈতিক অভিষেক সম্পন্ন করে তার দাক্ষিণাত্যনীতিকে জয়যুক্ত করার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ করলেন অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত আঘাত এল বিমাতা কৈকেয়ীর দিক থেকে। তার ফলে রামচন্দ্রের অভিষেক পন্ড হল। অলক্ষ্য থেকে এই অমোঘ বাণটি যে বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করে বশিষ্ঠ ছুঁড়েছিলেন তাতে রামের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বাণটা ছুঁড়লেন এমন সময় যখন তার জীবন একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনার দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়েই এই ঘটনা। আসলে বশিষ্ঠ তাকে হতাশ করে বিশ্বামিত্রকে হারাতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নিজে হেরে না গিয়ে তাকে বঞ্চিত ও ব্যর্থ করে দিলে বিশ্বামিত্রকে হারানো হবে। কিন্তু হারতে তাঁরা কেউ চাননি। তবু একজনকে হেরে যেতে হয়। রামচন্দ্রের সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, এই হেরে যাওয়াটা তার সবচেয়ে বড় জেতা। তার আশীর্বাদ। অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে অভিযান করলে তার নিজের গৌরব কতখানি বাড়ত? তার ক্ষমতা, যোগ্যতা প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব থাকলেও তার স্বীকৃতি পেত না। কিন্তু বশিষ্ঠ পরোক্ষে তাকে নিজের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিলেন।

বশিষ্ঠকে হারিয়ে অস্ত্রগুরু বিশ্বামিত্রকে জিতিয়ে দেয়ার জন্য গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতিকে সফল করার বাসনা নিয়ে স্বেচ্ছায় অযোধ্যার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করল। অযোধ্যার সৈন্যবাহিনীর তোয়াক্কা না করে নিজের উদ্যমে এবং চেষ্টায় এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করল। রাবণের সঙ্গে সংঘাতের জন্য গোপনে প্রস্তুত হল। কারণ এই জয় সম্পন্ন না হলে আর্যাবর্তের মানুষের চোখে ছোট হয়ে যাবে সে; তার জেদ হেরে যাবে, বিশ্বামিত্রের অপযশ হবে। তার দম্ভ নিয়ে লোকে উপহাস করবে। তাই খুব সতর্ক হয়ে সাবধানে এগোল। বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে সে চলল। দুচোখে তার নতুন আর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন। তেরো বছর পরে সেই স্বপ্নের দেশ পঞ্চবটীতে রাম প্রথম পা রাখল।

এরকম ধারণা হওয়ার কারণ, শূর্পণখা হল প্রদীপের নিচে সেই অন্ধকার যেখানে আলো পৌঁছয় না। শূর্পণখার মনে ভ্রাতৃবিদ্বেষের যে আগুন জ্বলছে রাবণ তার কতখানি খোঁজ রাখে কে জানে? তবে, রাবণের হাতে বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর জন্য শূর্পণখা অগ্রজ ভ্রাতাকে ক্ষমা করতে পারেনি। ভেতরে ভেতরে প্রতিহিংসায় ফুঁসছে। বাইরে থেকে তাকে টের পাওয়ার উপায় নেই। একজন ভ্রাতা হিসেবে রাবণ যা

করতে চেয়েছিল তা ভ্রাতার কর্তব্য মাত্রা মনের শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা ভুলতে দ্বিতীয়বার তাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু ভগিনীর যে প্রেমকে নিজের হাতে হত্যা করেছিল তাকে তো এ জীবনে কোনদিন ফিরিয়ে দিতে পারবে না। একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে বড় জোর তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে কিন্তু প্রেমের শূন্যতা তাতে পূরণ হতে পারে না। সেই শূন্যতার রন্ধ্রপথ ধরে প্রতিহিংসা প্রবেশ করল শূর্পণখার মনের অভ্যন্তরে। সেখানে ভ্রাতা নেই, দেশ নেই, জাতি নেই, শূর্পণখার বুকের ভেতর প্রতিহিংসার যে আগুন জ্বলে পুড়ে খাক করে দিচ্ছিল তাকে; সে আগুন নেভানোর কোন চেষ্টাই করেনি রাবণ। শূর্পণখার দুঃখ, কষ্ট, অভাব, শূন্যতা, যন্ত্রণা তেমন করে গায়ে মাখেনি। একটা অপরাধবোধে সর্বদা দূরে দূরে থেকেছে। দু'জনের মধ্যে দেওয়ালটা ভেঙে রাবণ ভগিনীর মনের অভ্যন্তরে জায়গা করে নেয়নি অথচ, ভাই-ভগিনীদের মধ্যে শূর্পণখাকেই সে বেশি ভালোবাসত। কিন্তু সে ভালোবাসা এত অন্যায় অবিচার করল তার উপর যে আর কেউ সারাজীবন তা করে উঠতে পারবে না। তাই স্বামীর প্রেমের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য তার নিজেরও দরকার রাবণের সংস্রব থেকে মুক্ত হওয়া। যত দিন যাচ্ছিল এই প্রয়োজনটা ততই তীব্র হচ্ছিল তার।

এসব রামের মস্তিষ্কপ্রসূত অলস কল্পনা নয়। শূর্পণখার মনের অতলান্ত শূন্যতার গহ্বরে মরমী মনের আলো ফেলে রাম তার মন ও আত্মাকে আবিষ্কার করল। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে শূর্পণখার মনের দিগন্তকে নিজের মতো করে আঁকল। কারণ তার বিষয়ে আগাগোড়া কিছু একটা চিন্তা করে স্থির করে তবে তো এগোতে হয়।

শূর্পণখার স্বামীর মৃত্যু চিন্তা এবং রাবণের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্রমাবনতির ব্যাপারটা রামচন্দ্রের মন ছেয়ে রইল। কেউ না বললেও রাম কল্পনা করে; শয়নে স্বপনে, জাগরণে পতি সোহাগিনী শূর্পণখার ভিতরে ভিতরে ঘুণ পোকার মতো প্রতিহিংসার কীট কুরে কুরে খায় এবং ক্ষয় করে তাকে। এ অবস্থায় শূর্পনখাই হলো রাবণের মৃত্যুবান। রাবণ বিজয়ের পথে সে হতে পারে তার আলোকবর্তিকা। এ রকম একটা ছক এঁকে নিয়ে শূর্পণখার সঙ্গে কিভাবে যোগসূত্র গড়ে তোলা যায় রাম তার পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত হলো। একাজে সর্বাগ্রে অকম্পনের কথা মনে পড়ল তার।

অকম্পন শূর্পণখার দেহরক্ষী। একদিন কার্যোপলক্ষ্যে বনপথে পদব্রজে একা ফিরছিল হঠাৎ বন্যবরাহের সামনে পড়ে যায়। প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে। সেই স্থানে তখন তার দুভাই শিকার সন্ধানে ঘুরছিল। মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়াল। পাগলের মত চিৎকার করতে করতে একজন মানুষকে তাদের দিকে দৌড়ে আসতে দেখল। পেছনে ক্ষিপ্ত দাঁতাল। রাম-লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ ধাবমান বন্যবরাহকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। দুটো তীরই বরাহের সামনে ও পিছনের পায়ে আমূল বিঁধে গেল। হুমড়ি খেয়ে বরাহ মাটিতে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। পাশব চিৎকারে তার গোটা বনভূমি কেঁপে উঠল। অকম্পন মূর্ছা গেল। অল্প শুশ্রূষাতেই জ্ঞান ফিরল। ভয়ের ঘোর কাটেনি তখনও। তাই জ্ঞান আসতেই সে চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও! বাঁচাও!

মাটিতে শায়িত অকম্পনের মাথায় হাত রেখে রাম বলল: ভয় কী? এই তো আমরা। বরাহ কোথাও নেই। মরে গেছে।

অকম্পনের বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। বলল: মরে গেছে! কিন্তু আপনারা কে? আপনাদের পরিচয় কি?

রাম পাল্টা প্রশ্ন করল : মহাত্মনের পরিচয় জানতে পারি?

অবশ্যই। আপনারা আমার জীবনরক্ষক। আপনাদের কাছে গোপন করার কিছু নেই। আমি অকম্পন। মহারাণী শূর্পণখার দেহরক্ষী।

লক্ষ্মণের মুখের দিকে চেয়ে রামের অধরে এক বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটল। বলল: আমরা তোমাদের বন্ধু। আমি একজন বনবাসী মাত্র। লোক আমাকে রামচন্দ্র বলে জানে। উনি আমার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।

বিস্ময় বিহুল কণ্ঠে উচ্চারণ করল অকম্পন: আপনি রামচন্দ্র! উনি লক্ষ্মণ!

হ্যাঁ, অকম্পন। আমরা সকলের বন্ধু হতে চাই। তুমিও আমাদের বন্ধু হও।

অকম্পন কথা বলতে পারে না। বিস্ময়দীপিত চোখে অপলক তার দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল: এত আমার সৌভাগ্য! জীবন রক্ষকের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। আপনাদের দয়ায়, সেবায়, করুণায়, মমতায় এ জীবন বাঁচল। নইলে, এতক্ষণে এক নিষ্ঠুর মরণ আলিঙ্গন করত আমায়। ঐ দাঁতালের তীক্ষ্ণ খোঁচায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকত এই দেহ। বন্য পশুদের মধ্যাহ্ন ভোজন হতো এই দেহ দিয়ে। ভাগ্যিস, বিজন অরণ্যে আপনাদের সঙ্গে দৈবক্রমে দেখা হল, নইলে কী ঘটত আমার অদৃষ্টে,. ভাবতেও ভয় করে।

অকম্পন, অমন করে বলার মতো কিছু করিনি আমরা। সামান্য যা করেছি তা সব মানুষ করে থাকে। অদৃষ্ট দেবতার কোন খেয়াল আমাদের দেখা হলো কে জানে? এ বন্ধুত্ব একান্ত প্রয়োজন বলেই হয়তো এভাবে দেখা সাক্ষাৎ হলো। ঐ বরাহকে না পেলে আমরা বন্ধু হতে পারতাম না। হব কী করে? আমরা বনবাসী, আর আপনি রাজভৃত্য। একজন বনবাসীর সঙ্গে রাজভৃত্যের তো কোন দরকার থাকতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপায় যে মিলন হলো, তাতে দেখা সাক্ষাতের পথ খুলে গেল।

হাসি হাসি মুখ করে লক্ষ্মণ বলল: ভালোই হলো। দুর্দিনের বন্ধুকে কেউ ভোলো না। আমরা ভুললেও অকম্পন ভুলতে পারবে না। তার কৃতজ্ঞ মনটা রাম-লক্ষ্মণের জন্য সর্বক্ষণ কিছু করতে চাইবে।

অকম্পন বলল : সত্যি কিছু করতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যাব। তোমাদের এ ঋণ, এই বন্ধুত্বকে কোনদিন ভুলতে পারব না। তোমরা মানুষ নও, দেবতা। আমাদের পরিত্রাতা। তোমাদের দর্শন পেলে জীবন ধন্য হয়ে যায়।

রাম জবাব দিল না। এক পরিপূর্ণ আনন্দে তার হৃদয় মথিত হতে লাগল। মৃদু মন্থর ঢেউয়ে বুক উঠানামা করতে লাগল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে অকম্পনের দিকে চেয়ে বলল: তোমরা সবাই ভীষণ ভালো। এদেশের কালো মানুষদের চোখে আমি নরদেহে নারায়ণ। আমার মধ্যে তারা যে কি দেখেছে তারাই জানে। তোমার মতো তারাও বলে তাদের উদ্ধার করতেই অবতীর্ণ হয়েছি আমি। তোমরা যে যাই বল, আমি রক্তমাংসের মানুষ। আমাকে দেবতা করে দূরে সরিয়ে দিও না। আমি তোমাদেরই লোক। তবু তোমাদের স্বজাতি রাক্ষসরা আমাকে নিয়ে কেন যে জল ঘোলা করছে তারাই জানে।

রামের কথার মধ্যে যে উদ্বেগ ছিল অকম্পন তা আঁচ করতে পারল। দৃষ্টিতে তার কেমন একটা অসহায়তা ফুটল। ভুরু যুগল কুঁচকে গেল। আরক্ত অস্বস্তিকর মুখে রামের দিকে চেয়ে কথা খুঁজতে লাগল। সামান্য দেহরক্ষী হয়ে সে কি বা বলতে পারে? তার আশ্বাসের মূল্যই বা কতটুকু? তবু আস্তে আস্তে বলল: তোমার শুভেচ্ছার বার্তা রাজমহিষী শূর্পণখাকে নিবেদন করব।

রামের বুক থেকে স্বস্তির শ্বাস পড়ল।

।। এগারো ।।

রামের দন্ডকারণ্যে আগমন নিয়ে শূর্পণখার মনে নানা প্রশ্নের কোন যন্ত্রণা নেই। সামান্য উদ্বেগ, যা হয়েছিল তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো তার স্বভাব নয়। রাম সম্পর্কে নানারকম গল্প ক্রমেই দুর্বল করে দিচ্ছিল তাকে। তবু মনটাকে শক্ত করল। অকম্পনকে শূর্পণখা তিরস্কার করে বলল: মানুষকে অবিশ্বাস করে ঠকা ভালো, কিন্তু বিশ্বাস করে ঠকতে নেই। তুমি বড় সরল আর সাধারণ। রামচন্দ্রের মন গলানো কথায় তুমি গলে যেতে পার কিন্তু আমি পারি না। রামচন্দ্র তোমার কৃতজ্ঞতাকে স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করছে।

অকম্পন মাথা হেঁট করে বলল: আপনার কথার প্রতিবাদ করি এমন সাধ্য আমার নেই। কিন্তু দুঃসময়ে তার অন্তরকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অকারণে আমরা রাম-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি বুকে। অথচ, সে আমাদের মিত্রতা চায়। নিষাদ, কিরাত, গৃধ্র, যক্ষ, নাগ জাতিরা শক্তিতে, বীর্যে সম্মানে রাক্ষসদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু তারা শত্রুতা ভুলে রামের মিত্র হতে পারল আর আমরা পারলাম না। রামের কুটবুদ্ধি প্রখর, তবু কুটবুদ্ধি খাটিয়ে কারো

রাজ্য গ্রাস করেনি, কিংবা তাদের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেনি। প্রেমে তাদের বশীভূত করেছে, নিজের করে নিয়েছে।

তাতে আমার কি?

ওদের মতো শত্রুতা ভুলে আমরাও পারি রামের পাশে দাঁড়াতে।

খর চুপ করে অকম্পনের কথা শুনছিল। বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল: নির্বোধের মত কথা বল না। রাম কোনদিন শবর, চন্ডাল, ব্যাধ, ধীবর, নাগ, এদের বন্ধু হতে পারে না। রামচন্দ্রের ছদ্মবেশ চিনতে পারা তোমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাজ নয়। কিন্তু তোমার তো চোখ আছে। দ্যাখনি এই সব অনুন্নত মানুষদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতা এবং দেহের কটুগন্ধে বিরক্ত হয়ে ঘৃণায় তাদের পল্লীর মধ্যে ঢোকেনি। কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ আর্যদের বিদ্বেষ, ঘৃণা নতুন কিছু নয়। রামচন্দ্রের রক্তের মধ্যেই তা আছে।

মহামাত্য খর, আমার মনে হয় এটা অপপ্রচার। কৃষ্ণাঙ্গ এবং রাক্ষস হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁর করুণার কোন অভাব হয়নি। তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ প্রীতিতে কোন ভেজাল নেই। রামের স্তুতি আমি করছি না, কিন্তু রাম দক্ষিণারণ্যে মানুষদের মন জয় করেছে। এটাই তাঁর সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

খরের চোখ মুখ উত্তেজনায় রাঙা হল। চোয়ালের হাড় শক্ত হল। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল: তোমার অনাধিকার চর্চা আর শত্রুর নির্লজ্জ চাটুকারিতা আমার ধৈর্যহানি করছে। আমার সামনে থেকে দূর হও তুমি।

অকম্পন গোমড়া মুখ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ওর বেরিয়ে যাওয়ার পরে খব নিজের মনে বলল: যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো যায় না। রামের অভিসন্ধি না বুঝে এরা গলে যায়।

শূর্পণখা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল: ঠিক বলেছ ভাই। মনের সব কথা কি তারা বোঝাতে পারে? সব ভাব কি কথায় ধরে?

শূর্পণখার গলার স্বরে খর চমকাল। মনের পাহাড়চূড়ায় যেন ধস নামল তার। ভগিনীর আকস্মিক রূপান্তর খরকে ভাবিয়ে তুলল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল: তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শরীর মন ভালো বোধ হচ্ছে না। হয়েছে কী তোমার?

খর, আমি ভাবছি অন্য কথা। পুরুষ ও মেয়েদের রাজনীতিতে একটা বড় তফাৎ আছে। তোমরা বীর্যাবর্তের আস্ফালন কর, নিজের জেদে অবিচল থাক। তোমরা চাও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব। গর্ব, অহঙ্কার, প্রতিপত্তি লাভের জন্য তোমরা যুদ্ধ কর। কিন্তু মেয়েরা বোধ হয় একটু ঘরের কথা ভাবে। ঘরের দিকে চোখ রেখে স্থির করে কতখানি সে প্রস্তুত, তার নিরাপত্তার কতটা বিঘ্ন হতে পারে, যুদ্ধের জন্য কী মূল্য দিতে হবে? যুদ্ধে হার জিতের অঙ্কও মনে মনে করে। কিন্তু তোমরা এসব ভাব না। আমি গোপনে খবর নিয়েছি; রামচন্দ্রকে অসহায়, সম্বলহীন বনবাসী বলে অবজ্ঞা করলে, তার শক্তি সামর্থকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে আমাদের অনেক মূল্য দিতে হবে। রামচন্দ্রের বাইরেটা দেখেছ, ভেতরটা দেখনি। নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য এই মানুষটা ছত্রিশ জাতির মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে তাদের হৃদয় জয় করে নিজেকে সংগঠিত ও সুরক্ষিত করেছে। এরা রামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তাদের সঙ্গে রামের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াবে তারা। লোকবল, অস্ত্রবল দুটোই রামের আছে। হয়তো আমাদের চেয়ে বেশি। রামের জটিল কূট রাজনীতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাতের কোন ছিদ্র নেই। তাছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের বিরুদ্ধে তার জঙ্গী মনোভাবও আগের মতো নেই। সে এখন, ভীষণ স্থির, শান্ত এবং সংযত। তার বিরুদ্ধাচরণ করার আগে এসব কথাগুলো ভাবা দরকার।

চুপ করে রইল খর। শূর্পণখার চোখের মধ্যে চোখ রেখে গভীরভাবে তাকে বুঝতে চাইল। শূর্পণখার মনেতে এখন কিসের পালা বদল চলেছে? ভয়, না অনুরাগ? শূর্পণখার বিপন্ন নারীমন হয়তো খুঁজছে একটা নিরাপদ আশ্রয় কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন! খরের ধারণা হলো, শূর্পণখার সমস্ত চিন্তাভাবনা দুরন্ত গতিতে রামের দিকে টানছে। শূর্পণখার বুকের জ্বালাই ইন্ধন যোগাচ্ছে মনের অগোচরে। তবে কি রাবণের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা নেই তার? তাকে বিশ্বাস করতে

কুণ্ঠিত কি? খরের ভেতরে অন্য কোন প্রতিক্রিয়া এবং দুশ্চিন্তার বদলে শুরু হলো বিচার বিশ্লেষণ। শূর্পণখার মনকে স্পর্শ করার জন্য অনুযোগ করে বলল : তুমি বদলে গেছ নিজের অগোচরে। আমাদের চিরচেনা শূর্পণখা অচেনা হয়ে গেছে যেন।

খরের উক্তিতে শূর্পণখা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে নীরব ভর্ৎসনা। বিমর্ষগলায় ক্ষীণ স্বরে বলল: একটা ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কায় আমার মন তোলপাড় করছে। জেনে শুনে বিপদ ডেকে আনতে ভয় পাচ্ছি।

খর নির্ভয়ে বলল : তুমি নির্ভয়ে থাক। তোমার ভয় কিসে? আমরা তো আছি।

শূর্পণখা শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল একবার। তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল: বুকের ভেতর ছায়ার মতো কি যেন নড়ে চড়ে। কাকে যেন খোঁজে? অনুসন্ধিৎসু চোখে একা অসহায়ভাবে তাকাল। ঘরে সে এখন একলা। নিবিড় গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছুটে যায় তার দৃষ্টি। মুগ্ধতার অবচেতন থেকে উঠে আসে অন্য আর এক মুগ্ধতার অভিব্যক্তি নিয়ে।

জীবনে শূর্পণখা রামচন্দ্রকে দেখেনি। তবু চেতনার গভীরে মৃগনাভির মতো তার এক আশ্চর্য সৌরভ ছড়িয়ে যায়। মনটা ভরে ওঠে তার গন্ধে। ভেতরটা আকুল হয়। কী যেন না পাওয়ার ব্যথায় ভরে যায় বুকের ভেতরটা। যেখানে অনেক ঢেউ। তবু তার মৌন কলরব তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে যায় অনেকদূর পর্যন্ত।

অকম্পনের কথাগুলো তার মনের বীণায় রিণ রিণ করে শুধু বাজছিল না, কল্পনায় দেখছিল রামের শ্রীময় অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, নীল নবঘন মেঘের মতো তার গাত্র বরণ, পদ্মকলির মতো টানা টানা নয়ন যুগল। গোদাবরীর নীল তরঙ্গ যেন দুচোখের তারায় স্থির হয়ে গেছে। চোখের চাহনিতে করুণার নির্ঝর। তদ্গত দুই চোখে সাধকের দৃষ্টি। মাথায় কালো কেশের বিপুল জটাভার। মনে অনন্ত প্রশান্তি, বুকে প্রেম। প্রেম ও করুণার দুই সাগরের স্রোত এসে মিশেছে সেখানে। পরশমণির ছোঁয়ার জেগে ওঠেছে গোটা দাক্ষিণাত্য। মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে দুবাহু বাড়ায়ে সব শ্রেণীর, সব গোষ্ঠীর মানুষকে প্রাণভরে কাছে ডাকছে, হে আমার রাক্ষস, অসুর, দৈত্যদানব ভাই, আর্যরা তোমাদের শত্রু নয়। মানুষের ভেতর শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বলে কিছু নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা মানুষ। আমরা মানুষ জাতি। আমাদের ধর্ম মানুষের ধর্ম। আমরা কেউ আলাদা নই, বিচ্ছিন্ন নই। একদিন তো মিলেমিশে ছিলাম আমরা। সেদিন তো আমাদের ভেতর কোন ঝগড়া ছিল না। তারপর লোভ ও স্বার্থের সংঘাতে একটা দেয়াল ওঠল আমাদের মধ্যে। একদিনে নয় বহুদিনের অবিশ্বাসে তা গড়ে উঠল। শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গরা মিলে সেই দেয়াল তুলেছিল। হয়তো তাতে শ্বেতাঙ্গ আর্যদের দোষ একটু বেশি ছিল। কিন্তু এককালে একটা ভুল হয়ে গেছে বলেই সেই ভুলটার জের টেনে যেতে হবে চিরকাল এমন কোন কথা নেই। দোষটা যেহেতু আর্যদের বেশি, তাই তাদের একজন হয়ে সেই অদৃশ্য দেয়ালটাকে ভেঙে ফেলার সঙ্কল্প নিয়ে রাজ্য, সিংহাসন, গৃহ, সুখ, বিলাস সব তাগ করে একেবারে দীন দরিদ্রের মতো সমস্ত মানুষের মাঝখানে নেমে এসে তাদের একজন হয়ে ওঠার জন্য বনবাসের অসুবিধেগুলো স্বীকার করে নিয়েছি। তবু আমার আন্তরিকতার প্রতি সংশয়, বন্ধুত্বে তোমাদের অবিশ্বাস, প্রেমে সন্দেহ, অথচ, মানুষের বিশ্বাস অর্জনের জন্য কত কী না করলাম। তবু রাক্ষসদের, দৈত্যদের বন্ধু হতে পারলাম কৈ? আমার কোন কথাই তারা শুনল না। এই দুঃখে পঞ্চবটীতে নীড় বেঁধেছি। আর্যদের এক বৃহৎ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

ভাবতে ভাবতে শূর্পণখার বুক কাঁপিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। রামচন্দ্রের যে উদ্দেশ্যই মনে থাক শত্রুতার মনোভাব অন্তত প্রকাশ পায়নি। বরং তার কাজকর্মের প্রতি এক দারুণ মুগ্ধতা তার মনকে অকারণ চঞ্চল করে তুলল। মারীচের মতো কুট রাজনীতিকেরও ধারণা রাম বিভেদের রাজনীতির উপর আঘাত হেনেছে। আর্যদের চিরন্তন অনার্য বিদ্বেষের ইন্ধন দিয়ে রাক্ষসেরা কালো মানুষদের অন্তরে যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণার বীজ বপন করত রামের কৃষ্ণাঙ্গ প্রীতি সেই বিরূপতাকে তাদের মন থেকে উৎপাটিত করতে সক্ষম হল। সরল মানুষদের গোষ্ঠীপ্রীতি, আনুগত্য ও বিশ্বাসকে মূলধন করে আর্য-অনার্য উভয়েই শ্বেতাঙ্গ-এবং কৃষ্ণাঙ্গদের পারস্পরিক রেষারেষি সৃষ্টি করে মনের গোপন অন্ধকারে হিংসার ছুরি লুকিয়ে শান দিত, কৃষ্ণাঙ্গদের কোলে টেনে নিয়ে রাম তাদের সে

অস্ত্রের ধার ভোঁতা করে দিল। ফলে, রামচন্দ্রই রাবণের ভয়ের পাত্র হয়ে ওঠল। কিন্তু বাইরে থেকে রাবণের মনের অভ্যন্তরে সেই উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা বোঝার কোন উপায় নেই। মানুষ এমন নিরুদ্বিগ্ন হয় কী করে?

চারদিক থেকে দক্ষিণারণ্যে সর্বনাশের ছায়া নামছিল খুব ধীরে। বুকের ভেতর সব হারানোর হাহাকার শূর্পণখাকে অস্থির করে তুলল। যন্ত্রণার মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার এ কিসের উৎকণ্ঠা? কার ভয়ে ভীত? বিদ্যুৎ চমকের মত চমকানো বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, তাহলে রামচন্দ্র তারও আতঙ্ক! রামচন্দ্র নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে তার বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। মনের গহনে অজস্র কথা ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে উথাল-পাথাল করতে লাগল। বারংবার মনে মনে উচ্চারণ করল—রামচন্দ্রের প্রেমে শত্রুমিত্র, পাত্র-অপাত্র নেই। চিরন্তন শত্রু বলে কেউ নেই। কারো প্রতি তার আক্রোশ, বিদ্বেষ, অভিমানও নেই। সে হল কালো মানুষের বন্ধু। তবু— থেমে যায় শূর্পণখার ভাবনাপ্রবাহ।

মনের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সংগ্রাম করল শূর্পণখা। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল; আর্যদের অনার্যবিদ্বেষ গোষ্ঠীবিদ্বেষ গোষ্ঠীকোন্দল, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের রেষারেষি মজ্জায় মজ্জায় তাদের মিশে আছে। এটা যাওয়াব নয়। খরের কথাগুলো তাকে সতর্ক করে দিল। তবু মন প্রবোধ মানল না। জটাজুটধারী, বল্কল পরিহিত রামের শান্ত, সৌম্য মূর্তি নিজের মতো কল্পনা করে এক সুন্দর আবহ রচনা হল। রোদের আল্পনার আঁকিবুকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে। কুঞ্জবনে বসে শূর্পণখা নিস্তব্ধ প্রকৃতি দেখছিল।

কতক্ষণ যে এভাবে প্রকৃতি দেখছিল নিজেও জানে না। জায়গাটা ভারি নিরিবিলি। নির্জনতার মধ্যে শূর্পণখা অনুভব করল রাবণ নিজের গৌরব বাঁচানোর জন্যে রামের সঙ্গে সংঘাত না করাই শ্রেয় মনে করে। তার নির্লিপ্ত থাকার কারণ এটাই। এ তার পুরনো কৌশল। বহুকাল আগের ঘটনা শূর্পণখার মনে দপ করে জ্বলে উঠল। বীর্যশুল্কা সীতার স্বয়ম্বর সভায় বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগী রাজা, মহারাজ এবং রাজপুত্রদের মতো রাবণও উপস্থিত হয়েছিল। বীরত্বের আস্ফালন করে একে একে বহু বীর যোদ্ধা রাজা, রাজপুত্রেরা হরধনু উত্তোলনে ব্যর্থ হলো। বীর খ্যাতি হারানোর আশঙ্কায় রাবণ ধনুক উত্তোলনে অংশগ্রহণ না করে চুপি চুপি স্বয়ম্বর সভা থেকে গাত্রোত্থান করে সে যাত্রার মত মান বাঁচিয়েছিল। নইলে, সেদিনই রামের কাছে হার স্বীকার করতে হত তাকে। অনুরূপ কোন আশঙ্কায় হয়ত তাকে শান্ত এবং সংযত রেখেছে। কারণ বহু ক্লেশে এবং জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে গৌরব, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে এবং এতকাল ধরে যা রক্ষা করছে রামের সঙ্গে সংঘাত করে তাকে হারানোর মতো নির্বোধ নয় রাবণ। কারণ সে জানে, যাদের নিয়ে যে অস্ত্রর ব্যবহার করে সংগ্রামে জিতেছে, অজেয় হয়েছে, আর্যাবর্তের আতঙ্কের পাত্র হয়ে আছে, রামচন্দ্র সুকৌশলে সেই অস্ত্রটি প্রেম-প্রীতির বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে তার হাত থেকে। রামের সঙ্গে মুখোমুখি যে যুদ্ধ হয় খোলা মাঠে সকলের দৃষ্টির সামনে সেই যুদ্ধেও রাবণের অনীহা। নিজের সুনাম বাঁচানের জন্য সে নির্বিকার। দুর্নিবার সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা যতক্ষণ না হচ্ছে, যখন সংঘাত না করে উপায় নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত রামকে আঘাত করে নিজের বিপর্যয় ডেকে আনবে না। রামের ফাঁদে পা দিয়ে বিপদ ডেকে আনার চেয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা অনেক নিরাপদ।

নিজের চিন্তায় শূর্পণখা এতই অন্যমনস্ক এবং আচ্ছন্ন ছিল যে দূষণের আগমন টের পায়নি। বার দুই ডেকেও সাড়া পেল না দূষণ। জোরে জোরে কাশলে শূর্পণখা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। লম্বা শ্বাস ফেলে বলল : এস।

দূষণ কুর্শিতে বসতে বসতে বলল : তোমাকে তো আগে এত অন্যমনস্ক দেখেনি। কী হয়েছে তোমার?

শূর্পণখার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে ওঠল। বলল : দেবর! অগ্রজের নীরবতার অর্থ বুঝি না। রামচন্দ্রকে প্রতিরোধের কোন চেষ্টা তার নেই। ভ্রাতার ভীরুতা এবং কাপুরুষতা আমি সইতে পারছি না। তাকে বিপন্ন মনে করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আমরাও বোধ হয় নিরাপদে নেই।

দূষণের দুই চোখে কৌতুক। মুখে প্রতিপদের চাঁদের মতো বাঁকা হাসি। বলল: রাবণ বিপন্ন হবে

কেন? তার হয়েছে কী? রামকে পাত্তা দিল না বলে তাকে বিপন্ন মনে করার হেতু কী? এটা রণকৌশল। মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হলে অনেক সুতো ছেড়ে সারা দীঘি জুড়ে তাকে দৌড়োদৌড়ি করাতে হয়। তারপর কাহিল হয়ে গেলে ডাঙায় তুলতে হয়। সেই রকম রামের মতো ফন্দীবাজ মানুষের মতি-গতি ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য রাবণ তাকে ছেড়ে রেখেছে। এই অবহেলার জন্যই রাম কোন রাজনৈতিক গুরুত্বই পেল না। তাকে অবজ্ঞার পাত্র করে তোলা রাবণের রাজনীতি। দীর্ঘ নীরবতা অনেক সময় মুখোমুখি যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়ে উঠে। এ যুদ্ধ বাইরে থেকে দেখা যায় না। মনের অভ্যন্তরে প্রতিমুহূর্ত তাকে লড়াই করতে হয় নিজের সঙ্গে।

শূর্পণখার ভুরু কুঁচকে গেল বিতৃষ্ণায়। বিরক্ত হয়ে বলল: আশ্চর্য তোমার যুক্তি। সাধারণ লোকে এসব কুটবুদ্ধি বোঝে না। রাবণের নীরবতা অন্য অর্থ খোঁজে তারা। ঔদাসীন্যের মধ্যে তারা রাবণের দুর্বলতা খোঁজে। রাবণ ভয় পেয়ে গেছে বলেই রামচন্দ্র সারা দক্ষিণারণ্য নির্ভয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

দেবি, সাধারণ লোক রাজনীতি বোঝে না। বুঝলে, রামচন্দ্র দক্ষিণারণ্যের মাটিতে পা রাখতে পারত না, তার সঙ্গে মেলামেশা করে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করত না। রামচন্দ্র তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে একটা সংঘাত বাঁধাতে চাইছে। যাদের নীতি হল সংঘাত বাঁধানো তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলাই প্রকৃষ্ট রাজনীতি। রাবণ তাই করছে। নীরবতা পালন করে তার রাজনৈতিক অভিসন্ধি অকেজো করে দিচ্ছে। তাই রামের সম্পর্কে আমাদের কোন দুর্ভাবনা নেই।

তোমাদের এই গর্ব, অহঙ্কার, দম্ভ আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমরা সব জেগে ঘুমোও। তোমাদের জাগানো তাই সহজ নয়। কেন বোঝ না রাজনীতিতে শত্রু অথবা প্রতিপক্ষ যত ছোট হোক তাকে তুচ্ছ করতে নেই। যে করে, তাকে পস্তাতে হয় পরে।

দেবি, নীরবতা মাঝে মাঝে বাক্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর। রাবণের নীরবতার অস্ত্র রামকে যে কত তীব্র ও গভীরভাবে বিদ্ধ করতে পারে তুমি কল্পনাও করতে পার না।

তোমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝলাম না।

খুব সোজা। তাকে নিয়ে মাথা ঘামানো মানেই রাবণের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে সে। বাস্তবে যাই হোক, প্রকৃত সত্য শত্রুকে জানতে দিতে নেই। জানা মানেই শত্রুর হাত শক্ত হওয়া কিন্তু মৌন থাকলে নিজেকে তার প্রত্যাখ্যাত মনে হবে। শত্রুর মনের অভ্যন্তরে একটা ভয় নিরন্তর তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। উদ্বেগ, আশঙ্কা, ভয়, দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। তা-হলে বুঝে দ্যাখ নীরবতাও একটা রণকৌশল হয়ে উঠতে পারে। মৌন সংঘাত যে কোন মুখোমুখি লড়াইয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পারে প্রতিপক্ষের দেহে ও মনে। কত অনায়াসে বিদ্ধ করতে পারে রামের খ্যাতি এবং গৌরবকে। এটা তো চোখে দেখার জিনিস নয়, পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে তার তাৎপর্যকে অনুসন্ধান করতে হয় রামচন্দ্র এতই অযোগ্য যে তেরোটা বছর কেটে গেল তবু রাক্ষসদের একজনকেও সে আক্রমণ করেনি। সুতরাং তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার নিজেকেও বিপন্ন ভাবার কোন হেতু নেই।

শূর্পণখার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তবু এক উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা তার নাভি থেকে উঠে এল। বলল: কী জানি? আত্মতৃপ্তির ঋণ হয়তো একদিন বহু মূল্য দিয়ে শোধ করতে হবে। বোধ হয় সেদিন খুব দূরে নয়।

শূর্পণখার মনের অভ্যন্তরে যে ভাবান্তরের পালা চলেছে তা রাবণের অজানা ছিল না। ইদানিং ধারণা হয়েছে ভ্রাতাই তার জীবনের অভিশাপ। এই মানুষটাই তাকে রিক্ত করে দিয়েছে। তার জীবনের বড় বাধাও সে। রাবণের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না আজকাল। মুখে প্রকাশ করে না কিছু, কিন্তু হাবে-ভাবে, কথায় সেটা প্রকাশ পায়। পারলে বিতৃষ্ণায় পাহাড়ের তলায় চাপা দিত তাকে। সে ক্ষমতা নেই বলে নীলকণ্ঠের মতো ঘৃণার বিষ কণ্ঠে ধারণ করে রাবণকে মানিয়ে নেয়। নিরাপত্তার জন্য মানিয়ে নিতে হয়। এই নেয়ার মধ্যে কী যে অপমান আর যন্ত্রণা আছে তা শুধু সেই জানে। মেয়ে বলেই এক নিরুপায় অসহায়তায় আত্মগ্লানি তার সত্তাকে খুবলে খুবলে খায়। তবু এক অদ্ভুত

ঠাণ্ডা, দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা নিয়ে রাবণকে আঁকড়ে থাকে এক নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায়।

রাবণও জানে মেয়ে জাতটা লতার মতো অবলম্বন আঁকড়ে থাকে। অবলম্বনহীন হয়ে থাকতে পারে না। অবলম্বহীন হওয়া মানে ছিন্নভিন্ন হওয়া। জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা, বিরহ-বিষাদ, মান-অভিমান, বিদ্বেষ-ঘৃণা, লাভ-লোকসান নিয়ে কেউ নিজের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলে না। শূর্পণখারও সাহস নেই খেলার। এই প্রত্যয় নিয়ে রাবণ নিরুদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু সেই জানার জগৎ হঠাৎ বদলে গেল তার। এতকাল রাবণ যা অভ্রান্ত, নিশ্চিত সত্য বলে জানত পঞ্চবটীতে রামের কুটীরে নির্মাণের অল্পকাল পরে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হচ্ছে সেটাকে। একজন মানুষ সম্পর্কে কোন জানাই বোধ হয় সঠিক নয়। হয়তো এমন পরিবর্তনশীল না হলে মানুষের জীবনটা এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

মাঝে মাঝে রাবণের মনে হয়, শূর্পণখার কাছে তার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। কঠোর হতে গিয়ে গভীর ক্ষমায়, অসীম মমতায় স্নেহময় অগ্রজ ভাই হয়ে যায়। তখন শূর্পণখার উপর সব রাগ পড়ে যায়। আর কেউ না জানলেও সে তো জানে, কোথায় তার শূন্যতা, কত জায়গায় তার ব্যথা। সেই শূন্যতা এবং ব্যথা সব সময় তাকে আড়াল করে বেড়াতে হয়। শূর্পণখার সেই কষ্টের কথা মনে পড়লে বুকখানা দরদে এবং মমতায় ভরে যায়। ক্ষমার আলো পড়ে অন্তঃকরণটা মহান এবং উদার হয়ে যায়। নিজে হেরে না গিয়ে শূর্পণখাকে হারানো তখন সহজ হয়ে যায়।

এই অনুভূতিটাই রাবণের মরে গেছে। সর্বনাশের ছায়া সব দিক থেকে নিবিড় হয়ে নামছে মনে। রামচন্দ্র তার হিসেব গোলমাল করে দিচ্ছে। দক্ষিণারণ্যের রাজনীতিতে রামচন্দ্রের অনুপ্রবেশের পর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। বোধ হয় তার নিজের নীতিবোধটাও বদলে গেছে। রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের কপটতার হাতে বন্দী হয়ে আছে। তার শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত অশক্তি, সৌভ্রাত্রের মধ্যে প্রতিহিংসা, শ্রদ্ধার মধ্যে ঘৃণা, বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা, আনুগত্যে অবিশ্বাস, মৈত্রীর বৈরীতা। সে আজ আত্মীয় নয়, ভ্রাতা নয়, বন্ধু নয়, দেশপ্রেমিক নয়; একসঙ্গে সব। দুর্বলতা তাকে স্বার্থপর, নীতিহীন আর সুবিধেবাদী করেছে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। উন্মত্ত আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে আত্মসংহারী করেছে।

রাবণ শূর্পণখার ভাবান্তরের মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পেল না। সময়ের উত্তরাধিকার বহন করছে সে। বর্তমান রাজনীতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এমনভাবে ছিটকে পড়েছে যে তার থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ভাই হয়ে সে চুপ করে থাকতে পারে না। রামের খপ্পর থেকে ভগিনীকে মুক্ত করার দায়িত্ব তার। রামকে দক্ষিণারণ্য থেকে বিতাড়িত করে অযোধ্যায় পাঠানোর জন্য খর ও দূষণকে গোপনে ডেকে পাঠাল।

।। বারো ।।

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে শূর্পণখা নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। শরীর তো নয়, ভাদ্রের ভরা নদী। টলটল করছে যৌবন। ঘাঘরার নীচে দেখা যাচ্ছিল তার নিটোল দুটো পা আর তাতেই শূর্পণখার ভেতরটা দীপশিখার মতো কেঁপে ওঠল। এ কোন শূর্পণখা দেখছে দর্পণে? তার ভেতর থেকে এ কোন রূপসী রমণী বেরিয়ে এল? ঘনপক্ষ ভুরু জোড়ায় আয়ত দুই চোখে কাজল পরে বিলোল কটাক্ষ হেনে, ঠোঁটের ফাঁকে মদির হাসি ফুটিয়ে তুলে নিজেকে দেখল। ডালিমের মত পরিপুষ্ট বর্তুলকার স্তনেব দিকে চেয়ে রইল। ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেণীটা এসে সাপের মত পড়ে আছে দুই স্তনের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ সমতল উপত্যকার উপর। আচ্ছন্নের মত উদ্ধত বক্ষসম্ভারের উগ্রতাকে একটু আকর্ষণীয় আর রূপময় করার জন্য বাসন্তীরঙের কাঁচুলীর উপর ফিন ফিনে ওড়ানাটা একটু টেনে দিয়ে আড়াল করল। অমনি এক বিচিত্র লজ্জার শিহরণে সঙ্কুচিত হয়ে গেল তার ভেতরটা। মনে হলো, বহুকাল পরে নিজেকে আবিষ্কার করেছে নতুন করে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। বুকের ভেতরটা খুশিতে উত্তাল হয়ে উঠল।

বিদ্যুৎজিহ্বর প্রতিকৃতির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল : তুমি কিছু ভেব না। আমি পারব। দেখবে, আমার সঙ্কল্প সার্থক হবেই। তোমার মতো আমার কোন বড় আদর্শ কিংবা বড় স্বপ্ন নেই। আমি শুধু তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেব। বহুদূর থেকে তুমি আমার মনের কথা শুনতে পাচ্ছ? আমার কাজের জন্য আমাকে ভুল বুঝবে না তো? হঠাৎই তার দুচোখে ঝাপসা হয়ে গেল। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বুকের ওপর।

মনের সঙ্গে অনেকক্ষণ সংগ্রাম করল শূর্পণখা। যতবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল ততবারই রামের শান্ত সৌম্য মূর্তি তার চোখের পর্দায় ভেসে ওঠল। তাকে কখনো দেখেনি। তবু কল্পনায় দেখল রামের ঢল ঢল মুখ, পদ্মকলির মতো দু'চোখ, মুখে চোখে যৌবনের বিভা, মাথার উপর চুড়ো করে বাঁধা কালো চুলের রাশ। পেশীতে পেশীতে সুনীল সাগর তরঙ্গ যেন বাঁধা পড়েছে চিরকালের মতো। তার পৌরুষ দীপ্ত রূপের মাধুর্য শূর্পণখাকে আবিষ্ট করে রাখল।

জীবন ও মনের গতিপ্রকৃতি কত বিচিত্র, বিপরীত, আশ্চর্যও রহস্যময়—শূর্পণখা এই মুহূর্তে মর্ম দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করল যে অসহ্য আবেগে, দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে তার ভেতরটা উত্তাল হয়ে উঠল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে এমন বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল কেন? বুকে এ তার কিসের কলধ্বনি? কার জন্য হাহাকার? বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকাল তার ভেতরটা। তবে কি এর নাম অনুরাগ? এ কী তার প্রেমের অভিব্যক্তি? না, অন্য কোন আনন্দে আবেগে ভেতরটা খুশি হয়ে উঠেছে। এ তার কিসের খুশি? শূর্পণখা প্রশ্ন করল নিজেকে। এখন তার মনে কোন অবস্থা চলেছে? প্রেমের, না প্রতিহিংসার? বৈরীতার, না বন্ধুত্বের? মনের গহনে অজস্র কথা ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে উথালি-পাথালি করতে লাগল। পিপাসিত মনের অনুভূতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচিত্র এক আবেগ তরল স্রোতের মতো প্রবাহমান।

শূর্পণখার চোখের জল কখন শুকিয়ে গেছে জানতে পারল না। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দিগন্ত জোড়া কালকেয় রাজ্যের দিকে চোখ ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। শরীরের মধ্যে নিজের অজান্তে এক অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহা শিহরিত হতে লাগল। সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু স্পন্দিত হলো। নিজের মনে উচ্চারণ করল: রামচন্দ্র তোমাকে আমার বড় দরকার। আমার নির্দোষ স্বামীর হত্যাকারীর সঙ্গে তোমার ঝগড়া, তোমার চিরশত্রু সে। তোমাদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেবার এতবড় সুযোগ আমি হাতছাড়া করব না। তোমাদের পুরনো শত্রুতার রন্ধ্রপথ ধরে রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের নিয়তি প্রবেশ করল আমার প্রতিহিংসা প্রতিশোধের রূপ ধরে। আমার লোকচরিত্র জ্ঞান সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুও কম নয়। আমি সেই অন্ধকার গুহার দরজা খুলে দেব। তুমি তার মধ্যে প্রবেশ কর রামচন্দ্র! আমার বুকের আগুন নিয়ে তুমি শুধু একাই দাবানল জ্বালাতে পার। রাবণের ঘরে আগুন দিতে তুমিই পার। সেই প্রলয়ঙ্কারী আগুনে পুড়ে লঙ্কা নগরী ছারখার হয়ে যাবে। তোমার ঘরও সে আগুন থেকে বাদ পড়বে না।

বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনে দাঁড়িয়ে রইল দর্পণের সামনে। পরিচারিকাকে ডেকে সারথিকে রথ প্রস্তুত করতে হুকুম পাঠাল। দর্পণের সামনে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে এক আচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করছিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল।

বুক জুড়ে তার ঘৃণা, রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। শূর্পণখা কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। উচিত অনুচিত বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে হাঁটতে আরম্ভ করল। অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে হনহন করে নিচের দিকে নামছিল। ক্রমাগত নামতে লাগল। কারো সঙ্গে কথা বলল না। কোনদিকে ফিরে তাকাল না। কিছু একটা হয়েছে মনে করে দাসী এবং সহচরীরা তার পিছন পিছন দৌড়ল। শূর্পণখাকে ফেরানোর জন্য নয়, তাকে ঘিরে থাকার জন্য। কিন্তু শূর্পণখা আরো দ্রুত হাঁটতে লাগল। তার কাছে পৌঁছনোর আগেই গাড়ী বারান্দার নিচে অপেক্ষমান রথে চড়ে বসল। আর তক্ষুণি রথ ঝড়ের মতো উড়ে চলল। নিমেষে ফটক পেরিয়ে গেল। দূর থেকে একটা আক্ষেপের কলরোল ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

বৃদ্ধা দাসী বলল: চিরকাল একগুঁয়ে। একবার যা করবে মনে করে তা থেকে আর নিরস্ত করা যাবে না তাকে। কখন যে তার কী হয়, কে জানে? ছোট থেকে দেখছি তবু ওকে চিনতে পারলাম না। ওর কথা ভাবতে ভাবতে একদিন পাগল হয়ে যাব। যার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলল তার কানে

পৌঁছল কিনা কে জানে? অলিন্দে অলিন্দে প্রতিধ্বনিতে হতে হতে হাহাকারের মতো ছড়িয়ে গেল বাতাসময়।

শূর্পণখার রথের চাকার তখন দুরন্ত গতিবেগ। সন্‌সন্‌ করে বাতাস কেটে রথ ছুটছিল। টান টান করে বাঁধা চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মুখে চোখে জড়িয়ে ধরছিল। আদরে সোহাগে কানে কানে ফিস ফিস করে বলল: শূর্পণখা অনেককাল তো খেলার পুতুল হয়ে সময়টা কাটিয়ে দিলে। যা খুশি তোমাকে নিয়ে করেছে রাবণ। এবার ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার। রাবণ তোমার ভাই হলেও কতটুকু জানো তাকে? সে নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারে। সেজন্যেই তোমাকে বলি, এবার সব মায়ামোহ, আনুগত্যের বন্ধন কেটে বেরিয়ে এস। পায়ের বেড়ি ভেঙ্গে ফেল। সব মুখোশ খুলে দাও। বুদ্ধিতে, সাহসে, শক্তিতে তুমিও কম নও। প্রত্যেক নারীর ভেতর একজন পুরুষসিংহ বাস করে। চোখে দেখা যায় না তাকে। সত্তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। সে পুরুষকে সব নারী তার স্বপ্নের মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে খোঁজে। সে পুরুষ সাধারণ নয়। অপাপদ্ধি, দুর্মর সাহসী, বিশ্বজয়ী সেই পুরুষ কেবল নারীর স্বপ্নেই বাস করে। ধ্যানের সেই পুরুষকে সুপ্তি থেকে জাগাতে হয়। যতক্ষণ সে না জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত নারীকে অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে হয়। এই মুহূর্তে সে কিন্তু তোমার মধ্যে জেগে উঠেছে। তোমার মনের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তবু স্বপ্নের পুরুষের ডাকে সাড়াও দিচ্ছ না, জেগে উঠছ না, আঁকুপাঁকু করছ ভিতরে ভিতরে তবু তেতে উঠছ না। রাগে ফেটে পড়ছ না। আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ থমধরা এক আচ্ছন্নতা নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে ছিল রথে। এলোমেলো হাওয়া লেগে মাথার চুল অশান্ত হয়ে উঠল। মনটাও ভারী অস্থির হল। অস্থির শূর্পণখা দুই হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে একটা কোণ রচনা করে হাতের তালুর উপর মুখ রেখে আনমনে বসে রইল। চোখের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে কত কি ছুটে যাচ্ছে। কোন কিছুর উপর তার নজর নেই। মনেতে রেখাপাতও করছে না। হু হু করে বাতাস কত জায়গা, কত গাঁ ছুঁয়ে এসে তার কানে ফিসফিস করে অবিশ্রান্ত কত কী বলে যাচ্ছে। বেলা দুপুরের চড়া রোদে তেতে উঠছে সবুজ বনানী। শূর্পণখার গায়েও রোদ লাগছে। তবু সে সব অগ্রাহ্য করে বাতাসের কথা শুনতে লাগল। নিজের মনের সঙ্গে বকর বকর করছিল।

হঠাৎ সচকিত হয়ে নিজের মনে নিজেকে শুনিয়ে বলল: বহুদূর এসে গেছ তুমি। বহুদূর পর্যন্ত এগিয়েছ শূর্পণখা। এরপরে তোমার ফিরে যাওয়ার পথ আর খোলা থাকবে না। ফেরার কী দরকার আছে? তুমি একাই বেরিয়ে পড় না.মহাপৃথিবীর দিকে। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তাতে সবচেয়ে বড় বাধা রাবণ। সে তোমাকে আগলে আছে। তোমাকে ঢেকে রেখেছে। তোমার জীবনে সে অভিশাপ।

শূর্পণখা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রথে। অনেকক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সারাক্ষণ ধরে বসে বসে নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন রাবণকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না? কেন এই মানুষটাকে অস্বীকার করতে পারে না? স্বামীহন্তা, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী, দাম্ভিক, নিষ্ঠুর, অপ্রকৃতিস্থ এই লোকটা কোন মন্ত্রবলে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল? এ এক রহস্য তার কাছে। এক অদ্ভুত জটিল রহস্য। এই মানুষটার উপর তার রাগ, ঘৃণা হয়, আবার পরক্ষণেই কেমন একটা করুণা হয়।

জোরে ছুটে চলা রথ থেকে প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখতে বেশ লাগে। রথে উঠলেই শূর্পণখার মনে হল, মরে যায় নি, বেঁচে আছে সে। চলার সুখে চোখ বুজে এল। এখনও রথে উঠলে চলার নেশায় রক্ত চনমন করে ওঠে।

কতরকমের গাছপালা। সব গাছই ঝাঁকড়া। শ শ বছর ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। তাদের মৌনতার ভাষা বড়ই রহস্যময়।

জঙ্গল এদিকে ঘন এবং গভীর। বড় গাছপালার সঙ্গে ঝোপঝাড়ও কম নেই। কতরকমের নিরীহ প্রাণী থাকে সেখানে। ময়ূর বনমুরগী, খরগোশ, হরিণের মতো নিরীহ প্রাণী মিলে মিশে একসঙ্গে বাস করছে। দুধারে নিবিড় জঙ্গল ঘেরা পথে রথ নিয়ে এগনো অসম্ভব হল। আঁকা বাঁকা পথটাও গোদাবরী নদীর দিকে হারিয়ে গেছে। সারথিকে রথ থামাতে বলে শূর্পণখা নেমে পড়ল। নদীর তীর

ধরে একা এগোতে লাগল সাবধানে।

হঠাৎ, মানুষের চলাফেরার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়াল শূর্পণখা। টান টান ভয়ে, বিস্ময়ে তার দু'পা গেঁথে গেল মাটিতে। মনে হল জঙ্গলে কে বা কারা কথা বলছে যেন। তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের মধ্যে লুকোল। ঐ আড়াল ছেড়ে নদীর দিকে যাওয়ার সাহস হল না। প্রচ্ছন্ন থেকে দেখার চেষ্টা করল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল একজন কালো মধ্যবয়সী লোক নদীতে নেমে স্নান করছে। জলে মুখ ডুবিয়ে বিচিত্র ধরনের শব্দ করছে। সে আওয়াজে ভয় পেয়ে একদল বনমোরগ বিরক্ত হয়ে নদীতে ঝুঁকে পড়া ঝোপ থেকে উড়ে গেল এক সঙ্গে। তাদের দেখা দেখি পিল পিল করে কাদা খোঁচা পাখি বেরিয়ে এল। গাছেরাও শূর্পণখার সঙ্গে মিলে ঐ দৃশ্য দেখছিল।

স্নান সেরে লোকটা নদী থেকে ভিজে কাপড়ে ওঠে এসে একটি পাথরের ওপর দাঁড়াল। শালতরুর মত দীর্ঘ পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারায় উদ্দীপ্ত যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। শরীরে কোথাও মেদ নেই। সরু কোমর। নরম আর কমনীয় সুডৌল মুখ। নিরাবরণ সেই দেহশ্রী অপরূপ। মোমের মতো নরম গা বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। মিশকালো গায়ের রঙ থেকে নীলকান্তমণির মতো দ্যুতি বেরোচ্ছিল। ডাগর নীলাভ দুই চোখে কেমন একটা স্বপ্নালুতা ছেয়ে ছিল। তন্ময় হয়ে কী যেন দেখছিল নদীবক্ষে। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে শূর্পণখা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগল তাকে। সমস্ত চেতনার ভেতর ঝরাফুলের মিষ্টি সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়ল সেই সদ্যস্নাত পুরুষের অনির্বচনীয় সুষমা। এই কৃষ্ণবর্ণ মানুষটি যে এদেশীয় কিংবা এ অঞ্চলের মানুষ নয়, শূর্পণখা দেখেই চিনল। রামচন্দ্র নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে এল তার চেতনা। তার উৎসুক দুটি চোখ তাকে আরো ভালো করে দেখার লোভে ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় পাথরের একটি চাঙ্গড়ার ওপর উঠে দাঁড়াল। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু পুরুষটি তার দিকে ফিরে তাকাল না। তার নজর কেড়ে নিতেও পারল না। শুধু গাছের ডালে ডালে সাঁ সাঁ বাতাসের কান্না শোনা যাচ্ছিল।

গহন বন দিনের বেলাতেই অন্ধকার। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার কেটে যাচ্ছিল। দূরে অপসৃয়মান পুরুষটির দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছায়া-দেহটার দিকে তাকিয়ে শূর্পণখা চিৎকার করে ডাকল: ও মানুষ, আমি পথ হারিয়েছি। আমাকে ফেলে যেও না।

ভয়ার্ত নারীকণ্ঠে আর্তচিৎকার জনহীন অরণ্যে গম গম করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। শূর্পণখা দেখতে পাচ্ছিল রামচন্দ্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সারি সারি গাছের ফাঁক দিয়ে রামচন্দ্র তাকে খুঁজছিল। তার বড় বড় ডাগর দুই চোখে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা ফুটে ওঠল।

শূর্পণখার দুই চোখে হাসি ঝিকমিক করে উঠল। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। মৃদু বাতাসে দুলছে গাছের পাতা। যতদূর চোখ যায়, শুধু ঘন অরণ্যের এক শান্ত সমুদ্র যেন নিথর হয়ে পড়ে আছে। আর তরল সোনার মত রোদ গলে পড়ছে সবুজ বনানীর ওপর। শূর্পণখার বুকে ভয় নেই, এক চিরন্তন কৌতুকময়ী নারী চিরকাল পুরুষমানুষকে নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। খেলাতে তার সুখ। সেরকম একটা মজার খেলায় মেতে ওঠতে ভালো লাগল শূর্পণখার। ও মানুষ বলে ডাকলে তার বুকের মধ্যে কি যেন গলে গলে পড়ে। সমস্ত ভালোলাগাটাই শূর্পণখা প্রদীপ জ্বেলে পেতে চাইল যেন।

বাতাসে রামচন্দ্র নারীকণ্ঠের ক্ষীণ কাতরোক্তি শুনতে পেল। ও মানুষ। একটু দাঁড়াও। আমি একলা। নিঃসঙ্গ। তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চল।

নির্জন অরণ্যে অসহায় নারীর ব্যাকুল আহ্বানে রামচন্দ্র চমকাল; অবাক হল আরও। প্রথমে মনে হয়েছিল এ তার মনের ভ্রম। ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের গন্তব্য পথে চলল। এদিকটা মানুষ বড় বেশি চলাচল করে না। দুঃসাহসী শিকারীও ঢুকতে ভয় পায়। এ হেন জায়গায় একজন নারী কোথা থেকে এল? কেন এল? নিশ্চয়ই এ কোন রমণীর ছলনা। সংশয়টা মনে গেঁথে বসল। বারংবার একই কণ্ঠের কাতর আবেদন তার অন্তরাত্মাকে ভীষণ নাড়া দিল। একজন বিপন্ন নারীকে এভাবে একলা ফেলে চলে যাওয়া তার ভালো কাজ হচ্ছে না। তার অনুমান মিথ্যেও হতে পারে। শুধু একটা কাল্পনিক সন্দেহের বশে বিপন্ন নারীকে যদি সাহায্য করতে না পারল তা-হলে কেমন ধরনের বীর পুরুষ

সে? নিজের কাছেই বা আপন পৌরুষ নিয়ে গর্ব করার কী থাকল? কথাটা মস্তিষ্ক বিদ্ধ করল। অমনি বিবেক কর্তব্যবোধ প্রচন্ডভাবে নাড়া খেল। বিলম্বের জন্য এক ধরণের অপ্রকাশ্য চাপা অনুশোচনা তাকে ছিন্নভিন্ন করল। কালক্ষয় না করে নদীর তীর ধরে দৌড়ে যেতে লাগল যেদিক থেকে বিপন্না নারীর কণ্ঠস্বর আসছিল। কান খাড়া করেই সে চলল।

নদীর তীর ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকল। খুব সাবধানে চারদিকে চোখ রেখে এগোতে লাগল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল একজন কালো অল্প বয়সী সুবেশা মহিলা এদিক ওদিক চেয়ে কাকে খুঁজছে যেন। এই তাহলে সেই রমণী! রামচন্দ্রর বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল।

রমণীর দু'চোখ বিস্ময়ের আলো জ্বলে উঠল। কৃতজ্ঞতার ছায়া ফুটে ওঠল। মৃদুস্বরে বলল : মহাত্মন, আপনি কে জানি না। তবু আপনাকে দেখে প্রত্যয় হলো। আমার নিজের জন্য স্বার্থপরের মতো আপনাকে ডেকেছি। হয়তো অকারণ বিলম্বও করে দিলাম।

রামচন্দ্র মুখ টিপে হাসল। বলল : সব মানুষই নিজের জন্য করে। এজন্য আপনার সংকোচের কিছু নেই। কিন্তু এই গহন অরণ্যে আপনি কি ভাবে এলেন? কোথা থেকে এলেন? আপনার পরিচয় জানতে পারলে সাহায্য করতে ক্রটি করব না। দীনের নাম রামচন্দ্র। দশরথাত্মজ।

শূর্পণখা চমকাল না। স্বপ্নের মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়ার অফুরন্ত বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ জবাব খুঁজে পেল না। পাবে কি করে? যে মানুষটির মিষ্টি সান্নিধ্য, আলাপের পরশ পায়নি কখনও, কোনদিন পাবে ভাবেনি, তার উষ্ণ নিশ্বাস গায়ে মেখে সে গর্বিত হয়ে উঠে। ভালো লাগার সুখে ভরন্ত কলসের মতো ভরে ওঠে বুক তখন কি আর কথা ফোটে মুখে। বুকের মধ্যে জমানো অ-বলা কথার স্তূপ এই মুহূর্তে ফসিল হয়ে গেছে যেন। নীরব থাকার মধ্যে এক ধরণের গভীরতর সুন্দর সুখ নিহিত থাকে। সুখের আবশে তার চাহনি গভীর ঘুম পাওয়ার মতো হয়ে এল। কী দারুণ মুগ্ধতা বয়ে আনল তার কথাগুলো। অভিভূত গলায় ধীরে ধীরে বলল : সব মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দিয়ে আমিও মালা গাঁথি। স্বপ্ন মালা। কাল রাতে স্বপ্ন দেখছিলাম, স্বপ্নে অনেক কথা বলছিলাম, অনেক কিছু। ভাবিনি আমাকে চমকে দিয়ে চুপিসারে সেই স্বপ্ন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। স্বপ্নগুলো দুঃসাহসী হয়, একটু বেশি প্রত্যাশা করে, কিন্তু বাস্তবে তার কানাকড়ি দাম থাকে না। কিন্তু এক আশর্চ্য ঘটনা ঘটল আমার বেলায়। মুগ্ধ করা মন্ত্র নিয়ে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র সাহায্যের লম্বা হাতখানা মেলে ধরলেন আমার দিকে।

রামচন্দ্র চুপ করে শূর্পণখার দিকে অপলক চেয়ে রইল। অধর কোণে হাসি ফুটে ওঠল। বলল · দেবী, আমার সামান্য কৌতূহলকে মহার্ঘ করে তুললেন। যা ছিল আমার অতি সাধারণ প্রশ্ন তা আমার গর্বের ও শ্লাঘার হয়ে ওঠল। নারীকে জানার কৌতূহল তাই পুরুষের কোনদিন ফুরোয় না। কিন্তু আপনার এই গহন জঙ্গলে আগমনের কারণ কি? আপনি কে?

শূর্পণখা এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিল না। রামচন্দ্রের চোখের ওপর চোখ রেখে বলল : বিপন্না রমণীর পরিচয় দেয়ার মতো আছেই বা কি? যন্ত্রণা মথিত একটা কষ্ট এবং হতাশা মর্মরিত হলো তার কণ্ঠস্বরে।

শূর্পণখার আত্মপরিচয়ের অনিচ্ছা রামচন্দ্রকে তার সম্পর্কে সতর্ক এবং সাবধান করল। সাধারণ ঘরের রমণী মনে হলো না তাকে। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বধু হবে সে। তার মন বোঝার জন্য হয়তো এ কোন নিপুণ ছলনা রমণীর। চোখের ভাষায় অনেক কিছু মাখামাখি হয়েছিল তার। রাম ওর কথার ধরণ দেখে হেসে ফেলল। বলল : মানুষ হলেই তার একটা নাম থাকে। সেটাই তার পরিচয়। মানুষের মতো মানুষ না হতে পারার জন্য কিংবা মানুষের সম্মান, মর্যাদা, গৌরব না পাওয়ার জন্য তার একটা দুঃখ, কষ্ট, অভিমান থাকতে পারে। কিন্তু তার নাম পরিচয়টা অর্থহীন হয় না তাতে। গাছের পরিচয় তার পাতায় এবং ফলে। তাদের গন্ধও আলাদা। তেমনি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা গন্ধ থাকে। প্রত্যেক গন্ধই আলাদা। কোন বদবুদ্ধির মানুষ এলে তার গায়ে হিংস্র শার্দুলের মতো কটুগন্ধ লেগে থাকে, আবার একজন সৎ-সাধু এলে ধূপ-ধুনোর গন্ধে ভরে ওঠে। তা-হলে মানুষ চাইলেও নিজেকে গোপন করতে পারে না। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন, আবেদন সব কিছু মিলে যে পরিচয়টা আমি পেয়েছি সেটাই আপনি। নামটা নাই বা জানলাম। নাম ছাড়া মানুষটাকে তো চেনা হলো।

শূর্পণখা অবাক মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার প্রশ্রয় ভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করল : সত্যিই আপনার কোন তুলনা হয় না। আপনি জাদু জানেন। গলার স্বর কানে এলে খুশিতে মন ভরে যায়। কে জানে, কী আছে আপনার গলার স্বরে। আমার সঙ্গে কথা বলে কী পরিচয় পেলেন জানতে খুব ইচ্ছে করে।

সব জানা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়, না করতে আছে? নিজেকে কষ্ট দিয়ে দুঃখ দিয়ে নিজের জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিজেকে শেষ করে দেয়ার ভেতর কোন বাহাদুরি নেই। আপনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। যতটা হবে আপনার। আপনি নষ্ট হয়ে গেলে হাততালি দেবার মানুষ অনেক জুটবে, কিন্তু সত্যিকারে সহানুভূতি দেখানোর কোন বন্ধু পাবেন না। স্বার্থপর এই মজার পৃথিবীতে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার জন্য একজন রুদালীও মিলবে না।

শূর্পণখার মনে হল রামচন্দ্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখছে। হয়তো তাকে চিনতে পেরেছে। পোশাক-আশাক, চাল-চলন, আচার-আচরণে একজন মানুষ পুরো নিজেকে ঢাকতে পারে না, অন্য মানুষ হয়ে উঠতে সময় লাগে। একজন মানুষ নিজে যা পোশাকে; স্বভাবে তাই হয়ে ওঠে। বাইরেটা দিয়ে ভেতরটা সত্যি লুকোনো যায় না। সহজ নয় বলেই ময়ূর পুচ্ছ পরা কাকও ধরা পড়ে যায়। সেও ধরা পড়ে গেছে। তাই নিজেকে আর লুকোল না। সত্যিই তো যে ইতর সে মহত্বের মুখোশ পরলেই কি তার ব্যক্তিত্ব, স্বভাব কোনটাই বদলায়! সেই কথাটাই রামচন্দ্র বলেছে নিজের ভাষায়। প্রত্যেক মানুষের ব্যাক্তিত্বের আলাদা আলাদা গন্ধ থাকে। সেই গন্ধেই তাকে চেনা যায়। রামচন্দ্র তাকে চিনে ফেলেছে।

বেশ কিছুক্ষণ শূর্পণখা চুপ করেছিল। বুকের মধ্যে সময় লাফাচ্ছে। আশ্চর্য এক গভীর কৃতজ্ঞতায় বড় বড় চোখে রামের দিকে চেয়ে রইল। একটা চাপা উত্তেজনায় তার ভেতরটা টাটাচ্ছিল। প্রাণ থেকে যা বলতে চায় তাই বলবে। যন্ত্রণামথিত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল : মেয়ে মানুষের স্বভাব হল নিজেকে লুকনো। একটা জালের মধ্যে তারা বাস করে। মনের কথাটা গুছিয়ে বলতে শেখায়নি বিধাতা। কত কথাই অনুচ্চারিত থাকে তার। দ্বিধা, সংশয়, লজ্জা, আড়ষ্ট করে রাখে তাকে। কেন যে সহজ হতে পারে না, কে জানে? কোথায় তার বাধা, কত রকমের আড়ষ্টতায় সে সঙ্কুচিত তার মতো করে কেউ কোনদিন জানতে চায় না। এই অভিমান বুকে নিয়ে সে লুকিয়ে বেড়ায়। কারণ, মেয়ে মানুষের কথা কেউ শুনতে চায় না। সবাই তাকে দাবিয়ে রাখে। তার যে নিজের কিছু কথা থাকতে পারে, তার যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, পরিচয় আছে সেটা কেউ আমল দেয় না। সমাজে, সংসারে সে শুধু মেয়েমানুষ। তার জাত নেই, ধর্ম নেই, নাম নেই। তার ব্যক্তি সত্তায় নারী মাংসের গন্ধ। হরিণের মাংস যেমন হরিণের বৈরী, নারী মাংস তেমনি নারীর জীবনে অভিশাপ। তার শত্রু ঘরে বাইরে। শত্রুর চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য নিজেকে লুকোনোর চেষ্টা কোনদিন ফুরোয় না তার। তাই নিজের সম্পর্কে কী বলব বুঝিয়ে বলতে পারছি না। সব কথা বোঝানোর নয়। বোঝানো যায়ও না।

শূর্পণখার কথাগুলো অত্যন্ত গভীর খাতে বয়ে যাচ্ছিল। নারী সম্পর্কে এক নতুন মানে বয়ে নিয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল রাম। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের এক চিলতে নরম আলোর ছোঁয়া লেগেছে শূর্পণখার দুই কপালের চুলের পাশে। নীল আকাশের মুগ্ধ করা মুক্তির বার্তা নিয়ে যেন চুপি চুপি প্রবোধ দিচ্ছিল তাকে। শূর্পণখা নিচের দাঁত দিয়ে উপরের ঠোঁট কামড়ে ধরল। দু'চোখের কোনে জল টলটল করছিল। মধ্যাহ্নের অলস হাওয়ায় অলকচূর্ণ উড়ে উড়ে পড়ছিল কপালে। অভিভূত গলায় রামচন্দ্র বলল : আপনার কথাগুলো মর্মে এসে লাগে। এই বীর পুরুষের পৃথিবীতে সব মেয়েরাই অসহায়। কিন্তু এসব নিয়ে গভীর করে ভাবতে গেলে সুখ মরে যায়। যার বিচারবোধ থাকে তার সুখও থাকে না। সুখী হবার সহজ উপায় বিচার-বিবেচনাহীন হওয়া।

শূর্পণখার চোখ নীরব কৌতুকে ঝলকে উঠল। বলল : মেয়েদের সব পরিচয় তো তার স্বামীকে নিয়ে। যার স্বামী নেই, তার কোন পরিচয় নেই। সংসারে সে হারিয়ে যায়। স্বামীর নামের গৌরব নিয়ে নিজের পরিচয়কে একাংশ ধরে রাখে। আমিও তেমনি এক ভর্ত্রীহীনা নারী। কালকেয় রাজ্যে বাস করি। নাম শূর্পণখা।

সবিস্ময়ে রামচন্দ্র উচ্চারণ করল : রাবণ ভগিনী!

শূর্পণখা প্রতিবাদের ভাষায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলল : আমি দানব বধূ। বিদ্যুৎজিহ্ব মহিষী শূর্পণখা। এটাই আমার পরিচয়।

লঙ্কেশ রাবণ যার ভাই সে অনাথিনী হবে কেন?

শূর্পণখা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি সে আমার কত বড় শত্রু। আমার জীবনের বড় অভিশাপ।

চমকে তাকাল রাম। বিস্ময়টাকে চাপা দিতে মৃদু হাসল। রহস্যময় সে হাসি। শূর্পণখার বুকের মধ্যে ঝড়ো বাতাসের উন্মাদনা তার নিঃশ্বাসে টের পেল। তবু তাকে ভালো করে যাচাই করে দেখার জন্য বলল : দেবি, শুনতে পাই, ভাই-বোনদের ভেতর আপনাকে সে বেশী স্নেহ করে। বড় ভাইয়ের প্রতি আপনার অভিমান হতে পারে, কিন্তু তার স্নেহ, আদরের প্রতি কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এসব আপনাদের ঘরের ঝগড়া। দুদিনবাদে মিটেও যাবে। আমি আপনাদের কেউ নই। এর মধ্যে আমার নাক গলানো উচিত নয়। মিছেমিছি আমাকে টেনে এনে বিপদে ফেলে আপনার লাভ কী? স্বল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝেছি, আপনি বুদ্ধিমতী এবং চতুর মহিলা।

শূর্পণখা জবাব দিল না। একটা লম্বা শ্বাস পড়ল তার।

ওরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে গহন বন পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। রামচন্দ্রের সঙ্গে বাঁদিকে মোড় ঘুরবার আগেই দেখল ঝোপের আড়ালে তার রথ নিয়ে সারথি সেইভাবে বসে আছে। পাছে রামের লক্ষ্য পড়ে তাই তার নজর অন্যদিকে ফেরানোর জন্য বলল : ঝুরো মাটিতে এ কোন প্রাণীর খুরের দাগ?

রামচন্দ্র এরকম একটা উদ্ভট প্রশ্ন শুনে শূর্পণখার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। তারপর ঢোক গিলে বলল : কোন ভারী দেহের প্রাণীর খুরের চাপে মাটি ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। বুনো মহিষের পাল হয় তো একটু আগে গেছে।

বুনো মহিষের নাম শুনে শূর্পণখা একটু ভয় পেল। ভুরু কুঁচকে রামের দিকে তাকিয়ে বলল : আপনি খুব মজা করতে পারেন। আমাকে ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যে কথাটা নাইবা বললেন। বিপদকে আমি ভয় পাই না। ভয় পেয়ে কোন সুরাহা হয় না।

রামচন্দ্রের স্থির ও অনুসন্ধানী চোখের উপর চোখ রাখতে গিয়ে নামিয়ে নিল। স্বগতোক্তি করল : মিছেই আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এবার পথ চিনে একাই যেতে পারব।

রামচন্দ্র কয়েক নিমেষের জন্য স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অধরে বাঁকা হাসি খেলে গেল। হাসিটা শূর্পণখাকে বিঁধল। মনে হলো রামচন্দ্রের কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই নিজের মনেই বলল : মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতে বেশ লাগে। হারিয়ে না গেলে তো আপনাকে পেতাম না। অথচ, এই পাওয়াটা ছিল খুব জরুরী।

রামচন্দ্র আড়চোখে তাকাল। শূর্পণখা খুব কাছ ঘেঁষে তার সঙ্গে হাঁটছিল। গা থেকে তার সুগন্ধ বেরোচ্ছিল। রামচন্দ্র বুক ভরে তার ঘ্রাণ নিয়ে বলল : জরুরী হবে কেন?

শূর্পণখা রামের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল : আমার সঙ্গে রথ আছে। আপনি চাইলে আপনার কুটীরে পৌঁছে দিতে পারি।

রামচন্দ্রের দু'চোখে বিস্ময়। শূর্পণখা মায়াবী চোখের দিকে চেয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বলল : আমাকে?

হ্যাঁ, আমার পরিত্রাতাকে। আপনার অনুগ্রহ না পেলে কী হতো কে জানে? নারী বলে বিপদের আশঙ্কায় আর পাঁচ জনের মতো বিজন অরণ্যে আমাকে একা ফেলে যাননি। আপনার মহানুভবতাকে এ জীবনে ভুলব না। আপনার ঋণও জীবনে শোধ হবে না। আপনার প্রতি আমারও কিছু কর্তব্য আছে।

রামচন্দ্র কথা খুঁজে পায় না। শূর্পণখার মায়াবী চোখের দিকে চেয়ে তার ভিতরকার বাসনা, কামনা, প্রেমকে টের পায়। এক ধরণের গভীর সুখে তার হৃদয় টৈটুম্বুর হয়ে যায়। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল : জীবনটা এক সুন্দর নাটক। এটা জীবনের দোষ নয়, মানুষ মানুষীর দোষ। আমরাই জীবনটাকে নাটক করে তুলেছি। তবু বলব, আমার আপনার মতো পুরো মানুষের সবটুকু কখনো এই ছোট্ট নাটিকার মধ্যে

আঁটে না। তাই আমার প্রতি আপনার কর্তব্যবোধের ইচ্ছেকে বিন্দুমাত্র কোন দিক দিয়ে ছোট করব না। এখন আপনাকে নিয়ে তো আমার আগামী দিনের স্বপ্ন। বিধাতার ইচ্ছে পূরণের মধ্যে হয়তো এই হঠাৎ দেখার সার্থকতা আছে।

রামের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শূর্পণখার মনটা কেমন উড়ু উড়ু হয়ে গেল। বহুকাল পরে মনে হল এই মানুষটার কাছে তার অনেক কিছু পাওয়ার আছে। দিয়ে থুয়ে, নিয়ে দিয়ে তারা দু'জন দুজনকে ভরপুর করে তুলতে পারে। তাদের উভয়ের স্বার্থ ও লক্ষ্য অভিন্ন। তবু মুখ ফুটে কেউ কাউকে বলেনি। মুখে না বললেও দু'জনে টের পায় এটা তাদের মনের কথা। কিন্তু নিজেকে তেমনভাবে রামের কাছে প্রকাশ করতে যে ভাষার দরকার, কূট-রাজনৈতিক জ্ঞান দরকার, তা নেই তার। চিন্তাটা এই কারণে। মনটাও সর্বদা অস্থির সেজন্য। মাঝে মাঝে খোলাখুলি কথা বলার খুব ইচ্ছে হয়। রামচন্দ্রও হয়তো ভাবছে, তার মনের ভাব প্রকাশ কীভাবে করে সেটা জেনে বুঝে নিজেকে নিবেদন করবে। কারণ তার পক্ষে মনের কথাটা বলা যতটা সহজ রামের পক্ষে নয়। মনের আবরণ খুলে রামের কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে কিছুই হারাতে হবে না তাকে, কোন সংকটেও পড়তে হবে না, কিন্তু রামের পক্ষে কোন কিছু নিজে অনুভব করা, আর সেটা তার অনুভূতিতে পৌছে দেওয়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। যদিও উভয়ের স্বার্থটা ঘটনাচক্রে এক হয়ে গেছে। এখানে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক স্বার্থের, প্রয়োজনের। এছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। প্রয়োজন থাকলেও হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি তারা চলতে পারে, মেলামেশা করতে পারে, আবার প্রয়োজন মিটে গেলে তাদের সম্পর্কও ফুরিয়ে যেতে পারে। ভালোবাসার কোন সম্পর্কই গড়বে না। বিদ্যুৎজিহ্বর শূন্য জায়গায় রামকে বসাবে না। প্রয়োজনে তাকে সঙ্গ দিতে পারে, অবহেলায়, ঘৃণায় বিরক্তিতে শরীরের উষ্ণ সান্নিধ্য দিতে পারে, কিন্তু মনের ভালোবাসা যে একজীবনে একজনকেই দিয়েছে। সে একজন হল বিদ্যুৎজিহ্ব। রাম শত চেষ্টাতেও সে জায়গা হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে না। তবু দিনের সর্বক্ষণ রাম তার ভাবনা অধিকার করে বসে থাকে। রামের কথাগুলো তার কানের পর্দায় অনুক্ষণ অনুরণিত হতে থাকে।

বয়সে অনেক ছোট বলে তুমিই বলছি। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তোমায় কাছে পাওয়ার জন্য মন এখন আকুলি-বিকুলি করে যে, পাগল পাগল লাগে।

কথা শুনে শূর্পণখার কর্ণমূল ঝাঁ ঝাঁ করে। নারীসুলভ লজ্জায় হাসে। জীবনে ন্যূনতম স্বার্থের কারণে পুরুষ জাতটা বানানো কথা বলে মেয়ে জাতটাকে বোকা বানায়। পুরুষের মিথ্যে কথাগুলো মেয়েরা বিশ্বাস করে ঠকে। পুরুষের কাছে স্বেচ্ছায় যখন নারী ছিন্নভিন্ন হতে ইচ্ছে করে তখন পুরুষের মিথ্যে আর বানানো কথাগুলোকে সত্যি মনে করে বিশ্বাস করে। কামপূরিত হওয়ার জন্য কখনও কখনও বক্রগতির বা মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়া যেমন অন্যায় নয় এ কথা সব নারী পুরুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তবু প্রবৃত্তির পথে হেঁটেই তাকে নির্বৃত্তি হতে হয়। হাসতে হাসতে বলল : তাই তো বড় চিন্তা।

রামচন্দ্র শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখের পলক পড়ছিল না মোটে। কী দেখছিল রামচন্দ্রই জানে। বিব্রত লজ্জায় শূর্পণখার মুখ রাঙা হয়ে গেল। নিজের মনে প্রশ্ন করে, রাম তার দিকে এমন করে চেয়ে আছে কেন? কী খুঁজছে তার চোখে? একি পুরুষের নারীকে আকর্ষণের পুরনো খেলা। রামের মুগ্ধ চোখের উপর চোখ রেখে লাজুক গলায় ভর্ৎসনা করে বলল : এবার ফেরান চোখ। অনেক হয়েছে। আর নয়।

রামচন্দ্র শূর্পণখার মন রাখার জন্য বলল : আরো যদি কিছুক্ষণ থাকে এভাবে দোষ কি?

রামের ঔৎসুক্যে লজ্জিত হলো শূর্পণখা। তবু হাসি পেল। বলল : মেয়ে হলে বুঝতেন। অন্য একজনের স্বামী আরেকজনের স্ত্রীর চোখের মধ্যে এমন করে চোখ পেতে রাখলে বুঝি লজ্জা হয় না।

রামচন্দ্র চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে বলল : যদি প্রশ্ন করি, কেন?

গা সিরসির করে। ভয় করে।

ভয়! কিসের?

ভালো লাগার ভয়। ভালোলাগা খেলাটা ভালো। কিন্তু সেই খেলায় নেশা ধরে গেলে বিপদ। নেশা বড়ই খারাপ অসুখ। প্রাণঘাতী অসুখ।

এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল রামচন্দ্র। অভিভূত গলায় বলল : তোমার কী মনে হয় এত দূরের জঙ্গল, পাহাড়ের পথ পেরিয়ে আমি যে তোমার প্রতীক্ষা করি তার মধ্যে কি হৃদয়ের টান নেই? সব সময় ইচ্ছে হয় তোমার জন্য কিছু করি।

শূর্পণখা কৌতুক করে বলল : পুরুষ মানুষের পক্ষে ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা, ছল করা প্রেমের বেদনা বিলাসই বোধ হয় বেশি মানায়। নারীর বেলায় সেটা বিপজ্জনক।

রামচন্দ্র বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : সখি সব কিছু খারাপ দেখা সহজ, কিন্তু মহৎ কিছু বিশ্বাস করা কিংবা চিন্তা করা আরো কঠিন। মানুষকে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট করে ভাবি না। অসহায় ভেবে অপমানও করি না। কিন্তু তুমি একটু অন্যরকম। আমার বিস্ময়!

শূর্পণখা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। যখন বলল কণ্ঠস্বর তার কেঁপে গেল। এসব কোনটাই আপনার মনের কথা নয়। মনের কথা বলতে এত সরম কেন? ভয়টা কোথায়?

ভয় নয়!

শূর্পণখার বাঁকা হাসি—ধনুকের মতো বক্র হলো। বলল : তা হলে আস্থার অভাব? রাবণ ভগিনী বলেই হয় তো এই সতর্কতা।

রামচন্দ্র সহসা জবাব খুঁজে পেল না। ধীরে ধীরে অধরোষ্ঠে হাসি ফুটল। প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বলল : তোমার নিজের কথা তো বললে না।

আমার কথা! চমকানো বিস্ময়ে শূর্পণখা কথাটা বলে হাসল। হাসলে গালে টোল পড়ে তার। তখন ভারি সুন্দর দেখায়। চোখের কোণে মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল : রাবণ থাকতে দণ্ডকবনে আমার ভয় কাকে? খর দূষণ চোদ্দ হাজার চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে এ রাজ্যকে আগলে রেখেছে। শত্রুর সাধ্য কি আমার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়? এমন কি আপনারও সাহস হবে না গোপনে আমার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যের অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

নীল নদীর মতো রামের দুচোখ সমবেদনায় নিবিড় হয়ে উঠল। বলল : ব্যথার সমুদ্র থেকে কথাগুলো ওঠে এল যেন তোমার। রাবণ তোমার ভাই হলেও তার প্রতি তোমার অনেক রাগ অভিমান জমা হয়ে আছে।

সে কথা জেনে আপনার লাভ কী? আপনি তো রাবণের শত্রু হয়ে দক্ষিণারণ্যে এসেছেন। সুতরাং, আপনি হারলে এই মেলামেশার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে আমায়। আপনি জিতলেও আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বিদায় দিতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না। সুতরাং তাকে ছেড়ে আপনার পক্ষ নেব কেন? আপনার কী ভবিষ্যৎ বলুন? আপনারা উভয়ে হারলেও আমাকে তো বাঁচতে হবে। বিস্বাদ রাজনীতির তাপে কেন যেন হাঁফিয়ে উঠেছি। শীঘ্রই নিজের বুদ্ধিতে কিছু করার দিন আমার আসবে।

হুম্, তোমাকে এসব কথা বললে কে?

খর বা দূষনের কেউ বলেনি। একটু ইতস্তত করে বলল : কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ বলেছে। ছোট থেকে রাবণের সঙ্গে তার রেষারেষি, মন কষাকষি আছে। তার ইচ্ছে লঙ্কার রাজা হওয়া। এ আকাঙ্ক্ষা তার আজকের নয়, অনেক কালের। সম্প্রতি ইচ্ছেটা প্রবল হয়েছে। রাবণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য একটা অজুহাত খুঁজছে।

রামের অধরে বাঁকা হাসি খেলে গেল। বাম চোখ কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। সবিস্ময়ে বলল : তাই নাকি? সর্ষের মধ্যে ভূত!

বড় বড় দুই চোখে বিরক্তি, উষ্মার আগুন ঢেলে দিয়ে শূর্পণখা বলল : তা ছাড়া উপায় কী? একদিন তো আর্যাবর্তের সঙ্গে আপনারও বনিবনা হয়নি। রেষারেষি আর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সিংহাসনের অভিষেকও বন্ধ হয়ে যায়। অপমানের প্রতিশোধ নিতে অনুগত ও আপন দলভুক্ত মুনি ঋষিদের পরামর্শে ও সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে আসা স্থির করলেন। নিজেকে যোগ্য করে ভারত ত্রাস

লঙ্কেশকে জয় করে আর্যাবর্তের নরপতিদের উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছেন। তারা আপনাকে ভয় করুক, সমীহ করুক, মেনে চলুক, বাধ্য থাকুক অনুগত ও অধীন হোক। এটাই তো আপনারা চাওয়া। সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়ার জন্য লঙ্কেশকে হারানো আপনার জরুরী। লঙ্কেশের এই হারটাই আপনার জয়ের নিশান। তাকে হারানোর জন্য তেরো বছর ধরে প্রস্তুত হয়েছেন। প্রতীক্ষা করছেন। এখনও জয়ের আশায় কতদিন কাটবে, কে জানে? ছক মতো সব কাজ শেষ পর্যন্ত হবে কি না আপনিও জানেন না। তবু আশা নিয়ে একা এগোচ্ছেন। সব মানুষের একটা প্রত্যাশা থাকে। প্রত্যাশা করেই সে দুর্গম পথে পাড়ি দেয়। পাহাড়ে উঠে, সমুদ্রে ভাসে, মরুভূমি পার হয়। প্রত্যাশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে সাফল্য ও ব্যর্থতা পাশাপাশি নিহিত থাকে। কিন্তু কোনটার কথা ভেবে বিচলিত কিংবা ভারাক্রান্ত হয় না। গন্তব্যপথে চলকানো নদীর স্রোতের মতো উন্মত্ত উৎসারে দৌড়ে যায়। সবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। যাদের থাকে তাদের কম বেশি যোগ্য হওয়ার ক্ষমতাও থাকে। যার তা নেই, নিরুত্তাপ, একঘেয়ে জীবন ভিতরে ভিতরে তাকে যন্ত্রণা দেয়। বাইরে থেকে তার ভেতরের যন্ত্রণা বোঝা যায় না—খাচ্ছে, দাচ্ছে, কাজ করছে, হাসছে, কিন্তু অভ্যেস আর একঘেয়েমি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে তার ভেতরটা। তথাপি তারা বোঝে না এমন করে বাঁচাকে বাঁচাই বলে না। ঐ অবস্থা থেকে যারা বেরিয়ে আসতে চায়, মরিয়া হয়ে তাদের জানান দিতে হয় বাঁচাটা কাকে বলে? তাই তো মানুষ আমরা। বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব।

বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকাল রামচন্দ্র। অভিভূত গলায় বলল : চমৎকার! এভাবে আগে ভেবে দেখিনি আজ নতুন করে চিনলাম নিজেকে। তোমার কথাটা হয়তো ঠিক। রাবণকে জয় করাটাই আমার সবচেয়ে বড় জেতা। একজন মানুষকে জয় করার স্বপ্ন নিয়ে আমরা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। কেবল কৌশল আলাদা। আমার এবং তোমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাজনীতির খেলা খেলতে বসে দু'জনেই অনেক কিছু ভেজাল ব্যবহার করছি। অবশ্য সেজন্য আমার বা তোমার কোন দুঃখ কিংবা অনুশোচনা নেই! কারণ, জীবনে চলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়ায়—সত্যকারে একজন বীর হতে চাও, না ভীরু হতে চাও? কোনটা? তোমাকেই স্থির করতে হবে। জীবনের নীতিবোধ দু'রকম : দুর্বলের ও সবলের। যে দুর্বল তার নীতিবোধ মানিয়ে নেয়া, সে হয় সাধারণত শান্ত, শিষ্ট, সদাচার আশ্রিত। আর যে সবল, যে স্রষ্টা, সে নিজের নীতিমালার রচয়িতা নিজেই। নীতিবোধের বাধা চৌহদ্দির মধ্যে তাকে ধরে না।

কথা বলার সময় শূর্পণখার গলার স্বর কেঁপে গেল। বলল : আসল কথাটা কিন্তু আমরা কেউ বলছি না। এখনও সন্দেহ রয়েছে। বিশ্বাস করতে তাই ইতস্তত করছি। কেন করছি কে জানে? আমার যা বলার ছিল, বলেছি। এখন শুধু এটুকু বলতে চাই যে দায়িত্বই আমাকে দিন না কেন, আমি যথাসাধ্য পালন করব। আমাকে বিশ্বাস করে আপনি ঠকবেন না।

রামচন্দ্র হেসে বলল : সে আমি জানি। দাক্ষিণাত্যের মানুষ যেভাবে আমার সংকটে একজোট হয়ে দাঁড়াল তাতে অভিভূত আমি। সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তো বসে আছি। মুখে বলে সেকথা বোঝাতে হয় কী?

।। তেরো ।।

রামচন্দ্রের ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি অত্যন্ত জটিল ও কুটিল। অস্ত্র নিয়ে যে লড়াই হয় রামচন্দ্র সেই অভিযান পরিহার করে মানুষের মনের অন্দরমহলে বিনম্র আচরণের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। মনকে ও আত্মাকে আবিষ্কার করে তাকে চমকে দিয়েছে। পরম শত্রুও বৈরীতা ভুলে কখন অন্যতম মিত্র হয়ে যায়, টের পায় না। মনের মন-এর আধখানা তাকে দিয়ে বসে। শূর্পণখার ক্ষেত্রে তাই হল।

শূর্পণখার সঙ্গে রামের গভীর মেলামেশাকে কেন্দ্র করে বেশ একটা মনোমালিন্যের পালা চলছিল রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মধ্যে। সীতার আশঙ্কা মায়াবিনী রমণী রামকে জাদু করেছে। রামচন্দ্রকে নির্বোধ ভাবতে সীতার কষ্ট হয়। কারণ তার স্বামী অত্যন্ত চতুর, বুদ্ধিমান, সৎ, ধার্মিক, চরিত্রবান, বিবেকবান,

নীতিনিষ্ঠ। কোন অন্যায়-অধর্ম করে না। তবু দুর্বল মনটা অস্থির হয়। রামের জন্য তার ভাবনা হয়। সে বড় বেপরোয়া, সব কিছুতে একটু বেশি ঝুঁকি নেয়। তাই আশঙ্কায় ক্ষতবিক্ষত হয় মন।

রামচন্দ্র যে মন নিয়ে মেশে সে মনকে দেখার চোখ শূর্পণখার নাও থাকতে পারে। কার মনের কি কথা, মনই জানে। একসঙ্গে পাশাপাশি থাকলে এক ধরনের মায়া জন্মে, একটু একটু টানও হয়। আপন লোক মনে হয়। বাড়ীর কুকুর বেড়ালের প্রতিও এক ধরনের গভীর মমত্ববোধ জন্মায়। শূর্পণখা তো পতিহীনা রক্তমাংসের মানবী। তাকে বিশ্বাস নেই। সে রাক্ষুসী। শরীরকে খুশি রাখাই তাদের ধর্ম। পাপ পুণ্যের কোন বালাই নেই তাদের। পুরুষকে প্রলুব্ধ করা, নষ্ট করা, ধ্বংস করা তাদের চরিত্র। তাদের পাল্লায় পড়লে পুরুষ মানুষের পৌরুষ থাকে না। সর্বক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। রামচন্দ্রেরও সেই অবস্থা। দুর্ভাবনার মধ্যে তাই সীতার দিনগুলো কাটতে লাগল।

রামচন্দ্র নিজেকে যত চতুর, বুদ্ধিমান মনে করুক, একজন রমণী কিন্তু সহজেই তাকে বোকা বানাতে পারে। নারীর শরীর, সান্নিধ্য এবং আকর্ষণ সেই চুম্বক। একজন রমণী চাইলে পুরুষ মানুষকে নরকে নিয়ে যেতে পারে। বিবেকবান মানুষও তার পাল্লায় পড়ে বিবেকহীন, নীতিহীন হয়। অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত ব্যক্তিও গোল্লায় যায়। সর্বস্ব খোয়ায়। নিজের অজান্তে ধ্বংস করার প্রবণতা তাকে ক্ষয় করে প্রতিদিন। দেহের ছোঁয়া লাগলে এক লহমায় পুরুষের জীবনটা ওলোট পালোট হয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, কর্তব্য, দায়িত্ব, মানবিকতা চুলোয় যায় নারীর এক চুমুতেই। দেহের কোষে কোষে রক্তের ছোটাছুটি পড়ে যায়। শূর্পণখা মেয়েমানুষ না হলে সীতার কোন উদ্বেগ, দুর্ভাবনা থাকত না।

একা থাকলেই এসব কথা মনে হয়। অমনি ভয়ে ভেতরটা কুঁকড়ে যায়। রামকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। মাঝে মাঝে জীবনে এমন দুর্দৈব মুহূর্ত আসে যখন সব থেকেও কিছুমাত্র থাকে না। অনেক পেয়েও মনে হয় তার কিছুই পাওয়া হল না। অথচ, রামকে খুশি করার জন্য কত কি করেছে। দিয়ে থুয়ে নিজেকে নিঃস্ব করেছে, তবু তার মন ভরেনি। বড় অকৃতজ্ঞ রাম। শূর্পণখার সঙ্গে মেলামেশার জন্য সে একটুও লজ্জিত কিংবা অনুতপ্ত নয়।

রাম মুখে যতই বলুক তার জন্য ভাবার দরকার নেই, তবুও ভাবনা হয়। শূর্পণখা তাকে জাদু করেছে। সে যে শূর্পণখার খপ্পরে পড়ে নিজের অজান্তে নিজেকে ধ্বংস করছে এ অনুভূতি এখন তার কোথায়? শূর্পণখা বৈরীতা ভুলে রামের মিত্র হয়েছে, একথা সীতার বিশ্বাস হয় না। তাকে বিশ্বাস করে রামচন্দ্র ভুল করছে, অজান্তে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। শূর্পণখাকে দিয়ে রাবণ পরাভবের জমি তৈরী হবে এই বিশ্বাসের রন্ধ্র পথ ধরে রাম নিজের সর্বনাশ, ধ্বংস, পতনকে অনিবার্য করছে। মায়াবী ছলনায় শূর্পণখা রামকে বোকা বানিয়েছে। তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নিজের ভাল মন্দ জ্ঞান হারিয়েছে। সীতার দুর্ভাবনা সেই জন্য। মাঝে মাঝে তাই এক গভীর কষ্টে বুকখানা টাটায়। রামের ভাবনার সঙ্গে শূর্পণখার চিন্তার মিল নাও হতে পারে। তার মুখের কথা মর্মের কথা নয়। রাবণ নিজের জন্য ভগিনী শূর্পণখাকে নিয়োগ করতে পারে। রামের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য রাবণ সম্পর্কে অনেক মিথ্যে কথা শূর্পণখা বানিয়ে বলছে। আর রাম সেগুলো বিশ্বাস করছে। শূর্পণখার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। একবারও ভাবছে না শূর্পণখা তাকে ঠকাচ্ছে। ভাইর বিরুদ্ধে ভগিনীকে খাড়া করে রাবণের ঘর ভাঙার যে খেলা খেলছে রামচন্দ্র সেটা ভাইদের দ্বারা যতটা সফল হয়, ভগিনীদের দ্বারা ততটা হয় না। এখনও পর্যন্ত সেরকম দৃষ্টান্ত একটাও হয়নি। রামের বিশ্বাস শূর্পণখা রাবণের খবরদারি থেকে বাঁচার জন্য, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রামের সঙ্গে এক অদ্ভুত হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু ভগিনী হৃদয় কি পারবে সহোদর ভ্রাতাকে শত্রুর মুখে নিধনের জন্য ঠেলে দিতে? ভ্রাতার সর্বনাশের মুখে যদি তার মনে অনুতাপ জন্মে, অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তাহলে রামকে ভাইর হাতে ধরিয়ে দিতে তার একটুও সঙ্কোচ হবে না। রামের প্রাণহানির উৎকণ্ঠায় সীতার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

প্রতিহিংসার জন্য যে নারী আপন সহোদরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, সে নারীকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। লক্ষ্মণ বারংবার সাবধান করা সত্ত্বেও সেকথা বোঝে না রাম। বুঝতে চায় না বলেই সীতার সন্দেহ, সংশয় দৃঢ় হয়। প্রতিহিংসাময়ী মেয়েরা হিংস্র সাপিনীর মতো, যতক্ষণ বিষ উগরে না দিচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। প্রতিহিংসা মেয়েদের যতখানি নীচ করে ততখানি নীচ বোধ

হয় পিশাচীরা ইচ্ছে করলেও হতে পারে না। শূর্পণখার প্রণয়ের অভিনয় তার কোন ফাঁদও হতে পরে। রামকে ছলনায় ভুলিয়ে যে কোন দিন রাবণকে দিয়ে তাকে বন্দী করতে পারে। প্রধান প্রতিপক্ষকে হাতের মুঠোয় পেয়ে রাবণ হয়তো তাকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। শূর্পণখাও পারে রামচন্দ্রকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে। শূর্পণখা তো রামের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। রামকে বশীভূত করার জন্য রাবণের বিপক্ষাচরণের অভিনয় করছে অথবা বেশ কিছু কথা বানিয়ে রামের প্রীতি অর্জনের চেষ্ট করছে। রামের অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকখানা তার মোচড় দিয়ে উঠল।

রামের কাণ্ড দেখে সীতার লজ্জা হয়। লজ্জারও অবশ্য অনেক দিক থাকে। এ লজ্জা তার নারীত্বের। একজন রমণী হয়ে পুরুষকে ধরে রাখতে না পারার পরাজয়ের লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে তার বুক পুড়ে যায়। লজ্জা হয় এই কারণে যে সবশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রামের মেলামেশার ঔদার্যকে সে কোন দাম দিতে পারছে না এই মুহূর্তে। অভেদ করার শিক্ষা রামের মধ্যে নেই। সব মানুষের সঙ্গে তার মিষ্টি ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু শূর্পণখার সঙ্গে সেই মিষ্টি সম্পর্কটা মেনে নিতে তার কষ্ট হয়। বুকের ভেতর জ্বালা ধরা ঈর্ষায় চিনচিন করে। শূর্পণখার কাছে অসহায়ের মত হেরে যাওয়ার লজ্জা আত্মগ্লানির হুল ফুটিয়ে তার সব রক্ত শুষে নেয়। অথচ তার ভেতর একজন নারীর যা কিছু ভাল, সুন্দর-রূপ, যৌবন, সৌন্দর্য, শরীর, মনের সব কিছু পাওয়া পূর্ণ করতে পারে সে। হয়তো শূর্পণখার চেয়ে অনেক বেশি। তবু তাদের দু'জনের মিষ্টি ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে শূর্পণখাকে এনে ফেলে রাম তার পবিত্র প্রেমের সুন্দর অনুভূতিকে আবিল করে ফেলল বলে লজ্জা হয়, অভিমান হয় সীতার।

তবু অবুঝ মন প্রবোধ দিতে মন গড়া কত যুক্তি খাড়া করতে হয় তাকে। একজন পুরুষের জীবনে প্রত্যেক নারীর পরিচিতি ভিন্ন ভিন্ন রকম। প্রত্যেকটি সম্পর্কই আলাদা। তাকে যেভাবে রাম চায়, শূর্পণখাকে সেভাবে কখনও চায় না। তবু তাদের একটা মধুর সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্কের মধ্যে শরীরটাই বেশি। শুধু নারী মাংসের গন্ধের ঘ্রাণ নেয়ার জন্য রামের পাগলামির কথা মনে হলেই তার সারা শরীর গুলিয়ে উঠে। বড় নোংরা লাগে। রাম তার স্বপ্নের, তার কবিতার, সেই রাম শূর্পণখার শরীরের কাছে পৌঁছে গেলে তার গর্ব করার কিছু থাকবে না। শরীর পাওয়ার জন্য রামের এই কাঙালপনা এক গভীর লজ্জায় আড়ষ্ট করে তাকে।

রাম সম্পর্কে এসব চিন্তায় মনটা অস্থির হলে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলে, সে তো সর্বজ্ঞ নয়। তার ভাবনার ভুলও হতে পারে। তবু, অবুঝ মনের কাছে ওর নিজের এসব ভাবনার মূল্য কতটুকু? তার আকাশ পাতাল চিন্তা যদি মিথ্যে হয় তাহলে এক লুকোনো লজ্জায় নিজেই ছিন্নভিন্ন হবে। তখন রামের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবে কোন লজ্জায়?

এই চিন্তায় তার দিন কাটে। সন্ধ্যা নামে। রাত হয়। রামচন্দ্র ঘরে ফেরে। তার প্রফুল্লিত মুখের দিকে তাকাতে সীতার কেমন সরম হয়। কল্পনেত্রে দেখে কুচকুচে কালো যৌবন গর্বে গর্বিতা শূর্পণখা গোধূলির হলুদ রঙের আলো মেখে মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে ফিরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। পাতা ঝরা গাছের শুকনো পাতা তার পায়ে মচ্‌মচ্ করে বাজছে, আর তার বুকের হাড় মড়মড় করে ভাঙছে।

সীতার কিছু ভালো লাগে না। সর্বক্ষণ থম ধরা বিষণ্ণতা, নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। একা থাকতেই ভালোবাসে। কথা বলে কম। বলতে গেলেই চাপা অভিমানে গলা বসে যায়। বুকের ভেতর যে তার নীরব অদৃশ্য লড়াই চলছে, কেউ বলে না দিলেও লক্ষ্মণ অনুধাবণ করতে পারে। আর তখন রামের উপর খুব রাগ হয়। শূর্পণখাকে দোষী সাব্যস্ত করে। সীতার মনের সুখ এবং শান্তি তার জন্য যেতে বসেছে। সে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর তীব্র সহমর্মিতা। যে সহমর্মিতা লক্ষ্মণকে শূর্পণখার প্রতি বিরূপ করে তুলল। ক্ষমাহীন ক্রোধে তার ভেতরটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তার মুখের ভাবটাই পাল্টে গেল। রামচন্দ্রের মতো নিজের সঙ্গে মিথ্যে ছলনা কিংবা অভিনয়ে সে দক্ষ নয়। মিথ্যাচার ব্যাপারটা তার ভেতর একেবারেই নেই বলে এই ভণ্ডামির পৃথিবীতে তার সব ঝগড়া নিজের বিবেকের সঙ্গে। আত্মমুগ্ধ স্বার্থসন্তুষ্ট পৃথিবীতে তার মতো মননশীল ভাবপ্রবণ মানুষেরা কষ্ট পায়। সীতার কষ্ট দেখে তার নিজের যে এতখানি কষ্ট হতে পারে ভাবতে পারেনি। তবু এই অসহায় মানুষটির জন্য কিছু করতে

পারেনি। আর নয়, এবার একটা কিছু না করলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। রাগে আর চিন্তায় লক্ষ্মণের মুখখানা কুৎসিৎ হয়ে উঠল।

বহুদূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ, রথের চাকার ঘরঘর আওয়াজ, ঘোড়ার গলার ঘন্টির আওয়াজ ভেসে এল। লক্ষ্মণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সাদা ঘোড়ায় টানা রথে শূর্পণখা চলেছে মন্দগতিতে। চড়াই উতরাই ভেঙে ভেঙে রথ আসছে। পঞ্চবটীর দিকে আসছে। ঠিক যেন যুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী বিজয়ী সম্রাটের মতো। গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। শূর্পণখার প্রতিমার মতো মুখ, বুক, টিকল নাক, টানা টানা চোখ, অনুপম লাবণ্যময়। সোনার অলঙ্কারে মোড়া সারা শরীর। পড়ন্ত বিকেলের সোনা ঝরা রোদ পড়ে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

লক্ষ্মণ স্তব্ধ হয়ে তাকে দেখছিল। কৃষ্ণাঙ্গিনী শূর্পণখার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া কিংবা তাকে অবহেলা করে চলে যাওয়া যে কোন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষেও কষ্টসাধ্য। আরণ্যক পরিবেশে, রথে তাকে বনবিহারিণী বনদেবীর মতো দুরন্ত দুর্জয় দেখাচ্ছিল। অরণ্যের নশ্বরী মানবী। তার দীপ্ত যৌবন, উচ্ছল তারুণ্য কামনার অঙ্গার নয়, লালসার বহ্নি নয়, আকাঙ্ক্ষার সিন্ধু, পূর্ণতার শিখা, প্রতিহিংসার প্রতীক, মরণের হেতু। এই শূর্পণখা রামের মত নরম মানুষদের জীবনে অনেক অশুভ ডেকে আনে। এরা সহজেই এদের ফাঁদে ধরা পড়ে। অনেক কিছুই বাধা দেয়। কিন্তু দরকারে আঘাত দেওয়া বা পাওয়ার জন্য মোটেই প্রস্তুত থাকে না। হয়ত কঠিন হওয়া এদের ধাতে নেই। কিংবা একটা কিছু পাওয়ার লোভ, প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে। এও এক রকমের দুর্বলতা। এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। রাম এমনিতে চিরদিন ধীর স্থির, শান্ত সংযত, বিচক্ষণ, হৃদয়বান, অনুযোগহীন এক মানুষ। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তবু তারও কিছু কিছু দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার কাছে রামচন্দ্র সত্যিই অসহায়। মায়াবিনী শূর্পণখার কাছ থেকে ভ্রাতাকে ফেরাতে হলে তাকেই কঠিন হতে হবে।

অনেককাল পরে আবার তাড়কা রাক্ষসীর কথা মনে পড়ল লক্ষ্মণের। কিশোর বয়সের ভয়ঙ্কর সে স্মৃতি এখনও ম্লান হয়নি। তাড়কার কথাগুলো তার কানে ভয়ঙ্কর নির্ঘোষে বাজে। আমরা দানব, আর্য নই। তোমাদের মতো দস্যু নই। অন্যের রাজ্যদখলের চেষ্টা করি না। যে যার নিজের সীমানায় শান্তিতে বসবাস করি। অকারণ হামলা সৃষ্টি করে কাউকে বিরক্ত করি না, কারো শান্তি নষ্ট করি না। দানব পুরুষদের নামে তোমরা নারীহরণ এবং ধর্ষণের অনেক অপবাদ দিয়েছ, বর্বর বলে তিরস্কার করেছ, কিন্তু নারীকে তারা সম্মান করে। প্রেমের মর্যাদা দেয়। আর, তোমরা দস্যুর মতো নারীর কৌমার্য এবং পাতিব্রত্য হরণ করে তার সুখের নীড় ভেঙে দাও। তাকে দাসীতে পরিণত কর।

তাড়কার অভিযোগের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, লজ্জায় তারা দু'ভাই মাথা হেঁট করেছিল। বিশ্বামিত্র মৌনতা ভঙ্গ করে সরোষে জবাব দিল: এর উত্তর কথায় হয় না দুর্বিনীতা; যুদ্ধ করে তার জবাব দিতে হয়। ধর অস্ত্র, কর সংগ্রাম।

জ্বালাধরা ঘৃণা ও ক্রোধে তাড়কার দুই চোখ ধক ধক করতে লাগল। কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বলল: তোমার ক্ষাত্ররক্তে শোণিতের তৃষ্ণা মেটেনি এখনও। তুমি শুধু রক্ত ঝরাতে পার, প্রাণ নিতে জান। তুমি মানুষ নও। নরমাংসের পাষণ্ড ঋষি।

বিশ্বামিত্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তেজিত হয়ে বলল : ভয় পেয়েছ সুন্দরী। যুদ্ধে ফয়সালা করে নাও নিজের ভাগ্য।

তাড়কার ঠোঁটে কৌতুক হাসি, চোখে বিদ্যুৎ বহ্নি। বলল : নারী বলে অবজ্ঞা করছ ঋষি? বেশ তোমার মনোবাঞ্ছাই পূরণ কর। কর যুদ্ধ ধর অস্ত্র।

বনের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া রথের দিকে চেয়ে লক্ষ্মণ বনস্পতির কান্ডে হাত রেখে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না। মুগ্ধতার ঘোর কাটার আগে শূর্পণখা তার সামনে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে বলল: বিদেশী বীর, তুমি কে? আমার রাজ্যে কেন এসেছ? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে কাকে? এটা আমার বেড়ানোর জায়গা। রোজ আসি। এই নদী আমার বড় প্রিয়। আমার বহু সুখ দুঃখ, আনন্দ বিরহের সাক্ষী এ নদী। এর সঙ্গে আমার অনেক অনেক কালের সম্পর্ক। কিন্তু তোমাকে তো আগে দেখেনি। তুমি কে?

ধরা পড়ে যাওয়ার একটা লজ্জায় লক্ষ্মণের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল। শূর্পণখার কথাগুলোর ভেতর এমন কিছু ছিল যা তার বুকে কাঁটা ফোটার মতো খচ খচ করছিল। পাছে শূর্পণখার রহস্যময়ী সন্ধানী দৃষ্টির ফাঁদে ধরা পড়ে যায় তার দুর্বলতা, তাই সে একটু বেশি জোরেই কাষ্ঠ হাসি করে উঠল: বাব্বা! কালে কালে কত দেখব? জংলীদের মুখে বোল ফুটেছে। তারাও ভদ্রলোক হয়ে গেছে। ইদানীং তাদের স্পর্ধা একটু বেশী হয়েছে। দোষ অগ্রজ রামচন্দ্রের। তার প্রশ্রয়েই তোমরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছ।

লক্ষ্মণের কথায় শূর্পণখা রাগল না। তার বড় বড় শান্ত দু'-চোখের নিরীহ দৃষ্টিতে আগুনের মতো রঙ। তার যৌবন ফাগুনের মতো। ঢেউ খেলানো কালো চুলের বাহার, চোখের দ্যুতি, দৃপ্ত ভঙ্গির দিকে অবাক মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে রইল। একমুহূর্তে দূরের আকাশ এবং পাহাড়ের মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অন্য মানুষ হয়ে উঠল। হাসি হাসি মুখ করে শূর্পণখা বলল : রাগলে তোমাকে সুন্দর দেখায়। ফর্সা মুখখানা আগুনের মতো গনগন করছে, কানদুটো তেতে উঠেছে, চোখের তারা দুটো খদ্যোতের মতো ধক ধক করছে। হঠাৎ আমায় দেখে তেলে-বেগুন জ্বলে উঠলে কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি। আমাদের কোন ঝগড়াও হয়নি। তবু তোমার চক্ষুশূল হয়ে উঠলাম। আজব ব্যাপার। শ্রীরামের মুখে তোমার ভ্রাতৃপ্রেমের অনেক গল্প শুনেছি। গল্পের সেই মানুষটির দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হলাম। আমি রাবণানুজ শূর্পণখা।

গলায় বিরক্তি ঢেলে উষ্মা প্রকাশ করে বলল: তোমার কাছেই আমি এসেছি। এটা যে তোমার বিচরণভূমি আমি জানতাম। ফয়সালা করব বলে জেনেশুনে এসেছি। আমার আগমন নিরর্থক হয়নি।

শূর্পণখা কেমন একটু শঙ্কিত হয়ে হাসল। বলল: তোমার সঙ্গে আমার আবার ফয়সালা কিসের? সবেমাত্র আমরা পরস্পরকে চিনলাম। এখনো ভালো করে দুটো কথা পর্যন্ত হয়নি। স্বার্থ নিয়ে সংঘাত বাঁধেনি। তা-হলে ফয়সালার কথা আসছে কেন?

তুমি আমার ভাইকে কেড়ে নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছ। আমাদের ঘরের শান্তি নষ্ট করছ। তাই, তোমার প্রতি আমার কোন করুণা কিংবা সমবেদনা নেই। লোকে জানে আমি চিরদিনই একগুঁয়ে। একবার যা করব ভাবি, তাই করি। মেপেজুপে কথা বলা আমার ধাতে সয় না। স্পষ্ট কথাটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। তুমি আমাদের শত্রু। আমরাও তোমাদের শত্রু। আমাদের বন্ধুত্ব হয় না। তোমার জন্য আমাদের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। আমাদের শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনে তুমি ঝড় তুলেছ।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু সেজন্য আমার দোষ কতটুকু? মনের মধ্যে ঝড় উঠলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। সে ঝড় থামানোর দায়িত্ব তো আমার নয়। তোমাদের ঝড় নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। সামলাবে কি সামলাবে না সে তো তোমাদের ব্যাপার।

লক্ষ্মণ সরোষে গর্জন করে বলল : তুমি রাক্ষুসী মায়াবিনী। জাদু জান। তোমরা মানুষকে ধরে ভেড়া, ছাগল, গরু বানাও। ভুলে যেও না আর্যরক্ত আমাদের শিরায় উপশিরায়। রাজ সম্মান আমাদের জন্মগত অধিকার। আর তোমরা যত জংলী, অসভ্য বর্বরেরা আমাদের দাসানুদাস, অনুগ্রহ ও কৃপার পাত্র।

শূর্পণখার উচ্ছল চপল ভাব সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। নারীসুলভ অপমান এবং অভিমানে তার বুক ছলছলিয়ে, টলটলিয়ে উঠল। অস্থির উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল তার ভেতরে। ব্যথাহত দুই চোখের চাহনিতে নীরব তিরস্কার। বলল : রামানুজ লক্ষ্মণ বিভেদের বিষ ছড়িয়ে রামের সম্ভাবনার যাত্রার বিঘ্ন কর না। বহু দিনের প্রচেষ্টার বিভেদের প্রাচীর ভেঙে রাম কালো মানুষদের অন্তর জয় করে নিয়েছে। বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে তার অকাল মৃত্যু ডেকে এন না। কালো মানুষদের বিশ্বাসী মনে অবিশ্বাস সন্দেহ, বিভেদের জীবাণু ছড়িয়ে একজন সফল মানুষকে বিফল করে দিও না। সাদা-কালোর বিরোধ জীইয়ে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদের মদত দেয়া সহজ, কিন্তু তাতে সত্যিকারের সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হয় না। রামচন্দ্রের মতো উদারপন্থী মানুষ খণ্ড বিচ্ছিন্ন দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে একজোট করতে গিয়ে তোমার মতো বিচ্ছিন্নতাকামী আর্যপুত্রের বিরাগভাজন হয়েছেন। একি ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের শত্রুতা নয়? তোমার কথা থেকে এটা পরিষ্কার যে তুমি আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গের

পুরনো দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একচুলও সরনি। তাই রামচন্দ্র যখন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে তখন রামচন্দ্রকে তুমি আর মেনে নিতে পারছ না। তার নীতিকে সহ্য করতে পারছ না। তাই রামচন্দ্রকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে সরানো তোমার অভিপ্রায়। মুখে না বললেও তোমার কথাবার্তায় এবং আচরণে সেই কথাটাই প্রকাশ পাচ্ছে। কালো মানুষের প্রতি তোমার মনের ঘৃণা, বিদ্বেষের বিষোদগার করে বিভেদের বীজ বুনতে চাইছ, রামচন্দ্রের লক্ষ্যকে অপূর্ণ রাখার জন্য। সম্ভবত রামচন্দ্রের স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে আমাকে চটাতে চাইছ।

ক্রোধে লক্ষ্মণের দুই চোখ রক্তবর্ণ হলো। উত্তেজনায় কাঁপছিল তার সর্বাঙ্গ। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল : চুপ কর রাক্ষুসী। আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া, বিভেদ সৃষ্টি করার কুমতলব আমি সহ্য করব না।

শূর্পণখা লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ করার জন্য বলল : বিচ্ছিন্নতাবাদী আর্যাবর্তের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাকে রামচন্দ্রের কাছ থেকে সরালে তোমার স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাই না? কিন্তু সেটা রামচন্দ্রের কাছে যে কত বেদনাদায়ক হবে তা তুমি কল্পনাও করতে পার না। রামচন্দ্র যদি প্রশ্ন করে কার স্বার্থরক্ষার জন্য শূর্পণখাকে আমাদের শত্রু করলে তখন কী জবাবদিহি করবে ভেবে দেখেছ?

রাক্ষুসী, তুমি কালকেয় রাজ্যের একজন রক্তচোষা ডাইনী। রামচন্দ্রের ভালো মানুষির সুযোগ নিয়ে ভেতরে ভেতরে তার বিরোধিতা করছ। পাছে তোমার অভিসন্ধি ধরা পড়ে তাই আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ সৃষ্টির জমি তৈরি করছ।

আমি কিছুই করিনি। মনে মনে তুমি যা চাও, আমি শুধু সেই কথাটা বলেছি। আর তাতেই ভীষণ ভয় পেয়েছ তুমি। প্রবাদ আছে, মরুভূমিতে ঝড় উঠবার আগে উটেরা নাকি হামাগুড়ি দিয়ে বালিতে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। তারা নাকি আগাম ঝড়ের সঙ্কেত পায়। এই উটের মত তুমি হয়তো আমরা ও রামের সৌহার্দাপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ধ্বংস করতে চাইছে। মনের মন তোমার অগোচরেই তোমাকে টেনে এনেছে। একবারও ভেবে দেখনি রামচন্দ্র নিজেই কৃষ্ণবর্ণ বলে সহজেই কৃষ্ণাঙ্গদের আস্থাভাজন হলেন। দক্ষিণারণ্যের তাঁর এই জনমোহিনীশক্তি তোমাদের অবাক করে দিয়েছে। তাই তাঁকে সন্দেহ করছ। ভালো মনে মেনে নিতে পারছ না। অনার্য জনগণের চোখের মণি রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার মেলামেশাকে তোমরা সহ্য করতে পারছ না। আবার মেনে নিতেও পারছ না। আগ বাড়িয়ে কর্মসূচীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে হারিয়ে দিতে চাইছে। কারণ আর্যত্বের অভিমানে তুমি নিজেকে একরোখা, গোঁয়ার বলেছ। আর তাতেই তোমার ভেতরটা দেখা আমার সহজ হয়ে গেল। দর্পণের মতো স্বচ্ছ জলের সামনে দাঁড়িয়ে বর্বর যুগের নগ্ন মানুষও নিজের নগ্নতা দেখে লজ্জা পেয়েছিল। সভ্য সংস্কৃতিবান একজন আর্য নিজের মনের নগ্নতা দেখে যদি লজ্জায় বিচলিত না হয় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শূর্পণখার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ মেশানো উক্তিতে অপমানিত লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বালা করতে লাগল। বলল: তুমি আমার ও রামচন্দ্রের মধ্যে বিরোধিতা উস্কে দেয়ার তাল খুঁজছ। তোমার বিভেদ সৃষ্টির এই প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য তাড়কা রাক্ষুসীর মতো তোমাকেও হত্যা করতে হাত কাঁপবে না আমার।

শূর্পণখা বলল : সভ্য আর্যসন্তান জংলীদের চেয়েও যে বর্বর হতে পারে সে তো তোমার আস্ফালনেই টের পাচ্ছি। নারী বলে তাকে খাতির কর না তাও জানি। তাড়কা রাক্ষুসীকে হত্যা করা নিয়ে তুমি গর্ব কর। ছিঃ! তোমার পৌরুষের এ কলঙ্ক কোনকালে মুছবে না।

রাক্ষুসী!

গলা নিচু করে কথা বল লক্ষ্মণ। রক্তচক্ষু দেখিও উর্মিলাকে। আমার রাজ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে ধমকাচ্ছ, তোমার স্পর্ধা কম নয়। ভুলে যেও না এরাজ্যের সম্রাজ্ঞী আমি। আর তুমি অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী।

লক্ষ্মণ শূর্পণখার তিরস্কার এবং ভর্ৎসনায় থমকে যায়। সহসা কথা খুঁজে পায় না। ভেতরটা রাগে অপমানে ফুঁসতে থাকে। কেবলই মনে হতে লাগল এই রমণী রামের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাদের

ভ্রাতৃত্বে সঙ্কট সৃষ্টি করছে। খর ও দূষণ গোটা সীমান্তটা সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে। চারদিক থেকে একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অথচ রামচন্দ্র এসব কিছুই দেখছে না। মোহিনী রমণীর মোহে আটকে আছে তার সব চিন্তা-ভাবনা। অগ্রজকে সেই ফাঁস কেটে মুক্ত করার জন্য শূর্পণখাকে সরানো দরকার। নইলে তাদের জীবন অঙ্গনে ঢুকে পড়ে সে অশান্তি ডেকে আনবে। শূর্পণখার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎটা সুখের হলো না। কটুবাক্যে, উত্যক্ত করার জন্য রামের কানে বিভেদের বিষমন্ত্র ঢেলে দিয়ে প্রতিশোধ সে নেবেই। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দুরন্ত নিষ্ঠুরতায় তার ভেতরটা ভয়ঙ্কর নির্মম হয়ে উঠল। হঠাৎ অসি নিষ্কাশিত করে বলল: নৃশংসতার উদাহরণ তৈরি করতে লক্ষ্মণ ভয় পায় না। কথাগুলো বলেই অসি হাতে শূর্পণখার দিকে তেড়ে গেল; মারতে নয়, ভয় দেখাতে।

সেই মুহূর্তে রামচন্দ্র সেখানে এসে পড়েছিল। লক্ষ্মণকে শূর্পণখার দিকে তেড়ে যেতে দেখে পিছন থেকে রে রে করে ছুটে এল। কী কর, কী কর লক্ষ্মণ! তুমি কী পাগল হলে? স্ত্রীলোককে আক্রমণ করতে সরম হল না তোমার। রাগলে তুমি চন্ডাল। চিরকাল এক রকমই থেকে গেলে। ছিঃ! তোমাকে ভৎর্সনা করার ভাষা নেই আমার। ছিঃ! ছিঃ!

লক্ষ্মণ অধোবদন হল। অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।

শূর্পণখার মুখে চোখে আতঙ্কের ভাবটা কাটেনি। রামচন্দ্র অপরাধীর মতো সসঙ্কোচে তার দিকে তাকিয়ে বলল : সখি, তোমার কাছে আমার মুখ দেখানোর জো নেই। তুমি ওর অপরাধকে ক্ষমা করে দাও। ওর হয়ে আমি মার্জনা চাইছি। এটা হয়তো ভবিতব্য ছিল, তাই ঘটল। তুমি মন খারাপ করে থেক না। এই দিনটাকেও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। কে জানে এই ঘটনাটাই হয়তো একটা অচল অবস্থার অবসান করবে। ঈশ্বর যাই করেন তারই পিছনে যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে।

শূর্পণখা কোন জবাব দিল না। গলিত অশ্রু গাল বেয়ে নেমে এল। কিন্তু তার কান্নার কোন আওয়াজ নেই। হতাশ চোখে রামের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর রামচন্দ্রের কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য রথের দিকে দৌড়ে গেল।

যতক্ষণ না শূর্পণখার রথ চোখের আড়ালে গেল ততক্ষণ রাম সেখানে দাঁড়িয়ে রইল নিথর পাথরের মূর্তির মত। মনে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতি ও জটিল অনুক্ত প্রশ্ন পাক খেতে লাগল। স্তব্ধ হয়ে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের মুখের ভাব মন দিয়ে লক্ষ্য করল। যা দেখল তাতে তার শঙ্কা হল। অপরাধীর মত ভারাক্রান্ত গলায় স্বগতোক্তি করল। বলল: ভাইয়া, আমার মাথার মধ্যে হঠাৎ কী যে ঘটে গেল তা নিজেও ভালো করে জানি না। আমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। নিজেকে আমি নিজেই ক্ষমা করতে পারছি না। তবে একটা কথা শুনে রাখ, শূর্পণখা তোমার উদারতার সুযোগ নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধাতে চেয়েছিল। একথা তার মুখে শোনার পরেই আমার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এখন অনুশোচনা হচ্ছে। এই ঘটনা আমার চরিত্রে একটা কলঙ্ক হয়ে রইল। তোমার ভর্ৎসনা শুনলে আমার গ্লানি অবসান হবে।

রাম বলার মতো কথা সে মুহূর্তে খুঁজে পেল না। সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্মণের মুখে কি যেন খুঁজল। বিষণ্ণ গলায় বলল: ভাবার যখন দরকার ছিল, তখন ভাবনি, এখন অনুশোচনা করা কিংবা আত্মগ্লানি ভোগ করার কোন সার্থকতা নেই। অনিষ্ট যা হওয়ার হয়ে গেছে, শীঘ্র কিছু একটা ঘটবে তার জন্য প্রস্তুত হও।

ভাইয়া, আমার ভুলে কী এসব হল?

অনুতাপ করার কিছু নেই। হয় তো এ ভালোই হলো। শূর্পণখাও চাইছিল একটা কিছু হোক। খর ও দূষণের হাত থেকে বেচারা মুক্তি চাইছে। তোমার হঠাকারিতার রক্তপথ ধরে শূর্পণখার জীবনে যদি সেই মুক্তি আসে তা হলে অবাক হয়ো না। শূর্পণখা নিজের প্রয়োজনে ঘরে আগুন লাগাতে চায়। তার একার বুকের আগুনে গোটা রাক্ষসবংশ পুড়ে ছারখার হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আমার মেলামেশাটা ছিল তার ইন্ধন। তোমরা মিছেই আমার কথা ভেবে কষ্ট ভোগ করছিলে। তার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক স্বার্থের। বলতে পার একটা নাটক, অভিনয়। শূর্পণখারও হয়তো তাই। আমাদের সম্পর্ক বড় পলকা।

।। চৌদ্দ ।।

শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে খর ও দূষণ রামচন্দ্রের হাতে পরাজিত ও নিহত হল। শূর্পণখা এই প্রথম জানল রামচন্দ্র একা নয়, তার অগণিত সেনা দক্ষিণরণ্যের মধ্যে লুকোনো আছে মুনি ঋষির আশ্রমে। যে মুহূর্তে খর যুদ্ধ ঘোষণা করল, তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের বিশাল বাহিনী চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ধরল। রামের অভিনব চক্রব্যূহের মধ্যে আটকা পড়ে খর ও দূষণের সৈন্যরা অসহায়ের মতো মৃত্যু বরণ করল। চারদিকে ছড়িয়ে রইল মানুষ, ঘোড়া এবং হাতির মৃতদেহ।

খর ও দূষণের মৃত্যুটা শূর্পণখা মনে মনে ভীষণভাবে চেয়েছিল। কারণ তারা থাকতে তার অধীনতা ঘুচতে না। আসলে, সে একটু নিজের মতো থাকতে চেয়েছিল। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের পথের কাঁটা ছিল। রাবণের বিশ্বস্ত দুই অনুচর খর ও দূষণ সর্বক্ষণ আগলে ছিল তাকে। এদের সরানোর জন্য লক্ষ্মণের হঠকারিতাকে তার মর্যাদাহানির প্রসঙ্গ করে রাবণকে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করল। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারার পথ খুলে গেল। তাকে ও রামকে নিয়ে যে অবিশ্বাস সন্দেহ এবং ভুল বোঝা বুঝি হচ্ছিল তার যেমন অবসান হল তেমন খর ও দূষণকে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার জন্য তাদের মৃত্যু সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ হল না। তার বিশ্বস্ততার গায়েও আঁচড় লাগল না। রাবণের কাছে নির্দোষ থাকার কোন অন্তরায় হল না। এতে ক্ষতি যা হল তা রাবণের একার। তার পরাজয়ের ফলে, গোদাবরী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এক এলাকা রামের দখলে এসে গেল। কিন্তু শূর্পণখার রাজ্যের দখল সে নিল না। কিংবা তার হাত থেকে শাসনদন্ড কেড়ে নিল না। তার সাম্রাজ্য তারই থাকল। কার্যত কিছুই হারাতে হলো না তাকে। কালকেয়'র মহারাণীর মর্যাদা অটুট রইল। রামের এই অদ্ভুত খেয়ালের কোন জবাব খুঁজে পেল না শূর্পণখা।

লক্ষ্মণ যে অসম্মান করেছিল তার শোধ নিতেই একটা বড় যুদ্ধ হয়ে গেল। রামকে বহু কষ্টে অর্জিত অস্ত্র এবং সৈন্য দুই হারাতে হলো অনেক। তবু তাকে ক্ষমা করল। এটা রামের কোন উদারতা, বা মহত্ত্ব নয় রাবণের চোখে তাকে সন্দেহের পাত্র করে তোলার এক অভিসন্ধি মনে হল শূর্পণখার। রামের সঙ্গে তার শুধু মাখামাখি ছিল না, একটা যোগসূত্রও ছিল। তাদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়ার যে একটা ব্যাপার ছিলই এটাই রাবণের চোখে আঙুল দিয়ে রাম দেখাত চাইল।

রাবণের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল রামের অভিসন্ধি। এই কুমতলবকে শূর্পণখা ভালো মনে নিল না। রাম তার কাছে কী চায়, রামই জানে। রাজ্যের দখল না নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার ভেতর তার কোন মহত্ত্ব কিংবা বদান্যতা আছে বলে মনে হল না শূর্পনখার। কারণ, রাম যাই করছে নিজের জন্য। যুদ্ধের পরে তাদের বন্ধুত্বও মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস পল্‌কা হয়ে গেছে। তবু রাম তার রাজ্য ফিরিয়ে দিল। তার নির্লোভ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যই করল। পাছে, নারী নির্যাতনের কলঙ্ক তার চরিত্রে লাগে, শূর্পণখা কোন মিথ্যে প্রচারের সুযোগ নেয় তাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করল না। রাম ভালো করেই জানে, শূর্পণখা তার কোন উপকার করতে পারবে না, কিন্তু তার সমূহ ক্ষতি করতে পারে, তার উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিতে পারে, জনতাকে খেপাতে পারে; তাই কৌশলে রাম তার সব প্রয়াসকে অর্থহীন করে রাখল। হেরে গিয়েও যে সাম্রাজ্য হারায় না, শাসনের অধিকার বঞ্চিত হয় না সে কেমন করে মানুষকে বোঝাবে, বিশ্বাস করাবে যে, রাম অত্যাচারী, ভন্ড, কপট। তাছাড়া যুদ্ধ তো রাম করেনি, খর ও দূষণ যুদ্ধের মধ্যে তাকে টেনে এনেছে। রাম সংঘর্ষে বিশ্বাসী নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় বন্ধন ঘটিয়ে তার হৃদয় জয় করে সাদা কালোর সীমারেখা মুছে ফেলেছে। মুনি ঋষিরাও সমান ভাবে তার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। কালো মানুষের বিশ্বাস জন্মেছে রামচন্দ্র বিভেদ, বৈষম্য বৈরীতার অবসান ঘটিয়ে এক নতুন দুনিয়া গড়তে চায়। বাস্তবে তারা দেখল সংঘর্ষের পথে যে জয় সে তার কাম্য নয়। হৃদয় জয়ে বিশ্বাসী। শূর্পণখার বিরোধিতা জয় করতেই চেয়েছিল। তবু তার পক্ষ থেকেই রামের উপর আক্রমণ হল। লোকের ধারণা জন্মাল সংঘাত যখন অনিবার্য হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য, আদর্শের জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এমন অস্ত্র ধরে রাম যাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে সে। হয়েছেও তাই। এ দোষ রামের নয় শূর্পণখার।

মানুষের চোখে শূর্পণখাই দোষী, সব অপরাধ তার। শূপণখার এখন মণিহারা ফণীর দশা। খর

ও দূষণ তার উপকারের চেয়ে অপকার করেছে। তার অবস্থা শাঁখের করাতের মতো—যেতেও কাটে আসতেও কাটে। রামের সাহায্য পাওয়া নিয়ে যেমন সংশয় আছে, তেমনি রাবণের আশ্রয়ে থেকে তার উপর স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। নিজেকে শূর্পণখার ভীষণ অসহায়, একা মনে হয়। সে ছাড়া আর কেউ তার চারপাশে নেই। বিদ্যুৎজিহ্বর শব ছুঁয়ে মনে মনে শপথ করেছিল: যারা নিজের সুখের জন্য, স্বার্থের জন্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল, আমাকে দুঃখ দিল, তাদের ঘুম কেড়ে নেব, শান্তিতে থাকতে দেব না, আমার কান্না তাদের বুকে হাহাকারের মতো বাজবে। আমার বুকের আগুনে তাদের সর্বনাশ হবে।'' শূর্পণখার দু'চোখের কোণ ভরে জল নামল। কথাগুলো তার অর্থহীন প্রলাপের মতো মনে হলো। নিজের শপথের কাছে হেরে যাওয়ার দুঃখ, কষ্টে তার ভেতরটা টাটাতে লাগল।

শূর্পণখার অনুশোচনা হয়। খর ও দূষণের জন্য তার এই অবস্থা। এই যুদ্ধটা না হলে তার প্রতিহিংসার পথ মসৃণ হতো। রামকে সামনে রেখে যে পরিকল্পনা করেছিল দীর্ঘদিন ধরে তা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। সব আশাই নির্মূল হলো। আর কোনদিন স্বামীহন্তা রাবণের বিপক্ষে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কৃপার পাত্র হয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

হেরে যাওয়ার যন্ত্রণায় শূর্পণখার ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। চিৎকার করতে ইচ্ছে করল, না, আমি হারব না, হারতে চাই না। হেরে যাওয়া বড় লজ্জার। হায়! অদৃষ্ট আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু কেন করল? আমি তার কী করেছি যে, আমাকে প্রতারিত করল?

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল শূর্পণখা। এক অদ্ভুত তিক্ততায় তার হৃদয় ভরে উঠল। শূর্পণখার একটাই চিন্তা এখন। বিদ্যুৎজিহ্বর শবদেহ ছুঁয়ে মনে মনে যে শপথ করেছিল, তার কী হবে? নিজেকে প্রশ্ন করল, পৃথিবীতে তার মতো দুঃখ জর্জরিত, আশাহত কেউ আছে? সম্ভবত না। এখন কী করবে? নিরুপায় উত্তরহীন জিজ্ঞাসার মধ্যে মনে জাগ্রত হল তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালা। যতক্ষণ মানুষ বেঁচে থাকে ততক্ষণ আশাও করে। আর যতক্ষণ আশা করে ততক্ষণই থাকে প্রতিশোধের সুযোগ। প্রতিশোধ গ্রহণের মতো তীব্র সুখ আর কিছুতে হয় না। প্রতিশোধের চিন্তাতেই তার মনকে শান্ত করতে চাইল।

রাবণের নায়কোচিত আত্মপ্রত্যয় নড়বড়ে হয়ে গেছে বলেই ভগিনীর সাহায্যে এগিয়ে এল না। পাছে রামচন্দ্রের সঙ্গে এক বৃহত্তর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাই নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করল রাবণ। আগ বাড়িয়ে রাক্ষসদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে যুদ্ধ করলে হিতে বিপরীত হতো, শূর্পণখা জানে। রামের স্তাবক দল তৎক্ষণাৎ চেঁচামেচি সুরু করে দিয়ে বলত, রাবণের নির্লজ্জ আক্রমণ রামের জনমুখী প্রগতিশীল সমাজ সংস্কার ও বৈপ্লবিক চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। রাবণ সংযত থেকে রামের সেই মিথ্যে অপপ্রচারের উত্তাপে জল ঢেলে দিয়েছে। এর ফলে, রাবণের গৌরব অটুট রয়েছে। কিন্তু পরোক্ষে তার পরাভবের লক্ষণগুলি প্রকট হয়েছে বলে মনে হল শূর্পণখার।

রামচন্দ্রের শক্তি এবং যুদ্ধ-কৌশল দেখার জন্য রাবণ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিজেকে জড়াল না। কিন্তু তাতে কৃতিত্ব এবং গৌরব তার অর্ধেক হয়ে গেল। রাবণের জবরদস্ত আত্মবিশ্বাস একটা বড় ধাক্কা খেল। দাক্ষিণাত্যে কালো মানুষদের উপর তার আধিপত্য ও প্রভুত্ব আলগা হয়ে গেল তার হাতের মুঠো থেকে। সাদা কালো মানুষের বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতির উপর রামচন্দ্র এক বড় আঘাত হানল। এতদিন যারা রাবণকে ত্রাণকর্তা মনে করত, রামচন্দ্রের সহৃদয় সান্নিধ্য, বন্ধুত্ব তাদের বিশ্বাস করতে শেখাল রাবণ তাদের রক্ষাকর্তা নয়, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু করেনি। লঙ্কার ঐশ্বর্য ও সম্পদ বাড়ানোর জন্য শোষকের ভূমিকা নিয়েছে। নিজের রাজ্যকে সোনার লঙ্কায় পরিণত করেছে। এসবই কালো মানুষের মেহনতের ফসল। সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে রামচন্দ্রের স্তাবকদের এই প্রচার কালো মানুষদের বিশ্বাসকে নাড়া দিল। কালো মানুষদের পদানত করে, রাক্ষসদের গৌরব বৃদ্ধির নামে রাবণ যত্রতত্র যুদ্ধ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাদের। এহেন মতলববাজ মানুষকে তাদের নেতা, রক্ষাকর্তা মনে করার কোন কারণ নেই। রাবণ সাদাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে কালো মানুষদের সর্বনাশ করেছে বেশি। আর কেউ না বুঝলেও শূর্পণখা অনুভব করতে পারে রাবণের যে ভাবমূর্তি দীর্ঘকাল জনমানসে মুদ্রিত হয়ে গেছিল তা এখন কিছুটা ধূসর এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভারত রাজনীতিতে এবং কালো

মানুষদের কাছে রাবণ তেমন জনপ্রিয় নয়। কিছুটা কোণঠাসা।

মনের মধ্যে কথাগুলো তোলপাড় করে ক্লান্ত করে তোলে তাকে। এ থেকে রেহাই নেই তার। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে শূর্পণখার। সত্যিই কিছু করতে পারে না সে। তার কোন ক্ষমতা নেই, বুদ্ধিও না, ঈশ্বর তাকে অকর্মণ্য, অক্ষম করে পাঠিয়েছে। স্বামী হন্তার উপর প্রতিশোধ নেয়ার সাহস, ও শক্তি তার নেই। এক নিদারুণ অসহায়তা তাকে গ্রাস করে। সব ভাবনাগুলো তখন তলিয়ে যায়। সে কথাও কাউকে বলতে না পারার কষ্টে বুক টনটন করে।

নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে শূর্পণখা বুঝল অসহায়তা আসলে মনের একটা সহায়হীন অবস্থা। অসহায় ভাবলেই মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে সব মানুষ একা। কেউ কারো নয়। প্রত্যেকে তার নিজের কাজ নিজেই করে। নিজের চেষ্টা ছাড়া সফল মানুষ হয় না কেউ। হার জিতের জীবনে হারের পাশাপাশি জেতাটাও আছে। জেতার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয় এক জীবনে। রাবণ, রাম—সবাই হেরে গিয়ে থেমে যায়নি। জেতার ইচ্ছে, উদ্যোগ আর সাহস নিয়ে প্রত্যাশা পূরণের সাধ নিয়ে একা একা এগিয়েছে। কারো জন্য তাদের প্রতীক্ষা ছিল না, কারো উপর নির্ভরও করেনি। একজন খঞ্জ মানুষও মনের জোরে পাহাড় ডিঙোয়, সমুদ্র পাব হয়। আবার একজন অন্ধও অন্যের সাহায্য ছাড়াই একা একা চলা ফেরা করে। শিশুও নিজের ইচ্ছেয়, চেষ্টায় এবং উদ্যোগে হাঁটতে শেখে, কথা বলে। যে মানুষ নিজেকে মর্যাদা না দেয়, নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে না জানে সারা জীবন নিজের কাছে তাকে হেরে যেতে হয়। নিজের অজান্তে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করে ভিতরে ভিতরে। হঠাৎই মনে হয় জীবনটা নিরর্থক নয়। খুবই সুন্দর। মানুষই তাকে অর্থহীন আর অসুন্দর করে ফেলে।

বড় বড় চোখ মেলে কুয়াশা মাখা অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। আকাশে ডুবন্ত সূর্যের লাল হলুদ আলো, নীড়ে ফেরা পাখীর ডাক, পাখা ঝাপ্টানোর শব্দ, পালকের, গন্ধ, নীল আকাশের, মাধুরী, মেঘের হরেকরকম রঙ সবই সুন্দর। গোটা প্রকৃতিলোক খুশি হয়ে চেয়ে থাকে অস্তগামী সূর্যের দিকে। শূর্পণখার মনে হয় যার যাতে সহজ অধিকার, তাতে সুখী না হলে-এ নয়, ও নয় বলে অন্য দিকে হাত বাড়ালে দুঃখ বাড়ে। মানুষ তো দাবার গুটি নয় যে খোপে খোপে বসিয়ে রাখবে। সে চলমান। এই অমোঘতা নিয়ে সে জন্মায়। তা হলে ভয় কিসের? প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে কি আর জন্মাবে? এই এক জীবনেই তাকে হয় জিতে নয় হেরে চলে যেতে হবে। হেরে যাওয়া বড় কষ্টের। কোন মানুষই হারতে চায় না। হেরে যাওয়া মানুষ মানুষই নয়। কে যেন কথাগুলো তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীব থেকে মর্মের ভেতরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল। মস্তিষ্কের মধ্যে কার ছায়া যেন নড়ে চড়ে।

ডুবন্ত সূর্যের কালচে রাঙা আলোর মধ্যে হঠাৎ মনে হল বিদ্যুৎজিহ্ব হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে তার দিকে। দুই চোখে তার মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। নীল আকাশের গায়ে তার অনাবিল হাসি লেগে আছে। বসন্তের বাতাসে শিউলির গন্ধ। নীড়ে ফেরা পাখির দল যে যার জায়গার দখল নিয়ে কলরব করছে গাছের শাখায়। হঠাৎই মনে হল মাঝ আকাশের সাদা মেঘের স্তূপের মধ্যে বিদ্যুৎজিহ্ব মুখ ডুবিয়ে বলছে; আমি জানি, তুমি খুব ভালোবাসতে আমাকে। আমারও কত সাধ ছিল তোমায় নিয়ে, এটা করব, সেটা করব। কিন্তু তোমার ভাই কিছু করতে দিল না। এখন আমার হাতে অনেক সময়। এখানে বসে আঁকব ছবি খুনের রঙে, রক্তের রঙ ছেনে। মৃত্যুর সব যন্ত্রণা, ব্যথাকে আনব টেনে। তোমার চোখের সেই অশ্রু সেই হাহাকার মিশিয়ে দেব ছবির দৃশ্যে ও রঙে। বুকে চমক দিয়ে তাই তো তোমায় ডাকি ওগো দুখ জাগানিয়া। ঘুমিয়ে থেক, না, এখন জেগে ওঠার সময়।

সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল পৃথিবীর সব রঙ শব্দ ও গন্ধ। বড় বড় গাছগুলো ভূতের মত দেখাচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। দু'একটা রাত জাগা পাখি গাছের ডাল ছেড়ে বসন্তের কুয়াশা মাখা অস্পষ্ট আকাশ থেকে দুরের নিকষ কালো আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। লোভীর মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে শূর্পণখা।

শরীরের অসংখ্য ধমনীতে রক্তের দপদাপানি অনুভব করল। একজন মানুষ বেঁচে থাকার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত দ্বেষ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসার এক গভীর যোগসূত্র আছে! এগুলো বোধ হয় একজন

ব্যক্তির তীব্রভাবে বেঁচে থাকার ব্যাপার এগুলোর মধ্যে লুকোনো আছে তার তীব্র জীবনী শক্তি। শূর্পণখার ভেতর হঠাৎ তার এক তীব্র আবেগ অনুভূত হলো। আত্মপ্রত্যয়ের আবেগে দৃঢ় হলো তার ভেতরটা। হৃদয়ের ভেতর তখন অন্য এক উত্তেজনা। অদ্ভুত এক অস্থিরতার জন্ম হলো তার মধ্যে।

শূর্পণখার সামনে এক কঠিন সংকট। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করল মনে মনে। কিছু না হারিয়ে রাম ও রাবণকে একসঙ্গে বিপাকে ফেলা এবং তাদের উভয়ের ভেতর একটা লড়াই বাঁধিয়ে দেয়া হবে তার নীতি। অথচ সে নিজে তার দায়ভাগী হবে না। সব দোষটা পড়বে রাবণের উপর। আর তার ঝক্কি পোহাতে হবে রামকে। এই ভাবেই একসঙ্গে দু'জনের উপর প্রতিশোধ নেবে। রামচন্দ্র নিজের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে রাবণের কাছে তাকে সন্দেহভাজন করার যে কূট মতলব এঁটেছিল তার উপর একটা বড় ধরনের আঘাত হেনে শূর্পণখা প্রমাণ করবে বিশ্বাসঘাতকতা একটা তীরের মতো যে ছোঁড়ে তার দিকেও ফিরে আসে। দরকার হলে সারা জীবন তার প্রতীক্ষা করবে সে। হয়তো এটাই তার অদৃষ্টের নিয়ম। অদৃষ্টই প্রতিহিংসার যন্ত্র করে তুলেছে তাকে।

এমন করেই হয়তো ইতিহাস তার আপন গতিপথ পরিবর্তন করে নইলে একদিন রামের পক্ষ নিয়ে যে ভাইয়ের সর্বনাশ করত তা যে আবার একদিন সেই ভাইয়ের ছত্রচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে রামের বিপদ ডেকে আনতে হবে তা কি ভাবতে পেরেছিল? জীবনে শূর্পণখার চাওয়া ছিল খুব সামান্য। বিদ্যুৎজিহ্বর অবর্তমানে সেটা ওলোট পালোট হয়ে গেল। সে আর ক্ষমায় বিশ্বাসী নয়। অনাসক্তিতেও বিশ্বাস করে না। এখন বাঁচাটা তার নিজের মতো করে, নিজের মধ্যে বাঁচা। বাঁচতে চায় সন্তানের মধ্যে। স্বামীর বংশপ্রদীপের মধ্যে। সেই বাঁচার পথে যে অন্তরায় হবে তাকে নিপাত করবে, নিঃশেষ করবে। যুদ্ধে নয়, কৌশলে। স্নেহপরায়ণ ভগিনীবৎসল রাবণ অসীম মমতায় তার দোষ, অপরাধ সব ক্ষমা করে নেবে। তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। সেই জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার খুব জরুরী ছিল। কিন্তু কোন মুখে রাবণের সামনে দাঁড়াবে?

আশ্চর্য মানুষের মন। রাবণের করুণাপ্রার্থী হওয়ার কথা মনে হতে নিদারুণ অপমানে তার ভেতরটা চিন চিন করতে লাগল। নিজের নিজেকে অসহায় মনে হল। বড় নিরুপায় হয়ে অদৃশ্য ভাগ্যের কাছেই অভিযোগ, আব্দার, আত্মসমর্পণ যা কিছু সব করতে হবে। মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য নিজেকে ভেঙে ভেঙে তৈরী করে।

অনেক ভেবে শূর্পণখা অকম্পনকে দূত করে লঙ্কায় পাঠাল। কারণ রাবণের মনোভাব পরখ না করে লঙ্কায় যাওয়া তার উচিত হবে না মনে করেই এরকম সিদ্ধান্ত নিল।

অকম্পনের সঙ্গে রাবণ সাক্ষাৎ করল না। কিন্তু অকম্পনও সাক্ষাৎ না করে কালকেয় রাজ্যে ফিরবে না বলে ধনুকভাঙা পণ করল। যতদিন দেখা না হয় ততদিন চুপ করে বসে থেকে সময় নষ্ট করল না। নগরীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াল। দেশের শত্রু রাক্ষসদের শত্রু রামচন্দ্র সম্পর্কে সত্য-মিথ্যে অনেক গল্প বলল সাধারণ মানুষদের মধ্যে। রামের বিপুল ক্ষমতা, ঐশ্বরিক শক্তি গোটা দক্ষিণারণ্যে তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। রামের কথা শুনতে এবং বলতে দক্ষিণারণ্যে মানুষ আনন্দ পায়। তিনি ঈশ্বর নন, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা তাঁর আছে। ঈশ্বরের মত তিনি যেমন রক্ষা করেন তেমনি ধ্বংসও করেন। মানুষের প্রতি তাঁর মমতার অন্ত নেই। বুক ভরা তাঁর প্রেম। তবু অভিসন্ধিপরায়ণ একজন মানুষ মনে করেই তাঁকে দমন করার জন্য কালকেয় রাজ্যের মহিষী শূর্পণখা খর ও দূষণের নেতৃত্বে অজেয় দানব ও রাক্ষসবাহিনী প্রেরণ করেছিল। বাইরে থেকে তাঁকে যতটা দুর্বল, অক্ষম এবং অসহায় ভাবা গিয়েছিল, আসলে তিনি তা নন। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই মিলে পলকে ধ্বংস করল তাদের। খর ও দূষণ প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারল না। কালকেয়'র পরাজয় হল। তবু মহান রামচন্দ্র কালকেয় দখল করল না। মহিষী শূর্পণখাকে বন্দী করল না। সাদা-কালোর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তার রাজ্য তাকেই অর্পণ করল। এর ভেতর কোন শর্ত ছিল না। দক্ষিণারণ্যের মানুষের বন্ধুত্ব সহযোগিতা ছিল তার একান্ত কাম্য। রাক্ষস জাতিরা মিথ্যে সন্দেহ করে

তাঁকে শত্রু করে রেখেছে। রাম তার অবসান চায়। আমাদের রাক্ষস জাতিরও ভাবার সময় হয়েছে, এভাবে মিলনের পথ আটকে রেখে আমরা নিজেদের ক্ষতি করছি। অহেতু উদ্বেগে, আতঙ্কে দিন কাটছে। এসবের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি চান সব বর্ণের সর্ব ধর্মের মানুষের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে, এক বিশাল ভারত রাজ্য গঠন করতে। আর্য-অনার্য, সাদা-কালো, রাক্ষস-অসুর-দানব এসব পরিচয় মুছে দিয়ে এক জাতি এক পরিচয় হবে সকলের। সকলেই ভারতীয়। রামচন্দ্র এসেছেন তার নেতৃত্বে দিতে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকে স্বীকার করে নিয়েছে কেবল রাক্ষসরাই পারেনি সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে। জাত্যাভিমান ত্যাগ করে গর্ব ও অহঙ্কার ছেড়ে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পারল না। এটা রাক্ষসজাতির লজ্জা, সঙ্কীর্ণতা; না দুর্ভাগ্য-ইতিহাসই বিচার করবে। আমরা ভারতীয়— এই পরিচয়ের বাইরে আমাদের কোন জাতি নেই এই বোধ জন্মালে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার ওপর যবনিকা পড়বে। এক নতুন ভারতবর্ষে সাদা কালোর অভিষেক হবে। এটা স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, একেবারে বাস্তব সত্য।

অবশেষে, অকম্পনকে ডেকে পাঠাল রাবণ। দু'জনের সাক্ষাৎ হলো গোপনে। কিন্তু তাকে দেখে রাবণের ভেতরটা রাগে জ্বলে উঠল অথচ মনে অদম্য কৌতূহল বোধ করল। একজন সাধারণ দেহরক্ষীর সঙ্গে এমন গুরুতর ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে রুচি হলো না রাবণের, তবু কিছু খবর বের করার তাগিদেই কথাটার সূত্রপাত করতে হল। বলল : ক'দিনের ভেতর সকলের চেনা হয়ে গেছ তুমি। রোজ অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর। কেউ কেউ তোমার কাছে আসেও, তাই তো?

অকম্পনের চোখে মুখে উৎফুল্লভাব ফুটে উঠল। বলল : তা আসে। আজও সকালেই ত্রিজটা, অবিন্ধারা, কলা এসেছিল বিভীষণের জন্য।

রাবণের কৌতূহল বাড়ল। বলল : বিভীষণ এসেছিল বুঝি?

আমি ওঁর অতিথিশালাতেই আছি, সেখানে আমাদের রোজ দেখা সাক্ষাৎ হয়।

খবরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য রাবণকে ভীষণ গম্ভীর এবং একটু অন্যমনস্ক করে দিল। কী প্রশ্ন করবে বুঝতে না পেরে কয়েকবারই বিচলিতভাবে উচ্চারণ করল: তাই বুঝি? তাই বুঝি? কেন? কেন?

অকম্পন একটু ভড়কে গেল। বলল : তা কী করে বলব রাজন?

বিভীষণের বুঝি রাজা হওয়ার খুব ইচ্ছে?

রাজা তো সবাই হতে চায়। লোভীরা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।

তোমারও তাহলে রাজা হওয়ার ইচ্ছে হয়।

আমার? আমি সামান্য একজন দেহরক্ষী। আনুগত্য এবং কর্তব্য পরায়ণতার জোরে মহিষী শূর্পণখার বার্তাবাহক হতে পেরেছি। এর বেশী লোভ আমার নেই। সাধ্যমত কর্তব্য করব। দেশের সেবা করব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করে যাব। রাজত্ব, সিংহাসনে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই একথা ঈশ্বরের নামে হলপ করে বলছি।

কিন্তু আমি যে শুনছি, তুমি রামের মহিমা কীর্তনে ব্যস্ত। লঙ্কার মানুষদেয় মন ভেঙে দেয়ার জন্য অন্য কথা বলছ। এক জাত, এক বর্ণ, এক ধর্ম এসব বলে বেড়াচ্ছ; কেন? এ কী লঙ্কার মানুষের মন ভাঙানোর খেলা নয়?

হ্যাঁ, মন ভাঙিয়ে নিচ্ছি স্বয়ং রামচন্দ্রের ঘর থেকে। নইলে কে রামের দিকে আর কে মহারাজ লঙ্কেশের দিকে, কারা রাবণ বিরোধী আর রামের অনুরাগী তার বাছাবাছির কাজটা সহজ করে দেয়ার জন্য রাম নামের টোপ ব্যবহার করেছি। লোভীরা টোপ গিলবে আর সত্যিকারে লঙ্কেশপ্রাণ মানুষগুলো তেড়ে আসবে আমার দিকে। আসল নকল বেরিয়ে পড়বে। এখন আমার কাজের দোষ গুণ মহারাজ নিজেই স্থির করুন।

অকম্পনের যুক্তি শুনে রাবণ চমৎকৃত হল। তবু বলল: তুমি হলে সুবিধাবাদী। নিজের স্বার্থকে বাঁচিয়ে কথা বললে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার কাছে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে—তোমার বুদ্ধির তারিফ করবি। কিন্তু যে ঢিলের লক্ষ্য রামচন্দ্র সে ঢিল তো আর রাবণের দিকে ফেরান যাবে

না। এতে রাবণের অপযশ যা হওয়ার হয়ে গেল। সাধারণ লোক তো আর তোমার মত করে বুঝবে না। তোমার এই অদ্ভুত চালাকির রহস্য আমি বুঝতে পারছি না।

মহারাজ অন্ধকার আছে বলেই আলোর জন্য প্রতীক্ষা থাকে। যেখানে দুয়ের একটা নেই সেখানে একটার অভাব অনুভব করবে কী করে? ভালো এবং মন্দ পাশাপাশি আছে বলে তার পার্থক্যটা মানুষ সহজে বুঝে নিতে পারে। নির্বাচনটা তার নিজস্ব। ভালো ফেলে মন্দ কেউ নেয় না। যারা মন্দ ব্যক্তি কেবল তারাই মন্দকে পছন্দ করে। কিন্তু মনে শান্তি পায় না। মহারাজ লঙ্কায় আজ এক আকাশের আলো এসে পড়ল। মনের গোপনে অন্ধকার থেকে ভালো মন্দ সব বেরিয়ে পড়ল আলোর অভিসারে। অপযশ যা ছিল চোখের আড়ালে সেটাই হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে বেরিয়ে এল ঠেলাঠেলি করে। যশ বেনো জলের মতো উপছে পড়ে নষ্ট হয় না। অক্ষয় ঘটে সযত্নে ভরা থাকে। কিন্তু কেউ যদি নিজে থেকে সে ঘট উল্টিয়ে না দেয় তাহলে, কারো সাধ্য নেই তার অপচয় করে। মহারাজ; আপনার ভাষাতে বলি যে ঢিলের লক্ষ্য রামচন্দ্র, সে ঢিলে আপনার অপযশের বদ রক্তটাই শুধু বেরিয়ে গেল। এজন্য তো আমার পুরস্কার পাওয়া উচিত।

রাবণের গলা থেকে একটা গম্ভীর আওয়াজ বেরোল : হুঁম! ভগিনী শূর্পণখা তোমাকে পাঠাল কেন? সে তো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তার সঙ্গে আমার আবার সম্পর্ক কী?

অকম্পন ফাঁপড়ে পড়ল। অবাক হওয়ার ভান করে বলল : মহারাজ ধৃষ্টতা মাপ করবেন। রক্তের এত বড় সম্পর্ক থাকতে আবার সম্পর্ক কী—মানেটা খোলসা হলো না।

রাবণ নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। অকম্পনকে এ প্রশ্ন করার মানেই নিজেকে বিদ্রূপ করা। মনের অভিব্যক্তি অকম্পনকে কিছুমাত্র বুঝতে না দিয়ে বলল : আমার কাছে খবর আছে রাম-লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে অপমান করার এক নাটক করে। আর তাতেই শূর্পণখা ক্ষিপ্ত হয়ে খর ও দূষণকে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করেছিল।

রাবণকে নীরব দেখে অকম্পন বলল : মহারাজ, কী বলব! এ আপনাদের ভাই-বোনের মান-অভিমানের নাটক। এ নাটকের নান্দীকারও আমি নই। তবে, বাস্তবকে মেনে নিতে মানুষের কোথায় যেন আপত্তি। জীবনে অনেক কিছু ঘটে, যা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন দুর্ঘটনাবহুল হতো না। রাম ও মহিষী শূর্পণখার যোগাযোগ তেমনি এক দুর্ঘটনা। আপনার অনুমতি হলে মহারাণী নিজেই এসব কথা বলতে পারেন। জনস্থানে আপনার সুনাম ও স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না তাঁর। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

তোমার মনে হওয়ায়, না হওয়ায় আমার কিছু যায় আসে না। তবে যে নাটক জনস্থানের আরণ্যক পরিবেশে হয়ে গেল তার একমাত্র নায়িকা কালকেয়র মহারাণী শূর্পণখা। তোমার মহারাণীকে বল, রাবণ অনেক আগেই এ বিষবৃক্ষ উপড়ে দিতে পারত। কেন যে করেনি সেটাই বুঝতে পারছি না।

মহারাজ, অধমের বিশ্বাস একটু অন্যরকম। আমাদের মহারাণীকে উপড়ে না ফেলে, লুফেও নিতে পারেন। নেবেনও। আমার তো তাই ধারণা।

বিশ্বাসঘাতকের কোন স্থান নেই রাবণের কাছে।

অকম্পন বিজ্ঞের মতো হাসি হাসি মুখ করে বলল : রাজনীতিতে সব হয়।

রাবণ কোন জবাব দিল না। তবে বর্তমান সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রাবণের আস্থাভাজন হওয়া এবং একজন যথার্থ ভগিনী হয়ে ওঠার বড় ইচ্ছে তার। সেজন্য অনেক কিছু করতে রাজি হবে শূর্পণখা। রামের সঙ্গে সংগ্রামে একটা ছোট ভূমিকাও নিতে প্রস্তুত। মুখে মুচকি হাসি ফুটল রাবণের। বলল : অকম্পন, তোমার মহারাণীকে আমি যতটা জানি, তুমি তার চেয়ে বেশি জান কি?

অকম্পন বলল : তা বটে। দাবি করলে যদি দাবি মানা হতো তা হলে হ্যাঁ বলতাম। কিন্তু সে কথা বলি কি করে? ভগিনীকে ডেকে তো আপনিই জেনে নিতে পারেন সব। আপনার জন্য মনটা তাঁর ব্যাকুল হয়েছে। অথচ, তাঁর প্রতি আপনার সে আস্থা কোথায়? আস্থাহীনতার অপমান নিয়ে কোন মুখে আপনার কাছে আসে?

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল রাবণ। খানিক পরে প্রশ্ন করল : এ অনুভূতি তোমার, না তোমার মহারাণীর?

এটুকু জানি, একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য সুখী নন তিনি, মনে তাঁর শান্তি নেই। তিনি যদি আপনার ভগিনী না হতেন তা হলে জীবনের পদে পদে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসম্মান কুড়োতে হত না তাঁকে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের কোন সুযোগও তাঁর নেই। বলতে বলতে অকম্পনের দুই চোখের কোটরে ব্যথা জমে উঠল।

রাবণের কপালেও বিস্ময়ের কুঞ্চন দেখা গেল। মনটাও গলে গেল। বলল : ভগিনীর বিপন্ন অবস্থার জন্য চিন্তা হয়। আমার অভিভাবকত্ব মেনে নিয়ে চলতে পারবে কি? সে আমার ছোট ভগ্নী। আমার কাছে এখনও সেই ছোট্টটি আছে, এখনও তার নাবালকত্ব ঘোচেনি। তাই দাদা রাবণের ধারণা, অবুঝ ভগ্নী হাত না ধরে হাঁটলে আছাড় খাবে। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রামচন্দ্র এবং রাবণের শত্রুরা বিপথে নিয়ে যাবে। নিয়ে গেছিলও।

মহারাজ!

অকম্পন, আমি জানি, তুমি কি বলতে চাও। শূর্পণখার উপর আমার খবরদারি করার ইচ্ছে নেই। রাজনীতির কিছু বোঝে না সে। এখনও স্বাবলম্বী, কিংবা স্বনির্ভর হয়নি। আরো অনেক সময় লাগবে। রাবণের সাহায্য ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়। আমি বুঝি ওর সচেতন জীবন্ত ব্যক্তিত্বে কালকেয়র কথাই ভাবে বেশি। ও আর লঙ্কার রাক্ষস নন্দিনী নয়, কালকয়ের দানববধূ। স্বামীর অবর্তমানে তার রাজ্যকে সমান মর্যাদায় সম্মানিত দেখতে চায়। কালকেয়'র জাতীয় গর্ব অবহেলিত হতে দেখলে ওর দুঃখ হয়, নিজেকে হীন মনে হয়। আমি নিজেও ওর অনুভূতিপ্রবণ মন সম্বন্ধে খুবই সজাগ। তবু আগলাতে গেলেই একটু দাদাগিরি হবেই।

গভীর শ্রদ্ধায় অকম্পনের দুই চোখ আবিষ্ট হয়ে গেল। মুগ্ধ চোখে রাবণের দিকে চেয়ে রইল।

অসঙ্কোচে রাবণের সামনে এসে দাঁড়াল শূর্পণখা। তাকে দেখামাত্র রাবণ তেতে উঠল। তার দুচোখ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় জ্বলজ্বল করতে লাগল। চাপা ক্রোধে উত্তেজনায় তার কণ্ঠ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল : শূর্পণখা তুমিও! অবশেষে তুমিও আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে! বিদ্যুৎজিহ্বর পত্নী লোভের বশে এত নীচ, স্বার্থপর হতে পারে আমি কল্পনা করেনি। পরদেশী, রাজ্যলোভী, ক্ষমতাপ্রিয় রামচন্দ্রের সঙ্গে আঁতাত করে তুমি পেলে কী? অসম্মান, অপমান নিয়ে সেই তো দাদার কাছে ফিরে আসতে হলো।

শূর্পণখা কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রাবণের দিকে। কষ্টের সঙ্গে হাসল। রাবণের কোথায় দুর্বলতা সে জানে। দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে তার কঠিন আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়। চিরকালই রাগের জবাব রাগের ভাষায় দিয়েছে। আর তাতেই রাবণ তার একান্ত নিজের হয়ে ওঠে। এটা তাদের পুরনো খেলা। মাথা নেড়ে বলল : হ্যাঁ তোমার হাতের চাবুকের দাগ পিঠে নিয়ে আবার ফিরে আসা বড় লজ্জার, কষ্টের যন্ত্রণার এবং অপমানের। লক্ষ্মণ বোধ হয় এই কারণে নাক কাটা শূর্পণখা বলেছিল। নির্লজ্জ, বেহায়া, সম্ভ্রম খোয়ানো বোঝাতে ও কথাটা বলেছিল। খর ও দূষণ তার প্রতিবাদ করতে; আমার অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে, হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হলো। আব তোমার কাছে পেলাম আমি বিতৃষ্ণা, বিরূপতার বিষের ছোবল। চমৎকার! যার স্বার্থে রামের ঘরে সিঁদ কেটে চুরি করতে গেলাম সে বলল চোর। মানুষ বড় বিচিত্র জীব। বড় অকৃতজ্ঞ। স্বার্থপর। কথাগুলো বলার সময় শূর্পণখার গলা কাঁপছিল।

রাবণ কী ভেবে হঠাৎ হো হো করে হাসল। শূর্পণখার মনের কুয়াশা কাটানোর জন্য, বুকের ভার হাল্কা করার জন্য বলল : রাবণের ভগিনীর মতো কথা বটে। রাবণের মতোই কণ্ঠে দম্ভ নির্ভয় জেহাদ। কিন্তু আমি শুনলাম রামের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তুমি রাবণের ধ্বংস চেয়েছিলে। রামের কাছ ছাড়া করার জন্য তোমাকে সে লাঞ্ছিত করেছিল। তোমার বেসরম মেলামেশাকে নাক কাটা শূর্পণখা বলে জনস্থানে রটিয়ে দিল। লোকে মনে করল সত্যিই নাক কেটে বিকৃত করে দিয়েছে।

আমাদের দেশের মানুষরা বড় সরল আর নির্বোধ। তারা একবারও ভাবল না, কোমল অঙ্গ হানি হলে বিপুল রক্ত ক্ষরণে একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। জীবন সংশয়ের কথাটা ভুলে গিয়ে তারা বিশ্বাস করল শূর্পণখার নাক কান কাটার গল্প। আশ্চর্য ; ক্রোধে তারা ফুঁসে ওঠল না বরং ভয় পেয়ে গেল ভীষণ। এতে রামের অসুবিধার চেয়ে সুবিধা হল বেশি।

শূর্পণখা থ হয়ে গেল। উত্তর দেবার কথা জোগাল না। রাবণের প্রচ্ছন্ন অভিযোগের কী জবাব দেবে সে? সব কথা তো আর খুলে বলা যায় না, সম্ভবও নয়। তাই, শূর্পণখা মুস্কিল পড়ল। কী করলে মুস্কিল আসান হয় তার উত্তর হাতরাতে লাগল। বড় বড় চোখ মেলে রাবণের দিকে চেয়ে রইল। মাথার ভেতর নানারকম কথা পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল। খর ও দূষণ যখন নিহত, রাবণ তার কৈফিয়তের সত্য-মিথ্যে যাচাইয়ের সুযোগ পাবে না। তাদের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে রাবণের প্রিয় হয়ে ওঠা সহজ। তাই রমণীসুলভ অভিমানে তার চোখ ছলছল করে। বলল: সত্যমিথ্যে মিশিয়ে কথাগুলো তোমাকে কে কিভাবে বলেছে জানি না। জানার স্পৃহাও নেই। নিজের সাফাই গাইতে লজ্জা করে। আবার সারাজীবন একটা মিথ্যে সন্দেহের বোঝা বয়ে বেড়ানোও কষ্টকর। মুশকিল হচ্ছে একবার বিশ্বাস হারালে পুনরায় আস্থা অর্জন করা কঠিন। এখন আমার কৈফিয়ৎ কতখানি তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে তুমি জান। তবে, এটা বলতে পারি আমার ভেতর কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। তোমার আমার বিভেদ সৃষ্টির জন্য সত্য মিথ্যে এমনভাবে মিশে গেছে যে তা থেকে প্রকৃত সত্য খুঁজে বার করা এক কঠিন সমস্যা।

রাবণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শূর্পণখার কথা শুনছিল। বলল : যথা,

শূর্পণখা কয়েক মুহূর্তে চুপ করে থেকে বলল: রাজনীতি, কুটনীতির ভাষা আমার জানা নেই। খর ও দূষণ পরামর্শ করে রামের সঙ্গে মেলামেশা করে তার মতি-গতি ও উদ্দেশ্য জানার জন্য আমাকে পঞ্চবটীতে পাঠাল। এর জন্য যে একনিষ্ঠতা দরকার তা আমি দিয়েছিলাম। দেশের কাজে, ভাইয়ের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অল্পদিনের মধ্যে রাম অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল। তার কাছে জানতে পারি লঙ্কার একটা বিরাট অংশ রাবণের বিপক্ষে। রাবণ বিরোধীচক্র লঙ্কার মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠেছে। রামের সঙ্গে তারা সংযোগ স্থাপনে উৎসুক। অকম্পন কিংবা আমি তোমার বিপক্ষে নই। মোহবশে রাম যে ভুল করছে লক্ষ্মণ কীভাবে তা টের পেয়ে যায়।

শূর্পণখা হঠাৎ থামল। এক হারানো অতীত রূপকথার মতো তার দু'চোখের তারায় উদ্ভাসিত হল। বুকের ভেতর রামের মধু নিঃসৃত কণ্ঠস্বর নিঃশব্দে গুঞ্জরিত হতে লাগল। দুই চোখ তার বোজা। মুগ্ধতায় অভিভূত হয়ে সে রামের কথাগুলো শুনতে লাগল : রমণীর প্রেম পুরুষের বিরাট জীবন স্রোতের অংশ। স্রোত যেমন বাধা মানে না, ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চল তেমনি আমার সব ভালোলাগা তোমার বুকে সমুদ্র হয়ে মিশে যেতে চাইছে।

কথাগুলোর ভেতর কেমন একটা আবিষ্টতা ছিল। শূর্পণখা ভ্রমর কালো বড় বড় দুই চোখ মেলে বোকার মতো চেয়ে রইল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। নিস্পৃহ ভাবে বলল: মেয়েরা বড় বোকা। ভালোবাসার কথা শুনলে গলে যায়। পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। ওরকম ভাবাই ভুল।

বিশ্বাস কর, তোমার কাছে এসে একটু বসলেই শান্তি পাই। তুমি নূতন প্রাণ দাও আমাকে। আমার ফুরিয়ে যাওয়া জীবনকে নবীকৃত কর।

বিহ্বল কণ্ঠে শূর্পণখা বলল : কী করে জানব তুমি আমাকে ভালোবাস? তোমার সীতা আছে। সে থাকতে আমাকে তুমি ভালোবাসতে পার না। এ তোমার প্রেমের বিলাস। আমাকে ঠকানো।

শূর্পণখা আমাকে একটু বিশ্বাস কর।

হাসালে। অমন করে লোভ দেখিও না। তুমি জান না, কী শূন্য গর্ভ একাকীত্বে ভরা আমার জীবন। এখানে বাতাস হা হা করে অট্টহাস্য করে। এখানে শুধুই তৃষ্ণা।

বিদ্যুৎচমকের মতো কথাগুলো মনে পড়তে একটা অদ্ভুত তিক্ততায় ভরে গেল তার অন্তর। ইতিহাস বোধ হয় তার নিজের নিয়মেই ভুলের শোধ নিল। শূর্পণখা আর চিন্তা করতে পারে না। রাবণকে ফাঁসাতে গিয়ে সে নিজেই ফেঁসে গেল। তীব্র অন্তর বেদনায় তার হৃদয় মথিত হতে লাগল।

এক দুরন্ত অসহায় বোধে তার দু'চোখ ভরে জল নামল। রাবণ তাকে কাঁদতে দেখে একটু অবাক হল। কোমল কণ্ঠে বলল: ভগ্নী তুমি কাঁদছ! কী হয়েছে তোমার? বর্বর লক্ষ্মণের অত্যাচারের কাহিনী শোনার আমার ইচ্ছে নেই। দুর্বলেরা বিলাপ করে।

দাদা! তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?

সহানুভূতিতে ভরে ওঠল রাবণের কণ্ঠস্বর। বলল: দুঃখের কিছু নেই। হতাশ হওয়ার মতো কিছু হয়নি। যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ আশা নেভে না। আবার ততক্ষণ থাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ।

শূর্পণখা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ক্লান্ত স্বরে উচ্চারণ করল: হ্যাঁ, প্রতিশোধ। কিন্তু দাদা তোমার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ কর না। দুঃখিনী ভগ্নীর জন্য তোমার লঙ্কাকে বিপন্ন কর না। সে আমি সইতে পারব না।

রাবণের চোখে কৌতুক, অধরে গর্বিত হাসি। মৃদু মাথা নেড়ে বলল, থুঃ। রাম আমার কি করতে পারে? কিন্তু সে আমার নীরবতাকে দুর্বলতা ভাবছে। সংঘাত এড়িয়ে চলাটা সে পালিয়ে বেড়ানো মনে করছে। তাই রাবণ ভগিনীকে লাঞ্ছিত করার দুঃসাহস দেখাল। আমার অসহিষ্ণুতা পরখ করে দেখার জন্য তোমার প্রতি তার এই বিবেকহীন আচরণ। আমার দর্প, অহঙ্কারকে তাচ্ছিল্য করতে তোমাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমার ঔদাসীন্যের ঘুম ভাঙতে, মনের অভ্যন্তরে আতঙ্কের বীজ বপন করতে তোমাকে যে মূল্য দিতে হলো, সুদ সমেত আমি তা আদায় করে নেব। তার দুর্বলতার কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে পঙ্গু করে দেব। ভগ্নী, রামের দুর্বলতা কোথায়—জান তুমি?

শূর্পণখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা অদ্ভুত পরিতৃপ্তি তার বুকের ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। বিহ্বল চোখে রাবণের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্যুৎজিহ্বর রুধিরসিক্ত অর্ধনয়ন মুদ্রিত মুখখানা মনে পড়ল। তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয়নি, রাম লক্ষ্মণের অপমানের কিছু করা হয়নি। সীতার মত নিরীহ নিরপরাধিনী মেয়েই পারে তার সব জ্বালা যন্ত্রণা মুখ বুজে সইতে। সীতার কপালটাই মন্দ। হয়ত তার অদৃষ্টই তাকে টেনে এনেছে এখানে। সীতার জন্য শূর্পণখার কষ্ট হল। মেয়েমানুষই মেয়েমানুষের শত্রু এই প্রবাদ বাক্যটা বোধ হয় সবচেয়ে সত্য। হঠাৎ রাবণের প্রশ্নে শূর্পণখার চমক ভাঙল। বলল: তুমি কথা বলছ না কেন?

ক্ষণকাল নীরবতার পরে অভিভূত আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে ওঠে শূর্পণখা বলল : সীতা রামচন্দ্রের বড় বন্ধন। মহা অরণ্যের দিকে যে অবারিত পথ তাতে সবচেয়ে বড় বাধা সীতা। এক অদ্ভুত মোহের ডোরে রামচন্দ্র বাধা তার সঙ্গে। লক্ষ্মণ পত্নী ঊর্মিলার মতো তারও এক অন্য জগৎ ছিল। সেখানে নিজেকে সে আটকে রাখতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। রামের জন্য সব ত্যাগ করেছে। সেই ত্যাগের জন্য রামকে কোন মূল্য দিতে হয়নি। সীতাই রামের দুর্বলতার কেন্দ্র। সীতা হরণই প্রকৃষ্ট পথ। এতে রামের পৌরুষ অপমানিত হবে। সীতাকে রক্ষা করতে না পারার বিড়ম্বনা, লজ্জা, দুঃখ, আত্মগ্লানি প্রতিমুহূর্ত রামকে দগ্ধ করবে।

রাবণ প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা নিয়ে তাকিয়ে রইল। মাথার ভেতর কেমন একটা বোবা ভাব। অভিভূত গলায় বলল: তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। চমৎকার সমাধান। রক্তহীন যুদ্ধ। এত বড় কাজটা কী করে সম্পন্ন হবে তার উপায় খুঁজে বার করা আরো কঠিন।

দিন, মাস, ঋতু অতিক্রান্ত হল। তবু কী করলে সীতা হরণ করা যায় রাবণ তার কোন সুষ্ঠু ছক তৈরী করতে পারল না। এর মধ্যে রামও রাবণের অভিসন্ধি আঁচ করল। রাবণ শূর্পণখার লাঞ্ছনার বদলা নারী নিগ্রহ করেই নেবে বলে সীতা লক্ষ্য তার। কিন্তু তার কৌশল উদ্ভাবন করতেই রাবণের দেরী হয়ে গেল।

এর ভেতরে সীতাকে অগ্নিমুনির আশ্রমে রেখে এল রাম। তার শূন্যস্থান পূরণ করতে অগ্নির পরামর্শে মতঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে শবর কন্যা শবরীকে পঞ্চবটীতে আনা হলো।* রাবণ এসব কিছু জানতে পারল না।

* মৎ লিখিত রামের অজ্ঞাতবাস দ্রষ্টব্য।

রাবণের দেরীতে শূর্পণখা হতাশ হল। যত দিন যায় ততই ভেতর ভেতর অস্থির হয়। প্রতিহিংসার বিষ বুকে নিয়ে সে জ্বলতে লাগল। মাঝে মাঝে রাবণের উপর রাগ হয়, অভিমান হয়। একটা অসহায় কান্নার আবেগে আর অপমানে তার বুক জুড়ে ঘৃণা রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সে কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। উচিত অনুচিত বোধ লুপ্ত হয়ে গেল তার ভেতর। শুধু গভীর রাতে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদে। বুকের মধ্যে তার অভিমানের তুফান।

একদিন আচমকা রাবণের শয়ন ঘরে হাজির শূর্পণখা। একটু অবাক হয়েছিল ভগ্নীকে দেখে। বিয়ের পর কোনদিন তার শয়নঘরে ঢোকেনি। রাবণ হতচকিত হয়ে পড়ায় সে লজ্জা পেল। বিব্রতভাবে বলল : এভাবে আচমকা ঢুকে পড়াটা খুবই অশোভন হয়েছে আমার। আমি যাই।

রাবণ সকৌতুকে একটু হেসে বলল : ঢুকে যখন পড়েছ, তখন আর কী হবে? আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বস। তারপর কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল : তোমার জন্য আমার কিছু করা হয়ে ওঠেনি এখনও।

উষ্মা প্রকাশ করে শূর্পণখা বলল : হবেও না কোনকালে। আমাকে নিয়ে তোমার পুতুল খেলা শেষ হবে না কোনদিন! পুতুলের মতো যা খুশি করছ। আমিও আশায় আশায় দিন গুণছি। ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার। আমি আর ঝুলিয়ে রাখতে পারব না।

নিরীহের মতো নিরুত্তাপ গলায় বলল রাবণ : উত্তেজনা, রাগ, অভিমান দেখানোর অনেক সময় পাবে। কিন্তু এখন সময়টা একটু অন্যরকম।

শূর্পণখা গনগণে ক্রোধ প্রকাশ করে বলল : তোমার বিলম্ব দেখে রামচন্দ্র হাসছে। মজা পাচ্ছে। ভীরু কাপুরুষ বলেই তুমি ভয় পাচ্ছ তাকে, সমীহ করে চলছ। বলতে গিয়ে শূর্পণখার মুখে থমথমিয়ে ওঠে কান্না।

রাবণ বলল : এসব কথা আসছে কেন?

শূর্পণখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : কারণ, তুমি বয়স্ক হয়ে গেছ। বয়সজনিত অবসাদ তোমাকে পেয়েছে। ভাঁটির টান ধরেছে তোমার ইচ্ছেয়, উদ্যমে। তাই যুদ্ধের কথা শুনলে তোমার ধমনী চঞ্চল হয় না। দোষ তোমার নয়, এ বোধ হয় বয়সের ধর্ম। বয়সের কারণে তুমি নিরাসক্ত, নিস্পৃহ। রাগেও আগুন নেই। এই যদি তোমার অবস্থা হয় তা-হলে আমাকে নিমিত্তের ভাগী করছ কেন?

শূর্পণখার মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলল না রাবণ। মনের ভেতরটা তার খুব ভার ভার বোধ হল। ভগ্নীর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা বিষাক্ত পোকার মত তার মস্তিষ্কের ভিতর কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। ক্রোধে, উত্তেজনায়, অপমানে তার দুইচোখ প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করতে লাগল।

রাবণকে নিরুত্তর দেখে শূর্পণখা বলল : দাদা, তোমার ভেতর সেই দুর্জয় রাবণের কবে মৃত্যু হল? স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বার মৃত্যুই আমাকে পরনির্ভরশীল করেছে। তোমার জন্য আমি সর্বহারা। সব থাকতেও আমার কিছু নেই। আমার মতো নিঃস্ব, হতভাগ্য কে হয়?

রাবণ কথা বলল না।

নীরবতা ভঙ্গ করে শূর্পণখা বলল : তাড়কা পুত্র মারীচ জাদু জানে। সে একজন রূপদক্ষ শিল্পী। তার সাজে আসল নকল একাকার হয়ে যায়। তাছাড়া সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, চতুর কৌশলী। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে তার। মারীচ তো তোমার অনুগত এবং আশ্রিত। একদিন তার দুর্দিনে সাহায্য করেছ, আজ তোমার প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াতে সে সংকোচ করবে না। মারীচ অকৃতজ্ঞ নয়। একবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার কোন কিন্তু থাকবে না।

রাবণ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। থম ধরা বিষণ্ণতা থমকে আছে মুখে। মুখ তার ফ্যাকাশে। চোখে বোবা শূন্যতা। রাবণ এই প্রথম অনুভব করল তার ভিতরে যে আগুন ছিল তা নিভে গেছে। কিছুতেই সে উত্তপ্ত হতে পারছে না। এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন তার ভিতরটা? রাবণ হঠাৎ টান টান হয়ে ভিতরকার নিবন্ত আগুনে কিছুটা রাগের হাওয়া দিয়ে উত্তপ্ত গলায় শূর্পণখাকে ভর্ৎসনা করল। বলল : কী করব, না করব, তার পরামর্শ তোমার কাছে নিতে হবে? মারীচকে আমি কম চিনি না। তার সম্পর্কে তোমার লম্বা চওড়া প্রশংসা পত্র না দিলেও হবে।

স্পর্শকাতর মনটাই রাবণকে কষ্ট দেয়। মনের সেই কষ্টটা যে কোথায় এবং ক্ষত ধরণের তা পাঁচজনকে বলতে পারলে একটু হাল্কা হত। কিন্তু সব কথা তো আর সকলের কাছে বলা যায় না। তাই, বোঝার মতো একা বয়ে বেড়াতে হয়। বুকের ভেতর অপমানের মতো ব্যথা বাজে এক ধরণের।

মনের উত্তেজনায় ঘর-বার করল। লক্ষ্মণের হাতে শূর্পণখা লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকে রাবণের কেবলই মনে হয় অপমানটা রামচন্দ্র শূর্পণখাকে করেনি, তাকেই করেছে। শূর্পণখা উপলক্ষ্য। নোংরা রাজনীতির মধ্যে শূর্পণখাকে টেনে এনে তার সুনাম ও খ্যাতিকেই আঘাত করেছে। লোকের কাছে তাকে ছোট ও হেয় করার উদ্দেশ্যে শূর্পণখাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করে অকারণ করুণা করল রাম। এ করুণা রামচন্দ্র শূর্পণখাকে করেনি, তাকে করেছে। সারা শরীরটা অপমানে রি রি করে জ্বলতে লাগল রাবণের।

মুহূর্তে রাবণের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, মনোবল, সাহসের ঘরে এক নীরব বিস্ফোরণ ঘটে গেল। রামের কাছে তার গৌরব মর্যাদা কমেছে বলেই তাকে পাত্তা দিচ্ছে না, গ্রাহ্যও করছে না। এক নীরব অবহেলা, অনাদরের অপমানে তার বুক জ্বালা করতে লাগল। জমানা রাবণের হাত থেকে রামের হাতে নিঃশব্দে হস্তান্তর হয়ে গেল। অথচ সে কিছুই টের পেল না। ইচ্ছে করে তার দিক থেকে দৃষ্টিটা অন্য দিকে সরিয়ে রাখার জন্য রাবণের অনুশোচনা হল। রাম তাব ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়েছে। ফলে রাবণ নয়, রামচন্দ্রই দাক্ষিণাত্যের ভরসা। আগে তার সঙ্গে ছিল তাবা, একে একে তাদের অনেকে রামের পাশে জড় হচ্ছে। রাবণকে তারা ভয় পায় না আর। তাদের ধারণা রাবণ নিজেই রামের কাছে হেরে যাওয়ার ভয়ে ভীত। তাই, সর্বক্ষণ লড়াই এড়িয়ে চলছে। ভীরুতা তাকে সহিষ্ণু করেছে, দুর্বলতা করেছে সংযমী। ঔদাসীন্য দিয়ে নিজের দুর্বলতাকে ঢেকে রেখেছে। মনটা হঠাৎ রাবণের নিষ্ঠুর বিচারক হয়ে ওঠল। ইচ্ছে করল হো হো করে অট্টহাস্য করে। কিন্তু পারল না। উল্টে বুক থেকে উঠে আসা শ্বাসের সঙ্গে ভেতরের যত তাপ বেরিয়ে এল। এক গভীর হতাশায় তার বুক মর্মবিয়ে উঠল। নিরুচ্চারে বলল : যে মাটি থেকে রস টেনে সে এতকাল জীবিত ছিল, সে মাটির রস তাহলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কথাগুলো হাহাকারের মতো ঘরময় ছড়িয়ে গেল।

রাবণের শ্বাস ক্রমশ প্রলয়ঙ্কর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল। ভিতরে এক তীব্র জ্বালা সে টের পেল। একা থাকতে থাকতে আরো অনেক কিছুই টের পেল। দাঁতে দাঁত পিষে নিজের অহংকে খুশি করার জন্য বলল : রাবণের সহিষ্ণুতা দেখেছে রামচন্দ্র, ক্রোধ দেখনি তার। রাবণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কেউ মাপ পায়নি কখনও। রামচন্দ্র! সকলের কাছে তুমি আমাকে ছোট করেছ। তোমাকে আমি ক্ষমা করব না। আমাকে নীচে নামিয়ে তুমি নিজেকে শয়তানের ভূমিকায় টেনে আনলে।

মনের ভেতর এক জটিল মতলব কদিন ধরে অনবরত পাক খেতে লাগল। মারীচের আশ্রমে আচমকা হাজির হল একদিন। রাবণকে দেখে মারীচ একটুও অবাক হয়নি। বরং ভয়ঙ্কর একটা কিছু হওয়ার আশঙ্কায় তার ভেতরটা কেঁপে গেল। বিব্রত ভয়ে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সবিনয়ে বলল : অধীনের কুটীর মহারাজের চরণচিহ্নে আরো একবার ধন্য হল। কিন্তু হুকুম করলে বান্দা লঙ্কায় যাওয়াকে পুরস্কৃত মনে করত। এই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে আমাকে হতাশ করলেন।

রাবণের মুখে অনবিল প্রসন্ন হাসির আভা ফুটল। মুচকি হেসে বলল : মারীচ তুমি চিরকালই বিনয়ী। কোন ভাষায় কথা বললে মানুষের মন জয় করা যায় তুমি তা জান। এজন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজে তোমার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

মারীচকে উত্তর দিতে কুণ্ঠিত দেখে রাবণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে সবিস্ময়ে বলল : মুখে-চোখে তোমার আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তুমি কী ভয় পেয়েছ?

রাবণের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে মারীচ বলল : এভাবে আপনার একা বেরোনো ঠিক হয়নি। চারদিকে শত্রু। দিনকাল ভাল নয়। জনস্থানে আপনার সেই রমরমা, নিন্দুকে স্বীকার করে না।

মারীচ রামচন্দ্রের ভয়ে ভীত তুমি। বোধ হয়, অতীতকে ভুলতে পারছ না।

ভোলা যায়? আপনার নিজের নিরাপত্তাই আজ বিপন্ন। ঘরে বাইরে শত্রু। কে কোন মতলবে ঘুরছে কেউ জানে না। এমন কি নিজের মায়ের পেটের ভাই-বোনকে বিশ্বাস করা শক্ত। চিরকালের মূল্যবোধটা ভেঙে পড়েছে। মনুষ্যত্ব, আদর্শ, বিশ্বাস, আনুগত্য বলে কিছু নেই। স্বার্থের লড়াইতে জড়িয়ে গেছে মানুষ। স্বার্থের জন্য এমন মূল্য নেই যে দিতে সে তৈরি নয়। মানুষের আস্থতে অনাস্থা, ভ্রাতৃত্বে সন্দেহ, বন্ধুত্বে অবিশ্বাস, প্রেমে বৈরীতা—এ এক হিংস্র জঙ্গল জীবন। জাতির চরিত্রে ঘুণ ধরেছে। চরিত্র বলে জিনিসটাই নেই। অথচ, আপনারা যখন দেশের জন্য, জাতির জন্য লড়াই করেছেন তখন আদর্শ ছিল, ব্যথা, অনুভূতি, দরদ, আনুগত্য ছিল। প্রেম ছিল। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র আসার পর কর্পূরের মতো সব উবে গেল।

মারীচের কথাগুলোতে রাবণের সমস্ত সত্তা ভীষণভাবে নাড়া খেল। মহৎ বিশাল অনুভূতির মধ্যে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে বলল : একদিন সিংহাসনের লোভে কুবের রাক্ষসদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেজন্য রাক্ষসভূমিকে অনেক দাম দিতে হয়েছিল। দেবলোকের ইন্দ্র রক্ষক হয়ে তাকে আগলাচ্ছিল, আর সে গোটা রাক্ষস ভুমিকে শুষে নিচ্ছিল। রাক্ষসদের সঙ্গে কুবেরের বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়ে হনুমানের মতো পিঠে ভাগ করতে বসল ইন্দ্র। ইন্দ্রের চতুর খেলায় দুপক্ষই দুর্বল হয়ে থাকল। নিজের দেশে রাক্ষসরা পরবাসী, ক্রীতদাস। দেশের ঐশ্বর্য, সম্পদ, ফসলের উপর তাদের অধিকার নেই। যা কিছু ভাল, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য দেবলোকে পাঠাতে লাগল কুবের। দেশের মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মুখের ভাষা বুকের ব্যথা বুঝতে পারতাম। তাদের হাসি, কান্না, জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব, কষ্ট, দুঃখ দারিদ্র্য সব আমার জানা।* এদেশের মানুষের কাছে আমার যা কিছু সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি তা তো সেই আত্মত্যাগের জন্য, স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাক্ষস রাষ্ট্র গঠনের জন্য। আজ জীবনের গোধূলি লগ্নে আমার এত গর্বের রাক্ষস-ভূমির উপর রামচন্দ্রের নিশান উড়বে, এ আমি চোখ খুলে দেখতে পারব না। অথচ রামচন্দ্র সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য শূর্পণখাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে এক মহাকৌতুক করল। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে শূর্পণখাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়া মানে তাকে পঙ্গু করে রাখা। রাবণকে অগ্রাহ্য করা। ভগিনীর রাজ্যের উপর আমার আর কোন খবরদারী থাকবে না। এই অপমানটা আমাকে হজম করতে হবে। লঙ্কা থেকে দেখতে হবে আমার আদরের ভগিনীর প্রাসাদে, দুর্গের শীর্ষে পাল তোলা নৌকার মতো রামের প্রভুত্বের পতাকা উড়ছে। এসব আমি দেখতে পারছি না।

উপায় কী বলুন? যুদ্ধ হলে কে জিতবে, কে হারবে স্বয়ং ভগবানও বলতে পারে না।

রাবণ প্রতিবাদ করল। গলার শিরগুলা ফুলে উঠল। বলল : আছে। উপায় আছে। অশান্তির ভয়ে যা করেনি, করতে হয়নি এতকাল, এবার তাই করে রামচন্দ্রকে রাক্ষসভূমি থেকে বিতাড়িত করে রাবণ শান্তিতে একটা লম্বা ঘুম দেবে।

মহারাজ, আপনার সব কথা আমি বুঝতে পারি না। কেমন হেঁয়ালি লাগে।

মারীচের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল রাবণ। বলল : তুমি এখন জপ-তপ আর জনসেবা নিয়ে আছ। তোমার আদর্শ জনকল্যাণ করা। রাক্ষস জাতির কল্যাণের জন্য তোমার কিছু করণীয় আছে। তোমার ও শূর্পণখার বন্ধুত্বের মধ্যে যদি কোন বিরোধ থাকে তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত নেই তার ভেতর। কী, ঠিক বলছি তো? রাবণ আড়চোখে মারীচের দিকে একবার তাকাল। দুই চোখে তার কৌতুকময় হাসি।

মারীচ অসহায়ভাবে বলল : যথার্থ!

আমি জানতাম, বিরোধ যদি কিছু থাকে তা লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে নয়, পথ বা নীতি নিয়েও নয়। ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে। অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে তা কোন বাধা হবে না। তোমাদের বন্ধুত্ব নিবিড়। তাই, আমার মন বললে শূর্পণখার ভালোর জন্য যদি কিছু প্রয়োজন হয় তা তুমিই পার করতে।

* মৎ লিখিত লঙ্কেশ রাবণ গ্রন্থটি পাঠ করলে রাবণের সংগ্রামী জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠক জানতে পারবেন।

মারীচের উজ্জ্বল মুখে সহসা আঁধার ঘনাল, ছায়া পড়ল। সঙ্গে খানিক ক্লান্তি এবং ভয়। সে বুঝে উঠতে পারল না কোন মতলবে রাবণ এসেছে। তবে তার মনে যে একটা জটিল অভিসন্ধি আছে সেটা তার হাব-ভাব আচরণের মধ্যে টের পেল। তাই একটু ভয় চকিত বিস্ময়ে বলল : যে কাজ আমায় দিয়ে হয় সে কাজ অন্যকে দিয়েও তো হতে পারে।

সব কাজ সকলকে দিয়ে হয় না। রাবণ মারীচের কাঁধে হাত রাখল। সে হাতের স্পর্শে মারীচের ভেতরটা কেঁপে গেল। ঐ হাতের মধ্যে কী আছে কে জানে?

বৃদ্ধ হয়েছি। কারো একটু সহায় পেলে ভালো হয়।

মারীচের মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। অজানা ভয়ে সে সঙ্কুচিত হলো। আস্তে আস্তে বলল : আমায় কী করতে হবে?

রাজনীতিতে অনেক ভেজাল ব্যবহার করেছ। ভেজাল না দিলে বোধ হয় কার্যসিদ্ধি হয় না। তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণের সাহায্য আমার চাই। ভগিনী শূর্পণখাকে অসম্মান করে, দয়া দেখিয়ে, করুণা করে, আমার সম্মান ও মর্যাদাবোধকে আঘাত করে রামচন্দ্র পার পাবে না। আমি তার পৌরুষকে আঘাত করার জন্য সীতা অপহরণের সঙ্কল্প করেছি।

মারীচ চমকাল। বলল : এত বড় ভুল করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

রাবণ ভর্ৎসনা করে বলল : আমি তোমার নিষেধ শুনতে আসেনি। নির্দেশ দিতে এসেছি। তুমি একজন নামকরা বহুরূপী, বহুরকম রূপ ধরতে পার। মৃগয়াপ্রিয় রামকে শিকারে প্রলুব্ধ করে, দূর বনে নিয়ে যাওয়াার জন্য তোমাকে সোনার হরিণ সাজতে হবে। স্থান, কাল, পাত্র বিচার করে যা করণীয় তাই করবে। তোমার ফাঁদ পাতার নৈপুণ্যের উপর আমার সীতা হরণের সাফল্য নির্ভর করছে। ব্যর্থ হলে অনেক দাম দিতে হবে তোমাকে। সাফল্যের পুরস্কার রাবণের মন্ত্রীত্ব।

মহারাজ, আমি সাধু মানুষ। কোন কিছুতে লোভ নেই। আমাকে শুধু এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন।

রাবণ কারো আবেদন নিবেদনে কান দেয় না। তোমার কর্তব্য হলো রাজাদেশ মান্য করা।

মহারাজ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আপনি যাকে মঙ্গলজনক ভাবছেন আদৌ তা কোন কল্যাণ আনবে না। সীতা হরণের পরামর্শ যে আপনাকে দিয়েছে সে আপনার মিত্র নয়। মিত্ররূপী শত্রু। রাক্ষসজাতির সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি এক গভীর চক্রান্তের ফাঁদে বন্দী। আপনার সুনাম কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র এ। এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে আরো একবার বিবেচনা করুন। আপনাকে ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত থেকে আপনি যদি নিজে বেরিয়ে না আসেন তা হলে আপনার স্বর্ণ লঙ্কার সঙ্গে রাক্ষস জাতিরও এক মহা সর্বনাশ হবে। আমি জোর দিয়ে বলছি, এ হলো গভীর ষড়যন্ত্র। হয়তো কেউ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য রাম এবং আপনার ভেতর একটা যুদ্ধ বাঁধাতে চায়। সীতা হরণ হলে আপনার মিত্রেরাও শত্রু হবে। শত্রুরা আনন্দিত হবে।

ছিঃ মারীচ। মৃত্যুর আশঙ্কায় তুমি কাঁপছ। তাই এসব যুক্তি দেখিয়ে আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করছ।

মহান সম্রাট! আপনার ভর্ৎসনা বড় নির্মম। আপনি আমাকে আঘাত করুন, মৃত্যুদণ্ড দিন, ক্রোধের আগুনে দগ্ধ করুন। কিন্তু এই নিষ্ঠুর সন্দেহের ভার আমি সইতে পারছি না।

মারীচ তুমি আমার অনুগ্রহভাজন। পাছে কর্তব্য ভ্রষ্ট হও তাই কঠিন বাক্যে তোমাকে তিরস্কার করলাম। ভগিনী শূর্পণখাকে নিগ্রহ করে যদি রাম চরিত্রে কলঙ্ক না লাগে, তার সুনাম অক্ষয় থাকে তাহলে সীতা অপহরণ করলে আমার অপযশ হবে কেন? এ হলো নীতিতে নীতিতে লড়াই। নারী নির্যাতনের শোধ নারীর অবমাননা দিয়েই শোধ করতে হবে। এক ঘৃণা আর এক ঘৃণার জন্ম দেয়। ঘৃণাই ঘৃণার শেষ কথা।

।। পনেরো ।।

রাবণের সফল সীতা হরণের সংকল্প শূর্পণখাকে পুলকিত করল। প্রতিশোধের প্রথম পর্বটা ভালোভাবে এবং শান্তিতে চুকল। সব দিকটা বেশ গুছিয়ে পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে এবং সব সন্দেহের বাইরে সে আছে। তার ষড়যন্ত্রের ফাঁদে রাবণ ও রামচন্দ্র বাঁধা পড়েছে। সে গিঁট সহজে খোলার নয়।

দুজনেই তার শত্রু। দু'জনের কথা মনে হলে মাথা দিয়ে আগুন ছোটে। রাম রাবণ দু'জনেই তার জীবনের অভিশাপ। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর জন্য দু'জন সমভাবে দায়ী। কেউ কারো অপেক্ষা কম নয়। রাম কারণ, রাবণ কার্য। পাছে বিদ্যুৎজিহ্বর মতো উদারচেতা যুক্তিপ্রবণ যুবক রামের পক্ষ গ্রহণ করে সাদা-কালো চিরন্তন বিবাদ-বিভেদের উপর যবনিকা টেনে দেয়, একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কিছু করে তাই আগেই রাবণ সরিয়ে দিল তাকে। এ হল রাজনীতি। এর মধ্যে প্রাণনীতি বলে কিছু নেই। রামের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতিই হলো বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর কারণ। এই ব্যাপারটা শালা-ভগ্নিপতির মধ্যে না থাকলে রাবণের হাতে তার বীরকে প্রাণ দিতে হতো না। হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রথম দিকে সে রামের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সে সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য রাম তার আক্রোশের লক্ষ্য হলো। এ হলো এক ঢিলে দুই পাখি মারার কপট রাজনীতি। রাম রাবণের অদৃষ্টের লিখন। সে শুধু নিমিত্তের বন্ধন।

এখন শুধু অপেক্ষা করা। দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্ব যাই চলুক তাতে কোন ভূমিকা নেই তার। সে শুধু দর্শক। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মাঝে মাঝে ভাবাবেগকে নাড়া দেয় হর্ষে ও বিষাদে। সে আজ পরিতৃপ্ত। মনে কোন দাহ নেই। স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বর মরদেহ স্পর্শ করে নিরুচ্চারে মনে মনে শপথ করেছিল হত্যাকারীকে ক্ষমা করবে না। প্রিয়তম ভাই হলেও না। প্রতিশোধ নিয়ে তবে শান্ত হবে। তার একমাত্র সাধ পূর্ণ হয়েছে। সীতা হরণের নাটক কোথায় গিয়ে কিভাবে শেষ হবে কেউ জানে না।

তবে, দুপক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বাকযুদ্ধ এবং প্রচারে দু'পক্ষই দুর্বল নারী জাতির প্রতি অসম্মান এবং বর্বর আচরণকে নিজ নিজ পক্ষে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করল। রাবণ রাক্ষসদের বুঝিয়েছে সীতা হরণ কোন অপরাধ নয়। এটা নিছক প্রতিবাদ। লক্ষ্মণ আয়োমুখীর নাক কান শুধু কাটেনি তার নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিকৃত করে যে নৃশংস বর্বর আচরণ করেছিল তা একজন অসভ্য জংলী মানুষও করতে লজ্জা পায়। রাজমহিষী শূর্পণখাও লক্ষ্মণের বর্বরতা থেকে রেহাই পায়নি। লক্ষ্মণের জঘন্য নারী নির্যাতনের মত কাহিনী নয় সীতা হরণের ঘটনা। রাক্ষস মহিলাদের অঙ্গ-বিকৃতি করণের মূলে আছে রাম-লক্ষ্মণের অনার্য বিদ্বেষ এবং ঘৃণা। এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটা ইচ্ছাকৃতভাবে না করলে তো এই যুদ্ধ হত না। তাকে তো প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে রাবণ যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। গোটা রাক্ষসজাতির মান-সম্ভ্রম-ইজ্জত ধরে রাম যখন টান দিয়েছে তখন রাক্ষসাধিপতির ধৈর্যভঙ্গ হওয়া কোন দোষের নয়। স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া যদি রামচন্দ্রের দোষের না হয়, তা-হলে ভগিনীর সম্মান বাঁচানো এবং সাধারণ একজন রাক্ষস রমণীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাবণের রুখে দাঁড়ানো কোন আদর্শবিরোধী কার্য নয়।

আশ্চর্য, রাম বেমালুম শূর্পণখা এবং আয়োমুখীর অসম্মানের কাহিনী চেপে গিয়ে বিপন্ন অসহায় মানুষের মতো অপহৃতা পত্নীর জন্য পথে পথে বিলাপ করতে লাগল। বিলাপের ভাষায় হৃদয় মথিত করার কী বিপুল শক্তি, তার বলবতী ধারা কী তীব্র হৃদয়াবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; ভয়ঙ্কর পাষণ্ডকেও সে সহানুভূতিশীল করে,—রাম তাকেই প্রচারের ভাষা করে তুলল। আর তাতেই মানুষের মন গলে গেল। রাবণের সব কৈফিয়ৎ অশ্রুপাতের তোড়ে ভেসে গেল। লোকচক্ষে রাবণ বর্বর, বিবেকহীন, নারী মাংসলোভী এক রাক্ষস।

প্রচারে রাম, রাবণ থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে রইল। বিভীষণ তার সুযোগ নিয়ে রামের পক্ষে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করতে বলল : দাদা, লঙ্কাবাসী যুদ্ধ চায় না। জোর করে প্রত্যেক লঙ্কাবাসীর কাঁধে যুদ্ধ তুমি চাপিয়ে দিচ্ছ। তোমার নিজের ভুলের মাশুল গোটা জাত দেবে কেন? জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনাকে জড়িয়ে তুমি সীতা হরণের দোষ ঢাকতে চাইছ। এটা কোন কৈফিয়ৎ

নয়। এই ব্যাপারটা একটা আপস আলোচনায় মিটিয়ে ফেলা যেত।

রাবণ বিভীষণের বিরোধিতায় একটুও আশ্চর্য হল না। নিরুত্তাপ গলায় ক্রোধ প্রশমিত করে বলল : বিভীষণ তুমি ছাড়া লঙ্কাপুরীর কোন রাক্ষস একথা বলবে না। সাবাজীবন আমি শুধু রাক্ষসদের ভাল চেয়েছি। তবু, তাদের অনেকে আমার কথা শোনে নি। তুমিও না। জাতীয় সঙ্কটকালে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব সব নাগরিকের। বিরোধকে যে উস্কে দেয় সে দেশের শত্রু। তোমার বিচার বোধহীন নির্বোধ উক্তি কেবল সংশয় সৃষ্টি করবে। বিভেদ বাড়াবে। তোমাকেই প্রশ্ন করব, নারী হরণ আর নারী অঙ্গ বিকৃতিকরণের মধ্যে কোনটা বেশী অমানবিক আর বর্বরতা? চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও? আমি ভেবেছিলাম লক্ষ্মণের আচরণের জন্য রাম দুঃখ প্রকাশ করবে, কিন্তু সে তা না করে একটা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে তোলার মতলব আঁটল। সীতা বলে আমি যাকে হরণ করেছি সে আদৌ আসল সীতা নয়, ছায়া সীতা। রামচন্দ্র জেনেশুনে আসল সীতাকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে নকল সীতাকে দিয়ে আমাকে নাকাল করল। এই যুদ্ধ হওয়ার কোন কথাই নয়, তবু রাম উত্তরাপথ, দক্ষিণারণ্যের মানুষজনকে কান্নার নাটক করে ক্ষেপিয়ে তুলল।* যেন তেন প্রকারে রামচন্দ্র আমাদের সঙ্গে একটা বিরোধ পাকিয়ে সর্বনাশা যুদ্ধ চায়। তাই আয়োমুখীকে হত্যা করে তার নাক কান স্তন কেটে অসম্মান করেছে। কারণ পঞ্চবটীর কুটীরের খুব কাছে তার গৃহ। স্বগৃহ ছেড়ে অন্যত্র যেতে চায়নি। এটাই তার অপরাধ। লক্ষ্মণ অসহায় রমণীর সঙ্গে বর্বরের মতো আচরণ করেছে। অবশেষে শূর্পণখাকেও অপমান করল। রামচন্দ্রের এই বর্বরতা এবং তার কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে তোমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি?

রাবণের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না বিভীষণ। অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে রইল। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভীষণকে ধিক্কার দিল। দেশপ্রাণ রাবণের জয়ধ্বনি করতে লাগল।

এসব বৃত্তান্ত অকম্পনের মুখে শোনার পর থেকে শূর্পণখার সারা শরীরে এক অনাস্বাদিত পুলকানুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। বুকের ভেতর থেকে একটা স্বস্তির শ্বাস উঠে এল। এই প্রথম মনে হল লঙ্কায় যা ঘটেছে সেজন্য কোনভাবে দায়ী নয় সে। এটা ঘটতই। হয়তো ঘটনাপ্রবাহ কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছিল তার জন্য। এসব জানার আগে দেশ, জাতি ও ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য একটা অপরাধবোধ তার মনের সব শান্তি কুরে কুরে খাচ্ছিল। সেই অশান্তিটা আর নেই। সীতা হরণের দুর্বুদ্ধি রাবণকে না দিলেও রাম লঙ্কা আক্রমণ করত। সে একটা অজুহাত সৃষ্টি করছিল কেবল। সাম্রাজ্যলোভী রামচন্দ্র তেরো বছর ধরে অপেক্ষা করেও রাবণকে ধৈর্যচ্যুত করতে পারেনি। তার সংযম ভঙ্গে ব্যর্থ হওয়ার জন্য রাম মরিয়া হয়ে রাক্ষসদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার বিষ উগরে দিল। এক জঘন্য নারী লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রাবণকে সংঘাতের মধ্যে টেনে আনল। এই সংঘাত রামের সৃষ্টি। এই প্রথম শূর্পণখা নিজেকে নির্দোষ ভাবল।

সীতা হরণের পর দুটো ঋতু কেটে গেল। তবু রামের দিক থেকে সীতা উদ্ধারের কোন আগ্রহ প্রকাশ পেল না। রামের ঔদাসীন্যে শূর্পণখার আশাভঙ্গ হল। অথচ তার আশা ছিল, স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্য রামচন্দ্র রাবণকে আক্রমণ করবে। এই যুদ্ধটা সে ভীষণভাবে চেয়েছিল। যুদ্ধ না হলে বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, সীতার ঈর্ষার জন্য যে লাঞ্ছনা, অপমান তাকে মাথা পেতে সহ্য করতে হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেবে কী করে?

অথচ রাম তো রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিসন্ধি নিয়ে, তাকে ধ্বংস করার সঙ্কল্প নিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করে দক্ষিণারণ্যে এসেছিল। তেরো বছর ধরে দক্ষিণারণ্যের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে সৈন্য, অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে। রাবণকে নির্বান্ধব করেছে। তা-হলে রাবণের লঙ্কা আক্রমণ করতে রামের বাধা কোথায়?

রামকে যুদ্ধে বাধ্য করার জন্য রাবণকে সীতা অপহরণের পরামর্শ ও দুর্বুদ্ধি দিয়েছে সে। কারণ,

কৌতূহলী পাঠককে মৎ লিখিত 'রামের অজ্ঞাতবাস' পড়ার জন্য অনুরোধ করব।

সীতাকে মনে প্রাণে ঈর্ষা করে। স্বামীর ভালোবাসায় তার জীবন ভরপুর। আর তার জীবন ভালোবাসার অভাবে মরুভূমি হয়ে গেছে। রামের প্রেমের সমুদ্র থেকে এক আঁচলা জল নিয়ে তার তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ একটু ভিজিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সীতার তা সহ্য হলো না।

মেয়েমানুষের মন বড় সন্দিগ্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ। নিজের উপরই তার সবচেয়ে অবিশ্বাস এবং অভরসা। তাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মনটা সঙ্কীর্ণ বলেই ভালো মনে সহজভাবে কিছু নিতে পারে না। প্রতিমুহূর্ত হারানোর ভয়। এই বুঝি প্রেমাস্পদ হাতছাড়া হয়ে গেল তার। একটা সন্দেহ সর্বক্ষণ তাকে তাড়া করে বেড়ায়। অনুরূপ এক বিষ সন্দেহের বশীভূত হয়ে সীতা অবিচার করল তার উপর। দোষ তার সামান্য। সীতার সব গর্ব রামকে নিয়ে। সেই রামকে বশ করার মধ্যে শূর্পণখার একটা গভীর আনন্দ ছিল। লক্ষ্মণকে দিয়ে সীতা তার গর্বের গায়ে আঘাত হানল। নিজের সবচেয়ে বড় সুখের কারণে সীতা তাকে দুঃখ দিয়েছে। তার কাছে এই হারটা শূর্পণখা কিছুতে মেনে নিতে পারল না। একটা তীব্র প্রতিহিংসার উত্তেজনায় তার ভেতরটা অস্থির হয়েছিল। রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলে যে সুন্দর প্রেমের ভুবন সে গড়ে তুলেছিল দণ্ডকারণ্যে, সবই ভেস্তে গেল সীতার জন্য। তার প্রেমহীন জীবনে কাউকে প্রেমে সুখী দেখলে বুকটা ঈর্ষায় জ্বালা করে। হিংস্র ঈগলের মতো ছোঁ মেরে সেই সুখকে ধারালো ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে ভাগাড়ে গিয়ে দু'পায়ে চেপে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে তবেই শান্তি। ঈর্ষায় নিষ্ঠুর, প্রেমহীন, মমতাহীন হওয়ার জন্য শূর্পণখার কোন লজ্জা নেই। লজ্জা তো প্রতিশোধের জন্য নয়। তাইতো সীতা অপহরণের দুর্বুদ্ধি দেওয়ার জন্য রাবণের কাছে তার কোন সংকোচ ছিল না।

এত করেও রাম লঙ্কা আক্রমণ করল না। সীতার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নিল না। তার ফাঁদে পা দিল না। সীতার অপহরণের পর যে সংঘাত ছিল অনিবার্য, রাম তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল। সে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বানর রাজ সুগ্রীবের গৃহে অতিথি হয়ে আনন্দে, বিলাসে দিন কাটাচ্ছে। তবে কি রাবণকে ভয় পাচ্ছে? যুদ্ধে রামের ভয়? আশ্চর্য লাগল শূর্পণখার। মিথ্যে হীনমন্যতার শিকার হয়ে স্ব-স্বভাবকে হত্যা করছে। আপন সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হওয়াও এক ধরণের ভ্রষ্টাচার। রাম এমন করে নিজের বীর পরিচয়টা হারিয়ে বসবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। অথচ, তার সব স্বপ্ন তো রামকে নিয়ে। রাম সক্রিয় না হলে তার প্রতিহিংসা নেয়া হবে না বুকটাও হতাশায় টনটন করে ওঠল তার।

অবশেষে শীতের শেষে রাম লঙ্কা অভিযান করল।

ঋতুরাজ বসন্তের যাদুস্পর্শে পাতাঝরা গাছের গায়ে কচি কচি রক্তিম পাতা মুকুলিত হচ্ছে। আকাশ নীল। নরম উষ্ণতায় ভরে দিয়ে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সেখানে শান্তি নেই, মানুষের চোখে ঘুম নেই। রূপসী প্রকৃতিকে দেখার সময় নেই। রাতের নিদ্রাবিহীন আকাশে তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে। মাঝ আকাশের রণংদেহি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে কালপুরুষ। রাতের আকাশকে শাসন করছে যেন। অনুগত ভক্তের মতো লুব্ধক এই মাঝ রাতে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে বীরকে—দু'পা সামনে পিছনে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে উত্তোলিত ধনু, কটিদেশে দীর্ঘ অসি। নির্মেঘ আকাশ থেকে দেবতাদের লক্ষ লক্ষ চোখ যেন নক্ষত্র হয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে।

কক্ষসংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে শূর্পণখা দেখতে লাগল রাতের আকাশ। প্রকৃতি শান্ত, সীমাহীন, নিরুদ্বিগ্ন। শূর্পণখার আর কোন দুর্ভাবনা নেই, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নেই। মুখে তৃপ্তির হাসি। হু হু করে হাওয়া এসে তার চুল এলোমেলো করে দিল। আদরে, সোহাগে, আনন্দে যেন তারা মুখে অজস্র চুমা দিতে লাগল। কানে কত কী বলল ফিসফিস করে। প্রিয়তম আজ তোমার বিদ্যুৎজিহ্বর বড় সুখের দিন, আনন্দের দিন। ব্যর্থ প্রেমের সুখ তো প্রতিহিংসা ছাড়া হয় না। আমার এই সুখের তুমি ছাড়া এই বিশ্ব দুনিয়ায় আর কেউ তো ভাগীদার নেই। নিশুতি রাতের বাতাস হয়ে সুদূর নভোলোক থেকে কত জনপদ, অরণ্য হয়ে চুপিসারে আমার সেই খুশি ও আনন্দের ভাগীদার করতে তোমার কাছে এসেছি। এভাবে আসতে হয় আমাদের।

সম্মোহিতের মত নিজের অজান্তে বারান্দা থেকে বেরিয়ে বিশাল দালান পার হয়ে কিশোর পুত্র শম্ভুর ঘরে ঢুকল। এমনিতে তার ঘরে আসে না রাতে। স্নেহশীলা দাসী ও বিশ্বাসী যত্নশীল চাকরদের পরিচর্যায় সে ভালোই থাকে। তবু তাকে দেখার জন্য মনটা এই মুহূর্তে বড় উতলা হল।

শূর্পণখার নিবিড় বাহু বন্ধনের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল শম্ভুর। চোখ মেলে দেখল জননী তার গালের উপর মুখ রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। কোমল, ভারী স্নেহময় সে স্পর্শ। শম্ভু পাশ ফিরে মায়ের দিকে মুখ করে শুল। শূর্পণখার টিকল নাক দিয়ে তার গাল স্পর্শ করল, গন্ধ নিল। শম্ভু একটুও নড়ল না। মায়ের বুকের মধ্যে লেপ্টে রইল। শূর্পণখার চোখের কোণ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তার শ্বাস ক্রমশ ভারী এবং উষ্ণ হয়ে উঠল। একটা কিছু শম্ভুর বুকে স্পন্দন তোলে। মায়ের বুকের এক তীব্র জ্বালা তার পিপাসিত অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে টের পায়। টের পায় অনেক কিছুই। শম্ভুর স্পর্শকাতর মনটি -মার জন্য ব্যাকুল হয়। ভিতরকার কষ্ট, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় তার ভেতরটা টনটন করে উঠল। শম্ভু একটু চুপ করে থেকে বলল : মা ঘুমোও নি তুমি?

শূর্পণখা একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। শম্ভু মায়ের বিষণ্ণ মলিন হাসি দেখতে পেল না। তার বুকের কাঁপুনি শরীরের মধ্যে অনুভব করল। প্রত্যুত্তরে শূর্পণখা বলল : না, বাবা, ঘুম আসছে না। জেগে থাকতেই ভালো লাগছে।

কেন মা? কাল তো রামচন্দ্রর বানর সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করার দিন। তাই বুঝি মনটা ভালো নেই তোমার?

শম্ভুর এই আচমকা কথার উত্তরে শূর্পণখা কী বলবে ভেবে পেল না। দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে করতে তার ভিতরটা মরে গেছে। এই যে শম্ভুর মা সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা তার ছদ্মবেশ। মনের গহনে কত কী বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্ত শম্ভু কিছুই টের পাচ্ছে না। জানতে পারছে না অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট প্রতিশোধ স্পৃহায় তার ভেতরটা শিহরিত হচ্ছে। শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে সে দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। সারাজীবন নিজের ও পুত্রের মধ্যে ছলনার এই আড়াল করে, ছদ্মবেশ পরে কি সত্যিই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়? সব সময় মনে হয় সে স্নেহময়ী রাবণ ভগিনী নয়, মমতাময়ী শম্ভুর জননীও নয়—প্রতিহিংসাপরায়ণ এক নারী। শুধুই বিদ্যুৎজিহ্বর পত্নী। পতি-প্রেমই তার জীবন, তার সাধনা, তার মহত্ত্ব—এই প্রেমই তার জীবনের অভিশাপ এবং কলঙ্ক।

শূর্পণখা সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে শম্ভুর দিকে। মনে হল কত কী যেন দেখছে তার চোখের মণিতে। শম্ভুর ভয় হল। অভিমানের একটা তুফান উঠতে চাইছিল। সেটা জোর করে চাপা দিয়ে থমথমে বিষণ্ণ গলায় বলল :মা-গো, তুমি কথা বলছ না কেন?

শূর্পণখা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মেরুদন্ড সোজা করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: মনটা আটকে গেছে, নানা সংস্কার কাজ করছে। মাথার মধ্যে কুয়াশার মত কী যেন জমে আছে। স্বচ্ছ হচ্ছে না। পুরনো কথা মনে পড়ে শুধু। এক একটা নাম, এক একটা মানুষ; এক একটা মানুষকে ঘিরে কত স্মৃতি। যুদ্ধের পাগলা হাওয়া এসে আমার সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে চাইছে।

শম্ভু কিছুই বুঝতে পারল না শূর্পণখার কথা। হতবুদ্ধির মত চেয়ে থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল: মা, মনের কথা বলতে গেলেই বাবার কথা মনে পড়ে যায় তোমার। তাই না?

শূর্পণখার বুক জুড়ে অকস্মাৎ ঝড় উঠল। সে কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। উচিত-অনুচিত বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। বিস্ফারিত দুই চোখ আগুনের গোলার মতো ধক ধক করতে লাগল। বলল: তোর বাবার মধ্যে যে আগুন সেই আগুনকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। মনে মনে সে অনেক কিছু করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। অনেক কিছু প্রতিবাদের জন্য আততায়ীর হাতে তাকে জীবন দিতে হল। সে কথাটা ভুলতে পারি না কিছুতে। অশান্ত মনে তাই প্রশ্ন জাগে প্রতিহিংসাপবায়ণতা কী অন্যায়? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেউ যদি হিংস্র হয়, সে কী অন্যায় তার?

মা, একথার মানে কী?

জানি না বাবা। হঠাৎ মনে এল তাই বললাম। আজ তোর বাবার কথা খুব মনে হচ্ছে। লোকে বলে, আত্মার মৃত্যু নেই। তাহলে তোর বাবার আত্মাও ধোঁয়ার মতো, কুয়াশার মতো কোথাও না, কোথাও আছে। অন্তরীক্ষ থেকে এ যুদ্ধ নিশ্চয়ই দেখতে পাবে সে। পুত্র এই যুদ্ধ নির্যাতিত, অপমানিত বঞ্চিত, দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখাতে, সামাজিক সুবিচারের সুরাহা করতে, মানুষের ভগবানের আবির্ভাব ঘটেছে পবিত্র লঙ্কাভূমিতে। অত্যাচারিতদের বুকের ভিতর থেকে জন্ম নিয়েছেন তিনি। রামচন্দ্রের রূপ ধরে এসেছে। মানুষের প্রতিবাদহীন বশ্যতা, অসহায়তা, অপমান, যন্ত্রণা, বঞ্চনার সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ। ইনি হলেন আমারও স্বপ্নের মানুষ। আমার ইচ্ছে পূরণের মহানায়ক।

শম্ভুর মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। আনমনা উদাস চোখে সে শূর্পণখার দিকে চেয়ে রইল। কিশোর রক্তের তাজা ধমনীর দপদপানিতে অনুভব করল একজন মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত দ্বেষ, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রতিহিংসার এক গভীর যোগসূত্র আছে। এগুলো হল একজন ব্যক্তির তীব্রভাবে বেঁচে থাকার ব্যাপার। এর ভেতরে লুকনো আছে তার জীবনীশক্তির, তার হার-জিতের ব্যাপার। হারের পাশাপাশি জেতার ব্যাপারটা থাকে। যে কোন ভাবে জেতাকে জেতাই বলবে। জেতার জন্য দরকার অনেক ইচ্ছে, উদ্যোগ, সাহস এবং পরিকল্পনা। কারো পরোয়া না করে একা একাই নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে শূর্পণখা।

ব্যাপারটা কিশোর বুদ্ধি দিয়ে শম্ভু আরো ভাল করে ভেবে দেখল। ভেবে দেখে আশ্বস্ত হল যে, জননী যা করছে তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই করেছে। এই কথাটা ভেবেই এক গভীর অব্যক্ত আনন্দ বোধ করতে লাগল। জননীর জন্য একধরনের গর্ববোধও করল। মার মুখের সামনে নিজের আনন্দিত মুখখানি মেলে ধরে বলল: প্রত্যেক মানুষ নিজের মতো করেই বাঁচে। এক জনের বাঁচার সঙ্গে আর একজনের বেঁচে থাকার ধরনের কোন মিল নেই। তোমার কাছে আমি জীবনের বাঁচার মানেটা আবিষ্কার করলাম। তুমি নিজে যেমন আবিষ্কার করেছ সাহসেব সঙ্গে, আমাকেও সেভাবে বাঁচতে শেখালে।

অষ্টআশি দিন ধরে একনাগাড়ে যুদ্ধ চলল। অবশিষ্ট শুধু রণশ্রান্ত বীর, বৃদ্ধ লঙ্কেশ্বর রাবণ। তার মৃত্যুতেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। কিন্তু যুদ্ধে তাকে হারানো সহজ হল না রামচন্দ্রের। হবে কি করে? দেহ তার পাথরের মতো দুর্ভেদ্য। গায়ে এক আশ্চর্য বর্ম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মে মোড়া। কেবল গলার কাছে কোন আচ্ছাদন নেই। সে বর্মে কোন অস্ত্র ভেদ করতে পারে না। তীক্ষ্ণ ধার ভল্লও পারে না চিড় ধরাতে। এই বর্ম গায়ে দিয়ে কত যুদ্ধ করেছে, কত মৃত্যু সে হেনেছে, তবু গায়ে তার আঁচড়টি লাগাতে পারেনি কেউ। মানুষটা যুদ্ধের জন্য যেন বেঁচে আছে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ তার লড়াইও থেমে থাকবে না। বীরশূন্য লঙ্কায় একমাত্র শেষ বীর সে।

শেষদিন এলো মৃত্যুকে বুকে নিয়ে। সেই ভয়ঙ্কর দিনে শূর্পণখা লঙ্কায় ছিল। দুর্গের গম্বুজে দাঁড়িয়ে শেষ দিনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখেছিল। পুত্র শোকাতুর পিতা স্বজন হারানো মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। বীর বিক্রমে একা রাবণ গোটা রণভূমি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। রাঘব বাহিনী মৃত্যু ভয়ে যে দিকে পাচ্ছে পালাচ্ছে। অঙ্গদ, নীল তাদের সামলাচ্ছে।

সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুমান রাবণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান রাবণকে পাথর করেছে। সেই পাথর তেতে উঠেছে। তার অগ্নিময় ক্রোধ আর প্রতিশোধ স্পৃহা আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ফুটছে। রামচন্দ্র তার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। রাম কোনকালে সম্মুখযোদ্ধা নয়—সে যুদ্ধক্ষেত্রে সামনা সামনি আসে না। তাকে ধরা যায় না, মারা যায় না। বীরেরা যখন বর্শা ছোঁড়ে, তরোয়াল নিয়ে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তখন সে দূরে দূরে পা ফেলে শিকারীর মতো তক্কে তক্কে থাকে। দূর থেকে ধনুকের ছিলায় তীর লাগিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে নিক্ষেপ করে ঘায়েল করে শত্রুকে। এভাবে সে খর ও দূষণকে পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে বধ করেছিল। রাবণের বীর সন্তান বীরবাহু চিত্রাঙ্গদ ও অন্যান্য পুত্রদের হত্যা করেছিল।

দ্বিপ্রহরের খররোদ পড়ে রাবণের শিরস্ত্রাণ জ্বলজ্বল করছে। দুর্গ থেকে মন্দোদরী দূরবীণে তা দেখল। দূর থেকে রাবণকে লক্ষ্য করে বিভীষণ কী যেন বোঝাল রাম লক্ষ্মণকে। হাত দিয়ে বারংবার

গলার কাছে বর্মহীন জায়গাটা দেখাচ্ছিল। সেই সময় মন্দোদরী হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় বক্ষবিদারী চিৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠল : স্বামী, ওরা তোমাকে বাঁচতে দিল না। আমাকে অনাথ করার ষড়যন্ত্র করছে। আমার এই শরীরটার উপর বিভীষণের লোভ। আমাকে পাওয়ার জন্য ও মরিয়া হয়ে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তুমি গেলে আমার গর্ব করার কিছু থাকবে না।

পাথরের দেয়ালে সজোরে মাথা কুটতে লাগল মন্দোদরী। কপাল ফেটে তার রক্ত পড়তে লাগল।

মন্দোদরীর আশঙ্কা সত্য হলো। একসঙ্গে অনেকগুলো তীর রাবণের কণ্ঠে বিঁধল। পরপর তিনটি তীরের মারাত্মক আঘাতে গলাটা জীর্ণ হয়ে গেল। তবু রাবণ রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল না। প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করে নিজের হাতে গলদেশ থেকে তীরগুলো টেনে টেনে বার করল। ক্ষতটা বড় হয়ে গেল, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সারা বুক রক্তে ভিজে গেল। মাথাটা কাঁধের উপর লটর পটর করতে লাগল। ঘাড়ের সঙ্গে ঝুলে রইল। দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। মাটির বুকে আছড়ে পড়ল। আর উঠল না।

মন্দোদরী মূর্ছা গেল।

এক ঝাঁক পায়রা ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে উড়ে গেল আকাশের দিকে।

শূর্পণখাও ককিয়ে কেঁদে উঠল। মনে হলো বুকখানা তার ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তার কোন আশ্রয় থাকল না। মাথার উপর বাড়ির ছাদ উড়ে গেলে যেমন হতভম্ভ হয়ে যায় ঠিক তেমনই একটা হতচকিত বিহ্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করল। নিজের মনের অন্তস্থলে নিজের কৃতকর্মের অপরাধবোধ সেই মুহূর্তে দুর্বার হয়ে উঠল। দুর্গের ভেতর সে আর তিষ্ঠতে পারল না। দুরন্ত অস্থিরতা তাকে দুর্গ থেকে বাইরে টেনে আনল। একবার নিজের চোখে সে নিহত রাবণকে দেখতে চায়। অদ্ভুত মেয়েমানুষের মন আর অদ্ভুত সেই মনের গতি।

চলতে চলতে মনে হল সশস্ত্র সৈন্যরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রচন্ড ঘৃণায় পেছন থেকে তার মাথা তাক করে তরবারি তুলেও নিজেদের সংযত করল। শূর্পণখা দেখল, উদ্যত তরবারি খাপে ঢোকাচ্ছে তারা।

দূর্গের বাইরে এসে যখন দাঁড়াল তখন অস্তাচলে সূর্য। গোটা আকাশখানা রক্তের মতো লাল। চরাচর জুড়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে নিবিড় হয়ে। বিধুর সান্ধ্যপরিবেশে খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার ভেতরটা টাটাতে লাগল।

রণক্ষেত্র জুড়ে আহত, মুমূর্ষ মানুষেব যন্ত্রণা, আর্তনাদ, বিলাপ, শূর্পণখাকে অস্থির করে তুলল। দু'কানে আঙুল দিয়ে সে রক্তে রাঙানো প্রান্তর দিয়ে জোরে হাঁটতে লাগল।

রাবণের প্রাণহীন দেহের সামনে কাঠের মুর্তির মতো দাঁড়াল। কিছুক্ষণ ধরে সে কিছুই দেখছিল না, শুধু দাঁড়িয়েছিল। তারপর তাকে দেখা মাত্র চমকে উঠল।

রাবণের অপলক দুটি চোখ খোলা। অধরে স্মিত হাসি।

নির্বাক নিস্পন্ন দৃষ্টি বিনিময় হলো কয়েকমুহূর্তের জন্য। রাবণের জ্যোতিহীন সাদা দুটি চোখ তার দিকে চেয়ে হাসছে।

শূর্পণখার মনে হলো, সে যেন নিঃশব্দে অভিযোগ জানাচ্ছে তার প্রতি। বলছে, তুমি প্রতিশোধ নিয়েছ। লঙ্কার ধ্বংসের জন্য তুমি ও বিভীষণ দায়ী। ইতিহাস তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করবে না। তোমাদের মতো মানুষ পৃথিবীতে যত কম জন্মে ততই মঙ্গল। তোমরা শুধু নিজেকে ভালোবাসো। ধিক্ তোমাকে। তোমাদের বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। তুমি আমাকে ঠকিয়েছ।

সর্বাঙ্গে আচমকা একটা তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল শূর্পণখার। বিষাদের গহ্বর থেকে এ কোন স্বীকারোক্তি করল? চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখছে শূর্পণখা। দু'চোখে সমস্ত জোর দিয়ে শূর্পণখা দেখতে চেষ্টা করছে রাবণকে। নিরুচ্চারে বলল : আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

শূর্পণখার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল বার দুই। দু'চোখে ঝাপ্সা দেখছে। দুচোখ ভর্তি তার জল।

যোজনগন্ধা সত্যবতী



পরম শ্রদ্ধেয়
আমার দুই মাস্টারমশাইকে
শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরথকুমার বসু

সত্যবতীর মনে শান্তি নেই। মনের অতলে নিরন্তর নানাবিধ যে প্রতিক্রিয়া হয় তার ছাপ পড়ে মুখে। তাই এক যন্ত্রণাবিদ্ধ কষ্টে মুখখানা মলিন হয়ে থাকে। কিন্তু মনের সে খবর নেয়ার লোক নেই তার। সত্যবতী রাজ-অন্তঃপুরে একেবারেই একা। অনেকটা বন, নদী, পাহাড় প্রান্তরের মত একা। তাদের অন্তরে ভালবাসার দাহ নেই, যন্ত্রণা নেই। কিন্তু একজন মানুষ তো অনেক মানুষের মধ্যে বাস করে। তাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করেই সে বাঁচে। কিন্তু সেখানে টান ধরে যখন পাওয়ার ঘর শূন্য হয়ে যায়, তখন তার মত দুঃখী আর কেউ হয় না। শূন্যতা শুধুই শূন্যতা— ঘরে বাইরে চারধারে। অনুরূপ এক গভীর শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কেবলই মনে হয়, তার আসল ঝগড়া সপত্নীপুত্র ভীষ্মের সঙ্গে। কিন্তু সে বিরোধ প্রকাশ্যে টেনে আনতে চায় না। মনের অতলে বৈরিতার আগুন। নেভা আগ্নেয়গিরির মত তাপ বিকীরণ করতে থাকে।

সত্যবতী ভাল করেই জানে ভীষ্মের সঙ্গে ঝগড়া করে সংঘাতের নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরী করা যায়, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই তার। তাই রাজ অন্তঃপুরে পিতৃহীন নাবালক সন্তান, আত্মীয় কুটুম্ব পরিচর্যায় এবং সংসার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। সপত্নীপুত্র ভীষ্ম থাকত নিজের বর্হিজগতে বেশি সময়, পিতার অবর্তমানে হস্তিনাপুরের রাজনীতি, জননীতি এবং ক্ষমতানীতির ক্রমবর্ধমান পরিসরে। তখন রাজনীতিতে ক্ষমতার উন্মাদনা অনুভব করত না সত্যবতী। পুত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিধি ছিল সীমিত। কোনদিন ভীষ্মের সঙ্গে দুর্নিবার সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা সত্যবতীর মনেই হয়নি। ভীষ্মের কার্যকলাপে সে ছিল মোটামুটি সন্তুষ্ট। প্রথমে জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং পরে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু তার সব হিসেব গোলমাল করে দিল। সেই প্রথম ভীষ্ম সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জাগল। সত্যবতীর বিশ্বাস ভীষ্ম খুব সংগোপনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজ করছিল। পথের কাঁটা ভেবেই সিংহাসনের প্রকৃত দুই উত্তরাধিকারীকে এমন করে সরিয়ে দিল যে, কেউ অপরাধী ভাবতে পারবে না তাকে। তাদের না বাঁচার জন্য ভীষ্মকে ভয়ানক শত্রু মনে করে সে। শুধু ভীষ্মের জন্যই তার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল। বোধহয় তাকে বেশি বিশ্বাস করে যে শুধু ঠকেনি, হেরেছেও।

কথাগুলো বড় দেরি করে বুঝল সত্যবতী। সময়ের মধ্যে নিজের ভুল না বুঝলে সে বোঝার কোনও অর্থ থাকে না। সব বোঝাই তখন নিরর্থক হয়ে যায়। মেয়েরা বড় নির্বোধ আর বোকা। বিশ্বাস করে ঠকে এবং হারে। তাদের সব আস্থা, ভরসা, ধারণাকে কোনো চালাক মানুষ তার অজান্তেই চোখের সামনে ধারাল বুদ্ধি দিয়ে ইঁদুরের মতো ইতর দাঁতে কেটেকুটে ছিন্নভিন্ন করে। ভীষ্মের মতো ভালো ছেলে যে কখনও সেরকম কিছু করতে পারে, এইটাই সে বোঝেনি। এখন মনে হচ্ছে, জীবনের অনেক কিছু বুঝতে সময় লাগে জীবনভর। আর তার সব বিশ্বাস ভাঙতে লাগে একমুহূর্ত।

অনেক অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বুঝেছে, রাজনীতি বড় কঠিন খেলা। এখানে সত্য, মিথ্যে, ন্যায়, অন্যায় পাপ পুণ্যের স্থান নেই। রাজনীতির মূল কথাই হল প্রতিপক্ষকে হারানো এবং নির্মূল করা। ভীষ্মও কূটকৌশলে হারিয়ে দিল তাকে। একা থাকলে এই অনুভূতিটা কুরে কুরে খায় অনুক্ষণ। আর তখন অনেক কথা মনে পড়ে যায়। সুদূর অতীতকে তখন দেখতে পায়।

জীবনের রূপ-রঙ-ছন্দ সব হঠাৎই নিজের অজান্তে বদলে যায়। অথচ এই বদলে তার নিজের কোনো ভূমিকা ছিল না। সে শুধু সময় প্রবাহে ভেসে গেছিল। কাল সবেগে শুধু আকর্ষণ করে তার দিকে। গোটা জীবনটাই তার মহাকালের এক অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি। মহাকাল সত্যিই তাকে নিয়ে কী করতে চায় সে নিজেও ভালো করে জানে না। একাকীত্বের মধ্যে যখন নতুন কোন তরঙ্গ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তখন ভাসতে ভয় লাগে, চেনা গণ্ডীর বাইরে পা দিতে সাহস হয় না।

তবু জীবনের অন্য এক আলোকিত প্রান্তরের দিকে হাতছানি দিয়ে কে যেন ডেকে নেয় তাকে। মনের আলোয় আভাসিত হয়ে ওঠে তার অতীতটা। অনেক কথাই মনে পড়ে সত্যবতীর। অনেক বছরের গণ্ডি নিমেষে পার হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছিল চতুর্দশী মৎস্যগন্ধাকে। পঞ্চাশ বছরে পা রেখেও পঁয়ত্রিশ বছর আগের জীবনকে দেখতে পাচ্ছিল। বুকের মধ্যে প্রথম প্রেমের কল্লোল শুনতে পেল।

কল্লোলিনী যমুনার উচ্ছল তরঙ্গ প্রাণের খুশিতে ভরপুর তখন। বসন্তের হাওয়া রতিরঙ্গে মেতেছে তার সঙ্গে। ভুবনমোহিনী যৌবনগর্বিতা নটীর মত সেও চলেছে অভিসারে। তন্ময় হয়ে মৎস্যগন্ধা যমুনার ঢেউ দেখছিল। রোজ দেখে। তবু এই নদীর কত কী দেখা হয়নি, কত দৃশ্য অদেখা রয়ে গেল। আজ তার বুকের ভেতর কেমন যেন ঢেউ-এর উন্মাদনা জাগল। ঢেউগুলো এ ওর গায়ের ওপর পড়ে হাসতে হাসতে কৌতুকে অশেষ আনন্দ করতে করতে চলেছে যেন। কোথায় যে চলেছে তারা, কে জানে? তবু ওই চলমানের সঙ্গে সঙ্গে তার মনটাও চলতে ইচ্ছে করে। শুধুই চলার মধ্যেও বোধহয় একধরনের আনন্দ আছে।

নির্জন নদীতীরে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। তবু পরাশরের সন্ধানী দৃষ্টি ঠিক তাকে খুঁজে নিল। নদীর ওপর হেলে পড়া একটা বাবলা গাছের সঙ্গে বাঁধা মাছ ধরা ডিঙিতে স্তূপাকৃত একরাশ অগোছালো জালের মধ্যে সে চুপ করে বসেছিল। পরাশর তার দিকে এগিয়ে গেলে চার চোখে মিলন ঘটল। অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে না পেরে মুখ নিচু করল। দুরন্ত লজ্জায় সে রঙিন হয়ে উঠল।

পরাশর মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকেই দেখছিল। এক পা এক পা করে তার দিকে যেতে যেতে হোঁচট খেল। পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। তাই দেখে মৎস্যগন্ধা হেসে ফেলল। উচ্চকিত শব্দ করে হাসল। উলুধ্বনির মত সে হাসি যমুনার তরঙ্গের মত চলকে চলকে চলে। চারদিকে হাসির রঙ, লাবণ্য উপচে পড়ে যেন অবলীলায়। তার ঝঙ্কার এবং শ্রুতিমাধুর্য ছিটকে গেল চতুর্দিকে। বিদ্যুৎচমকের মত পরাশরের অনুভূতি উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান হল। তার সমস্ত হৃদয় মুহূর্তের মধ্যে গন্ধবতীর দিকে ধাবিত হল। তখন হুঁশ ছিল না তার। অনাস্বাদিতপূর্ব এক সুখের অনুভূতিতে তার হৃদয় পুড়তে লাগল। খুব কাছে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে ডাকল পরাশর। মৎস্যগন্ধা, আমি পরাশর। তুমি আমাকে ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলিনি। দেখেই চিনেছি। সেই চোখ, সেই মুখ, নাক, গায়ের রঙ, হাসি এসব তো লুকনো যায় না।

পরাশরের কথা শুনে গন্ধবতীর হাসি কখন যে মিলিয়ে গেল সে নিজেও জানে না। হাঁ, হয়ে ঋষিকে দেখতে লাগল। পরাশর তার থমথমে নীরব নিথর দুই চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, চিনতে পারনি তো!

মৎস্যগন্ধা নঞর্থক মাথা নাড়ল। পরাশর বলল : তোমাকে কুড়িয়ে পেয়ে আমি দাসরাজার কাছে গচ্ছিত রেখে গুরুগৃহে বেদ-অধ্যয়ন করতে যাই। চোদ্দ বছর পরে স্বপ্নে তোমাকে দেখলাম। ঘুম ভেঙে গেলে এক নতুন মনের সূচনা হল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমার হৃদয় সমুদ্রে এ কিসের কল্লোল? কোথা থেকে এ তুফান এসে জীবনের মূল ধরে টান দিল?

তারপর এক গভীর তীব্র ভালো লাগায় পরাশর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো সোহাগ গলায় বলল : মৎস্যগন্ধা তোমাকে ভীষণ ভালো লাগছে আমার। যৌবন তোমাকে সুন্দর করেছে। আজ তোমার কাছে আমার অনেক দাবি। একদিন যে জীবন রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করেছি, সেই জীবন আমার বাঁচার জন্য চাই। লজ্জায় নিজেকে তুমি লুকিয়ে রেখ না। রাখলে আমি বাঁচব না। অনেক পথ হেঁটে, পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পার হয়ে তোমকে দেখব বলে এসেছি। এখন কী ভালো লাগছে আমার।

মৎস্যগন্ধার কথা হারিয়ে গেল। বিষম লজ্জা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করল। অন্তর্বাসহীন বুকের উপর কাপড়খানা টেনে দিয়ে পরাশরকে দেখতে লাগল। পরাশরের বয়স হলেও যৌবনোচিত আকর্ষণ তার চোখ দুটিকে আটকে রাখল। আর তাতেই তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। পরাশরেরও চোখের পলক পড়ছিল না। সময়ের গতি তখন দুরন্ত।

কোথা থেকে কি হয়ে যাচ্ছিল দু'জনের ভেতর ভালো করে বোঝার বোধশক্তি ছিল না। এক

অবোধ রহস্যময় নিবিড় অনুভূতি তাদের চেতনাকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করছিল আর তারা নিবিড় আশ্লেষে একে অপরকে পাওয়ার এক অনাস্বাদিত গভীর সুখানুভূতির মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল। কী দ্রুত একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে তারা প্রবেশ করছিল। সমর্পণের আবেগে উভয়ে ব্যাকুল তখন, ভাবার সময় কোথায়? প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে রক্তে তখন দুরন্ত তৃষ্ণা, কোষে কোষে নিবৃত্তির ক্ষুধা। ডিঙির দড়ি খুলে পরাশর স্রোতের মুখে ঠেলে দিল। ভেসে গেল মাঝদরিয়ায়। অভিনব আদর, অনাস্বাদিত জীবন, চমৎকার আনন্দ, শরীরে মনে নতুনত্বের স্বাদ কানায় কানায় ভরে যাচ্ছিল, সারা শরীর যেন গান গেয়ে উঠল। সঙ্গম সুখের প্রার্থনায় জীবনের মানেটা হঠাৎই আবিষ্কার করল সাহসের সঙ্গে। মহিষকালো স্তূপাকৃতি জালের উগ্র আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিশল তাদের গায়ের গন্ধ। চারপাশে ছড়ানো জালের স্তূপ তাদের আড়াল করল। শুকনো জালের মরমর শব্দের সঙ্গে সঘন নিঃশ্বাসের শব্দ যমুনার কল্লোল মিলে মিশে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ যমুনার তরঙ্গের মতই উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে গেল তাদের শিরায় শিরায়।

তখনই এক বুক ভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল সত্যবতীর। আর তাতেই চমকাল সে। বহুকাল পরে চতুর্দশী তরুণী মৎস্যগন্ধাকে দেখল। পঁয়ত্রিশ বছর পরেও চতুর্দশী আছে সে। একটুও পরিবর্তন হয়নি। কালও তাকে ছোঁয়নি। উৎসুকী কৌতূহলী মনটা কেবল তাকে নতুন করেছে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে জীবনের প্রথম পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সম্পর্কটা বোধ হয় তার সন্তানের মধ্যে বেঁচে আছে। বুকের মধ্যে দপ করে স্মৃতির দীপ জ্বলে ওঠল। গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ছায়াবৃত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পরাশর। মুখে সেই অনির্বচনীয় হাসি। বলল : প্রিয়তম, এক দারুণ সংকটের মধ্যে তোমার দিন কাটছে। মহারাজ শান্তনুর নজর পড়েছে তোমার ওপর। কল্মাষপাদ রাক্ষসের মতো তোমাকে গ্রাস না করা পর্যন্ত সে নিবৃত্ত হবে না। রাজার পথ আগলে দাঁড়ানোর মত আমরা কী আছে, যা নিয়ে তোমাকে রক্ষা করব। আমাদের চলার পথ এখন আলাদা। তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার। যে যার পথে একা চলব মনের চোখকে ঢেকে রেখে। তোমার চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা দ্বৈপায়ন। তাকে নিয়ে আমি চলে যাব মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ চলে গেছে সেইদিকে। তুমিও কুমারী হয়ে যাবে। তোমার কোন ঝঞ্ঝাটই থাকবে না।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন তুলোপেঁজা হয়ে যেতে যেতে যোজনগন্ধা হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠল। পরাশরের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল : চুপ কর। আমি আর শুনতে পারছি না। বিশ্বাস কর, আমি কোনও দোষ করিনি। তবু বিশ্রী কথাগুলো আমাকে শুনতে হচ্ছে। অনুযোগ অভিযোগের একটা সময় থাকে। আমিও যে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি একবারও সেকথাটা ভাবলে না। সারাজীবন তো কল্মাষপাদ রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটালে। পারলে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে? দৈত্যের মতো হানা দিয়ে মহারাজ শান্তনু যখন আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে, আমার চারপাশের জীবন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে মনটা কিছু করতে চাইছে, তখন তুমি আমাকে তিরস্কার করছ? কী সাংঘাতিক মানুষ তুমি!

চমকে পরাশর যোজনগন্ধার চোখের উপর চোখ রাখল। বলল, জ্বলে মরছি আমি সেই অপরাধের গ্লানিতে, তোমাকেও ছিন্নভিন্ন করছি। এ আমার দোষ, অন্যায়। হাত ধরাধরি করে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু ভেতরের ইচ্ছেটা কিছুতে বাইরে করা সম্ভব হচ্ছে না বসে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করছি। কল্মাষপাদ রাক্ষসদের হারিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু মেরে ফেলা যায় না। আমাদের সুখশান্তির উপর হানা দিয়ে একটা সুন্দর সুখী জীবনকে নষ্ট করে দেয়। তাই, আমি যা পারিনি আমার সন্তানকে তাই করতে শেখাব। অবিচারকে অবিচার দিয়েই মুছতে হয়। অন্যায় দিয়েই অন্যায়কে সরাতে হয়। অন্যায়, অবিচার পন্থা হিসেবে দারুণ। বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুলের যেমন কোন বিকল্প হয় না। সেরকম তোমার নামের বন্ধনের টানেই তেমার পুত্রও আপদে, বিপদে সংকটে সর্বক্ষণ তোমার সহায় হবে এবং পাশে থাকবে। হেরে গিয়েও জেতা যায় যোজনগন্ধা। বাঁচার মত বাঁচার জন্যই শান্তনুর কাছে হেরে গিয়ে তোমাকে সামনে রেখে আমার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জীবন মানেই বেঁচে থাকা, সবটাই বর্তমান—এই মুহূর্ত থেকে পর মুহূর্ত পর্যন্ত।

বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে গভীর খেদে স্বগতোক্তির মত করে উচ্চারণ করল

যোজনগন্ধা। মানুষের মত সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জীব, বিধাতা আর একটিও তৈরি করেননি।

বিধাতার এ এক কঠিন পরিহাস। কষ্টে উচ্চারণ করল পরাশর।

অনেক পুরনো কথা। তবু কী অশ্চর্য! সব সেরকমই আছ। একটুও বদলায়নি। এমন কি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। কাল তাকে জীর্ণ করতে পারেনি। কোথাও কোনো দৈন্য নেই। তবু এতকাল পরে এতসব কথা মনে হয় কেন? পিতা দাসরাজের কথাগুলো হঠাৎই মনে পড়ল। মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের রূপকার। দুঃখকে আনন্দ করার ভার তার নিজের হাতে।

সত্যবতীর ভাবনাটা থমকে যায়। কিন্তু গন্তব্য জানা না থাকলে সাফল্যের মধ্যেই এক গভীর ব্যর্থতা থেকে যায়। তবু এসব ভাবনার মধ্যে একটা কিছু অন্বেষণ করছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, একটা কিছু হবে, কিছু ঘটবে জীবনে, একটা মোড় ফিরবে নিশ্চয়ই। নইলে এতকাল পরে এমন করে অতীতের কথা মনে হবে কেন? এই যে একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে; বর্তমান, ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশে অতীতকে মনে পড়ল, সে তো শুধু স্মৃতি নয়, মনে পড়া নয়, বাস্তব অনুভূতি। এক স্বপ্ন দৃশ্য যেন। অন্ধকারের ভিতর থেকে পঞ্চমবর্ষীয় দ্বৈপায়নের শরীরটা ফুটে উঠছিল। অবাক হয়ে চেয়ে ছিল তার দিকে। এক মায়াবী আলো ঘিরে ছিল তার মুখমণ্ডলে।

তখনই মনে হলো, এই পুত্রই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে তাকে। একমাত্র ছেলের কাছে মায়ের কোন লজ্জা নেই। মনের কথা অকপটে শুধু তাকেই বলা যায়। নিজেকে উন্মোচিত করার এমন নিরাপদ জায়গা খুব কম আছে। তার সঙ্গে ছত্রিশনাড়ীর বন্ধন। শুধু কি তাই, উভয়ের ধমনীতে যে রক্তস্রোত বইছে, তার উপর দাবি করার পুরো অধিকার তার আছে। পুত্র দ্বৈপায়নই এ নির্বান্ধব শত্রুপুরীতে তার একান্ত কাছের মানুষ। হয়তো সে কারণেই তার ওপর বেশি নির্ভর করছে। একমাত্র দ্বৈপায়নকে সামনে রেখে সত্যবতী তার নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চাইল। এবং পরিবারের অভ্যন্তরে তার গুরুত্ব ও প্রভুত্বকে বাড়িয়ে তোলা খুবই জরুরী মনে করল। সে কারণে সত্যবতী খুব সাবধানে চতুর্দিক গুছিয়ে সুকৌশলে পুত্র দ্বৈপায়নকে কৌরব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার এক ছক আঁকল।

মনের আলোয় আভাসিত হয়ে ওঠে এক অনাগত ভবিষ্যৎ। বীজের মত উপ্ত আছে মনের ঘরে। সেই বীজ অঙ্কুরিত না হলে তো গাছ হয় না। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য কতকগুলো অবস্থার দবকার। সেই অবস্থাগুলোর ভেতর দিয়ে না গেলে গাছ ফুলে ফলে ভরে ওঠে না। অনেক কিছু উৎপাত, উপদ্রব আর ভয়ের এলাকা পার হয়ে তবেই গাছে ফুল ধরে, ফল হয়। মানুষের কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা পূরণও অনেকটা বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং গাছে ফল ধরার মত। আসল কথা হলো, মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, প্রত্যাশার পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারলে একজন ব্যর্থ মানুষও প্রচণ্ড সফল হতে পারে। উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও ইচ্ছে ঠিক থাকলে একজন খঞ্জও দুর্গম পাহাড়ের শীর্ষে উঠতে পারে। বারংবার মনে হতে লাগল জীবনের সব ঘটনারই একটা মানে আছ। পরাশরের সঙ্গে প্রেম, মিলন. সন্তান, শান্তনুর প্রণয়, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, চিত্রাঙ্গদা এবং বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যু প্রভৃতির উপর তার কোন হাত নেই। তবু এসব কিছু না ঘটলে হয়তো দ্বৈপায়নের জন্য এই প্রতীক্ষা তার থাকত না। তাকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার এই সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হত না। এসব কথা মনে হলেই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। ঝড় উঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে তার অসহায়তা তার হতাশা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। আর তখনই পুত্র দ্বৈপায়ন ছাড়া অন্য কারো কথা মনে হয় না।

দ্বৈপায়নের আকস্মিক 'মা' ডাকে সত্যবতীর তন্ময়তা ভঙ্গ হল। শাঁখের মত বেজে গেল তার ভেতরটা। উন্মুখ প্রতীক্ষার অবসান হল। কতকাল পরে দেখল তাকে। পঁচিশ বছরে কত বদলে গেছে দ্বৈপায়ন। বাল্যের সেই মুখখানা শ্মশ্রু, গুম্ফের মধ্যে চাপা পড়েছে। তবু আত্মজ বলেই রক্তের টানে তাকে চিনল। এক গহীন চিরপ্রদোষের দ্যুতি ছড়িয়ে আছে তার মুখমন্ডলে। মুগ্ধ সত্যবতীর বিহ্বল দুটি চোখ এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল। দ্বৈপায়ন তার ছেলে। তারই ছেলে! প্রথম প্রণয় কুসুম। দু'হাতে তাকে টেনে নিল বুকে। আতসবাজির মত নানা রঙের বিস্ফোরণ ঘটে গেল সেখানে। পুত্রের লোমশ বুকের ওপর মুখ ডুবিয়ে সারা গায়ের ঘ্রাণ নিল। বলল, জানতাম, তুমি আসবে। সব কুশল তো!

দ্বৈপায়নও অভিভূত বিহ্বল। এক অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকে ভরে যেতে লাগল তার ভেতরটা। নিজেকে প্রকাশ করার কোন অভিব্যক্তি ছিল না তার। কিন্তু তার চোখের তারায় ফুটে উঠল এক নীরব সহমর্মিতা। জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ল। কিন্তু আজ তা দূর জ্যোতিষ্কের মতো অনেক দূর সরে গেছে। তার দ্যুতি পড়ে মনটা উজ্জ্বলিত হয় না। তবু মায়ের নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এক অভিনব আবেগ জাগল। বলল : আমায় ডাকলে কেন মা?

পুত্রের মনকাড়া কথায় সত্যবতীর হঠাৎ সব তালগোল পাকিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার চোখের ওপর চোখ রেখে স্থির হয়ে রইল। তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল জোরে, সশব্দে। দ্বৈপায়ন একটু চমকে বলল : মা তোমার নিশ্বাসে ব্যর্থ জীবনের হাহাকার আমাকে আকুল করে তুলছে।

কথাটা শুনে সত্যবতীর গায়ে কাঁটা দিল। দেহমন জুড়ে সুরের কল্লোল। মনে হল, আর সে একা নয়। তার পাশে আছে সুযোগ্য পুত্র। এই কথাটা অনেকক্ষণ ধরে তার মনে যাওয়া আসা করল। বারংবার মনে হতে লাগল, পুত্রের হাত ধরে বাধা বিপত্তির সিঁড়ি ভেঙে সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজায় খিল দিয়ে সত্যবতী, পুত্রকে হাত ধরে পালঙ্কে এনে বসাল। আস্তে আস্তে বলল : পুত্র এক দারুণ সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। তোমার সহোদর বিচিত্রবীর্যের কোনো সন্তানাদি নেই। অথচ, আমি ভীষণভাবে চাই তার বংশধরের হাতে এ সিংহাসন অর্পণ করতে। কিন্তু তা না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। আমার সে সাধ পূরণ করতে পার না তুমি?

দ্বৈপায়ন একটু অবাকই হল। বলল : মা, আমি সন্ন্যাসী আজন্ম ব্রহ্মচারী। তোমার বাসনা পূরণ করি কেমন করে?

পিতার আদেশ পালন করতে পরশুরাম গর্ভধারিণী জননীকে কুঠারাঘাত করতে একটুও দ্বিধা করেনি। মাতা বলেই কি অবহেলার পাত্র। পিতার আদেশে যা করা যায়, মায়ের নির্দেশে তা করায় কি কোন বাধা আছে?

থমথমে গম্ভীর গলায় দ্বৈপায়ন বলল : কী হয়েছে তোমার?

অভিমান হল সত্যবতীর। বলল : তুমি পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম করতে যাও। তুমি সন্ন্যাসী, আজন্ম ব্রহ্মচারী। তোমার কাছে প্রত্যাশ করা অন্যায় হয়েছে আমার।

দ্বৈপায়নের অধরে স্মিত হাসি। বলল : অনেককাল পরে মাকে ফিরে পেয়ে আর মা-হারা হয়ে থাকতে চাই না। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। কথা বলছ না কেন মা।

দুঃখ কষ্ট বঞ্চনা মানুষকে সুস্থ রাখে না। বুকের আগুনে পুড়ছে আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, শাসনা—সব। পাষাণ দেবতার সাধ্য কি সে আগুন নেভায়? কেবল তোমার মত ঋষিই পারে এ আগুন নেভাতে।

মাগো, আমার ওপর তোমার এই বিশ্বাসের হেতু কি জানতে পারি?

পুত্র, কার ওপর কিভাবে বিশ্বাস সৃষ্টি হয় বিশ্বাসকারী নিজেও জানে না। কিন্তু আমার তোমার জীবনের ওপর যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া থেকেই হয়তো এ বিশ্বাস জন্মেছে। বিশ্বাস মানেই অন্য এক আশ্রয়ের সন্ধান, একটা নির্ভরতা। বোধ হয় একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত। কিংবা কালচক্রের আকর্ষণেই তুমি আমি একত্র হয়েছি। পুত্র, তোমার পিতা একদিন বলেছিল : যোজনগন্ধা, তুমি মহাকালের যজ্ঞের এক সমিধ। আমি, শান্তনু, ভীষ্ম তার ইন্ধন, আর পুত্র দ্বৈপায়ন হল দৈবের কর্মকাণ্ডের মহাঋত্বিক, মনে হচ্ছে, সত্যদ্রষ্টা পরাশরের ভবিষ্যৎবাণী আজ সত্য হতে চলেছে। আমাদের সকলকে নিয়ে মহাকাল আর্য-অনার্য বিদ্বেষ এবং ঘৃণার এক প্রতিশোধ নেবে।

দ্বৈপায়নের অধরে অনির্বচনীয় হাসি কৌতুকে বর্তুল হল। বলল : মা, বুকের আগুনে তুমি জ্বলছ। তোমার মনটা আজ ভীষণ অশান্ত। একটুতেই প্রগলভ হয়ে পড়ছ।

সত্যবতী তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল : না। দেবতার তৈরি বিচিত্র ছলনার জালে বাঁধা পড়ে গেছে আমাদের ভাগ্য। আর বোধ হয় মুক্তি নেই।

মাতা ও পুত্রের মধ্যে নীরবতা স্তব্ধতাকে গভীরতর করে তুলল। অনেকক্ষণ পরে সত্যবতী তার উদ্বেগের ওপর খুব সন্তর্পণে একটা একটা করে কথা বসাতে লাগল। শুরু করল অনেক আগে

থেকে। বলল, পুত্র এই দুনিয়ায় মানুষ চেনা সহজ নয়। একদিন পিতার বাসনা পূরণ করতে দেবব্রত নিজের কামনা ডালি দিয়েছিল। সিংহাসনের দাবিও ত্যাগ করেছিল। আমাকে মা বলে ডেকেছিল। আমরা উভয়ে সমবয়সী। তবু মাতৃজ্ঞানে আজও আমাকে সমান শ্রদ্ধা করে সে। আমার আজ্ঞা ছাড়া কোন কাজই করে না। তবু মনে হয় সে অত্যন্ত ধূর্ত এবং চালাক। তোমার সহোদর দুই ভাই চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার সম্পর্কে আমার বিশ্বাসগুলি কেমন দুর্বল হতে লাগল। নানারকম সংশয়ে অবিশ্বাস ক্রমেই তা জটিল হয়ে উঠল। কেবলই মনে হয়, বিশ্বাস করে তাকে ভুল করেছি। ভীষ্ম তার নিজের বঞ্চনা থেকে সুকৌশলে জয় আদায় করে নেয়ার এক বিচিত্র ফন্দী এঁটেছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করে চলেছে। ভীষ্মই সর্বেসর্বা। কুরুজাঙ্গালের অধিপতিরূপে প্রতিবেশী দেশের নরপতিরা তাকে সমীহ করে, মান্য করে। গোটা হস্তিনাপুর কার্যত তার আদেশ ও নির্দেশে চলে। নাবালক ভ্রাতাদের প্রতিনিধি হয়ে সে শুধু গোটা দেশটা শাসন করছে না তার প্রকৃত শাসক হয়ে বসেছে। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য বেঁচে থাকতে আমি তার কার্যকলাপের দিকে ফিরেও তাকায়নি। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি, রাজ্য বিস্তারের জন্য কী করলে ভাল হয় ভীষ্ম একাই স্থির করত। আমি কিছু বুঝতাম না। বোঝার কোনদিন প্রয়োজন হবে মনেও হয়নি। পুত্রদের অকাল মৃত্যু হওয়ার পরে আমি হিসেব নিকেষ করতে বসেছি। আমার পাওয়ার ঘর শূন্য হয়ে গেছে। আমি একেবারে একা হয়ে গেছি। আমার সর্বস্ব এখন তুমি। সেই তোমাকে ডাকতে হল, আর কিছুদিন আগে ডাকলে এতখানি হারাতে হত না।

মা, তুমি কিছুই হারাওনি। তোমার সব হারানোর বেদনার বোঝা আমিও হাল্কা করতে পারতাম না। আমার এই আসাটা তুমি চাইলেও আগে হতো না। সব কিছুর জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকে। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পাতা ঝরার দিনে ফুল ফোটাতে চাইলেই কি তা ফোটানো যায়? কুঁড়ি ধরা, ফুল ফোটা, ফল ধরা এবং পরে তা ঝরে পড়ে মাটিতে অঙ্কুরিত হওয়া জন্য একটা সময় ভাগ করা আছে। কারো কিছু চাওয়া বা ইচ্ছায় তা হয় না। তেমনি জীবনের সব কিছুই একটা নির্ধারিত সময়েই হয়। আগেও না, পরেও না। কাল শুধু সবেগে তার দিকে আকর্ষণ করে। আমরা সবাই মহাকালের রথচক্রের তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার জন্যই নিজেকে নিবেদন করি শুধু। এজন্য আক্ষেপ এবং অনুশোচনার কিছু নেই।

পুত্র, তোমার কথাগুলো সুগন্ধ ফুলের মতো আমার নিশ্বাসে ভরে আছে। কিন্তু মানুষের মন তো, তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মতো আমার বুকের ভিতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগ করে ফেলেছে। তোমাকে সব কথা না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

মাগো মনকে নিয়ে জবরদস্তি করার একটা সীমা আছে। নিষ্ঠুরতারও সীমা আছে। কোন কিছুতে সীমা ছাড়াতে নেই।

চমৎকার কথা বল তুমি। তবু সব কথা গুছিয়ে বলতে আমাকে একটু সময় দাও বাবা। আমাকে তুমি বিমুখ কর না।

দ্বৈপায়ন চুপ করে সত্যবতীর দিকে অপলক চেয়ে রইল। মুখে হাসি, চোখে কপটতা।

বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভারাক্রান্ত এবং বিষণ্ণ গলায় সত্যবতী বলল : পুত্র আমার অদৃষ্টই মন্দ। বিধাতা এক হাতে দিয়ে অন্যহাত দিয়ে আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেন। এমনটা যে কোনদিন হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। তবু আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। দু'দুটো পুত্রের অকাল মৃত্যু হলো। এই মৃত্যুটা কিন্তু এভাবে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সত্যি যখন হলো নিছক ভাগ্য বলে তাকে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হওয়ার মত কিছু পেলাম না। বরং হিসেব মেলাতে গিয়ে কেবলই মনে হয় ভীষ্ম তোমার দুই অনুজ সহোদর চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের বেঁচে থাকাটা মনে প্রাণে চায়নি। তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের পথের কাঁটা হয়ে উঠছিল চিত্রাঙ্গদ। তেজে, বীর্যে, সাহসে সে ভীষ্মের মতোই হয়ে উঠল। সিংহাসনে তারই দাবি। সিংহাসনে তার অভিষেক হলে মুকুটহীন রাজা ভীষ্মের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ত। ক্ষমতা হারানোর এই আশঙ্কায় ভীষ্ম বোধহয় ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই পথের কাঁটা চিত্রাঙ্গদকে সরিয়ে দেয়ার কথা তার মনে হয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় ভীষ্ম মেতে উঠল। একটার পর একটা রাজ্য জয় করে হস্তিনাপুরের রাজ্যসীমানা বহুদূর

পর্যন্ত প্রসারিত করল। চিত্রাঙ্গদের বুকে জয়ের নেশা, যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে সর্বদা তাকে যুদ্ধের সঙ্গী করত। ছোট ছোট রাজ্য জয়ের নেতৃত্ব দিত চিত্রাঙ্গদ। সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দুর্ধর্ষ গন্ধর্বরাজার সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গেল। সেই যুদ্ধে নিহত হল সে। তবু প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুর কোন প্রতিশোধ নিল না ভীষ্ম। তার নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা আমাকে অবাক করল। ভীষ্ম জেনেশুনে চিত্রাঙ্গদের মত কিশোরকে একা গন্ধর্ব দমন করতে পাঠাল কেন? সে নিজে তার সঙ্গী হলো না কেন? ভ্রাতার মৃত্যুর জন্য তার বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল কই? ভীষ্মের সেই রাগ কোথায় গেল? এই প্রশ্নগুলোর কোনও সদুত্তর আজও পাইনি। কেবলই মনে হয়, এই মৃত্যুতে ভীষ্মের হাত ছিল। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কৌশল করে সরিয়ে দিল যেন।

মা, তোমার কথাগুলো অস্বীকার করার নয়। মনে হচ্ছে, তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে এইসব কথা বলছ না। অনেক কিছু দেখেশুনে, বিচার বিবেচনা করে ভীষ্ম সম্পর্কে তোমার মনের অতলে যে বিপরীত স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে, এ হলো তার প্রতিভাস।

দ্বৈপায়নের সহানুভূতির স্নিগ্ধ পরশে তার হৃদয় মন ভরে গেল। সুখের অনুভূতি শাঁখের মতো বেজে যেতে লাগল তার শরীরের মধ্যে। সে ছাড়া অন্য কেউ সে শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল না। সত্যবতী এক মুগ্ধ চমকে তার দিকে চেয়েছিল। তাদের দু'জনের মাঝখানে তরঙ্গহীন নিথর সময় বয়ে যেতে লাগল। দ্বৈপায়নই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল : মা, তুমি চুপ করে থাকবে? প্রেমের অমৃত ছাপিয়ে ভয়ের বিষে নীল হয়ে গেছে তোমার সারা শরীর। ঐ বিষটুকু শরীর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার মনের জ্বালা জুড়াবে না। কল্পনাও করতে পারবে না, কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে।

তুমি ঠিক বলেছ। বিচিত্রবীর্যই আমার শেষ ভরসা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। শৌর্যে বীর্যে চিত্রাঙ্গদের সমকক্ষ না হলেও পরাক্রমশালী বলা চলে। নাবালকের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা আমার ছিল না। ভীষ্ম চাইলেও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে তাকে দূরে রাখতাম। অভিষেকও বিলম্ব হচ্ছিল সেজন্য। হঠাৎই সংবাদ এল কাশীরাজ তিন কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বরসভা ডেকেছেন। হস্তিনাপুরকে আমন্ত্রিত না করার ক্ষোভে, অপমানে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ম্বর সভা থেকে তিন রাজকন্যাকে বলপ্রয়োগ করে তুলে আনল হস্তিনায়। ভীষ্ম চিরদিনই জেদী, বদমেজাজী, একরোখা। সে যা ভাবে, তাই করে। কারো কথা শোনে না! তার কাজে বাধা দান, সৎ-উপদেশ গ্রাহ্য করে না। কাশীরাজ কন্যা অম্বা ছিল গৌড়রাজের বাগদত্তা। কিন্তু ভীষ্ম তাকে না জেনে অপহরণ করার জন্য মহারাজ শল্য তাঁর বাগদান ফিরিয়ে নিল। অম্বা তখন ভীষ্মকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। কিন্তু সত্যভঙ্গ হবে বলে ভীষ্ম বিয়েতে রাজি হল না। নিরুপায় অসহায় রমণী দুঃখে অপমানে আত্মাহুতি দিয়ে জীবন জুড়াল। অন্য দুই কাশীরাজ কন্যাকে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিল। দুই সদ্যোদ্ভিন্ন তরুণী বধূর প্রেমের অক্টোপাশে বাঁধা পড়ল বিচিত্রবীর্য। তাদের নিয়ে মশগুল রইল। কামনার জোয়ারে ভেসে গেল। একটু একটু কবে তার শরীর ক্ষয় হতে লাগল। কালব্যাধিতে আক্রান্ত হল। তারপর একদিন জীবনদীপ নিভে গেল। আমার ঘর আঁধার হয়ে গেল। সব হারিয়ে আমিও রিক্ত হয়ে গেলাম। ভগবান আমাকে সব দিয়েও কেড়ে নিলেন। একা থাকতে থাকতে কেবলই মনে হয় তাড়াহুড়ো করে এই বিয়ে যদি ভীষ্ম না দিত, তা হলে এই বিয়োগান্তক নাটক হত না। নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের পথ মসৃণ করার জন্য ভীষ্ম এক চতুর চক্রান্ত করেছিল। কাশীরাজের কন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় অনাহূত হয়ে যাওয়ার সত্যি কোন দরকার ছিল কী? এতে হস্তিনাপুরে গৌরব বাড়েনি, বরং ম্লান হয়েছে। অন্যেরা ছি ছি করেছে। আমারও অবাক লেগেছে, গন্ধর্বদের হাতে চিত্রাঙ্গদের নিহত ও পরাভূত হওয়ার ঘটনা তো ভীষ্মকে হস্তিনাপুরের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য উত্তেজিত করেনি। পরাভবের অসম্মান ভীষ্ম মুখ বুজে সহ্য করেছে। কাশীরাজ কন্যার স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত না হওয়ার জন্য হস্তিনাপুরের সম্মানহানি হয় কেমন করে, আজও আমার মাথায় ঢোকে না। কারণ এ রাজ্যে বিবাহযোগ্য কোনো রাজপুত্র তো নেই। তাহলে, আমার মন যদি বলে, ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর অন্যতম কারণ তা হলে কি খুব অন্যায় হবে পুত্র? যতদিন যাচ্ছে ভীষ্মকে আমি সহ্য করতে পারছি না। তার সঙ্গে আমার মনের দূরত্ব বাড়ছে। আমার দুই পুত্রের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। মন থেকে কিছুতে এই ধারণাটা তাড়াতে পারছি না।

দ্বৈপায়ন মন দিয়ে সব শোনার পর বলল : আমাকে কী করতে হবে মা।

অত্যন্ত উত্তেজিত মস্তিষ্কে সত্যবতী তার সব হিসেব নিকেষ যেন দ্রুত সেরে ফেলল। বুকের ভেতর ভীষ্মের উপর জমে ওঠা রাগটা উগরে দিতে মনটাই নিষ্ঠুর হল। বলল, ভীষ্ম বিয়ে না করার শপথ করে নিজের ক্ষতি যত না করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে ও আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। ওর ভেতর ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা লোভ, প্রতিপত্তির দুর্বার ইচ্ছে যেমন আছে তেমন প্রকৃতি পরিবৃত হয়ে বাস করা আদিবাসীর জংলামিও আছে। ক্ষত্রিয় বাবা এবং জংলী মায়ের রক্ত বইছে ওর শরীরে। তাই ওর মধ্যে একধরনের অমানবিক হিংস্রতা আছে। ওর ব্যর্থ জীবনের জন্য আমি বোধহয় দায়ী। রাজ্যের মালিকানার ভাগাভাগি বোধহয় ওর পছন্দ নয়। তাই হয়তো সব ক্ষমতা একা ভোগ করার কৌশলে আমাকে হারিয়ে দিল। এভাবে আমি হেরে যেতে চাই না পুত্র। আমি তো একেবারে নিঃসন্তান হইনি। তুমি তো আছ।

দ্বৈপায়নের খুব অবাক লাগল। শান্ত মন খারাপ করা আর্তি তার মুখে চোখে ফুটে উঠল। বিব্রতভাবও খেলে গেল চোখের চাহনিতে। তারপর একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল : না, এ জন্মের মতো তোমার জীবন তোমার, আমার জীবন আমার। এর কোনও পরিবর্তন না করে যদি কিছু করতে পারি, নিশ্চয়ই করব।

পুত্র নতুন করে নতুন ভাবে বেঁচে ওঠার জন্য তুমি অনেক কিছু করতে পার। কৃষ্ণাঙ্গ বলে শ্বেতাঙ্গ আর্যঋষির সমাজে তোমার কোনও সমাদর ছিল না। রক্তে, বর্ণে, দর্শনে তুমি কৃষ্ণকায় অনার্যই থেকে গেছ। ওটাই তোমার একমাত্র পরিচয়। এ পরিচয় মুছে যাওয়ার নয়। তাই আর্যদের ঘৃণা বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, আর্য সাম্রাজ্যের ভিত ভাঙতে তোমাকেই চাই। তুমি আমাকে শুধু সাহায্য কর। বিচিত্রবীর্যের দুই বধূর গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করে তুমি এক নতুন প্রজন্মের জন্ম দাও। তোমাকে দিয়েই আমি এক নতুন বংশধারা সৃষ্টি করতে চাই।

এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে দ্বৈপায়ন চমকাল। প্রশ্ন ভরা বিপন্ন অসহায় গলায় বলল : মা, আমি কেন? দেবব্রত তো ছিল।

ভীষ্ম শপথ ভঙ্গ করে কোনও রমণীর সঙ্গে সহবাসে রাজি নয়। তাই, একাজ তোমাকেই করতে হবে। তোমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে আছে? পুত্র এ তোমার মায়ের আদেশ। অদৃষ্টের বিধান। মুক্তি চাইলেও তোমার মুক্তি নেই। বধূদেরও আমি সেভাবে প্রস্তুত হতে বলেছি।

দ্বৈপায়ন চুপ করে রইল। কপালে চিন্তার বলিরেখাগুলো গভীর এবং কুঞ্চিত হল। তাকে নীরব দেখে সত্যবতী পুনরায় বলল, পুত্র তোমার দ্বিধার কিছু নেই। মায়ের আদেশ পালন করছ মাত্র। কুরুবংশের কেউ নও তুমি, কিন্তু আমার পুত্র তো। মায়ের সম্পর্কে তুমিও এই পরিবারের একজন। মহাকাল বোধ হয় তোমাকে দিয়ে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চায়। তোমার অদৃষ্টই এভাবে ডেকে আনল হস্তিনাপুরের রাজবাড়ীতে। বৎস, আমরা কেউ কিছু করি না, আমরা কেবল নিয়তি চালিত। শুধুই নিমিত্ত।

আরক্ত লজ্জায় দ্বৈপায়ন জননীর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। দিগন্ত অবধি নিবিড় সবুজ গাছ-গাছালির উপব পড়ন্ত সূর্যের মায়াবী আলো পড়েছে। প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে আকাশের রঙ। সেই দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল : মা, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। কিন্তু এটা একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। মানুষের চাওয়ার সঙ্গে তো পুরোপুরি মিলতে নাও পারে। ঋষিরও ক্ষমতা নেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করা। বলতে পার, তোমার মতই এক্ষেত্রে অসহায় আমি।

সত্যবতী একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল পুত্রের দিকে। মুখের ভাবও তার বদলে গেল।

দৈব সত্যবতীর সহায় হল না। অম্বিকার গর্ভে যে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় সে জন্মান্ধ। সংবাদটা শোনা থেকে সত্যবতীর মন ভালো নেই। বিধাতা তার সঙ্গে যেন নির্মম রসিকতা করল। অথচ, অম্বিকা গর্ভবতী হওয়া থেকে কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নই সে দেখত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট

ছবিও আঁকা হচ্ছিল মনের অভ্যন্তরে। অম্বিকা অন্ধপুত্রের জননী হওয়ার পর নিমেষে সব কিছু ভেস্তে গেল। আশা, আকাঙ্ক্ষা সব বরবাদ হয়ে গেল। ভীষ্মের দৈব সহায়তার কাছে হার হল তার। এভাবে হেরে যেতে চায় না সত্যবতী। কিন্তু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে কে কবে জিতেছে? এ প্রশ্ন বিব্রত করে তাকে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে সমস্যার কোনও সুরাহা হল না।

অন্ধপুত্রের নাম রাখা হল ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু অন্ধপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে কী করবে? তার কাছে কোনও প্রত্যাশা থাকতে পারে না। তাকে সর্বক্ষণ অন্যের কৃপা ও অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচতে হয়। পরনির্ভশীল হয়ে থাকাটা তার ভাগ্যের লিখন। কাজেই তাকে দিয়ে রাজকার্য হবে না। রাজপুরীতে ভীষ্মই কেবল তাকে সহানুভূতির চোখে দেখে। ধৃতরাষ্ট্র তার খুব ন্যাওটা হয়েছে। তাকে নিয়ে ভীষ্মের বাড়াবাড়িটা ভালো লাগে না সত্যবতীর। বরং মনে হয় অগ্রজ বলেই সিংহাসনে তার নিয়ম মাফিক অভিষেক করে ভীষ্মই প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করবে। তার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে সুকৌশলে ভীষ্ম আজীবন রাজক্ষমতা ভোগ করতে পারবে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে সত্যবতীর। পুত্রহন্তা ভীষ্মকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল না, এই ভেবে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বুকের ভেতরটাও তার জ্বালা করে।

আর কেউ না জানলেও সত্যবতী তো জানে নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে সে। এভাবে হেরে যাওয়াটা ভীষণ কষ্টকর। পৃথিবীতে কেউ হারতে আসেনি। সবাই জিততে চায়। তবু ঘটনা পরম্পরায় একজনকে হেরে যেতে হয়। হারার আশঙ্কায় সব মানুষই নিজের ছায়ার সঙ্গে লড়াইর জন্য তৈরি থাকে। প্রতিমুহূর্ত নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, গোপন প্রতিহিংসার সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়। এ লড়াই বাইরের কেউ দেখতে পায় না। অথচ ভিতরে ভিতরে সে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল। কারণ অশান্তির বীজ তো রোপিত হয় বুকের গভীরতম প্রদেশে।

মায়ের বার্তা পেয়ে দ্বৈপায়ন পুনরায় হস্তিনাপুরে এল। এবারেও সে একই কথা। পুত্র নতুন করে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু অম্বিকা অন্ধপুত্র প্রসব করে আমার স্বপ্নভঙ্গ করল। সব আমার অদৃষ্ট। পুত্র অম্বালিকাকে তুমি আহ্বান কর।

দ্বৈপায়ন আশ্চর্য হল না। তার দুই চোখের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার কৌতুক ও বিস্ময়। বলল : মা, অদৃষ্ট যদি এবারও হতাশ করে তোমায় তা হলে কী করবে?

সত্যবতীর অন্তরটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু ভয় পেয়ে কাঁদতেও ভুলে গেল সে। দিশাহারার মত চেয়ে রইল তার চোখে চোখ রেখে।

অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করল। কিন্তু সেও জন্ম থেকে অত্যন্ত কৃশকায়, দুর্বল এবং রুগ্ন। শরীর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয় তার। কোন কিছুতে তার আগ্রহ, উৎসাহ নেই। সর্বক্ষণ কেমন একটা নিস্তেজ ভাবলেশহীন ভাব। বহু পরিচর্চা করেও তাকে সুস্থ রাখা মুস্কিল হল। অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করে কতদিন বাঁচবে এই সন্দেহে সত্যবতীর বুক তোলপাড় করে। নিজেকে প্রশ্ন করে অতঃকিম! অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত হাসিতে তার অধর বিস্ফারিত হল। মনে হল, তার নয়, দৈবের। অদৃষ্ট তার অধরে হেসে উঠল যেন।

পালাবদলের ইতিহাস সৃষ্টি করতে মহাকালের পরোয়ানা নিয়ে পুত্র দ্বৈপায়ন এসেছে অতর্কিতে। সুতরাং কিছু একটা হবেই। সত্যবতী একা থাকলেই কল্পনা করে দ্বৈপায়নের রক্তবীজেই সঞ্জীবিত হয়ে আছে তার প্রত্যাশা পূরণের আকাঙ্ক্ষা। তাই দ্বৈপায়নকে আবার আসতে হল হস্তিনাপুরে। অসংকোচে সত্যবতী বলল : পুত্র যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমনটি হল না। বোধহয় এক পক্ষের ঘৃণায়, অনুকম্পায় অন্যপক্ষের উদাসীন স্থূল-কর্তব্যপালন একে অন্যকে পরিপূর্ণ করেনি বলেই অক্ষম, অযোগ্য রুগ্নপুত্রের জন্ম দিল বধূরা। কথাগুলো বলার পরে দ্বৈপায়নের চোখের উপর তার দীর্ঘ নিবিড় দুই আঁখি মেলে ধরল। নিজের কথাগুলোর সত্যতা বাজিয়ে নেওয়ার জন্য বলল : ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর উপর ভরসা করতে পারছি না। তুমি পুনরায় অম্বিকাকে গ্রহণ কর।

ভূত দেখার মত আঁতকে উঠেছিল দ্বৈপায়ন। বলল : অসম্ভব। তার কাছে পুনরায় অপমানকর কিংবা অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটুক তা আমি চাই না।

সত্যবতী তার আপত্তি শুনে হাসল। বলল : সন্তানের মুখ দেখে মায়েরা অনেক কিছু টের পায়। অম্বিকা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অম্বালিকা করছে ঘৃণা। আমার জন্য সব সহ্য করেছ। তুমি না বললেও আমি জানতাম জোর করে কোনো চাওয়াই পাওয়াতে পর্যবসিত হয় না। এর দাম দিতে দুটো নিষ্পাপ শিশুর জীবন অভিশপ্ত হয়ে থাকল। এই ব্যাথা বেদনা কোনোদিন ভুলব না।

দ্বৈপায়ন অসহিষ্ণু হয়ে বলল : মা আমি সন্ন্যাসী। আমাকে তুমি এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন? তোমার উদ্দেশ্য আমার মাথায় ঢুকছে না।

সত্যবতী দু'পা এগিয়ে এসে দ্বৈপায়নের গায়ে হাত রাখল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় সে স্পর্শ। সত্যবতী তার হাতের মধ্যে দ্বৈপায়নের সারা শরীরের কাঁপুনি অনুভব করল। চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল, মা হয়ে তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। তোমার প্রতি কোন কর্তব্য করা হয়নি। নিজের সুখের দিকে ধেয়ে গেছি। আজ তাই, তোমার নিজের জন্য একটা নীড রচনা করে দিতে চাই। অম্বিকা অম্বালিকা ওরা তোমার নীড় রচনায় সাহায্য করবে না। তাই তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি অম্বিকার কক্ষে ঢুকবে।

দ্বৈপায়ন চমকে অসহায়ভাবে উচ্চারণ করল : মা।

পুত্র। লোকে দেখল তুমি অম্বিকার ঘরে গিয়েছ। কিন্তু আমি জানি সে ঘরে তার বদলে থাকবে বিচিত্রবীর্যের সুরূপা এক শূদ্রাণী মনোরঞ্জিনী। তুমি তাকেই বরণ করবে। স্বার্থহীন দানে, অজস্র সেবা, যত্ন দিয়ে সে তোমাকে ভরে দেবে। তাহলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

দ্বৈপায়ন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল : তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না।

পুত্র আমার মন বলছে, একটা অসম্ভব কোনো ঘটনা ঘটবে। আমি শুধু তার প্রতীক্ষা করছি। শূদ্রাণী মনোরঞ্জিনীর গর্ভজাত সন্তান বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে স্বীকৃতি পাবে। তাহলেই আজীবন কুরুবংশের একজন হয়েই থাকবে সে। সব কিছুতেই তার অধিকার থাকবে। পরিবারে তার গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়।

মা, হস্তিনাপুরে আমার ঘন ঘন যাওয়া আসা নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে কতরকমের কথা হয় জান? সবাই তোমাকে সন্দেহ করছে। আমাকে দিয়ে তুমি কিছু করতে চাও এ কথাটা আর গোপন নেই। ভীষ্মের হাত থেকে তোমার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে আমাকে কৌরব অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে এনে বসিয়েছ। সুচতুরভাবে রাজনীতির পুরোভাগে আমাকে রেখে ভীষ্মকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছ। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ছলনা করে কার্যত তুমি এই পরিবারের একজন করে তুলছ আমাকে। আমার এই নিঃশব্দ প্রবেশকে কেউ মেনে নিতে পারছে না।

সত্যবতী অনাবিল হেসে বলল : আমি তো সত্যিই তাই চাই। কারো ভাবাভাবি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তুমিই হবে কুরুবংশের আগামী প্রজন্মের জন্মদাতা। এ রাজপুরীতে আমি যে একা নই, আমার পাশেও যে দাঁড়ানোর মানুষ আছে এবং সেও যে একজন অসাধারণ বিখ্যাত মানুষ। এটা তো জানান দিতে হবে। আমার কৃষ্ণকে ভারতের সবাই চেনে। এমনকি ভীষ্মের কুরুজাঙ্গালের বাইরে রাষ্ট্রজোটের শত্রুরাজ্য পাঞ্চাল এবং যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গে যে তার গভীর সংযোগ এবং সম্পর্ক আছে। একথাটা অন্যদের জানান দেবার জন্যই তো তোমাকে ডাকি। লোকে অন্তত জল্পনা কল্পনা করুক হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এই শঙ্কা ভীষ্মের মনের অভ্যন্তরে যত সংঘাতের রূপ নেবে তত শপথের মর্যাদা রক্ষার্থে তোমার ঔরসজাত পুত্রদের হাতে সিংহাসনের অধিকার এবং রাজদণ্ড সমর্পণ করে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াবে। সংঘাত ছাড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এক দীর্ঘ অধ্যায় সমাপ্ত হবে। একটা রাজবংশকে মুছে ফেলে তার স্থলে আর এক নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিকে প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত বদলের এক ইতিহাস তো তৈরী হবে তাতে।

দ্বৈপায়ন প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়ে সুদুর ভবিষ্যৎকে যেন দেখতে পেল। বলল : তাতে তোমার জয় হবে ভাবছ? লড়াইর ক্ষেত্রটা তোমার কুল থেকে ক্রমেই অন্য এক কুলের দিকে প্রসারিত হয়ে এক বৃহৎ জটিল রাজনীতির সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবে।

সে কথা ভেবেই তোমাকে তৃতীয়বার শরণ করেছি। বিশুদ্ধ অনার্যরক্তের একজন মানুষ চাই।

তোমার বীর্য, তেজ, সাধনা দিয়ে সেই প্রার্থিত মানুষটিকে জন্ম দেয়াই তোমার ব্রত। তোমার আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত হবে তার মেদ মজ্জা প্রাণ।

অকস্মাৎ দ্বৈপায়নের মনে হল, সেও শূদ্রাণী মায়ের সন্তান। শূদ্রের আত্মত্যাগে ও সেবায় মানুষের সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠে। সেবার শক্তিতে শূদ্রজাতি এ মহাবিশ্বকে ধারণ করে রেখেছে। অদৃশ্য দেবতা হয়তো জননীর মধ্যে দিয়ে আর এক নতুন প্রজন্মের হাতে দেশকালেব ভার অর্পণ করছে। সে শুধু ঋত্বিক। চিন্তিত মুখে জননীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল : তোমার ইচ্ছাপূরণ হলে আমিও সুখী হব।

কথাটায় কিছু ছিল না। তবু কান তার গরম হয়ে গেল। কম্পিত বুকে উদ্দীপ্ত আনন্দ নিয়ে জননীর পাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম করল।

মানুষের জীবনটা নদীর মতো। একখাতে বয় না। মাঝে মাঝে খাত পাল্টায়। নদীও বোধহয় টের পায় না, কোন অদৃশ্য নিয়মে একখাত থেকে অন্যখাতে বয়ে যায়। সত্যবতীর সমস্ত মনটা তেমনি ভীষ্মের দিক থেকে অন্য এক জীবনের আধা আলো অন্ধকার প্রান্তরের দিকে নদীর চলকানো জলের মত উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে যায় অনন্ত মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে। ভীষ্মের কথা মনে হলেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিনের ছবিটা চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে সত্যবতীর। আর তখন খুব গভীর করে অনুভব করে দেবব্রত তার সমবয়সী হয়ে কী অবলীলায় তাকে মা বলে ডাকল। মা ডাকে কী থাকে, কে জানে? ওই ডাক কানে এলে খুশিতে ভরে যায় মন। কেন যে এমন বিপজ্জনকভাবে ভাল লেগে যায় এক একজন মেয়ের জীবনে যে, তখন সমস্ত হৃদয় জুড়ে অপত্য স্নেহ হঠাৎ ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে রক্তের ধমনীতে বিপুল উল্লাসে ছড়িয়ে পড়ে। তেমন এক গভীর ভালোলাগায় সত্যবতীর দু'চোখ বুজে গেল। তাকে মা বলে ডাকার যে কেউ আছে এ সংসারে একথা ভুলে গেছিল। তাই এক মুগ্ধ চমকে, ভীষ্মের চোখে চোখ পেতে রাখল। কী সুন্দর দেখতে ভীষ্মকে? ছেলেরা এত সুন্দর হয়! বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখন। এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে শুনল, সূর্যসাক্ষী রেখে দাসরাজের কাছে অঙ্গীকার করেছি, জীবনে বিবাহ করব না, হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দাবিদার হব না।

চমকানো বিস্ময়ে সত্যবতীর বুকের অভ্যন্তর থেকে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। না, এত নিষ্ঠুর হয়ো না দেবব্রত। ভীষণ কঠিন প্রতিজ্ঞা তোমার। আমার সুখের জন্য এতবড় শাস্তি নিজেকে দিও না। পৃথিবীতে অনেক ধরনের মরণ আছে। এও একধরনের মরণ। স্বেচ্ছায় নিজেকে হত্যা করে কোন স্বর্গ লাভ করবে? পুত্র, মানুষের দেয়া নেয়া করে যা অবশিষ্ট থাকে তাই শুধু নিজের। কিন্তু সেটুকুও তুমি রাখলে না। বড় বোকা তুমি। বোকারা শুধু ত্যাগ করে। নিজে ঠকে এবং বঞ্চিত হয়। এসব হয়তো তুমি জান। তোমার কাছে নতুন কথা নয়। নিজেকে এভাবে ঠকালে কেন?

ভীষ্ম মৃদু মৃদু হাসছিল। আর শান্তনু অশান্ত চিত্তবিক্ষোভে ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল। কেমন একটা গভীর অপরাধবোধে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। সত্যিই তো নিজেকে তুমি ঠকালে কেন? পিতার কোনো কর্তব্য করিনি। মহারাজ যযাতির পুত্রের কাছে প্রত্যাশা করার অধিকার ছিল, কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন দাবি নেই। তবু প্রার্থনা করার আগেই অযাচিতভাবে করুণা করে সকলের চোখে আমাকে ছোট করে দিলে। পুরুর ত্যাগ, মহত্ব মহারাজ যযাতিকে যেমন কাঁটার মত বিঁধত তেমনি তোমার অযাচিত করুণা আমাকে সুখে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। যযাতিও একদিন পুত্রকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিল। তুমিও ফিরিয়ে নাও এ শপথ। নইলে, আমি শান্তি পাব না।

ভীষ্মের অধরে প্রসন্ন হাসি। বলল : পিতা, আর্য-অনার্যের মিলন বৈবাহিক সম্পর্কেই কেবল সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে। এই দুই গোষ্ঠির মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করেও তারা রেষারেষি এবং বৈরিতা ভুলতে পারল না। তাই কুরুজাঙ্গালের সমস্ত মানুষেকে আর্য-অনার্যের পরিচয়ে নয় এক নাগরিকত্বের, এবং মানুষের পরিচয়ে বড় করে তোলার তোমার এই মহান চেষ্টা আমার অন্তঃকরণকে হঠাৎ যদি আত্মোৎসর্গের আদর্শে বড় করে, সে কী অপরাধ আমার!

ব্যাকুল গলায় সত্যবতী বলল : ত্যাগ ছোট্ট একটা বিষয় নয়। মুখের কথাতে ত্যাগ হয় না, মনের আলোয় আভাসিত না হলে তার আলো পড়ে অন্যের মন আলোকিত করে না। যে ত্যাগে মানুষের সমাজ সংসারের কোনো কল্যাণ হয় না, তাকে ত্যাগ করা বলে না। নিজের সুখের জন্য ত্যাগকে বলে অহঙ্কার। ত্যাগে আত্মগর্ব থাকে না পুত্র।

ভীষ্ম একটুও দমল না। বিনম্র গলায় বলল : আত্মগর্ব যদি কিছু করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আবেগের বশে কিছু করিনি জননী। যা করেছি অনার্যদের স্বার্থরক্ষায় করেছি। পাছে একটা সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় তাই দাসরাজার শর্তে রাজি হয়ে গেলাম। খুব আশ্চর্য হচ্ছ তো! বিশুদ্ধ আর্যরক্তের একাধিপত্য মুছে ফেলে পিতা বর্ণসংকরের হাতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ভার অর্পণ করতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু নেপথ্যে যারা সিংহাসন চালায় তারা আমাকে সুনজরে দেখে না। তাদের হারিয়ে দেব বলে দাসরাজের শর্ত মেনে আর্য-অনার্যের মিশ্ররক্তের আগামী বংশধরকে সিংহাসনে অভিষেক করব এই অঙ্গীকার করা কি খুব অন্যায় হয়েছে আমার? পিতার সংকল্পকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য এই স্বার্থটুকু যদি ত্যাগ করতে না পারি, তাহলে পুত্র হলাম কী করতে?

কথাগুলো শুনে সত্যবতীর গর্ব হল। বুকখানা আকাশের মত বড় হয়ে গেল। তিরস্কার করেছে বলে অনুশোচনা হল। ভীষ্মের মধ্যে মিথ্যাচার ব্যাপারটা নেই, সেই প্রথম জানল। অনেককাল আগের কথা, তবু মন আলোড়িত হল। ভীষ্ম সম্পর্কে পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো ভীষণভাবে নাড়া খেল।

শান্তনুর মৃত্যুর পরে কার্যত ভীষ্মই রাজকার্য দেখাশোনা করছিল। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে একধরনের নেশা ধরে গেছিল। শাসনক্ষমতা চলে গেলে কী নিয়ে বাঁচব—এই বোধে রাজ্য ও রাজনীতিকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরল। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা তাই বিলম্বিত হচ্ছিল শুধু। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর ফলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব নিয়ে এক সঙ্কট সৃষ্টি হল। শাসনক্ষমতায় থাকার জন্য এই সঙ্কট ভীষ্মের তৈরী। এরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যবতী নিজেই শুধু কষ্ট পেল না, তার অবচেতনে ভীষ্ম সম্পর্কে একধরনের বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হল।

বিকেলে একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে এসব কথা আপনা থেকে মনে আসে রোজ। কেন আসে, সত্যবতী নিজেকে প্রশ্ন করেও জানতে পারে না। তবে, মানুষকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করা যে ভীষণ খারাপ অসুখ, প্রাণঘাতী অসুখ—এটা দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর ভীষণভাবে অনুভব করল। বুকের মধ্যে সেজন্য এক ধরনের ব্যথা বাজে অনুক্ষণ।

মনের গতিপ্রকৃতি মানুষ নিজেও জানে না। জানা থাকে না বলেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সত্যবতীর বুকের অভ্যন্তর থেকে উঠে এল . বেচারি ভীষ্ম! নিরুচ্চারে নিজের মনে বলল। আসলে যে ভীষ্ম মা বলে ডাকে তাকে, ভীষণ শ্রদ্ধা করে, সে ভীষ্ম নয়, দেবব্রত। আর যে হস্তিনাপুরের রাজ্য চালায় সে অন্য লোক। সে হল মুকুটহীন রাজা, তার সতীনের ছেলে, শান্তনুর পুত্র। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের বৈমাত্রেয় ভাই এবং অভিভাবক ভীষ্ম।

সত্যবতী বসেছিল বারান্দায়। সূর্যাস্ত দেখছিল। প্রতিদিনই দেখে, তবু মনে হয় এখনও কত দৃশ্য অদেখা রয়ে গেল। দেখার নেশা কিছুতে কাটতে চায় না। এক আশ্চর্য নির্লিপ্ত প্রশান্তিতে ছেয়ে থাকে সত্তা।

হঠাৎ একজন দাসী এসে বলল, ভীষ্ম এসেছেন।

সত্যবতী কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল : হ্যাঁ, পাশের ঘরে তাকে বসতে বল, আমি আসছি।

একটু পরেই সত্যবতী ঢুকল। তাকে দেখে একটু অপ্রতিভ হাসে। মৃদুস্বরে বলল, মাকে মনে পড়েছে তাহলে!

সব সময় তোমার কথা ভাবি। অনেক রকম ভাবনা।

সত্যবতীর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল, আমি তোমার মত অত সুন্দর করে বলতে পারি না। ভাষার ব্যবহারও জানি না।

ভীষ্মের অধরে অনির্বচনীয় হাসি। বলল, দোটানার কষ্ট তো তোমার নেই। আমার হচ্ছে শাঁখের করাত—দু'দিকেই সমান টান। কী করে বোঝাই বল, গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিলে ফুলের যেমন লাগে অনেকটা সেরকম হবে।

বোঝা গেল না।

বোঝানো যায় না মা। তবে, এরকম একটা দোটানা তোমারও থাকার কথা। কথাটা বলা শেষ করে ভীষ্ম স্থির দৃষ্টিতে সত্যবতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে একটু মৃদু হেসে বলল : মা, আজ তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। না বলে ফেরাতে পারবে না।

সত্যবতী একটু ঘাবড়ে গেল। চট করে তার মুখের ভাবটা লুকনোর জন্য এমন একটা নাটকীয় ভঙ্গী করে হাসল, যেন কিছুই হয়নি। বলল : কি খাবে বল? ফল, না ঠাণ্ডা সরবৎ!

একথায় ভীষ্ম হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসল। সত্যবতী আপ্যায়িত করে তাকে যে ভুলিয়ে দিতে চাইছে, একথাটা বুঝেই বলল : ফলই দাও, ফললাভ হবে তাতে।

সত্যবতী বড় বড় চোখ করে গভীর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভীষ্মের দিকে। দাসীকে ডেকে এক থালা ফল আনতে বলল। তারপর কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইল চুপচাপ। দীর্ঘশ্বাস পড়ল অজান্তে। ভীষ্মের দিকে পিঠ করে বলল, আমি হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে রক্তের বন্ধন ছাড়া আর সব বন্ধন ভারী পলকা।

ভীষ্ম ফল চিবোতে চিবোতে বলল : একথা কেন বলছ?

সূর্যাস্তের মরা আলোর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো মনে হল বলেই বলছি।

ভীষ্ম মাথা নেড়ে বলল, তোমার এসব মনে হয় বুঝি? আসল কথা কি জান, সংসারকে যতই আপন করতে চাও না কেন, সংসার তোমাকে ফাঁকি দেবেই। এরকম করে ভাবলে দুনিয়ার সব নিয়ম উল্টে দেওয়া যায়। কিন্তু এসব হল ভাবের কথা। এর মানে আছে কি নেই, সে তর্কে আমি যাব না। কথা বাড়িয়েও লাভ নেই। এখন কাজের কথা শোন?

সত্যবতী একটু অধৈর্যের ভাব প্রকাশ করে বলল : বল।

একটা কথা জিগ্যেস করতে খুব ইচ্ছে করে। জবাব দেবে?

তোমার কি কোনো বিশেষ অভিযোগ আছে?

আছে বলেই জিগ্যেস করছি।

ভীষ্মের চোখের সামনে সহসা কুঁকড়ে যায় সত্যবতী। তবু, সাহস করে তার চোখের উপর চোখ রাখল। বলল : না ডাকতেই এসেছ যখন, কারণ কিছু একটা আছে।

ভালোবাসা এবং ঘৃণার সম্পর্কটা কাকে বলে জান?

ভেবে দেখার দরকার হয়নি কখনো।

কিন্তু আমার হয়েছে। আহত অভিমানে তার কণ্ঠস্বর বীণার তারের মতো বেজে ওঠল। মা, তোমার এবং আমার সম্পর্কটা বোধ হয় এই ভালোবাসা এবং ঘৃণার।

এসব কথা বলার মানে কি?

জানি না। কেবলই মনে হয়, যে রাজ্য-চালায়, নিন্দুকেরা মুকুটহীন সম্রাট বলে যার নামে অপবাদ দেয়, সে আমি নই। তবু অপবাদ, নিন্দে, কুৎসা নানা সন্দেহে দোষী করে আমায়। তখন বড় একা লাগে নিজেকে। তোমার কাছে কাঙালের মত দৌড়ে আসতে লজ্জা তখন হয় না। কিন্তু যে আমি শুধু রাজ্য জয়ের জন্য উন্মত্ত সে রক্তপাত করতে, যুদ্ধ করতে একটুও ভয় পায় না। সে কখনও আমার মত তোমার স্নেহের টানে দৌড়ে আসে না। সব মানুষ একটা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। যার কোন অবলম্বন নেই, আশ্রয় নেই, পায়ের তলায় মাটি নেই, সে মানুষটা নেশায় ডুবে থাকে। নেশা করে ভুলে থাকে। নেশা তার শূন্যস্থানটা ভরে রাখে। একে দোষ বলবে কেউ? আমার আমিময় জীবনে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তুমি যে আছ কাজের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি। বৃহত্তর এক জীবন আমাকে আহ্বান করে। তারপর সব কাজ শেষ হয়ে গেলে নিজেকে বড় একা মনে হয়। তখনই অনুভব করি আমি নিজেকে যা ভাবি, আমি তা নই। অথচ, আমার সমস্ত সত্তা যেন বিশ্বব্যাপী আকাশ পাতাল জুড়ে মুখব্যাদান করে আছে। এর সঙ্গে আমার লোভ কিংবা উচ্চাকাঙ্খার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার শূন্যতাবোধকে ভরে রাখার এক উপচানো আনন্দ এবং জয়ের এক অসহনীয় সুখবোধ; এ কেবল আমার একার। এর ভাগ আর কাউকে দেয়া যায় না। আমার এই স্বভাব এবং প্রকৃতির জন্য বাইরের নানা সমস্যার জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছেও

বোধহয় আমি সেইরকম এক মানুষ হয়ে উঠেছি। নইলে, আমার মনের অভ্যন্তরে সর্বদা কেন প্রদোষের রহস্যময় আলো আঁধারের মত বিপন্ন এক অসহায়তা, সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস আমার সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করে যেন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মনে হচ্ছে, এক দেবব্রত ভেঙে তিনখানা হয়েছে। দ্বৈপায়নের হস্তিনাপুরের আগমনের পূর্বে আমার যে জীবন ছিল তা প্রথম খণ্ডমাত্র। দ্বৈপায়নের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মের পরে আমি দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহন করেছি তোমার মনের অভ্যন্তরে। দেবব্রত মরে ভীষ্ম হয়ে গেছে। আগামী উত্তরাধিকারীরা এক নতুন জীবনের সূচনা করবে। জানি না, কেমন হবে ওই তৃতীয় খণ্ডের জীবন যাপন? বড় ভয়ে আছি। এখনও আমার জন্য একটু স্নেহ আছে তোমার অন্তরে। ভালবাসার সেই পাত্রটুকু শূন্য হওয়ার আগে আমাকে মুক্তি দাও।

সত্যবতী নিরুত্তর। ভীষ্মের দিক থেকে আকাশের দিকে চোখ ফেরাতে দেখতে পেল এক অতিকায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তূপ। এক অদৃশ্য পালোয়ানের মত চেহারা নিয়েছে। আকাশের সূর্যাস্তের সব আলোটুকু মুছে গেছে। সন্ধ্যের কুয়াশামাখা অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তূপ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে গোটা আকাশটাকে ভয় দেখাচ্ছে। সত্যবতীর বুকের ভেতরটা আশঙ্কায় তোলপাড় করে উঠল। মনে হল, শীঘ্রই একটা কিছু হবে। এই রহস্যময় আশঙ্কা এবং উদ্বেগের উৎস কোথায়? অনেক আকাশ পাতাল ভাবনা কয়েক মুহূর্ত তার মন জুড়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল তার ভেতরটা। মাথার ভেতর একটা অদ্ভুত বোবা ভাব। সব ভাবনা চিন্তা থেমে গেছে। কথা বেরোচ্ছে না। বার দুই ঢোঁক গিলল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। ভীষণ অনুশোচনা হল। কান্না পেল। ঘুরে দাঁড়াল সত্যবতী। ভীষ্মের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। ভীষ্ম কে? মানুষ, না দেবতা? কিংবা কোনো কুশলী অভিনেতা? শরীরটা দুলছে সত্যবতীর। মাথাটা হঠাৎ শূন্য লাগছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল। কিন্তু হাঁটুতে জোর পেল না। বুকের মধ্যে একটা অশান্ত অস্থিরতা।

।। ।।

দ্বৈপায়নের ঔরসজাত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর তিনজনকেই বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজপুত্র বলা হল। বয়সেই তারা ছোট বড় শুধু। নইলে, তাদের ভেতর আর কোনও তফাৎ নেই। শূদ্রাণী পুত্র বলে বিদুরকে সত্যবতী আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখল না। এ পরিবারের অম্বিকা, অম্বালিকাপুত্রের মতো তারও সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা। সেও কুরুবংশের সন্তান। সত্যবতী অনেক ভেবেচিন্তে বিদুরকে এই পরিবারভুক্ত করে রেখেছে। ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার পথ খোলা রাখল না।

বিদুরের প্রতি সত্যবতীর স্নেহ যে একটু বেশি। তার কোন রাখঢাক ছিল না। কৌরব পরিবারের অনেকের বিশ্বাস এই সন্তানটির জন্মের জন্য সত্যবতীর নিজের কাছে অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। সাধ্যমত চেষ্টা করেছে সেগুলো স্খালন করতে। মানুষ যখন কোন অন্যায় করে তখন স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে সে পতিত হয়ে যায়। সেই পতিত মনটাকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করাব নামই প্রায়শ্চিত্ত। সত্যবতী নিজের বিবেকের কাছে সে ধরনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছিল। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। জল ঘোলাও করল না। কার্যত বিনা বাধায় বিদুর এই পরিবারের অভ্যন্তরে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। সত্যবতী খুব ধীরে সুস্থে বিদুরকে কুরুবংশের একজন করে তোলার এক পরিবেশ সৃষ্টি করল।

বিদুরের ওপর সত্যবতীর দৃষ্টি ছিল সজাগ। সর্বক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখে। রাজনৈতিকভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত না করা অবধি শান্তি ছিল না। রোজ তাকে চোখে দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি, একদিন দেখতে না পেলেই অন্তরে সে টের পায়। বিদুর তার মার কাছে আদরে আছে, ভালো আছে, ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে জমজমাট হয়ে আছে, এসব জেনেও সে উদ্বিগ্ন হয়। সত্যবতী জানে, বিদুর ভাল আছে, ভাল না থাকার কথা নয়। তবু সামনে পেলে একবার জিগ্যেস করবে কেমন আছে? সে বলবে ভাল। তখন সত্যবতী তার সুডৌল মুখের রেখাগুলি, চোখের দৃষ্টি পরখ করবে। তার যদি মনে হয় ভাল, তাহলেই ভাল। আর যদি মনে হয় ভালো নয় তা হলে মৃদু ভর্ৎসনা

করে বলবে, আমি বুঝি তোর পর? আমাকে লুকচ্ছ কেন? বিদুর বড় হয়েছে। এসব প্রশ্ন হলে সলজ্জ হাসে শুধু, ঠাকমার চোখে চোখ রেখে। সত্যবতী তখন চোখ গোল গোল করে বলবে- ওঃ আবার হাসা হচ্ছে! দুষ্টু ছেলে।

বিদুরও তার কোল ঘেঁসে বসে বলল—তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ।

সত্যবতী বলল, হ্যাঁরে, তোকে নিয়ে আমার ভয়ের অন্ত নেই। খুব সাবধানে থাকি। কে কি বলল তার পরোয়া করি না। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কিছু হবে না, তারপরের কথা কিছু জানি না। সব ভবিতব্য। তবে এ বাড়িতে তোর আর তোর মার গায়ে কেউ আঁচড় দিতে পারবে না। এ আমি বলে গেলুম।

সত্যবতীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিদুর উদ্বেগ হাল্কা করত বলে; ঠাকমা, আমি তো বড় হয়ে গেছি। এই পরিবারের সকলে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সকলের সঙ্গে আমার একটা সুন্দর বোঝাপড়া আছে। সব অবস্থার সঙ্গে আমি অদ্ভুত মানিয়ে নিতে পারি। আমার কথা ভেবে নিজেকে তুমি কষ্ট দাও কেন? তোমার কিসে কষ্ট আমাকে খুলে বল।

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সত্যবতীর। বলল : সব বলব। সময় হলেই সব জানতে পারবে।

সত্যবতী হঠাৎ ভারি গভীর এবং মায়াবী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিদুরের দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক দুরন্ত ভালোলাগার বিদ্যুৎ খেলে গেল। থরথর করে কাঁপছিল তার অভ্যন্তরটা। মাথার ভেতরটা পাক খেতে লাগল। দুরন্ত শোক থেকে উৎপন্ন ক্রোধে সত্যবতীর মুখখানা গনগন করতে লাগল। নিরুচ্চারে মনে মনে বলল : ভীষ্মের কাছ থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে কেড়ে আনতে হবে। তার পুরুষোত্তম ভাবমূর্তি লোকের অন্তরে তাকে অনেক বড় করে তুলেছে। সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে সে। এই লোকটাকে বিগ্রহের আসন থেকে টেনে ধুলোমাটির মধ্যে নামাতে চাই। যে উচ্চকাঙ্ক্ষার নেশায় মানুষটা চিরকাল কাছের লোকজনকে অবহেলা কবছিল, তাদের সুখ, দুঃখ, মনোবেদনার দিকে তাকাল না, শুধু নিজের জেদে অটল থাকল স্বার্থপরের মতো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, তার সব কিছু মুছে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত সত্যবতীর শান্তি নেই। শুধু তার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হল। তাদের মৃত্যুটা যতদিন মনে থাকবে ভীষ্মর ভুল সিদ্ধান্তকে এবং তার আপসহীন জেদী স্বভাবটাকে ভুলতে পারব না। ভীষ্মকে শোধরানোর জন্য তাকে রাজনীতি এবং রাজ্যশাসন থেকে দূরে রাখা একান্ত দরকার।

বিদুর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করল। খুবই বুদ্ধিমান এবং শান্ত মেজাজের ছেলে বিদুর। সত্যবতীর অন্তরের অভ্যন্তরে যে বিরাট ভাঙা গড়া চলছে তার অনুভূতি দিয়ে বুঝল। কিন্তু বাইরে তার মনের প্রতিক্রিয়া কিছুমাত্র প্রকাশ করল না। বিদুরও কোন প্রশ্ন করে তাকে উত্যক্ত করল না। নিঃশব্দে উঠে গেল সে। সিঁড়ির উপের দঁড়িয়ে অপলক চোখে নীরবে বিদুর তার ভাবান্তরের দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দেখল। আশ্চর্য লাগল। কত দূরের মানুষ যেন সত্যবতী। তবু স্নেহ মমতার চৌম্বক আকর্ষণ সত্যবতীর দিকে তাকে টানতে লাগল। সে জানে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা বৃথা। মাঝখানে অসংখ্য অদৃশ্য বাধা।

ভরা দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। নীল আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটা নেই। সবটাই নীল। সূর্যের কড়া রোদের তাপে সতেজ সবল গাছগুলো পর্যন্ত নেতিয়ে পড়েছে। যতদূর চোখ যায় সমস্ত স্থানটাই নির্জন এবং রোদে ঝলমল। ঘুঘুর ডাকে এক অদ্ভুত শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ছাদের কার্নিসের ছায়ায় পায়রার সপ্রেম গদগদ স্বর এক মায়া রচনা করে। ওদের জীবনে কোনো সমস্যা নেই। তাই এক উপচানো আনন্দে, অসহনীয় সুখবোধে সর্বক্ষণ মুখর।

এইসব ঘটনা ও দৃশ্য এবং শব্দের মায়া মোহের অনির্বচনীয় আকর্ষণ সত্যবতীকে মোহাবিষ্ট করে। একা একা এসব অনুভব করতে ভীষণ ভালো লাগে। এই আলো, ছায়া, অর্থহীন শব্দ মনোহরণের দৃশ্য মৃত্যুর পরেও কী এমন গভীর করে পৌঁছবে তার কাছে? মৃত্যু মানেই স্বপ্নহীন, মায়াহীন, অনস্তিত্বের অন্তহীন ঘুম। আর তখনই মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিজের অজান্তে চলে আসে বিদুরের

মহলে। এমনিতে খুব একটা বিদুরের ঘরে আসে না। ইদানীং তার যাওয়া আসাটা বিদুরের ঘরে বেড়েছে।

ঠিক দুপুরে সত্যবতীকে তার ঘরে হাজির দেখে বিদুর বেশ অবাক হল। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে সত্যবতীর দিকে চয়ে রইল অনেকক্ষণ। সত্যবতীর চোখ দুটি হরিণের মতো আশ্চর্য সুন্দর। নীল সাগরের গভীরতা। কী গভীর মায়া আর কত করুণ সে মুখখানি। সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে বিদুর বলল, ঠাকমা, তোমাকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে। তোমার হয়েছে কী?

সত্যবতী কী বলবে ভেবে পেল না। অনেকদিন ধরে কথাটা বলিবলি করেও বলা হয়নি। আজ সমস্ত মনটা সে তৈরি করে এসেছিল। বলল : হয়নি কিছু। তবে, মনটা ভালো নেই।

মনের কষ্টের কথা জানতে চাওয়া যদি দোষ না হয়, তাহলে আমাকে বলে মনের ভার হাল্কা করতে পার।

সত্যবতী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল : তোমকে আমার অনেক কথা বলার আছে।

বিদুর বলল : সে আমি জানি। অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলার ভূমিকা করছ। কিন্তু মুখ খুলতে পারছ না। সহস্র দ্বিধায় তোমার কথাগুলো গলার কাছে আটকে রয়েছে। দাসিপুত্র বলেই হয়তো সংকোচে বলতে পারছ না। চোখের ভাষায় তোমার মনের কথাটা বুঝতে চেষ্টা করতাম।

বিদুরের কথাগুলো সত্যবতীর হৃদয়টাকে দ্রব করে দিল। বলল : বিদুর তোমার কাছে আমার অনেক দাবি। এখন লুকনোর কিছু নেই। অনাবৃত করে দেখানোর এবং বলার সেই সময় হয়েছে। তুমি লেখা পড়া শিখেছ। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান হয়েছে তোমার। এ পরিবারের অনেক কিছু জান, আবার জান না। যেটুকু জান তাও অসম্পূর্ণ। বর্তমানে সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। কেবল তুমিই পার সংকটে আমরা পাশে দাঁড়াতে।

বিদুরের অবাক হওয়ার পালা। সত্যবতীর জীবনে কত ঝড়-ঝাপটা গেছে, তবু তাকে ভেঙে পড়তে দেখেনি। আজ সেই চিরচেনা মানুষটি এত উতলা কেন? সত্যবতীর কী হয়েছে? নিজেকে তার এত বিপন্ন, অসহায় মনে হচ্ছে কেন? এক গভীর সহানুভূতিতে তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপছিল, ঝড়ের মুখে অসহায় পাতার মত। আস্তে আস্তে বলল, ঠাকমা, আমি শূদ্রাণী পুত্র। এই পরিবারের কেউ নই। তবু তোমার সঙ্গে এক পলকা বন্ধন রয়ে গেছে। তোমার দয়ায়, প্রশ্রয়ে ভালোবাসায় এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছি। তুমি আমার আশ্রয়, আমার অবলম্বন। সংকটের দিনে তোমার পাশে দাঁড়ানো আমার ভাগ্যের কথা। কিন্তু যারা তোমাকে ঘিরে আছে, তারা মেনে নেবে কি? অন্ত্যজ বলে কেউ আমায় দূরে সরিয়ে রাখেনি, কিন্তু কাছেও টেনে নেয়নি। পরগাছার মত নিজের জোরে আঁকড়ে আছি। বিনিসুতোর মালায় গাঁথা এক অপলকা অধিকারের বন্ধন। যে কোন মুহূর্তে খসে যেতে পারে।

বিদুরের কথাগুলো সত্যবতী মন দিয়ে শুনল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল। নিজের সব ভাবনার কথা অন্যকে বলতে নেই। তবু কিছু কিছু কুসুমগন্ধী কথা থাকে যা বিশ্বাসভাজনের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছে না দিলে তার কোনো গন্তব্যই থাকে না। নিজেকে তেমনভাবে প্রকাশ করতে শুধু ভাষা নয়, পরিবেশ সৃষ্টির দরকার হয়। সত্যবতীর মনে হলো, সেরকম একটা অনুকূল ভাবাবেগে বিদুরকে সে উৎকর্ণ করতে পেরেছে। তার বুকের ধুকপুক শব্দ নিজের বুকের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে একছন্দে মিশল। বিদুরকে হাত ধরে পালঙ্কে বসাল। নিজেও বসল তার মুখোমুখি। আস্তে আস্তে বলল, বৎস, শূদ্রের অভিমান, লজ্জা, আত্মগ্লানি তোমার মতো আমি এ বুকে বয়ে বেড়াই। সেই কথাটা বলতে এসেছি তোমাকে। অনেককাল আগের কথা। তবু মাঝে মাঝে ভীষণ মনে পড়ে। একটা ভয়ঙ্কর রাগে ভেতরটা প্রতিশোধস্পৃহায় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আমার সমৃদ্ধ জীবন যারা ব্যর্থ করে দিল তাদের ক্ষমা করতে পারি না। সমস্ত মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অথচ, সে কথা কাউকে বলতে পারি না। বুকের মধ্যে একা বহন করি। তুমি পার না আমায় সাহায্য করতে।

বিদুরের সারা বুক জুড়ে শিহরণ বয়ে গেল। হীনমন্যতার এক গভীর যন্ত্রণায় অবহেলার অপমানে তার বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। সত্যবতী, হয়তো ভালো করেই জানে শূদ্রের অভিমানে এবং সংকটে সে তার পাশে দাঁড়াবে, কোন অবস্থাতে তাকে ত্যাগ করবে না। বৃদ্ধ বয়সে তার জীবনে

একান্ত নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে। এতবড় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় নিয়ে যে মানুষটা আজ তাকে আশ্রয় করেছে তাকে 'না' বলে ফেরাতে মন চায় না বিদুরের। আবার তার মহানুভবতার পরম দান গ্রহণের মতো মনের অবস্থাও নেই। অস্থিরতায় বারকয়েক মাথ নাড়ল। বলল, তোমার জন্য আমি সব পারি। বিষের যে জ্বালায় তোমার বুক অহরহ জ্বলছে, সেই জ্বালা অহর্নিশ আমার বুকেও। মনোরঞ্জিনীর পুত্র বলেই যোগ্যতা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনকালে হস্তিনাপুরের রাজা হতে পারি না আমি।

বিদুরের সেই গহন বিষণ্ণতার মধ্যে সত্যিকারের একটু আনন্দ দেবার জন্য সত্যবতী বলল, মনে মনে আমি ভীষণ ভাবে চাই তুমি হস্তিনাপুরের রাজা হও।

তোমার চাওয়া যে সব নয়, আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবু এই চাওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সত্যবতী চুপ করে রইল। দুপুরের ফুর ফুরে হাওয়ায় তার মাথার চুল এলোমেলো উড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা শ্বাস পড়ল। হতাশ গলায় বিমর্ষস্বরে বলল, কৃষ্ণবর্ণা অনার্য রমণীদের আর্যরা কোনোদিন সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা করেনি। তাদের খুব সস্তা আর সহজপ্রাপ্য মনে করে। তারা শুধু আর্যপুত্রদের লালসা চরিতার্থ করার যন্ত্র। কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীরা একধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। শ্বেতাঙ্গদের কাছে তারা কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ে। নিজেদের খুব দীন মনে করে। শ্বেতাঙ্গদের একটু করুণা পেলেই তার ধন্য হয়ে যায়। তাদের সান্নিধ্যে মনটা ভরে যায়। সেবার অধিকার পেলেই কৃতার্থ হয়। এ ধরনের মানসিকতার মধ্যে একটা দাস্যভাব আছে। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি কালো মানুষদের এই দুর্বলতা তাদের সব দুর্ভাগ্যের হেতু। কিন্তু পিতা দাসরাজ সুকৌশলে আমার দুর্ভাগ্যের কপালে জয়টীকা পরিয়ে দিলেন। একজন দুর্বলও কৌশলে দুর্ভাগ্য থেকে জয় আদায় করে নিতে পারে, এই সহজ কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি তোমাকে এবং দ্বৈপায়নকে তার অস্ত্র করেই এদের বিরুদ্ধে লড়ব।

বিদুরের ভেতরটা সহসা চমকে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর। সত্যবতীর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপরে কি মনে করে চোখ বুজল। বলল, ঠাকমা, এ তোমার সংসার, তোমার রাজ্য। তুমি এ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। সর্বময়ী কর্ত্রী। কার সঙ্গে তোমার ঝগড়া?

আমার সব ঝগড়া শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। তাদের গড়া সাম্রাজ্যের শক্ত ভিতের উপর আমি কালো মানুষদের জন্য একটা আলাদা রাজ্য গড়ে যেতে চাই। কালো মানুষদের অভিশপ্ত জীবনের অবসান কামনা ছাড়া আমার কোনো বাসনা নেই। ঈশ্বরেরও বোধ হয় সেই ইচ্ছা। নইলে, আমার জীবনটা এমন ঘটনাবহুল হবে কেন? বাঁধা ছকের বাইরে অকস্মাৎ এ কোন জীবনধারা এসে মিশল? সেই ধারায় গা ভাসিয়ে আমিও বাসনার উপকূলে পৌঁছে গেলাম। এখনও অনেক দূর। শুধু তটভূমি দেখা যাচ্ছে।

বিদুর উৎকর্ণ হয়ে সত্যবতীর কথাগুলো শুনছিল। বুকের ভেতর ঝটিতি অজস্র প্রশ্ন একসঙ্গে উথাল পাথাল করে উঠল। কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। বরং আশ্চর্য লাগল এই ভেবে, যার জীবন নানা দিক থেকে এত কানায় কানায় পূর্ণ তার তো কোন ক্ষোভ দুঃখ থাকার কথা নয়। তবু তার ভেতরটা কত রিক্ত! কত একা সে! কেন এমন হয়? প্রশ্ন প্রশ্ন—কত প্রশ্ন তার মনে এল। মানুষের জীবনে কত ঘটনাই ঘটে—যার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু এইসব ঘটনা অজান্তে তাকে এক অন্যমানুষ করে দেয়। হয়তো সে নিজেও জানে না। সে শুধু আরম্ভটা দেখতে পায়, শেষ কোথায় জানে না? তবু প্রত্যাশা নিয়ে পথ চলে। গন্তব্য জানা না থাকলে একজন সফল মানুষও ব্যর্থ হয়।

কয়েকটা মুহূর্ত উভয়ের চুপ করে কাটল। বিদুরের ধ্যানস্থ দু'চোখের গভীরে সত্যবতী কী দেখল সেই জানে। পালঙ্ক থেকে নেমে জানলার ধারে দাঁড়াল। খোলা জানলা দিয়ে নীল আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। রৌদ্র করোজ্জ্বল, নির্মেঘ আকাশের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সত্যবতী বলল, তুমি তো ঈশ্বর বিশ্বাসী ছেলে। ঈশ্বর যেভাবে চালান সেভাবেই চলি। আমরা কেউ কিছু করি না। একটার পর একটা ঘটনা এমনভাবে ঘটছে আমার জীবনে যে, প্রতিমুহূর্ত মনে হচ্ছে ঈশ্বরই আমাকে দিয়ে কিছু করাচ্ছেন। তা না হলে আমার সাধারণ জীবন এমন আসাধারণ ঘটনাবহুল হবে কেন? কত

বিচিত্র ঘটনায় ভরা আমার জীবন। আমার সারা জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য কালিতে, অব্যক্ত ভাষায় লেখা হচ্ছে এক বদলের ইতিহাস। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে ধাক্কা খায় যখন বুঝতে পারি ভিতটা অলক্ষ্যে তৈরি হয়ে গেছে। পালাবদলের কাজটাই শুধু বাকি। দ্বৈপায়ন সোনার চাবি হয়ে সেই অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার ঘরের দরজাটা খুলে দিয়েছে। মহাবল মহাকাল গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছেন পদদলিত শূদ্রের তেজে জেগে উঠতে। জান পৌত্র, আমি মহাকালের সে পদধ্বনি কান ভরে শুনতে পাই। আমার হৃদয়ছন্দে ডমরুধ্বনি করে নটরাজ নাচছেন। তাঁর এক পা অতীতে, এক পা বর্তমানে। হাসি কান্নার তরঙ্গে দুলছে আমার বুকের হার। বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, তবু একবারও বলতে ইচ্ছে কবছে না, হে নটরাজ, থামাও তোমার নৃত্য। তুমি দারুব্রহ্ম হয়ে যাও। অথবা তুমি বামনরূপে এসে তৃতীয় পা আমার মাথার ওপর রাখ। তোমার পদতলে পিষ্ট করে দলিতদের জিতিয়ে দাও। অবহেলা, অনাদর, অসম্মান, বঞ্চনা, যন্ত্রণার ভার আর কতকাল বহন করবে তারা? দলিত মানুষের অভ্যুত্থানের শক্তি বিধাতা দিয়েছে তোমায়। তুমি চাইলেই পার, প্রতিদিনের লজ্জা, অপমান, আত্মগ্লানি থেকে শূদ্রদের রক্ষা করতে এবং জীবনযুদ্ধে তাদের জিতিয়ে দিতে। কেবল সেই ইচ্ছেটুকু তোমাব ভেতর জাগাতে হবে।

বিদুরের সব কথা হারিয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সত্যবতীর দিকে। ঠাকমাকে তার ভীষণ অচেনা মনে হলো। আশ্চর্য লাগে। এক বুক রাগ, অপমান, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো গন গন করছিল তার ভিতরে। মুখেচোখে বিহ্বলভাব হঠাৎ এরকম একটা রূপান্তর বিদুরকে বিপন্ন কবে। ঝড়ের মুখে অসহায় পাতার মতো কাঁপছে তার ভেতরটা। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সে যা শুনল তা স্বপ্ন, কল্পনা, না বাস্তব! কিন্তু একজন মানুষ এভাবে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবে কী করে? এ রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েও সত্যবতী দলিতদের প্রতি গোপন সহানুভূতিকে দয়া কিংবা করুণায় নোংরা করেনি। কারণ অধিকার ভিক্ষা করে পাওয়ার জিনিস নয়। অনেক মূল্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। যে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে শেখেনি বাইরের কোনো শক্তি কিংবা অনুগ্রহ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তাকে অবশ্যই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। এ পৃথিবীতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া না। সত্যবতী হয়তো তাকে বাজিয়ে দেখার জন্যই কথাগুলো বলেছে। কিন্তু তাতে কতখানি অবিশ্বাস, কতখানি সন্দেহ এবং ছলনা ছিল বিদুর পরিমাপ করতে পারল না। কেবল কথা বলার সময় সাবধান হল। মৃদুকণ্ঠে বলল, ঠাকমা, মনোরঞ্জিনীর পুত্র আমি। যে কোনো বিষয় মনস্থির করতে আমার সময় লাগে। আসল কথাটা হলো, এই পৃথিবীতে আমরা পরস্পরের কতটা আপনজন?

ভীষণ চমকে উঠেছিল সত্যবতী। শীত বাতাসের একটা চাবুক তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কষ্টে বলল : আমার, তোমার এবং দ্বৈপায়নের জন্ম শূদ্রাণী মায়ের গর্ভে। আমাদের দুঃখ, যন্ত্রণা এক। আমরা কেউ আলাদা নই। অনার্য রক্তের অনেক কিছু আমাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাকে সহজে উপড়ানো যাবে না। বোধ হয় পুরুবংশের অভ্যন্তরে বীজটা পুঁতেছিল উপচির বসু, অনেককাল আগে।

বিদুরের মুখে বিহ্বলভাব। কেমন একটা রূপান্তর ঘটে যায়। তার সুরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে সহসা অদৃষ্ট যেন দৈত্যের বেশে মসীলেপন করতে লেগেছে। আর অসহায়েরর মত তাকে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে তার কাছে। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মও অনার্য রমণীর সন্তান। তা হলে ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর বিরোধ কেন? তাকে সহ্য করতে পারছে না কেন? সে কি শুধু সপত্নীগত পুত্র বলে, না অন্য কিছু। নিজের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে লাগল বিদুর। বলল : তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরই ভাল লাগবে।

সত্যবতী বিদুরের কথায় একটু অবাক হয়। বলল : আমার জন্য তো কিছু করতে বলেনি। শুধু বলেছি দলিতদের একজন হয়ে এই বাড়ির বনিয়াদ ভাঙতে থাক। দলিতদের বুকের আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

বিদুর নিঝুম চোখে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে বলল : তুমি না চাইলেও এই বংশ ছারখার হয়ে যাবে। অনেক কলুষিত রক্ত ঢুকেছে এ পরিবারে।

সত্যবতী মাথা নাড়ল। বিদুর মৃদুকণ্ঠে বলল : এসব কথা কেউ মুখ ফুটে বলে না ঠাকমা। মনের কথা প্রকাশ করতে নেই। তাতে বাতাসে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে যায়। আর বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পেরে যায়।

সত্যবতী জ্বালাভরা দৃষ্টিতে বিদুরের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : জানি। এই বয়সে তুমি কত বিচক্ষণ। সর্বদিকে তোমার নজর। যতদিন যাচ্ছে ততই তোমাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন, বাসনা, আকাঙ্ক্ষাগুলো মুকুলিত হচ্ছে। আমার কল্পনা বাস্তব হয়ে যাচ্ছে। আমার ভেতর লুকোনো ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা একটা রূপ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি হেরে যাইনি। ফুরিয়েও যাইনি। বিজয়কেতন নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে তুমি চলেছ।

ঠাকমা, তুমি চুপ কর। এসব কথা বলতে নেই।

বাধা দিস না। আমাকে বলতে দে। বুড়ো হয়েছি, কবে আছি, কবে নেই তার আগে স্বপ্নের স্থপতিকে সব কথা বলে খালি হয়ে যেতে চাই। পৌত্র, বুকের ভেতর জমানো অভিমান বাধা মানে না। সব নিষেধ, প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে তার। আমিও আড়াল রাখতে চাই না আর। তোমার সব জানা দরকার। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা, ক্ষমতার কোনো অভাব রাখেনি বিধাতা। অন্ধত্বের জন্য পরনির্ভরশীল থাকতে হবে চিরকাল। চোখ খোলা রেখে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় তাকে কোনো সচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাহায্য নিতে হবে। সেই ব্যক্তিটিই ধৃতরাষ্ট্রকে পুতুল করে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে বসবে। আমি চাই না, দেবব্রত পুনর্বার ক্ষমতায় ফিরে আসুক।

ঠাকমা, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

দেবব্রতকে একদিন আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তার কাছে ঠকে গেছি। এক অসাধারণ প্রতিজ্ঞায় সে আমায় যেমন মুগ্ধ করেছে, আচ্ছন্ন করেছে, তেমনি বোকাও বানিয়েছে। হয়তো আমার অদৃষ্টও সেজন্য দায়ী কিছুটা। তবু মানুষের মন তো। ভবিতব্যের অনেকখানিতে মানুষের হাত সে দেখাতে পায়। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যুর জন্য দেবব্রতকে কোনোদিন আমি ক্ষমা করতে পারব না। হয়তো সে নিমিত্ত। তবু, তাদের মৃত্যুর জন্য দেবব্রতেরই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের দুর্মর লোভই দায়ী। দেবব্রত আমার সাধের স্বপ্ন ভেঙে খানখান করেছে।

বিদুর অস্বস্তিবোধ করে। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। এই ধরনের কথায় দেবব্রতের মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তির মর্যাদাহানি হয়। তাই এক দারুণ প্রতিবাদে সে মাথা নাড়ে। বলল : ঠাকমা, তোমার মনটা আজ ভালো নেই। নানাবিধ কারণে তোমার বিশ্রামের দরকার। আমি চিরদিন তোমার আশ্রয়ে আছি, থাকবও। তুমি আমার ইহকাল, পরকাল। তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

সত্যবতীর দু'খানা হাত ধরে বিদুর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাতেই সত্যবতীর মুখের রঙ বদলায়। একটু অপ্রতিভ হাসে। বলল : এ কথাটাই তোমার মুখে শুনব বলে আশা করেছিলাম।

বিদুরের কোনো ভাবান্তর বোঝা গেল না। সত্যবতী চোখ দুটো বুজে গভীর এক প্রশান্তিতে প্রস্তরীভূত হয়ে তার হাত দুটি ধরে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে বিদুরের দিকে তাকাল। স্নিগ্ধ ও গভীর মায়াবী এক দৃষ্টি। আস্তে করে বলল : আমাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে চল।

দ্বৈপায়নের কথাগুলো সত্যবতীকে হতাশ করল। পুত্রের শান্তভাবলেশহীন মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। খুব বিস্বাদ লাগল। সত্যবতীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, মা বিদুরের পায়ের তলায় মাটি নেই। পরগাছার মত সে ঝুলে আছে কৌরববংশের সঙ্গে। মানুষ হিসেবে সে খুব সৎ-ধার্মিক। সকলের প্রিয়। বলা যেতে পারে কৌরববংশে অজাতশত্রু। সে ও আমি এই পরিবারে বনস্পতির মত এক অদ্ভুত স্বার্থের বেদীপার্শ্বে পুতুলের মত স্থির হয়ে আছি। আমাদের ধমনীতে এই বংশের রক্ত প্রবাহিত হয় না। তবু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং অদৃষ্ট মিলে আমাদের দু'জনকে হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি করে তুলেছে। এটা সবাই জানে, তবু এই নিয়ে এখনও কোন ঝড় ওঠেনি। উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সকলে খাপ খাইয়ে চলছে। সব কিছু এমন আচমকা ঘটে গেল যে কারো কিছু করার ছিল না। কিন্তু বিদুরের রাজা হওয়ার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।

সত্যবতী ব্যথিত হয়ে বলল : তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সংসারে আত্মীয়তার বন্ধনগুলোও পলকা।

বিদুর তার অনুভূতির মধ্যে সত্যবতীর তীব্র অসহায়তা টের পেল। শরীরের মধ্যে একটা অস্থির কাঁপুনিও অনুভব করল। মনে হল, সত্যবতী একটা আশ্রয় খুঁজছে। তাকে আশ্বস্ত এবং প্রসন্ন করার জন্য বলল : ঠাক্‌মা এই তো আমি। তোমার পাশেই আছি। তুমি তো ভেঙে পড়নি কখনও। আজ নিজেকে বিপন্ন মনে করে অস্থির হচ্ছ কেন?

সত্যবতী এক বিপন্ন অসহায়তা নিয়ে বিদুরের দিকে চেয়ে রইল। বলল : বাইরের মানুষটা সব নয়। নেভা আগ্নেয়গিরির বাইরে দেখে তার অন্তর্নিহিত আগুন কী টের পাওয়া যায়? আমার বুকের মধ্যে তেমনি এক আগুন অহরহ জ্বলছে। আমি কী করে শান্ত থাকি?

হস্তিনাপুরের ইতিহাস নতুন পথে পা বাড়াবার জন্য তৈরি। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়েই যত গণ্ডগোল। দ্বৈপায়নের ঔরসজাত বিচিত্রবীর্যের তিন ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের মধ্যে কার রাজা হওয়া উচিত, কে বেশি যোগ্য এই নিয়েই একটা বিরোধ আসন্ন। বিরোধটা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কূল থেকে তার ও ভীষ্মের তটভূমির দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। পাণ্ডুকে আঁকড়ে ধরে ব্রাহ্মণরা প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টায় আছে, অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রকে অবলম্বন করে ভীষ্ম ক্ষাত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে। আবার বিদুরের পক্ষ নিয়ে সত্যবতী শূদ্রজাতির নব অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখছে। ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের তৃতীয় শক্তিরূপে বিদুরকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিবির নিজ নিজ পক্ষে পেতে আগ্রহী।

সংকটের তেমাথায় দাঁড়িয়ে সত্যবতী ভাবছিল, অচেনা জায়গায় নতুন পথিককে তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে যেমন স্থির করতে হয় কোন পথে গেলে গন্তব্যের পৌঁছবে, তেমনি জীবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে সত্যবতীকেও স্থির করতে হবে কার পক্ষে গেলে সব কূল রক্ষা হয়। এক্ষেত্রে আগাম ধারণা সব সময় কাজে লাগে না, প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়ে সঠিক নির্বাচনই শেষ কথা। কারণ, সিদ্ধান্ত একবার ভুল হলে শোধরানোব উপায় থাকে না। সারা জীবন পস্তাতে হয় তাকে। জীবন দিয়ে দাম দিতে হয়। এসব ভেবেই সত্যবতী হস্তিনাপুরের সিংহাসনে নতুন রাজার অভিষেকের জন্য কেবলই সময় নিচ্ছিল। কারণ সত্যবতী ভালো করেই জানে রাজনীতিতে সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কালহরণ যত হবে, ততই বিবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বার্থের সংঘাত, লোভের রূপ দিনের আলোর মত প্রতিভাত হবে। হলও তাই। সত্যবতী কাউকে কোন নির্দেশ না দিলেও নৃপতি নির্বাচনের দায়িত্বটা যে যার মত ব্যাখ্যা করল। সত্যবতী নীরব এবং নিরপেক্ষ থেকে বুঝতে চেষ্টা করল প্রকৃত ঘটনার স্রোত কোন দিকে কিভাবে গড়াচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়া মানেই ভীষ্মের রাজত্ব। তাই, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিচিত্রবীর্যেব দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র পাণ্ডুর পক্ষ অবলম্বন করে তাকেই হস্তিনাপুরের রাজা করতে চাইল। পাছে তাদের প্রচেষ্টা বানচাল হয়, তাই দ্বৈপায়নকে ভীষ্মের বিপক্ষে দাঁড় করে এক পারিবারিক বিবাদের বীজ বপন করল।

অগ্রজ বলেই সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার। কিন্তু অন্ধ বলেই সংকট দেখা দিল। চক্রান্তকারীরা উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য বলতে লাগল, শাস্ত্রে আছে অন্ধের রাজা হওয়ার অধিকার নেই। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে দিয়ে রাজকার্য চলে না। অন্ধরাজা দেশের ও দশের জীবনে অভিশাপ। রাজা পরনির্ভরশীল হলে সমূহ বিপদ। এজন্যই ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনাপুরের রাজা করা যায় না। তাই কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুকে ধৃতরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করা উচিত। কনিষ্ঠ হওয়া কোনো বাধা নয়, অযোগ্যতাও নয়। মহারাজ পুরু কিংবা শান্তনু উভয়েই কনিষ্ঠ হয়ে সিংহাসন আরোহন করেছিলেন। তা হলে পাণ্ডুর হবে না কেন? বিতর্কটা এর বেশি অগ্রসর হল না। রাজপদে বিদুরের প্রসঙ্গ কেউ তুলল না। ভীষ্মও আশ্চর্যভাবে নীরব থাকল।

সত্যবতী কৌশলে কালহরণ করতে লাগল। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দিন যত দেরি হতে লাগল ততই একশ্রেণীর নাগরিক প্রচার করতে লাগল বিদুরের নম্র আচরণ, মধুর বচন, শান্ত,

শিষ্ট ব্যবহার এবং দেব-দ্বিজে ভক্তিই তাকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। সকলের কাছে সে শুধু আদরণীয় নয়, গ্রহণযোগ্যও। অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভালবাসা, অনুরাগ তাকে কাছের মানুষ করেছে তাদের। বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায় নীতি-নির্ধারণে তার সিদ্ধান্তকে ভীষ্ম, আচার্য; দ্রোণ, কৃপ পর্যন্ত সমাদর করে। তাছাড়া বিদুর ধর্মপ্রাণ, সৎ এবং আদর্শবান। বিচিত্রবীর্যের তিনপুত্রের মধ্যে বিদুর সর্বশ্রেষ্ঠ। কেবল পাণ্ডুরই কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। সে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। তার মত দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষকে নিয়ে রাজ্য চালানো যায় না, তিন ভাইর মধ্যে একমাত্র বিদুরের রাজা হওয়ার সব গুণগুলি আছে।

কে বা কারা কোন স্বার্থে এই প্রচারগুলি করছিল ভীষ্ম জানে না। তবে বিচিত্রবীর্যের তিন ক্ষেত্রজ পুত্রের সিংহাসনের দাবি নিয়ে বেশ একটা বিতর্ক জমে উঠল। অথচ, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। তবু এই নিয়ে বেশ একটা সংকট তৈরি হল নগরীর অভ্যন্তরে এবং তিন ভ্রাতার মধ্যে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের নেপথ্য আয়োজন খুব চতুরভাবে এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে করা হচ্ছিল। ভীষ্মের বারংবার মনে হত রাজ্যশাসন থেকে তাকে হঠানোর চক্রান্ত চলেছে নিঃশব্দে। উত্তরাধিকারীর সংকটটা কারো কৌশলী পরিকল্পনায়, চতুর প্ররোচনায় এবং নেপথ্য ইন্ধনে তৈরি। কিন্তু নেপথ্যবাসীটি কে বা কারা তা জানার জন্যই ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল। নিজে থাকল নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রের অভিষেক সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করল না সে। যেমন রাজ্য শাসন করছিল তেমনই করে যেতে লাগল।

সত্যবতীই ফ্যাসাদে পড়ল। অবশেষে ভীষ্মকে তার বলতে হল, পুত্র, রাজপুত্ররা বড় হয়েছে। তাদের অভিষেক নিয়ে এবার ভাবনাচিন্তা করতে হয়। লোকে চারদিকে ছি ছি করছে। রাজ্যে, হস্তিনাপুরের রাজা নির্বাচন নিয়ে এক জটলা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে কিছু কর।

ভীষ্মকে অভিযুক্ত করেই সত্যবতী কথাগুলো বলল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে চমকে উঠেছিল। একটা চাবুক যেন তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। একটু বিষণ্ণ হয়ে বলল, অভিষেকের দিনক্ষণ স্থির করার জন্য আমাকে দায়ী করছ কেন? চিরকাল তোমার নির্দেশেই চলেছি। দিনকাল পাল্টেছে মা। নিজের ইচ্ছেতে এখন কিছু করি না। এমনিতে অনেক কথা হাওয়ায় উড়ছে। কত মিথ্যে অপবাদে, কত স্বার্থবুদ্ধির জঞ্জালে আমার সুনাম, আদর্শ ঢাকা পড়েছে। তবু আমার হয়ে কেউ প্রতিবাদ করল না। কেবল আমিই জানি এই হীন চক্রান্তের পিছনে কার কি মতলব, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। শুধু এই দুঃখে ও যন্ত্রণায়, লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। তাই আগ বাড়িয়ে কিছু করার কথা ভাবি না। যখন তোমার নির্দেশ আসবে তখন অভিষেক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করব মনস্থ করেছি। এখন রাজনৈতিক জটলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর মধ্যে টেনে আনলে আর একটা গোলোযোগ শুধু বাড়বে। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

সত্যবতী একটু বিব্রত হল। একটু অপ্রতিভ হাসল। মৃদুস্বরে বলল, আমি কিন্তু খুব সাধারণভাবে কথাগুলো বলেছি। কিছু ভেবে বলেনি। তবু তোমার স্পর্শকাতর মনটি আমার কথাতে আহত হয়েছে। কারণ, ছেলেরা অগ্রপশ্চাৎ অনেক কিছু জড়িয়ে বিচার করে, মেয়েরা করে না। যাইহোক, কথার বিতর্ক থাকুক। ওতে আমাদের কারো লাভ হবে না। এমনিই মনটা নানাবিধ ঝামেলায় অশান্ত। তবু এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সব কিছু নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। আমি এ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, আমি তো সমস্যাকে ফাঁকি দিতে পারব না। সমস্যা যত কন্টকিত এবং সংঘাতসঙ্কুল হোক না কেন, নিস্পৃহ ও উদাসীন থেকে দায় এড়িয়ে যেতে পারি না। তাই বলছিলাম, উত্তরাধিকারী সংকট নিয়ে একটা মীমাংসা তো করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ না হলে কোনো সমস্যাই হত না।

ভীষ্ম নিস্পৃহভাবে বলল : আমায় কী করতে হবে?

সত্যবতী ভুরু কুঁচকে বলল : চমৎকার কথা! তারপর একটু গম্ভীর হয়ে ভর্ৎসনা করে বলল, নিস্পৃহ থাকা ভাল। কিন্তু কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা বোধ হয় ভালো নয়। এতকাল ধরে আমি শুধু নির্দেশ দিয়েছি, সফল হওয়ার ছক করেছ তুমি। আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন? নির্দেশ পালনের জন্য কী করলে ভাল হয় তুমি স্থির কর। এ কাজটা এতাবৎকাল শান্তনু নন্দন ভীষ্মই

হাসিমুখে পালন করে এসেছে। সংকট সময়েও তার বুদ্ধি দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে বলে জানি, সে ধার কি ভোঁতা হয়ে গেল তবে?

সত্যবতীর নরমে গরমে মেশানো কূটভাষণ বক্রোক্তি এবং তিরস্কারের জবাব ভীষ্ম সহসা দিতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। সত্যবতীর কথার ভিতরকার সত্যটুকু ভীষ্মকে স্পর্শ করে থাকবে। একধরনের অপরাধবোধে মাথা হেঁট করে রইল। প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল, নদীর স্রোত জিনিসটা ভারি অদ্ভুত। সময় ও জল যেন একসঙ্গে মিশে চলেছে মোহনার দিকে। তেমনি তুমি ও আমি নদীর মত একই তরঙ্গে ভেসে ভেসে চলেছি অজানা ভবিষ্যতের দিকে। একই অদৃষ্টসূত্রে বাঁধা আমরা। সেটাই আমার এবং তোমার বড় বন্ধন।

ভীষ্মের কথায় সত্যবতী বুকটা ধক করে উঠল। হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকল। অধরে টেপা হাসি। তারপর আস্তে আস্তে বলল : তোমাকে যতটা নিরাসক্ত উদাসীন দেখায় তুমি ততটা নও। চালাকি করে আমাকে দিয়েই কথাটা বলিয়ে নিতে চাইছ। বিশ্বাস যে করে, তার চেয়ে বড় দায় বিশ্বাস যে রাখে।

হাসি হাসি মুখে সত্যবতী ভীষ্মের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল: রাজসভায় সকলকে নিয়ে খোলামনে আলোচনা করে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নিলে কেমন হয়।

ভীষ্ম বলল : বেশ তাই হবে। কিন্তু বিতর্কের শেষ সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারব না। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারটা রাজপরিবারের। এর সঙ্গে অন্যের পছন্দ-অপছন্দ জড়ালে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে রাজ্যে। তাই বিতর্কের রাশ টেনে ধরার জন্য একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষকেই দায়িত্ব দেয়া ভাল। ভ্রাতা দ্বৈপায়নকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরূপে রাখলে সবদিক রক্ষা পায়। কারণ যাদের নিয়ে বিতর্ক তারা তো দ্বৈপায়নের ঔরসজাত সন্তান। তাঁর বিচারই সকলের গ্রহণযোগ্য হবে। যদি নাও হয়, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তো কেউ করবে না। সেটাই বা কম কিসে?

সত্যবতী ভীষণ আশ্চর্য হল। ভীষ্ম একেবারে তার অন্তরের কথা বলল। কী ভাল লাগল তার কথা শুনে। আনন্দে বুকখানা থর থর করে কেঁপে গেল। সারা শরীরের মধ্যে এক আশ্চর্য সুখের শিহরণ টের পেল, যা দৈনন্দিন নয়, স্বাভাবিকও নয়—একেবারে অন্যরকম। বিহ্বল চোখে সে ভীষ্মের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল।

দ্বৈপায়ন চতুর্থবারের জন্য হস্তিনাপুরে আমন্ত্রিত হল। এই রাজ্যের কেউ নয় সে। তবু এক আশ্চর্য বন্ধনে বাঁধা। অদৃষ্ট আর পরিস্থিতি মিলে তাকে হস্তিনাপুরের রাজ্য ও রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি করে তুলল। সামান্য এক ঋষি থেকে ঐতিহাসিক মানুষ হয়ে গেল সে। কালই ছিন্নমূল একটা মানুষকে চুম্বকের মত হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের বিবিধ ঘটনার মধ্যে টেনে আনল। সে নিজে কিছু করল না। যা করার সব অদৃষ্টই করল। কথাগুলো নিজের মত করে সত্যবতীর ভাবতে ভাল লাগল। সেই সঙ্গে নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা মাথার মধ্যে ভীড় করল। নানা শব্দ ও গন্ধ চেতনার মধ্যে তারা বাজির উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মত চারদিকে ছিটকে যাচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে মাথার উপর ছাদের নিচে চাঁদোয়ার মত ঝুলনো কাঠের কারুকাজ করা নকশার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দেওয়ালের বড় দর্পণের ওপর হঠাৎ চোখ পড়তে চমকে তাকাল। পর্দার ফাঁক দিয়ে যেটুকু দ্বৈপায়নকে দেখা যায় ততটুকুই ছায়া পড়েছে আয়নায়। সদ্য স্নান সেরে উঠে আসছে যেন। সকালের নরম রোদের আলো তার কৃষ্ণবর্ণ ভেজা গা বেয়ে যেন চুঁইয়ে পড়তে লাগল। জ্যোতিশিখার মত জ্বলজ্বল করছিল। চূড়া বাঁধা চুলের রাশ পিঠময় ছড়ানো। ভিজে বলেই শুকনোর জন্য খুলে দিয়েছিল। কপালে লম্বা করে শ্বেতচন্দনের এক তিলক পরেছে। তার অনাবৃত গায়ের ওপর একখণ্ড গেরুয়া রঙের চাদর কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত কোনাকুনি করে বাঁধা। তাকে দেখে উল্লাসের কলধ্বনি বাজছিল

সত্যবতীর বুকের রক্তে। বিপুল এক সুখের আবেগে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতর অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছিল শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি অসাধারণ পুরুষের প্রতিকৃতি।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল সত্যবতী। নিজের অজান্তেই উঠে গেল তার দিকে। হাত ধরে খাটে এন বসাল তাকে। বলল : পুত্র তোমাকে হস্তিনাপুরের বড় প্রয়োজন। কেবল তুমিই পার এক অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে। হস্তিনাপুরে রাজা কে হবে, এই নিয়ে এক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বলতে পার, এর একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে তোমাকে ডেকেছি। প্রার্থীরা সকলে তোমার পুত্র। তাই এক নিরপেক্ষ ও নির্ভুল বিচার তোমার কাছেই আশা করতে পারি।

সত্যবতীর বুকের গভীরে গোপন গোলাপরাঙা স্বপ্ন ও বাসনাকে দ্বৈপায়ন দেখল। অধরে কৌতুক হাসি ফুটল। বলল : মাগো, রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসনে বসবে কে, এই নিয়ে একটা জটিল তর্ক সৃষ্টি হল কেন? সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে সত্যিই কোনো সমস্যা ছিল না। তবু এই নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হল তার সমাধানের জন্য তুমি কি চিন্তা করেছ? কাকে নৃপতি করা উচিত মনে কর।

দ্বৈপায়নের সকৌতুক প্রশ্নের সম্মুখে সত্যবতী অসহায় বোধ করল। পুত্রের মুখের দিকে সত্যবতী বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিপন্ন অসহায় গলায় বলল : আমি নারী। রাজনীতিব সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু? রাজনীতি ভাল বুঝি না বলেই তোমাকে ডেকেছি।

সত্যবতীর চোখের ওপর চোখ রেখে মিট মিট করে হাসছিল দ্বৈপায়ন। বলল, সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা নেই। নিজেকে গোপন করারও কোন দরকার হয় না। অকপটে তোমার মনের কথা ব্যক্ত করতে পার।

পুত্রের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। বিব্রত গলায় বলল, পুত্র আমাকে লজ্জায় ফেলে তুমি কী সুখ পাও? আমার মনের ইচ্ছা তোমার অজ্ঞাত নয়। বিদুরের প্রতি তোমার ও আমার সমধিক স্নেহ। নৃপতি হওয়ার সব গুণ তার আছে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মত সেও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজপুত্র এবং তোমার ঔরসজাত। বিদুর অম্বিকার দাসীপুত্র। রাণীর স্বামী তার দাসীদেরও স্বামী এই প্রথা বহু পুরনো। এই বংশের পূর্বপুরুষ রাজা যযাতির সঙ্গে শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়েছিল দেবযানীর। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়ে তার সঙ্গে এসেছিল। দাসী শর্মিষ্ঠার গর্ভে রাজ যযাতির তিন পুত্র হয়। তাদের সর্বকনিষ্ঠ ছিল পুরু। মহারাজ যদি তাকে সিংহাসনেব উত্তরাধিকারী করতে পারেন তাহলে বিদুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার অর্জনের বাধা কোথায়? এই কথাটা জোরের সঙ্গে সকলের সামনে দাবি করার জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছি পুত্র। তুমি চাইলেই বিদুর হস্তিনাপুরের রাজা হতে পারে। দলিত মানবকুলের প্রতিনিধি হয়ে বিদুর হস্তিনাপুর শাসন করুক, এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন। এরকম একটা পরিকল্পনা করে তোমাকে হস্তিনাপুরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়েছি। অদৃষ্ট আমার সহায় হয়েছে। এখন তুমি সহায় হলে ষোলকলা পূর্ণ হয়।

তা হলে কী প্রমাণ হয় বিদুর রাজা হবে। মা, নৃপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলি অবশ্যপালনীয় শর্ত আছে। কারণ দেশের রাজাই দেশের ভবিষ্যৎ। একটা দেশ ও জাতির ভাগ্য, সমৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলার মূলে রাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার। এবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ মা। ভাল হলে কেউ সুনাম করবে না। কিন্তু পান থেকে চুন খসলে রেহাই নেই। যা নয় তাই বলবে লোকে। তুমিও পার পাবে না।

দ্বৈপায়ন হাসল। বলল : তুমি একেবারে ছেলে মানুষ।

যেতে যেতে সত্যবতী হতাশ গলায় বলল, আমি মেয়েমানুষ। আমার তো কখনো কিছু করার থাকে না। শুধু ভাবার থাকে। গরীব ধীবরের মেয়ে। ভাগ্যের জোরে রাজরানী হয়েছি। ভাগ্যই আবার রাজরানী থেকে ভিখারী করেছে। আমার তো তাই দুঃখ থাকারই কথা।

বিজ্ঞের মত হাসল দ্বৈপায়ন। বলল তুমি বড় অবুঝ। সব কথা সব জায়গায় বলতে নেই। কথাশুনে কারো চরিত্রের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না। মুখশ্রী দেখে তেমনি মানুষ চেনা যায় না।

সত্যবতী কথা বলল না। ভরন্ত দুপুরে পায়রার গদগদ স্বরে কী বলে? সত্যবতী প্রশ্ন করল

নিজেকে। নিশ্চয়ই ভাললাগা আর ভালবাসার কথা বলে। দ্বৈপায়ন কথাগুলো এই মুহূর্তে দ্বিগুণ ভাল লাগল। মন আলো করা দ্যুতি ছিল তার। নইলে, এমন আকাশজোড়া বিদ্যুৎ লেখার মত চমকিত হবে কেন তার ভেতরটা? সেই মুহূর্তে দ্বৈপায়নের হাতটা চেপে ধরল।

দ্বৈপায়ন ভিজে চুলগুলো বাতাসে শুকিয়ে নেয়ার জন্য পিঠময় ছড়িয়ে দিয়ে বলল : তোমার মত করে ভাবলে দুনিয়ার সব নিয়ম উল্টে দেয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। রাজনীতিতে ভাবের কথার কোন মূল্য নেই। তবু সেরকম ভাবের হাওয়া তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। এরা কেউ তোমার মিত্র নয়। তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফাঁদ পেতেছে এটা যদি বুঝে না থাক, তাহলে নৃপতি নির্বাচনের ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। হস্তিনাপুরের অনেক শত্রু আছে। তারা চাইছে, হস্তিনাপুর টুকরো টুকরো হয়ে যাক। বিদুরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের উদ্দশ্য সিদ্ধ হলে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বিদুরকে রাজা করলে, গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে। দলিতদের বঞ্চনা যতদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মুখ্য অস্ত্র না হয়ে উঠছে, ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চাইলে তাদেরই ক্ষতি হবে।

বিস্ময়ে ভুরুযুগল কুঞ্চিত হল সত্যবতীর। নীরবে মাথা নাড়ল। দ্বৈপায়নের দিকে প্রশ্ন ভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে বলল : পুত্র, তোমার কথাগুলো এক ফুৎকারে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভিয়ে দিল। এখন কী নিয়ে আমি বাঁচব?

দ্বৈপায়ন গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবেগ ভরে বলল : তুমি কি বিশ্বাস কর তোমাকে নিরাশ করায় কিংবা কোনো এক গভীর সুখ থেকে বঞ্চিত করায় আমার খুব সুখ? মা, তুমি এই অন্তপুরের বাসিন্দা শুধু। এর বাইরে একটা অচেনা পৃথিবী আছে। সেখানে আছে অচেনা মানুষজন। অদ্ভুত স্বার্থের এবং স্বভাবের কিছু লোকজন। তাদের তুমি ভাল করে জান না। মানে, জানার সুযোগ হয়নি তোমার। তুমিও ভাবনি বিদুরের নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পেছনে কত আত্মকলহ লুকনো আছে। ভাবতে পারবে না, রাজপদে তার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কী কুৎসিত লড়াই শুরু হয়ে যাবে। কারণ, উচ্চবর্ণেরা পশ্চাৎপদ দলিতদের নেতৃত্ব এবং আধিপত্যকে মেনে নেবে না। বিদুরকে যারা ভালবাসে তারাও বিদুবের শত্রু হয়ে তার পতন ঘটাতে ব্যস্ত হবে। আসলে তুমি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আছ, তার মূলটা ধার করে নিয়েছ পুরুবংশের উদারনীতিবাদী ঐতিহ্য থেকে। আর যে সমাজ, যে জনগণের মধ্যে বিদুরের অবস্থান, তার প্রতি শাসকগোষ্ঠির কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। রাজনীতিতে তাদের কোন স্থান নেই, জনজীবনেও তারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারেনি। নিজেরাও সংঘবদ্ধ হয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি। অগ্রগণ্য বর্ণের দিক থেকে প্রত্যাঘাত এলে তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। দলিতদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান কোন আর্য নরপতি সহ্য করবে না। দলিতদের অভ্যুত্থানের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে আর্য নরপতিরা চিরতরে কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাই হবে। তুমি কি শুনেছ বিদুরের রাজা হওয়ার পক্ষে কেউ দরবার করেছে তোমার কাছে? বিদুরের রাজা হওয়ার চেয়ে শতগুণ ভাল হবে তাকে এ রাজ্যে মন্ত্রী করে রাখা। গোটা প্রশাসনের রাশ থাকবে তার হাতে। রাজার অধিক ক্ষমতা তার হাতে। তবু সেজন্য কারো কোনো প্রতিবাদ থাকবে না। জটিলতাও বাড়বে না। সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উত্থানের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করার এইরকম ভালো সুযোগ এর আগে আর্যাবর্তের কোন রাজার রাজত্বে আসেনি। আমার মনে হয় এভাবে তোমার আশা পূরণ হবে।

সত্যবতীর হঠাৎ একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল : দলিত মানবকুলকে সভ্য ভদ্র আর্যরা কেউ মানুষ মনে করে না। তাদের কোন অধিকার স্বীকার করে না। অবহেলা, অনাদর, অসম্মান বহন করে জীবনটা কেটে গেল তাদের। উপেক্ষা, বঞ্চনা ভাগ্যের লিখন হয়ে রইল। তাকে আর বদলানো গেল না। অথচ যোগ্যতা দক্ষতা প্রজ্ঞা সবই আছে তাদের। কেবল কালো মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করাই অপরাধ। পুত্র, জন্মের ওপর তো মানুষের হাত নেই।

মা, এসব নিয়ে বিলাপ করে কোন ফল হবে না। কখনও কখনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে কার্য সিদ্ধ হয়। আমার মতে রাজা হওয়ার চেয়ে বিদুবের আমাত্য হওয়াই ভাল। প্রশাসনের মধ্যে থেকে কোনরূপ দায়ভাগী না হয়ে সে তোমার মনস্কামনা পূরণ করবে। তোমার ভাল চাই বলে,

এই পরামর্শ দিলাম। বিদুর রাজা হলে তোমার অধিক খুশি হতাম আমি। কিন্তু পিতা হয়ে তার শত্রুতা করি কী করে? তার চেয়ে সহজ হবে পাণ্ডুকে রাজা করে এই বাড়ির ভিত ভাঙার সংকল্প। তুমি তো চাও দলিতদের বুকের আগুনে গোটা আর্যাবর্ত জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাক। মা, তোমার মত আমার বুকেও অম্বিকা, অম্বালিকার প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা উপেক্ষা এবং অপমানের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের ইন্ধন হোক তাদের উভয়ের পুত্ররা। বিদুর হবে সেই মহাযজ্ঞের ঋত্বিক। সেদিন তুমি হয়তো থাকবে না, কিন্তু ইতিহাস বিদুরকে অমর করে রাখবে। এটাই বোধহয় বিদুরের নিয়তি। মাগো, এ হল জীবনযুদ্ধে জিতবার রণকৌশল। যে কোন জয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রায়াজন তা হল নীতি নির্ধারণ।

সত্যবতী মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। মনের ভেতর নিদারুণ আশাভঙ্গের যন্ত্রণা তাকে অস্থির করল। মনে হল, তার একটা বিরাট হার হয়ে গেছে। আগের মত একবারও মনে হল না, কোনো হারই হার নয়, যতক্ষণ না একজন মানুষ নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে। মনের মাটিতে দাগ কাটলেই হারটা হার নয়, যতক্ষণ না একজন মানুষ নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে। সেরকম একটা হেরে যাওয়ার মনোকষ্টে তার ভেতরটা টনটন করতে লাগল।

অনেক দিক চিন্তা করে পাণ্ডুকে রাজপদে মনোনীত করা হল। রুগ্ন এবং অসুস্থ পাণ্ডুকে রাজকার্যে সর্বব্যাপারে সাহায্য করতে রাজপুরোহিত বিদুরকে মহামন্ত্রী করার প্রস্তাব দিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথমপর্ব বিনা বাধায় সম্পন্ন হল। ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থকেরা কিংবা ভীষ্ম পাণ্ডুর মনোনয়নের বিপক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করল না।

সত্যবতীর পাশেই থমধরা বিষণ্ণতা নিয়ে ভীষ্ম বসেছিল। তার এমন পাথর মূর্তি সত্যবতী আগে দেখেনি। ভীষ্মের দেহে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে। ভীষ্মর নিষ্পন্দ পাথর মূর্তির দিকে তাকিয়ে সত্যবতীর বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। নিজের উদ্বেগকে চাপা দেয়ার জন্য বলল : দেবব্রত, তোমার সম্মতি ছাড়া পাণ্ডুকে তো হস্তিনাপুরের রাজা ঘোষণা করতে পারি না। কিন্তু তুমি এতই মৌন এবং নির্বিকার যে—

কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে সত্যবতী ভীষ্মের দিকে চেয়ে রইল। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে ভীষ্ম থমেথমে গম্ভীর গলায় বলল : এত সুখের কথা। পান্ডুর অভিষেকে আপত্তি করব কেন? সিংহাসন তো আমার নয়। ধৃতরাষ্ট্র এবং পান্ডুর মধ্যে কে রাজা হবে, সে তো তোমাকে স্থির করতে হবে। অন্ধের জীবনের কোনও দাম নেই। অনুকম্পায় তার জীবনটা অভিশপ্ত। নিজের ভাগ্যের কাছে ধৃতরাষ্ট্র আগেই হেরে বসে আছে। সুতরাং অগ্রজের দাবিতে সিংহাসনের দাবিদার হয় কী করে? উচিত-অনুচিতের কথা জিগ্যেস করে আমাকে নিমিত্তের ভাগী করতে চাও কেন?

বিহ্বল হতভম্ব চোখে ভীষ্মের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল সত্যবতী। ভীষ্মের ভিতরে যে বিরাট ওলট পালট ঘটে গেল তা তার ধারণায় ছিল না। ভীষ্মের আকস্মিক ভাবান্তর, শ্লেষাত্মক উক্তির মধ্যে এমন কিছু গোপন একটা ইঙ্গিতময়তা ছিল যা সত্যবতীর ভয়ের উদ্রেক করল। অনেকরকম অমঙ্গল ভাবনাও তার মনে উঁকি দিল। মনে হল, এ পরিবারের বনেদ ভাঙার প্রথম পর্যায়ের কাজটা সুষ্ঠুভাবেই করেছে। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের সম্পর্কটা শত্রুতায় কঠিন হয়ে গেছে। পরিবারের অভ্যন্তরে বিবাদ বিভেদের যে ঝড় সে তুলল, তাকে সামাল দিতে পারবে তো।

নিজের অজান্তে সত্যবতীর অধরে বিমর্ষ হাসি ফুটল। কৌতুকের হাসি। নিজেকে নিয়েই তার কৌতুক। মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে অদৃষ্টের কৌতুক। ভীষ্মর উপর তার যত রাগই থাক, তবু দুঃখ, হয় তার জন্য। তার কথা ভাবলে বুকটা হু-হু করে। পিতার জন্য, পরিবারের জন্য, দেশের জন্য তার বিরাট ত্যাগটা গোঁয়ারতুমিতে অন্যরকম হয়ে গেল। এজন্য নিজেই দায়ী সে। তার মত প্রচণ্ড সফল মানুষও ব্যর্থ হয়ে গেল জীবনে। এই ব্যর্থতা তাকে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা দেয় বলেই বুকের মধ্যে অভিমানের তুফান ওঠে।

সত্যবতীর দুটি চোখ তার চোখের ওপর আটকে রইল। ভীষ্মের মুখ চোখ অপমানের তাপে

তাগ্রাভ হয়েছিল। পুরুষ তীব্রভাবে অপমানিত হলে তাঁর ভেতরটা প্রতিশোধে এমনই উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তখন সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সত্যবতীর দুর্ভাবনা শুধু সেজন্য। প্রতিজ্ঞা শুধু বাইরে করে না, মনে মনেও করে। কথায় কথায় ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করার একটা ঝোঁক আছে ভীষ্মের। তাই বোধহয় শাস্তি পেতে হয় তাকে জীবনের সবক্ষেত্রে। এই চেনা জানা পৃথিবীতে ভীষ্ম একটু ব্যতিক্রম। সকলের থেকে একটু আলাদা। নিজের মত হতে পারার এবং থাকতে পারার জন্য দাম দিতে হয় অনেক।

একটা প্রবল অস্বস্তির মধ্যে অনেক মুহূর্ত কেটে গেল। জবাব দেওয়ার মত কথা খুঁজে পেল না। কি করবে বিচার করতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে থমথমে গলায় তার কানে কানে বলল : পুত্র সবই বিধিলিপি। আমরা শুধু নিমিত্ত। এসব জেনে বুঝেও আমরা রাগ করি। অভিমান করি। পরস্পরকে দোষারোপ করি। তুমি ঠিকই বলেছ, অদৃষ্টের কাছে হেরে গিয়ে ভাবি, একটা বিরাট হার হয়ে গেল নিজের।

ভীষ্মের চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। সত্যবতীর কথায় একটু চমকে উঠেছিল যেন। বলল : মা এসব অপ্রয়োজনীয় কথা শোনাব জন্য রাজসভায় কেউ বসে নেই। এসব ব্যক্তিগত কথার বিন্দুমাত্র দাম নেই। এখানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তবু বুকের দুঃখকে মেলে ধরবে না। তোমার ঘোষণা শোনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

রাজসভা থেকে সত্যবতী ঘরে ফিরল। বুকটা তার কেমন করছিল। বুকের ভেতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল একটা পাষাণভারে।

।। ।।

কয়েক বছরের মধ্যে এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যার উপর সত্যবতীর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাণ্ডুকে রাজা করে হস্তিনাপুরের রাজনীতি থেকে ভীষ্মকে ছেঁটে ফেলে যারা আত্মপ্রসাদ ভোগ করছিল, গান্ধার রাজকুমারী গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ে দিয়ে তাদের সব হিসেব গোলমাল করে দিল। সত্যবতীর সঙ্গে কোনরূপ শলা-পরামর্শ না করেই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের সব ব্যবস্থা একাই করল। ইচ্ছে করেই নিজেকে বিতর্কের মধ্যে টেনে আনল। হস্তিনাপুরের রাজ অন্তঃপুরে এবং রাজনীতিতে নিজেব গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলার জন্য ভীষ্ম যা করল তা গৃহবিবাদের একটা ভূমিকা কেবল। তাই নিজের পছন্দ করা মেয়েকে সুদূর গান্ধার থেকে হস্তিনাপুরে আনিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করল এই রাজ্যের অবাধ কর্তৃত্ব এবং অপ্রতিহত ক্ষমতার চাবিকাঠিটি তার হাতেই আছে। সে এখনও হস্তিনাপুবের মুকুটহীন সম্রাট একথাটা স্পষ্ট করে জানানোর জন্যই কুন্তীভোজ কন্যা পৃথার সঙ্গে পাণ্ডুব যে বিয়েটা দ্বৈপায়নের ইচ্ছেতে চুপিচুপি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর দ্বিতীয়বার বিয়ে দিল। দ্বৈপায়ন যে হস্তিনাপুরের কেউ নয় সেকথাটা তাকে ভালো করে জানান দেবার জন্য বিদুরের বিয়েটা দিয়ে আরো একটা দুঃসাহস দেখাল। হস্তিনাপুরেব দ্বৈপায়নের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে এখন অবাঞ্ছিত। ভীষ্ম তার কার্যকলাপ দিয়ে পদে পদে তাকে বুঝিয়ে দিল।

যতদিন যেতে লাগল সত্যবতীর মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগল। লোকচক্ষুর অগোচরে ভীষ্ম ও তার মধ্যে এক নীরব লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তাদের বিরোধের মধ্যবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বৈপায়ন। ভীষ্মের সঙ্গে তার প্রচ্ছন্ন রেষারেষি ক্রমেই মর্যাদার লড়াই হয়ে উঠেছে। অথচ এমনটা যে কোনদিন হবে বা হতে পারে সত্যবতী স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। ভীষ্ম চিরদিনই বাধ্য ও অনুগত। হঠাৎই আমূল বদলে গেল। পাণ্ডুর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পরে ভীষ্ম ভীষণ পাল্টে গেল। যতদিন সত্যবতীর হয়ে কিংবা নাবালক ভাইদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করছিল, ততদিন সত্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায় সে ছিল অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানী। কিন্তু পাণ্ডু রাজা হওয়ার পরে তার আর বদনামের ভয় রইল না বলেই সে এক অন্য ভীষ্ম হয়ে উঠল। এই ভীষ্মকে সত্যবতী চেনে না। রোজকাব দেখা ভীষ্মেব সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

শান্তনুর মৃত্যুর পরে একজন সম্রাটের মতই স্বাধীনভাবে এবং নিজের মর্জিতে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যশাসন করছিল। হস্তিনাপুরের সর্বেসর্বা ছিল সে। কিন্তু পাণ্ডু রাজা হওয়ার পর ক্ষমতা হারিয়ে মণিহারা ফণীর মত ফুঁসছিল সে। পাছে পরিবারের ওপর কর্তৃত্বটুকুও হারিয়ে বসে সেই ভয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তাই পরিবারের হালকে শক্ত করে ধরল। পরিবারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যত জোরাল হবে ততই রাজনীতির লাগামটা তার মুঠোয় থাকবে। ফসকে যাওয়ার ভয় থাকবে না। পারিবারিক রাজনীতি ও প্রশাসন এবং রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই সত্যটা ভীষ্ম তার কাছে শিখে তাকেই পরাভূত করল তার অস্ত্রে। যে ভীষ্ম সর্বদা নিজে হেরে তাকে জিতিয়ে দিত, সে এখন প্রতিপক্ষ হয়ে তার পরাজয় চাইল। পরাভবের আতঙ্কে এবং একধরনের কষ্টে তার বুকটা টনটন করল। অথচ, একদিন অদৃষ্ট জীবনভোর তাকে জিতিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে তার সব সংঘাত চলেছে মনের অভ্যন্তরে নিজের সঙ্গে। সেখানে একজন মানুষকে কল্পনায় হারিয়ে দেয়ার ভেতরেও একধরনের সুখ আছে। সেই সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করে নিজেকে। সত্যবতীরও সেরকম একটা উপলব্ধি হল।

ভীষ্মের ওপর পুত্রহন্তার প্রতিশোধ নিতে সে দ্বৈপায়নকে ব্যবহার করল। দ্বৈপায়নকে সব ব্যাপারে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ভীষ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলল তাকে। একটা প্রচণ্ড চাপে রাখার জন্যই ভীষ্মও পাল্টে গেল। এমন কি তার সঙ্গে সম্পর্কও আশ্চর্যভাবে বদলে গেল। এই বদলের সব দোষ সত্যবতীর নিজের। বাইরে কাউকে না বললেও একান্তে নিজের মনে তাকে স্বীকার করল। ভীষ্ম রাজ্য-সিংহাসনের ওপর তার সব অধিকারটুকু ত্যাগ করে পরিবারের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজের ইচ্ছেয় নিজের মত করে আজীবন বাঁচতে চেয়েছিল। সে যে এই পরিবারের একজন এবং তার নিজের কিছু অধিকার আছে, পরিবারের ভাল-মন্দের দায়িত্ব আছে সেটুকু নিজের মত ভোগ দখল করতে চাওয়া তার কিছু অন্যায় ছিল না। তবু পুত্র দ্বৈপায়ন তারই প্রশ্রয়ে আগ বাড়িয়ে ভীষ্মের সেই অধিকারের পৃথিবীটাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যে অন্যায় করেছিল তার দাম মা হয়ে তাকেই দিতে হবে ভীষ্মের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কও চিড় ধরেছিল। তাদের মধ্যে এমনই একটা ব্যবধান তৈরি হল যে কারো ডাক কারো কাছে পৌঁছল না।

উপলব্ধিটা সত্যবতীর বড় দেরী করে হল। সময়ের মধ্যে ভুল শোধারানো না হলে, সংশোধনের কোন সুযোগই থাকে না। পরে সতর্ক হওয়া কিংবা উপলব্ধি করার কোন মানে হয় না। ভীষ্মের অভিমানটা যে ঠিক কোথায় সেটা না বুঝে বোকার মত বাহাদুরী নেবার জন্য দ্বৈপায়নকে এই পরিবারের সর্বেসর্বা করে যে অনর্থ বাঁধাল তার জন্য সত্যবতীর ভীষণ অনুশোচনা হয়। কিন্তু সত্যিই কী বাহাদুরি দেখানোর জন্যই দ্বৈপায়নকে আহ্বান করেছিল? প্রশ্নটা নিজেকেই করল সত্যবতী। আসলে অবচেতন মনে সে একটা নিরাপদ আশ্রয়, অবলম্বন এবং সহায় খুঁজছিল। যে সহায়কে তার নিজের বলে, দাবি করতে পাবে, যার কর্তব্যের মধ্যে আছে নিবিড় এবং ভালবাসার টান। গর্ভজ পুত্রের মধ্যে তার একটা আলাদা দ্যুতি আছে বলেই একান্ত করে কাছে পাওয়ার লোভটুক সংবরণ করতে পারেনি। কিন্তু সেই সুখটুকু পাণ্ডু রাজা হওয়ার পর বিষিয়ে গেল। শান্তিও বোধহয় চলে গেল লাগামের বাইরে।

সময় বয়ে যায়। কত ঘটনাই ঘটে গেল সত্যবতীর চোখের ওপর। সেই সব ঘটনার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তার ইচ্ছেতেও কিছু হচ্ছে না। সে শুধু দর্শক। দর্শকের শুধু দেখার থাকে। করার থাকে না কিছু। সত্যবতীও কিছু করার ছিল না। ভাববার ছিল। বাকী জীবনটা দর্শকের আসনে বসেই ভেবে ভেবে কাটিয়ে দিতে হবে তাকে।

সময় সব কিছুকে বদলে দেয়। এই বদলের ওপর কারো কোনো হাত নেই। এখানে সব কিছু হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যায়। কখন, কী হবে এবং কোনদিক থেকে পরিবর্তনের ঝড় এসে ওলট পালট করে দেবে কেউ জানে না। রাজা হরিশচন্দ্র কি জানতেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে তাঁকে? মহারাজ বলিও কী জানতেন বামুনের ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা পূরণের জন্য পাতালবন্দী হয়ে জীবন কাটাতে হবে। আসলে

প্রত্যেক মানুষের এক সত্তার সঙ্গে আর এক সত্তার এক ধররেনর অদৃশ্য প্রতিযোগিতা থাকে। সে কথা বোঝার ক্ষমতা হয়ত সকলের থাকে না, থাকলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। প্রতিক্ষণ এই নীরব অদৃশ্য লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে বলে প্রতিমুহূর্ত হারজিৎ হয় তার জীবনে। তাই যার যখন সুযোগ আসে, সে তখন অন্যকে নীরবে হারিয়ে দিয়ে জয়ী হতে চায়। এ পৃথিবীতে হারতে কেউ চায় না। হারাটা বড় যন্ত্রণার, বড় কষ্টের আর অপমানের।

তাই বোধহয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক চিত্রটা বদলে গেল। রাজা হওয়ার পরে পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের ওপর রাজকার্যের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করে কিছুদিনের জন্য পত্নীদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরোল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে শুনল সে আর হস্তিনাপুরের রাজা নয়। ধৃতরাষ্ট্রই এখন হস্তিনাপুরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অথচ এই ক্ষমতা হাতবদলের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে হানাহানি, রক্তপাত কিছুই করতে হল না। পাণ্ডু ফিরলে খুব শান্তভাবেই বলল : পাণ্ডু তোমার অনুপস্থিতির দিনগুলো আমার জীবনে এক অদ্ভুত উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। এ অনুভূতি কাউকে বলে বোঝানোর নয় ভাই। এখন কেবলই মনে হয়, বিধাতা চোখ ছাড়া আমাকে সব দিয়েছেন। অন্ধত্ব আমার জীবনে অভিশাপ একথাটা আর বিশ্বাস করি না। রাজকার্যও ভালভাবে করতে পারি। তবু একদল স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ, যারা রাজকার্য দেখাশোনার কাজে নিরন্তর সাহায্য করে থাকে তাদের চক্রান্তে আমি সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু সারাজীবন বঞ্চিত থাকব কেন? এ আমার সিংহাসন। এর ওপর তোমার কোনো দাবি নেই। ভাগ্যই নিজের জায়গায় এনে বসিয়ে দিল আমাকে। এতো তোমায় আব ফিরিয়ে দিতে পারিনা। অধিকাব কেউ কাউকে দেয় না ভাই। অধিকারকে রক্ষা করতে হয়, কেউ কেড়ে নিলে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়। তাই বলছিলাম, তুমি আমি একত্রে হস্তিনাপুরে থাকতে পারি না। তোমাকেই দুর্গম পর্বতাঞ্চলে পত্নীদের সঙ্গে নির্বাসনে যেতে হবে। সে ব্যবস্থা আমি করেও ফেলেছি।

বিদুরের মুখে এসব কথা শোনার পর সত্যবতীর মনে হয়েছিল, ভাগ্যই মানুষকে রাজা এবং ভিখারী করে। তবু মানুষ নিজের পুরুষকার বলে ভাগ্যনির্মাণ করে। ধৃতরাষ্ট্রও অদৃষ্টের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে যে নতুন সৌভাগ্যের অধিকারী হল তা বিধাতার অনুগ্রহ নয়, কূটকৌশলে সে তা অর্জন করেছে। রাজধর্মে জয়ই সব শেষ কথা। রাজার কাছে ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, পিতা মাতা বলে কিছু নেই। রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ থাকতে নেই। শত্রুকে নির্মূল করাই রাজধর্ম। পাণ্ডু এখন আর ভাই নয়, তার প্রধান শত্রু। ধৃতরাষ্ট্রের কাজের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু চক্ষুহীন ধৃতরাষ্ট্রকে শক্তি যোগাল কে?

সারা রাত ধরে বিছানায় শুয়ে সত্যবতী সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। প্রথম মনে হল, শকুনিই চক্রান্তের নায়ক। বঞ্চিত ও সৌভাগ্যবানের সংঘর্ষের মধ্যে শকুনি ছাড়াও আর একজনের মুখ মনে পড়ল, সে হল ভীষ্ম। সে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠল বুকে। সে একজন মহিলা, তার বিমাতা। ভীষ্মের মত ব্যক্তির শোভা পায় না তার সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া। তবু ভীষ্ম সেই কাজটাই করল। এক গভীর বেদনায় সত্যবতীর বুকটা তোলপাড় করে ওঠল। নিজের ভেতরেই তার শুরু হল এক গভীর বিশ্লেষণ।

ভীষ্ম জীবনে কখনো হারেনি নিজের কাছে কিংবা অন্যের কাছে। জেতাতেই সে অভ্যস্ত। জিততেই তার ভাল লাগে। এই জেতার জন্য হারাতে হয়েছে অনেক। তবু জেদের সঙ্গে ভুলের সঙ্গে আপস করে শুধরে নেয়নি নিজেকে। এটাই সত্যবতীর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে। ভীষ্ম মানুষটা যেন কেমন!

তার মত স্পষ্টবাদী মানুষও পাণ্ডুকে রাজপদে মনোনীত করার সময় আশ্চর্যরকমভাবে নীরব ছিল! তার আশঙ্কা কয়েক বছরের মধ্যে সত্য হল। ভীষ্মের মনের মধ্যে লুকনো ঝড় পাণ্ডুকে হস্তিনাপুর থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল শতশৃঙ্গ পর্বতের অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। ভীষ্ম হস্তিনাপুরের সিংহাসনের অধিকার থেকে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেনি ঠিক, কিন্তু সে একটু মনেপ্রাণে চাইলে পাণ্ডুকে হস্তিনাপুর ছাড়তে হত না। পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হোক এটা ভীষ্ম কোনদিন চায়নি বলেই তার প্রস্থানে বাধা দেয়নি। কিংবা নির্বাসন থেকে তাকে ফিরিয়ে আনেনি।

সব বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যবতীর মনে হল ভীষ্মের সঙ্গে তার আসল বিরোধ। দ্বৈপায়ন বা পাণ্ডু কেউ নয়। পরোক্ষভাবে, তাদের লাঞ্ছিত করে তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে সে। কথাগুলো

মনে হতে তার ভেতর এক নতুন প্রতিক্রিয়া শুরু হল। শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মত কি যেন পাকাতে লাগল। সেটা রাগের নয়, দুঃখের এবং অপমানের।

সত্যবতী শান্তভাবে কিছু ভাবতে পারছিল না। মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা নিয়ে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বলল : বয়স হয়েছে। মনের জোরও ফুরিয়ে গেছে। তাই, একটুতেই অভিমান হয়। অভিমান হলে এক দুঃসহ আত্মনিগ্রহে ছিন্ন ভিন্ন হয় তার ভেতরটা। মনে হয়, চারদিক থেকে একটা উন্মাদ ঝড় ছুটে আসছে তার দিকে। ঐ ঝড় সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবে। এমন কি তার অহংকেও গুঁড়িয়ে দেবে। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সত্যবতীর সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। অস্তিত্বের শিকড় ধরে কিছুক্ষণ টানা-হ্যাচড়া করে দ্বিতীয় জন্মের সূচনা করে থেমে গেল। কেমন হবে এই দ্বিতীয়খণ্ডের জীবন যাপন কে জানে?

আঠারো বছর পরে পৃথা শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে স্বামীর মরদেহ নিয়ে পুত্রদের সঙ্গে করে হস্তিনাপুরে ফিরল। পাণ্ডুর হৃতরাজ্য ও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের দাবিদার হয়ে এল। পাণ্ডুর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে এসে দ্বৈপায়ন বুঝতে পারল অল্পকাল মধ্যে হস্তিনাপুরের রাজ্য ও রাজনীতিতে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে শীঘ্রই নতুন ধরনের এক বিবাদ শুরু হবে। তার ভয়াবহতা স্মরণ করে বৃদ্ধা জননীর জন্য উদ্বিগ্ন হল সে। এই পর্বে জীবনযাপন যে তার শান্তিপূর্ণ হবে না এটা অনুধাবন করেই দ্বৈপায়ন মাকে প্রাসাদের বাইরে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যবতীর ঘরে ঢুকল।

তখন সন্ধ্যা নামছিল ধীরে। কুয়াশার মত আবছা অন্ধকার ধীরে ধীরে গড়িয়ে এল চারদিক থেকে। পাখীরা কুলায় ফিরছে। তাদের ডানায় পড়ন্ত সূর্যের কমলারঙের আলো। জলস্থল অন্তরীক্ষের সব ব্যস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় আঁধারে। কাছের কোনো গাছের ডালে শিরা ফুলিয়ে একটা পাখী সমানে ডাকছে। তার এই একা কান্নার কোনো সঙ্গী নেই।

মা, মাগো—পিছন থেকে ডাকল দ্বৈপায়ন। ষোলো বছর পর তার গলায় আচমকা মা ডাক শুনে সত্যবতী চমকে তাকাল। মৃদু কাঁপুনি টের পেল বুকের ভেতর। দুরন্ত আনন্দে সহসা দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ব্যাকুলগলায় বলল : পুত্র! এসেছ। কতকাল পরে এলে। ব্যাকুল হয়ে তোমার অপেক্ষা করছি আমি।

মা, এখানে তুমি ভাল নেই!

আমার জন্য তোমার খুব চিন্তা হয়, তাই না।

একটা দুঃসময়ের মধ্যে আছ তুমি। এখানে তোমার নিজের মত থাকার দিন ফুরিয়েছে। এই পুরী থেকে তাই তোমাকে নিতে এসেছি। এখানে আর একমুহূর্ত থাকা চলবে না। পদে পদে অপমানিত হবে।

পুত্র! এখানে কতকালের কত স্মৃতি আমার। এসব ফেলে কোথায় যাব?

অবুঝ হয়ো না। এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে মা। শিগগিরি বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে এ পরিবারের বনেদ ভেঙে চুরচুর হবে। খান খান হয়ে যাওয়ার সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি তোমাকে শুধু বিদ্ধ করবে। অপমানিত হবে।

সত্যবতী অসহায়ের মত বড় বড় চোখে চেয়ে রইল। আধ অন্ধকারের মধ্যে তার ব্যথাতুর বিমর্ষ চোখের চাহনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল দ্বৈপায়ন। খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে শীতল হাওয়া আসছিল। সত্যবতীর শরীরের ভেতর কাঁপুনি দিচ্ছিল। ভয়ঙ্কর সব চিন্তা তার চারপাশে জড় হলো। কাঁটা ফোটার মত একটা নাম না জানা আত্মগ্লানিতে বুকটা টনটন করতে লাগল। সম্মোহিতের মতো পুত্রের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। স্তিমিত কণ্ঠে বলল : আমায় কি করতে হবে পুত্র!

দ্বৈপায়ন বলল : মা পাণ্ডব এবং কৌরবদের বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে হস্তিনাপুরের বাতাস তপ্ত হয়ে ওঠার আগেই এ গৃহ ছেড়ে পালাও। জীবনের বাকি কটা দিন তুমি আমার কাছে থাক।

পুত্র! সত্যবতীর মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। উদগত নিঃশ্বাস সহসা যেন বুকের খাঁচায় আটকে রইল। ব্যথায় টাটিয়ে ওঠল। কান্না পেল। কান্না গিলে গিলে বহু কষ্টে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : পুত্র, মায়া মোহ সংসারী মানুষের জন্মগত অভিশাপ। এসবের মধ্যে বাস করারও একটা

আলাদা সুখ আছে। এর রহস্যময় আকর্ষণ ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায় না। একদিন বলেছিলাম, এ গৃহের বনেদ ভেঙে ফেল, মুখোশ খুলে দাও। মহাকাল আজ তার পরোয়ানা নিয়ে আমার সম্মুখে হাজির হয়েছে। দু'চোখ খুলে তাকে দেখব পুত্র। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ, যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এসব আমার কর্মফল।

দ্বৈপায়ন অন্তহীন বিস্ময় নিয়ে জননীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল : মা, আমি কি তোমার কেউ নই? আমারও তো ইচ্ছে করে বৃদ্ধবয়সে আমার দুঃখিনী মাকে একটু শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করি।

অমন করে বললে আমার সব বাঁধ ভেঙে যাবে।

মায়ামোহ মানুষের জন্মগত। অথচ আমার প্রতি তোমার কোনো মায়ামোহ জন্মায়নি। আমি তোমার কেউ নই।

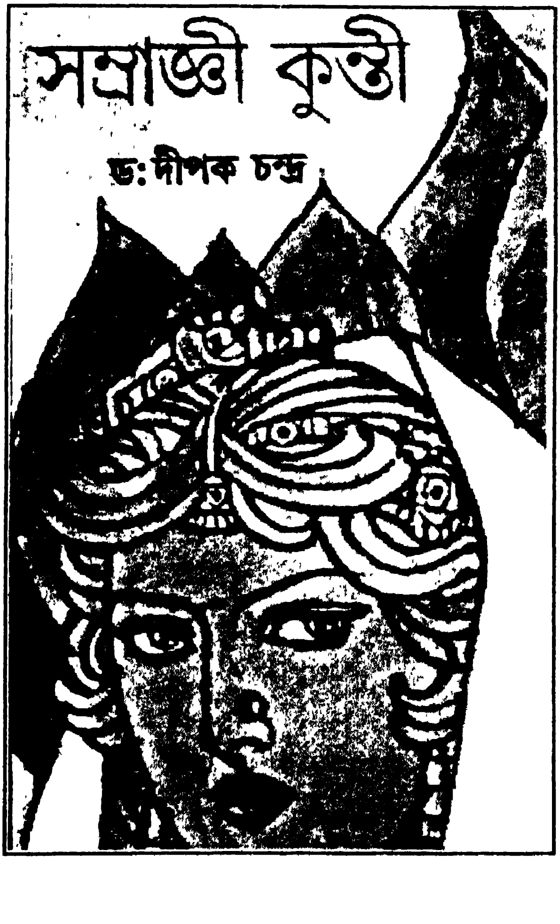
তুই আমার সব বাবা।

কপট রাগ-অভিমান করে দ্বৈপায়ন বলল : মিছে কথা। আমার প্রতি তোমার একটু ভালবাসা মমতা থাকলে তুমি 'না' বলে আমায় ফেরাতে পারতে না।

সত্যবতী কথা খুঁজে পেল না। তার কথাগুলো বুকের ভেতব ঝংকারে বেজে গেল। আশ্চর্য এক অনুভূতিতে তার ভেতরটা টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। দুই চোখে কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাব নিয়ে দ্বৈপায়নের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দ্বৈপায়নও তার মুগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখল সত্যবতীর চোখের ওপর। তার দৃষ্টির রূপ বদলাল। জননীর মন মেপে দ্বৈপায়ন তার ভাবের ওপর আস্তে আস্তে কথা বসাল। বলল; মা, নারীজাতির মায়ামোহ কিছুতে কাটতে চায় না। তাই বোধহয় দৈব নিত্যপূজা, ব্রত উপবাসের মধ্যে দিয়ে তার বিষয়মুখী মনটাকে ঈশ্বরমুখী করে তোলে। ঈশ্বর প্রেমই মানুষকে সুন্দর করে, তাকে নির্দ্বন্দ্ব ও মহিমময় করে। প্রাসাদে থেকে তুমি তাঁর মহিমা, করুণা কিছুই অনুভব করতে পারবে না। অরণ্যঘেরা মুক্ত প্রকৃতির শান্ত, স্তব্ধতায় এবং নির্জনতাতে তাঁর বিরাট ত্বকে অনুভব করা যায়। একবার ঘর ছেড়ে বেরোলেই জীবনের একটা আলাদা মানে খুঁজে পাবে। ঈশ্বরকে পাবে সমস্ত প্রকৃতিতে ও প্রাণীতে যিনি ওতপ্রোত। তিনিই তোমার অভিপ্রেত। মা, এই সংসাবে থাকলে তুমি পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করবে, বিপদমুক্তি চাইবে, মঙ্গল চাইবে— ঈশ্বরকে চাইবে না। সংসারবদ্ধ জীব তাঁকে ছাড়া আর সব কিছু চায় কাঙালের মত, কিন্তু তাঁকে চায় না একবারও। অথচ এই ঈশ্বর তার মধ্যেই আছে। সমস্তরকম বদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়ে শুধু নিজের মনের ভেতর তাঁকে এক মনে ধ্যান কর। তাহলে দেখবে ছাড়া আর কেউ নেই তোমার চারপাশে। তুমি তেমার একমাত্র অস্তিত্ব এবং একমাত্র চেতনা। তোমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম হয়। এই অনুভূতির নাম দিব্যোন্মাদ। মুক্তি তাই ঘরে নয় বাইরে--প্রকৃতিলোকে। যিনি অনন্ত প্রকৃতির অধিপতি, প্রকৃতিও তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। বদরিকাশ্রমের পাহাড় ঘেরা অরণ্য পরিবৃত মুক্ত প্রকৃতিলোকে তোমায় নিয়ে যাব। শুধুই ধ্যানমৌন তুষার শুভ্র পর্বতমালা। কোথাও একটি বৃক্ষও নেই নগ্ন কঠিন শিলাময় পাহাড়। এই শূন্যতা কিন্তু যন্ত্রণায় নয়। বরং তার ভেতর এত অফুরন্ত মুক্তির হাতছানি যে কোন অভাবই বোধহয় না। সেখানে অন্য এক সুখ ও শান্তিতে তুমি ভরপুর হয়ে থাকবে।

শুনতে শুনতে সত্যবতী কেমন তন্ময় গেল। ভেতরটা তার এক অনির্বচনীয় সুখে আনন্দে ভরন্ত কলসের মত ভরে যেতে লাগল। সমস্ত শরীরটাই হিমবাহের মত গলে গিয়ে নিঃশব্দে ভক্তির সমুদ্র হয়ে দেবলোকের দিকে যেন চলল। তার মনে হচ্ছিল, অনন্তবিসারী নীল আকাশ, দিগন্তে নীলাভ ছায়ায় ঢাকা পাহাড়, সূর্যালোকিত সবুজ বনানী সব যেন কেমন সুদূর আর অপার্থিব হয়ে ওঠেছে। মুহূর্তে একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা, আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। হঠাৎই কান্নার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠল তার বুকের অভ্যন্তরে। অভিভূত গলায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল : পুত্র, ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে তুমি নিয়ে চল। আমাকে নতুন প্রাণ দাও। এই মিথ্যে জীবনের অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে হাত ধরে নিয়ে চল।

সম্রাজ্ঞী কুন্তী



শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সুব্রত সেনগুপ্ত
বন্ধুবরেষু—

দৃষ্টিকোণ

কথায় বলে যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভারতে। এর চেয়ে সত্য কথা বোধ হয় কিছু হয় না। মহাভারত হলো ভারতের জীবনবেদ। বহু বিচিত্র মানব জীবনের এক বিশাল দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে যে কোন দেশের যে কোন মানুষ তার আত্মাকে নিরাবরণ করে দেখতে পারে। সাজ-পোশাকের আড়ালে নিজের নগ্নরূপকে দেখে সেও লজ্জা পাবে। কত লোভ, লালসা, পাপ, কত রকমের হীন ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা, ঘৃণা বিদ্বেষে মনটা আবিল হয়ে আছে। সততা ও বিশ্বাসভঙ্গের বিনীত মুখোস, শঠতা, কপটতা, হীনমন্যতার লজ্জায় তার চরিত্র কত নোংরা হয়ে গেছে; তাকে দেখার এমন বিশ্বস্ত দর্পণ বিশ্ব সাহিত্যে নেই। তাই মহাভারত অনাদি কাল ধরে আদৃত হয়ে আসছে। পাঁচ হাজার বছর পরেও তার সমাদর একটুও কমেনি, বরং তার জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জানা ঘটনা অজানা রহস্য নিয়ে বারংবার হাজির হয় বলেই মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কোনকালে পুরোনো হয় না। চিরনবীন। এই নবীনতা এবং সজীবতাকে আমার উপন্যাসের মধ্যে ভীষণভাবে আনতে চাই বলে, পাঠক পাঠিকাদের বিপুল প্রশয়ে একের পর এক আখ্যান লিখছি।

সম্রাজ্ঞী কুন্তী তাঁদের অনুপ্রেরণার ফসল। কালকূটএর জনপ্রিয় গ্রন্থ 'পৃথা' আমার পড়া হয়নি। তাহলেও পৃথাকে নিয়ে উপন্যাস করার সাহস হয়নি। জনান্তিকে বলে রাখি, লেখার হাতে খড়ির যুগে কুন্তীকে নিয়ে কিছু লেখার কথা বারংবার মনে হতো। সে লেখা এতকাল পরে সম্পন্ন হলো। সাম্রাজ্ঞী কুন্তী লিখে তাই একটা তৃপ্তি পেয়েছি।

কুন্তীকে ভালো লাগার কারণ, তার মতো সংগ্রামী নারী চরিত্র মহাভারতে আর একটিও নেই। বালিকা বয়স থেকে যে জীবন সংগ্রামের সূচনা, মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। এই মহিলা সুখের মুখ দেখেনি। অদৃষ্ট বারংবার বাজ পাখির মতো তার সুখকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। কুন্তী মহাভারতের সাফ্যারিং ক্যারিকট্যার।

শূরসেনের পৃথা যখন কুন্তী ভোজের কুন্তী হলো তখন থেকেই শুরু হলো তার সংঘর্ষ। নিজের সঙ্গে নিজের সংঘর্ষ নিজের সঙ্গে অন্যের। হস্তিনাপুরের মহিষী হয়ে এলে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ বেঁধে গেল। পৃথার পারিপার্শ্বিক যখন নিঃশব্দে তার উপর প্রতিশোধ নিতে এল তখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কুরুক্ষেত্রের মতো এক মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে তুলল। মহাভারত যুদ্ধের ভূমিকায় কুন্তীর স্থান ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। সেই দাগটি থেকে যে রক্তক্ষরণ হয় বুকের গভীরে তা কুন্তীকে নতুন করে চিনতে সাহায্য করে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের মধ্যে বসে কুন্তী নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখে। এই আত্মানুসন্ধানের সূত্রে আবর্তিত হয়েছে গোটা আখ্যানভাগ।

কুন্তী নিজের মুখে তার কথা শোনাচ্ছে। আগামী প্রজন্মের কাছে সে তার কার্যের জবাবদিহি করছে।

যে মানুষকে ইতিহাসের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কখনও বা মধুর, কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়। মহাকালের মতোই সে নিষ্ঠুর নিরাসক্ত, নির্বিকার। অন্তত কুন্তীর সেই কথাই মনে হয়েছিল। অকপটে সেই সত্যের স্বীকারোক্তি করতে তার কুণ্ঠা নেই। নিজের পাপ গোপনের প্রয়াস নেই। বরং অকপটে বলতে পেরে তার ভেতরটা শুচি হয়ে উঠেছে।

সোজা পথে কুন্তীর যাত্রা শুরু হয়নি। অনেক বাধা এসেছে তার জীবনে। এই বাধা উত্তরণ করতে, অধিকার সুরক্ষিত করতে নিজেই একটি নতুন বংশ প্রতিষ্ঠা করেছে। জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ নিয়েছে ঃ নিজের জোরে যে বাঁচতে শেখেনি, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। এই জ্ঞান থেকে যেমন সুবিধে হয়েছে নানাদিক থেকে তেমনি শত্রুতা এসেছে। শুধু মানুষের শত্রুতা নয়, বিধাতার শত্রুতাও কম ছিল না তার জীবনে। এ সব নিয়ে কুন্তীর ভাবনার কোন দায় নেই। অথচ তাকে জড়িয়েই কিছু লোকের যত স্বপ্ন, যত সাধ যত সাধনা এবং ষড়যন্ত্র। কেন? তার সূত্রেই কুন্তীর আত্মকথন এগিয়েছে। কুন্তীর একপিঠে পৃথা, আর এক পিঠে কুন্তী—দুয়ে মিলে পূর্ণ হয়েছে জীবনবৃত্ত। কুন্তী যখন পৃথার কথা বলে তখন এক ভিন্ন আঙ্গিক ও শিল্পরীতি অনুসরণ করেছি। কুন্তীর আগের জীবন এবং পরের জীবনের পার্থক্য বোঝাতেই এই মিশ্র শিল্প রীতির সাহায্যে দুই জীবনের ঘটনাকে আলাদা করা হয়েছে। পাঠকের বিভ্রান্তি এড়াতেই এটুকু বলা উচিত মনে হয়েছে। একটা কথা বলার প্রয়োজন। মহর্ষি ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে বাসুদেবের বুকে পদাঘাত করেছিলেন। এখানে দুর্বাসার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধের প্রকাশ দেখাতে বাসুদেবের বদলে বৃষ্ণিবংশের রাজা নারায়ণের বুকে দুর্বাসা পদাঘাত করে এক নতুন মিথ সৃষ্টি করেছি। দুটো নামকে এক করে দেখার বিভ্রান্তি থেকে পড়ুয়াদের মুক্ত রাখতে এই কৈফিয়ৎটুকু যথেষ্ট।

বিদুর এবং ভীষ্ম সম্পর্কে কুন্তীর স্বীকারোক্তিতে যে যুক্তি ও তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তা বহু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে। এ নিয়ে মহাভারতের বিশিষ্ট সমালোচক ও গবেষক মাননীয় প্রদীপ ভট্টাচার্য, আই, এ, এস এর সঙ্গে বেশ কিছু আলোচনা হয়, তিনি আমার যুক্তি ও বিশ্লেষণকে সমর্থন করেছেন। সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দোপাধ্যায় আমার বিশ্লেষণকে নস্যাৎ না করে স্বাগত জানিয়েছেন। এই দুই চরিত্র সম্পর্কে দুঃসাহসী হওয়ার সাহস এঁদের কাছে পেয়েছি। এঁদের দুজনকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অরণ্যে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে অরণ্য। গোটা আকাশ রাঙা হয়ে গেছে। লেলিহান শিখা লকলকে জিভ মেলে আকাশটাকে গিলতে চাইছে যেন। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আগুন যেন জঙ্গলের পশুদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য অরণ্যের। ছোট বড় বন্যপ্রাণীরা পরিত্রাহি চিৎকার করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, যে যেদিকে পারছে। মুখ দিয়ে তাদের ফেনা বেরোচ্ছে। কষ্টে হাঁফাচ্ছে। তবু শ্বাস নেওয়ার জন্য একটু থমকে দাঁড়াচ্ছে না, পাছে আগুন দৈত্য ধরে তাদের। দেহ পিঞ্জরে লুকোনো প্রাণের প্রতি কি মমতা প্রাণীকুলের।

শুকনো পাতার উপর দিয়ে আগুন লাভা স্রোতের মতো গড়িয়ে আসছে। কুটীরের দাওয়ায় বসে দাবানলের দিকে অপলক চেয়ে আছি। আগুনের কী ভয়ঙ্কর রূপ। কী নিষ্ঠুর লীলা তার। বুকে প্রেম নেই, করুণা নেই, মমতা নেই, শুধু আছে ক্ষমাহীন জিঘাংসা! ধ্বংসে তার উল্লাস। তার প্রলয় শিখায় নটরাজ নাচছেন যেন। নির্দয়ভাবে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করার আনন্দে মাতোয়ারা। পরিণামের কথা ভাবার সময় যদি থাকত এমন করে জ্বলে উঠত না আগুন।

দাবানলের বুক থেকে তাপ বয়ে নিয়ে হু হু করে ছুটে এল এক ঝলক গরম হাওয়া। ত্বকে ত্বকে জ্বালা ধরিয়ে দিল। আমার চেতনার ভেতরে, সমস্ত সত্তার ভেতর ঐ জ্বালা কথা কয়ে উঠল যেন। বলল, তোমার বুকের আগুনের চেয়ে দাবানলের তাপ খুব বেশি কি? —আচমকা প্রশ্নে আমি একটু বিব্রত বোধ করি। গরম বাতাস একান্তে ফিসফিস করে বলল : পৃথা এরকম এক দাবানল তো তোমার বুকে অনেককাল ধরে জ্বলছে। খোলা চোখে তার লেলিহান শিখা কেউ দেখেনি। মানে, দেখতে পায়নি। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আগুন জ্বেলেছ তুমি। তোমার বুকের আগুনে গোটা ভারতভূমি পুড়ে ছারখার হয়েছে। ক্ষত্রিয় নারীর গর্ব ছিল তোমার। প্রিয় গর্ব পূরণ করতে তুমি করনি এমন কাজ নেই। নিজের অহঙ্কারের মধ্যে তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে। ঐ অহঙ্কার ছাড়া এই বিশ্বে তোমার সুখের ভাগীদার কে আছে? পৃথা তুমি বড় অভাগা। বড় একা পৃথিবীতে। কিন্তু তোমার মতো দুঃখীকে দেখে করুণা হয় না।

পাখীর গগন বিদারী আর্তনাদ সহসা অন্যমনস্কতার জগৎ থেকে আমাকে বাস্তবে নিয়ে এল। বুকের মধ্যে কষ্টের একটা খামচা খামচি শুরু হলো। দাবানলের কথা তো এ নয়। এ তো আমার মনের অভ্যন্তরের কথা। বিবেকের আত্ম-অনুশোচনা।

বাণপ্রস্থে আমার মনটা ভালো যাচ্ছিল না। জীবনভর যা করেছি নিজের জন্য, স্বামীর জন্য, পুত্রদের জন্য; তার ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত নিয়ে ইদানীং অনেক কথাই মনে হয়। নিজের অজান্তেই আমার সব কাজের একজন নিষ্ঠুর সমালোচক এবং কঠিন বিচারক হয়ে উঠি। দুর্বলতার প্রশ্রয় দেই না। অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করার জন্য মনকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত রাখি। তবু সত্য চিরদিন অপ্রিয়। মনের মন যখন বিচার বুদ্ধির উপর দখল নেয়, আসামীর কাঠগড়ায় সওয়াল করে তখন নিজেকে বড় দীন, অসহায় এবং বিপন্ন মনে হয়। কৈফিয়ৎ দেবার কিছু থাকে না।

অজান্তে চোখের পাতা ভিজে গেল। এ কোন অনুভূতিতে ভেতরটা আমার পাগল পাগল লাগছে? দাবানলের তপ্ত হাওয়ার স্পর্শে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। মনের কখন কি হয়ে যায় মনও জানে না। কেন জানে না—কে জানে? কতকাল হয়ে গেল একবারও নিজেকে কোন কাজের জন্যে দোষী মনে হয়নি। তা-হলে বুকে এ কোন অনুশোচনার কষ্ট? এর উৎসই বা কোথায়?

কিছুক্ষণ চোখ বুজে সব স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে কে যেন বলল : পিতা শূরসেন তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। দুর্বাসা তোমার জীবনে রাহু। কর্ণ অভিশাপ। পাণ্ডু অনন্ত দুঃখের কারণ। আর তোমার ব্যক্তিত্ব, তেজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, রাজমাতা

হওয়ার দুর্বার বাসনা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার এক আগুন জ্বালল। সেই আগুনে মাদ্রী পুড়েছে, খাণ্ডবপ্রস্থ জ্বলেছে, বারণাবতে জতুগৃহে নিরীহ ছ'টি প্রাণ দগ্ধ হয়েছে; দ্রৌপদী প্রেমের আত্মাহুতি দিয়েছে, কুরুক্ষেত্র গোটা ভারতবর্ষকে শ্মশান করেছে। তবু বুকের আগুন তোমার নেভেনি। তোমার বুকে এত তাপ জমে আছে যে অরণ্য দাউদাউ করে জ্বলছে। অকস্মাৎ চমকে তাকালাম।

গলিত লাভা স্রোতের মতো আগুন ধেয়ে আসছে।

কুটীরের অদূরে অপ্রশস্ত নদী বয়ে গেছে। ওপাড়ের আগুন যে কোন সময় এপাড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবু কী আশ্চর্য! আমার বুকে একটুও ভয় নেই, দুর্ভাবনা নেই।

সমস্ত অনুভূতির ভেতর মহাকালের পদধ্বনি শুনছি। নুপূর পায়ে নাচছেন নটরাজ দাবানলের রূপ ধরে তা তা থৈ থৈ করে। তাঁর এক পা বর্তমানে, আর এক পা অতীতে। আকাশজোড়া উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের জ্যোতি বিকীর্ণ মহোৎসবের মধ্যে নটরাজ নয়, আমার অতীতকে দেখছি।

ত্রয়োদশী পৃথা সদ্যোস্তিন্ন যৌবন নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। তাকে তো আমি চিনতেই পারি না। চিনব কোথা থেকে? পৃথা তো অনেককাল আগে মরে গেছে। কিন্তু তার নামের শিকড়টা আমার মধ্যে রয়ে গেছে। তাই বোধ হয়, পৃথাকে বাদ দিয়ে কুন্তীকে ভাবা যায় না। কুন্তীর মধ্যে পৃথার মৃত্যু হয়েছে ঐ তেরো বছর বয়সে। পৃথার নবজন্ম হলো কুন্তীর মধ্যে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পৃথা হাসছে। একটু হাসলে ওর দু'গালে টোল পড়ে। তখন দারুণ সুন্দর দেখায়। পৃথার গালে টোল দেখার জন্যে পিতা শূরসেনের এক ধরনের আকুলতা ছিল। তাঁর সে মুখ স্মৃতিসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। আজও চোখ বুজলে দেখতে পাই।

দিনান্তে শূরসেন পৃথার কাছে একবারটি আসবেই। পৃথাকে দেখতে নয়, তার ক্ষুধা ঝরানো মোহন হাসির টানে রোজ আসে। অবশেষে, এমন হলো শূরসেনকে দেখলেই তার হাসি পেত। কাঙাল চোখে শূরসেন তার টোল খাওয়া মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকত। কি দেখত— কে জানে?

পৃথা লজ্জা পেত। বাবার বাড়াবাড়ি একদম ভালো লাগত না। ভেতরে ভেতরে এক অস্বস্তিকর সংকোচ ছটফট করত। পাছে কষ্ট পায় বাবা, তাই সাবধানে হেসে হেসে বলতো : তুমি যেন কি? আমি আর ছোট নেই, বড় হয়েছি। এটা বোঝ না কেন? আমার বুঝি লজ্জা করে না? ছেলেমানুষীর একটা বয়স থাকে, তোমাকে এ বয়সে আর মানায় না। কথাগুলো বলত আর হাসতো।

শূরসেনের সংশোধনের চেষ্টা ছিল না। তৃষ্ণার জল তৃষ্ণিতকে যেমন পরিতৃপ্ত করে তেমন এক তৃপ্তি নিয়ে বলত : তোর সুধা ঝরা হাসিতে আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। কেবল তোর কাছে এসে দাঁড়ালে একটু শান্তি পাই। আমাকে নতুন প্রাণ দেয়। টোল খাওয়া ঐ হাসি আমাকে নবীকৃত করে।

পৃথা কথা বলতে পারত না। বিগলিত প্রসন্নতায় মৃদু মৃদু হাসত।

অনেক কাল পরে কথাগুলো আমার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল।

বহুকাল আগের ঘটনা হলে কি হবে? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম একটা লতানো গাছ বাইরের বারান্দায় মৃদু হাওয়ায় দুলছে। গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল ফুটে আছে তাতে। পৃথা এক গুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে কবরীতে গুঁজল। এক ঢাল কোঁকড়া চুলের কবরীর শোভাটা তাতে বহুগুণ হলো। কি এক অকারণ পুলকে নিজের মনে গুণগুণ করল।

পৃথা মুখে যাই বলুক, প্রতিদিন শূরসেনের আগমনের জন্য উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করত। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই নেশাগ্রস্ত রোগীর মতো তার ভেতরটা কী এক অস্বস্তিতে আর অতৃপ্তিতে ছটফট করত। বাবার উপর রাগ অভিমান হতো শূরসেনের কাছে তার চেয়ে কেউ বেশি হতে পারে একথা মনে হলে মাথা দিয়ে আগুন ছুটত।

একবার কার্যোপলক্ষে শূরসেন কদিন আসেনি পৃথার কাছে। তাতেই অভিমানে মুখ আঁধার করে জানলার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল পৃথা। বুকে তার ঝড়। কথা বলবে না বলে সে তো

আছে ধনুকভাঙা পণ করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে ছিল তাঁকে দেখবে না। খেলার পুতুল নয় বাবার। পুতুল দাক্ষিণ্য পেয়ে খুশি হয়, কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ চায় আদর, ভালোবাসা। তার প্রাপ্ত মর্যাদা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তেরো বছর বয়সেও পিতার কাছে ছোট সে। বাবা-মার কাছে সন্তানেরা কোনদিন বড় হয় না; চিরকাল ছোট থাকে। কিন্তু বাবার এই ঔদাসীন্য একটুও ভালো লাগে না তার। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে, নিজের একটা মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় বাবা সেটা বুঝতে চায় না। সে এখন আত্মসচেতন একজন নারী। বাবা বলে শূরসেন তার মর্যাদা অপব্যবহার করতে পারে না। সব কিছুর একটা বয়স আছে। কষ্ট হলেও তাঁকে মেনে নিতে হয়। মানুষের সব সম্পর্কের ভিত তো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মর্যাদা আর সম্মান দিয়েই তৈরী হয়। মুগ্ধ করার মন্ত্রে বাবা তার মর্যাদা বাজে খরচ করছে বলে মনে হলো পৃথার। সব বস্তুরই একটা আলাদা মূল্য থাকে। বিনামূল্যে ধূলোকণা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্নেহ, মমতা, আদর, সোহাগ তো দূরের কথা। বাবা ভালবাসেনি তাকে। নিজের ভালবাসাকে বিনামূল্যে খুশি করে গেছে। তাই, জীবন হাতের আঁজলা গলে গলিয়ে যাচ্ছে সে। তার প্রতি শূরসেনের দরদে টান ধরেছে। বিনামূল্যে সে এত বেশি দিয়েছে যে তার নিজের দামটাই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

নিজের মনের ভেতর সত্তার ভেতর এরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতিকে আবিষ্কার করা যে কী দারুণ আনন্দ আর মুক্তির ব্যাপার আচমকা তা জানল। মনের জগতের সব আবিষ্কারই মানুষ বোধ হয় অকস্মাৎ একা একা করে। নির্জনের, অবকাশের একাকী ব্যক্তিত্বটাই তার আসল ব্যক্তিত্ব। এই বোধটাই তার কানে ফিস ফিস করে বলে, কোন কাজে যদি মনের সাড়া না পায়, আনন্দের না হয়, যদি তা নিষ্ঠার না হয় না হলে তা পূজার কাজে লাগে না। উল্টে এক গভীর ঘৃণাই অবচেতনে জমতে জমতে নিজেকে কুরে কুরে খেয়ে যায়। কাজ কবাটা যতটা অন্যের জন্যে তার চেয়ে বেশি নিজের ভালো লাগা এবং নিজের ভালোর জন্যে। মানুষ হিসেবে আত্মসম্মান নিয়ে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মূল্য, যে বোঝে না তাকে সারা জীবন পস্তাতে হয়। যদি মানুষ মানুষের মতো হয় তবেই এ সংসাবে, সমাজে তার মূল্য, নইলে তার দাম কানাকড়িও নেই।

ঘরের ভেতর চেনা পায়ের খসখস শব্দ হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াল। পৃথা নড়ল না। ঘাড় ফিরে দেখলও না। কাঠ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরের অসংযত অভিমানকে আটকে রাখতে প্রাণপণে জানলার গরাদ দুহাতে শক্ত করে ধরল।

অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

শূরসেনের বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি। অসহায়ভাবে বলল : ক'দিন আসতে পারেনি। আজও দেরী হলো।

পৃথা কথা বলল না। গরাদ ধরে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল! শূরসেনের নিশ্বাস তার গায়ে পড়ল। বেশ বুঝতে পারছিল তার একটু করুণা, অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য কৃপাপ্রার্থীর মতো বাবা খুব কাছে দাঁড়িয়ে। নিজেকে অপরাধী ভেবেই তার গা ছুঁতে পারছে না। চুপ করে অপেক্ষা করছে কখন তার বুকের বরফ গলবে। চোখে শ্রাবণ ধারা নামবে।

পৃথা বুকের মধ্যে কাঁটা ফোটা যন্ত্রণার মতো তীব্র সুখের এক দপদপানি অনুভব করল।

এবারের মতো ক্ষমা করে দে মা। আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে গিয়ে শূরসেন বলল। তাঁর গলায় যেন অপরাধ রাখার জায়গা নেই।

পৃথার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। নিচের দাঁতের উপর ঠোঁট কামড়ে ধরল। মুখে কথা নেই। শূরসেনকে দেখেই যে মুখে অকারণে ফিক করে হাসি ফুটত, খুশির আভা ছড়িয়ে যেত সে মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। কার অভিশাপে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

কাঁধের উপর শূরসেন হাত রাখল। ঘৃণায় পৃথা কুঁকড়ে গেল। বিরক্ত ভাবেই এক ঝটকায় কাঁধ থেকে হাতখানা সরিয়ে দিল। বলল : আমি তোমার খেলার পুতুল না।

শূরসেন পৃথার কণ্ঠস্বরে চমকল। গাঢ় গলায় আচমকা বিস্ময়ে উচ্চারণ করল ঃ এ কী ধরণের কথা!

মাথা সিঁধে রেখে বুক টানটান করে রুক্ষ গলায় পৃথা বলল : যা সত্যি তাই বলছি। বাবা, মানুষের সম্পর্কটা বড় পলকা। সাবধানে নাড়তে চাড়তে হয়। একটু অসাবধান হলে ভেঙেচুরে যায়। জোর করে সম্পর্ককে বাঁচাতে গেলে তাতে কাটার দাগ ধরে যায়। একটু অসাবধান হলে, নিজের দাঁতও খাতির করে না, জিভকে কামড়ে দেয়। রক্তপাত হয়। অনর্থকক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

শূরসেন অবাক হয়ে পৃথাকে দেখতে লাগল। মাত্র ক'টা দিন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এর মধ্যে কত বদলে গেছে সে। পৃথাকে তার ভীষণ অচেনা লাগল। দুঃখ করে বলল : এও হয়তো তোমার ভালোবাসার এক ধরনের প্রকাশ। কিন্তু এরকম প্রকাশ যত কম হয় সংসারে তত মঙ্গল। আমার আর আর সন্তানদের থেকে তোমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা আমার বাৎসল্যের বিলাস মনে হয়েছে তোমার। হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রকৃত ভালোবাসা বড় ঝড় ঝাপ্টার। পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়। বড় বেশি প্রত্যাশা করে অন্যজনের কাছে। আবার আশাভঙ্গের বেদনায় পুড়ে কষ্ট ভোগও করে।

পৃথার বুকের ভেতর হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। সব দৃঢ় প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। হঠাৎ বাবার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। গভীর এক অপরাধবোধ থেকে বলল, আমায় ক্ষমা করে দাও বাবা। আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি শুধু একটু অন্যরকম বলেই বোধ হয় এত কষ্ট পাই। এটাই তোমার কাছে আমার অপরাধ।

শূরসেন তার দু'গালের উপর হাত রেখে গাঢ় গলায় ভাঙা স্বরে বলল : বোকা মেয়ে, ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? সব বাবা-মাকেই ছেলে মেয়ের এরকম কত পাগলামির ভার বইতে হয়। বাবা-মায়েরাই শুধু সেকথা জানে। না বলে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য থাকলে হয়তো অন্যরকম হতো। তা পারে না যে তারা। তাদের মতো স্নেহ-বৎসল প্রাণী বোধ হয় নেই।

শূরসেনের কথার আঁচ লেগে পৃথাার ফর্সা মুখ অপমানে রাঙা হয়ে গেল। মাথা হেঁট করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

পৃথার অবস্থা দেখে আমি মৃদু মৃদু হাসছি। হাসবই তো! তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? প্রশ্নটা করেও আমি হাসছি। এই তো কত সহজে জিগ্যেস করতে পারলাম, এতদিন করেনি কেন? ও তো আর আমি নই, আমার অন্য এক সত্তা। সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে ওর মান-অভিমান দুঃখ-যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করে না বলেই এমন করে ওকে দেখে হাসতে পারছি। বহুকাল পরে আজ ওর কথা যখন মনে পড়ল, ভ্রূকুটি করেছি নিজেকে। আমার অন্য এক সত্তাকে উপহাস করার কোন লজ্জাই আমার ছিল না। তার সঙ্গে আমার নামের বন্ধন এড়াতে পারছি না বলে বিনি সুতোর মালার মতো আমার সত্তার সঙ্গে ঝুলে আছে। নিজের কথা গভীর করে ভাবতে গেলে তার প্রসঙ্গ না এসে পারে না। আমার নিন্দে, অপবাদ, কলঙ্ক, দুর্নাম, দুর্ভাগ্যের মূলে আমার বাবা শূরসেনের কাণ্ডজ্ঞানহীন একতরফা সিদ্ধান্তকে কিছুতে ভুলতে পারি না। বাবা নিজের হাতে তার প্রিয় পৃথাকে গলা টিপে হত্যা করল। পৃথা মরে কুন্তী হলো। কেন যে বাবা এমন একটা কাণ্ড করল কে জানে? এরকম না করলে আমার জীবনটা হয়তো তছনছ হতো না। আজ আমার নিজের দিকে চাইতে ভীষণ লজ্জা করে, ঘৃণা হয়।

যে স্মৃতিকে অবচেতনের গভীরে নির্বাসন দিয়ে বেশ ছিলাম, হঠাৎ বাদ্ধর্ক্যে — বাণপ্রস্থে সেই স্মৃতি মনে পড়ছে। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করছে।

কুন্তী ভোজ বাবার পিসতুতো ভাই এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। জ্ঞান হওয়া থেকে তাঁকে এখানে দেখিনি। এই প্রথম পদার্পণ ঘটল তাঁর। মানুষটা ভীষণ আমুদে। হৈ-হুল্লোড় ভালবাসে। অল্পেই

যে কোন বয়সের লোককে চুম্বকের মতো কাছে টেনে নেয়। মুহূর্তে আপন হয়ে উঠে। তবু তাঁর আচমকা আগমন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলল পরিবারের অভ্যন্তরে। যে যার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করল। এ ধরণের ব্যাখ্যা রাজপ্রাসাদে নতুন নয়। অপরিচিত কোন অতিথি এলে প্রত্যাগমন পর্যন্ত হরেক রকম আলোচনা চলতে থাকে। শূরসেনের কানেও সে গল্প নিশ্চয়ই পৌঁছত। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বাইরে বোঝা যেত না। তবে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবরটা ইদানীং বেড়েছিল। কৌতূহল প্রকাশের ধরণটাও ছিল একটু অন্যরকম। ভোজরাজকে কেমন লাগে, তাই বেশি করে জানতে ইচ্ছে করত। কেন, জানি না?

ক'দিন পরে ব্যাপারটা আর চাপা থাকল না। মাটি ফুঁড়ে বীজ থেকে চারা গাছ যেমন বেরিয়ে আসে তেমনি সব রহস্য ভেদ করে বাবাকেও বলতে হলো, পৃথা তোর কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে।

তাঁর আচমকা কথায় পৃথা একটু বিব্রত বোধ করল। ধমকে বললঃ চুপ করত। মাঝে মাঝে তোমার কি যে হয়, বুঝি না বাপু। আমি যত বড় হচ্ছি, তুমিও কেমন হয়ে যাচ্ছ! তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়।

শূরসেন কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। কষ্টে ঢোঁক গিলল। জানলার কাছে এসে গরাদ ধরে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে আসা দিনের উজ্জ্বল আলো পড়ল বাবার গায়ে। মেঝেতে তার ছায়া পড়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত ছায়াও। গরাদের ফাঁকের ভেতর মুখের অর্ধেকটা গলিয়ে দিয়ে যূপবদ্ধ প্রাণীর মতো অসহায় গলায় বললঃ আমার বুকে বিসর্জনের বাজনা ডগর দিয়ে বাজছে। অন্যেরা কেউ তা শুনতে পাচ্ছে না।

পৃথার ভুরু কুঁচকে গেল। গম্ভীর গলায় বললঃ থামবে তুমি। এমন ছেলেমানুষী কর যে, ভালো লাগে না। কেন বোঝ না তোমার কষ্ট দেখলে আমিও কষ্ট পাই। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য তখন ভীষণ অপরাধী মনে হয়। মেয়ে যেন আর কারো হয় না, শুধু তোমার একার আছে।

পৃথা আমার কথা একটু আলাদা। জঙ্গলের তিন রাস্তার মোড়ে এসে পথিককে যেমন স্থির করতে হয় কোন পথ বেছে নেবে, তেমনি জীবন পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাকেও ভাবতে হচ্ছে কোন পথে যাব আমি? দুটো পথ কোন দিকে গিয়ে কোথায় শেষ হয়েছে জানা থাকলে স্থির করতে কম সময় লাগে। কিন্তু যেখানে জানা নেই সেখানে হয় সমস্যা। পথ, একবার ভুল বেছে নিলে শোধরাবার উপায় থাকে না। তোকে নিয়ে আমি সেই সংকটে পড়েছি—জীবনও জঙ্গলের মতোই। এখানকার ভুলের শাস্তিও বড় কঠিন। জীবন দিয়ে তার দাম শুধতে হয় নীরবে নিভৃতে।

বিস্ময়ে পৃথার ভুরু কুঁচকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় সভয়ে জিগ্যেস করলঃ বাবা, কী হয়েছে বলতো? তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কী একটা লুকোতে চাইছ। লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই। সংকট যখন আমায় নিয়ে, তখন মিছেমিছি নাটক করে লাভ কি? জীবনের ঘটনা নাটকের একটা অংশ, কিন্তু নাটকের কাঠামোয় একটা মানুষের জীবনকে ধরে না। নাটকের চেয়ে জীবন অনেক বড়। তাছাড়া তুমি বলছ, আমি তোমার বাঁচা, মরা দুইই। তা হলে বুঝিয়ে বলতে পারছ না কেন? জানি না—কী বলব তোমাকে?

অপরাধ রাখার জায়গা নেই যেন শূরসেনের। হাত ধরে পৃথাকে প্রশস্ত কেদারায় বসাল। নিজেও বসল তার পাশে। একটু ইতস্তত করে বললঃ পাছে শ্রদ্ধা হারিয়ে ঘৃণার পাত্র হই, তাই সব বলা হয়নি। বিশ্বাস কর, তোর কাছে দয়া, করুণা, অনুগ্রহ, কৃপা ভিক্ষা করতে আমার লজ্জা করছে। কতবার বলতে চেয়েছি, কিন্তু পারেনি। কে যেন গলাটা চেপে ধরে।

অমঙ্গল আশঙ্কায় পৃথার বুক কেমন করে। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললঃ বাগাড়ম্বর না করে কী হয়েছে, বল?

পৃথার মন তৈরীর জন্য একটু সময় দরকার ছিল। তাই, শূরসেন হেঁয়ালী করে বললঃ তিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত পথিকের মতো ভাবছি, কোন পথে যাব? এক পথ তোর দিকে গেছে, আর এক পথ গেছে কুন্তী ভোজের দিকে ঘুরে। আমার এখন উভয় সংকট। কার মন রাখি? আদরের মেয়ের মন রাখলে কুন্তীভোজ অসন্তুষ্ট হয়। আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। আমি তার কাছে

মিথ্যেবাদী হব। লোকে বলবে অকৃতজ্ঞ, প্রতারক। এখন কি করব? আমার প্রতিশ্রুতি, সম্ভ্রম, মর্যাদার কি হবে?

পৃথার বুকে অভিমানের সমুদ্র অপমানে অনাদরে উথলে উঠল। দুঃখে দুচোখের পাতা জলে টলটল করতে লাগল। তীব্র জ্বালার উষ্ণ লু বইতে লাগল সারা শরীরে। কান দুটো রাগে, অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। শরীরে যে এত তাপ জমে ছিল, জানা ছিল না পৃথার। বেশ একটা উত্তেজনা নিয়ে প্রশ্ন করলঃ তোমার মাথা টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? কি সব যা তা বলছ? হঠাৎ এমন কি ঘটল যে তোমার মর্যাদা বিপন্ন? মিথ্যেবাদী হওয়ার মতো কি কাজ করেছ? তোমার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? সম্ভ্রমহানির প্রশ্ন উঠছে কেন? তোমার সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে আর কেউ নয়, আমি একা দাঁড়িয়ে কেন? সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে শীগ্গিরি একটা অঘটন কিছু ঘটবে আমার জীবনে। একটা বাঁক নেবে।

সেই অবোধ রহস্যময় উদ্বেগের কোন মানে হয় না পৃথার। তবু তার বুক টাটাচ্ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিয়ে বললঃ কী হয়েছে অপকটে বল। আমার ভীষণ ভয় করছে। যদিও জানি, জীবনে যা ঘটে সবই আগে ঠিক করা থাকে। তবু—

শূরসেনের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে বললঃ মানুষ কিছু করে না, শুধু কর্মফল ভোগ করে। এক অদৃশ্য হাতই সব নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সাধ্য কি তার নিয়ন্ত্রণ ভাঙে।

শূরসেনের কথার পৃথার উদ্বেগ আরো বাড়ল। বিব্রত ভয়ে তার ভেতরটা শির শির করতে লাগল। থমথমে গম্ভীর গলায় বললঃ আসল কথা বলতে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? একটা অপরাধবোধে তুমি বারাবর আমায় জিজ্ঞাসা থেকে সরে যাচ্ছ। তোমার দ্বিধার জন্য আমার ভয় বাড়ছে। এক অশান্ত অস্থিরতা নিয়ে পৃথা উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

অদ্ভুত প্রত্যাশাভরা চোখে শূরসেন তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করল। জানলার দিকে সরে গিয়ে পৃথার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললঃ কুন্তীভোজ বড় দুঃখী। অনেকগুলি বিয়ে করেও সন্তানের মুখ দেখতে পেল না। ওর প্রাণে সন্তানের স্নেহে ভরপুর। বাৎসল্যে বুক ভরে আছে। অথচ, তার একজনও দাবিদার নেই। ওরও কারো উপর দাবি করার কেউ নেই। বড় হতভাগা! বেচারার জন্য কষ্ট হয় বড়। ওর উপর আমার অনেক সহানুভূতি আছে জেনেই ব্যর্থ জীবনের বেদনা, অতৃপ্তি, দুঃখ, হাহাকার শূন্যতা নিয়ে, অনেক প্রত্যাশা করে আমার কাছে দৌড়ে এসেছে। ভিখিরির মতো যে চায় তাকে না বলে ফিরিয়ে দিতে বড় কষ্ট হয়। আত্মীয় এবং বন্ধু হয়ে তার কষ্টটুকু যদি না বুঝলাম তা-হলে কিসের বন্ধু? তাই তো অনায়াসে বলতে পারল সে ঃ- শূর এ পৃথিবীতে আমার মতো হতভাগাদের কোন দাম নেই। সব নিরর্থক মনে হয়। কেন বেঁচে আছি, কার মধ্যে বেঁচে আছি, জানি না। পৃথিবীর সব মানুষই তার সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকে। আমি কার মধ্যে বেঁচে থাকব? মানুষ তো একটা প্রত্যাশা নিয়ে চলে। লক্ষ্যে পৌঁছয়। কিন্তু আমার কে আছে? কি আছে? এখন কেমন ক্লান্তি লাগে। পৃথা, বসুদেব শ্রুতশ্রবার মধ্যে আমি নতুন করে জীবন পেলাম। বেঁচে থাকার একটা নতুন মানে খুঁজে পেলাম।' বলার সময় নিশ্বাস ফেলল বড় করে। আমার মুগ্ধ দুচোখের দৃষ্টি ওর চোখের মধ্যে এমন করে এনে ফেলল যেন অন্যদিকে চোখ ঘোরাতে না পারি। বললঃ সন্তানদের অনেক কিছু বাবার শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। সামান্য পরশে সমস্ত অনুভূতির মধ্যে গলে গলে পড়ে। সন্তান না হলেও এই অনুভূতি উপলব্ধি বাৎসল্যভাব সব মানুষের হয়। পরের ছেলে মেয়ে নিজের হয়ে যায়। এটা অনুভূতির ব্যাপার। তোমার ছেলে মেয়েদের সংস্পর্শে এসে আমার সেই অনুভূতি হল।' আমার হাত দুটো তার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললঃ শূর বুকের মধ্যে বড় কষ্ট। আমার সব কষ্ট অবসান হয় তোর পৃথাকে যদি আমায় ভিক্ষা দাও। পৃথাকে আমি ভিক্ষা চাইছি। তোর তো আরো অনেক মেয়ে আছে, পৃথাকে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচা।"

শূরসেনের গলা কাঁপছিল। বললঃ সেই মুহূর্তে কি যে হলো আমার জানি না। একজন স্নেহবৎসল

সন্তানহীন মানুষ কাঙালের মতো সন্তান ভিক্ষে করছে, আর আমার উপায় থাকতে নিষ্ঠুরের মতো তাকে 'না' করতে পারলাম না। 'না' উচ্চারণ করতে কষ্টে আমার বুক ভেঙে গেল। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মনে মনে বলি, কোন বাবাই চিরদিন মেয়েকে ঘরে রাখতে পারে না। অন্যের ঘরে বধূ করে পাঠাতেই হয় তাকে। আমি না হয় কুন্তীভোজের গৃহে কনে করে পাঠলাম। সেখানে সে পরম যত্নে, আদরে থাকবে। স্নেহ-ভালোবাসা-মমতা অনেক বেশি পাবে।

পৃথা কথা বলতে পারল না। চুপ করে শুনলে। রাগ কিংবা অভিমান হল না। একটা অপমানবোধ বুকের ভেতর কাঁটার মতো বিঁধে রইল। স্নেহপরায়ণ পিতা প্রিয়তম কন্যাকে নিয়ে এমন একটা কান্ড করতে পারে পৃথা কষ্ট করেও ভাবতে পারে না। বিপন্ন বিস্ময়ে তার প্রস্তরীভূত অবস্থা।

অনেকক্ষণ পর গভীর একটা অস্বস্তিবোধ থেকে মৃদুস্বরে বললঃ শ্রুতশ্রবা আমায় চেয়ে অনেক ছোট। তাঁকে তো দত্তক নিতে পারত। উত্তরাধিকারীর জন্য লোকে পুত্র সন্তান দত্তক নেয়। কিন্তু মহারাজ কুন্তীভোজ বেছে বেছে আমাকে নির্বাচন করলেন কেন? ব্যাপারটা আমার ভালো বোধ হলে না। তাঁর ইচ্ছে সমাদর করতে আমার নিজের বাবা মা'কে হারাব কেন?

অসহায়ভাবে শূরসেন তাকে বোঝানোর জন্য বললঃ এর ভেতর হারানোর কথা আসছে কেন? আরো একজন নতুন পিতা লাভ হলো সে কি কম কথা?

বাবা, আমি তোমার খেলার পুতুল নই। বাবা বলে, আমায় নিয়ে যা খুশি করতে পার না। আমার নিজের ইচ্ছে, পছন্দ, ভালোমন্দ বোধ হয়েছে। নিজের একটা ব্যক্তিসত্তা আছে। সম্পত্তির মতো যখন খুশি হাত বদল করবে, তাও আমি নই।

পাগল মেয়ে। তোর অমর্যাদা হওয়ার মতো কোন কাজ করেনি।

তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমার সরল বিশ্বাস ভেঙে টুকরো টুকরো করেছ। নিষ্ঠুর। নিজের স্বার্থের চেয়ে তোমার কাছে বড় কিছু নেই।

পৃথা। চমকানো বিস্ময়ে ডাকল শূরসেন।

শান্ত নিরীহ মেয়েটির ভেতর সহসা এক বিষধর ফণা তুলে ধরল। অভিমানের বিষ উগরে দিল। বললঃ ভেবেছ, আমি কিছু জানি না। বড় রাজ্য স্থাপনের সংকল্প তোমার মনে, প্রাধান্যলাভের স্বপ্নে তুমি বিভোর। কী করলে শক্তি বৃদ্ধি হয় তার চিন্তায় দিনের বেশি সময় কাটাও। মুখে কিছু না বললেও আমি জানি, মগধের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য একই বংশোদ্ভূত রাজ্যগুলির সঙ্গে বিবাদ কলহ এবং বিরোধের উত্তাপ যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে পারস্পরিক বোঝা পড়ার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে কুন্তীভোজকে তোমার দরকার। রাজ্যের তীব্র আর্থিক সংকট দূর করতে তার কাছে অর্থ ধার করছ। বিনিময়ে আমাকে দত্তক কন্যা করে পাঠাচ্ছ। ছিঃ আমাকে তুমি বিক্রী করে দিলে। আমার যে মন বলে একটা জিনিস আছে তার কথাটা একবারও মনে হয়নি। অথচ, আমার গর্ব ছিল, আমাকে তুমি বেশি করে অনুভব কর। কিন্তু আমাকে তুমি সম্মান দাও নি। একবারও আমার মতামত গ্রহণের চেষ্টা করনি। তোমার একার সিদ্ধান্তকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ। আমি যে তোমার সন্তানদের চেয়ে একটু আলাদা, একটু বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে আমাকে সহ্য করতে পারলে না তুমি?

শূরসেন পৃথার মুখে দিকে অপরাধীর মতো চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললঃ রাগের বশে তুমি যা বললে সব সত্য নয়। একদিন তোমার ভুল ভাঙবে। এখন আমার কোন কথা তোমার ভালো লাগবে না। আমিও সে চেষ্টা করব না। সংসারে যারাই ব্যতিক্রম হয় তাদের সব কিছুর জন্য একটু বেশি মূল্য দিতে হয়। আমার সন্তানদের ভেতর তুমি আলাদা বলেই তোমাকে চিনে নিতে আমার কষ্ট হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্য কাউকে নয়, তোমার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়েছে। একে তুমি দোষ বলবে? কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যাকে পাঠাব তাকে তো বিশ্বস্ত হতে হবে। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন আস্থাবান ব্যক্তিকে মনে না পড়া যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী। তোমাকে কোনভাবে অপমান করেনি বরং সম্মানিত করার চেষ্টা করেছি। আমার উদ্দেশ্যকে অপব্যাখ্যা করলে তুমিও কষ্ট পাবে, আমিও বেদনা অনুভব করব। সন্তানের মধ্যে আমি যে তোমার উপর

বেশি নির্ভরশীল সে কথা বলে বোঝানোর দরকার আছে মনেও হয়নি। হলে, আগাম অনুমতি নিতে নিশ্চয়ই ভুল করতাম না।

পিতার কথাগুলো মন দিয়ে শুনল পৃথা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপরই থমথমে গম্ভীর গলায় বললঃ ভুল তো হয়েছে। ভোজরাজ আমাকে দত্তক চাইলেন কেন জানতে চেয়েছ? তাঁর পুত্রহীনতার সংকটের আমি কী করতে পারি? সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বের সমস্যা কিংবা কুলরক্ষার উপায় মেয়ে হয়ে আমি কিভাবে সমাধান করব? সেবা, মমতা দিয়ে তাঁর সন্তানহীনতার দুঃখ, ব্যথা, জ্বালার উপশম করতে পারি মাত্র।

সেটা কি কম কথা?

শ্রুতশ্রবাও তো সে কাজ করতে পারতো। তা ছাড়া বয়সে আমার অনেক ছোট সে। আমার চেয়ে দীর্ঘদিন তাকে কাছে পেতেন। তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা আরো সহজ হতো।

আমিও সে কথা বলেছি। কিন্তু মেয়ে হয়ে ছেলের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য করতে যেভাবে তুমি পার শ্রুতশ্রবা সেভাবে পারবে না বলেই জুহুরির মতো কুন্তীভোজ তোমাকেই চিনে নিয়েছে। এতে তোমার গর্ববোধ করা উচিত।

মাথা হেঁটে করে বললাম : গর্ব হওয়া তো দূরের কথা অপমানে ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কেমন একটা ভয়ও হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। জীবনের বাঁক নেবে।

কুন্তীভোজের গৃহে আমি আর পৃথা নই। কুন্তী। অন্য এক নবীন বালিকা কিশোরী। আমার গোত্রান্তর হলো। শুরু হলো নতুন জীবন নতুনভাবে। এখানে আমি অত্যন্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য সচেতন এক কিশোরী।

পৃথা মরে কুন্তী হলো টেরও পেলাম না। একদিনের জন্যে দুঃখ হয়নি। শূরসেনের বড় আদরের নামটা হারিয়ে গেল আমার জীবনে। এখানে শুধু কুন্তী আমি। এটাই আমার নাম এবং পরিচয়। এই নামেই আমি পাণ্ডুর মহিষী। পঞ্চ-পান্ডবের গর্বিতা জননী ঃ রাজামাতা কুন্তী।

রাজমাতা হওয়ার পথটা মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক অপমান, অনাদর, অবহেলার বিঘ্ন সংকুল উপত্যকার এলাকা পেরিয়ে অনেক দুঃখ, ভয়, যন্ত্রণার পাহাড়ের গা ঘেঁষে বয়ে এসে তবেই আমি রাজমাতা হয়েছি। এটা আমার আক্ষেপ নয়, আমার গর্ব। জয়ের গর্ব।

তবু সে কথা মনে হলে, মন খারাপ করা আর্তিতে বুকখানা টাটায়। কোথায় যেন একটা বিষাদ জমা হয়ে আছে। রাজমাতার ভাবভঙ্গী থাকে না তখন। বুকের গহনে রক্ত ক্ষরণ হয়। নিজেকে বড় দীন এবং ছোট মনে হয়। কৃতকর্মের জন্য নিজেকে দায়ী করি। দায়ী থাকি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। বাণপ্রস্থে সেই প্রায়শ্চিত্তই করছি। কিন্তু সময়ের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে না পারলে প্রায়শ্চিত্ত যে কত বিড়ম্বনাকর হয় আমার চেয়ে বেশি কে জানে?

বাণপ্রস্থের দিনগুলোর বড় নির্জন। বিষণ্ণ একাকীত্বের মধ্যে কাটে সর্বক্ষণ। মানবহীন দেশে নিস্পৃহ নিরাসক্ত নির্জনতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এখানে মানুষ বলতে তো চারজন—আমি, দেবর, ভাসুর ধৃতরাষ্ট্র এবং বড় জা গান্ধারী। চার-জনে যেন চার দ্বীপের বাসিন্দা। দেখাশোনা হয় কিন্তু কথাবার্তা হয় খুব কম। সারাদিন বড় জোর দু চারটে কথা বলার চেষ্টা করি। তাও প্রয়োজনের কথা। অনন্ত সময় চলে যায় মুখ বুজে। নির্জন বন থেকে বৌ কথা কও, চোখ গেল-পাখি ডাকে। বাঁদর হুপ হুপ করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দিয়ে যায়। পাশ দিয়ে ঝরণা ঝর ঝর করে বয়ে চলেছে তো চলেছেই। ওর শব্দ কখনো থেমে নেই। কিন্তু এ শব্দগুলো, ভাষাগুলো কোনোটা মানুষের সঙ্গী নয়। বরং তার সঙ্গহীনতাকে ব্যঙ্গ করে, পাতারা ফিসফিস করে বলতে থাকে তুমি একলা, তুমি একলা।

আমি প্রত্যেকদিন বুঝতে পারি কুন্তীভোজের গৃহে পৃথা যদি কুন্তী না হতো তাহলে অন্যভাবে জীবনটা সুরু করতে পারত। দিনগুলো হয়তো প্রত্যেক মেয়ের মতো পুনরাবৃত্তি করে কাটত। বিয়ে

হতো কোন রাজপুত্রের সঙ্গে। রাজমহিষী হতাম। রাজমাতা হতাম। তারপর আর কি? আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়লো হতো। অদৃষ্ট আমার জীবনের ফাঁকির বাঁশি বাজতে দেবে না বলেই এক অন্য জীবনের মধ্যে টেনে এনেছ। আমার সাধ্য কি তার স্রোতে বাধা দেই?

এটা আমার জীবনের শুধু একটা ঘটনা। বৃহৎ জীবনের একটা খণ্ডাংশ মাত্র। তবু জীবনের কথা প্রসঙ্গে সেটুকু না এসে পারে না। কারণ তাকে বাদ দিয়ে তো আমি নই। কুন্তী ভোজের গৃহে একসঙ্গে যে কটা বছর কাটিয়েছি স্নেহে, সখ্যে মাধুর্যে তা পূর্ণ। তার মধ্যে কোন ফাঁক ও ফাঁকি ছিল না। আমার জীবন কাহিনীর সূচনা পরিপূর্ণ গৌরবে ভরে দিয়েছিল। যদি কেউ জিগ্যেস করে কী তুমি পাওনি? কোনটা পাওনি কুন্তী ভোজের গৃহে? তা হলে আমাকে বলতেই হবে অভিযোগ করার মতো কিছু নেই। এখানে যা সব ঘটনা তা মারাত্মক কিছু নয়, তা নিয়ে জীবনের গল্প হয় না। তবু আমার অন্তর্জীবন প্রবাহের গতিটা চিহ্নিত করতে তার উল্লেখ করতে হয়। কারণ কোন ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থ রূপ নয়। যে ভালোবাসা মানুষের প্রাণে দীপ জ্বেলে দেয়, চারপাশে সৌরভে ভরে দেয়, অমরাবতীতে পৌঁছে দেয়, সেই ভালোবাসার এমন রূপ আছে যা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, নরক যন্ত্রণার কষ্ট দেয়। অথচ বাইরে থেকে দেখতে উভয়ের রূপ একই; যেন দুই যমজ ভাইবোন—একজন প্রাণ দেয়, অন্যজন হরণ করে।

এরকম নানা ঘটনার অনুভূতির ভেতর জীবন তরীখানা নিয়ে আমি ভেসে বেড়িয়েছি। একটুও শান্তি পায়নি। কুন্তী ভোজের গৃহে হঠাৎ বদরাগী মুনি দুর্বাসা, রাজার অতিথি হয়ে এসে আমার শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে একটি লোষ্ট্রপাত করে যে তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করল তার আবর্ত থেকে কোনদিন মুক্তি পাইনি। এই বলয়ের ভেতর অন্য কাউকে নয় চিরকাল আমাকেই খুঁজেছি। আমার সত্তার যে অংশ নিজেকে কোনদিন কারো কাছে অভিব্যক্ত করতে পারেনি তারই বেদনা।

সে বেদনার স্রষ্টা কে? প্রশ্নটা সারা জীবন ধরে আমার মনের মধ্যে একা বয়ে বেড়িয়েছি। কারণ সব সমাধান তো আর উত্তরের দ্বারা হয় না। জীবনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর একা একা দিতে হয়। কারণ সব কথা তো অন্যকে বুঝিয়ে বলার নয়। সেটা বলতে গেলে নিজেকে ছোট লাগবে ভীষণ। আমার প্রশ্নের উত্তরটা বোধহয় সেরকম। আমি যা বলি না কেন, আমাকে বোঝার গরজ নেই কারো। তাই আমার জিজ্ঞাসার সঙ্গে এক ধরনের অপ্রকাশ্য নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশানো উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ এবং ভয় মিশে ছিল।

এখন সে ভয় নেই তার। কিন্তু একটা লজ্জা সঙ্কোচ রয়ে গেছে। সেটা বোধ হয় কোনদিনই কাটবে না। কারণ আমি রমণী। রমণীর সব লজ্জা তার রক্ত মাংসের দেহ ঘিরে। পুরুষের যেখানে ঢাকাঢাকির কিছু নেই, সেখানে মানুষের সমাজ নারীকে বেশি করে আবৃত করছে। অনেক বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে। সংস্কার বিশ্বাসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে দেহ চেতনা, দেহই নারীর সম্পত্তি। এত মূল্যবান সম্পত্তি যে সর্বক্ষণ পাহারা দিতে হয়। দেহের শুচিতা গেলে সম্পত্তি হারানোর মতো নারীর অপরাধ রাখার জায়গা থাকে না। দোষটা যেন তার একার। বিশ্বাসভঙ্গের কষ্ট তাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দেয়। নিজেকে বড় দীন অসহায় এবং বিপন্ন মনে হয় তখন। দেহের শুচিতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব তার মধ্যে এক শ্রেণীর মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এই তীব্র দেহ সচেতনতাই তার অহং। এই অহং নিয়ে একটিমাত্র পুরুষকে বরণ করে জীবনে। পুরুষের শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য দৈহিক শুচিতা এবং সংযম রক্ষার দায়িত্ব একা নারীকেই বহন করতে হয়। এই বোধ ও অনুভূতির ভেতর বড় হওয়ার জন্য একে মেনে নেওয়ার বাড়াবাড়ি সব মেয়ের ভেতর আছে। আমার রক্ত স্রোতেও সেই সংস্কারের ধারা প্রবাহমান। একদিন ঋষি দুর্বাসা এসে ওলোটপালোট করে দিল সব। আমার জীবনে সে এক ধুমকেতু।

বহুকাল পরে ঋষির মুখখানি দেখতে পাচ্ছি। খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে তাঁকে দেখছিলাম। বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির ঔজ্জ্বল্য এবং স্বপ্নালু দু'চোখের চাহনিতে এমন একটা নিবিড় ঘুম লাগার ভাব ছিল যা তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফেতে ঢাকা পড়েনি। বরং অপরূপ শ্রীময় করেছিল। একটা দিব্যভাব তাঁর

মুখ, চোখ শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল যেন। আপনা থেকে মনটা শ্রদ্ধায় নুয়ে এল। একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ কাঁপিয়ে দিয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ।

বাণপ্রস্থের কুটীর থেকে আমার নব্বই বছর আগের জীবনকে তেমনি দেখতে পাচ্ছি। আলপনা দেয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে দুর্বাসা। কুন্তী ভোজের রাণীরা তাঁর পরিচর্যায়, অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। রাণীদের কেউ দুধ দিয়ে হাত পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ পবিত্র গঙ্গাজলে তা পুনরায় পরিষ্কার করছে, কেউ চুল দিয়ে ভিজে-পা-হাত মুছিয়ে দিচ্ছে। সব জলটুকু গা থেকে নিঃশেষে শুষে না নেয়া পর্যন্ত নরম চুল বুলিয়ে তা মুছে নেয়া চলতে লাগল। তারপর রাজপুরোহিত উদাত্ত কণ্ঠে ঋষির আগমনের এবং গুণের প্রশস্তি বাক্য পাঠ করে তাঁকে অভিনন্দিত করল। কুন্তীভোজ গরদের গাত্রবাস দিয়ে তাঁর খালি গা ঢেকে দিলো। দুর্বাসাকে মধ্যমণি করে রাজা এবং রাজমহিষী পথ দেখিয়ে অতিথিশালার দিকে এগিয়ে চলল।

দুর্বাসাকে এত সমাদর করার কি আছে? ওই ঋষির ক্ষমতা কতটুকু? একজন রাজার ভয় পাওয়ার মতো কী আছে তাঁর? প্রশ্নগুলো কুন্তীভোজকেই করলাম। আমার কৌতূহলিত প্রশ্ন কুন্তীভোজকে বেশ একটু অস্বস্তিতে ফেলেছিল। মুখ দেখেই তা টের পেলাম। কয়েকটা মুহূর্ত তার দ্বিধায় কাটল। অপ্রস্তুতভাবটা কাটিয়ে উঠে বললঃ রাজার পুত্রহীনতা অপরাধ। ব্রাহ্মণ মুণি ঋষিদের আশীর্বাদ, অনুগ্রহ পেলে পুত্র লাভ হয়। তা-ছাড়া এঁরা বড় স্পর্শকাতর। একটু সেবা, যত্ন ভালো আতিথ্য পেলেই খুশি। আর না পেলে চটে যান। সাধারণ মানুষ এঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে এবং মানেও খুব! এদের অনুরাগ মূলধন করে এঁরা অনেক কিছু করতে পারেন। রাজ্যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বাঁধিয়ে নানা উৎপাত ঘটিয়ে রাজার ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। তাই কোন রাজা এঁদের চটাতে চায় না। এঁর সেবা যত্নেরা সব ভার তোমাকে দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। তুমি বুদ্ধিমতী। কখন কোন কাজটা করা দরকার এবং কি করলে ভালো হয়, তুমি যেমন বোঝ, এমনটা আমি পারি না।

মেয়ে মানুষের মত তো প্রশংসায় গলে যায়। ভেতরটা প্রসন্ন হয়ে উঠে। প্রশ্ন ফুরিয়ে যায়। বিগলিত খুশিতে ধন্য হয়ে বলি, তোমার বিশ্বাসের অসম্মান হয় এমন কিছু করব না।

ভোজরাজ প্রসন্নচিত্তে বললঃ আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

ঢোঁক গিলে বললাম, যাঁর সেবার দায়িত্ব পেলাম, সেই মানুষটির স্বভাব, আচরণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু পূর্ব ধারণা থাকলে প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নেয়ার কাজটা সহজ হয়।

ভোজরাজ চমকানো বিস্ময়ে বললঃ ঠিক বলেছ। ঋষিরা কোন না কোন রাজার চরগিরি করে। দুর্বাসা মগধ সম্রাট জরাসন্ধের একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। জরাসন্ধ তাঁর খুব অনুগত এবং বাধ্য। দুর্বাসার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের গতিবিধি, চিন্তাধারার উপর সংগোপনে নজর রাখার একটা কার্যকরী সংস্থা তৈরী করেছেন। মুনি ঋষিদের সাহায্যে জরাসন্ধ অন্য রাজ্যের গোপন কার্য পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। দুর্বাসার আগমন তাই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আতিথ্য গ্রহণ করতে তিনি আসেননি, যাদব রাজ্যগুলির মধ্যে বংশানুক্রমিক যে দ্বন্দ্ব বিরোধ, সংঘাত নিরন্তর লেগে আছে তার হিসাব নিকাশ করতে এসেছেন। মগধ সম্রাট যাদবদের অন্তর্কলহ এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর আগ্রাসী রাজনীতি প্রতিরোধ করতে যাদবরাজ্যগুলিকে জোটবদ্ধ করে প্রজাতান্ত্রিক যাদব সমবায় রাজ্যগঠনের যে প্রয়াস আমি ও শূরসেন করছি, তার বিঘ্ন ঘটাতে দুর্বাসাকে পাঠানো হয়েছে। কোপন স্বভাবের এই ঋষিকে তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ। কেবল তোমার উপরেই যা একটু ভরসা। তাঁকে না চটিয়ে কি উপায়ে আমাদের স্বার্থ নিরাপদ করা যেতে পারে আগে থেকে তার বাধাধরা কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দুর্বাসার মনের গতি-প্রকৃতি বুঝে স্থির করতে হবে। দুর্বাসার সঙ্গে আমি কোন সংঘাত চাই না। প্রতিবাদ অন্তরে গোপন রেখে কৌশলে ঋষির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার সব দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম।

সেদিন সারারাত ভালো ঘুম হলো না আমার। নানা চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করেছি শুধু। ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। তখনও বিনিদ্র রজনীর জটিল চিন্তার

ঘোর কাটেনি। দেহ মনে ক্লান্তি, অবসাদ জড়িয়ে আছে। সরোবরে গা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় পুজোয় বসলাম। তবু মনটা শান্ত হলো না। পুজান্তে একা একা উদ্যানে পায়চারি করছি, আর ভোজরাজের কথাগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করেছি।

বারংবার মনে হতে লাগল নবীনা কিশোরী থেকে হঠাৎ এক দায়িত্বশীল রমণী হয়ে গেছি। আকাশ জোড়া বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত হতে লাগল আমার ভেতরটা আনন্দে, আবেগে আশঙ্কায়। বেশ বুঝতে পারছিলাম, দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় আমার মধ্যে কী সব ঘটে যাচ্ছে। আর আমি ঐখানে কান পেতে আছি—গভীরে, খুব গভীর অভ্যন্তরে কে যেন অস্ফুট স্বরে কথা বলছে।

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে পেছন থেকে ভোজরাজ উচ্ছল গলায় ডাকলঃ পুত্রী। উদ্যানে একা কী করছ? এ সময় তো কখনো তোমায় দেখি না। কী হয়েছে তোমার? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি।

লাজুক অপ্রতিভতায় সহসা একটু হেসে ফেলি। বললাম ঃ দেখা হয়ে ভালোই হলো। কতকগুলো জরুরী কথা বলার আছে।

বেশ তো বল।

কয়েকটা মুহূর্তে কেটে গেল কথাগুলো গুছোতে। বয়স্ক ব্যক্তির মতো বললাম, দুর্বাসাকে প্রীত করে জরাসন্ধকে তোষণ করার নীতি আমাদের অসহায়তাকে প্রকাশ করবে। কারণ জরাসন্ধ কংসকে আশ্রয় করে যাদব রাজ্য গ্রাস করার ফন্দী এঁটেছে। এতে যদুকুলোদ্ভব সব যাদবেরাই অসন্তুষ্ট। তাদের ক্ষোভ বিদ্রোহ গোপন নেই। বিশেষ করে ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। দুর্বাসা এসেছেন ভোজরাজ কুন্তীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ সরেজমিন করতে। এ অবস্থায় শুধু আতিথ্য ও সেবা দিয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করে কর্তব্যচ্যুতি করা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাঁর তো শ্যেনদৃষ্টি থাকবে তুমি কতখানি জরাসন্ধের প্রতিপক্ষ, গোপনে কতটা শক্তি সংগঠিত করছ? যাদবদের উপর তোমার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কতটুকু তার উপর। বাবা তুমি আমাকে বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছ। বৃহস্পতির রাজনীতি শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করনি। তবু মনে হচ্ছে, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছ।

বাঁকা হাসিতে ভোজরাজের ওষ্ঠাধর বঙ্কিম হলো। বললঃ পুত্রী রাজনীতিতে স্বার্থরক্ষাই মূল কথা। স্বার্থেই বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। কার স্বার্থ কীভাবে রক্ষা হয় তার উপরে গড়ে সন্ধির শর্ত। সেও সাময়িক! স্বার্থরক্ষা হওয়ার পরে তার কানাকড়ি দাম নেই। জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করতে হয়। এখানে জেতাটাই বড় কথা। কিভাবে জিতলে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। পুত্রী রাজনীতিতে পর্যবেক্ষণ যার যত তীক্ষ্ণ, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যার বেশি, সেই জেতে। দুর্বাসার সঙ্গে আমাদের লড়াইটা কৌশলগত। কারণ, তিনি শত্রুপক্ষের লোক। তবুও ঋষি বলে তাঁর গন্তব্যের উপর কার্যের উপর কোনরকম বিধিনিষেধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ নীতি আরোপ করতে পারি না। তাঁকে বহিস্কার করা কিংবা বন্দী করাও শিষ্টাচার নয়। রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁরা ঈশ্বরের সাধক, মোক্ষাভিলাষী সাধু-সন্ত। ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর এঁদের প্রভাব কত গভীর ব্যাপক তা জানা না থাকলে রাজার রাজকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে! ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এবং এঁদের প্রভাবকে যে সুসমন্বয় করতে জানে তার উন্নতি, সাফল্য এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারে না। বনবাসী রামচন্দ্রের সাফল্যের মূলে আছে মুনি-ঋষির সহযোগিতা।

ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং তার গতি প্রকৃতির নাড়ী নক্ষত্র সম্পর্কে ভোজরাজের সূক্ষ্মজ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করে রাখল। সুদীর্ঘকাল ধরে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করতে করতে তাঁর চুল পেকেছে, বুদ্ধিও পরিপক্ক হয়েছে, এক কালে কুমার হৃদয়ে অর্ধস্ফুট উত্তপ্ত আদর্শ ক্রমে শাসন শিল্পে পরিণত রূপ পেয়েছে। এ জন্যেই হয়তো জনক শূরসেন এই মানুষটির সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আঁতাত গড়ে তুলেছে। হঠাৎ-ই কথাগুলো বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল আমার মস্তিষ্কের মধ্যে। কয়েকটা মুহূর্ত আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। মুগ্ধতার ভাবটা কেটে গেলে বললাম ঃ তোমার বক্তব্য সুন্দর। কিন্তু শুধু বক্তৃতা দিয়ে তো কৌশল প্রয়োগ করা যায় না। কঠিন বাস্তবে কত ধরণের সমস্যা,

বক্তৃতায় তাকে আঁটে না। প্রতিমুহূর্তে নিত্য-নতুন সিদ্ধান্ত পাল্টে পাল্টে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। ঋষি দুর্বাসার মতো কঠোর স্বভাবের মানুষকে বশ করা, সেবায় পরিতুষ্ট করে নিবৃত্ত করা বক্তৃতাতেই সম্ভব, কাজে নয়। খাতির যত্ন. সেবা পাওয়াটা অতিথি তাঁর ন্যায্য পাওয়া মনে করে। ত্রুটিতে অপরাধ ধরে।

তোমার কথাগুলো ফেলে দেওয়ার নয়। কিন্তু যারা সংঘাতের জন্য তৈরী, যাদের নীতি হলো সংঘাত বাড়ানো তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলাই প্রকৃষ্ট রাজনীতি। প্রতিপক্ষকে মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিতে নেই।

আমিও জানি। মহর্ষি বৃহস্পতি বলেছেন, সে অস্ত্র যদি কেড়ে নিতে না পার, অন্তত তাকে অকেজো করে দিও। কিন্তু কি ভাবে? পদ্ধতি স্থির করা আর তার সঠিক রূপায়ণই সমস্যা।

মুনি ঋষিরা খুবই স্পর্শ কাতর। একটু সেবা যত্ন, আদর ভালবাসা শ্রদ্ধা পেলেই প্রসন্ন হয়ে যায়। স্পর্শকাতর মনের স্পন্দনটি কান পেতে সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা শোনে, অনুভব করে তারা খুব সহজেই এঁদের রুক্ষ বুকের মরুভূমিতে মানবিক অনুভূতির মরুদ্যান রচনা করতে পারে।

বিজ্ঞের মতো আমি হেসেছিলাম। আমার সে হাসি জীবন রহস্যকে জানার কৌতুকে বর্তুল হয়েছিল। বললামঃ অনুমান এবং কল্পনা কখনো সত্য হয় না। বাস্তব বড় কঠিন এবং রূঢ়। জনক শূরসেনের মুখেই এই ঋষির ক্রোধ সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা শুনলে তুমিও অস্থির বোধ করবে। বৃষ্ণিবংশের রাজা নারায়ণের গৃহে একদিন ভর-দুপুরে দুর্বাসা হাজির। তাড়া হুড়ো করে তাঁর আহারের ব্যবস্থা হলো। আহার করতে গিয়ে তপ্ত অন্ন ব্যঞ্জনে তাঁর হাত পুড়ে গেল। তাতেই ঋষি ক্ষেপে গিয়ে রাজার বুকে পদাঘাত করলেন। গোষ্ঠী কোন্দলে বিভক্ত এবং সমর শক্তিতে দুর্বল রাজা প্রতাপশালী মগধ সম্রাটের কথা বিবেচনা করে অসম্মান, অপমান বুক পেতে গ্রহণ করলেন। বুঝতেই পারছ কুচুটে স্বভাবের এই মানুষটা হৃদয় বলে কিছু নেই। দম্ভে, অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে শুধু সংঘাত সৃষ্টিই এঁর উদ্দেশ্য। দুর্বাসা ভালো করেই জানে প্রতিপক্ষ যদি তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়, মন্দ আচরণ করে তা-হলে তার উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেবেন।

কৌতুকহাস্যে ভোজরাজের মুখ কোমল হলো। চোখের চাহনিতে জীবন রহস্য বোঝার কৌতুক। বললেন ঃ ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বনের অবাধ্য হিংস্র পশুকেও স্নেহ ভালোবাসা, মমতা দিয়ে পোষ মানানো যায়, আর একজন বদ মেজাজী মানুষকে বশীভূত করা যায় না; আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাযোগ্য হয়ে উঠার উপর নির্ভর করে চিত্তজয়ের সাফল্য। ভালোবাসা মমতা, দরদ চিত্তজয়ের মন্ত্র। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেতে হয়। বিনা হৃদয়ে, হৃদয় পাওয়া যায় কোথায়? বেশির ভাগ রাজাই দাস-দাসী দিয়ে অতিথির পরিচর্যা ও সেবা করে থাকে। মুনি ঋষিরা তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে, তাঁদের বুভুক্ষিত অন্তরটা গৃহী মানুষের সংস্পর্শে ভরে উঠে না। প্রত্যাশা অপূরিত থেকে যায়। কেউ কেউ এই দূরত্বে অসহিষ্ণু বোধ করে। ঋষি দুর্বাসা সেই প্রকৃতির মানুষ। জরাসন্ধ যদি নিজের স্বার্থে ও কার্যে তাঁকে ব্যবহার করতে পারে তা-হলে অন্যেরা তাঁকে পারল না কেন? এই প্রশ্নটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। হয়তো একটা গভীর পারিবারিক মেলামেশা এবং আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে ঋষির মন ও প্রকৃতি নমনীয় হতে পারে। প্রত্যাশা পূরণ হলে অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ থাকে না। বেশির ভাগ মানুষ সেটা বোঝে না কিনা—তাই শেষ রক্ষা করতে পারে না তারা। আমার এই উপলব্ধির কূট প্রয়োগ এবং সফল রূপায়ণ তোমার কর্মকুশলতা এবং চাতুরীর উপর নির্ভর করছে। ভোজরাজ্যের ভাগ্য তোমার হাতে অর্পণ করলাম।

বিবর্ণ ভয়ে মুখখানা আমার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললাম ঃ এ কাজের যোগ্য কিনা নিজেও জানি না। তা-ছাড়া আমি মেয়ে। ভালো করে রাজনীতি বুঝিনা। পুঁথিগত বিদ্যে আর শেখা বুলি দিয়ে তর্ক করে হাততালি পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে তা দিয়ে কতখানি স্বার্থ নিরাপদ করা যায় বুঝি না। রাজনীতিতে এমন অনেক কিছু ঘটে যায় যা না ঘটলে মানুষের জীবন ও ইতিহাস এমন দুর্ঘটনাবহুল হতো না। আমি সামান্য বালিকা। জটিল মানব চরিত্রের কতটুকু বুঝি? আমার অভিজ্ঞতাই বা কি? কোন ভরসায় আমাকে এত বড় দায়িত্ব দিচ্ছ? আমার ভয় করছে? দোহাই, এত বড়

শাস্তি দিও না।

তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। আমার কোন পুত্র নেই। তোমাকে পুত্রের উপযুক্ত করে শিক্ষা-দীক্ষায় তৈরি করেছি—সে কি ভয় পাওয়ার জন্যে? মেয়ে বলে নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছ না। কিন্তু একটা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বুদ্ধি এবং যোগ্যতার কোন তফাৎ নেই। দায়িত্ব অর্পণ না করে মেয়েদের আমরা অকেজো করে রেখেছি। অযোগ্য ভাবতে তো তাদের আমরা শিখিয়েছি। তাই, আত্মবিশ্বাসে মেয়েরা বড় দুর্বল। দায়িত্ব নেয়ার চেয়ে তাদের ভয় অভিযোগের, ব্যর্থ হওয়ার লজ্জার। একজন ছেলের এই ধরনের সংকোচ দুর্লভ ঘটনা। এক্ষেত্রে সাহসই সব। ছেলেদের চেয়ে তুমি কম কি সে? বাস্তবে মেয়েরা চিরকাল পুরুষদের চেয়ে বেশি দায়িত্বপূর্ণ। সংসারের সন্তানের সব দায়িত্ব তো তারা বেশি পালন করে আসছে। সেখানে তাদের পারদর্শিতা, কুশলতার কোন তুলনাই হয় না। তা-হলে নিজেকে অযোগ্য ভাবছ কেন? একজন জংলী রমণী বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করছে। সেও শিকার করছে, পশুর মাংসকেও কেড়ে খাচ্ছে। সবটা• মনের ব্যাপার। নিজের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। মন শক্ত হলে ভয়ও দূর হয়ে যায়।

আমি সামান্য রমণী। আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আস্থা অর্জনের কোন কাজ আমি করেনি।

সে পরীক্ষার সুযোগ তো আসেনি। তাই কী পার, আর পার না তা তুমি নিজেও জান না। যোগ্যতা-অযোগ্যতা কোন পরীক্ষাই তোমার হয়নি। আমার বিশ্বাসটা একবার তোমাকে দিয়ে বাজাতে চাই।

পরীক্ষা দেয়ার দুঃসাহস আমার নেই। আগুন নিয়ে খেলা করতে পারব না।

ভোজরাজ দৃঢ়তার সঙ্গে বললঃ এদেশের অন্ধকার আকাশে তুমি একমাত্র তারকা। আমার আশা, ভরসা সব। যে কোন দামে, যে কোন প্রকারে যোগ্যতার পরীক্ষায় তোমাকে বসতে হবে। হার-জিত ভাগ্যের খেলা। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানুষ তার স্খলন, পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল ভ্রান্তি নিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ। সব কিছুর ভেতর দিয়ে না গেলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ভুল করলে মানুষ অভিজ্ঞ হয়। অভিজ্ঞতার জন্যে অবশ্যই দাম দিতে হয়। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠকে শেখে।

ভোজরাজের আহ্বানের মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে, না করার ক্ষমতা ছিল না আমার। কর্তব্যের বোঝা চিরকাল আমার মতো মেয়েদেরই জন্যে। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিরুপায় হয়ে মনে মনে বলি—সুখ-দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, সফল-অসফল, জয়-পরাজয় যাই উপস্থিত হোক নিঃশব্দে, নির্লিপ্তভাবে মেনে নিয়ে অবিচলিত থাকি যেন।

আমি ঠকে শিখেছিলাম। কথাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুকের গভীর থেকে উঠে গেল। মনের ভেতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে। কিন্তু তার কোন অনুভূতি নেই আমার মধ্যে। অবচেতনের গভীর সেই স্মৃতি নির্বাসন দিয়েছি। তবু কী বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি।

আড়াচোখে দুর্বাসাকে দেখছি। নিবিড় ঘুম পাওয়া দুটি চোখের মতো তাঁর চাহনি। স্বপ্ন জমে আছে যেন। স্বপ্নালু চোখের উপর বাঁকা ধনুকের মতো দু'খানি ভুরুর রেখা ছাড়া মুখের আর কিছু দেখছি না। দাড়ি গোঁফ ভর্তি গালের ফাঁক দিয়ে মুখের যে অংশটা বেরিয়ে থাকে সেখানকার রেখাগুলোও আমার চোখে পড়ছে না। স্বপ্নালু দুটি চোখের মায়াবী আকর্ষণ থেকে অবুঝ দৃষ্টিকে কিছুতে সরিয়ে নিতে পারলাম না। দুর্লভ অপার্থিব দৃষ্টির মুগ্ধতা আমার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। কী এক অনির্বচনীয় প্রাপ্তিতে মন ভরে উঠল।

হঠাৎ ভোজরাজের কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙল। মহর্ষি আমার কন্যা কুন্তী। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললঃ দাঁড়িয়ে কেন? প্রণাম কর।

যন্ত্রবৎ ভোজরাজের আদেশ পালন করলাম। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেছি। আমার অস্বাভাবিকতা ভোজরাজের নজর এড়াল না। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে

আছে। সে চোখে ভর্ৎসনা নেই, তিরস্কারও না। আছে শুধু জিজ্ঞাসা আর উদ্বিগ্ন অসহায়তা।

গভীরে খুব গভীরে জন্মান্তরের মতো বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত আমার নানা রঙের দিনগুলো জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলো অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেলেও তার স্মৃতি একটুও ঝাপ্সা হয়নি। ব্রুণরেখা অটুট আছে তার। এসব আমি ভুলি কি করে? আমার জীবনের সমস্ত ভুলভ্রান্তি, অপরাধ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সব নিয়ে আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে সবিনয় নিবেদন করছি নিজেকে। লুকোনোর কোন চেষ্টা আমি করব না। আমার আমিকে উজার করে দেখাতে চাই কালান্তরের প্রেক্ষাপটে। আমি প্রার্থনা করছি যদি কোথাও কেউ থাকে আমার ভাগ্য নিয়ন্তা তবে এই অন্তবর্তী সময়টা পার করে নিয়ে চল ভোজরাজ্য।

জীবন রহস্য বোঝার বয়স হয়েছে তখন আমার। যৌবনের ঢল নেমেছে দেহে। দিন দিন সুন্দর হচ্ছি দেখতে। দর্পনের সামনে দাঁড়ালে চোখ ফেরাতে পারি না। নেশার মতো চেয়ে থাকি। বড় বিস্ময়ে লাগে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে! কত সব অদ্ভুত প্রশ্ন, কৌতুহল, আকাঙ্ক্ষা আগুনের ফুলকির মতো রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। কজ্জলিত দুই আঁখির তারায়, দৃষ্টিতে যৌবনের চলপতা, অধরে উচ্ছলিত হাসির নির্ঝর। উদ্ধত দুটি পয়োধর মদগর্বিত যৌবনের দুটি দুর্গ যেন। আমার পল্লবিত যৌবনের গর্ব। আমার নারীত্বের শোভা। দেহবল্লরীর সুধাগন্ধে আমার প্রাণমন আকুল। এ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছি আর প্রতিমুহূর্ত নতুন হয়ে উঠছি। দেহের সৌন্দর্য নারীকে বিকশিত করে। তাঁর সব রূপই দেহে পোশাকে, আভরণে, অলঙ্করণে, খুশিতে ভালোলাগায়, আনন্দে মাখামাখি হয়ে আছে যেন। প্রকৃতির রূপ পাহাড়, অরণ্য, প্রান্তর, দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশ, নদীনালা বিধৌত পল্লীর শোভা দেখলে যেমন খুশি হয় তেমনি আমাকে দেখে দুর্বাসার যে ধরনের খুশি হয় তার গভীরতর অর্থ বুঝতে ভুল হল না কোন মেয়ের সে যে বয়েসেরই হোক না কেন। খুশিতে আমার বুক ফুলে ওঠে। তখন সারা শরীর গান গেয়ে ওঠে। মম যৌবন নিকুঞ্জ গাহে পাখি গান।

দুর্বাসা আমার আতিশয্যে, আতিথ্যে, আপ্যায়নে, সান্নিধ্যে এত বেশি খুশি হতেন যে তাঁর কাছে থেকে একটু সরে থাকার উপায় ছিল না। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লেপ্টে থাকতাম। সেবা, শুশ্রুষা ছাড়াও আহার বিহারেও আমাকে সঙ্গ দিতে হয়। আহারের ব্যবস্থা, পুজার আহ্নিকের বন্দোবস্ত সেও করতে হয় আমায়। অন্য কেউ করলে ঋষি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। অভিশাপের ভয় দেখাতেন। শাপের ভয়ে পরিচারিকারা ঋষির ঘরে পর্যন্ত ঢুকত না। এড়িয়ে চলত তাঁকে। বাধ্য হয়ে আমাকেই ঝক্কি সামলাতে হতো। রাগের বশে যদি কোন শাপ-মন্ত দেয়, তাই না করতাম না। আশ্চর্য! সংসারে, মায়া মোহ, স্নেহ-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে যে মানুষ সিদ্ধ যোগী, পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন সেই মানুষটা একেবারে শিশুর মতো। লোকের কাছে খ্যাপা দুর্বাসা, কিন্তু তাঁর ভেতর কোন খাপামি তো কোনদিন দেখেনি। শিশু যেমন জননীর কাছে আশ্রয় নেয় তেমনি আমি তাঁর আশ্রয়, তাঁর অবলম্বন। বিস্ময় লাগতো বাইরে যে মানুষটা এত কঠিন, ভেতরে তিনি এত দুর্বল, এত নরম। সেই বয়সে প্রথম অনুভব করলাম বাইরের অবলম্বনগুলো যখন ঘুচে যায় তখন শিশুর মতো আশ্রয় নেয় নারীর কাছে। প্রেমের কাছে, আত্মিক আশ্রয় খোঁজে। প্রেম পিপাসিত বলেই বোধ হয় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবু মনের মানুষটা না পাওয়ায় বোধ হয় তৃষ্ণা মেটেনি। প্রেমই হয়তো আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষিকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

সাত দিনের বেশি কোথাও আতিথ্য নেননি। কুন্তী ভোজের গৃহে আমার নেশায় প্রথম থিতু হয়ে বসলেন। তাঁর হৃদয়ের খুব কাছে বসে বুকের কলধ্বনি শুনেছি হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে—নিশি ডাকের মতো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তার বুকের অভ্যন্তরে। ঐ ডাক তাঁকে স্থির হতে দেয় না। একদিন সখেদে বললেনঃ জান কুন্তী। মানুষ যে কি চায় নিজেও ভালো করে জানে না। ব্রহ্মচারী হয়ে কি পেয়েছি? আমার বুকে এত জ্বালা কিসের? কার উপর অভিমান করে এত রেগে যাই? কোন অতৃপ্তি আর অভাবে আমি খ্যাপা দুর্বাসা হয়েছি? এমন তো হতে চাইনি আমি। তবু মাঝে মাঝে বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ঈর্ষায়, বিদ্বেষে, ঘৃণায়, ক্রোধে, পাষণ্ডের

মতো দায়িত্বহীন কাজ করে বসি। কত মানুষকে নিষ্ঠুর ক্রোধে, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো অভিশাপ দিয়েছি, দৈহিক নির্যাতন করেছি। পরে, কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এখানে আসা অবধি নানা ঘটনার মধ্যে সে সব কথা মনে হয় খুব। তাদের সঙ্গে তোমার কত তফাৎ? আমাকে তুমি অবাক করেছ। বেশ বুঝতে পারি আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। তার সব কৃতিত্ব তোমার। আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গেছি। ফুলের গন্ধের মতোই ভালো মানুষের মনের গন্ধও আপনি ছড়িয়ে যায় অন্যের মনে। তেমনি করে আমার মনের মধ্যে ছড়িয়ে আছ তুমি। তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলছি, আমি ক্লান্ত, আমি রিক্ত। আমার ভার তুমি নাও। আমায় একটু করুণা কর। কথাগুলো বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ডুবুরীর মতো আমার দু'চোখের গভীরে ডুবিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে রইল।

তাঁর কথাগুলো হঠাৎ করে বুকের মধ্যে কী যেন সব গলিয়ে দিল। কী যেন নয়, পুরো বুকটাই যেন গলে গেল। আমার ভেতর অত বড় ঋষি যে কি দেখেছিলেন তিনিই জানেন। কাঙালের মতো অল্প বয়স্কা মেয়েটির সান্নিধ্যে, সঙ্গ সেবা, যত্ন, পরিচর্যা এত বেশি চাইতেন 'না' বলতে বুক ভেঙে যেত। দিন দিন আমিও বদলে যাচ্ছি। আমার চোখে রঙ, বুকে সুর। ভালোবাসি, ভালোবাসি বলে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।

যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে উঠল আমার ভেতর এক চিরন্তনী নারী। সেই প্রথম অনুভব করলাম পুরুষ মনের উত্তাপ পাবার জন্যে একটা তৃষ্ণা তৈরী হয়েছে আমার বুকের অভ্যন্তরে। পুরুষমনকে আকর্ষণ করার প্রবণতাও সেই প্রথম। জীবনের ধর্ম প্রকাশ করা। উদ্ভিন্ন দেহে কিশোরীব মনে জেগে ওঠা নারীত্ব; সাজ-সজ্জার ভেতর দিয়ে পুরুষের কাছে মেলে ধরে। নিজেকে আবিষ্কার করে। মনের আয়নায় রূপ, যৌবন এবং সৌন্দর্যকে দেখে। রূপচর্চা হলো নারীর সৌন্দর্যচর্চা। তার মনের এক ধরনের প্রকাশ। মনের মাধুরী মিশিয়ে নারী সাজে; পুরুষের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠার জন্যে। পুরুষকে তৃষ্ণার্ত করা, তার তৃষ্ণাকে আরো বাড়িয়ে তোলার এক খেলা। রূপচর্চায়, সাজ-সজ্জায় নারী কোন বয়স মানে না। সাজ-সজ্জা, রূপচর্চার কোন বয়স নেই, সময় নেই, কোন মাপকাঠি নেই। নিজে সেজে খুশি হওয়া, দিয়ে সুখী হওয়াই নারীর মনের ধর্ম। কারণ, দেয়াটা তার নিজের ক্ষমতার মধ্যে, পাওয়াটা তার হাতের ভেতর নয় বলেই নিজেকে উজার করে দিয়ে পুরুষকে চায় নারী। চায়, তার প্রেমিক পুরুষটি উপর শর্তহীন প্রভুত্ব, প্রণয়ীর নিঃশর্ত দাসখৎ। জেতাতে যেমন তার সুখ, দখলেও তেমন আনন্দ। নারী দুটোই চায়।

পরিণত মন দিয়ে নারী মনের যে রহস্যের কথা বললাম, পঞ্চদশী কুন্তীর সত্তার গভীরে সেই চেতনাই তাকে দুর্বাসার দিকে প্রবলবেগে টানছিল। দুর্বাসার সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে বুকের মধ্যে কার পদধ্বনি শুনতে পেতাম যেন। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধারণাটা। সম্পর্কটা আমি বুঝতে পারছি বুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে। ফুলের উপর আলো পড়লে তার পাপড়িগুলি যেমন মেলে ধরে অনেকটা তেমনি এক উন্মুখ চাওয়ার কাছে নিজের সত্তাকে মেলে ধরেছি। ফুল যেমন জানে না ফল ফলাবার নির্দেশ এসেছে তার কোন অলক্ষ্য থেকে, তেমনি আমিও জানি না এই অদৃশ্য উৎফুল্ল হওয়ার ভেতর কিসের নির্দেশ আসছে।

ঘটনাগুলো পর পর বলা হচ্ছে কিনা জানি না। পর পর যে বলতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বহু বৎসরের ব্যবধানে স্মৃতিতে, ভাগ্যে তা এক অন্যরূপ নিয়েছে। আবেগ মুগ্ধতা, বিপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবন-বৃত্তান্তের আর আগেও নেই, পরেও নেই। এখন ঐ দিনগুলো একই সময়ে আমার মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে শুধু বর্তমান। আমি তাকেই দেখছি। এটা স্মৃতি নয়, বর্তমান। ক্ষণে ক্ষণে আমি তার মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছি। আমাকে স্পর্শ করে আছে গোটা অতীত।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঋষির শয্যার পাশে বসে তাঁর পদ সেবা করছি। কুলুঙ্গীর বড় বড় দীপের স্নিগ্ধ আলোয় কক্ষ বেশ উদ্ভাসিত। আড়চোখে ঋষিকে দেখছি। অনুরাগের বর্ণচ্ছটা মিশিয়ে মুগ্ধ চোখে ঋষি আমাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তে নম্র লজ্জায় ভেতরটা নুয়ে এল, ভয়ও হলো। ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মতো আমি কাঁপছি। আমার অবস্থা দেখে মৃদু মৃদু হাসছেন ঋষি। শরমে মাথাটা আরো নুয়ে এল ঋষির পায়ের দিকে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। মনে মনে দ্রুত কত ধরনের কথা বলছি নিজের সঙ্গে। হঠাৎ ঋষিবর বললেন : জান কুন্তী, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তোমার চোখে উপর চোখ মেলে ধরার জন্যে এমন আকুলি বিকুলি করে ভেতরটা যে আর স্থির থাকতে প্যারি না। একে কি তুমি দোষ বলবে?

ঋষির জিজ্ঞাসার জবাবে কী বলব আমার জানা নেই। চিত্রার্পিতের মতো তাঁর তৃষিত চোখের সামনে চুপ করে বসে আছি। অনন্ত সময় চলে যাচ্ছে। তবু তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারলাম না। কেন জানি না, নিজের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি প্রাণপনে। কিন্তু ঋষির কোন অভিব্যাক্তি নেই। স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

হঠাৎ ঋষি শুধালেন : লজ্জা? লজ্জা কিসের? তুমি তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ। উপনিষদ বলেছে, যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হলো তখন ব্রহ্ম একা। সৃষ্টি কর্তার মনে কোন সুখ নেই। দুঃসহ একাকীত্ব এবং সঙ্গীহীনতায় তাঁর সময় কাটে না। একা তাঁর ভালো লাগল না। একা থাকার মধ্যে কোন রস পান না, আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না বলেই তিনি নিজেকে দুই করলেন। তখন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে তৈরী এক বিচিত্র বিশ্ব এল। ব্রহ্মা নিজে বলে উঠলেন—আনন্দ রূপমৃতং যদ্‌বিভাতি। পৃথিবী সুন্দর হলো। আকাশের দিকে চেয়ে সৃষ্টিকর্তা বললে তুমি সুন্দর, সুন্দর হলো সে। ব্রহ্মার সবচেয়ে যে প্রকটরূপ তা আনন্দস্বরূপ। তিনি রসিক, রসপ্রিয়, রসলোভী। রস অনুভব করে তিনি আনন্দ পান। আর রস তো একা অনুভব করা যায় না; তার জন্য চাই আর একজন। দুয়ের জানাজানি পরিচয় প্রীতি; এ না হলে রসের ধারা বইবে কি করে? এই যে দ্বিতীয় সত্তা মানুষের ক্ষেত্রে সে হলো নারী। তার মানে পুরুষ কিংবা নারী একটি মানুষরূপের অর্ধেক মাত্র। তাই তো সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে দুজনের প্রতি দুজনের সমান টান। দুজন ছাড়া দুজন পূর্ণ হয় না। এই সম্পূর্ণ হওয়ার টান নারী পুরুষের ভেতরে থেকে গেল। এই সম্পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তার প্রেম। প্রেমে মানুষ পূর্ণ হয়। তুমি এসব কথা জান?

ঋষির প্রত্যেকটি কথা আমার কানে, মনে, বুকে এমন করে গেঁথে গেল যে এক দারুন মুগ্ধ চমকে বিজুরীর মতো চমকাতে লাগল আমার ভেতরটা। আড়ষ্ট লজ্জার ভাবটা আর নেই। নারীর স্বভাবের মধ্যে নিজের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখার একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। সংকোচ, কুণ্ঠা তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ যন্ত্রনা দেয়। তবু পুরুষের কাছে নিজের আনন্দ, সুখ, ভালোলাগাকে উন্মোচিত করে না কোন নারী। পুরুষের কাছ থেকে নিজেকে লুকোনো, নিজেকে অনাসক্ত করে, নিজের মূল্যকে, অভাবকে আরো তীব্র করে তোলার প্রতীক্ষার ভেতর এক প্রতিকারহীন যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায়।

বুকে উথাল পাথাল ভাব। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ি।

প্রশ্রয় ভরা উজ্জ্বল চোখ মেলে অনিমেষ তাকিয়ে আছে ঋষির দিকে। চোখের মধ্যে ঋষির চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল যেন একটুও উপছে পড়ে বাইরে নষ্ট না হয়। সব মেয়েই পুরুষের এই চাউনির অর্থ বোঝে। ভয়ার্ত গলায় বললাম : অনেক হয়েছে। এবার ফেরান চোখ। আমি সইতে পারছি না ওই দৃষ্টি। ভয় করছে।

তড়াক করে দুর্বাসা বিছানায় উঠে বসল। আমার খুব কাছে সরে এল। নিমেষে হাতটি তুলে নিল তাঁর হাতে। বাধা দেয়ার শক্তি ছিল না আমার। হাতটি খুলে ধরলাম তাঁর করপদ্মে। ঋষি হাতের উপর গাল রাখল, চুম্বন করল। বুকে চেপে ধরে আদর করল। আমার সারা শরীরে সিরসিরানি উঠল। আঙুলের আঙুলের উষ্ণতায় মিলন হলো। কতক্ষণ জানি না—হাতটা ঋষির হাত থেকে টেনে নিলাম। এক অজ্ঞাত রহস্যলোকের পর্দাটা সরে গেল। আমি অনুভব করলাম, পুরুষের অনেক কিছুই নারীর শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। ছোঁয়া লাগলে সমস্ত শরীর গলে যেতে চায়।

দুর্বাসার অর্ধনিমিলিত দুই চোখের তারায় বিভোর বিহ্বলতা। বলল : রাগ হলো তো? আমি খুব খারাপ তাই না?—যেন অপরাধ রাখার জায়গা নেই।

কেমন একটা ভয়ে জড়সড় হয়ে মাথা হেঁট করে নিচের দাঁতের উপর ঠোঁট কামড়ে বলি :

আমি তো কিছু বলেনি। নারীর সান্নিধ্য, তার সাহচর্য আপনি তো জীবন ভোর চান নি, কিংবা নেয়ার সাহস হয়নি, অথবা ইচ্ছে হয়নি বলে নারী থেকে দূরে থেকেছেন। আজ, আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটা মেয়েকে ঘরে একা পেয়ে উপোসী পুরুষের মতো এভাবে চাইছেন কেন? আপনার কোন কঠিন পরীক্ষার কাছে আমার আত্মসংযম পাছে হেরে যায় তাই—বলে চুপ করে যাই।

দুর্বাসার চোখে উপোসী ভিখেরীর ক্ষিদে জ্বলজ্বল করছিল। বলল : কেই বা কাকে বোঝে? নিজেকেই বা কতটুকু চিনি? ঋষি হলেও আমিও একজন রক্তমাংসের মানুষ।

দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে পাছে অভিশাপ দেয়, তাই সন্তুষ্ট করার জন্যে তাঁকে বলি : আমার কথাটা আপনি একটু বুঝুন। একবারও ভাববেন না যে আমার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কোন ইচ্ছে পূরণ করার মধ্যে যেমন তীব্র সুখ থাকে, তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে অন্য এক মহান আদর্শ, ব্রত এবং ধর্মকে রক্ষার করার মধ্যেও তেমনি একটা সুখ চাপা থাকে।

আমি কি জানি, আমার মধ্যে এক ভোলা মহাদেব আছে। তার মুক্তি, আনন্দ, সুখ গৌরীর মতোই এক রমণীর কাছে আত্মসমর্পনে। এটা বোঝার কথা কুন্তী, বোঝানোর নয়। উপনিষদে পুরুষ যে দ্বিধা বিভক্ত করেছিল নিজেকে, সেই ছিন্ন দু'ভাগের মধ্যে পরস্পর মিলিত হবার, সম্পূর্ণ হবার টান তো রয়েই গেল। ঋষি হলেও সে মুক্ত নয়। সত্যি কথা বলতে কি, অমন যে যোগীবর মহাদেব তিনিও পারেননি গৌরীর টান থেকে দূরে থাকতে। মহাদেবের বুকে গৌরী নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাল — স্বামী ও কার ছায়া তোমার বুক জুড়ে আছে? ও কে? মহাদেব গৌরীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলল : প্রিয়তমা, এ তুমি। আমি তোমাকে আরো কাছে পেতে চাই। ঐ ছায়ার মতো তোমার মধ্যে মিশে যেতে চাই। এমন দূরে দূরে, আলাদা করে নয়, তোমার সমস্ত অঙ্গের স্পর্শ আমি চাই। যাতে বাঁধা পড়বে আমার নিত্য আলিঙ্গনে। শব্দ আর অর্থকে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি আমি তুমি এক অঙ্গে দুই রূপ হয়ে থাকব। তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা আমি চিন্তা করতে পারি না।

গৌরী উৎফুল্ল হয়ে বলল : খুব মজা হবে। এক অঙ্গে আমরা দুজন অর্ধ নারীশ্বর হয়ে শোভা পাব। তোমার অর্ধেক আর আমার অর্ধেক অঙ্গ নিয়ে হবে এই যুগল রূপ। সমস্ত গায়ের স্পর্শ আমি চাই, যাতে তুমি বাঁধা পড়বে আমার নিত্য আলিঙ্গনে।

মহাদেব বলল : তাই হোক।

কথাগুলো বলা শেষ হওয়ার পরেই দুর্বাসা হঠাৎ-বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাঁর ভূজবন্ধনে এমন নিবিড় করে বাঁধল যেন একটু নড়া-চড়া করতে না পারি। তাঁর তৃষ্ণার্ত মুখ আমার মুখের উপর নেমে এল। আমি চেষ্টা করছি ঋষির আগ্রাসী চুম্বন থেকে নিজেকে সরাতে। ভূজবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করছি। কেন করছি কে জানে? হয়তো পুরুষের তৃষ্ণাকে, উত্তেজনাকে নিয়ে সব নারীই এই খেলা খেলতে ভালোবাসে। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে হেরে যায়। তেমনি আমিও পরাজিত হলাম। দুর্বাসা রুক্ষ, উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল আমার নরম ঠোঁটের সমস্ত স্নিগ্ধ সিক্ততা। মুখে বলছি, আঃ কি করছেন? লাগে-লাগে, ভাল্লাগে না—এরকম বর্ব্বরতা মানায় না। মুখে যাই বলি না কেন আমার সারা শরীর গান গেয়ে উঠছে। মুখের ভেতর তাঁর মুখের স্পর্শ লেগে আছে। তবু আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

দুর্বাসা আমাকে বাহুবন্ধন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি বিশ্রস্ত বসন গুছিয়ে নিচ্ছি, এলোমেলো চুল ঠিক করে নিচ্ছি।

মুখে কিছু বলছি না দেখে লজ্জিত ঋষি হতাশ গলায় নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে স্বগতোক্তি করল যেন। বলল : মানুষ মাত্রেই কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে। যা তাকে মানুষ হিসেবে হাস্যস্পদ করলেও মানুষ হিসেবে হয়তো পূর্ণতরও করে তোলে। মানুষ তো আর দেবতা নয়। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রের অপূর্ণতাই তাকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলে অকস্মাৎ। তাকে কি কেউ দোষ বলবে?

ভালোবেসে কিছু চাওয়াটা কখনো দোষের হয় না। তাকে বর্বরতা করা বলে না।

দুর্বাসার স্বগতোক্তির জবাবে বললাম না কিছুই। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

সেদিন রাত্রে আর ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ঋষির স্পর্শটা গায়ে লেগে রইল। এরকম একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে যে আমার অনুভূতির রূপ, রঙ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের স্বাদটাই বদলে দিতে পারে চিন্তাই করেনি। আমার জীবনে সে প্রথম পুরুষ।

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে ভালো লাগছে। আমরা দুজনে কাছাকাছি বসে আছি। নীরব অন্ধকার আমাদের সব অস্তিত্বকে ঢেকে দিয়েছে। দুজনের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কুলুঙ্গীতে রক্ষিত নিবাত নিষ্কম্প মৃদু দীপ শিখার অনুজ্জ্বল আলোয় আমাদের যুগল ছায়া দীর্ঘাকৃত হয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে। এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে আমি আবিষ্ট।

কখন যে ঘুমে দু'চোখের পাতা জুড়ে গেছে জানি না। রাতের স্বপ্নে দুর্বাসা চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকল। পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে কুন্তী বলে ডাকল। ঐ ডাক শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। বুকে সাগর উথলে উঠল। নিজের শরীর মনকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হলো। তবু সাড়া না দিয়ে ঘুমের ভাণ করে চুপ করে থাকলাম। প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করছি ঋষি গায়ে হাত দিয়ে ঘুম থেকে কখন জাগিয়ে তুলবে? আদর করে বুকে টেনে নেবে। সময় বয়ে গেল। সাড়া না পেয়ে এক বুক অভিমান নিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। আর আমি চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা বুকে করে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছি। চোখের জল বাঁধা মানছে না। মন যাকে তীব্রভাবে চায় তাকে এভাবে 'না' বলে ফিরিয়ে দেয়ার যন্ত্রণা কী দুঃসহ, তার অনুভূতি হলো। বুকে প্রেমের কল্লোল সেই প্রথম। একটা ভয়ও হলো। ভয়ের কারণ, মনটা তো শরীরের মধ্যে থাকে। শরীর ছাড়া মনের বয়স কোথায়? মনের মন কখন কি করে বসে সেটা জানা না থাকলে ভয় হয়। এক নিষিদ্ধ অথচ তীব্র ভালোবাসার ভয়ার্ত আভাসে ভেতরটা জ্বর জ্বর লাগল।

পাখির ডাকে সহসা ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের বিষাদটা দেহমন ভরে রয়েছে। আমার শরীর শিথিল। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই যেন।

আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমি জানি না এই অনুভূতির উৎস কোথায়—শরীরে না মনে? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে? মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ স্বপ্নটা একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে।

মানুষের শরীরেরও বোধ হয় একটা গন্ধ আছে। প্রত্যেকের গায়ের গন্ধ আলাদা। বোধ হয় প্রত্যেক ফুল এবং প্রাণীর গায়ের গন্ধের মতো আলাদা আলাদা। পোষা কুকুর, বিড়াল, গরু চলে গেলে বাতাসে যেমন তাদের গায়ের গন্ধ লেগে থাকে তেমনি মানুষের গায়ের গন্ধও নাক চেনে। মানুষও। কিন্তু মানুষ যেহেতু পশু নয় গায়ের গন্ধটা তার বাতাসের গায়ে লেগে থাকে না। যে তাকে ভালোবাসে, শুধু সে নিশ্বাসের মধ্যে তার ঘ্রাণ পায়। কিন্তু একজন না পছন্দ মানুষের সঙ্গে আমার সব ভালোলাগা, না-লাগা যে এমন করে জড়িয়ে যাবে কখনও ভাবেনি। ভাবতে খুব মজা লাগে, ঋষি দুর্বাসার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ একটু নয়-চারগুণ। তবু ঐ মানুষটা এক লহমায় জীবনের বড় বড় বাধা নিষেধের পাহাড়গুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে লজ্জা, ভয়, সংকোচ, দ্বিধার আড়াল ভেঙে ফেলে আমার শরীর ও মনের দখল নিয়েছে। আমার আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। আমার শরীরের মধ্যে যে মন বাস করে যুগান্তরের ঘুম থেকে তাকে জাগিয়েছে। আমায় আমিকে দেখলাম, চিনলাম। এক নতুন নারী হয়ে উঠলাম। হঠাৎ পাওয়ার শারীরিক বিস্ময়, একটা সুখকর অনুভূতি, আনন্দ, উত্তেজনায় আমার ভেতরটা ভরে গেল। শরীরের মধ্যে যে এত সুখ অসামান্য আনন্দের উৎস লুকোনো আছে, দুর্বাসার সান্নিধ্য না পেলে বোধ হয় জীবনভোর অজ্ঞাত থেকে যেত।

আমার জীবনে সেই প্রথম প্রেমের অনুভূতি। দুর্বাসাকে আমি হৃদয় দিয়ে বসেছি। ঋষির শাপের

ভয়ে নয়, তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্যেও নয়, ভোজরাজকে প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্যে নয়, দুপক্ষের তীব্র আসক্তি আর আনন্দঘন আশ্লেষে একে অন্যকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার সুখকার অনুভূতিতে আমার হৃদয়পাত্র ভরন্ত কলসের মতো ভরে যেত আবেশে। সেই ভাললাগার কোন বয়স নেই। সময় নেই। মনই সব। মনের মন তো আগে থেকে পরিকল্পনা করে কাউকে ভালবাসে না। একসঙ্গে থাকতে থাকতে ভালবাসা হয়ে যায়। যুগল মনের মন্দিরে শরীরের দীপ জ্বেলে আরতি করার পরেই পুরুষ ও নারী পরস্পরকে খুঁজে পায়। কিন্তু সে খোঁজা, সে পাওয়া কোনদিন শেষ হয় না, সেই সঙ্গে জানারও। হারিয়েও যেন কিছু হারায় না।

আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করে দুর্বাসা তো তোমাকে ভালোবেসেছিল তাহলে তোমায় ত্যাগ করলেন কেন? তুমি তো বিশ্বাসভঙ্গের কোন কাজ করনি তাঁর সঙ্গে। সরল মনে নিষ্পাপ প্রেম উজাড় করে দিয়েছ। তবু তোমার প্রেমকে অপমান করলেন। প্রেম-প্রীতির গর্ভে অনবধানে যাঁর এক ফোঁটা ঔরস পড়ে অলক্ষ্যে দিনমাস ধরে যে রক্তমাংসের দলাটা তুমি লালন করলে, তার প্রতি একটু মমতা কিংবা দরদবোধও কি তাঁর নেই? তস্করের মতো সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, নিঃস্ব করে চুপি চুপি যে পালাল; প্রেমের সেই বিশ্বাসঘাতকের উপর তোমার ঘৃণা হয় না? সে তোমাকে দিয়েছে কি? তোমার নিষ্পাপ মাতৃত্বের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। শত্রুপক্ষের লোক মিত্র হয় না কখনও একথাটা তোমার মতো বৃহস্পতির কূট রাজনীতি জানা মেয়ের বোঝা উচিত ছিল। তবু মোহে পড়ে তোমার শেখা বিদ্যে জলাঞ্জলি দিলে। মাদার গাছে গা ঘষলে তারা কাঁটায় দেহ রক্তাক্ত হয়। তেমনি শত্রুর সঙ্গে মেলামেশারও একটা পরিধি আছে। তাকে অতিক্রম করলে মূল্য দিতে হয়। তোমার কষ্টের জন্যে তুমিই দায়ী। জরাসন্ধের ভয়ে দুর্বাসার মনোরঞ্জনার্থে কুন্তীভোজ তোমাকে ব্যবহার করেছে। সুযোগ পেয়ে ঋষি তাঁর তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। তোমার জন্য তার প্রাণে একটু মমতাও ছিল না।

অভিযোগটা অস্বীকার করার মতো জোর পাই না মনে। সত্যি তো, কুন্তীভোজের গৃহ ছেড়ে যেদিন চলে গেল সেদিন একবারও আমার কাছে বিদায় নিতে এল না। বলল না : চলে যাচ্ছি। নির্বোধের মতো বিশ্বাস করে ঠকেছি। ভোজরাজকে কৌশলে জিতিয়ে দিতে গিয়ে হেরে গেছি তাঁর কাছে। আমার মতো অনেক মেয়েই প্রেমাস্পদের কাছে হেরে যায় ইচ্ছে করেই। হেরে যাওয়ার মধ্যেও একটা আশ্চর্য সুখ নিহিত আছে। সে কথাটা যেদিন কোন মেয়ে বুঝে ফেলে সেদিন মনে মনে বলে, তোমাকে আমার সর্বস্ব নিবেদন করলাম। আমার জয়—তোমার জয় হোক। আমি চাই তুমি আমাকে জোর কর, তোমার খুশিমতো যেমন ইচ্ছে চালাও, আমাকে তোমার দাসী করে রাখ। তোমার মধ্যে আমাকে হারিয়ে যেতে দাও। এইভাবে আত্মনিবেদন করার ভেতর কিংবা পরাভব স্বীকারের মধ্যে কোন দাহ নেই, অপমান নেই, অনুশোচনা নেই। দানের আনন্দে, তৃপ্তিতে হয়তো বা পুন্যে তা পরিপূর্ণ। এমন শান্ত স্নিগ্ধ ভালোবাসতে শুধু মেয়েরাই জানে। সেই ভালোবাসার গর্ববোধ ছিল আমার বুকে। কিন্তু দুর্বাসা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের মতো মহামূল্যবান জিনিসগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হঠাৎ এভাবে চলে যেতে পারে স্বপ্নেও মনে হয়নি। ঋষির বিশ্বাসঘাতকতা আমার প্রেমকে ছোট করে দিয়েছে। নিজেকে তাঁর কাছে প্রথম পরাজিত মনে হলো। যদিও তাঁর কাছে কোনদিন হারতে চায়নি। বরং ঋষিকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সেই হেরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় জেতা হলো তাঁর কাছে। এখন বুঝতে পারছি আমার জানাটা ঠিক ছিল না। ভোজরাজের কথা মনে হলো, কোন জানাই ভ্রান্ত নয়! আজ যেটাকে অভ্রান্ত নিশ্চিত সত্য বলে মনে হচ্ছে, কাল সেটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। মানুষকে বিশ্বাস করতে হয় ভেবে চিন্তে। কিন্তু কথাগুলো যে এমন করে আমরা জীবনে ফলবে, কে জানতো?

পনেরো বছর বয়সের স্মৃতিটা ভুলে থাকা সত্যিই কঠিন। ঐ বয়সটা আমার জীবনের এক বিশেষ দিকচিহ্নও বটে। কারণ, সেদিনের ঘটনাই আমাকে শিখিয়েছে কি করে সত্যকে জানতে হয়। ঘুরে ফিরে সেই কথাটা তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মতো আমার ভেতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে করে দিল।

দুপুর হতে একপ্রহর দেরী তখন। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে সুদর্শনা হাঁফাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে

বলল : একবারটি বাইরে চল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখ, কী কাণ্ড হচ্ছে। খ্যাপা ঋষি চলে যাচ্ছে। তাঁর যাওয়ার রথ এসেছে। অশ্বারোহী সৈন্যেরা রথের আগে পিছে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুরোহিত এসেছে যাত্রামঙ্গল পাঠ করতে। আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে রূপচর্চা করছ। কার জন্যে করছ? এসব তোমার দেখবে কে? দেখার মানুষ তো চলে যাচ্ছে।

সুদর্শনা আমার বিশ্বস্ত পরিচারিকা। শূরসেন থেকে তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। ভোজপুরীতে এই বয়স্কা দাসীই আমার একমাত্র সহচরী এবং আত্মীয়া। মায়ের মতো আগলে বেড়ায়। চোখে চোখে রাখে। আমার জন্য ওর উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। একটু বেশি দুঃসাহসী বলে ভয়টা বেশি। কতদিন জিগ্যেস করেছে, খ্যাপা ঋষির সঙ্গে তোমার মাখামাখিটা আমার ভালো লাগে না., বাপু। এখানে তোমাকে শাসন করার কেউ নেই। ভালো-মন্দ বলে দেয়ার লোক নেই। এখানে তুমি ভীষণ একা। আমি ছাড়া আর কেউ তোমার ভালো চায় না। তাই একটা ভয়ের মধ্যে থাকি।

সুদর্শনার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলি, ঋষি তো আর বনের বাঘ নয়, মানুষ। তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

বেজার মুখ করে সুদর্শনা সংকোচে বলল : ভয় তো শরীরের। শরীর কারো কথা শোনে না। তার গোপন করারও কিছু নেই।

তুমি কি ভাব বলতো?

তোমাকে পেটে ধরেনি কেবল। জন্ম থেকে তোমাকে পালন করছি। তোমার সঙ্গে স্নেহ মমতার সম্পর্ক আমার। মমতা বশেই মায়ের মতো সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকি। তুমি আমাকে লুকিয়ো না। তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারি লোকটা তোমাকে মন্ত্রে বশ করেছে। তোমার সাধ্য কি মন্ত্রের বন্ধন কাটিয়ে বাইরে এস।

মন্ত্র কী খারাপ জিনিস।

চমকানো বিস্ময়ে জিগ্যেস করল : মন্ত্র পড়ে তোমরা বিয়ে করেছ কি?

কেন? জীবনকে দেখার জীবনকে জানার উপলব্ধি করার পাঠ অভ্যাস করা কি খারাপ?

পৃথা এসব কী বলছ! ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। এখানে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই। ভোজরাজও নিজের স্বার্থে তোমার সঙ্গে স্নেহ ভালোবাসার খেলা করে। মানুষটা খুব ধূর্ত। বাইরে থেকে তাঁর চালাকী টের পাওয়া যায় না। আমি জেনেছি, ঋষিকে উনিই আমন্ত্রন করে এনেছেন। ঋষিকে তুষ্ট করে মগধ সম্রাটের আক্রমন থেকে ভোজরাজ্যকে বাঁচানো তাঁর উদ্দেশ্য। তাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্যে ভোজরাজ ঋষির ঔরসে পত্নীদের গর্ভে সন্তানোৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাণীরা কেউ রাজী হয়নি। তখন তোমার কচি মনকে আদর্শের রঙে রাঙিয়ে, বুদ্ধি-বিদ্যা, দায়িত্ববোধের প্রশংসা করে ঋষির পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছেন। তুমিও ঋষির সেবায় মজে গেছ। তাই তো তোমায় নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। কখন কি হয় তাব ভয়ে মরি। কুন্তীভোজ কি চায় কে জানে?

একলহমায় কথাগুলো মনের উপর ঝলকে-উঠল। আমার সারা শরীর চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা থেঁতলে দিচ্ছিল যেন। আমার মধ্যে তখন একটা বিরাট ভাঙা গড়া চলছে। আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না। মনে মনে বলছি, মানুষ চিনতে ভুল করলাম। ভালোবেসে ঠকলাম। বিশ্বাস করে এ কোন অপরাধ করলাম? তা-হলে পৃথিবীর সব কিছু বদলে গেল কি? রাজনীতির পালের হাওয়া লেগে মানুষের সঙ্গে মানুষেরা সম্পর্ক কি বদলে যায়? গোটা জীবনের মূল্যবোধটা কি অন্যরকম হয়ে যায়? নইলে, বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় সংকীর্ণতা ঐক্যের স্থানে বিচ্ছিন্নতা এসে মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে কেন? হঠাৎ এ কোন বিপর্যয়ের মধ্যে এসে পড়ল আমার জীবন? এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে কৃমি পোকার মতো থিক থিক করছে। মনটাও বিষিয়ে গেছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না!

আমাকে নীরব দেখে সুদর্শনা বলল : রাজকুমারী, রাগ কিংবা অভিমান করার সময় নয় এখন। তুমি একটা কিছু কর।

কেমন একটা উদাস অবসন্নতায় বিষণ্ণ আমার কণ্ঠস্বর। বললাম : এ পৃথিবীতে এই দুর্বল ছোট্ট দু'হাত দিয়ে কাকে ধরে রাখব? ধরা না দিলে কাউকে ধরে রাখা যায়? যায় না। শুধু মুখে বলা, যেতে আমি দেব না তোমায়। কিন্তু যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, মায়া-মমতার ধার ধারে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে চলে যায়, তাদের তো যেতে দিতে হয়। মনের লড়াই তো আর খোলা তলোয়ার নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে সবাকার সামনে হয় না।

ব্যাকুল গলায় সুদর্শনা বলল : তুমি একবারটি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে দেখলে অপরাধে ঋষির মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

আমি তো কোন অপরাধ করেনি। মনের ভলোবাসায় কোন অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি সেই প্রেমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আমার করার কী আছে? বেশি বয়স বলে আমি তো তাঁর অমর্যাদা করেনি। আমার ভালবাসাতে খাদ নেই, পাপ নেই। কোন অনুশোচনাও নেই। থাকবে কেন? ভালবাসার কুসুম এই বুকে ফুটিয়েছে কে?—ঈশ্বর। আমার ভালবাসাই ঈশ্বর।

ওসব ভাবাবেগের কোন মানে নেই। মেয়ে-মানুষ জাতটাই বড় আবেগপ্রবণ। ভালবাসায় বড় বেশি সৎ আর একনিষ্ঠ থাকার জন্য এবং বিশ্বাস করার জন্য জীবন ভোর তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়। তবু চৈতন্য হয় না তার। বোকা, বোকা, ভীষণ বোকা। মনটা যেহেতু শরীরের মধ্যে বাস করে তাই শরীর ছাড়া কোন ভালোবাসা হয় না। শরীরের ভালোবাসাতেই পাপ। ভালবাসার পাপ মেয়ে মানুষকে একা বয়ে বেড়াতে হয়। তার বিষফল সারা শরীর মন বিষিয়ে দেয়। এই বাস্তব কথাটা বুঝতে যারা দেরী করে তাদেরই পস্তাতে হয়। আশ্চর্য! সেই কথাটাই ভাবছ না তুমি।

ভাবার সময় যখন ছিল ভাবেনি। ভাবনাটা বড় দেরী করে ফেলেছি। এখন ভেবে হবে কী?

দেরী হলেও শুধরানোর সময় আছে এখনও। জীবনটা জোয়ার-ভাঁটার মতো। হারজিত লেগেই আছে। হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না। মনের হাল শক্ত করে না ধরলে পাড়ে পৌঁছবে কী করে? হাল ছেড়ে ভেসে বেড়ানোর মতো বিড়ম্বনা আর নেই। একদিন ঋষিকে হারিয়ে দিতে চেয়েছিলে তুমি। অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষটাকে জয় করার জন্য তোমার গর্ব ছিল। কারণ তুমি হারতে চাও নি। হেরে যাওয়ায় সত্যি কোন সুখ নেই। হারতে চায় না কেউ। জেতাটাই বড়। কিভাবে জিতলে, সে কথা কেউ মনেও রাখে না! আমার কথা শুনে, একবারটি ভোজরাজের সামনে দাঁড়াও। নির্ভয়ে বল, ঋষি প্রতারক, ঠগ, দস্যু। আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছেন। ওকে যেতে দিও না।

কথাগুলো বলে সুদর্শনা আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। দুর্বাসা যখন রথে উঠছেন ঠিক সেই সময় আমাকে হাজির করল তাঁর সামনে। আমায় দেখে একটু অবাক হলেন। বোধ করি কেঁপে গেল দুর্বাসার ভেতরটা।

ভোজরাজও কম আশ্চর্য হয়নি। চমকানো বিস্ময়ে বলল : তুমি!

দুর্বাসা খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেন নি। মুহূর্তে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। হাসিতে উদ্ভাসিত হল মুখমণ্ডল। কিছু হয়নি এমন একটা ভাব করে বলল : ভোজরাজ আপনার কন্যার সেবার কথা এ জীবনে ভুলব না। বড় ভাল মেয়ে, খুব লক্ষণযুক্তা। কিন্তু সোজা পথে ওর জীবন শুরু হয়নি। অনেক বাধা-বিপত্তি ধকল সইতে হবে সারাজীবন ধরে। যেমন ভাগ্যবতী তেমনি অভাগা। জোয়ার ভাঁটা জীবনভোর লেগে থাকবে। জীবনের উন্নতিও যেমন, শত্রুতাও তেমনি। শুধু বিধাতার শত্রুতা নয়, মানুষের শত্রুতাও কম নেই। তাই ওর ভালোর জন্যেই বশীকরণের গুপ্তবিদ্যার পাশাপাশি জননী হওয়ার এক আশ্চর্য মন্ত্র শিখিয়েছি। এই মন্ত্র বলে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে জননী হতে পারবে। দেবতার সন্তান বলেই জাতকের গায়ে কলঙ্ক লাগেবে না। মানুষের সমাজে দেবতার পুত্রদের খুব সমাদর। তাদের জননী হওয়াও গর্বের। আমি আশীর্বাদ করছি, সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরী হবে কুন্তী। সন্তানেরা হবে তার পরম গর্বের এবং বিস্ময়ের।

কী যে ঘটে গেল আমার মধ্যে সেই মুহূর্তে, জানি না। ঋষির চোখ আমার চোখের উপর

স্থির। অধরে মৃদু মৃদু হাসি। মুখে অনাবিল প্রশান্তি। চোখের চাহনিতে নিবিড় ঘুম ঘুম ভাব। কেমন একটা আচ্ছন্নতায় আমার ভেতরটা আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে আসছে দুরন্ত প্রতিবাদে ভেতরটা গজরাচ্ছে। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে বলি : মিথ্যে কথা। অপকর্ম আর অপরাধ তোমার বিবেককে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না তাই আমাদের নিষিদ্ধ সম্পর্কের গায়ে নির্দোষ দেবতার নামের ছাপ লাগিয়ে নিজের সম্মান বাঁচাচ্ছ। ভণ্ড ঋষি! তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছে। ঋষি নামের কলঙ্ক তুমি। আসলে তুমি একটা কপট, প্রতারক। আমার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করলে পাছে ব্রহ্মচর্যার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, তাই নিজের অপকর্মকে নির্লজ্জের মতো অন্যের ঘাড়ে চাপালে। তোমাকে ধিক্কার দেবার ভাষা নেই আমার। কথা বলতেও ঘেন্না করছে। প্রেমের নামে আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করলে কেন? তুমি তো আমাকে কিছু শেখাও নি। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাগুলো বলল তাকে, তোমার কি মর্যাদা খুব বাড়ল? নিজের কাছে তুমি ধরা পড়ে গেছ। তোমার মান বাঁচাতে গিয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ। অন্যের কাছে নিজেকে লুকতে পার, কিন্তু আমি তো জানি, কোথায় গলদ আর কোথায় ফাঁকি তোমার। বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে তোমার। তাই একজন কুমারীকে একজন ঋষির কাছ থেকে অন্য কোন মন্ত্র নয়, মা হওয়ার মন্ত্র শিখিয়েছ। বিচক্ষণ হলে টের পেতে কোন মেয়ে কুমারী অবস্থায় মা হতে চায় না। প্রকৃতির নিয়মে সব মেয়ে মা হয়। ঋষি তুমি কি বোকা? কী দুর্বল তোমার যুক্তি? এভাবে আমাকে অপদস্থ করলে কেন? আমি তোমার কী করেছি? আজ তোমার কাছে আমি কি কেউ না? আমার কোন দাম নেই তোমার কাছে? এই তোমার বিচার?

কথাগুলো মনের মধ্যে ঝড় তুলল। কিন্তু কী আশ্চর্য আমি সম্মোহিত ঋষির দুচোখ আমার দুই চোখের মধ্যে এমন করে এনে ফেলল যে ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে গেল। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত ছিল না আমার। ঋষি বিদায় গ্রহণের বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার চৈতন্যোদয় হল।

সন্দেহের পোকাটা কুড়ে কুড়ে খেয়ে আমার ভেতরটা ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। সন্দেহ এমন এক জিনিস,. মনের মধ্যে শিকড় গেঁড়ে বসলে তাকে আর নির্মূল করা যায় না। মাটির গভীরে গাছ যেমন শিকড় চাড়িয়ে দেয় তেমনি সন্দেহের শিকড় নিঃশব্দে শাখামূল মেলে ধরেছে মনের অভ্যন্তরে।

সকাল হচ্ছে, রাত্রি আসছে, অমোঘ নিয়মে সময়ের চাকা ঘুরেছে। সেই ঘূর্ণমান চক্রের মধ্যে আমার অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ পাক খাচ্ছে।

আমার দেহে মাতৃত্বের সব লক্ষণগুলো দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। উদর বসনের শাসন মানছে না। পয়োধর কাঁচুলির বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নির্লজ্জ শরীরটা নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। কী যে করব একে নিয়ে কিছুই স্থির করতে পারছি না। মনে মনে ঋষিকে গাল দেই। তাকে উদ্দেশ্য করে বলি স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, ভণ্ড, শঠ, প্রতারক। তারপর আস্তে আস্তে রাগ জুড়িয়ে গেলে এক অন্য অনুভূতি হয়। তখন আর আক্ষেপ থাকে না। মনটা উদার হয়ে যায়।

ঋষি হলেও দুর্বাসা মানুষ। মানুষ হলেই মন বলে একটা ব্যাপার থাকে। মনের দুর্বলতাই সব। এই মনের জন্যেই একজন সংসারী মানুষকে সারা জীবন ধরে দাম দিতে হয় অনেক। কিন্তু ঋষি সংযমের শানে মনটাকে শানিয়ে নিয়ে মায়া, মোহ, দুর্বলতাকে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করছে। ঋষির কোন দুর্বলতা থাকতে নেই। তবু মানুষের শরীরের ভেতর যে মনটা বাস করে সে মনের ভেতর কখনও কখনও ঝড় উঠে। ঝড় উঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে তাঁর অসহায়তা এবং হতাশা সম্বন্ধে সচেতন হয়। ঋষির সঙ্গে মনের সংঘাত বাঁধে। মনের দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়লে পাছে ছোট হয়ে যায়, ঋষির গৌরবের সৌধ ভেঙে পড়ে, বাইরের ঐশ্বর্য বিপন্ন হয় তাই ঋষিকে বাঁচাতে অত্যন্ত স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর হয়ে যান। মনের মানুষটাকে তাঁর ভীষণ ভয়। কেউ যদি মনের দারিদ্র্য দেখতে পায় তাহলে শ্রদ্ধা-ভক্তি সম্মান করবে না! সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, সমীহ

না থাকলে ঋষির মাথা উঁচু থাকবে কী করে? ঋষি তা-হলে সাধারণ হয়ে যাবে? একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন পার্থক্য থাকে না তাঁর। আর সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকা মানেই তো নিচু হওয়া। অর্থাৎ অন্য সবাইয়ের সমান হওয়া, সকলের সঙ্গে একাকার হওয়া। ঋষিত্বের মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে অন্য ঋষিদের মতো দুর্বাসাও বিস্ময় এবং চমক সৃষ্টি করেছেন।

একটা ভয়ঙ্কর অসম্মান থেকে নিজের গৌরব এবং মর্যাদা নিয়ে ঋষিদের এই বেঁচে উঠার কৌশলই আমাকে শেখাল কী করে বাস্তব সত্যকে চিনতে হয়। হঠাৎ, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক ঝলক আলোয় আমার ভেতরের অন্ধকারটা উদ্ভাসিত হলো। ঐ ক্ষণদীপ্ত আলোকে নিজের ভেতরটা দেখে নিতে ভুল হলো না।

সেই সময় হঠাৎ দরজার তালা খোলার শব্দ হলো। সুদর্শনার গলা শোনা গেল বাইরে। দেখলাম, সুদর্শনা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। তারপর আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বিরক্ত হয়ে বলল : রাতদিন এরকম দরজা বন্ধ করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওঠা-পড়ার শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? তবু শুনতে হবে। একঘরে এমন করে মুখ লুকিয়ে আরো কয়েকমাস কাটাতে হবে। কিন্তু এভাবে কতকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখবে? একদিন জানাজানি হয়ে যাবেই। কানাকানি তো শুরু হয়ে গেছে। তুমিও যে নির্ভাবনায় আছ তা নয়। মুখে না বললেও টের পাই, প্রতিমুহূর্ত নিজের সঙ্গে নিজের এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটা লড়াই তোমার ভেতর চলেছে। এরপরে তো সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই সংঘর্ষ বেঁধে যাবে। তখনও কি অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? ঋষিকে ঘেন্না করলে কিংবা নির্বোধের মতো অভিমান করলে তার কি আসে যায়? আসল অন্যায় যে করল তাকে শাস্তি দেয়ার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে কাকে শাস্তি দিতে চাইছ? এর মধ্যে মাতৃত্বের কোন গৌরব নেই। নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আত্মঘাতী হওয়ার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। বরং ঋষির উপদেশ মনে রেখে তাঁর মন্ত্রকে রক্ষাকবচ করে নাও। ঋষিদের কথা মিথ্যে হয়না—এ রকম একটা বিশ্বাস আছে লোকের।

সুদর্শনার কথা শুনে চমকে উঠি। নিজের মনেই বলি, এমন করে আত্মঘাতী হওয়ার মধ্যে সত্যি কোন বীরত্ব কিংবা মহত্ত্ব নেই। এরকম একটা জেদেরও কোন মানে হয় না। তবু আমি মেয়ে বলেই হেরে যাচ্ছি, ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ে হার মেনে নিচ্ছি। এ আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি হেরে যাব কেন? —এযে আমারও লজ্জা! আমি লোককে মুখ দেখাব কি করে? আমার নিজেরই তো নিজের মুখ দেখতে লজ্জা হচ্ছে।

আমার গায়ে হাত রেখে সুদর্শনা বলল : রাজকুমারী তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না। তোমার এ শরীরে উত্তেজনা ভালো নয়।

রাগে নয় দুঃখে, অপমানে, অভিমানে আমার ভেতরটা তেতে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম : দোষ কী আমার একার? ঋষিও তো সমান অপরাধী। কোন অংশে একটুও কম নয়। বরং, বেশি। জেনে শুনে তিনি যদি দায়িত্ব, কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে আমারও বা কি দায় পড়েছে? তাঁর নিষ্ঠুর হওয়া যদি পাপ না হয়, তা হলে আমি পাপের ভয় করব কেন? কিসের পাপ? মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই গর্ভের রক্তপিণ্ডের দলাটা বোঝার মতো ঘেন্নায় বয়ে বেড়াচ্ছি? একটু মায়া-মমতা দেখাতে চাই না।

সুদর্শনা আমার কথা শুনে কৌতুক বোধ করল। মুখে তার টেপা হাসি। বলল : ও সব রাগের কথা। কিন্তু আমি তো জানি, হাজার চেষ্টা করলেও মায়ের বুকে স্নেহ-মমতার উপর বাঁধ দেয়া যায় না। সুরধনী যেমন শিবের জটাজাল উন্মোচন করে মর্তভূমি প্লাবিত করে সাগরের দিকে ছুটে চলে অনন্ত তৃষ্ণায়, অমনি এক প্লাবনে ভেসে যায় মায়ের সব যন্ত্রণা, রাগ, অভিমান ভয়।

ওর কথা শুনে আমার সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে উঠেছে। দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব দেখছি। খুব ভয় পেলে মানুষের যেমন চেহারা হয়, আমারও তেমনি চেহারা হয়েছে। শ্বাসবন্ধ করে নিজের ভেতরকার সব কষ্ট, যন্ত্রণা, হাহাকারকে প্রাণপণে নিঃশেষে শুষে নিতে লাগলাম নিজের বুকে। দুচোখ বোজা। নিশ্বাস পড়ছে না। ভীরু ভয়ে মুখ থেকে একটা কথাও বেরোচ্ছে না। সুদর্শনার দিকে

তাকাতে ভয় করছে।

আমি চুপ করে আছি দেখে সুদর্শনা প্রসঙ্গ বদল করে বললঃ থাক-, ওসব কথা বলে লাভ নেই। এখন কী করলে লজ্জা-সম্ভ্রম বাঁচে সেই কথাটাই বেশি করে ভাবা দরকার। আমি ভেবেছিও। মেয়ে মানুষের জীবন ইজ্জতের দামটা সবচেয়ে বেশি। যার কোন ইজ্জত নেই, তার সম্ভ্রমও নেই। সে একটা ফালতু। তুমি না চাইলেও দুর্বাসার মন্ত্রই তোমার ইজ্জত বাঁচানোর অস্ত্র।

কথাটা আমার খুব মনঃপুত হলো না। অপমানে ঘেন্নায় বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। বললঃ তুমি জানো না তিনি কতো নিষ্ঠুর, আর কত নীচ। সব কথা শুনলে তোমারও ঘেন্না হবে। আমি তাঁকে ঘেন্না করতে চাই। এভাবে আমাকে শাস্তি দিও না।

সুদর্শনা বললঃ তোমার গর্ভে তো তাঁর সন্তান এসেছে। এটা তো সত্যি। এতো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

হ্যাঁ, জানি। উত্তেজনায় আমি হাঁফাচ্ছিলাম।

তা হলে, জেদ করছ কেন? তাঁর অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত তো তোমাকে করতে হবে। উপায়ও তিনি বলে গেছেন সে তো তুমি জান। বিপদ এবং সঙ্কট এড়ানোর এর চেয়ে ভালো উপায় নেই। ঋষিদের বাক্য লোকে মান্য করে। সমীহ করে। মানুষের সমাজ ঋষিদের কথা বিশ্বাস করে বলেই আমাদের কৈফিয়ৎটা সহজ হয়ে গেছে। তুমি তো প্রাতে রোজ স্নান কর। অনেকক্ষণ ধরে সূর্যস্তব কর। সবাই তোমাকে সূর্যের উপাসক বলে জানে। একদিন দুর্বাসার মন্ত্র পরখ করে দেখার জন্যে কৌতূহল বশে ইষ্ট দেবতা সূর্যকে আহ্বান করলে। ভক্তের আহ্বানে দিবাকর তৎক্ষণাৎ সশরীর উপস্থিত হয়ে তোমার প্রার্থনা পূরণ করল। ধর্মপ্রাণ মানুষ একথা অবিশ্বাস করবে না। বরং দেবতার কৃপালাভের জন্য রমণীরা সমালোচনা না করে তোমার দুর্লভ সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করবে।

সুদর্শনার এরকম একটা কৈফিয়তে হঠাৎই আমার ভেতরটা বিদ্যুৎ চমকের মতো মুর্হুমুহু চমকাতে লাগল। মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরিগুলোতে কে যেন দীপ জ্বেলে দিতে লাগল। অবাক বিস্ময়ে আমি এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার সম্মতি না পেয়ে সুদর্শনা বেশ একটু অসহিষ্ণু এবং বিরক্ত হলো। উষ্মা প্রকাশ করে বললঃ দুর্বাসাকে ঘেন্না করা সহজ। কিন্তু তাঁর কপট মন্ত্রকে নিয়ে শঠতা করা কোন অধর্ম নয়। কপটের সঙ্গে কপটতা করা কিংবা মিথ্যের জবাব মিথ্যে দিয়ে দেয়ার নামই শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। বিষ দিয়ে বিষ তোলার অন্য নাম সঞ্জীবন অর্থাৎ বেঁচে ওঠা।

তখন গভীর এক চিন্তার মগ্ন। আমি দেখতে পাচ্ছি সুদর্শনা হাত নেড়ে মুখের বিভিন্ন ভঙ্গি করে কথা বলছে। কিন্তু তার কোন কথাই আমি শুনছি না। কেবল ওর মুখের উপর চোখ মেলে ছিলাম। হঠাৎ আমার আমিটা বিদ্রোহ করে বসল। দরজা খুরে ঘর থেকে আচমকা বাইরে এলাম। মাথায় আগুন জ্বলছে। ভালো মন্দ বিচার করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। ভেতরটা বিদ্রোহে ফুঁসছে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার মধ্যেকার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙেছে। আগ্নেয়গিরির গর্ভদেশের আগুন যতক্ষণ নিঃশেষ হয়ে বাইবে না বেরোয় ততক্ষণ গর্ভদেশ জ্বলে; তেমনি এক জ্বলন্ত ক্রোধ নিয়ে ভোজরাজের ঘরে ঢুকলাম।

অপরাহ্ন।

ভোজরাজ রাণী চিত্রলেখার সঙ্গে জমিয়ে পাশা খেলছিল। অসময় আমায় দেখে তারা দুজনে আশ্চর্য হলো। চিত্রলেখা বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললঃ তুমি? বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে কারো শয়ন ঘরে যে ঢুকতে নেই, তা-তো তুমি জান।

আমার মুখে চোখে একটা থতমতভাব ফুটে উঠে। অপমানে মুখখানা গনগন করে। রাগ হয় চিত্রলেখার উপর। থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকি। বুকটা তোলপাড় করে। বুক জুড়ে অভিমানের সমুদ্র।

চিত্রলেখা ভোজরাজের প্রিয়তম মহিষী। ভোজরাজের সঙ্গে যখন এবাড়ীতে এলাম, তখন আমাকে দেখেই বলেছিলঃ মেয়েটি কে গো? একে কোথা থেকে আনলে?

ভোজরাজ বললঃ একে দত্তক নিলুম শূরসেনের কাছ থেকে। এখন থেকে এই বাড়ীর মেয়ে। এই বংশের সঙ্গেই ওর জীবনসূত্র গাঁথা হয়ে গেল। এখন থেকে ও আমাদের মেয়ে। আমারই ওর বাপ মা।

চিত্রলেখা বুকের মধ্যে আমায় টেনে নিয়ে সস্নেহে বললঃ বড় ভালো মেয়ে গো। চোখে মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ, কথাবার্তায় বুদ্ধির ধার। কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাই না? আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা।

ভোজরাজ বললঃ শুধু আলাদা নয়, বিশেষ একজনও বটে। সংসারে মানুষের জঙ্গলের মধ্যে এই মেয়ে আলাদা। একটা রক্তকমল। আমার ছেলে নেই, এই মেয়ে থেকেই আমাদের সব হবে, আবার। আমাদের আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকল না, শূন্য ঘর আমার ভরে যাবে আনন্দে, সুখে।

কথাগুলো দুর্বোধ্য লাগল। কিন্তু ক'দিনের ভেতর সন্দেহ কেটে গেল। এক সংসারে থেকে আর এক সংসারের একেবারে অন্দর মহলের ভেতর ঢুকে পড়ল। অচেনা সবাই। আত্মীয় পরিজন সকলে। ক'দিনের মধ্যেই সব একেবারে একাকার হয়ে গেল। মনে হয় না, আমি বাড়ীর মেয়ে নই। এদের সকলের সঙ্গে আমার বহুকালের সম্পর্ক।

এর পেছনে যা কিছু কৃতিত্ব তা মহিষী চিত্রলেখার। মেয়ের মতো যেমন শাসন করে ভালো-মন্দ বলে তেমনি সোহাগে, আদরে, স্নেহ-মমতায় ভরিয়ে দেয় আমার বুক। রাগ, দুঃখ, অভিমান, কষ্ট থাকে না। চিত্রলেখাকেই মনে হয় আমার পূর্ব জন্মের মা।—বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাগুলো মনে পড়ে মিলিয়ে গেল।

এক বুক উত্তেজনা নিয়ে দৌড়ে আসার জন্যে হাঁফাচ্ছি তখন। ভেতরটা তেতে ছিল। চিত্রলেখার ভর্ৎসনায় এবং শাসনে মেজাজটা চড়ে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝাঁঝাল গলায় বললামঃ জানি। খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু ঘরে আগুন লাগে যখন নিয়ম মানামানির সময় থাকে না। তেমনি, জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যা বাধাধরা পথ ছেড়ে হঠাৎ-ই অন্যপথ ধরে চলে। তখন সাধারণ নিয়মগুলোও মেনে চলতে পারে না।

চিত্রলেখার আর কথা না বলে চুপ করে গেল। ভোজরাজের দিকে চেয়ে বললঃ আমি উঠে যাচ্ছি। তোমরা কথা বল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম ঃ না। তুমি যেতে পারবে না। তোমার যাওয়া হবে না। এখানেই থাক।

তোমার হুকুম।

না। তোমাকে আমি যেতে দিলে তবে তো যাবে?

চিত্রলেখা হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় বসল।

ভোজরাজ মিনমিনে গলায় বললঃ তোমার মনটা আজ ভালো নেই। কী হয়েছে? আমাদের কাছে বস

ঝংকার দিয়ে বললামঃ বসতে আসেনি, বলতে এসেছি। মার সামনেই কথাটা তোমাকে জিগ্যেস করব। ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। মনে মনে পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পাইনি। আজ তোমাকেই তার জবাব দিতে হবে। আমাকে দত্তক নেয়ার এই নাটক করলে কেন?

চিত্রলেখা তিরস্কার বলে বললঃ ছিঃ। ওঁর মতো মানুষের নামে এমন অপবাদ দিতে তোমার মুখে বাঁধল না। ওঁর নিজের মেয়ে হলে এমন কঠিন কথা বলতে বুক ফেটে যেত।

সত্যি, বুক আমার ফেটে যাচ্ছে? চৌচির হয়ে যাওয়া বুকে কোন আগল নেই। তাই সব কথা গুছিয়ে বলতে না পারি যদি আমাকে ক্ষমা কর। আচ্ছা মা, আমি তো মেয়ে। সুবিচারের জন্য তোমাকেই প্রশ্ন করছি। তুমি এর জবাব দাও। বাবার বংশরক্ষা কিংবা সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যা তো আমাকে দিয়ে সার্থক হবে না। তা হলে কোন উদ্দেশ্যে আমাকে দত্তক নিল? শুধু কি মেয়ের হাতে সেবা, যত্ন, পাওয়ার লোভে? মেয়ে সন্তানকে কে কবে ধরে রাখতে পেরেছে?

তাকে তো পরের ঘরে যেতে হবে? সেখানে নতুন বংশের ধাত্রী হবে। তা-হলে, বাবার দত্তক নেয়ার উদ্দেশ্যটা কেমন করে আমি মেটাব বল? হাজার সদিচ্ছা থাকলেও মেয়ে হয়ে আমি কি তার ইচ্ছে মেটাতে পারি? মেয়ে মানুষের দ্বারা তা কি সম্ভব?—তুমি চুপ করে থাকলে-যে আমার প্রশ্নের জবাব পাই না। বল? বল? উত্তর হয় না বলে দিতে পাচ্ছে না।

বলতে বলতে আমার নেশা লেগে গেল। প্রশ্নটা তাদের দুজনের কাছে ছুঁড়ে দেবার জন্যে একটু দম নিয়ে আবার বলিঃ কিন্তু দত্তক মেয়েকে দিয়ে বংশরক্ষা করা সম্ভব জেনেই বোধ হয়, এ বাড়ীতে আসার দিনে বাবা তোমায় বলেছিল, আমাদের আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকল না। আমাদের সব হবে আবার এর অর্থ তো দত্তক মেয়েকে দিয়ে বংশরক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া। তাই তো বংশদীপের অভাবে হারিয়ে যাওয়ার কোন ভয় থাকল না। দত্তক কন্যা থেকেই তার সব আশা পূর্ণ হবে। ঘরে ভরে উঠবে আনন্দে। আর সেজন্য আমার আসার বৎসরকাল মধ্যে দুর্বাসাকে আমন্ত্রণ করে আনা হল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল তাতে। দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করে জরাসন্ধর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করা গেল এবং বংশরক্ষাও হলো।

চিত্রলেখা এবার চিৎকার করে উঠল। বললঃ কুন্তী! তুমি ভোজরাজকে মিথ্যে দোষারোপ করছ।

বিস্ময় প্রকাশ করে বললামঃ মিথ্যে! না, না। বাবা কতদিন, কতসময় আমার সামনে তোমার কাছে অক্ষেপ করে বলেছে, কে আমাদের রাজ্য দেখবে? কার জন্যে রাজ্য সিংহাসন আগলাচ্ছি? মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় রাজ্য-ঐশ্বর্য ছেড়ে বানপ্রস্থে যাই? কোন সুখের জন্যে লোকে বিয়ে করে? কিসের আশায়? বংশই যদি না রইল তো এ ছাই রাজ্য নিয়ে আমি করব কি? একে রক্ষা করব কার জন্যে? কুন্তী বা আমাদের কতখানি সাধ পূরণ করবে? কিন্তু ও ছাড়া আমাদের আছে কে? আশার প্রদীপ বলতে তো ও। আমার দুঃখটা বুঝবে কি? আমার প্রত্যাশা কি খুব বেশী? এ রকম কিছু চাওয়া কিংবা আশা করা কুন্তীর কাছে অন্যায় কী?—এ সব কথার আমি অন্য মানে করতাম। কিন্তু হেঁয়ালীটা এখন স্পষ্ট। পরিকল্পনা করে, অনেক ভেবেচিন্তে তোমরা আমায় দত্তক নিয়েছ। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যে দুর্বাসাকে আমন্ত্রণ করে এনেছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। আমি ভোজরাজের বংশরক্ষার যন্ত্র মাত্র।

আমার সমস্ত গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ঘরের মধ্যে থমথমে আবহাওয়া। ভোজরাজ-চিত্রলেখা আমার আচমকা প্রশ্নের আক্রমণে বোবা হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরম যেন ভেতরের সব রসটুকু শুষে নিচ্ছে। তাদের নিরুত্তর দেখে বললাম—আমার অভিযোগগুলো কী মিথ্যে? এসব অস্বীকার করতে পার? চুপ করে থেক না। আমার কথার জবাব দাও। পাথরের মূর্তির মতো মাথা হেঁট করে থাকলে, কিন্তু অপরাধ লঘু হয় না। দোষের মাত্রা কমে না।

চিত্রলেখা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বললঃ তবে কি তুমি কোন কেলেঙ্কারীর কাজ করছ? নিজের সাফাই গাইবার জন্যে এখন ভোজরাজকে দুষছ। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। একজন ভালো মানুষকে এভাবে হেনস্তা করে কেউ? ছিঃ

রাজমহিষী চিত্রলেখার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ একটু কৌতুক বোধ করলাম। বললামঃ চমৎকার! এখানে আমার মা নেই, বাবা নেই। তোমারই আমার সব। আমার ইহকাল, পরকাল। তুমি তো মা। তোমার কাছেই আমি প্রশ্ন রাখছি। দুর্বাসার সেবা, যত্ন, পরিচর্যার ভার আমার উপর চাপানো খুব দরকার ছিল কি? এখানে তো বিশ্বস্ত, সেবাপরায়ণা সুন্দরী দাসী কিংবা পরিচারিকার অভাব নেই। তবু ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলে, যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে তাঁর দেখাশোনার সব দায়িত্ব আমার মতো একজন অনভিজ্ঞা কিশোরীর উপর ছেড়ে দিলে কেন? তুমি তো বাধা দিতে পারতে। দিয়েছিলে কি? বরং শেখালে, পুরুষ মানুষকে একান্ত অনুগত ও বাধ্য রাখা, তাকে বশীভূত করা-মেয়ে জন্মের সার্থকতা। ব্যর্থ হওয়া তার লজ্জা। চিত্তজয়ের খেলায় মেয়ে মানুষের হেরে যাওয়ার মতো লজ্জা, অপমান আর কিছুতে নেই। একজন মেয়ের কাছে পুরুষের অনেক দাবি, আব্দার থাকে। মায়ের মতো প্রিয়ার মত হৃদয় দিয়ে সে সব ব্যথা, কষ্ট, দুঃখ যে মেয়ে বুঝতে না পারে তার মেয়ে হয়ে জন্মানোই বৃথা। আমার নিজের মাও হয়তো এসব কথা বলতো। কিন্তু তাঁর সস্নেহ,

উদ্বিগ্ন দৃষ্টি সর্বক্ষণ আমাকে পাহারা দিত। ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় একা ছেড়ে দিয়ে কখনো নিশ্চিত থাকতে পারতেন না। একজন বয়স্থা আইবুড়ো মেয়েকে সর্বক্ষণ ঋষির সেবা-যত্ন, দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত করতে কিছুতে সম্মত হতেন না তিনি। অভিশাপের ভয়েও না। নিজের মা হলে যা করত, তুমি কি তাই করেছ? একদিনও জানতে চেয়েছ কি, ঋষির আচরণ কেমন? আমার শরীরে মেয়েলী চিহ্নগুলোর পরিবর্তন দেখেও উদ্বিগ্ন মায়েদের মতো প্রশ্ন করেছ কখনও?

বলতে বলতে আমার লজ্জায় দম বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু কথাগুলো এভাবে বলতে পারায় বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম। মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম। আমার তখন কথা বলার নেশা ধরে গেছে। প্রতিরোধহীন যুদ্ধে একাই যুদ্ধ করছি নিজের সঙ্গে নিজে। একটা আত্মপ্রশান্তিতে মনটা যখন ভরে গেছে, সেই সময় ভোজরাজ মিনমিন করে বললঃ তুমি আমায় মিথ্যে দোষী করছ।

মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই মানুষটার উপর অভিমান রাগ, আক্রোশ সব চেয়ে বেশি। বুকটা দুরন্ত উত্তেজনায় থর থর কেঁপে উঠল ঘৃণায়, কপটতায়। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কি ঘটে গেল, জানি না। কানের মধ্যে ভোজরাজের সস্নেহ কথাগুলিই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে হেসে উঠল যেন। বাবা-মার কাছে সন্তানের কোন লজ্জা থাকে না। তাদের মতো বড় বন্ধু আর নেই।' অধরে বিচিত্র কৌতুক হাসি। চোখ দুটো খাদ্যোতের মতো ধক ধক করছে। মেয়ে বলে আমার মধ্যে কোন আড়াল ছিল না। মার খাওয়া নির্যাতিত মানুষের প্রতিহিংসার প্রতিশোধ আমার ভেতরটাকে কঠিন হিংস্র করে তুলল। এক বিষধর আমার মধ্যে ফণা তুলে ধরল যেন। বিষপূরিত দন্তে গরলের সুতীব্র যন্ত্রণা উগরে দেবার জন্যে বিষধর যেমন ছোবল দেয় তেমনি আমার বুকে দীর্ঘকাল ধরে জমানো ক্ষোভের সব বিষটুকু উগরে দিলাম ভোজরাজকে। বললামঃ তা-হলে তোমার কাছে প্রশ্ন রাখছি। তুমি বল, বিদায় গ্রহণের সময় দুর্বাসা আমাকে দেখেই তোমার বললঃ কুন্তী এক আশ্চর্য গুপ্ত মন্ত্রের অধিকারী। জননী হতে ইচ্ছে করলে ঐ মন্ত্রবলে যে কোন দেবতাকে সন্তানের জন্যে আহ্বান করতে পারে। এরম একটা অদ্ভুত কথা আচমকা বলার কোন কারণ ছিল না। তবু তুমি বোবা সেজে রইলে। তোমার একবারও মনে হলো না, আমি কুমারী। আমার জননী হওয়ার জন্যে ঋষির এত ভাবনা কেন? আর কোন মন্ত্র নয় জননী হওয়ার মন্ত্র পাঠ দেওয়ার তাঁর প্রয়োজন হল কেন? তবু এ সম্পর্কে ঋষিকে কোন প্রশ্ন করলে না কেন? কোন কুমারী মেয়ে অনূঢ়া অবস্থায় স্বেচ্ছায় সন্তান চায়; না চাইতে পারে? তার কলঙ্কের ভয় নেই? স্বেচ্ছায় কুলটার অপবাদ নেবে কেন? সাধ করে, স্বেচ্ছায় কোন মেয়ে তার শুচিতা ভবিষ্যৎ নষ্ট করে? এসব অতি সাধারণ প্রশ্ন, তোমার মতো বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে পড়েনি এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল? তা-ছাড়া জননী হওয়াটা তো বিবাহোত্তর কালের ব্যাপার। তখন যদি কোন রমণীব জননী হতে না পারে তখন অন্য উপায়ের কথা ভাবে। আর এ তো বিবাহ পরবর্তী জীবনের সমস্যা। আমার সে ধরণের কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়নি। তবু ঋষির এ রকম একটা আচমকা কথায় তোমার কোন সন্দেহ হলো না দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এটা চমকে দেবার মতো কোন কথা নয়, তবু তুমি নিরুত্তর থেকেছ। একটা অপরাধবোধে ঋষি তাঁর অপকর্মকে গোপন করার কৈফিয়ৎ দিতেই আমার কলঙ্কের উপর দেবতার নামের ছাপ দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর, তুমি সব জেনে শুনে না জানার ভান করছিলে। ষড়যন্ত্র করে আমার জীবনটা নোংরা করে দিলে। বাবার ভূমিকায় অভিনয় করে তুমি আমায় সঙ্গে শত্রুতা করলে, কিন্তু আমি তোমার কি করেছি? তোমার সব কথা বর্ণে বর্ণে শোনার জন্যে আমার এই দুর্দশা। এর দায় নেবে কে? আমি কোন অন্যায় করেনি, তা-হলে আমাকে সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কার স্বার্থে? কেন?

ভোজরাজ অপরাধীর মতো মতো মাথা হেঁট করে রইল। পাথরের মেঝের উপর তাঁর চক্ষুদ্বয় স্থির। একটা অচল মাংসপিণ্ড বসে আছে যেন পালঙ্কে। একটুও নড়াচড়া নেই মানুষটার। ক্রুদ্ধ আক্রোশে আমি তাকে নাড়িয়ে দিয়ে বলি, কথা বলছ না কেন? আমার কথায় জবাব দাও।

সেই ঝাঁকুনিতেই ভোজরাজ বাস্তবে ফিরল। চমকে উঠে বসল। হাঁ, এসব আমার কিছু মনে হয়নি। আমি ভেবেছিলাম, ঋষি গোপনে তোমাকে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের পাঠ দিয়েছেন। সেই শিক্ষাকে পরিশীলিত মার্জিত শব্দে "জননী হওয়ার মন্ত্র" বলেছেন।

রাগে বিষধরের মতো ফোঁস করে উঠে বলিঃ ছি! এখনও কপটতা করছ? একটা বড় সত্যকে মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে তোমার জিভে বাঁধছে না। প্রকৃতির নিয়মে সব মেয়ে মা হয়। এটা ঋষির কাছ থেকে শেখার কিছু নয়। নর নারীর গোপন সম্পর্কের কথা মাতাও কন্যাকে সংসংকোচে বলে। লজ্জাও পায়। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝায়। আর ঋষি সেই সম্পর্কটি পরিশীলিত মার্জিত শব্দে প্রয়োগ করেছেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য কোন যুক্তি নয়। একটা হেঁয়ালী সৃষ্টি করে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্বামীর অপমানে এবং অসম্মানের আগুনে চিত্রলেখার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। মাথার উপর ছাদ না থাকলে মানুষ যেমন নিজেকে অত্যন্ত আশ্রয়হীন, বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করে তেমনি এক নিরুপায় অস্থিরতার বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে বললঃ এত যখন অবিশ্বাস তোমার তখন তুমি অভিযোগ করলে না কেন?

লোকলজ্জার ভয়ে পারেনি বলতে। তবু মনে মনে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিঃ ছিঃ ঋষি! তুমি মিথ্যেবাদী, ভণ্ড প্রতারক। তোমাকে বড় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি খেলা করেছ। আমার অপরাধ কী? বিশ্বাসের অমর্যাদা করলে কেন? আমি তোমায় শত্রুপক্ষের মেয়ে বলে কি শত্রুতা করে প্রতিশোধ নিলে? পরিহাস করার জন্যই কী হেঁয়ালী করা? জননী হওয়ার জন্য মানুষ নয়, দেবতাকে বরণ করার কথা বলে কার্যত তোমার নীতিহীন দুষ্কর্মকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছ। মানুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে বদনাম হয়, কিন্তু দেবতার সঙ্গে হয় না। কুমীরত্বের গায়ে কাদা লাগে না। ঋষিবর! তোমায় এ শঠতা ঋষি পদবাচ্য নয়। একজন শত্রুর মতো। এরকমই একটা প্রতিবাদ ভোজরাজের কাছে প্রত্যাশা করা আমার কি খুব অন্যায় হয়েছিল? কিন্তু বাবা সেজেও ভোজরাজ মুখে কুলুপ এঁটে থাকল।

চিত্রলেখা মরিয়া হয়ে বললঃ তাতে তোমার লাভ কী হতো?

সত্যটা তো প্রকাশ পেত। কে কার সঙ্গে শঠতা, কপটতা করল তার রহস্য উদঘাটিত হতো। আমার সন্দেহের অবসান হতো। মিথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াতে হতো না। এক বুক ঘৃণার ভার বয়ে বেড়ানোর কোন কষ্ট থাকত না। এটা কী কম লাভ!

এসব কতদিনের কথা। তবু কী আশ্চর্য, বুকের ভেতর তার স্মৃতির দীপ আজও তেমন জ্বলছে। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি। তখন সবে রাত হয়েছে। প্রসব বেদনা ভয়ঙ্কর। একটা তীব্র কাঁটা ফোটা যন্ত্রণায় দেহটা মুচরে, দুমড়ে যাচ্ছে। সারা শরীর জুড়ে এক অব্যক্ত খিঁচুনি। এ যেন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে অদৃশ্য একটি শক্তির প্রাণপণ লড়াই হচ্ছে। যে লড়াই আমার আত্মজার সঙ্গে। চোখে ফেটে জল আসছে। অসহায়ের মতো তার কাছে মার খাচ্ছি। পেটের উপর কী দৌরাত্ম্য তার! কখনও খামচে ধরছে পেটটা, বাইরে বেরোনোর দরজা ধাক্কা দিচ্ছে এত জোরে যে, মুঠা করে দুহাতে বিছানা ধরে প্রাণপণ নিজের সঙ্গে যুঝছি। অবশেষে, সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে, আমার শক্তিকে পরাভূত করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জানিয়ে দিল জয় হয়েছে নবাগতের। আর, আমি পরাভূত রক্তাপ্লুত, শ্রান্ত। নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছি শয্যায়। এক গভীর অবসন্নতায় ডুবে যাচ্ছে আমার চেতনা।

ভয়ে দু'চোখে বুজে আছি। এক কঠিন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্বেগ আর আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন করছি নিজেকে। চারপাশে অদৃশ্য ভীড়ের অস্তিত্ব অনুভব করছি। শত সহস্র সন্দেহ, কৌতূহল, জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে আমার ভয় করছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যি ঠোঁট, গলা শুকিয়ে আসছে। বড় অসহায় আর বিপন্ন বোধ করছি। এতদিন একরকম ছিলাম। সকলের চোখের আড়ালে নির্জনে একা থেকেছি। ভোজরাজ আর চিত্রলেখা ছাড়া রাজ অন্তঃপুরে আর কেউ জানে না আমার অজ্ঞাতবাসের রহস্য। কিন্তু এবার কী করবে? লোক জানাজানি হলে কী বলবে? তাদের সামনে আমি মুখ দেখাব কী করে? ভোজরাজও চুপ করে নেই। মনে মনে এক গল্প তৈরী করা আছে তার। লোকের কৌতুহলে জল ঢেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভোজরাজ নিজেই ঘোষণা করে বলবে

যে, ইষ্টদেব সূর্য প্রসন্ন হয়ে এই শিশু সন্তান দিয়েছে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যা আর রইল না। এতে কি সব সমস্যা মিটে যায়? আমার অপবাদ, দুর্নাম কলঙ্কের ভার বহন করবে কে? আমার বাকী জীবনটার পরিণামই বা কী?

এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা যেন আমার জন্য আমাকে ভাবতে বলল। একটাই তো জীবন। অন্ধকার ঘরে মিষ্টি প্রদীপ শিখার মতো তির তির করে কাঁপছে জীবনের স্বপ্ন, বাঁচার তৃষ্ণা, অনন্ত বাসনা।

এক লড়াই শেষ করে, আর এক লড়াই শুরু করেছি নিজের সঙ্গে। আশ্চর্য। পৃথিবীতে যাকে আনতে কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করলাম তার প্রতি হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম। স্নেহ, মমতা, দরদের পুকুর শুকিয়ে গেছে। হৃদয় আমার পাষাণ হয়ে গেছে। এক অব্যক্ত ঘৃণায় তার মুখ পর্যন্ত দর্শন করিনি। এটা ঠিক নিষ্ঠুরতা নয়, আমার এক ধরণের নীরব বিদ্রোহ। তাকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিয়েছি। তবু বিবেচক মন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—নবজাতকের অপরাধ কী? তার জন্মের জন্যে কতটুকু দায়ী সে? তাহলে, মায়ের ঘৃণা বিদ্বেষ, উপেক্ষার পাত্র সে হবে কেন? কেন? বিবেকের প্রশ্নে চমকে উঠি। নবজাতকের দিকে তাকালে পাছে কোন দুর্বলতায় মন গলে যায়, মায়া হয় তাই চোখ বুজে রইলাম। একটা হাহাকার হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই বেজে যাচ্ছ প্রকৃতির নিয়মে। শরীর মন কন্টকিত হচ্ছে। তবু আমার মধ্যে তার প্রতি একটা কঠিন উপেক্ষা ও ঘৃণাকে খুব স্পষ্ট করে টের পাই। আপন গর্ভস্থ-সন্তানের প্রতি জননীর এরূপ বিরূপতা স্বাভাবিক নয়। এর শেকড় অন্য কোথাও। তবু থেকে থেকে মনে হতে লাগল, ও আমার শত্রু। শত্রু ছাড়া কি? বিশ্বাসঘাতকের ছেলে ও। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? বড় হয়ে তো পিতার মতই বদমেজাজী হয়ে মানুষের জীবনে অকল্যান এবং অশুভকে ডেকে আনবে। দুনিয়াতে সৎ বস্তু কিছু রাখবে না। সমাজ বলে কিছু থাকবে না। স্বেচ্ছাচারে, ব্যভিচারে, দুর্নীতিতে সব নীতিবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। দুর্বাসার বিকল্প হবে। বিষবৃক্ষে বিষফলই ফলে। এই সন্তান তো দুর্বাসার শরীর থেকে জাত, তাঁরই আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এক প্রাণ। তাঁরই বীজ, তাঁরই রক্ত—কেমন করে আলাদা হবে। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে প্রদীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশগতি। দুর্বাসা রইল না, কিন্তু তার প্রাণের অম্লান শিখা তো রয়ে গেল। এ সন্তান তো তাঁর সৃষ্টি। আমার মাধ্যমে শুধু সৃষ্টি হয়েছে। এসব মনে হলে দুর্বাসার উপর আমার রাগ বিদ্বেষ, ঘৃণা হয়। নবজাতকের মধ্যে আমি তখন দুর্বাসাকেই দেখি। নবজাতকের রূপ ধরে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছে। তাকেই তখন মনে হয় প্রধান প্রতিপক্ষ। আমার জীবনকে তছনছ করতেই যেন দুর্বাসার প্রতিনিধি হয়ে আমার সঙ্গে আছে। মাথাটা গরম হয়ে যায়। কারণ, রক্তের ধারা তো আর বদলায় না। ভাঁটার মতো উল্টো স্রোত বওয়াও সম্ভব নয়। তাই বোধ হয় বুকটা এমন পাথর হয়ে গেছে। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমার এমন একটা দুরত্ব গড়ে উঠেছে যে তার দিকে ফিরে তাকানোর কোন কৌতুহল নেই। বিরূপতাকে জয় করার কোন চেষ্টা নেই।

সুদর্শনা থমথমে মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার কোলে নবজাতক। আমার নির্বিকার তার ভালো লাগছিল না। ভয়ে জিগ্যেস করতে পারছিল না। রক্তমাংসের দলাটা দু'হাতে নিয়ে তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছি। আমার মন গলানোর জন্যে বলছিল—ছেলে তো নয় দেবদুত। স্বর্গের কবচ কুন্ডল নিয়ে যে জন্মে তাকে জীবনযুদ্ধে হারায় কার সাধ্য? এই কবচকুন্ডলই তোমাকে রক্ষা করবে। মা রাগ করলে হবে কি? তুমি নিজে তোমার রক্ষাকর্তা। কারো উপর ভরসা করে আসনি বাপু! অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে তোমাকে যেতে হবে, তাই তৈরী হয়ে এসেছে। কে, কি ভাবছে তোমায় নিয়ে, কী বদমতলব করছে, ওসব তোয়াক্কা না করেই তুমি তোমার নিজের পথে ধেয়ে যাবে। কোন বাধাই মানবে না। কারো সাধ্য নেই তোমার ক্ষতি করার। ঈশ্বর তোমার সহায়।

বিরক্ত স্বরে বললামঃ একটু চুপ করবি। আমায় কি শান্তিতে থাকতে দিবি না। কথাগুলো বলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুলাম।

সুদর্শনা নির্বিকার গলায় বললঃ কেন, তোমার কি ধারণা, তুমি শান্তিতে আছ? তোমার মধ্যে

মায়া দয়া নেই, সে তো জানি। কিন্তু এতখানি নিষ্ঠুর হবে ধারণা ছিল না। এখন কি করবে শুনি? তোমার রকম সকম দেখে ভোজরাজকে সংবাদ দিয়েছি।

ঝংকার দিয়ে বললামঃ অপদার্থ। সংবাদ দেয়ার কথা তোকে বলেছে কে? ভোজরাজের গুপ্তচরগিরি করতে কি আমার সঙ্গে আছিস তুই।

তোমার অভিযোগ যে সত্য নয়, তুমিও জান। ভোজরাজের নাম শুনলে আজকাল তুমি এত খেপে যাও কেন?

আমার ভেতর সেই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াটা সুরু হলো। রাগ, অপমান, অভিমান শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মতো ছড়িয়ে গেল। কণ্ঠরুদ্ধ যন্ত্রণায় বললামঃ মনে হয় মহৎ কিছু হওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু ভোজরাজ আমাকে সেটা হতে দিল না। আমাকে নিয়ে এমন এক নিষ্ঠুর পুতুল খেলা না করলে বোধ হয় আমার জীবনটা অন্যরকম হতে পারত। ভোজরাজ জীবনের গোটা ছকটাই উল্টে দিল। আমিও তার প্রত্যাশাকে ছিন্নভিন্ন করব নিজের হাতে। তুই আর দেরি করিস না। জানাজানি হওয়ার আগেই মঞ্জুষা করে অশ্বা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আয়। তোর কোন পাপ হবে না। সব পাপ তো ওর বাপের। ওর বাপ আমার বড় শত্রু। অমন হাঁ করে চেয়ে দেখার আছে কী? যা বলছি তাই কর। অন্ধকার পাপ ঢেকে দেবে। একটা অদ্ভুত চক্রান্তের অর্থহীন অধ্যায়ের এখানেই অবসান হোক।

সুদর্শনা বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করতে অন্ধকারে একা বেরিয়ে গেল। আর আমি বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম। অনেকক্ষণ দুটো ঠোঁট বজ্রের মতো এঁটে থেকে ভিতরকার সব যন্ত্রণা এবং আর্তির শব্দকে প্রাণপণে আটকে রাখলাম। বাইরে থেকে আমার সে কান্না কেউ শুনতে পেল না।

বোধ হয় আমার খুব পুণ্য ছিল। তাই, আমার শিশু সন্তানের কোন অনিষ্ট হয়নি। ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখল। স্রোতে হারিয়ে গেল না। এক জননী বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তো, আর এক জননী স্নেহ মমতার কোল পেতে কুড়িয়ে নিল। কুমারী জীবনের লজ্জা এবং কলঙ্ক মনে করে যাকে অশ্বানদীতে বিসর্জন দিয়ে সমস্ত দায় থেকে, পাপ থেকে বিবেককে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম সে যখন ভীষণভাবে বেঁচে আছে—এই বাস্তব সত্যটা জানার পরে আমার ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। চোখের জল রাখতে পারি না। আমার কান্নাও চাপা রইল না।

সুদর্শনা আমাকে কাঁদতে দেখে হতভম্বের মতো চেয়ে রইল। অপ্রস্তুত বিস্ময়ে বললঃ আরে! তুমি কাঁদছ কেন? ও ছেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? পেটে ধরলে যেমন মা হয় না, তেমন পেটে না ধরেও মা হওয়া যায়। সেজন্য তোমার কাঁদার কী আছে?

সুদর্শনার প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা এবং বিদ্রূপ একটু বিঁধল আমাকে। সত্যিই তো আমি কাঁদছি কেন? সে কথা সুদর্শনাকে বলব কী করে? বুকটা ব্যথিয়ে উঠে। শ্বাস দ্রুত হয়। আবার একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে ভেতরটা। নিজেকে কৈফিয়ৎ দিতেই যেন বলিঃ আশ্চর্য হওয়ারই কথা। পাথর তো নই। মানুষের মন। কোথায় তার কত ধরনের ব্যথা, কতরকমের দুর্বলতা, শূন্যতা আছে, তা যদি মানুষের জানা থাকত তা হলে মনের মনকে এত কষ্ট পেতে হত না। নিন্দিত এবং ধিকৃত ছেলের প্রতি আমার অপরিমেয় দুর্বলতা ব্যাখ্যার অতীত এবং যুক্তিহীন। এই দুর্বলতা ঠিক পুত্রস্নেহ নয়, অন্য কিছু। একটা কিছু চিন্তা করে আমি আতঙ্কিত। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওর বেঁচে থাকার ভেতর আমি এক বিপুল ভাঙচুরের কাল্পনিক ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমার অপরাধের কৈফিয়ৎ চাইতে একদিন যে, ও বিদ্রোহ করবে না কে বলতে পারে? তার বিদ্রোহ সহনীয়, কারণ তা স্বাভাবিক। আমারও প্রাপ্য। কিন্তু ওর ঘৃণার আগুনে আমার মর্যাদা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেই ভয়ে বিপন্ন বোধ করছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে সুদর্শনা বললঃ তোমার এ ধরণের চিন্তা আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। তোমার ভাবনা

তো সত্য নাও হতে পারে। ভুলও হতে পারে। তাকে ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। সংবাদ বাহকের মুখে শুনেছি ছেলেটির যেমন দীর্ঘ গড়ন তেমনি দেবতার মতো পবিত্র মুখশ্রী। দেখলে মন ভরে যায়। ও কখনো নিষ্ঠুর প্রতিশোধপরায়ন হতে পারে না।

স্বস্তিতে, তৃপ্তিতে এবং আনন্দে দুচোখ আমার বুজে গেল। চোখ বন্ধ করে তার স্পর্শ অন্তর মধ্যে অনুভব করলাম। কল্পনায় পলকের জন্যে তার মুখ দেখলাম। বুকটা আনন্দে বিষাদে উথাল পাথাল করে আর চোখ বারবার ভরে যায় জলে। চোখের উপর দিয়ে একটা অন্তহীন সময় বড় মন্থর গতিতে পার হয়। নিজের মনেই বলি; পৃথিবীটা বড় মায়ার।

এসব কবেকার ঘটনা। আজ, এতদিন পরে অতীতের সমস্ত পথগুলো পরিক্রমণ করতে গিয়ে, সেদিনকার সব কিছু খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। সদ্যোদ্ভিন্না যৌবনবতী কুন্তীকে নিয়ে আর এক নতুন নাটকের মহড়া আরম্ভ হল। এই নব-নাট্যের নির্দেশক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। আর তার প্রধান প্রধান কুশীলব হল, মহারাজ কুন্তীভোজ, হস্তিনাপুরের বিদুর এবং কুরুবংশের সর্ব প্রধান পিতামহ ভীষ্ম, যুবরাজ পাণ্ডু। এই নাটকের নায়ককে চোখে দেখা যায় না। তিনি একটা জালের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু নায়িকা আমি।

অপূর্ব এক নাট্য ঘটনার অবতারণা হল আমার সামনে। সত্যিই সুন্দর। সময় যেন এখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। অপূর্ব এক স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে আমি অতীতকে দেখতে লাগলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছিল কক্ষের অভ্যন্তরে। প্রদীপ জ্বলছিল। তার আলোয় সুঠাম দীর্ঘদেহী এক ঋষিকে দেখলাম, ভোজরাজের মুখোমুখি বসে আছেন। তাঁর গায়ের রং কালো। এত গভীর কালো যে প্রদীপের স্বল্প আলোয় তাঁকো ভালো করে চেনা যাচ্ছিল না। বুক পর্যন্ত তাঁর কাঁচা পাকা মেশানো দাড়ি নেমে এসেছিল। পরনে গেরুয়া বসন, গায়ে কষায় রঙের পট্টবস্ত্রের উত্তরীয়, মাথায় চূড়া করে বাঁধা চুলের খোঁপা। হাল্কা আলো তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দুটি চোখে ঋষির অপার মহিমা হয়ে ঝরে পড়ছিল। মাথার চারিদিকে একটা জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সেই ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাব ঋষির কথায় দূর হয়ে গেল। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। এক অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা হল আমার সামনে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই বক্তা।

ঋষিবর বললেনঃ মহারাজ, সাম্রাজ্যের আয়তন, অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি—এই তিন ক্ষেত্রেই রাজগৃহের জরাসন্ধ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির চাইতে অনেক বড় ও শক্তিশালী। ভারত রাজনীতিতে সব ব্যাপারে তার ভূমিকাও মুখ্য হতে বাধ্য। রাজনৈতিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে ভারতের ছোট ছোট চুরাশিটি রাজ্য জরাসন্ধের রাজনীতির ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে এক বিরাট রাষ্ট্রজোট গড়ে তুলেছে। এবং সে জোটে জরাসন্ধের ভূমিকাই যে বড় ছায়া ফেলবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর এখানেই জরাসন্ধের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির সাফল্য। পরিবর্তিত অবস্থায় হস্তিনাপুরের কুরুবংশের ভীষ্ম জরাসন্ধের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা ভাগ করে নেয়ার দায়িত্বের ভিত্তিতে তারা নিজেদের ভেতর ঠাণ্ডা লড়াইর উত্তাপকে শুধু কমিয়ে ফেলল না, একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল। উভয়ের ভেতর মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারত রাজনীতির পটপরিবর্তন ঘটে গেল দ্রুত। পাল্টে গেলে রাজনীতির মানচিত্র। এরকম একটা অচেনা পরিবেশে রাষ্ট্রজোটের বাইরের রাজ্যগুলিকে নতুন করে শত্রু মিত্র ঠিক করে নিতে হচ্ছে। নতুন করে চিনতে হচ্ছে প্রতিবেশীদের। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে জরাসন্ধের অঙ্গুলি হেলনেই চলেছে গোটা ভারতরাজনীতি। জরাসন্ধের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো রাষ্ট্রশক্তি আর রইল না। ফলে, ভারতে জরাসন্ধের প্রভুত্বই শেষ কথা। যাদব রাজ্যগুলি যদি এই বাস্তব সত্য ভুলে বিবাদে মেতে থাকে তা-হলে তাদের মৃত্যুঘন্টা বাজতে খুব দেরী নেই।

কুন্তীভোজের ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক রাজনীতিক তাকে সাবধান করে রাখল। অকপটে

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করা নিরাপদ নয় মনে করে চুপ করে রইল, মুখ তুলে অনেকবার মহর্ষিকে দেখল। প্রত্যয়ের অভাবে বিপন্ন গলায় বলল : মহর্ষি, যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গে আপনার প্রীতির সম্পর্ক তো আজকের নয়, অনেক কালের। বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে আপনি কোন না কোন রাজ্যে ফি-বছরে আসেন। পরামর্শ যা দেয়ার আপনিই অযাচিতভাবে দিয়ে থাকেন। তবু বিচ্ছিন্ন যাদব রাজ্যগুলি পরস্পরের বিবাদ বিসংবাদে মেতে আছে। নিজেদের রেষারেষি কমিয়ে এনে পরস্পরের স্বার্থে এবং উপকারে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ভিত্তিতে কেউ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা ভাবে না। আমার একার উদ্যোগের দাম কী? আমি কি বা করতে পারি?

দ্বৈপায়ন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললঃ তা বটে। তবে, আপনি একটা কাজ করতে পারেন। পৃথার বিয়েটা হস্তিনাপুরের তরুণ নরপতি পান্ডুর সঙ্গে দিতে রাজি হলে জরাসন্ধের আগ্রাসী রাজনীতি থেকে যাদবদের দূরে, রাখা সম্ভব। পান্ডু ও কুন্তীর বিয়েটা একটা উপলক্ষ্য। কুন্তী বুদ্ধিমানী, উচ্চাভিলাষী, শিক্ষিতা, রাজনীতি জ্ঞানও প্রখর। পান্ডু নরম মনের মানুষ। কুন্তী নিজের মতো করে গড়ে পিঠে নিয়ে তাকে চালাতে পারবে। তুমি আমি না চাইলেও কুন্তী ও পান্ডুর পরিণয় বিধি নির্দিষ্ট। এ পরিণয় হবেই।

সে কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল থর থর করে। মুখখানা সহসা যে যেন আবীর মাখিয়ে দিল। কুন্তীভোজ বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল দ্বৈপায়নের দিকে। মুখেতে একটা বিব্রত অস্বস্তির ভাব ফুটল। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা ভাল করে ভেজাল। তারপর হতাশ গলায় বললঃ মহর্ষি কুন্তীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সত্যি ভয় পাই।

দ্বৈপায়ন সরল চোখ দুটো তুলে ধরে বললেন কেন? হয়েছে কি?

কুন্তীভোজ হতাশ গলায় বললঃ মহর্ষি, পান্ডুর মতো নিরীহ, সৎ ছেলেকে ঠকাতে পারব না। তার সঙ্গে মিথ্যাচার করতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে! মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকা রাখা যায় না। একদিন অসাবধানে সত্যটা প্রকাশ হয়ে যাবে। সেদিনের কথা ভাবলে বুক কাঁপে। আজ না হলেও, পৃথার কলঙ্ক প্রকাশ পাবে। সেদিন স্বামী, সংসার সন্তানের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? নিজের মর্যাদা গৌরব হারিয়ে কত ছোট হয়ে যাবে সবার কাছে, ভাবলে আমি আর শান্ত থাকতে পারি না। এমন একটা কথা শোনার পরে কেউ কি শান্ত থাকতে পারে?

মহারাজ, আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন মানে হয় না। সবই আগে থাকতে নির্ধারিত থাকে। বিধাতার কি মহান উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে কুন্তীর জন্ম। পান্ডুর সঙ্গে বিবাহ তার পরিণাম। বলতে পারেন, দুর্বাসা কিংবা কানীন পুত্র তারই অঙ্গ। কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। হয়তো বিধাতার অভিধানে তারও প্রয়োজন আছে। ওসব নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই। এসব অদৃষ্টের আয়োজন। আপনি তার বিবাহের আয়োজন করুন। স্বয়ম্বর সভায় কৌরব নরেশ পান্ডুকে বররূপে আমি হাজির করব। আপনি কুন্তীকে তার গলায় বরমাল্য দিতে রাজি করুন।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম—আমি কি স্বপ্ন দেখছি। নিজের হাতে নাড়ী দেখছি সত্যি বেঁচে আছি তো? অদৃষ্ট আমায় নিয়ে এ কোন নতুন নাটক শুরু করল? বিধাতার মহান কাজ করতে কি সত্যিই আমার জন্ম! তাই কী সকলের থেকে একটু আলাদা আমি। এমন করে এক একজন মানুষকে নিয়ে ইতিহাস আপন গতিপথ পরিবর্তন করে, নইলে শূরসেন ছেড়ে ভোজরাজ্যে এলাম কেন? পিতা শূরসেনের তো বসুদেব ছাড়া আরো নয়জন পুত্র ছিল, কুন্তীভোজ তাদের দত্তক না নিয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য আমাকে দত্তক নিল কেন? ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এমনি করে আসল নকল যাচাই হয়ে যায়। সে রকম এক ইতিহাসের পাত্রী হব ভাবতে বুকের ভেতর এক অনির্বচনীয় সুখের শিহরণের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

গর্ব করে বলার মতো স্বয়ম্বর সভা হয়নি আমার। এরকম অনাড়ম্বর, নিরুত্তাপ, স্বয়ম্বরসভা কোন রাজকুমারীর হয় না। রাজপুরীতে কোথাও বিবাহোৎসব আমেজ ছিল না। অতিথি অভ্যাগতদের

সংখ্যা ছিল নগণ্য। পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রের সংখ্যাও মুষ্টিমেয় ছিল। কন্যাপণ কিছু ছিল না। বীর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোন বীর আমাকে জয় করেনি। আমার জন্যে প্রার্থীদের কাউকে কপালের ঘাম এক বিন্দু ঝরাতে হয়নি। এ হেন স্বয়ম্বর সভায় দাঁড়িয়ে বহু প্রার্থীর মধ্যে থেকে ইচ্ছেমত স্বামী নির্বাচনের এক গৌরবময় অধিকার ছিল শুধু আমার। অন্যেরা কৃপাপ্রার্থীর মতো অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যাকুল ছিল। তবু আমাকে পাওয়ার জন্যে কারো ভেতর কোন হানাহানি উত্তেজনা কিংবা প্রতীক্ষা ছিল না। নির্বাচনের সময় যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দরকার হয় আমাকে তার পরীক্ষা দিতে হয়নি। মানে মর্যাদায়, বংশগরিমায় হস্তিনাপুর নরেশ পাণ্ডু ছাড়া আর কেউ সম্মানিত ব্যক্তি ছিল না। তাই স্বয়ম্বর সভায় ঢুকে উপবিষ্ট প্রার্থী রাজপুত্রদের দিকে তাকিয়ে আমার মাথাও ঘুরে যায়নি। অকুণ্ঠচিত্তে পাণ্ডুর গলায় মালা দিলাম। ভোজরাজের আনন্দের সীমা নেই। উৎফুল্ল হয়ে সকলকে শুনিয়ে বললেনঃ দ্যাখো, আমার মেয়ের পছন্দ দ্যাখো। সেরা জিনিষটি বেছে নিতে ভুল করেনি। যে যেমনটি চায়, তেমনটিই সে পায়।

ভোজরাজের কথা শুনে আমি চমকে উঠি। আমার মনের কথাটা ভোজরাজের তো জানার কথা নয়। সত্যি, আমি কোনদিন বুদ্ধিমান স্বামী চাইনি। বীরত্বকে যদি স্বামীত্বের ভূষণ করতাম তাহলে স্বয়ম্ভর সভায় বীর্যশুল্কা হতাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। সভায় দাঁড়িয়ে বহু প্রার্থীর মধ্যে থেকে ইচ্ছেমত স্বামী নির্বচনের গৌরবময় অধিকার নিজের হাতে রেখেছিলাম ওর ভেতর ভোজরাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব কতটা ছিল তা আমি জানিনে। তবে, কাকতালীয়ভাবে তাঁর চাওয়ার সঙ্গে আমার ইচ্ছেটা মিলে গিয়েছিল। আমি শুধু স্বামী নির্বাচন করেনি, সেই সঙ্গে তার রাজ্যের একজন রাণীর মতো রাণী হয়ে উঠার কথা বেশি ভেবেছি। আমার বর যে হবে বংশগরিমায়, মানে মর্যাদায় সকলকে ছাড়িয়ে যেন যায়। তাকে বিয়ে করে আমি হতে পারি যেন সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজপরিবারের রাজবধূ এবং কর্তৃত্বশালিনী রাণী। এমন স্বামী আমি চাই, যাকে পেলে তার উপর আমার অবাধ কর্তৃত্ব থাকবে, যে আমার রাজ্য পরিচালনা বুদ্ধি ও পরামর্শকে স্বাভাবিকভাবেই সমাদর করবে। পাণ্ডুর মতো শান্ত নিরীহ ভীরু মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে মনে হলো, স্বপ্নের রাজপুত্রের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। মুহূর্তে কি যেন ঘটে গেল বুকের ভেতর। আত্মবিস্মৃতি ঘটল। অকুণ্ঠচিত্তে হাতের ববমাল্যখানি তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বললামঃ ভাগ্যের নির্দেশ মেনে আমি তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করলাম।

পাণ্ডু আমার কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল। তারপর হাত ধরাধরি করে পায়ে পায়ে বাসর ঘরে যাই। মুগ্ধ দুটি চোখে মেলে ধরল পাণ্ডু আমার চোখের উপর। বললঃ আমিও তোমাকে পাওয়ার জন্য, দেবার জন্য এসেছি কুন্তী। আমি চাই তোমায়।

লাজুক হেসে মাথা হেঁট করে সবিনয়ে বললামঃ আমার আছে কী, যা তোমাকে দিতে পারি।

যে চোখে দিয়ে আমাকে দেখেছ, যে মন নিয়ে আমার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিলে, সেই চোখ আর মন আমাকে দাও। তাহলেই আমার সারা জীবনের চাওয়া পাওয়ার ঘর ভরে উঠে। আমি ধন্য হয়ে যাব।

ওর গলায় স্বরে খুশিতে ভরে যায় মন। কে জানে? কি ছিল ওই কণ্ঠস্বরে? ভালোবেসে ফেলেছি শুধু কথার জন্যেই।

ফুলশয্যাররাতে ও আমাকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আদর করল। বললঃ আমার প্রাণে অনেক ভালোবাসা আছে। এসবই তোমার জন্যে জমিয়ে রেখেছি।

কথায় যাদুকর ও। কথা দিয়েই আকাশে মেঘ জড়ো করে অলকানন্দ নামাতে পারে। আমার বুকের ভেতরর বর্ষণ শুরু হয়েছে। ওর মুখ আমার কানের কাছে, গালের উপরে, ও আমার কানে ফিসফিস করে বলছে আমার প্রাণের ভেতরে সুধা আছে চাও কি? ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট আমার অধর স্পর্শ করে রইল। নরম মধুর স্পর্শে আমার মুখটা খুলে গেল। আমি মুখে ওর মুখের স্পর্শ পেলাম। আমার সারা শরীর গান গেয়ে উঠল। আমিও ওর গলা বেষ্টন করে আমার অনাবৃত বুকের উপর মুখখানা চেপে ধরলাম। শৃঙ্গারমোহিত নারীর মত আসঙ্গের আনন্দঘন অশ্লেষে তাকে

সম্পূর্ণ করে পাওয়ার অতৃপ্ত উল্লাসে অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে সঙ্গমে প্ররোচিত করি তাকে। এক আশ্চর্য স্থবিরতার শিকার হয়ে শায়িত দেহের উপর উপুড় হয়ে অক্ষমতার অপমানে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। কুন্তী, আমি পারছি না। সত্যি আমি পারছি না। আমি অক্ষম। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

আমার শরীর মন চমকে উঠল। আকাশ জোড়া বিদ্যুৎলেখার মতো চমকিত হতে লাগল আমার বুকের ভেতরটা। আশাভঙ্গের নিদারুণ বেদনায় আমার শরীর অসাড়। শরীর থেকে রক্তমাংস যেন উধাও হয়ে গেছে। আমি চোখ বুজে আছি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এর মধ্যে যেন পৃথিবীটা আমার কাছে বদলে গেছে। আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবতেই পারি না।

হঠাৎ, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বলে পাণ্ডু দু'হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধরে করপল্লব চুম্বন করল। ও আমার হাত ছাড়ল না। আমার হাতের পাতা দুটো ওর হাতের মধ্যে নিপড়ীত হতে লাগল। আশাভঙ্গের ছাই হয়ে গিয়ে ও নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করছিল প্রাণপণে। সম্বলহীন মানুষের মতো, নিরাশ্রয়ের মতো আমার হাতের উপর মুখ রেখে ও ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করছিল। আমি বাঁধা দিলাম না। হাতখানা টেনেও নিলাম না। তার কাছ থেকে ছুটে পালাতেও চাইনি। একই সঙ্গে শরীর ও মনের বিচ্ছেদের বোবা যন্ত্রণা নিয়ে নিজের মনে কাতরাচ্ছি, এ কি অন্যায়! এ কি নিষ্ঠুরতা! কী করি এখন? আমার শরীর মন অবসন্ন হয়ে আসছে। আশ্চর্য! এই সময়ে ও আমাকে একটুও কাছে টানল না। আমাদের মধ্যে এখন অনেক ব্যবধান ও জানে। পৌরুষের লজ্জা, ব্যর্থতা, অপমান, পরাভবের দুঃখ, গ্লানি, অসম্মান নিয়ে ব্যবধানকে দৃঢ়তার সঙ্গে ও রক্ষা করছিল। ওর আত্মনিপীড়নের ক্ষমতা দেখে আমারই করুণা হলো। করুণা ছাড়া কি বা করতে পারি? আমার কপালটাই মন্দ।

মনে হচ্ছে, আমার মতো দুখী আর কেউ নেই। শূন্যতা শুধুই শূন্যতা ঘরে বাইরে চারধারে। সাতপাকের বিয়ের বাঁধনটা গলায় ফাঁস মনে হলো। এক অদৃশ্য দড়ি দিয়ে আমি আষ্টে পিষ্টে বাঁধা ওর সঙ্গে। সাধ্য, কি, বেঁচে থাকতে ঐ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলি। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল গভীর অবসাদ। সত্যি এই অবুঝ এলোমেলো জোড়াতালি দেওয়া মিথ্যে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে আর কোন আকর্ষণ নেই। কেবল পাণ্ডু অচল পাষাণের মতো আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। এইটেই বাস্তব সত্য। ব্যর্থ জীবনের এক জ্বালা ধরা অনুভূতিতে আমার বুকটা টনটন করতে লাগল! বাজপাখির মতো পাণ্ডু ছোঁ মেরে আমার বিয়ের সামান্য সুখটুকুও ছিনিয়ে নিল। নর-নারীর প্রেম ভালোবাসা শরীরী আকর্ষণের বাইরে কিছু নয়। বিয়ে হলো সেই ইচ্ছে পূরণের বন্দোবস্ত। সমাজ অনুমোদিত পথে একজন পুরুষকে ও একজন নারীকে পরস্পরের দেহের ওপর পূর্ণ অধিকার অর্পণ করার অন্য নাম বিয়ে। এটা বিয়ের শেষ কথা না হলেও অন্যতম শর্ত। সেই অধিকার ও সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অসহনীয় শরীর ও মনের কষ্টের কাছে রোগের কষ্ট কিছু নয়। সেই প্রথম বুঝলাম আমি। বোধ হয়, মুখে একটা ভয়ের চিহ্নও ফুটল।

হস্তিনাপুরের দিকে রথ ছুটল। কুন্তীভোজের একটা ছোট্ট অশ্বারোহী দলের পাহারায় আমাদের পাঠানো হলো। এমন প্রাণহীন, উৎসবহীন, অনাড়ম্বর যাত্রা কোন রাজার বিয়েতে হয় না। যাত্রার এহেন দৈন্যের কারণ কী, জানি না। বিয়ের সুরু থেকে বিদায় দৃশ্য পর্যন্ত রাজকীয় কোন আড়ম্বর নেই। অথচ, সব মেয়ে স্বপ্ন দেখে বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হবে। কিন্তু বাস্তবে যখন তা হয় না, এক নিদারুণ আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় তখন বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। বাইরে থেকে তার কষ্টটা চোখে দেখে যায় না! অনুরূপ এক যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হতে হতে চোখ ভরা জল নিয়ে রথে উঠলাম। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী আমি।

রথ ছুটছে। চাকার একটানা ঘর্ঘর শব্দ আর অশ্বের ক্ষুরধ্বনি জনমানবহীন, লোকালয়বর্জিত পথের নৈঃশব্দ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে শনশন করে বাতাস কেটে ছুটছিল। দ্রুত পিছিয়ে পড়া পথের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে বারবার পিছনে ফেলে আসা ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল।

পান্ডুর সঙ্গে আমার বিয়েটা পারিবারিক নিয়ম মেনে হয়নি। এর ভেতর কোথায় একটা গন্ডগোল আছে। হয়তো বা গোটা ব্যাপারটাই একটা চক্রান্ত। স্বয়ম্বর সভায় পান্ডু ছাড়া হস্তিনাপুরের আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল না। আশ্চর্য! বিয়ের পরেও হস্তিনাপুর থেকে কেউ এল না আমাকে নিতে। কোন দায়িত্বশীল রাজ প্রতিনিধিও পাঠানো হলো না। সব কেমন অদ্ভুত লাগল। একটা অশুভ ভাবনা মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। শীঘ্রী একটা কিছু ঘটবে আমার জীবনে। এরকম একটা আশঙ্কায় মনটা মুষড়ে গেল। নিঃশ্বাস আটকে এল। বুকের কাছে একটা কষ্ট হয়।

পান্ডু অপরাধীর মতো ভীরু চোখ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল অন্যদিকে। যেন আমার কাছে তার অপরাধ রাখার জায়গা নেই। তাই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল।

এক উৎকর্ণ বোবা জিজ্ঞাসা নিয়ে আমিও পান্ডুর মুখের দিকে সংশয়ে তাকিয়ে আছি। এই সুদর্শন ও অদ্ভুত মানুষটির প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ এবং একে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশা আমাকে পেয়ে বসল।

ঝাঁকুনির চোটে পান্ডুকে ক্লান্ত লাগছিল। কথা বলতে পারছিল না। চোখ তুলে তাকাতেও তার সাহসে কুলোচ্ছিল না। এক উদাস অন্যমনস্কতা নিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। চোখে অপমানের লজ্জা। কূট সন্দেহে ভেতরে ভেতরে সে একটা অস্বস্তি ভোগ করছিল।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় স্বগতোক্তি করে বললামঃ সবাই আমাকে নিয়ে খেলার পুতুলের মত যা খুশি করছে। ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার। আমাকে নিয়ে একটা অদ্ভুত ষড়যন্ত্র চলেছে। এসব কথা তো কেউ মুখ ফুটে বলে না। কিন্তু আমি মানুষের হাব-ভাব, চাল-চলন দেখলে টের পাই। বাতাস শুঁকলে বলতে পারি কী হতে চলেছে। সত্যি কী হয়েছে আমাকে খুলে বল তো।

অপ্রস্তুতভাবেই পান্ডু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল মানে, আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এ রকম একটা ঘটনার জন্য আমার কিছু করার ছিল না। বিশ্বাস কর, আমি নির্দোষ।

নির্বিকারভাবে বলি : বললাম তো কেউ মুখ ফুটে সত্যি কথা বলে না। ভয় যে পায় তা নয়; রহস্য সৃষ্টি করে সন্দেহের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। আর সেই বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পেরে যায়।

পাণ্ডুর চোখ মুখে একটা অস্বাভাবিক অপ্রকৃতিস্থ ভাব ফুটে উঠেছিল। কথা বলতে একটু সময় নিল। নিজের হাতের রেখাগুলোর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা জাগল। তারপর একটা শ্বাস ফেলে, বলল : প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা আচমকা ঘটে যার কোন প্রস্তুতি থাকে না তার নিজেরও। আমার বিয়েটা তেমনি এক ঘটনা। এখন মনে হচ্ছে ঋষি দ্বৈপায়নের কথা শুনে আমি মহাপাপ করে ফেলেছি। তোমার চোখে আমি অপরাধী হয়ে গেছি। কিন্তু আমার দোষ কী? তোমাকে সব কথা বলার সুযোগ পেলাম কোথায়?

পাণ্ডুর উপর বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললাম : তুমি তো ছেলেমানুষ নও। একটা দেশের রাজা। তোমার উপর সে দেশের ভালো মন্দ নির্ভর করছে। আর তুমি বোঝ না, তোমার দোষ কী? এসব কথা কেউ শোনে না, বিশ্বাসও করে না। এটা কোন যুক্তি নয়। রাজার কোন দুর্বলতা থাকতে নেই। দুর্বলতাই তোমার দোষ, অপরাধ, এবং পাপ।

অসহায়ের মতো পাণ্ডু বলল : পিতামহী সত্যবতী বললেন, দ্বৈপায়ন তোর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে। মেয়েটি দেখতে খাসা। যেমন মুখশ্রী তেমন গায়ের রঙ আর গড়ন। এক ঢাল চুল, গোল মুখ, টানাটানা চোখ, টিকল নাক, দেবী প্রতিমার মত। বিশ্বাস কর, বিয়ের কথা শুনে একটুও খুশি হইনি। দুচোখের দৃষ্টির কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হয়। বুকের ভেতর কী যেন ঢেউ দিয়ে গেল। একটু হাসার চেষ্টা করে বলি : পিতৃব্য ভীষ্ম তো অন্যত্র মেয়ের সন্ধান করছেন। শুনেছি কথা বার্তাও পাকা হয়ে গেছে। এখন অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ করা তোমাদের উচিত হবে না।

সত্যবতী বেশ একটু ক্ষুন্ন হয়ে ধমকে দিয়ে বলল : সে ভাবনা তোমার নয়। ও নিয়ে তোমাকে

ভাবতেও হবে না। ওজন্যে তোমার দুশ্চিন্তারও কারণ নেই। বরং তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবলে আমার দুশ্চিন্তা যায়। চিরদিন বোকাই রয়ে গেলে। তোমার এই সরলতার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হবে। নিজের অবস্থায় ভাল মন্দ বোঝ না।

তবু পিতৃব্যের পরামর্শ ছাড়া কিছু করতে—

কথা শেষ হওয়ার আগে পিতামহী তিরস্কার করে বলল : ভীষ্মকে যা বলার আমি বলব। তোমার বিয়েটা দ্বৈপায়নের পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গেই হবে। দ্বৈপায়ন আমার ছেলে, তোমার পিতা। সন্ন্যাসী মানুষ। তার উপর আমার বেশি আস্থা থাকা স্বাভাবিক। তোমার প্রতি তার দরদ, মমতার ভেতর কোন স্বার্থ কিংবা কৃত্রিমতা নেই। তার মতো হিতৈষী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভীষ্ম কখনও হতে পারে না। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে দ্বৈপায়নই তোমার অভিষেকের পথ সুগম করেছে। রাজপদে তোমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করলে ভালো হয় দ্বৈপায়নের চেয়ে বেশি বোঝে কে? সব দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে ফেলে কালই দ্বৈপায়নের সঙ্গে চুপি চুপি ভোজরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিয়ে ভীষ্মকে তাক লাগিয়ে দাও।

বিশ্বাস কর কুন্তী, পিতৃব্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি একটু শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু আমার সে মনের খবর কে রাখে? মিছিমিছি তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে গেলাম। একটা কষ্ট বিদ্ধ ব্যথায় আমার ভেতরটা টন টন করতে লাগল। প্রতিমুহূর্ত আমার চেতনার ভেতর এক বিন্দু আলোর মতো পিতৃব্যের মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল।

আমাকে মৌন থাকতে দেখে মহর্ষি দ্বৈপায়ন মৃদু মৃদু হাসছিলেন। পিঠের উপর হাত রেখে মধুর কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে বলল : ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও বীর্যবান, চতুর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতালোভী এবং অসাধারণ তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। আর তুমি সুদর্শন হয়েও ভীরু, দুর্বল সরল আপোষকামী। তোমার মধ্যে একটা শিশু সুলভ ভাব আছে। তাই স্বাবলম্বী হতে পারছ না। নির্ভরতা তোমাকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখছে। এটা ভাল নয়। ভীষ্ম তোমাকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের অভিষেক করতে চায়নি। চাতুরী করে আমি তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছি। ভীষ্ম নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছে। বিয়ে করে তুমি সংসার ধর্ম কর, ভীষ্ম চায় না। আমি তার মনের কথা জানি। বিয়ে দেবার নাম করে তোমাকে তার অনুগত ও বাধ্য রাখবে। তারপর যথেষ্ট ক্ষমতা সঞ্চয় করে, রাজ্য পরিচালনায় তোমার অপটুতা প্রমাণ করে, রুগ্ন এবং অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সিংহাসনচ্যুত করবে। আমি দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা আসবে। তাই দেশে দেশে ঘুরে তোমার উপযুক্ত সহধর্মিনী খুঁজে বেরিয়েছি। অবশেষে তার দেখা পেলাম ভোজরাজ্যে। সে এক অসাধারণ রমণী। সে সুন্দরী বুদ্ধিমতী আর শিক্ষিতা। মানবিক সব গুনের মধ্যমনি—তার বহু রূপ, তার লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ভীষণ। সে জানে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তাকে। কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সময় সময়। একজন সেনাধ্যক্ষের মতো তার চোখ, বুদ্ধি, কৌশল এবং সহিষ্ণু। তার হৃদয়ও বিশাল করুণা কি অসীম। যৌবনের তাগিদে তোমার হৃদয় জ্বলতে চাইছে? তাকে সে নির্বাপিত করতে পারে। তুমি যদি উচ্চাভিলাষী না হও, সে তোমার অন্তর বিকশিত করবে। তোমাকে দেখিয়ে দেবে জয়ের পথ। তুমি ক্লান্ত, অবসন্ন হও যদি, তার অন্তরে লুকানো সান্ত্বনা দিয়ে তোমাকে সঞ্জীবিত করবে, উদ্দীপিত করবে। হতাশায় তুমি নিরুদ্যম হলে সে তোমাকে উন্নীত করতে সক্ষম, সক্ষম তোমাকে বিজয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে। আর এই ভাবেই একজন স্ত্রীলোক অক্ষম অযোগ্য পুরুষকে পরিচালনা করে পৃথিবী শাসন করে। আমি সেই রমণীকে দেখেছি। প্রতিকূল অবস্থাকে ধৈর্য ধরে উত্তীর্ণ হওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে তার মধ্যে। তার শক্তি, প্রভাব পুরুষের চারপাশে অদৃশ্য বায়ুর মতো ঘিরে থাকে। এরকম রমণীকে সহধর্মিনী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন সত্যিই যে পাণ্ডুর কাছে আমার নামের এরকম প্রশস্তি করতে পারেন ভাবতে অবাক লাগল। মুগ্ধতা সারা শরীরে ঢেউ দিয়ে গেল। অধরে মৃদু হাসির আভা ফুটল। নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে পাণ্ডুর মুখের উপর জিজ্ঞাসা নিবিড় দৃষ্টি মেলে ধরি। দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। অবাক বিস্ময় নিয়ে ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলাম। পাণ্ডু চুপ করলে বললাম : তুমি কি বললে?

পাণ্ডু হঠাৎ লজ্জা পেয়ে হাসল। বলল : আমার ভাগ্যে যা লিখিত তা তো হবেই। স্বয়ম্বরে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হলে, সে সাফল্য হবে গৌরবময়, আর ব্যর্থ হলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জার।

ওর দিকে দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম : এখন তোমার মনে কোন অবস্থা চলেছে? সাফল্যের গৌরবতৃপ্তি, না দুভাগ্যের অতৃপ্তি আর আশঙ্কা!

পাণ্ডু অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বলল : দুটোই। হস্তিনাপুরের দূরত্ব যত কমে আসছে ততই আমার ভয় করছে। মনে অজস্র চিন্তা। শেষ ভরসা তুমি। দ্বৈপায়নের কথায় তুমিই দেখাবে জয়ের পথ, বাধা উত্তরণের রাস্তা।

পাণ্ডুর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা শক্তির উৎস বেজে উঠে। ওর কথা শুনে আমার ভেতরটা চমকায়। বুকের মধ্যে কেমন যেন দামামা বাজতে থাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! পাণ্ডুর মনে এখন আর দ্বিধার কষ্ট নেই। আমার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : তুমি চুপ করে আছ কেন?

একটু হাসার চেষ্টা করি। বলি : উত্তর জানা নেই বলে চুপ করে আছি। তুমি এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছ আমাকে। একটা চাপের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

কেন?

আমার জন্যে তো ভয় তোমার। আর সেই আমাকে তোমার রক্ষাকর্তা ভাবছ। কিন্তু আমি কী অন্যায় করেছি যে আমাকে এত শাস্তি পেতে হবে? মহর্ষি দ্বৈপায়নের নির্দেশে তোমাকে বরমাল্য দিয়েছি। তিনি তো দেখে শুনে পছন্দ করে, লোক দেখানো স্বয়ম্বর করে আমাকে হস্তিনাপুরের রাণী করে আনছেন। তাহলে সেই মহাপুরুষ অন্তরালে থাকবেন কেন? তাঁর কী কোন দায়িত্ব নেই? হস্তিনাপুরের রাজবধূ হওয়ার পথে যখন এত বাধা-বিপত্তি তখন সত্যগোপন করে আমাকে প্রসারিত করলেন কেন তিনি? বেশ তো ছিলাম! মিছিমিছি আমার জীবনে এই সংকট সৃষ্টির দরকার কী ছিল? জেনে শুনে, তুমিই বা আমাকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে আনলে কেন? তোমার পিতামহী তো আছেন, মেয়েমানুষ হয়ে তিনি যদি মেয়েমানুষের অসুবিধেটা না বোঝেন, তা-হলে বুঝবে কে? তোমরা সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করলে কেন? রাগে, ক্ষোভে, অপমানে, মনের জ্বালায় আরো অনেক কিছু বলতে গিয়ে গলাটা কথার মাঝখানে বুজে এল। দু'চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল।

পাণ্ডু অসহায়ের মত মাথা নাড়াল কয়েকবার। তারপর বলল : ভয়টা হয়তো আমার কল্পনা। এমনটা নাও হতে পারে। আসলে, আমার মনের জোর নেই তেমন। কোনরকম গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলেই আমার মধ্যে পালাই পালাই ভাব জেগে উঠে? যারা বিপর্যয়ের মুখোমুখি সাহসের সঙ্গে দাঁড়ায়, তারা লড়াই করে বুদ্ধির জোরে। কিন্তু আমার বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়। বিপদ বাধার বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার বুদ্ধি এবং মনের জোর তোমার আছে বলে শুনেছি। তাই নির্ভয়ে তোমাকে আঁকড়ে ধরে আশ্রয় চাইছি। আমার তুমি ছাড়া আর আছে কে?

পাণ্ডুর নির্ভরতা, আস্থা শিশুর মত। আমিই ওর নিরাপদ আশ্রয়। এরকমভাবে আত্মসমর্পণ করলে কি তার উপর রাগ, বিদ্বেষ থাকে? আমার ঘৃণার আগুনে জল ঢেলে দিল। যা কিছু গ্লানি ছিল তাও মুছে গেল। আস্তে আস্তে বলি : তুমি কী বলতে চাইছ; বুঝছি না। আমি নতুন বউ। অচেনা পরিবেশ। কারো সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। এখানে কোন ব্যাপারে আমি তর্ক করতে পারি না। নিজের বলে অধিকার দাবি করা নতুন বউর ধর্ম নয়। তার ধর্ম সমস্ত কিছু মান-অপমান, অনাদর. অসম্মান, আঘাত, তিরস্কার মুখ বুজে সহ্য করা। সব কিছু মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া। সহিষ্ণুতা দিয়ে একদিন তার সব প্রতিকূলতাকে জয় করে ঘরে ও মনে শান্তির বাতাবরণ রচনা করা। এটাই হলো মেয়েমানুষের টিকে থাকার নীতি, তার লড়াই-র ধর্ম। পুরুষ হয়ে মেয়ে মানুষের অসহায়তা তুমি বুঝবে না। তোমার প্রত্যাশাকে পাওয়ার পর্যবসিত যদি না হয় তা-হলে সেরকম আস্থা নিয়ে প্রত্যাশা করলে আমার অক্ষমতাই তোমার কাছে আমাকে ছোট করে দেবে। তাই বড় ভয় করছে।

হস্তিনাপুরে পা দেয়ার ক'দিন পরেই টের পেলাম পরিবারের ভেতর আমাকে নিয়ে একটা টানা পোড়ন চলেছে। কেউ কিছু না বললেও বুঝতে তো পারি। আমায় নিয়ে মূল সমস্যাটা কোথায়? অবাঞ্ছিতের মত আমি হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি। যাকে বলে অনধিকার প্রবেশ। এখন ভদ্রতা করে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিতে সংকোচ বোধ করছে, আমার এই অনধিকার প্রবেশটাকেও মানিয়ে নিতে পারছে না। একটা কঠিন সংকটের মধ্যে পড়েছে সবাই।

দেবর বিদুর আর পিতামহী সত্যবতী ছাড়া আর কেউ ভালো করে কথা পর্যন্ত বলে না! পরিচারিকা এবং দাস-দাসীরও চাল চলন কেমন অস্বাভাবিক। তাদের কারো সান্নিধ্য আমার ভালো লাগে না। বোকার মতো আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। কী দেখে তারাই জানে। কোন আজব বস্তুর সন্ধান পেয়েছে যেন আমার মধ্যে। আমি যেন তাদের ভেতর একজন নই। অন্য জগতের এক জীব যেন। তাই কী চেয়ে চেয়ে দেখে। ওদের ওই চাহনি আমার ভালো লাগে না। নতুন পরিবেশে নিজেকে বড় একা আর অসহায় লাগে। ভয়ও করে। আমার দোষটা কী, অপরাধটা কোথায় জানি না।

এখানে আমার আসা থেকেই সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। শুরু হলো এক আত্মক্ষয়কারী সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ নিজের সঙ্গে নিজের, আবার নিজের সঙ্গে পরের। এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভবের সত্যিই কি কোন কারণ ছিল? আমিই এর কারণ ভেবে মনে মনে কষ্ট পেতাম। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতো। আমাকে নিয়ে পরিবারের অভ্যন্তরে যে ঝড় উঠেছে তা সহজে থামবে বলে বোধ হলো না।

যত দিন যায় ততই বুঝতে পারি, বিরোধটা আসলে ছিল দৃষ্টির বাইরে। ঘূণ পোকার মতো এই পরিবারের শিকড়কেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আমি আসার পরে তার জীর্ণদশা বেরিয়ে পড়ল। ইতিহাসের কোন প্রয়োজন মেটাতে মহর্ষি দ্বৈপায়ন ভীষ্মের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা করে আমায় হস্তিনাপুরে রাণী করে এনেছেন? কুরুবংশেরর সঙ্গে আমার অদৃষ্ট কী তবে কোন রহস্যসূত্রে বাঁধা? উত্তর মেলে না। এলোমেলো হাজার প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হয় মস্তিষ্ক।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে একটা উদ্দেশ্য সাধন করতে আমায় রাণী করে এনেছেন, এটা আমার কাছে স্পষ্ট। পিতৃব্য ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর স্বার্থের বিরোধটা সেখানেই। তাঁদের এই বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছি আমি। তাই পিতৃব্য ভীষ্ম আমায় নিয়ে এক দোটানায় পড়েছেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি নিজেকেই ছিন্নভিন্ন করছেন। আমাকে পাণ্ডুর বিয়ে করা অন্যায় হয়েছে, না এই বিয়ে দ্বৈপায়নের হস্তক্ষেপ হয়েছে বলে ভীষ্মের রাগ। বোধ হয় কর্তৃত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে দুই ভাই-এর লড়াই। কৌশলে কে কতখানি জয় আদায় করল, কে হারাল কতখানি তার চুলচেরা হিসেব বিশ্লেষণের এক অদ্ভুত উত্তেজনায় তাঁরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রু। আমায় নিয়ে তাঁদের হার জিতের লড়াই লড়াই খেলা। এই বাস্তব সত্যটা অনুভব করার পর থেকেই একটা অশুভ চিন্তায় সর্বক্ষণ আতঙ্কিত থাকি।

ভীষ্মের ভেতর এক বিপন্ন অসহায়তা এবং অস্থিরভাব লক্ষ্য করেছি। দ্বৈপায়ন, আমার সঙ্গে ভীষ্মের সম্পর্ক ভালো করার পথে একমাত্র অন্তরায়। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। তা নিয়ে বিবাদ-বিরোধ জীইয়ে রাখা মানে আমার মতো নিরীহ, নিরপরাধিনীকে কষ্ট দেয়া। বাস্তবকে অস্বীকার করে চলতে চান বলেই তিনি নিজেও কষ্ট ভোগ করছেন আমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন। এই ধরণের মানুষগুলো একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। তাঁরা নিজেকেও ক্ষমা করেন না, পারিপার্শ্বিককেও না। পারিপার্শ্বিক যখন প্রতিশোধ নিতে আসে তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেই ছিন্নভিন্ন-হন শুধু। কখনো কখনো ইতিহাসের পাতায় সেই রেষারেষি, সংঘর্ষ একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। এই উপলব্ধিই আমাকে চোখ খুলে দেখতে শেখাল।

ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই এসব হাজার এলোমেলো চিন্তা মাথার ভেতর জট পাকায়। কারণ আমি তো আর আগের মতো নেই। আমার সত্তা এখন দ্বিখণ্ডিত। বিয়ের আগের যে জীবন তা একটা খণ্ড মাত্র। পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ের পর আমার আর এক সত্তার জন্ম হলো। জীবনের শাখা-প্রশাখা ফুল কুঁড়িতে ভরে দিয়ে, নারী সত্তাকে-ধন্য করে, মুক্ত, দৃপ্ত, পরিপূর্ণ জীবনের দিকে অনন্ত উৎসারে ধেয়ে চলাই দ্বিতীয় জন্মের সার্থকতা। যা আগের জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের এই জীবনের সূচনাতেই ঘটল নানা বাধা-বিপত্তি। এ বাড়ীতে আমার অবস্থা তো বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়া বাইরের লোকের মতো। বেশ বুঝতে পারছি একটা কঠিন সংকটের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে। ঘর সংসার সাজিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে পুতুল খেলা করতে যে ভাগ্য দেবতা এ বাড়ীতে নিয়ে আসেনি, ফুলশয্যার রাতেই বুঝেছি। এই কথাটা বিধাতা জানান দেবার জন্যই প্রথম মিলন রাতে নির্দয়ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। তা হলে, এখানে আমার ভূমিকা কি? সে কথা ভাবতে গেলেই চোখে ঘুম নামে। বেশি ভাবনা-চিন্তা করা কোনো মেয়ের অভ্যাস নয় বলেই, তাড়াতাড়ি ঘুম জড়িয়ে আসে তাদের চোখে।

একদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। ঘুম খুব গভীর নয়। বেশ বুঝতে পারছি, পাণ্ডু আমার পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। এ-পাশ ও-পাশ করছে। আমাকে ঘুমোতে দেখে ও আমার গা ঘেঁষে শুলো। একখানা পা তুলে দিল আমার গায়ে। চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে লাগল আস্তে আস্তে। মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় দেখতে লাগল। আলতোভাবে একটা চুমু দিল গালে। স্তনে হাত রেখে ওর ঠোঁট রাখল আমার ঠোঁটে। চুমু খাওয়ার জন্যে নয়, তার সব ব্যথাকে নিঃশেষে সমর্পণ করে তার অক্ষমতাই প্রকাশ করল যেন। এর যখন উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে আমার গায়ে। আর আমি কিছুই করছি না। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছি। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শুলাম।

তখন স্বপ্নে বিচরণ করছি আমি। আমার শরীর হাল্কা হয়ে গেছে। আমি হাঁটতে পারছি না। শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। আমার কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, আমার বিশ্রস্ত কেশদাম পাখীর ডানার মতো হয়ে গেছে। এক ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে আমি কাল পেঁচার মতো উড়ে বেড়াচ্ছি।

হঠাৎ পুরুষের গলায় আমায় কে যেন ডাকল। ভেতরটা আমার চমকে উঠল। স্বপ্নে চোখ খুলে কাউকে দেখলাম না কোথাও। কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি, কে যেন হেঁকে বলল : আমি মহাকাল। তোমার মধ্যে আছি। এ পরিবারে আমার ইচ্ছেতেই তুমি এসেছ। তোমার নিজের বলে কিছু নেই,—এমন কি স্বপ্ন কল্পনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও না। উথাল পাথাল ঘটনা স্রোতে তুমি মথিত হওয়ার জন্যেই আছ। যন্ত্রী যেমন যন্ত্রকে দিয়ে তার কাজ করে নেয়, তেমনি তোমাকে দিয়ে আমিও করব। তুমি হলে আমার কালচক্র।

স্বপ্নেই আমি নিজেকে চমকাতে দেখলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবছি এ আমার বিভ্রম। আমি যা শুনেছি, ভুল শুনেছি। কারণ, আমি তো সব সময়ে ভাবি, সংসারে—যার জীবনের যাত্রাপথ প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, কপটতা দিয়ে অভিষিক্ত হলো তার শেষ পরণতি যে কোথায়, কেমন করে কোন চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা যেমন আমার কল্পনায় আসে না, তেমনি আমায় সৃষ্টিকর্তাও হয়তো বলতে পারে না। মনের অভ্যন্তরে এই উদ্বিগ্ন অসহায়তাই হয়তো স্বপ্নে মহাকালের বাণী হয়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক হুঁশিয়ারী পরোয়ানা জারি করে গেল যেন। কথাটা মনে হতেই ঘুমের মধ্যে এক কম্পন অনুভব করলাম। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। মনে হলো সত্যিই বড় অভাগা আমি। অদৃষ্টের শিকার। আমার কেউ নেই। অভিযোগ জানানোর আব্দার করার, আত্মসমর্পণ করার কোন প্রিয়জন আমার নেই যেন। নিজেকে বড় অসহায় এবং একা লাগল।

সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মতো একজন ঋষি এক গাল হাসি নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। সস্নেহে তাঁর পাশে বসাল। বলল : তোমার কেউ নেই। একথা ভাবছ কেন? আমি তো আছি। তোমার একান্ত আশ্রয় এবং বিশ্বস্ত অবলম্বন। তুমি আমার পুত্রবধূ। তোমার সব দায়িত্ব

আমার। আমি থাকতে তোমার ভয় কি? তোমার কাছে আমার অনেক দাবি। কত আশা, স্বপ্ন নিয়ে যে , তোমার দিতে তাকিয়ে আছি—তুমি জান না। তোমাকে জানতে হবে এবংশের ইতিহাস। এমনি করেই হয়তো ইতিহাস তার আপন গতিপথ পরিবর্তন করে। কখনও কখনও সেই পরিবর্তন ইতিহাসের পাতায় সংঘর্ষ, বিরোধের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই যযাতির বংশধরের মধ্যে আর এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে তোমাকে পুত্রবধূ করে এই পরিবারে এনেছি। এই পরিবারে তুমি, আমি দু'জনেই বাইরের লোক। সুতোয় বাঁধা অধিকার নিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছি। ইতিহাস তৈরীর এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করা কি যায়? তা-হলে ইতিহাস সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয়। ইতিহাস তো আর নিজে সৃষ্টি হয় না। এক একজন মানুষকে দিয়ে ইতিহাস তৈরী হয়। যাকে সেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়—আর সকলের চেয়ে একটু আলাদা হয়। নরমে কঠিনে, কোমলে নির্দয়ে মেশানো এক অসাধারণ মানুষ। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই, আবার কারো মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও তার হয় না। তাকে নির্বিকার, নিরাসক্ত হয়ে আরেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ইতিহাসের হাল ধরতে হয়।

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসি! চারদিক চেয়ে খানিকক্ষণ থম ধরে বসে থাকি। সমস্ত অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি। নিজের অজান্তে চোখ দুটো জলে ভরে আসে। নিজেকেই প্রশ্ন করি; এসব চিন্তার শিকড় কোথায়? স্বপ্নের শেকড় কি বাস্তবের মাটিতে থাকে? তা না থাকলে তো চুকেই গেল। সে কল্পনার কোন দাম থাকে না। সে কল্পনা হলো ফানুস। ফানুস ফেটে গেলে ফানুসের আর কোন মূল্য থাকে না; তেমনি আমার অদ্ভুত স্বপ্নও অর্থহীন। ঐ নিয়ে ভেবে মন খারাপ করা কিংবা কষ্ট পাওয়ার কোন মানে নেই।

এসব অনেককাল আগের ঘটনা। কিন্তু কী আশ্চর্য আমি সব ঘটনার মধ্যে অবাধে প্রবেশ করছি। সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে সব এমন করে মনে আসে কি করে? কাল তাকে জীর্ণ করেনি, পুরনোও করেনি। বরং কৌতূহলী উৎসুকী মনে তা একটা নতুন মানে বয়ে এনেছে। এই অনুভূতি ও উপলব্ধি কালের সৃষ্টি। তার সামনেও নেই, পেছনও নেই। মনের আলো পড়ে তার অন্ধকার ঘরের ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্য পরিবেশে মানুষ-জন স্থান সব তেমন আছে। কেবল আমিই বদলে গেছি। চুলে পাক ধরেছে, চামড়া লোল হয়েছে, মুখে বলি রেখা পড়েছে।

এতকাল ধর জানতাম কাল শুধু পুরানো করে, নতুন করে না। কিন্তু সেই জানাটা দাবানলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বদলে গেল। সময় বিশেষে পুরনোও নতুন হয়। ফেলে আসা অতীতের দিকে যখন পিছন ফিরে তাকানো হয় তখন সে আর পুরনো থাকে না। তার গায়ে নতুন, অনুভূতি, উপলব্ধির ছাপ পড়ে। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে সে নতুন হয়ে যায়। পুরনো বলে ভাবাটাই তখন ভ্রম বলে মনে হয়। কারণ, তখন সে আর স্মৃতি নয়, মনে করাও নয়, বাস্তব অনুভূতি। তখন তো তার বাইরেটা দেখি না, সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে, মিলিয়ে তার আত্মাকে দেখি।

পৃথা-কুন্তী-ঈ—ডাকটা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে এল যেন। কেবল, পাণ্ডুই সোহাগ করে এ নামে ডাকে আমাকে। কতকাল পরে সে ডাকটা শুনতে পেলাম। আমার ভেতরটা চমকে গেল। দৌড়ে দরজাব কাছে ছুটে যাই। পর্দা ফাঁক করে দেখি বরের সাজে পাণ্ডু আসছে। পরীর মতো এক ঝাঁক মেয়ে ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তার গায়। আর সেই ফুল বিছানো রাস্তা দিয়ে পাণ্ডু রাজার মতো হেঁটে আসছে। পিতৃব্য ভীষ্ম আগে আগে চলেছেন তার সঙ্গে। পাণ্ডু কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। মুখে তার প্রসন্নতার ছোঁয়া পর্যন্ত নেই। যন্ত্রের মতো ভীষ্মের পাশে পাশে হাঁটছিল। অন্য পাশে ছিল রক্তবসন পরিহিত রাজ পুরোহিত। গা ছুঁয়ে কানে কানে কত কী ফিসফিস করে বলছিল। তা-হলে, পৃথা কুন্তী বলে আমায় ডাকল কে? তবে কি, মনের ভ্রম আমার। পাণ্ডুর ডাক নয়, তবু বুকের গভীর অভ্যন্তরে এই ডাকটা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম। সেই আকুল প্রত্যাশাই হয়তো হাঁক দিয়ে আমাকে বাইরে বার করে আনল।

আমার ঘরের সামনে নিয়ে গেল পাণ্ডু। কিন্তু একবারও ঘরে ঢুকল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলও না। অভিমানে দুঃখে আমি ও ঘরের বার হলাম না। চৌকাঠের কাছে মোটা কাপড়ের পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণের জন্যে বোধ হয় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল। শ্রবণ যন্ত্র বিকল হয়েছিল—উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বাদ্যধ্বনি কিছুই আমার কানে গেল না। পুত্তলিকাবৎ ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি। বুকের ভেতরটা উথাল-পাথাল করছে। নিজের মনে বলছি এ কী অন্যায়! এ কী অন্যায়! অবশেষে ঘেন্না হলো পাণ্ডুর উপর। আর রাগ! পারলে ওকে আমি খুন করতাম। কিন্তু আমার বিবেক বলল : ওর দোষ কি?

সত্যি ওর কোন দোষ নেই। বিয়ের খবর পাণ্ডুই দিয়েছিল আমাকে। উদ্বিগ্ন গলায় বলল : পৃথা কুন্তী আমার বড় বিপদ। পিতৃব্য সত্যি কী চায় আমার কাছে বুঝতে পারি না। তাঁর জুলুমটা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সিংহাসনে আমার আর রুচি নেই। রাজ্যের প্রতি কোন মোহ নেই। আমি শুধু মুক্তি চাই।

ওর কথা শুনে বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী? পাণ্ডুর কাছে পিতৃব্যের এমন কী প্রত্যাশা থাকতে পারে যে তার জন্যে বেচারা দুশ্চিন্তায় এবং ভয়ে আছে। একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। জিগ্যেস করি—তোমার খারাপ হয় এমন কিছু পিতৃব্য করবেন না। তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ।

পাণ্ডু একটু হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল : পিতৃব্য, আমার দ্বিতীয় বিয়ের সব বন্দোবস্ত করেছেন। আমার কোন ওজর আপত্তি শুনবেন না।

উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করি—তার মানে?

নির্লিপ্তভাবে পাণ্ডু বলল : কারণ আছে তাই। ও তুমি বুঝবে না।

রেগে গিয়ে বলি : সব সময় তোমার রসিকতা ভালো লাগে না। আমার মরণ বাঁচনের সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে তুমি কি খুব সুখ পাও?

অসহিষ্ণু হয়ে পাণ্ডু বলল : সত্যিই সুখ পাই না। কিন্তু আমার সুখ দুঃখের মূল্য কি? কিসে আমার সুখ সে কথা বোঝার মতো পিতৃব্যের মন কোথায়? হার-জিতের কাজিয়ায় কে কতখানি জয় আদায় করল—আমায় নিয়ে তার হিসাব করছে। আমি কে? আমার কথা শুনছে কে? মদ্র রাজকন্যা মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করতেই হবে আমায়।

কী কারণে?

কারণ তো বললাম।

তুমি কিন্তু চেপে যাচ্ছ। প্রকৃতই কী হচ্ছে আমার জানা দরকার।

জেনে কী লাভ? পিতৃব্য একবার যখন মনস্থ করেছেন, তার অন্যথা করা সাধ্য কারো নেই। এই পরিবারে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে তুমি এসেছ। অনধিকারে প্রবেশের শাস্তি এখন তোমাকে পেতে হবে। সেই সঙ্গে আমাকেও। তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা রাজপরিবার স্বীকার করেনি। লোকলজ্জার ভয়ে, নিন্দুকের মুখ বন্ধ করতে শুধু মানিয়ে নেয়া হয়েছে। রাজপুত্রদের অনেক অপকর্মের মতো এটি কুকীর্তির উদাহরণ বলে মনে করেন পিতৃব্য। মাদ্রীর সঙ্গে আমার বিয়েটা পরিবারের প্রচলিত নিয়ম মেনে ধূমধাম করে জাঁকজমক করে হবে। কৌরববংশের মর্যাদার জন্যে এবং রাজনৈতিক সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে এই বিয়ে একান্ত জরুরী।

কথাটা শুনে আমার বুকটা ঝাঁ করে উঠল। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল মনে। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এবং ভীষ্মের রেষারেষি, ঈর্ষা, ঝগড়া, আমার জীবনকে বিষময় করে তুলেছ। রাজা বলেই পাণ্ডুকে তাঁরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্য অর্জনের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তার ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে ভীষ্ম দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহে বাধ্য করেছে। একবারও তার মনের দিকে ফিরে তাকানোর গরজ পর্যন্ত বোধ করলেন না। তিনি নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর। দ্বৈপায়নের উপর রাগের প্রতিশোধ নিতে আমাকেই শাস্তি দিচ্ছেন। পাণ্ডুকে কেড়ে নিয়ে আমাকে একেবারে একা করে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য। জীবনের সব প্রাপ্তিকে এক ভয়ঙ্কর অপ্রাপ্তিতে ভরিয়ে দেয়ার ভেতর বোধ হয় তাঁর এক ধরনের

গভীরতর সুখ নিহিত আছে। সেই জন্যেই ভালো মানুষদের কপালে ভালোবাসা জোটে না। ভীষ্ম ভালোবাসার কী বুঝবে? যে মানুষ নিজেকে ভালোবাসেনি, প্রেমকে শ্রদ্ধা করেনি, তার জীবনই বৃথা। ভালবেসে নরনারী পরস্পরের কাছে যে কত দামী, কত মহার্ঘ্য হয়ে উঠে তা পিতৃব্য ভীষ্মের মতো ব্যর্থ মানুষ জানবে কেমন করে? তা অনুভব করার ক্ষমতাই তাঁর নেই।

প্রত্যুত্তরে বলিঃ পিতৃব্য ভীষ্ম আমাকে মেরে দ্বৈপায়নকেই শিক্ষা দিলেন যে, এই পরিবারে তিনি কেউ না। তাঁর কথাই শেষ কথা। দ্বৈপায়নকেই শিক্ষা দিলেন যে, এই পরিবারে তিনি কেউ না। তাঁর কথাই শেষ কথা। দ্বৈপায়ন টেক্কা দিয়েছে বলেই ভীষ্ম সমঝে দিলেন তাঁকে। দ্বৈপায়নের উপর তাঁর রাগের সব ঝাপ্টা আমাকে একা বুক পেতে গ্রহণ করতে হলো। এই অনাদর অপমানের কাঁটা হয়ে বিদ্ধ করেছে আমাকে। আমি অবাঞ্ছিত। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেললাম। ধরা গলায় বললামঃ তুমি কি গো? রাজা হয়েও হাতের পুতুল হয়ে থাকবে? তোমার কথাই তো শেষ কথা। তা-হলে, তুমি কেন ভীষ্মকে অমান্য করতে ভয় পাচ্ছ?

পান্ডু কিছু বলতে দ্বিধা করল। কী যেন বলি বলি করেও সামলে নিল। কয়েকবার ঢোক গিলে বললঃ পৃথা-কুন্তী তোমার কষ্ট আমি বুঝি। মানুষ যেহেতু তার মনের কারণেই মানুষ তাই তার কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে। খুব কম মানুষই তার ভাষা বোঝে। তুমিও নিজের দুঃখটাকে বড় করে দেখলে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা যে আমাকেও ছিন্ন ভিন্ন করছে ভিতরে তার রক্ত ক্ষরণ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না বলে, আমার উপর তোমার রাগ।

দিশেহারা রাগের চোটে পান্ডুর জামা দু'হাতে খামচে ধরে টানতে লাগলাম প্রবল জোরে। আর সে অসহায়ের মতো আমার হাতে নিষ্পেষিত হতে লাগল। প্রবল ঝাকুনি খেয়ে তার মাথাটা লটপট করতে লাগল ঘাড়ের উপর। চোখ দুটো তার কষ্টে বোজা। তবু আমার বুকে একফোঁটা দরদ কিংবা করুণা নেই। মেয়ে শকুনের মতো ফ্যাসফেঁসে গলায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলিঃ আমি কি গাঙের জলে ভেসে এসেছি? আমি ফেলনা! তোমাদের ঘরে তো নিজের পায়ে হেঁটে আসিনি? তা-হলে আমাকে নিয়ে এত হেনস্তা কেন? আমাকে অপদস্থই বা করা হচ্ছে কেন? আমি তোমাদের কী করেছি? আমার দোষই বা কী? ভীষ্ম দ্বৈপায়নের ঝগড়ার খড়্গ আমার উপর পড়বে কেন? তোমার বিচার বুদ্ধি বলে কি কিছু নেই। আমার জীবন তো নষ্ট করেছ। আর একটা মেয়ের জীবনকে নষ্ট করতে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ব্যর্থ করতে, তোমার বিবেক তোমাকে বাধা দিল না? ছিঃ! তোমাকে আমার ঘেন্না করছে।

পান্ডু চুপ করে থাকাতে আমার রাগ আরো চড়ল। ঝাঁকুনির চোটে তার রুগ্ন শরীরটা কেমন যেন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ও হাঁফাচ্ছিল। কথা বলতে পারছিল না। অতি কষ্টে উচ্চারণ করলঃ আমি তো তোমার উপর কোন অবিচার করেনি। এ বিয়েটা সত্যি আমি চাইনি। মাদ্রীর কাছে নতুন করে ছোট হয়ে যেতে সত্যি আমার অপমান লাগছিল। ভয়ে নয়, উত্তেজনায় নয়, একধরনের চাপা অপ্রকাশ্য অক্ষমতার অনুশোচনায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। আমার দু'চোখে ঘেন্নার আগুন। পান্ডু জানে, তার মতো নিবীর্য অক্ষম অযোগ্য পুরুষ মানুষকে দয়া করুণা করা যায়, অনুগ্রহ দেখানো যায়, কিন্তু ভালোবাসা যায় না। জোর করে জীবনের লজ্জা পাওয়া যায়, গ্লানি পাওয়া যায়, কিন্তু জোর করে কি কোন আনন্দ পাওয়া যায়? ভালবাসা-জনের শরীর পাওয়ার জন্যে কাঙালপনা থাকে সমর্পণের নীরব স্বীকৃতিতে তা আনন্দময় হয়ে ওঠে। যাকে ভালোবাসি তার যদি শরীরই সাড়া না দেয় তো কিসের ভালোবাসা? কিসের সম্পর্ক? সব নারী পুরুষের তারুণ্যের সম্পর্ক শরীরে উপর গড়ে উঠে। শরীর ছাড়া মনের কানাকড়িও দাম নেই তখন। পান্ডুর মতো পুরুষত্বহীন পুরুষ যার স্বামী হয় তাব মতো হতভাগিনী নারী হয় না। সাতপাকের বাঁধনটা ছেঁড়া যায় না বলে নিজের সঙ্গে ঝগড়া করে, ছেলে ভুলোনো ভালবাসার কথা বলে, হতাশ ও গ্লানি বুকে জমিয়ে রেখে মৃত্যু অবধি এভাবে জীবনের প্রবৃত্তিগত ভালোবাসার আবেগকে গলা টিপে মেরে ফেলাব নাম মেয়েদের আনুগত্য, তার সতীত্ব। ছিঃ বলে নিরুচ্চার নিজেকেই ধিক্কার দিই। যতদিন বেঁচে থাকব ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস,

সন্তানহীনতার হাহাকার, বুক ভরা অভিমানের বোঝা নিয়ে, বোবা কান্না নিয়ে পথ হাঁটতে হবে একা। এ জীবনে স্বামীর কাছে নারীর প্রত্যাশার কিছু নেই, দাবি করারও কিছু নেই। এভাবে জীবন কাটানো বড় কষ্টকর, একঘেয়ে। কিন্তু পাণ্ডুর বিয়ে হওয়াতে এখন আমি একা হয়ে গেলাম। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। সব রাগ অভিযোগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অসহায়ের মত ওর বুকের উপর মুখ রেখে দুহাতে আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলি—সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে একা পেতে দিলে না আমাকে। ছাই ভালোবাস আমাকে? তুমি আমার হলে না। তোমার আগুনে পুড়ে ছাই হতে দিলে না। শুধু বুকের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে রাখলে। বড় নিষ্ঠুর তুমি। আমি তো তোমার মতো মানুষ নই। একজন অতি সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু কী নিয়ে আমি থাকব? অথচ, তুমি চাইলেই এ বিয়ে হতো না। তুমি চাও না বলেই আমার কথা একবারও না ভেবে, মদ্ররাজ্যে যাচ্ছ।

পাণ্ডু বললঃ সাধ মিটিয়ে তোমার অভিযোগ অনুযোগ কর। তোমার যা খুশি আমাকে বল। আমি নিরুপায়। আমার ভবিতব্য। একজন রাজাকে অনেক বিয়ে করতে হয়। রাজা বলেই তার প্রাণে অনেক ভালোবাসা থাকে। কোন রাজার কাছে আগামীকালের ভরসা প্রত্যাশা রেখ না। রাজারা প্রয়োজনের জীব।

কথাগুলো বলে পাণ্ডু চলে গেল। আর দাঁড়াল না। এই কঠিন কথাটা বলার জন্যই হয়তো এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওর চলে যাওয়ার পরে আমার বুক জুড়ে দেখা দিল হারানোর ভয়! ও কি আমার কাছ থেকে সত্যি দূরে সরে যাবে? ওর উপর আমার কোন দাবি থাকবে না? আমি একা হয়ে যাব? অনাথ হয়ে যাব? বুকটা হায় হায় করে উঠল। নিজের মনে প্রশ্ন করি ওকে ছাড়া আমি বাঁচব কী করে?

সারা রাত সেদিন জেগে কাটিয়েছি। চিত্রার্পিতের মতো পাণ্ডুর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকেছি। সারা রাত ধরে শুধুই মনে হয়েছে। এই মানুষটিকে কাল থেকে আমার পাশে দেখতে পাব না আর। অন্য এক রমণীর সাথে নিশি যাপন করবে। ও আমার আর কেউ নয়! ওর সঙ্গে বিয়ে বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। বলা যেতে পারে একটা পুরুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবাস। সত্যি ঐ মানুষটির কী আছে? ও কোনদিন আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও সমর্থ হবে না। তবু ওকে ছাড়া এই মুহূর্তের আমি আর কিছু ভাবতে পারি না কেন? এই মানুষটি আমার জীবন ব্যর্থ করে দিল ওকে অস্বীকার করতেও পারছি না। পুরুষত্বহীন, দুর্বল, ভীরু, লোকটির নিঃশর্ত আনুগত্যের যাদুবলে আমাকে দখল করে আছে। এ থেকে আর মুক্তি নেই। কত যে পাপ করেছি গত জন্মে। চকিত বিদ্ধ একটা শূন্যতার হাহাকার বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণায় ক্রিয়াশীল তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল।

রাত বাড়ছে। চারদিক নিঝুম। অবসাদে ক্লান্ত লাগছে। ঘুমে দু চোখ বুজে আসছে। পাতলা তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো পাণ্ডু আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আদর করছে। চুলের ভেতর বিলি কেটে দিতে দিতে থমথমে গম্ভীর গলায় বলছেঃ পৃথা কুন্তী তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করছ কেন? তোমার আমার জীবন আলাদা আলাদা। তোমার জন্যে জীবনে করার মতো কিছুই করতে পারলাম না। একটা সন্তানও তোমার কোলে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সমস্ত দীনতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই। আমি স্বার্থপর নই! তোমাকে মিথ্যে বিয়ের তেতো বাঁধন থেকে চিরতরে মুক্তি দিলাম। জীবনটা বাঁচবার জন্য, নষ্ট করবার জন্য নয়। কে কি বলল, মনে করল সেই ভয়ে তোমার জীবনের সাধ-আহ্লাদ ব্যর্থ করে দিও না। নিজেকে ঠকিও না। তোমার যা ভালো লাগে, তাই করে সুখী হও। কী ভাবে কেমন করে সে সুখ তুমি পাচ্ছ, তা আমার জানার পর্যন্ত দরকার নেই। পাপ পুণ্য মনের ব্যাপার। মনে যদি পাপ বোধ না জাগে শরীরে তার কোন দাগই লাগে না। লাগলেও ধুলো-বালির মতো ঝেড়ে ফেলা যায়। আমি বুঝেছি, শরীরকে খুশী না রাখলে মনটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনের মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য নয়। কাম হলো প্রাণের পূর্ণ এবং সুস্থ প্রকাশ। প্রকাশ উদ্বেল জীবনী শক্তির।

পাণ্ডুর কথা শুনে আমি তো অবাক! এই মানুষটা বলছে কি? আমার জীবন নষ্ট করে কার সাধ্য? আমার সমৃদ্ধ জীবন এত অল্পে তা বিপন্ন হওয়ার নয়। আমার মাথার মধ্যে শিরাগুলো দপদপ করছে। আর আমি উত্তেজিত হয়ে পাণ্ডুর বুকে মাথা কুটছি। হাউ হাউ করে কাঁদছি, আর বলছি—না, না। আমি পারব না, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

গায়ের উপর একটা, কৃশ হাতের ঠান্ডা স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে গেল জেগে উঠে চোখ মেলে দেখি পাণ্ডুর হাত আমার গায়ে।

আমার সকল দুর্ভাগ্যের সঙ্গী সুদর্শনার ডাকে চমকে তাকালাম। এক মুহূর্তে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরলাম। এভাবে আর কতক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকবে? যে যাবার সে তো গেছে চলে। এখন তুমি কী করবে? তোমার কপালটাই মন্দ। দাক্ষিণ্য যদি বা জোটে, কপালে সয় না। দুর্ভাগ্য তোমার পিছন পিছন দৌড়ায়, সৌভাগ্য তাই আর নাগাল পায় না।

ওর কথা শুনে আমার দু'চোখ ভরে জল নামল। আমি কথা বলতে পারলাম না। ভাগ্যের কাছে আমি ক্রমাগত হেরে যাচ্ছি। এক একজন মানুষ থাকে সংসারে যারা শুধুই হারবার জন্যে বেঁচে থাকে। হেরে যাওয়াটা কী বেদনাদায়ক তা কেবল হেরে যাওয়া মানুষই জানে। আশ্চর্য! কোন মানুষই হারতে চায় না। তবু একজনকে হার মেনে নিতে হয়। হার আছে বলেই জেতার কথাটা ভাবি। জেতাটা বড় আনন্দের।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মনে মনে বলি, কোন হারাই হার নয়। হেরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় জেতা। জন্মালেই যেমন মানুষকে মরতে হয়, মরার জন্যেই মরবার আগে মানুষকে অনেকবার মরতে হয় তেমনি জেতার জন্যে অনেকবার হারতে হয়—এ কথাও সত্য। হেরে জেতার শিক্ষানিবিশি করতে হয় মানুষকে অনেককাল ধরে। তবে কি ভাগ্য জেতানোর জন্যে আমাকে শিক্ষানবিশি করছে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। জেতার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না করছি। তবু ভয়, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে। ভিতরটা কিছু করার দুঃসাহসী উন্মাদনার আবেগে থর থর করে কাঁপছে। আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না। দুপুর কাটিয়ে অপরাহ্নে পিতৃব্য ভীষ্মের ঘরে পা রাখলাম।

আমার অবাক হওয়ার পালা। ভীষ্ম নিজে এক দোটানায় কষ্ট পাচ্ছেন। নিজের বিচার বুদ্ধির সঙ্গে অবিরাম বিবেকী সংঘাতে নিজেকেই ছিন্নভিন্ন করছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল লড়াইটা তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের। এক অসহিষ্ণু উত্তেজনায় ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন যেন। তাঁকে দেখে রাগ করার বদলে দয়া হল। মানুষটা কত অসহায়, কত দীন একা যে চোখে না দেখলে জানাই হতো না। কিন্তু তাঁর এই কষ্ট?

আমার পায়ের শব্দে চমকে তাকালেন। এরকমভাবে তাঁর কক্ষে যে আমি প্রবেশ করতে পারি, তিনিও বোধ হয় চিন্তা করেননি। শুনেছি, কৌরব বধূ গান্ধারীও কখনও তাঁর ঘরে সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে আসেনি। আমিই সর্ব প্রথম তাঁর কক্ষে তাঁরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মতো কাঁপছি। হঠাৎ-ই গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করি। কিন্তু তিনি প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন। মুগ্ধ কণ্ঠে বললেম ঃ আমাকে তুমি অবাক করে দিয়েছ। সেই আমার কাছে এলে, কিন্তু বড় দেরী করে ফেললে। সময়ে না এলে, আসাটাই বৃথা হয়ে যায়। এই আসার কোন মানে হয় না। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

আপনাকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। স্বপ্ন দেখতাম, আমার অপমান ভাঙতে আপনি দৌড়ে আসছেন আমার ঘরে। স্বপ্ন কখনও সত্য হয়? সে জন্যই দেরী হয়ে গেল। তার জন্যে আমার ক্ষোভ কিংবা অভিযোগ নেই। বরং আশ্চর্য হয়েছি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আপনাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে। মিছিমিছি কার জন্যে এই কষ্ট পাচ্ছেন? কিসের কষ্ট? আপনার মনোবেদনার উপশম হয় এমন কিছু করতে পারলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। কোন অপরাধে আপনার কাছ থেকে দূরে রেখেছেন আমায়? আমি আপনার কী করেছি?

বিস্ময় নিবিড় চোখ মেলে ভীষ্ম চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। আমার আকুল করা সমবেদনায় তাঁর

ভেতরে কি যেন গলে পড়ছিল। মুখের অভিব্যক্তিতে অপরাধ রাখার জায়গা নেই যেন। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে বলল জীবনভোর এমন মরমী মন নিয়ে কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। কেউ জানতে চায়নি আমি কেমন থাকি? আমার মনে কত ব্যথা, যন্ত্রণা সে খোঁজও নেয়নি কেউ। তোমার কথাতেই আমার পাওয়ার ঘর ভরে গেল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর তীব্র ভালবাসা। আচমকা আমার বন্ধ দরজার উপর করাঘাত করে জাগিয়ে তুললে কেন? কী দরকার ছিল দরদ দেখানোর? আমি তো কারো অনুগ্রহ, দয়া, করুণা, চাই না। আমার কাছে তোমাকে পাঠাল কে?

এরকম একটা পাল্টা প্রশ্নে আমি থতমত খেয়ে যাই। একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। পাছে আমার বিব্রত ভাবটা ধরা পড়ে যায় তাই লাজুক অপ্রতিভ হেসে বলিঃ কেন আসতে নেই? আপনি তো আমাকে কখনো ডেকে নিলেন না। তাই নিজের অধিকারে এসেছি আপনার স্নেহের ভাগ নিতে। দূরে সরে থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন?

আমার কথা শুনে ভীষ্মকে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে দেখলাম। মনে হল তিনি কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমার কথাটা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক নয়। একেবারেই মামুলী। তবু ভীষ্ম তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে দুর্বল গলায় বললেনঃ নিজেকে বঞ্চিত ভাবার মতো কিছু হয়েছে কী?

আমার দুচোখে বিস্ময়, অধরে মৃদু হাসি। উত্তর দিতে বিপন্ন বোধ করছি। অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চাইছি। চোখের দৃষ্টিতে একটু লজ্জা লজ্জা ভাবও। সাবধানে, তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলিঃ চারদিকে ছোট মনের ছোট স্বার্থের মানুষ জনের মধ্যে অহরহ বাস করতে মনটা অন্যরকম হয়ে যেতে চায়। নিজের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে বসি। আর তখন আপনার উপর খুব অভিমান হয়। দুঃখও হয়। কিন্তু সে সবের আর দাম কী?

ভীষ্ম প্রত্যুত্তরে বললঃ সত্যিই তো যে দাম দেয় রাগ, দুঃখ অভিমান তার উপরেই করা যায়।

ধরা-ছোঁয়ার বাইরের মানুষটির কথা শুনে আমার হাসি পেল। ম্লান, বিষণ্ন হাসি হলেও বুকের গভীর থেকে উঠে এল। মাথা নেড়ে বললামঃ জানি। কিন্তু বাঁচবার জন্যে তো একটা স্থির প্রত্যয় ভূমি তো চাই। জীবনের সুখ দুঃখগুলিকে অহরহ সহ্য করা যায় না। সহানুভূতি, সমবেদনার মরমী স্পর্শ তখন নতুন প্রাণ দেয়। বীতশ্রদ্ধ জীবনকে নবীকৃত করে তোলে।

আমার কথায় ভীষ্ম খুব আপ্লুত হলো কিনা বোঝা গেল না। শুকনো ঠোঁটে কাষ্ঠ হাসল। কষ্ট করেই হাসল। বললেনঃ জীবন রহস্যকে গভীর করে বোঝার কিংবা জানার অবকাশ ঈশ্বর দিল কৈ? হস্তিনাপুরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে বহু স্বার্থের রাজনৈতিক তমসায় আচ্ছন্ন। কী করলে হস্তিনাপুরে কৌরববংশের স্বার্থ নিরাপদ করা যায় তার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দিনরাত কেটে যায়। হৃদয়চর্চা করার সময় পাই না। সিংহাসনের তাবেদারী করতে করতে এমন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে যে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় রাজত্ব আমি চালাই না, আমাকে রাজত্ব চালায়?

উত্তর দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকি। যে কথা বলতে এসেছি ভূমিকা না করে সেকথা বললে বড় স্বার্থপর মনে হয় নিজেকে। তাই একটু জোর খাটানোর নাটক করতে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। এখন তাঁকে সত্য কথাটা জিগ্যেস করব কি? না যা ঘটেছে বা হয়েছে নীরবে মেনে নেব তাকে। কিছুই স্থির করতে পারছি না। একটু ইতস্তত করে চলে যাব বলে পা বাড়াই। ভীষ্ম পিছন থেকে ডাকলেন। বললেনঃ তুমি তো কিছু বলতে এসেছিলে। শুধু ভূমিকা করে চলে যাবে? সাবধানে একটা দূরত্ব রক্ষা করে আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন সত্যি আমি বুঝি না। বুঝতে চেষ্টা করছি; যে অধিকার নিয়ে তুমি দাবী জানতে এসেছ তা কতখানি আন্তরিক! নাটকের অভিনয় আর জীবনের স্বাভাবিকতা এক নয়। জানি, আমার বিরুদ্ধে তোমার অনেক নালিশ আছে। কিন্তু খোলাখুলি আমাকে জানাতে পারলে না। জানালে হয়ত দেখতে নালিশ করার কিছু নেই। সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি তোমাকে আগলাতে চেয়েছি।

হঠাৎ-ই ক্ষোভের বশে বলে ফেলি, আমাকে নয়, আপনাদের ছেলেকে আগলেছেন তা জানি। কিন্তু সে আমার জন্য নয়, আপনার জন্যেই।

ভীষ্ম হেসে বললেনঃ এটা তোমার কথা নয়, শেখানো বুলি। তারা তোমাকে অমন বুঝিয়েছে।

দৃঢ়স্বরে আমি প্রতিবাদ করলাম। এসব শেখাতে হয় না। একটু চোখ, কান খোলা রাখলেই টের পাওয়া যায়। কারুর কথায় ওঠ-বোস করার মেয়ে নই আমি।

আমার স্পষ্ট ভাষণে ভীষ্ম কিছুমাত্র রুষ্ট হলেন না। বরং মৃদু হেসে বললেন ঃ তা কি জানি নে। তোমার শক্তিও যেমন আছে, দুর্বলতারও তেমনি শেষ নেই। তুমি বুদ্ধিমতী, ধৈর্যশীলা, কোন সময় কাজ করলে সুফল লাভ বেশি হয়ে সে বোধও তোমার তীক্ষ্ণ। যত দেখছি, অবাক হচ্ছি। হস্তিনাপুরে আজ পাণ্ডুর রাজমর্যাদা, গৌরব এবং সম্মান বেড়ে গেছে, সে তো তোমার জন্যে। তোমার কৃতিত্বে আমি গর্ব অনুভব করি।

ভীষ্মের কথা শুনে কান জ্বালা করে উঠল! ঠিক বুঝতে পারলাম না, তিনি ব্যঙ্গ করছেন, না মনের কথা অকপটে বলছেন। তবু অবিশ্বাসে, সংশয়ে প্রতিবাদে ভেতরটা সোচ্চার হলো। শান্তভাবে বললামঃ কী জানি? বিশ্বাস করতে মন চায় না।

ভীষ্ম মৃদু হেসে বললঃ বিশ্বাস করা সহজ নয়। কিন্তু তোমার জানা উচিত ছিল ভীষ্ম মিথ্যে বলে না। কাউকে তোয়াজ করে কথা বলতে জানে না। তাছাড়া, তুমি আমাদের ঘরের বৌ, তোমার স্তুতি করে আমার কোন লাভ নেই। কিন্তু যা বলেছি, তা সত্যি।

আমার কথা হারিয়ে যায়।

বাঁকা হাসিতে ভীষ্মের ওষ্ঠাধর ধনুকের মতো বঙ্কিম হলো। বললেনঃ চুপ করে থাকলে কেন?

কী বা বলব? আমার নিজের জন্য বড় ভাবনা হয়।

ভাবনা? তোমার জন্যে? কেন? কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কী করে বোঝাই আপনাকে? মেয়ে মানুষের মুখে অনেক কথাই মানায় না। তাই তো তার বুক ফাটে মুখ ফোটে না।

বেশ তো, নির্দ্বিধায় তোমার নালিশ জানাতে পার।

নালিশের যেখানে প্রতিকার হয় না, সেখানে অর্থহীন নালিশ করে নিজেকে অসম্মান করার কোন মানে হয় না। মদ্র রাজকন্যার সঙ্গে হস্তিনাপুর নরেশের পুনর্বিবাহের ভূমিকা তো আপনি ভালো করে জানেন। সুতরাং নতুন করে বলার কিছু নেই। বড় একা হয়ে গেলাম। মাথায় উপর হঠাৎ ঘরের ছাদ উড়ে গেলে মানুষের যেমন অসহায় লাগে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, আশ্রয়হীন মনে করে তেমন একটা বোধে আমার ভেতরটা টাটাচ্ছিল। আমাকে রাণীর আসন থেকে জোর করে ধূলোমাটির মধ্যে টেনে নামানো হলো যেন। এই অপমানটা ভুলতে পাচ্ছি না। এ এক আজব শাস্তি।

আমার কথাগুলো ভীষ্ম খুব কৌতুক ভরে শুনলেন। সহসা একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া পড়ল তাঁর গৌরবর্ণ মুখে। সহসা কথা খুঁজে পেলেন না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। দুই চোখের কোটরে তাঁর ব্যথা জমে উঠল। প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন। ধনুকের মতো ওষ্ঠাধরে পাথর কঠিন দৃঢ়তা। ধীরে ধীরে বললেনঃ তোমার কথা আমিও যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। তোমার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়। হস্তিনাপুরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দ্বন্দ্বও অন্তর্কলহের মধ্যে যারা তোমাকে টেনে আনল জবাব দেবার দায়িত্ব তাদের। হস্তিনাপুরকে রক্ষা করার সে দায়িত্ব আমরণ পালন করতে হবে। যারা হস্তিনাপুরের সুনাম নষ্ট করতে চায়, তাদের দুষ্ট অভিসন্ধির মুলোচ্ছেদ করতে আমাকে যদি নির্দয় হতে হয়, সে কি আমার দোষ!

তিক্ত ভারি মন নিয়ে পিতৃব্যের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এক বুক অপমান নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে যেন নিজেরই কেমন অপ্রস্তুত লাগছে। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করলে যেমন ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিয়েতে তেমন এক অন্ধকার নামল আমার চোখে। বড় একা আর শূন্য লাগল। ভাগ্যের কাছে হেরে যাওয়ার দুঃখটা বুকে দামামার

মত বাজতে লাগল। সেই সময় বিদুর এল অপ্রত্যাশিতভাবে। ওকে দেখে আমার ভীষণ কান্না পেল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে মাথার বালিশের মধ্যে মুখ, গুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। দুঃখে অভিমানে নয়, একান্ত নিরাশ্রয়ের পরম আশ্রয় লাভের মতোই অসহায় কান্না। হেরে যাওয়ার কান্না। এ কান্না যেন একজন সমব্যথীর বুকে সাগর হয়ে মিশে যেতে চায়।

আমার ঘর নিঝুম। থমথম করছে। চারদিকে এক অদ্ভুত শূন্যতা। বিদুর কী করবে ভেবে স্থির করতে পাচ্ছিল না। বিছানায় মাথার দিকে বসল। আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল বিদুর।

এ ভাবে আমার বিছানার পাশে বসে নি কোনদিন। কেমন একটা লজ্জায় ভীষণ কুঁকড়ে গেল ভেতরটা। মুখ লাল হয়ে গেল। তাই-ই নয় এই বাড়াবাড়ি ঔৎসুক্যে লজ্জাও করছিল ভীষণ। লজ্জাটা গোপন করতে তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ গুঁজলাম। কিন্তু বিদুর নড়ল না। ওকে চলে যেতে বললে আহত হবে। তাই কিছু বললাম না।

আমার বুকে তখন ঝড়ের দোলা। কত কথাই মনে হচ্ছিল। পান্ডুর সঙ্গে বিয়ে না হলে ভালোই হতো। মানুষটা বড় রুগ্ন। একটুতেই ভোগে। কটা দিনই বা ভালো থাকে? ভালো করে তুলতে বিদুর প্রাণ ঢেলে সেবা করত! তার সেবা, যত্ন, শুশ্রুষায় পান্ডু সুস্থ হয়ে উঠতো দ্রুত। বিয়ের পরেও বিদুর এই দায়িত্বটা ত্যাগ করেনি। নিন্দুকের নানা কথা সত্ত্বেও বিদুর পান্ডুর দেখাশোনা করতে আনন্দভবনে যাতায়াত একদিনও বন্ধ করেনি। পান্ডুর দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের ইচ্ছেতেই সে নিয়েছিল। কারো কথাতে নয়। সুতরাং লোকে কী বলল তার ভয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে যাবে কেন? এক মুহূর্তের জন্য নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারাতে বা অন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে সে প্রস্তুত ছিল না। এই স্বাতন্ত্র্যের জোরেই বোধ হয় বিদুর কৌরব পরিবারে সর্বময় ছিল। সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব খাটত। সবাই তাকে ভালোবাসত। সব কাজেই সে ছিল দক্ষ। তার নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, কর্তব্যজ্ঞান, সহানুভূতিবোধ আমাকে বিদুরেব দিকে প্রবলবেগে টানতে লাগল।

বলতে বাধা নেই, একা থাকলেই নিজের কথা বেশি করে মনে হয়। ছোট্ট জীবনটার তখন একটা মূল্যায়ণ করতে বসি। অবৈধ পুত্র জন্ম দেয়ার জন্যে আমার মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধ ছিল। এই বোধটা আমাকে ভীষণভাবে অর্ন্তমুখী করেছিল। সংকোচে, ভীরুতায় আমি নিজেকে সর্বক্ষণ গুটিয়ে রাখতাম। আমার মনের কাছেই বন্দী ছিলাম। আর বিদুর ছিল মুক্ত। প্রাণবন্ত, আলাপচারী। তার তারুণ্যভরা আনন্দোজ্জ্বল উষ্ণ হৃদয়ের সাহচর্যে আমাকে বার করে আনল ভেতর থেকে। আমার অসঙ্গতিকে সে আবিষ্কার করল। নৈরাশ্য, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা এবং যন্ত্রণাকে সে ভাগ করে নিল আমার সঙ্গে। আমার দুঃখ, বেদনা, বিচ্ছিন্নতার কষ্ট তাকে করে তুলেছিল প্রচণ্ড সংবেদনশীল। আমার দিকে এই পরিবারের কোন লক্ষ্য নেই বলে যে একজন মানুষের, আমার একটু মনোযোগ এবং সাহচর্য দরকার বিদুর সেটা ভালোই বুঝত। আমি যে আশ্রয়হীন, আমার যে একটা অবলম্বন চাই বিদুরের মতো এমন নিবিড় করে কেউ বুঝতে চায়নি। তার এই সমবেদনা আমার মধ্যে বন্ধনের কাজ করত। সে বন্ধন বন্ধুত্বের, একজন সত্যকারের আত্মীয়ের। বিদুরের সমবেদনা ও ভদ্রতা আমার মনকে ছুঁয়েছিল। যতদিন যায় ততই মনে হতে লাগল এই শক্ত-সমর্থ, বিশ্বস্ত, মিষ্টভাষী যুবকটি জীবনের পরম আশ্রয়। আমার জীবন তরীর নোঙর।

পান্ডুর কাছে আমি কিছুই পাইনি। অথচ, সব মানুষ চায় এমন একজন মানুষের সাহচর্য, প্রেম, সহানুভূতি যে তাকে আনন্দ দেবে, আশ্রয় দেবে, পালন করবে, ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে একটা ছোট্ট গৃহ, সংসার আর সন্তানের স্বপ্ন সফল করবে। কিন্তু পান্ডুর সে আবেগ কোথায়? সে ক্ষমতাও তার নেই। তাই বোধ হয় তার মনের কাছ থেকে আমি দূরে সরে গেছি। সেই শূন্য জায়গাটা বিদুরের সান্নিধ্যে, স্বপ্ন এবং স্মৃতিতে একটু একটু করে ভরে যাচ্ছে।

বিদুরই আমার দুঃখের বন্ধু। সবচেয়ে কাছের মানুষ। সত্যিকারের শুভার্থী। আমার অসহায় অভিযোগের সান্ত্বনা দিতে কতবার বলেছে, যত মানুষ আমাদের চেনে, তার চেয়ে কম মানুষের ভেতরে যদি আমরা বাস করতাম তা হলে জীবনটা অনেক শান্তির হতো। হয়তো সুখেরও হতে পারত। এখানে এত মানুষের মধ্যে তুমি আছ, কিন্তু তারা কেউ তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। তাদের

চেনাও কষ্টকর। একটা কথা বলব। উপদেশ বা জ্ঞান বলে নিও না। কারণ তা দেবার যোগ্যতা আমার নেই। তোমার বিবেক, মনকে যারা মানুষের বলে ভাববে, কেবল তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখবে। বেশি লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেয়ে দুচার জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অনেক দামী। আবার, এটাও ঠিক বাঁধা-ধরা নিয়মের ভেতর সব সময় চলা যায়না। যখন যেমন দরকার বুদ্ধি করে তেমন তেমন পথে চলতে হয়।

বিদুরের কথার সুগন্ধে আমার বুক ভরে গেল। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি। ওকেই পরম বন্ধু বলে সেইদিন থেকে মেনে আসছি।

ধীরে ধীরে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠলাম। আমাদের বিবাহিতা জীবন খুবই সাদামাটাভাবে কেটে যাচ্ছিল। অপ্রাপ্তির পাল্লাটা আমার ভারী হচ্ছিল প্রতিদিন। সে কথা কেউ জানে না। সেই জানার মতো গভীরতা কৌরব পরিবারে কারো ছিল না। আমিও সেকথা বাইরের সকলের কাছে গোপন রেখেছিলাম। নিজের হাসি আর উচ্ছলতা দিয়ে সব কিছু ঢেকে রেখেছিলাম। পাছে পাণ্ডুকে ছোট করা হয় তাই নিজের বুকের দুঃখকে বাইরে কারো সামনেই একমুহূর্তের জন্যে প্রকাশ করিনি নিজের কষ্টে নিজে পুড়েছি। বিদুরই একটু একটু করে ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল। থমথমে গম্ভীর মুখে আমার দিকে চেয়ে বললঃ তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাব তাই না? কিন্তু মানুষের মুখ চুপ করে থাকে না। সে কিন্তু ঠিক বলে দেয় শরীর মনে কোথায় আগুন লেগেছে, কোথায় অর যন্ত্রণা, ব্যথা, কতরকমের কাতরানি। মুখ সব ফাঁস করে দেয়। তুমি লুকতে চাইলেও আমি বিশ্বাস করব না। দর্পণ আর মুখ কখনও মিথ্যে বলে না।

বিদুরের কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। এক গভীর বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল মন। দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। তবু দারুণ লজ্জার কাছে মনের সে যন্ত্রণা কিছুই নয়। মুখে এক গভীর বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। বললাম চমক লাগানো কথা বলে নিজের কাছ থেকে ছাড়া অন্যের কাছে হাততালি পাওয়ার আশা কর না।

বিদুর ভুরু কুঁচকে বললঃ যে মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চায়, ধরা পড়ার ভয়ে ছুটে পালায়, মিথ্যে ভান করে সত্যকে এড়িয়ে যায় তার দুঃখ দূর করার ক্ষমতা বিধাতারও নেই।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। লজ্জায় মাথা নুয়ে এল। মুখ নিচু করেই বললামঃ তোমার ভাইর সম্মান বাঁচাতে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি। আজ ধরা পড়ে গেছি যখন কৌতূহল ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। আমরা একই শয্যায় কেউ কারো নই। আকৃতিটাই শুধু পুরুষ মানুষের কিন্তু পুরুষের শরীরের উত্তাপ ওর নেই। মৃতের মতো শীতল শরীর। আমার কোন সান্ত্বনা নেই। নিজের অতৃপ্ত বাসনার আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমরা কেউ-কাউকে ঘৃণা করি না। আবার তীব্রভাবে ভালোবাসি না। মাঝে মাঝে নিজেকে জিগ্যেস করি ভালোবাসা কি শুধু শরীর? মানুষের সঙ্গে জীব-জন্তুর পার্থক্য কি আছে? কিন্তু শরীরটা সন্তান ধারনের যন্ত্র। শুধু সেজন্যে শরীর শরীরকে চায়। নারী মাত্রই সন্তান চেয়ে এসেছে। জীবনকে ভালোবেসে নারী শরীরকে ভালোবাসে। এই জন্যই নারীর জীবনে পুরুষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার দুঃখটা শুধু সেজন্যই। মেয়ে মানেই জননী। এই অনুভূতিটা আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়। বড় নিঃস্ব আর দীন মনে হয়। সারা জীবন এই দুঃসহ একাকীত্ব নিয়ে থাকব কী করে? চিকিৎসা করলে হয়তো ও আবার ভালো হয়ে উঠবে।

বিদুর জ্বালা ধরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। মুখে তার কথা জোগাল না। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললামঃ কী আর হবে? সবই অদৃষ্ট। আমার জীবন এত অসহায়, একা একা। কষ্টের জীবনে নিত্যসঙ্গী একাকীত্ব! কী পাপ যে করেছিলাম আমি, কার কাছে, কোন জন্মে, তা জানিনা। এ জীবনে বোধ হয় সন্তানের মুখ দেখা হবে না। কেন যে জীবনটা আমার এলোমেলো হয়ে গেল!

আমার বিশ্রস্ত চুলের মধ্যে হঠাৎ হাত ডুবিয়ে বিদুর অসহায়ের মতো চুপ করে বসে রইল। অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়ার ক্ষমতাটা ওর এত আন্তরিক যে সেটাই আমার প্রতি তার ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এ রকম একটা অনুভূতিতে আমার ভেতরটা যখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন আমার ব্যর্থ জীবনের সব অভিমান নিয়ে ওর হাতের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে চুপ করে রইলাম। বিদুর কোঁকরানো চুলের জটগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে খেলতে লাগল। আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের সব রঙ, গন্ধ, বিদুরের হাতের ছোঁয়ায় বর্ণময় হয়ে উঠল। কী ভালো যে লাগছিল। কেমন করে বোঝাই?

কানের পাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল : তুমি ভীষণ বোকা? কেঁদে কিছু পাওয়া যায় না। মানুষের করুণা, দয়া, সহানুভূতিতে বুক ভরে। কিন্তু যে যা হারায় তা ফিরে পায় না। পাণ্ডুর বিয়েতে তোমার কাঁদার কি আছে? রাজ রাজরার ঘরে একাধিক বিয়ে নতুন কিছু নয়। তোমার পিতা শূরসেনেরও একাধিক পত্নী আছেন। আমাদের পিতামহ শান্তনুরও একাধিক মহিষী ছিল। এটা কোন ব্যাপার নয়। একজন মেয়ের জীবনে সেটা হয়তে অনেক বড় ব্যাপার। তবু সেজন্য ভেঙে পড়লে তো হবে না। নিজের মনকে শক্ত করতে হবে। বুকের আগুন যদি চোখের জলে নিভে যায় তা-হলে হেরে যাওয়ার অপমানের প্রতিকার করবে কী করে? তোমার সামনে এখন অনেক কাজ। বলতে পার কাজের সূচনা হয়েছে। কাজ আরম্ভের নির্দেশ এসেছে। দুর্ভাগ্যের মেঘ চিরস্থায়ী হয় না। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তো তোমাকে লড়াকু মহিলা বলে জানেন। কিন্তু তোমার ভেতর লড়াইয়ের সেই জোরটা কোথায়? বনে ঝড় উঠে। বড় বড় গাছও ঝড়ের দাপটে নুইয়ে পড়ে, ধাক্কা সামলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তুমি কেন মনে করছ না, সেরকম একটা ঝড় তোমার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে কিন্তু ভেঙে তছনছ করেনি। ঝড় যেমন আসে আবার চলেও যায়।

আমার যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে বিদুর ডুবুরির মতো মুঠো মুঠো সান্ত্বনার মুকতো তুলে আনল। আর, আমি হারের মত করে গলায় পরলাম। আমার কোন দুঃখ নেই আর। এক একজন মানুষের গলার স্বরে কি যেন থাকে। আশ্চর্যভাবে ভালো লেগে যায়। সমস্ত শরীর যেন গলে যেতে চায়। জীবনের বাস্তব কী আশ্চর্য। স্থান কাল, পরিস্থিতি সেই মুহূর্তে প্রবলবেগে আমাকে বিদুরের দিকে টানতে লাগল। এমন বিপজ্জনকভাবে বিদুরকে ভালো লেগে গেল যে নিষেধের অনুশাসন কিংবা কোন নিয়ম বাঁধনই আর মানতে চাইল না মন। বিদুরের হাঁটুর উপর মাথা রেখে তার মুখের উপর চোখ মেলে ধরি। থমথমে বিষণ্ণ গলায় বলিঃ সব কথা সবার বোঝার নয়। কিন্তু কোথায় আমার দুঃখ, কিসে আমার অপমান, কত জায়গায় আমার ব্যথা মায়ের মতো কাঁদার আগেই তুমি কেমন করে বোঝ গো? তুমি আমার কে হও?

ও আমার টিকল নাকের আগাটি আলতোভাবে ধরে নাড়িয়ে দিল। এক ধরনের চাপা অপ্রকাশ্য খুশিতে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে বললঃ বেশি জানতে নেই। কখনও জানতে চাইতেই নেই। আমার ছোট জীবনের এই দিগন্তের কোথাও লুকোচুরি নেই, সবটাই উন্মুক্ত। বিস্তৃত করে কিছুই চোখে পড়ে না। ভাবিও না। কেন ভাবব? জীবনে যা কিছু ঘটে তা সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। তার একটা মানেও থাকে। এক অদৃশ্য হাত বাজীকরের মতো সব কিছু নিপুণ পরিচালনা করে। তার কাজে কোন গলদ নেই। কোন কাজের পরে কোনটা করলে তার চমৎকার সুরাহা হয় সে ঐ বাজীকরই পরিকল্পনা করে। তুমি, আমি সকলে সুতোয় ঝুলোনো পুতুল। তার ইচ্ছেয় তার হাতে খেলছি, আর ভাবছি, আমিই করছি। কিন্তু আমরা কেউ কিছু করি না। পাছে আনন্দে, সুখে, তৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে তাই দিবারাত্র আমি আমি করছি। আমরা শুধু নিজেকে চিনতে শিখেছি। তাই মানুষমাত্রে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে। সেই ব্যক্তিসত্তা তার নিজের। নিজেরই একার।

বিদুরের গলার স্বর এমনিতে কানে গেলে খুশিতে ভরে যায় মন। হস্তিনাপুরে ঐ কণ্ঠস্বরে শুনে প্রথম দিন যেমন চমকে উঠেছিলাম তেমনই এক চমক আমাকে জানিয়ে দিল নিজেকে পাহারা দেওয়া ভীষণ কঠিন কাজ। এই অনুভূতির সত্যি কোন মানে আছে কি?

বিদুরের শান্ত সৌম্য চেহারার মধ্যে এমন একটা লুকনো আকর্ষণ আছে যার মতো চকিতে হৃদয় বিদীর্ণ করার মতো অস্ত্র নেই। চেহারার মত গলার স্বরেও বিগলিত করুণার নির্ঝর যেন চলকে চলকে চলে। সমস্ত দেহ মনকে প্লাবিত করে উপচে পড়ে অবলীলায়।

কিন্তু হলে কী হবে? জাতে তো নারী। পুরুষ সহজে যা পারে। নারী চাইলেও তা করতে পারে না। তার সাহসে কুলোয় না। তাই মনের কথা মনেই থেকে যায়; মুখে বলা হয় না। মনের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়। মেয়েরা মুখে বলতে পারে না বলেই খুব বেশি করে চায় পুরুষ তাকে বীর্য বলে জয় করুক, দস্যুর মতো লুণ্ঠন করুক, জোর করুক, কেড়ে নিক, চালাক, পরাধীন করে রাখুক। এমন একটা উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে বিদুরের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। বিদুরের হাতটি হাতে নিয়ে কচলাচ্ছি, গালের উপর চেপে ধরছি। আঙুলে আঙুলে, হাতের পাতায় পাতায় উষ্ণতার মিলন হলো। বিদুরের সারা শরীরটাই যেন উষ্ণ প্রস্রবনের ধারা হয়ে আমার শরীরের প্রতি রোমকূপে স্নায়ুর মধ্যে আগুন ঢেলে দিতে লাগল। এ এক নতুন অনুভূতি। নিষিদ্ধ তীব্র উত্তেজক আনন্দে আমার জ্বর জ্বর লাগছিল। পান্ডুর ছোঁয়াতে যে শরীর শবের মত শীতল, নিথর থাকে সেই শরীর-ই বিদুরের স্পর্শে উষ্ণ প্রস্রবনের কূপে পরিণত হয় কী করে? আমার শরীরের মধ্যে যে এমন একটা আগ্নেয়গিরি লুকনো ছিল জানা ছিল না।

বিদূরের মুখখানা আগুনের মতো গণ গণ করছে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, চাহনিতে কেমন এক ধরনের বিহ্বলতা নেমে এল। ওর দু হাঁটু থর থর করে কাঁপছিল। দু'জনে দুজনের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছি। মন খারাপ করা আর্তি বুকে নিয়ে নিরুচ্চারে মনে মনে বলছি, বিদুর তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ! একঘেয়ে ক্লান্তিকর বিষণ্ণ দম বদ্ধ ঘরের একফালি আলো হাওয়ার বারান্দা তুমি। বাইরে মস্ত আকাশ ঝুলছে মাথার উপর। চারদিকে কত আলো, হাওয়া, মুক্তির শ্বাস তবু কেন পুরনো একঘেয়ে অভ্যাসের বেড়া ভেঙে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না? তুমি তো অনায়াসে ছিঁড়তে পারতে বিদুর! তুমি তো পুরুষ মানুষ। তোমার ভয় কিসে? শাসন, বাঁধন নিয়ম শৃঙ্খলা এসব তো তোমার জন্যে নয়। তবু তুমি সাহস করে একটা চুমু খেয়ে পর্যন্ত আমাকে ভালোবাসা নিবেদন করলে না। মিছি মিছি লজ্জায় দুচোখ রাঙা জবা করে তুলেছ।

অনন্ত সময় চলে যায়।

হঠাৎই মনে হলো, এই মুখ বুজে থাকাটা বোধ হয় নর-নারীর প্রেমের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। মুখে কথা নেই, অথচ দুজনার বুকের মধ্যে কথার সাগর তোলপাড় করছে চিত্রকরের আঁকা চিত্রপটের মতো।

জানলার উপর অপরাহ্নের কমলা রঙের আলো পড়েছে। আকাশের গায়ে ডানা মেলে দিয়ে দু'একটা করে পাখি মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে নীড়ে ফিরছে। তাদের ডানায় এবং পালকের উপর হলুদ আলো পড়েছে। জীবনের আলো। মৃদু বাতাসে তাদের গায়ের গন্ধ উড়ছে। আর ঘরের মধ্যে যৌবনের গন্ধ আমাদের দুজনার বুকে ভুর ভুর করছে। একজন নারী তার স্বামীকে না পেলে যদি আরেকজন পুরুষের ভেতর তার স্বামীকেই খোঁজ করতে হয় তখন সেই দ্বিতীয় জনকে নিজের ভেতর আবিষ্কার করা, অনুভব করার এক আশ্চর্য অনুভূতিতে সারা শরীরে সিরসিরানি উঠে।

বিদূর চুপ করে চেয়ে ছিল। পুরুষকে ঐ চাউনি আমি চিনি। মুগ্ধ করা মন্ত্র নিয়ে পুরুষ ঐভাবে আহ্বান করে নারীকে। কিংবা নারী করে পুরুষকে। চুপিসারে পা পা করে হাঁটে, যেমন করে বাঘ এগোয় শিকারের উপর নজর রেখে।

হঠাৎ স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে বিদুর মজা করে জিজ্ঞেস করল কী সুন্দর বলতো! এ রকম মহৎ বোধ আর কী আছে? আচমকা অপ্রস্তুত ভাবে বলে এইটে কী কম পাওয়া হলো। পুরুষ আর নারী যখন নীরব থাকে তখনই বুকের গভীরে স্বপ্নগুলো আলসের উপর বসা কপোত কপোতীর মতো ডানা ঝাপ্টাঝাপ্টি করে, কিছু বলার জন্যে ঠোঁট নাড়ে চাড়ে। বড় সুন্দর অনুভূতি! নিজের সত্তা যে কত দামী; কত মহার্ঘ হয়ে উঠে তা এমন করে জানা হয়নি কখনও। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসে নিজেকে আবিষ্কার করার এক ধরণের গভীরতর সুখ পেলাম।

জলের নীচে দিনের আলো যেমন কাঁপে তেমনি মৃদু কম্পন ঘটে গেল। আমার সত্তার মধ্যে। কথাগুলো বলার সময় বিদুরের মুখে এক প্রসন্নতামাখা প্রেম ছবি ফুটে উঠল। অস্ফুট চাপা গোপন

কাম ভাবও আমার দৃষ্টি এড়াল না। তার ভালোলাগার ঘরে আগল দিয়ে নিঃশেষে নিবেদন করতে একটুও গোপন করল না নিজেকে।

সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কী যে ঘটে গেল কে জানে? জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চুপ করে চেয়ে আছি। অপরাহ্নের মরা আলো পড়েছে আমার মুখে। সামনের বনভূমিতে পাতা ঝরা গাছে নতুন কিশলয় মৃদু মন্দ বাতাসে জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এক ঝাঁক সবুজ টিয়ার উল্লাসী সমবেত চিৎকারের মতো এক দারুন মুগ্ধতা আমার জীবনের নতুন মানে বয়ে নিয়ে এল। বিদুরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটের কোণে। প্রশ্রয় ভরা তিরস্কারের দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে ধরি ওর চোখের তারায়। মৃদু কণ্ঠে বলিঃ একজন নারীর কাছে নিজেকে অসামান্য করে তুলতে কত কপটতাই না করলে? তবু মুখ ফুটে চারটি অক্ষরের শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে না। তুমি একটা অদ্ভুত বাজে লোক।

বিদূরের মুখে অনিবর্চনীয় হাসির আভা ফুটল। বললঃ চারটি অক্ষরের শব্দ তো কত আছে? কোন চার অক্ষরের শব্দের কথা বলছ?

কপট রাগ করে মুখ ঝামটা দিয়ে বলিঃ ন্যাকা।

কাকে দিয়ে কখন কিভাবে ইতিহাস সৃষ্টি হয় সৃষ্টি কর্তা নিজেও বলতে পারে না। তেমনি কোন মানুষও জানে না কী করে সে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে যেতে পারে। মানুষের অজান্তেই ইতিহাস তৈরী হয়ে যায়। কখনও মন্থরভাবে কখনও দ্রুত। দেশ কাল এবং ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইতিহাস সাগরের যাওয়া নদীর চলকানো স্রোতের মতো উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে চলে নিঃশব্দে। তবু যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয় ঈশ্বর তাকে অন্য ধাতু দিয়ে গড়ে। বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়। কোন কিছুতে ভেঙে পড়লে হয় না। আমার ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে বিধাতা এক অদৃশ্য কালি দিয়ে আমাকে ইতিহাসের উপাদান করে গড়েছেন। ইতিহাসের স্রষ্টা বলে নিজেকে দাবি করব এমন জোর পাই না মনে, তবে আমার ভেতর দিয়ে এক ইতিহাসের জন্ম হয়েছে। আমাকে তার জননী বা ধাত্রী বললে বোধহয় খুব খুশী বলা হবে না।

আমার চতুর্দিকে বনভূমি জ্বলছে দাউ দাউ করে। আমি তার মধ্যে বন্দী। নরমাংসভোজী আদিম উপজাতিরা তাদের শিকার জীবন্ত পুড়িয়ে মারার আগে যেমন বহ্নুৎসব করে, আনন্দে নৃত্য করে তেমনি লেলিহান শিখা সদর্পে এবং কী বিপুল হর্ষে আমাকে ঘিরে নৃত্য করছে। আগুনের দ্বীপে বন্দীর মতো চাপা কান্না বুকে নিয়ে একা একা বেঁচে থাকার কষ্ট, ভয়, আতঙ্ক ও উদ্বেগের চেয়ে বেশি করে মনে হতে লাগলঃ ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষা এভাবেই মানুষকে দিতে হয়। অনেক রক্তে চোখের জলে লেখা হয় তার কাহিনী।

পিতৃব্য ভীষ্মের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। তবু আমাকে হস্তিনাপুরের বধূ বলে মেনে নিতে পারলেন না তিনি। রাজমহিষীর প্রাপ্য সম্মান থেকেও বঞ্চিত করলেন। রাজসভায় পাণ্ডুর পার্শ্বে সম্রাজ্ঞীর আসনটি শূন্য রেখে আমাকে শুধু অবহেলা করলেন না, অপমানও করলেন। এ রাজ্যের মানুষের চোখে আমি যে কত ছোট হয়ে গেলাম সে কথা মনে হলে অভিমানে, দুঃখে দু'চোখ ভরে জল নামত।

আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট এই যে, পাণ্ডুকে কখনো কোন কথা বলা হলো না। কত কথা বলার ছিল। তবু বলা গেল না। কারণ মাদ্রী আমাদের দু'জনের সম্পর্ককে অনেক দূরে করে দিয়েছে। মাদ্রী খুব ভালো মেয়ে। নিরীহ এবং অত্যন্ত নম্র, শান্ত, কোমল স্বভাবের। প্রথম সাক্ষাতেই সে আমার মন হরণ করেছিল। বড়'র আসনে বসিয়ে ছোটর মতো সর্বদা অনুগত থেকেছে। তবু তার সম্পর্কে আমি খুবই সতর্ক এবং সাবধান ছিলাম। কারণ, মানুষকে বিশ্বাস করে আমি বারবার ঠকেছি। তাই বিশ্বাস করে ঠকার বিশ্বাস না করে ঠকা অনেক ভালো বলে মনে হয়েছে।

মাদ্রী তো পিতৃব্য ভীষ্মের পছন্দ করা মেয়ে! আর আমি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মনোনীত

পাত্রী। আমার সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রটা এখানেই। দু'ভাইয়ের বিরোধ ও রেষারেষির ঘোলা আবর্তের মধ্যে পড়ে আমার জীবনটাই বিষময় হয়ে উঠল। এজন্য দায়ী কে? দ্বৈপায়ন, না ভীষ্ম, না আমার ভবিতব্য। বোধহয় ভবিতব্যই একে বলে!

ভবিতব্যের কারণে পিতৃব্য ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের পিতামাতা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দু'ভাই। একজনের শরীরে কৌরববংশের রক্ত, অন্যজন কৌরববংশের কেউ নয়, কিন্তু কৌরববংশধারায় দ্বৈপায়নের রক্তধারা এসে মিশল। দ্বৈপায়ন এই পরিবারের কেউ না হয়েও রাজমহিষী জননী সত্যবতী এবং বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে হস্তিনাপুরের উপর একটা অলিখিত দাবি ও অধিকার ছিল তাঁর কিন্তু ভীষ্ম তাঁর এই নিঃশব্দ প্রবেশকে মেনে নিতে পারলেন না। আবার দ্বৈপায়নও তাঁর সন্তানদের উপর পিতৃত্বের দাবি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নিজের অজান্তে ভীষ্মের সঙ্গে এক গোপন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন। আমার বিয়েতে তার সূচনা হলো। ভীষ্মের কর্তৃত্বাভিমানের উপর দ্বৈপায়ন সরাসরি আঘাত করলেন। দুভাইর রেষারেষি, কলহ দ্বন্দ্বের মধ্যবর্তী হয়ে রইলাম আমি। কাঁটার মতো তাঁদের বিবাদের সম্পর্কটা আমাকে শুধু বিঁধে থাকল না, জীবনটাকেও কণ্টকিত করল। ভীষ্মের বিশ্বস্ততা অর্জন করা আমার পক্ষে কঠিন হলো। তাঁর চোখে আমি দ্বৈপায়নের অস্ত্র শুধু। যেখানে যেমন দরকার সেখানে আমাকে ও পাণ্ডুক ব্যবহার করে গোটা রাজশক্তিকে দ্বৈপায়ন নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান বলেই পাণ্ডুকে রাজা করলেন। ভীষ্মকে তোয়াক্কা না করে আমাকে হস্তিনাপুরের রাজমহিষী করে দ্বৈপয়ন কার্যত ভীষ্মের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করলেন। দ্বৈপায়নের কাছে এতবড় অতর্কিত পরাজয়কে ভীষ্ম নীরবে মেনে নিতে পারলেন না। তাই হস্তিনাপুর থেকে তাঁকে হঠানোর জন্য ভীষ্ম কঠোর হলেন। দ্বৈপায়নের প্রভাব কমাতেই আমাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে অবাঞ্ছিত করা একান্ত দরকার হল। শুধু সেইজন্য পাণ্ডুর জীবনে আরো একটি নারীর আকর্ষণকে অনিবার্য করে আমাকে ফালতু করার ফন্দী করলেন ভীষ্ম। বলতে বাধা নেই, সপত্নীগত ঈর্ষা-বিদ্বেষের মানসিক দ্বন্দ্বে ও সংঘর্ষে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো জটিল ও তিক্ত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তাই যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে মদ্ররাজ্যের বিবাদ, কলহ ও বৈরীতার সম্পর্ককে দৈনন্দিন জীবনের ভেতর টেনে এনে আমার জীবনকে বিষিয়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়ে মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গেই পাণ্ডুর বিয়ে খুব জাঁকজমক করে দিলেন ভীষ্ম। বহুদেশ থেকে নরপতিরা এলেন, ব্যবসায়ী, অভিজাত ব্যক্তিরা এবং বহু গুণীজন এলেন। মাদ্রী ও পাণ্ডুর বিয়েটাই সর্বজনসমক্ষে বড় করে তোলা হলো। লোকের মুখে মুখে এই বিয়ের ধুমধাম, আনন্দ, যতদিন মনে থাকবে ততদিন হস্তিনাপুরে সত্যি আমি নগণ্য হয়ে থাকব। অপমানের বিষ জ্বালায় আমার ভেতরটা যত জ্বলবে ততই তার বিষদংশনে মাদ্রী ও পাণ্ডু জর্জরিত হবে। তাদের জীবন থেকে আমি ততই দূরে সরে যাব। ভীষ্ম এক ঢিলে দুই পাখী মারল। আমাকে ও দ্বৈপায়নকে হস্তিনাপুরে অবাঞ্ছিত করে, পাণ্ডুকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে হস্তিনাপুরের সব কর্তৃত্বকে ভীষ্ম নিজের হাতের মুঠোর নিয়ে এলেন। পিতৃব্যের চতুর ছলনার পেছনে আরো একটা হিসাব ছিল—সপত্নীগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ রেষারেষির হলাহল পান করে আমরা দুটি রমণী বিবাদে, কলহে পরস্পরকে শুধু বিষদংশন করব না, পাণ্ডুকেও সেই বিষের সমুদ্রে টেনে এনে বিপন্ন করে তুলব। এক ঘোরতর ঘরোয়া অশান্তিতে তাকে যত বিব্রত ও ব্যস্ত রাখা হবে ততই রাজকার্যের সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যাঘাত হওয়ার অভিযোগ তাকে সিংহাসনচ্যুত করে পিতৃব্যের করুণাপুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করা সহজ হবে।

মাদ্রী ও পাণ্ডুর বিয়েটা যে ভীষ্মের একটা ভয়ঙ্কর ফাঁদ, হঠাৎ-ই আমার মধ্যে তার আলো ঝলকে উঠল। বুকে অপমানের হলাহল। কিন্তু তাঁর দুঃসহ জ্বালা মুখ টিপে বয়ে বেড়ানো বড় কষ্টকর। তথাপি সেই বিষজ্বালা নিয়ে আমি কাজ করছি, খাচ্ছি হাসছি, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করছি, গল্প গুজব করছি। হয়তো এমন করতে না পারলে জীবনের গতি রুদ্ধ হতো। এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। কিন্তু যাকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়, ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে তার জীবনের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারটা বোধ হয় অন্যদের সঙ্গে মেলে না। লোকে বাইরে থেকে দেখে বলেই, অভ্যেস আর একঘেয়েমি যে আমার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে তা দেখতে পায় না।

কিন্তু বিদুরের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। সে আমার আত্মাকে দেখতে চায়। আত্মাকে বাদ দিয়ে মানুষটাকে দেখতে চাওয়ার মতো বড় মিথ্যে হয় না। মানুষের শরীরের মধ্যে যে মন বাস করে; সে কেমন? বিদুর তাকে অবিষ্কার করতেই এসেছিল।

সেদিন রাত্রিটা এক আশ্চর্য রাত্রি।

চারদিকে জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলমল করছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি একা। আমার চুল বাঁধা হয়নি। বিষণ্ণ মন নিয়ে কেশ বিন্যাস করতে রপচর্চা করতে ভালো লাগে না। কার জন্য সাজব? মৃদু বাতাসে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। চোখ মুখ ঢেকে গেছে একেবারে। আলতো হাতে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছি যত্ন করে। আমার ছায়া পড়েছে পিছনের দর্পণে। আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে নিজেকে দেখছি। ঐ ছায়াটা তো মিথ্যে নয়। আমার মতনই আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তার স্বাধীনতা, নিজস্বতা বলে কিছু নেই। আমার মতই বন্দী।

চারধারে তখন কেউ ছিল না। তাই সামান্যতেই ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম। চাপা উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল শরীরের কোষে কোষে। বিদুরকে দেখে মনের মন যে আমার কী করবে ভেবে পায় না। পাছে আমাকে কোন প্রশ্ন করে বসে তাই ওর দিকে চেয়ে অকারণ হাসি। ওই বিব্রত করুণ হাসির মধ্যে অনেক কিছু ছিল। আমার মনের জ্বালা, যন্ত্রণা, অসহায়তা সব ঐ মোহন হাসিতে এমন করে নিঙড়ে দিলাম যে বিদুর সহসা কথা খুঁজে পেল না। বিহ্বল চোখের তারায় আমার প্রতি ওর মমতা, দরদ, সহানুভূতি যেন ঠোঁটের কোণে ব্যাথার হাসি হয়ে ফুটল। বললঃ তুমি হাসলে যে!

চোখের কোণে আমার বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললামঃ কাঁদলে কী সুখী হও তুমি? কী হলো? কথা বলছ না যে!

ভাবছি।

কী এত ভাবো? বেশি ভাবলে মানুষ স্থবির হয়ে যায়। পাগল হয়ে যায়।

আমার মন তোমার জন্য ভাবতে বলে।

তাই বুঝি?

তুমিই বলো, পাণ্ডুর সঙ্গে তোমার মনের কোন মিল নেই, এমন কি শারীরিক সম্পর্কও নেই, তবু ভালোবাস তাকে? জবরদস্তি করে কাউকে ভালোবাসা যায়! আশ্চর্য লাগে।

বিদুরের কথা শুনে হাসি পেল আবার মজাও লাগল। বিষণ্ণ হেসে বললামঃ কী জানি। নিজেও বুঝতে পারি না নিজেকে।

বিদুরের অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসতে দেখে অবাক গলায় শুধালামঃ হাসছ যে।

হাসছি তোমার কথা শুনে। রাতে মাদ্রী যখন পাণ্ডুর আদর খায় তখন তুমি নিশ্চয়ই খুব কাঁদ?

জানি না। বলতে গিয়ে চোখের পাতা কেঁপে যায়, মুখের ভাব পাল্টে যায়। গলার স্বর ভারী হয়ে উঠে।

স্বামী চাও না তুমি।

খুব চাই। কিন্তু আমার ভাগ্যের মধ্য এত নিষ্ঠুরতা আছে যে তার জন্য কষ্ট হয়। নারী পুরুষের ভালোবাসা কোন একটা অভ্যাস নয়। যেখানে আবেগ নেই, স্বতস্ফূর্ততা নেই, শ্রদ্ধা নেই; মমতা নেই, সেখানে সম্পর্ক আলাদা হয়ে যায়। তোমার ভাইর মতো স্বামী পাওয়া নারী জীবনের অভিশাপ। এই বন্ধনটাই আমার জীবনের একটা বড় ফাঁস।

কথাগুলো দুম্ করে দুঃসাহসের সঙ্গে বলে ফেলে বেশ ঝরঝরে লাগল।

বিদুরও থমকে গিয়ে চোখ তুলে তাকাল। ওর মুখে ঘাম ফুটে উঠল। আমতা আমতা করে বললঃ আমাকে চাও কী?

ওর কথা শুনে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলাম ঃ কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

আমাকে তুমি কোনদিন বোঝার চেষ্টা করনি। কিংবা আমি পারিনি নিজেকে প্রকাশ করতে। আসলে মনে মনে তোমাকে যা বলতে চাই, বলব বলে ঠিক করে রেখেছি, বলার সময় ঠিক তার

উল্টোটা বলেছি। আমি এরকমই!

তুমি একটা পাগল।

কেন?

পাগলকে আর কী বলব?

অভিমানে বিদুরের গলার স্বর ভারী হলো। বললঃ সত্যিই তো, আমি তোমার কে? খুশি বইবার মানুষ তো অনেকই আছে তোমার। আমি না হয় দুঃখ বইব।

বিদুরের শ্লেষ আমাকে বিদ্ধ করল। বুকটা সত্যিই হাহাকার করে উঠল। চোখের পাতা বন্ধ করে মনের কষ্ট রুদ্ধ করি। মনে মনে বলিঃ তুমি যে আমার কে, আমি জানি। তুমি আমার সর্বস্ব। আমার সুখ, আমার জীবন মরণ, অস্তিত্ব—অনস্তিত্ব সব।

জানালার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়ালাম। বিদুর আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর খুব আস্তে আস্তে নম্র গলায় বললঃ তোমার ভারাক্রান্ত মনের ভার একটু লাঘব করতে এসেছিলাম। বিশ্বাস কর শান্তি দিতে এসে ভুল বশে এক বুক অশান্তি নিয়ে ঘরে ফিরছ—একী কম দুঃখ আমার!

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা যন্ত্রণা চিরে দিয়ে যায় আমার ভেতরটা। হঠাৎ বিদুরের দিকে ঘুরে দাঁড়াই। প্রশ্নয় ভরা তিরস্কারে দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি বিদুরের দিকে। উদ্বিগ্ন গলায় বলিঃ সে কি? কেন? এ সব কথা বলে সত্যি কী কোন লাভ হয়? গলার দ্রবীভূত স্বর কান্নার মত শোনাল।

বিদুরের কণ্ঠস্বরে অভিমান, অপমান ছাপিয়ে উঠল। বললঃ কী জানি? যে কারণে একটা মানুষ ভুল করে। সেই দুর্বলতা আমাকে তোমার কাছে হঠাৎ-ই চির অপরাধী করে রাখল।

কথাগুলো শুনে ভীষণই কষ্ট হলো। হঠাৎ ওর দু'খানা হাত আমার হাতের পাতার মধ্যে চেপে ধরে বলিঃ কী বলছ তুমি? তোমার জন্য না হলেও আমার নিজের জন্য তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। তুমি ছাড়া এখানে আমার কে আছে? বিশ্বাস কর, আমার আমিময় এই জীবনটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম এত বেশি যে ভালো করে দেখাই হয়নি যে, তুমি এমন করে ভরে আছ আমার সমস্ত চেতনার ভেতর। মর্মের ভেতর। আমার সমস্ত আমিত্ব যে তুমিময় হয়ে আছ আমার নিঃশ্বাসের ভেতর টের পাই।

কথাগুলো বলে ভীষণ লজ্জা হলো। লজ্জা পেয়ে বললামঃ ছিঃ! কী লজ্জা বলো তো।

অবাক হয়ে বিদুর অস্ফুট গলার বললঃ লজ্জা কিসের? লজ্জা পাওয়ার মতো তো কোন কথা বলনি। আমার চোখের মধ্যে বিদুরের চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল যেন তার স্নিগ্ধ নিবেদনের নীরব ভাষা একটুও অপচয় না হয়। পুরুষের এই কাঙাল চাউনি সব মেয়েই চেনে। সারা শরীরের ভেতর এক অব্যক্ত সিরসিরানি উঠল। বিদুর আমার কাঁধ হাত রাখল। ত্বকে ত্বকে উষ্ণতার মিলন হলো।

কয়েকটা মুহূর্তের বিভ্রম। তারপর, ওর হাতখানা কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বলি তুমি একটা পাগল। নিষিদ্ধ ফল ছুঁতে নেই। যে একবার ছুঁয়েছে সেই জানে।

বিদুরের হাসি হাসি মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে উঠল। চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে ওর মুখ লাল হয়ে গেছে তাই নয়, এই বাড়াবাড়ির ঔৎসুক্যে লজ্জিত হয়েছে অনেকখানি। হাসতে হাসতে বলিঃ লজ্জা! লজ্জা!

কিসের? তোমার লজ্জা? পুরুষ মানুষদের বেহায়া হওয়াটা মেয়ে মানুষও চায়। আবার অবহেলা অবজ্ঞা করে, তাকে মহার্ঘ করে তোলে মেয়ে মানুষই। এটা হলো নারী পুরুষের মুগ্ধতার এবং ভালোবাসার পুরনো খেলা। মেয়ে মানুষ চায় পুরুষ তার উপর জুলুম করুক আর নারী তার সব অনিচ্ছা নিয়ে চায় পুরুষের কাছে পরাভব মেনে ভরে উঠতে। এসব না বুঝলে মেয়েদের মনের নাগাল পাবে না কোনোদিন!

মুগ্ধ অভিভূত গলায় বিদুর ডাকলঃ বৌ-ঠান!

বুকের ভেতর কেঁপে গেল আমারঃ যাও। কুন্তী কারো অনুকম্পা চায় না, সমবেদনা চায় না।

তাই তো সব দুঃখ, বঞ্চনা, ব্যর্থতা, হতাশার মধ্যেও তার মুখ ভরা হাসি সব সময়। দোষ তো আমার ভাগ্যের। তাই কারো কাছে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমিই মন্দ বলে অন্যকে মন্দ ভেবে ছোট করব কেন?

ভালোই বলেছ। মানুষ বিধাতার এক বিচিত্র প্রাণী। জন্তু জানোয়ারের তো মন নেই; তার মনের উর্ধ্বগতি, অধোগতির খবর সে রাখে না। কিন্তু মানুষ অনুভূতির সংঘাতে প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, কিন্তু তার সব খবর মনের মালিকও বোধ হয় টের পায় না। তাই সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে নিজেকে। তোমার মুখ ভরা হাসির মধ্যে মনের যে কষ্ট লুকনো আছে, মুখে না বললেও আমার সমস্ত অনুভূতির ভেতর অনুভব করি। সব পুরুষের একজন নারী সঙ্গী চায়, সব নারীরও একজন পুরুষ সঙ্গী চায়। পেয়েও তাদের এত কষ্ট কেন? আসলে সব মানুষই চায় এমন একজন মানুষের সাহচর্য, বন্ধুত্ব প্রেম দরদ, মমতা সহানুভূতি যে তাকে আনন্দ দেবে, আশ্রয় দেবে, রক্ষা করবে, ছোট্ট নীড় রচনা, আর সন্তানের স্বপ্ন সফল করবে। কিন্তু যেখানে থেকে তা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না কিংবা পেয়েও তাকে বর-বৌর খেলা, কাল্পনিক ছেয়ে-মেয়ের সংসারের পুতুল খেলা করে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়টুকু ছাড়া তার কোন দাম নেই। মনের একান্ত চাওয়ার সঙ্গে ইচ্ছে ও পাওয়ার মিল না হলে পাওয়ার ঘর, সুখের ঘর ভরে উঠে না।

বিদুরের কথা শুনে আমার চোখ ভরে জল নামল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে কান্না কান্না গলায় বলিঃ 'সত্যিই, কজন আর কেঁদে তালাচাবি দেয়া দমবন্ধ ঘরে এই বোবা ভার থেকে মুক্ত করতে পারে নিজেকে। নিজের ব্যর্থ জীবনের কথা বলে শুধু লজ্জা পাওয়া যায়। গ্লানি পাওয়া যায়। কোন আনন্দ সত্যিই তার ভেতর নেই। তবু মনের মানুষটাকে মনই খুঁজে নিয়ে অকপটে সব কথা বলে। তেমন মনের মানুষ দু একজনই হয়। যার কাছে একজন মেয়ে হেরে যাবার মতো ভীরুতার কথাও অসংকোচে বলতে পারে।

বিদুর অনন্ত বিস্ময় নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় জোড়া পায়রা এসে জানলার কপাটে বসল। সপ্রেমে গভীর স্বরে বক বকুম করতে লাগল।

হায়রে মানুষের আশা! হায় রে মানুষের স্বপ্ন! কত আশা নিয়ে জীবনের নীড় রচনা করে, ভালোবাসার কত স্বপ্ন তার চোখে, জীবনের কত অদ্ভুত, অসম্ভব সব ছবি আঁকে সে। আর জীবন দেবতা অদৃশ্য হাতে কী নিষ্ঠুরভাবে সেই স্বপ্নের তাজ ভেঙে চুরমার করে দেয়। অসহায় দর্শকের মতো তাকে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না মানুষের হাতে! হাতই যখন থাকে না তখন এমন এমন অদ্ভুত অসম্ভব সব স্বপ্ন মানুষ দেখে কেন?

শূদ্রক রাজা দেবকের পরমা সুন্দরী কন্যা পরাশরীর সঙ্গে বিদুরের বিয়েটা জোর করে দেয়ার পর থেকে মনে হতে লাগল আমার জীবনটা অর্থহীন। এই পৃথিবীতে পিতৃব্য ভীষ্ম আমাকে বিদুরের কাছ থেকে আলাদা করে দিল। আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম। ভীষণ শূন্য লাগল। মাথার উপর ছাদ না থাকলে যেমন অসহায় লাগে, ভীষণ আশ্রয়হীন মনে হয় তেমন একটা বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণার এক জ্বালা ধরা অনুভূতি আমাকে ভীষ্মের উপর বিরূপ করে তুলল। মনে হতে লাগল, এই মানুষটি কৌরব পরিবারে আমার সকল সুখ আগলে রেখেছে। আমাকে একটু আনন্দে থাকতে দেবে না। এক দারুণ আক্রোশে আমাকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে যেন। ঘুণপোকার মতো আমার সুখ-শান্তি, স্বস্তিকে, নিঃশব্দে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। নিজের জেদে জিততেই যেন আমার জীবনটা মিথ্যে করে দিল। আমার ও বিদুরের মধুর প্রীতি ও সৌহার্দ্দকে সহ্য করতে পারছে না বলেই আমাদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর গড়ে তুলতে এবং আমাকে একেবারে একা করতেই যেন পরাশরীর সঙ্গে বিদুরের বিয়ে হলো।

আমার উপর পিতৃব্যের নিষ্ঠুর কারণ বুঝি না। তাঁর মতো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের

সঙ্গে আমার মতো নিতান্ত এক সামান্য রমণীর কোন সংঘাত থাকতে পারে না। কী নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিরোধ করব? আমার আছে কি? পায়ের তলায় মাটি নেই, বেঁচে থাকার আশ্রয় নেই, দাঁড়ানোর মানুষ নেই, আমার হয়ে কথা বলার প্রতিনিধি নেই, পরামর্শ দেয়ার মানুষ নেই তবু পিতৃব্য আমার সঙ্গে এক অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ যুদ্ধ কার সঙ্গে? তবে কি, আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে বসিয়ে দ্বৈপায়নের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করছেন? ভীষ্মের সব যুদ্ধদ্বন্দ্ব তো দ্বৈপায়নের সঙ্গে। দ্বৈপায়ন পাছে তাঁর কর্তৃত্বের উপর খবরদারি করে তাই কর্তৃত্ব এবং অধিকারকে সর্বদা আগলে থাকেন। বিদুরের বিয়েটা তাঁর কর্তৃত্ব আগলানোরই ব্যাপার। হস্তিনাপুরে কৌরব পরিবারে তিনিই সব। তাঁর আদেশ-নির্দেশ, ইচ্ছে-অনিচ্ছেই শেষ কথা।

কিন্তু দ্বৈপায়ন তাঁর অধিকার খর্ব করেছেন। বংশরক্ষার সমস্যার সমাধানে এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব কৌরব পরিবারে সুদৃঢ় করতেই তাঁর ও ভীষ্মের মধ্যে একটা লড়াইর সূচনা হলো। রাজপরিবারের অনুমোদন না নিয়ে পান্ডুর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিয়ে কার্যত দ্বৈপায়ন ভীষ্মের সঙ্গে এক অঘোষিত শক্তি পরীক্ষার লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্তত, ভীষ্মের তাই মনে হয়েছে। দ্বৈপায়নের এই অনুপ্রবেশের পরিণাম ভালো হয়নি। বরং, পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়েছে, বিরোধ বেড়েছে। আভ্যন্তরীণ সংকট আরো জটিল হয়েছে। দ্বৈপায়নকে কৌরব পরিবারে প্রবেশের পথ করে দিয়ে পিতৃব্য ভীষ্ম একদিন যে ভুল করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে আর প্রস্তুত নন। দ্বৈপায়ন এই পরিবারের কেউ নয়। কী হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে, কী পরিবারের মধ্যে তাঁর কোন ভূমিকা কিংবা দাবি ভীষ্ম মানতে রাজি নন। এখানে শুধু অতিথি তিনি। তাঁর ঔরসজাত ক্ষেত্রজ পুত্রদের উপর তাঁর কর্তৃত্বের কোন অধিকার নেই, একথাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমার উপর অবিচার করে চলেছেন। হস্তিনাপুরে আমার অপমান, অনাদরের কারণ দ্বৈপায়ন। পিতৃব্যের চোখে আমি দ্বৈপায়নের দুরন্ত জেদের প্রতিরূপ। আমাকে তাঁর সহ্য করা তাই কষ্টকর।

যত দিন যেতে লাগল, আমি বুঝতে পারছিলাম এই রাজ্যের এবং পরিবারের সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠ মানুষটির সঙ্গে বিবাদ করে একত্রে বসবাস করা অসম্ভব। তাঁর বিরূপতায় আমি কষ্ট পাই। নীরব অবজ্ঞা আমাকে বিদ্ধ করে, অবহেলায় অপমান বোধ করি। অনাদরে জীবনটা প্রতিমুহূর্ত অর্থহীন মনে হয়। এই পরিবারে সত্যি আমার কোন জায়গা নেই। আমার জায়গা পূরণ করতে মাদ্রীকে আনা হয়েছে। পান্ডুর কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পান্ডুর ভালোবাসা হয়তো আমার উপর এখনও আছে। বিদুরের মনেও যে অনুরাগের পাত্র শূন্য হয়ে গেছে এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। তবু, ওরকম প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা, কিংবা ঔদাসীন্যে মোড়া ভালোবাসা দিয়ে জীবন চলে না। আমার জীবনটা এদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় সেটাও চাই না। আমি ফুরিয়ে যেতে চাই না। এ জীবনের একটা কোন অর্থ খুঁজে বার করা দরকার। অর্থ পাওয়া যাক বা না যাক সেই খোঁজটা আমি ফুরিয়ে যেতে দেব না। ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানি বোধ করছি। কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছি না। ইচ্ছে করল, জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়তে। সেই মুহূর্তেই মৃত্যুর কথা মনে হলো। শুধু শুধু মরতে যাব কেন? অসময়ে মৃত্যু মানেই তো জীবনের অপচয়।

আরো মনে আছে, কী ভয়ঙ্কর মানসিক অস্থিরতায় সেই সময়টা কেটেছিল। বিছানা আমার বিষ লাগতো। রাতভোর এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়িয়েছি। মাথার ভেতরটা একেবারে শূন্য। কপালে ঘাম জমেছে। পোশাকের নিচে ঘামে ভিজে গেছে। একসময় থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এসব করছি কেন? কার জন্যে করছি? আমার কী হয়েছে? এসব করে, আমি যা হারাতে বসেছি তা কি ফিরে পাব? এভাবে কিছু ফিরে পায় কি? মিছেমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি কেন?

খানিক বাদে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসে ভিজে পোশাক বদলে খোলা জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফুরফুরে হাওয়ায় দেহ-মন স্নিগ্ধ হলো। বাইরে স্তূপাকৃত অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মাথার উপর নীল আকাশ। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ দিগন্তের বুকে ঝুলে আছে। দু'একটা তারা করুণ চোখ মেলে আমাকে দেখছে যেন। করুণার কথা মনে হতেই মনের মন প্রশ্ন করল-

কোথায় গন্ডগোল হয়ে গেল? কিসে ভুল হলো? এইভাবে ঘরবার করে কী বেঁচে থাকা যায়? যায় না বলেই বোধ হয়, এভাবে হন্যে হয়ে অন্য কোন উপায় খুঁজছি? মনের ভেতর খোঁজাটা রয়ে গেছে। কারণ, আমি তো বুঝতে পেরে গেছি হস্তিনাপুরে আমি অপ্রয়োজনীয়। আমি শুধু একবার দেখতে চাই; আমার নিজের কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য আছে কিনা?

ধীরে ধীরে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি। চোখের নিচে রাত জাগার ক্লান্তি এবং কালিমা পড়েছে। মুখেতে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ লেগে আছে, চোখের চাহনিতে রয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন। বয়সের সঙ্গে মনের সঙ্গে লাল আর সবুজ পোশাক বেশ মানিয়ে গেছে।

আমার স্মরণশক্তি প্রবল। সহজে কিছু ভুলি না। বহুকাল আগের ঘটনা। তবু জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনাই আমার মনে গেঁথে আছে। কেবল তারিখ আর বারটা মনে নেই।

বেশ ঝকঝকে রোদ উঠেছিল। ভোরের স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে আমি পান্ডুর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মৃদু টোকা দিলাম দরজার কপাটে। একবার। দুবার। তিনবার। ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। তবু ফিরে যেতে পা উঠল না। কল্পনায় দেখছিলাম মাদ্রীর গভীর আলিঙ্গনের মধ্যে পান্ডু নিশ্চিন্তে সুখে ঘুমোচ্ছে। মাদ্রীর সুকোমল উন্নত বক্ষযুগলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে যৌবনের ঘ্রাণ নিতে নিতে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়তো পান্ডুও। অথবা শরীরী আনন্দের আকর্ষণ ছেড়ে শয্যাত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে না তার। তাই হয়তো দরজায় বারংবার টোকার শব্দ শুনেও সাড়া দিচ্ছে না। খুব ইচ্ছে করছিল জড়াজড়ি অবস্থায় তাদের ঘুমের দৃশ্য দেখতে। শান্ত সকালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক আশ্চর্য শরীরী দহনের তাপ উষ্ণতায় আমাকে ভরে দিচ্ছিল যেন। বুক থেকে এক গভীর শ্বাস পড়ল।

ফিরেই যাচ্ছিলাম। খুট্ করে দরজার খিল খোলার শব্দে থমকে দাঁড়ালাম। দরজায় যাকে দেখলাম সে মাদ্রী নয়, পান্ডু। বেশ বাসে একটুও শৈথিল্য নেই। অন্তত বিস্ময় নিয়ে কয়েকমুহূর্ত আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। বুকের মধ্যে আমার দামামা বাজছে।

পান্ডুর মুখে চোখে একটা উচ্ছলতার ভাব ফুটে উঠল। বলল ঃ ভেতরে আসবে না!

কক্ষের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম ঃ সাত সকালে এসে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম না তো? তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম। তোমার শরীর ভালো আছে তো!

পান্ডুই দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। উত্তর দিতে গিয়েও একটু দ্বিধায় পড়ল। জিগ্যেস করলাম ঃ মাদ্রীকে তো দেখছি না? কোথায়?

পান্ডু এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাদ্রীর কথা এড়িয়ে গিয়ে অভিমানী গলায় বলল ঃ এতদিন পর সময় হলো আমার কথা জানবার?

বসবার ঘরে পান্ডুর মুখোমুখি বসে আছি। ওর প্রশ্ন শুনে ম্লান হাসি। বললাম ঃ তোমারও তো সময় হয়নি আমাকে দেখার। কেমন আছি কী ভাবে দিন কাটছে জানতে চেষ্টা করেছ। দায়িত্ব শুধু কি আমার একার?

তোমার সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই আমার।

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রয়োজনের সম্পর্ক তো আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে সে সম্পর্ক না রাখলেও বোধ হয় চলে যায়। এখানে তোমার সব আছে। তুমি হস্তিনাপুরের রাজা, কৌরব পরিবারের সন্তান। এখানে তুমি ব্যস্ত মানুষ। তোমার আরো একজন স্ত্রী আছে। তাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ। তোমার কোন অভাব নেই। অনাদর নেই। অপ্রাপ্তি জনিত বেদনাও নেই।

পান্ডু উদ্বিগ্ন গলায় বলল ঃ তোমার সমস্যাটা কী বলতো?

সেই কথা বলতে সাত সকালে ঘুম থেকে তোমাকে টেনে তুলেছি। সেজন্য সত্যি দুঃখিত। তোমাকে একটা কথা আজই সামনা সামনি জানাতে ইচ্ছে হলো। আমি এখান থেকে চলে যাব।

চলে যাবে মানে?

আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি-চাইছি।

এখানে থাকলে, আর কিছুদিনের ভেতর সত্যিই পাগল হয়ে যাব। এখানে আমি একেবারে একা হয়ে গেছি। আমাকে একা করে দেয়া হয়েছে। এই পরিবারের আমি কেউ নই। আমার কোন দায়িত্ব নেই, স্বামীর উপর পাছে দাবি করি, তাই আমার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কী নিয়ে থাকব? তুমিও নিরুপায়। তাই, একা থাকতে চাই। রাগ কর না লক্ষীটী। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই। আমি তোমার জীবনে শুধু একটা বোঝা। আমি চলে গেলে তুমি আরও মুক্ত হতে পারবে। পিতৃব্যও মুক্ত মনে তোমার রাজ্য দেখাশোনায় মন দিতে পারবেন। তিনি নিঃশঙ্ক হবেন।

কেদারা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল পাণ্ডু। রাগে ও অভিমানে রক্তিম হয়ে গেল তার মুখখানা। অভিমান রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ তুমি এই কথা বলতে এসেছ আমাকে। কে বললে, তুমি আমার জীবনে একটা বোঝা? বরং আমিই তোমার জীবনের বোঝা। তাই আমাকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছ।

দুদিকে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম ঃ না গো না। তুমি কোনদিন বোঝা হওনি। কেবল তোমার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে?

প্রয়োজন! পাণ্ডু দু'চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের সুরে বলল। এটা একটা বিশ্রী শব্দ। তোমাকে আমি জিনিসপত্রের মতো প্রয়োজন মনে করেনি। তুমি আমায় প্রথম ভালোবাসার ফুল। অক্ষয় অব্যয়। ও ফুলের সৌরভ শেষ হবার নয়।

আমিও তোমাকে স্ত্রীর সম্মান থেকে বিচ্যুত করেনি।

তুমি বুঝছ না, ব্যাপারটা আর তোমার আমার মধ্যে নেই। এখানে তুমি কেউ নও। বলতে কষ্ট হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। তবু জেনে রাখ তুমি একটা পুতুল। হাঁ পুতুল ছাড়া কিছু নও। এটা যে তোমার কত বড় অপমান তা বুঝেও বুঝছ না। কোন অধিকারে থাকব এখানে? মহিষীর সম্মান, মর্যাদা কী দিয়েছ আমাকে? প্রতিমুহূর্তে নীরব অপমানের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এভাবে আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার চেয়ে এস্থান ছেড়ে যাওয়া ঢের ভাল। মানুষের মর্যাদা, সম্মান গেলে তার আর কি থাকল? আমি শুধু একবার দেখতে চাই, আমার নিজের কাছে আমার জীবনটার কোন মূল্য আছে কিনা? তুমি আমাকে মুক্তি দাও। জলভরা চোখে কথাগুলো বহু কষ্টে-বললাম।

পাণ্ডু হঠাৎ অপ্রস্তুতবোধ করল। তার মুখে কোন কথা জোগাল না। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর গম্ভীর গলায় বলল ঃ তুমি তো নিজের কাছে নিজের প্রয়োজনীয়তা খুঁজছ, এর মানে কিভাবে নতুন করে বেঁচে ওঠা যায়। সেই বাঁচার সঙ্গে তুমি আমাকে আর জড়াতে চাও না। তুমি বড় স্বার্থপর। আমার জীবনে তুমি আমার আশ্রয়, আমার একমাত্র অবলম্বন। একথা শুনেও তুমি চলে যাবে।

বেশ জোরাল গলায় বললাম ঃ যাব। তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। যাবে তুমি? নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে এক অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে। যেখানে আমরা প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অনুভব করব। আবিষ্কার করব। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে যোগাযোগ গড়ে তুলব, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার হব।

এটা তোমার নিছকই পাগলামি।

তা-হলে, আমাকে একাই একটু পাগলামি করতে দাও।

পাগলামির একটা নিষ্ঠুর রূপও আছে, রাস্তায় বসে তুমি বুক উজার করে কাঁদ, কেউ জিগ্যেস করবে না, তুমি কাঁদছ কেন? কী তোমার দুঃখ? বরং উপহাস করবে মজা করার জন্যে দু'চারটা পাথর ছুঁড়ে উত্যক্ত করবে, আরো কাঁদাবে। এসব খেপামি ছাড়।

আমাকে এবার সেই খেপামি একা একা করতে হবে। আমি তো বুঝেই গেছি, এখানে আমি যেমন অবাঞ্ছিত, দুদিন বাদে তুমিও অবহেলার পাত্র হবে তেমন। গান্ধার যুবরাজ শকুনি তো

নিজের রাজ্য ছেড়ে আর এমনি এমনি আসেনি। একটা কিছু করার মতলবে এসেছে। শুনেছি, পিতৃব্যের আমন্ত্রণে তিনি অন্ধ ভগ্নীপতির দেখাশোনা করতে এসেছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়নের প্রভাবমুক্ত করার জন্য হস্তিনাপুরের গোটা প্রশাসন ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অথচ, রাজা হয়েও তুমি কিছু জান না। গলাধাক্কা খাওয়ার আগে সম্মানের সঙ্গে চলে গেলে অপমানের আত্মগ্লানিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হতে হবে না। এই রাজ্যে তুমি কত অসহায় এবং বন্ধুহীন তা জান না বলেই এমন নিশ্চিন্তে আছ। কিন্তু আমি তোমার মতো নিশ্চিন্ত নই। আত্মসম্মানজ্ঞান যার নেই সে মানুষ নয়। তার কোন প্রত্যাশা কিংবা দাবি থাকে না। কৃপা-অনুগ্রহ পেয়েই সে নিশ্চিন্ত। আঘাত, দুঃখ পাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েই থাকে। তোমার প্রয়োজন সুখী জীবন। কীভাবে আছ, কেমন করে আছ সেটা বাইরের লোকেরা জানতে পারে না। কিন্তু এভাবে বাঁচার ভেতর কোন গৌরব নেই। আত্মসম্মান ভিক্ষে করে পাওয়ার জিনিস নয়। যার আত্মসম্মানজ্ঞান নেই সে মানুষ নয়। তার বেঁচে থাকা না থাকা সমান। আসলে এই বোধটাই তোমার হয়নি, মানুষের যা দামী তার দাম না দিয়ে তুমি সস্তায় বিকিয়ে দিচ্ছ। তোমার এই বোকা বোকা দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে তোমার শনি প্রবেশ করছে। কিন্তু আমি অসম্মান, অবহেলা আর সইতে পারছি না। আমি জড়ও নই। আমি শুধু দেখাতে চাই, যারা তোমাকে কৃপা ও অনুগ্রহ করছে, আমাকে সইতে পারছে না, শত্রু ভাবছে, অবজ্ঞা, অবহেলা করে মর্যাদা হানি করছে, তাদের কাছে আমার জীবনটার যে কত মূল্য তা জানান দেবার জন্যই তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি, যে মানুষের অন্যের ক্ষতি করার কিংবা দুশ্চিন্তা হওয়ার মতো ক্ষমতা নেই তাকে কেউ ভয় করে না। মানুষ বলে পাত্তা দেয় না। নিজের বাহুবল লোকবল, ব্যক্তিত্বের জোর না থাকলে বা অন্যকে ভয় পাওয়ানোর ক্ষমতা না থাকলে জীবনের বহুক্ষেত্রেই সেই মানুষের নিজের স্বাধীনতাকে একটু একটু করে বন্ধক দিতে হয় অন্যের হাতে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে সঙ্কীর্ণ গন্ডীর বাইরে গিয়ে ব্যক্তিসত্তার জোরে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করে আত্মসম্মান আদায় করে নেয়ার নাম মনুষ্যত্ব। মানুষ সেই সাহসের জন্যই চিরদিন গর্বিত বোধ করছে। সেই সাহসটাই তুমি হারিয়ে বসেছ। আত্মসম্মান বোধের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। আমি সেই মুক্তির স্বাদ পেতে চাই। অনন্ত নীল আকাশে ডানা মেলে দেবার জন্যে আমার ভেতরটা ছটফট করছে। শান্ত থাকতে আমি পারছি কৈ?

পান্ডু জ্বালা ধরা চোখে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিপন্ন অসহায় মানুষের মতো বলল ঃ সত্যিই আমার সাহস নেই। আমি বড় ভীতু। অনেকরকম ভয় আমার--হারানোর ভয়, হেরে যাওয়ার ভয়. রোগের ভয়, বিশ্বাসভঙ্গের ভয়। বিধাতা আমার জীবনটা কেন যে এইভাবে গড়ল, জানি না। এখন আমি কী করব? কী আমার করা উচিত? অস্থির বর্তমানের চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভালো কী মন্দ তাও জানি না। তবে আত্মসম্মানজ্ঞান মেয়েদের প্রখর থাকে। জীবনের বাঁচার মানে তুমি নিজে যেমন আবিষ্কার করেছ সাহসের সঙ্গে তেমন করে আমি কিন্তু অনুভব করিনি। জীবনের যে ঝড় উঠেছে সেই ঝড়ে যে কোন মানুষকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে, প্রমত্ত ঝড়ের ধাক্কায় অনেক কিছুই ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে! তোমার প্রত্যাশা পূরণ নাও হতে পারে, স্বপ্ন ব্যর্থ হতে পারে। তাই বলছিলাম একটু শান্ত হও।

এক অদ্ভুত হাসিতে আমার অধর যুগল ভরে গেল। বললাম ঃ যার জীবন যে খাতে একবার বয়ে যায়, তার পক্ষে অন্য খাতে হঠাৎ-ই তাকে বইয়ে দেবার উপায় থাকে না। নদীর ধর্মই হলো সাগরে হারিয়ে যাওয়া। নদীই হচ্ছে জীবন। আমার আর ফেরার পথ নেই।

রাগে পান্ডু গর গর করে উঠল। বলল ঃ তুমি স্বার্থপর। নিজেকে তুমি ভালোবাস। নিজেকে নিয়ে তোমার খুব দেমাক। নিজের সুখ, আনন্দ, গর্ব ছাড়া তুমি কিছু বোঝ না।

হাঁ, মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার নিজেকে। নিজেই সে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। সে আছে, তার চারধার ঘিরে অন্যান্য সব সম্পর্ক আছে। সে সব সম্পর্ক না থাকলেও একজন মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের জন্য আত্মসম্মানের জন্য তারও যে কিছু করার ছিল বেশির ভাগ মানুষ সেই কথাটা ভাবে না। অন্যের

ভাবাটাকে দেমাক মনে করে। আসলে জেদই মানুষকে দিয়ে সব করিয়ে নেয়। যার জেদ নেই, সে কি মানুষ?

হঠাৎ পাণ্ডুর মুখটা অপ্রতিভ দেখাল। নিজের ভাবনার মধ্যে বেহুঁশ হয়ে গেল।

পাণ্ডুর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যই তার প্রতি আমাকে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট করে তুলল। তবু এই মানুষটিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। তাকে বাদ দিয়ে তো আমার কোন আলাদা মর্যাদা কিংবা স্বীকৃতি নেই। হস্তিনাপুরে তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেছিলাম, পাণ্ডুকে ছাড়া সে পরিকল্পনার মানে হয়ও না হয়তো কোনো। জোর করে কিছু করতে চেষ্টা করা হবে হঠকারিতার সমান। তাকে সঙ্গে না পেলে কে কী রকম অবজ্ঞার চোখে তাকাবে তার দিকে কে জানে? মুখে চলে যাব বললেও আমার একার সাহস হলো না সত্যি চলে যাওয়ার। পাণ্ডু আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার অবলম্বন এবং আশ্রয়। হৃদয় ভাঙা মান-অভিমান, ক্ষোভ, রাগ, অসন্তোষ, ব্যর্থ হওয়ার জ্বালায় তীক্ষ্ণ অথচ মোলায়েম গলায় বললামঃ নরম মানুষকে সকলে কাদার মতো পায়ে মাড়িয়ে যায় অবহেলায় এবং ঘেন্নায়। তাদের পায়ে তলায় থেঁতলে যাচ্ছে তোমার অন্তঃকরণ। কিন্তু এভাবে তোমাকে অপমানিত হতে দেব না। কিন্তু আমি চাইলে কী হবে? তুমি তো আমার অনুভূতি, আশঙ্কা সংশয়, ভয়, সন্দেহ এসব বোঝ না। বোঝবার চেষ্টা কর। কখনও আত্মসমীক্ষা করে দেখেছ কী? মহর্ষি দ্বৈপায়নের কূটকৌশলে তুমি রাজা হয়েছ। পিতৃব্য ভীষ্মের কূটকৌশলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রাজত্ব করছ। ক্ষমতার চাবিটি পিতৃব্যের হাতে। মহর্ষি দ্বৈপায়নকে হারানোর জন্যে যে কোনদিন ঐ চাবিকাঠিটি ঘুরিয়ে সিংহাসন থেকে তোমাকে দূর করে দেবেন। মহর্ষির কৃপাপুষ্ট ব্যক্তির কোন স্থান নেই হস্তিনাপুরে। তারা পিতৃব্যের শত্রু। শত্রুকে নির্মূল করে পিতৃব্য দ্বৈপায়নের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক পরিচ্ছন্ন প্রশাসন চালু করতে চান, যেখানে তাঁর কর্তৃত্বই থাকবে শুধু। অগ্রজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পিতৃব্যের দুর্বলতা আছে। তোমার ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহসনে প্রতিষ্ঠিত করতে গান্ধার রাজ সৌবল আমাত্যবর্গ এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের এক অঘোষিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধার স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করেছেন। যতরকম সুখ-সুবিধে পাওয়া সম্ভব সবই তারা পাচ্ছে। তোমার দিক থেকে তারা ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে চলে যাচ্ছে। তোমারও দিন ফুরিয়ে আসছে। গদি ছাড়বার জন্যে-প্রস্তুত হও।

পাণ্ডুর ভুরু কুঁচকে গেল। বিষাদে মুখখানা, থম থম করছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ আমায় তুমি অবাক করলে রানী। অথচ, এরাজ্যের রাজা হিসাবে আমার কোন ভূমিকা নেই। রোগে রোগে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছি। আমার না থাকলেও চলে।

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি ঃ জীবন সম্পর্কে যারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। তাদের কাছে সব কিছুই, এমন কি নিজেকেও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু আত্মসমর্পণ করবে কেন? নিজের সম্মান ও মর্যাদাকে কোনরকম আঘাত না করে প্রতিপক্ষের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ না দিয়ে তার হাতের অস্ত্র কেড়ে নাও। একটা অছিলা করে রাজা থাকতে থাকতে হস্তিনাপুর ছেড়ে চল। রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সফর করে বেড়াও। তাতে রাজার খাতিব, যত্ন, মর্যাদা যেমন পাবে, তাদের মনোভাবও বুঝতে পারবে। সেইসঙ্গে হস্তিনাপুরের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কর। পিতৃব্যের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ জেহাদ ঘোষণাও করা হবে তাতে। তুমি যে দুর্বল নও, কৃপা কিংবা অনুগ্রহ দেখানোর মানুষ নও, করুণা অথবা অবহেলার পাত্র নও—এটা জানান দেবার জন্যে তো গর্ববোধ করতে পারবে। সেটা কি জীবনের কম পাওয়া?

পাণ্ডু কথা বলতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে অবাক মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে থাকে, মাথা নাড়ে। একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল ঃ তোমার মতো এমন গভীর করে তলিয়ে দেখেনি কখনো। আমাকে ক্ষমতায় বসিয়ে লুকিয়ে যা হচ্ছে তাতে সত্যি আমার গৌরব নেই। আছে অপমান। রাজার গৌরব এবং মর্যাদা বাঁচানোর জন্যে তোমার পথই বাঁচার পথ।

বহুদেশ এবং রাজ্য ঘুরে হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন করতে আমাদের বৎসরকাল লেগে গেল। এই সময়ের মধ্যে রাজধানীতে এক রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গেল নিঃশব্দে এবং বিনা রক্তপাতে। পাণ্ডুর অনুপস্থিতে অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র রাজকার্য চালাচ্ছিল। কিন্তু পাণ্ডু ফিরে এলে সে রাজ্য আর ফিরিয়ে দিল না তাকে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করতে সপরিবারে পাণ্ডুকে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের পরোয়ানা জারি করল।

এরকম কিছু ঘটবে আমি জানতাম। পাণ্ডুর মনও তৈরী করেছিলাম খুব সংগোপনে। পাণ্ডুও জানতো তার অনুপস্থিতির সময়ে পিতৃব্য ভীষ্ম এবং মহর্ষি দ্বৈপায়নের কৌশলগত বিবাদ এবং ক্ষমতা লড়াইর উপর একটা যবনিকা পড়বে। এই যবনিকা হস্তিনাপুরে থাকলেও আটকানো যেত না। এতে শুধু রেষারেষি এবং তিক্ততাকে অতিক্রম করা গেল। বাইরের লোকও টের পেল না রাজনৈতিক পালাবদলের ঠান্ডা লড়াইর উত্তাপ। এতকাল যে লড়াইর সূত্রপাত হয়েছিল কৌরব পরিবারের অভ্যন্তরে, হস্তিনাপুরের চৌহদ্দীতে, ভীষ্মের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভেতরে সে দ্বন্দ্বের কৌশলগত লড়াই এবার হস্তিনাপুরের বাইরে লালিত হতে লাগল। মাটির ভেতর গাছ যেমন নিঃশব্দে শিকড় চালিয়ে দিয়ে রস শোষণ করে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে তেমনি পিতৃব্যের সঙ্গে মহর্ষির সংঘাতের সূক্ষ্ম শিকড় কৌরব বংশের দুর্বলতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চারিয়ে গেল। আর আমি হয়ে গেলাম তাঁদের বিবাদের ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু। সেদিনই বুঝেছিলাম সত্যিই আমি ইতিহাস হতে চলেছি। হয়তো একদিন আমাকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি সৃষ্টি হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে আমি থাকব চিরকাল।

আমি খুব অসাধারণ মহিলা নই। আমার মনে ব্যর্থতার কোন খেদ নেই। আমি যা করেছি, আমার মতো সাধারণ একটি মহিলার পক্ষে তা খুব একটা সামান্য নয়। ইতিহাস আমার কি বিচার করবে তা কেবল ভবিষ্যতই জানে। তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই। বেঁচে ওঠার জন্যে, হারানো অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্যে, নিজের গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্যে একজন সত্যকারের সংগ্রামী মানুষের যোগ্য সন্তানের উত্তরাধিকারী অর্জনের জন্যে একজন মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করেছি। কোন মূল্যবোধের কাছে কোন সময়ে নিজেকে বন্ধক দেইনি। নদীর মতো এক খাদ থেকে আর এক খাদে বয়ে গেছি অনন্ত উৎসারে।

আমার সমস্ত সুবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছি, বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে পাণ্ডুর মতো এক অযোগ্যের হাতে পড়েছি। বিধাতা হয়তো আমাকে তাঁর যোগ্য সন্তান হয়ে ওঠার জন্যেই এই বন্দোবস্ত করেছেন। বিধাতা একজন পুরুষের মতো আমাকেও কম করে কিছু দেন নি। সব রকম ভালোমন্দ সুখ দুঃখ বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে গিয়ে প্রমাণ করতে হয় নিজের কৃতিত্বকে। সে জন্যে আমার বড় চিন্তা হতো।

রাজনীতির রাহু আমার স্বপ্ন চন্দ্রমাকে গ্রাস করতে উদ্যত। আমার সাধ্য কি আটকাই তাকে? মুখ বুজে যেমন হেরেছি, অপমানও সয়েছি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকে ছোট করেছি, দশের চোখেও ছোট হয়ে গেছি। স্বার্থের তাপে আমার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। আমার বুকে স্বাতন্ত্র্য থাকার আগুন জ্বলছে। যে কোন মুল্যে নিজেকে রক্ষা করতে চাওয়ার ভেতর কোন দোষ নেই। মেয়ে মানুষ হওয়াও কোন অপরাধ নয়। বরং একজন উদ্যোগী পুরুষের চেয়ে একজন নারীয় সফল হওয়ার সুযোগ বেশি। পুরুষ যেখানে পৌছতে পারে না, নারী সহজেই সেখানে পৌছে যায়। পুরুষকে সবটাই নিজের উদ্যোগে করতে হয়, কিন্তু নারীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোই আছে। কেবল তার নেবার অপেক্ষায়। সেটা নারীর সুবিধা এবং অসুবিধা। নারী বলেই তাকে দয়া করছে। অনুগ্রহ দেখাচ্ছে। এই বোধে নারীর অন্তর নিজের অজ্ঞাতেই হাঁফিয়ে উঠে। নিদারুন আত্মকলহে সে মনোকষ্ট পায়। সাহায্যে তার সাফল্যের গৌরব দীপ্তি ও তৃপ্তি কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তেমনি সব সময়ের ভয় কখন পা পিছলে সাহায্যের নোংরা জলে পড়ে যায়।

এ রকম একটা আত্মকলহের মধ্যেই অনুভব করলাম, বড় বটগাছ না চাইতেই ক্লান্ত পথিককে আশ্রয় এবং ছায়া দেয়। সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবনটা অনেকটা বিরাট বটগাছের ছায়ার নীচে বসে থাকার মতোই। বটগাছ ক্লান্ত পথিককে নিজের চেয়ে অনেক ছোট ভাবে, কিন্তু পথিকের মনে একবারও সে কথা উদয় হয় না। বরং মনে হয় এই ছায়া ও আশ্রয়ই বটগাছের কাছে তার একান্ত প্রত্যাশা। এটাই বটগাছের তার প্রতি কর্তব্য। তেমনি এক অবিচল কর্তব্য ও দায়িত্বসূত্রে পুরুষও নারীর পাশে অযাচিত ভাবে দাঁড়ায় সেবকের মতো, বন্ধুর মতো রক্ষকের মতো। পুরুষের এই প্রবণতা তার প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুতরাং, তাকে বিকৃত করে কেউ যদি ব্যক্তিগত জীবনের আস্বাদ নষ্ট করে দেয় তা হলেই সর্বনাশ।

আমি অনেক ভেবেছি, পিতৃব্য ভীষ্ম এবং মহর্ষি দ্বৈপায়নের কথা। বুঝতে চেষ্টা করেছি, উভয়ের ঝগড়ার ভেতরে কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেই মিলটা গভীর এবং অপ্রকাশ্য। খোলাখুলি ভাবে কেউ কিছু আমাকে জানাচ্ছেন না। তবে তাঁদের ঝগড়া আমাকে নিয়ে। আমার মধ্যে তাঁর দুজন কী দেখছেন কে জানে? ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরেছি, দুজনের কাছেই আমার একটা প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা অভিন্ন বলেই মনে হয়েছে। তবু দুজনের মনোভাব সহযোগীর নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর। কেন? এই প্রশ্নটা আমার চিত্তকে আলোড়িত করেছে। বার বার মনে হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা উৎস তো থাকা দরকার। কিন্তু তার শিকড় কোথায়?

এরকম একটা প্রশ্ন চিহ্নের সামনে যখন থমকে দাঁড়িয়েছি, পাণ্ডু রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিদুরের সঙ্গে কক্ষে ঢুকল। বিদুরকে দেখেই মনটা খুশিতে ভরে গেল। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। কপট রাগ দেখিয়ে বললাম ঃ তবু ভালো মনে পড়ল। আজকাল তো ভুলেই গেছ। উনি বোধ হয় জবরদস্তি করে ধরে এনেছেন তোমাকে, নইলে আসাই হতো না আর। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, অধমের সঙ্গে কে আর সম্পর্ক রাখতে চায় বল?

বিদুরের দু চোখে খুশির প্লাবন। মৃদু হেসে বলল ঃ আচ্ছা, তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?

ঝগড়া করাটাকে সম্পর্কহীনতা বলে ভাবছ কেন? ঝগড়া সুস্থতার লক্ষণ। একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে অভিমানে, ভালোবাসায় কিংবা অধিকারে—এর মধ্যেও এক ধরনের রম্যতা আছে।

পাণ্ডু উষ্মা প্রকাশ করে বলল ঃ কথা কাটাকাটি করার সময় নয় এখন। আমার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছে হস্তিনাপুর ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পিতৃব্যের সামনে অগ্রজ কথাগুলো বলল অথচ, তিনি প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর নীরব অনুমোদন পেয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্র। বিনা রক্তপাতে সিংহাসনের হাত বদল হয়ে গেল।

বিদুর বলল ঃ এভাবেই ভারতবর্ষের মতো একটা বিরাট দেশও হাত বদল হয়ে গেছে একদিন। এ দেশের সরল, নিরীহ, আদিম অধিবাসীদের কি বহিরাগত আর্যরা কুটযুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে গোটা উত্তরাঞ্চলকে আর্যাবর্ত করে নেয়নি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে! সেই ইতিহাসের পুনাবৃত্তিতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। নিজের শক্তির উপর শক্ত হয়ে যে দাঁড়াতে শেখেনি তাকে তো তার মাশুল দিতে হবে। একটা পরগাছাও আশ্রিত গাছের শাখাকে শুধু আঁকড়ে ধরে না, কান্ডের অভ্যন্তরে শিকড় চারিয়ে দিয়ে তার থেকে রস শোষণ করে বেঁচে থাকে, তেমনি করে একজন দুর্বল মানুষও অস্তিত্বের জন্যে তৃতীয় কোন শক্তির কাছে আত্ম সমর্পণ করে আদায় করে নিতে পারে তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।

বিদুরেব সুচতুর কূট ভাষণ বুঝে নিতে বিলম্ব হলো না। ওর দুটি চোখের উপর আমার নিরীহ দুটি চোখ মেলে ধরে সকৌতুকে বলি ঃ ঠিকই তো। একজন মানুষ যতক্ষণ নিজের কাছে হেরে না যাচ্ছে ততক্ষণ কেউ তাকে হারাতে পারে না। নিজের কাছে হেরে যাওয়াটাই মানুষের বড় হার। কিন্তু সংঘর্ষের আগেই তুমি তার কাছে হেরে বসে আছ। তোমাকে যদি হারতেই হয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে হারবে কেন? তাকে হারানোর জন্যে অনন্তকাল যদি অপেক্ষা করতে হয় আমাদের, তাই করব। তার শঠতা, কপটতার জবাব আমরা মিথ্যে ছলনা এবং কপটতা করেই দেব।

পাণ্ডু এবং বিদুর বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাণ্ডু আস্তে আস্তে বলল : সত্যিই আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছি। আর তুমি কী অসাধারণ তৎপরতার সঙ্গে সব কিছু চটপট জেনে ফেলেছ, বুঝে নিয়েছ। বিদুর ঠিকই বলে, তুমি বাইরে খুব শান্ত, শিষ্ট নিরীহ, কিন্তু তোমার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ণ মানুষ।

বিদুরের চোখের কোণে নীরব হাসির ঝিলিক দিল। আর তাতেই আমার ভেতরটা ভীষণ চমকে গেল। বিব্রত গলায় বললাম ঃ দেবরের পাগলামিতে কান দিও না। আমাকে অপদস্থ করার জন্যে ওরকম অনেক কথা বানিয়ে বলে। কী আনন্দ পায় কে জানে?

অবিশ্বাসভরা চোখে পাণ্ডু আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল ঃ বিদুর ছাড়া এই বিশ্ব দুনিয়ায় তোমার সুখের, আনন্দের আর কে ভাগীদার আছে? আমি তো অপদার্থ। কখনো সুখ আনন্দ দিতে পারেনি। তোমার জীবনে আমি রাহুর মতো এক দুষ্ট গ্রহ।

অসহিষ্ণু ক্রোধে বিরক্তিতে পাণ্ডুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললাম ঃ ধান ভানতে শিবের গাজন সুরু হলো। ধেনো হাটে বুনো ওল নিয়ে বসলে। আশ্চর্য মানুষ বটে! কথা হচ্ছিল, নির্বাসিন অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়েছে আমাদের। অন্তঃপুরের চৌহদ্দীতে বসে যে কাজ করা কঠিন সে কাজটা চোখের বাইরে গিয়ে করাটা সহজ।

তোমার এ রকম অদ্ভুত আনন্দের অর্থ বুঝি না।

স্বামী, প্রতিশোধ নেবে না?

নিতে চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? আমার মতো অকর্মণ্য মানুষকে সাহায্য করার মানুষ কোথায়? সব মানুষই স্বার্থপর। আমার কাছে তার পাওয়ার যদি কিছু না থাকে তাহলে মিছিমিছি আমাকে সাহায্য করতে চাইবে কেন? তাকে কি দিতে পারি আমি? যে লোভে আমার জন্যে সব উৎসর্গ করতে রাজি হবে? নিঃসম্বল, অসহায় মানুষের বন্ধু কেউ হতে চায় না। তাকে একা একা চলতে হয়। আমাব সন্তানও নেই যে, তার কাছে প্রত্যাশা করব।

একথায় হঠাৎ একটু দিশেহারা বোধ করে চুপ করে থাকি। তারপর ধীরে ধীরে বলি ঃ তা আমি জানি। কিন্তু সন্তানহীনতা কৌরব পরিবারের কোন সমস্যা নয়। এ সংকট তো কয়েক পুরুষ ধরে চলেছে হস্তিনাপুরে। কার্যত মহারাজ শান্তনুর পর কারো ধমনীতে অবিমিশ্র কৌরব বংশের রক্ত নেই। তোমরা ক্ষেত্রজ পুত্র বলে অচ্ছুৎ হয়ে যাওনি। তুমি আমি এবং দেবর বিদুর চাইলে এক অসম্ভব প্রত্যাশা হয়তো পূরণ করা যায়। কৌরব বংশের সমান্তরাল এক নতুন বংশই পারে আমাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে। এই তৃতীয় শক্তিই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আদায় করে নেবে হৃতগৌরব ও মর্যাদা। তাই বলছিলাম, নির্বাসিনে গিয়ে আমরা কিছুই হারাব না। হারাতে পারি না। কূট কৌশলে হস্তিনাপুর থেকে আমাদের যেভাবে উৎখাত করা হলো কূট বুদ্ধিতে সেভাবেই হৃতক্ষমতা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারি।

পাণ্ডু একথায় হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকল। তারপর একবার আমার দিকে আর একবার বিদুরের দিকে তাকাল। কী যেন বলি বলি করে সামলে নিয়ে বলল ঃ রুগ্ন বলেই অগ্রজ অনায়াসে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। এখন আমি একলা আমার অনুগতদের সে কিনে নিয়েছে। এতবড় একটা বেইজ্জত হওয়ার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোলা যায় কখনও? কিন্তু আমার মতো রুগ্ন অসহায় মানুষ কী বা করতে পারে? অর্থহীন প্রতিশোধ গ্রহণের স্বপ্ন দেখি। কত সময় মনে হয়েছে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে আমার অসহায় একাকীত্ব দূর করি। স্ত্রীদের কাছে স্বার্থপরের মতো এ প্রস্তাব করতে সাহস হয়নি। অপদার্থ, রুগ্ন স্বামীর জন্যে আর কত অপমান সইবে?

পাণ্ডু একটু হাসল। ম্লান হলেও হাসিটা তার বুক থেকে উঠে এল। কৃত্রিম নয়। মাথা নেড়ে বলল ঃ তবু তোমাকে আমার অপমানের কথা গভীরভাবে ভাবতে দেখে এবং তার একটা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের কথা বলতে শুনে কী আনন্দই না হয়েছে আমার। আজ আমার আনন্দের দিন। বুক থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। তোমরা কৃপা করলে আমি বাবা হতে পারি। পৃথা কুন্তী আমার ঐকান্তিক বাসনা পূরণ করতে তোমার পছন্দ করা যে কোন ব্যক্তিকে পুত্রোৎপাদনের জন্য আহ্বান করতে পার। এমন কি বিদুরকেও।

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে ফেলে পাণ্ডু বিদুরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বিদুর লজ্জায় মাথা হেঁট করল। তৎক্ষণাৎ দুচোখ বুজে আমি স্থির হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তার চোখ মেলে পাণ্ডুর দিকে তাকালাম। তার চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। বলল ঃ যারা ব্যতিক্রম হয়, তারা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে সৎ হয় খুব! তাদের লুকবার কিছু থাকে না। অনাবিল চোখ, খোলা হাওয়ার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জীবনের ঘ্রাণ নেয়, জীবনকে ভালোবাসে। তোমাকে দেবার কিছু নেই। কিন্তু আমাকে ধন্য করার মতো অনেক কিছু করার আছে তোমার। জন্ম দিলেও যেমন সন্তানের জনক হওয়া যায় না, তেমনি সন্তান উৎপাদন না করেও একজন ভালো জনক হওয়া যায়। এতে তো তোমার সংকোচের কিছু নেই, শাস্ত্র মতে তারা তো আমারই সন্তান। আমার ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের দেহ ধারণ করে তারা তোমার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হবে। এক প্রাণ থেকে আর এক আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশগতি। আমি রইলাম না। কিন্তু আমার স্বপ্নের বাসনা, কামনার অম্লান শিখা তো রয়ে গেল। বলতে বলতে একটা গভীর শ্বাস পড়ল পাণ্ডুর। বুকের ভিতর থেকে এষণাটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

আমারও বুকটা কেমন হাহাকার করে উঠল বসুসেনের (কর্ণের) জন্যে। অনেককাল পরে ভুলে থাকা ব্যথা থেকে রক্তক্ষরণ হলো। এক মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল আমার ভেতরটা। বসুসেন আমার ছেলে! অনুভূতির ভেতর কী যেন ঢেউ দিয়ে গেল। এতদিনে তাকে নিশ্চয়ই দেখতে সুন্দর হয়েছে। এই বসুসেন যখন পেটে ছিল তখন স্বপ্নে কল্পনা করেছি, হাঁটতে শিখলে মা বলে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। খুব অভিমান হলে কোমর জড়িয়ে ধরে দু'পায়ের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলবে; তুমি ভীষণ খারাপ। তোমার সঙ্গে আড়ি, তুমি একটুও ভালো না। মিছিমিছি আমাকে কষ্ট দাও? আমি তোমার কী করেছি?

কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে কী সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। সেই গভীর অজানা অনাস্বাদিত বোধ আমার বুকে যে বিশ্বাসঘাতকের মতো লুকিয়ে ছিল তা কখনও জানি নে। হঠাৎ করে সহস্র হাতে ছুরি মারল আমার বুকে। আর এক গভীর অপত্যস্নেহ হঠাৎ উৎসারিত ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। মনে হলো, বসুসেনকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদরে সোহাগে ডুবিয়ে দিয়ে বলছি ঃ ভাব, ভাব, ভাব। অমনি থর থর করে কেঁপে গেল ভেতরটা। স্বপ্ন সত্য হলো না। কল্পনার বসুসেন দৌড়ে কোনদিন আসবে না। এলে হয়তো অন্যরকম লাগত।

বসুসেনের কথা মনে হলে মনের মধ্যে ঝড় উঠে। পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধেই তখন বড় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি। নিজের উপরেও প্রচন্ড রাগ হয়। বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি নিজেই এই সরল নিষ্পাপ শিশুর চরম সর্বনাশ করেছি। আমার রক্তে রয়েছে সর্বনাশের বীজ। সেই অভিশপ্ত রক্ত বীজই সঞ্জীবিত হয়ে গেছে বসুসেনের মধ্যে। আতঙ্কে, ভয়ে আমার হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। বড় ব্যথা হৃদয় জুড়ে। হঠাৎই দুঃখ ঝাপ্সা হয়ে এল। মুখের ভাবও বদলে গেল।

পাণ্ডু আমার চোখের উপর চোখ রেখে বলল, তোমার চোখে জল। তুমি কাঁদছ?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি ঃ কাঁদব কেন? চোখে জল এমনি এসে যায়। অন্যদিকে মুখ ঘোরাই। বলতে ইচ্ছে করল ঃ তুমি তো জান না, এ জীবনে আমি কী হারালাম। সন্তান থেকেও আমি সন্তানহীনা। আমার মতো দুঃখী কে আছে? বসুসেনের জন্যে খুব দুঃখু হয়। মন খারাপ করে। তার কথা খুব মনে হয়। কিন্তু কোন মুখে পাণ্ডুকে তার কথা বলব? সংকোচে, দ্বন্দ্বে বুকটা তোলপাড় করতে লাগল। কতবার মনে হলো পাণ্ডুর পিতামহী সত্যবতী কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে দিয়ে কৌরববংশকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করলেন, তেমনি আমার কানীন পুত্র বসুসেনকে দিয়ে পাণ্ডুর সন্তান সংকটের বাধা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারি। আমিও হারানো সন্তান ফিরে পাই তা-হলে। শূন্য বুকটাও ভরে উঠে। কিন্তু অবৈধ মাতৃত্বকে নিজের মুখে কবুল করি কেমন করে?

অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। যে অধিকারে মহর্ষি দ্বৈপায়নের ঔরসজাত সন্তানেরা কৌরববংশের উত্তরাধিকারী এবং কৌরব বলে পরিচিত। আমার কানীন পুত্র বসুসেনও মায়ের পরিচয়ে পাণ্ডব এবং কৌরব। কারণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর ধমনীতে কৌরববংশের রক্ত নেই, তারা এবংশের কেউ

না। কৌরব বধূদের গর্ভে জন্ম বলে তারা কৌরব। তেমনি আমিও কৌরব বধূ। আমার গর্ভের সন্তান বলে বসুসেন যদি কৌরব নাও হয়, পান্ডুর পুত্র তো। কিন্তু শাস্ত্রমতে কানীন পুত্র স্বামীর পুত্র বলে গণ্য হয়। সত্যবতী দ্বৈপায়নকে পুত্র বলে যেমন কৌরববংশের মধ্যে টেনে আনল তেমনি আমিও পুত্রের দাবিতে পান্ডুরসিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব দাবি করতে পারতাম। কিন্তু সেই দুঃসাহস দেখাতে পারলাম কৈ? ভয়ে, লজ্জায়-সংকোচে পান্ডুকে সত্য কথা বলা হয় না। স্বার্থের কোলাহলের মধ্যে আমি ছোট হতে পারি, কিন্তু বসুসেনকে ছোট করব কী করে? তার দোষ কী? মা হয়ে তার জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে পারি? কিন্তু সফলই বা হল কোথায়?

স্বার্থপরের মতো নিজের নিরাপত্তা এবং লাভের কথা বেশি ভেবেছি। সত্যবতীর সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না। আমার ও তাঁর দেশ, কাল, পাত্র এবং পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সত্যবতী নিজের রাজ্যে এবং অন্তঃপুরে ছিলেন একেশ্বরী। তাঁর সামনে পেছনে কোন বিরোধ বাধা ছিল না। অবৈধ মাতৃত্ব নিয়ে তাঁকে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। লোকলজ্জা তাঁকে বিদ্ধ করেনি। কোন অবিশ্বাস, সন্দেহ তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়নি। তিনি ছিলেন মুক্ত আর আমি নানাভাবে সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে বদ্ধ। চারপাশে আমার শত্রু। সহস্র সন্ধানী চোখ আমাকে পাহারা দিচ্ছে। নিজেকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত আমি। এক মুহূর্তের জন্যে নিজেকে মুক্ত এবং স্বাধীন মনে হয় না। যে পিতৃব্য সত্যবতীর দক্ষিণহস্ত তিনি একটুও বোঝেন না আমাকে। তাঁর জন্যেই আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল।

২

পান্ডু বড় বড় চোখ মেলে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে আমাকে দেখছিল। ধীরে ধীরে সে চাহনি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল। সেই অসহনীয় দৃষ্টির সামনে আমি কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। মনে হলো, আমি তার কাছে ধরা পড়ে গেছি। লজ্জা পাওয়ার আগে বললাম ঃ স্বামী তুমি কি পুত্র চাও?

জ্যামুক্ত ধনুকের মতো পান্ডু উল্লসিত হয়ে বলল ঃ ভীষণভাবে চাই। এটা কি প্রশ্ন করে জেনে নেবার মতো কথা। দয়া যখন হয়েছে, তখন করুণা কর রাণী।

কথা বলার সময় ভুরু কুঁচকে গেল। দয়া বলছ কেন? স্ত্রীর কাছে প্রত্যেক স্বামীর দাবি এটা। একমাত্র অভিলাষ।

হাঁ, অভিলাষ। একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই, সব মানুষই সন্তানের মধ্যে তার প্রত্যাশার জগৎকে দেখে। তোমার গর্ভের সন্তান প্রত্যাশার পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে দেবে আমায়। পারবে না পৃথা কুন্তী?

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের সঠিক ব্যক্তিটি নিয়োগের জন্যে অনেক কিছু বিচাব বিবেচনা আবশ্যক হয়। আমাদের ঘৃণা, বিদ্বেষের প্রতিশোধ শুধু নয়, হস্তিনাপুরের রাজ্য-সিংহাসনের উপর তোমার দাবি ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সহায়ক ব্যক্তিকে আমরা চাই। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া তো এক নয়। আমরা রাজ্যচ্যুত, নির্বাসিত। আমাদের সহায় নেই, সম্বল নেই, বন্ধু নেই, লোকবল, ধনবল, বাহুবল কিছুই নেই। তাই আমাদের এমন মানুষের সহায়তা দরকার যে হস্তিনাপুরের প্রশাসনের ভেতরে থেকে সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। সে সাহায্য স্বার্থহীন দানে পরিপূর্ণ না হলে কোন লাভ হবে না। এমন ব্যক্তি অন্বেষণ করতে হবে যাকে হস্তিনাপুর সকল লোকে মান্য করে, তার বিশেষ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থাকবে। তাকে চতুর, বুদ্ধিমান, কূটকৌশলী এবং বিশ্বস্ত হতে হবে। হস্তিনাপুরের উপর তার নিজের রাগ শুধু থাকবে না, সংগুপ্ত বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রতিহিংসায় উন্মুখ হয়ে সেও সুযোগের অপেক্ষা করছে। একমাত্র এরকম ব্যক্তি পেলেই আমি তাকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্যে বরণ করতে পারি।

পান্ডু একাগ্রচিত্তে ভেবে বলল ঃ বিদুর ছাড়া এরকম ব্যক্তি হস্তিনাপুরে আর কেউ আছে কি-না জানা নেই।

কপট গাম্ভীর্য প্রদর্শন করে বললাম ঃ তাহলে বিদুরকেই তোমার পছন্দ। শাস্ত্রেও আছে দেবরকে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত করা কিংবা বরণ করা অনাচার কিংবা গর্হিত কর্ম নয়।

পাণ্ডু সহসা উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ প্রীত হলাম পৃথা-কুন্তী।

সেদিন আচমকা বিদুরের কথাটা তুমি বলার পরে আমিও ভেবেছি, বিদুর সহায় হলে একদিন হস্তিনাপুর আমরা ফিরবই। হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে সে আমাদের লক্ষ্য জয়ের সহযোগী হয়ে কাজ করবে। আমাদের জন্যে যদি কিছু নাও করে, তার পুত্রদের জন্যে তো নিঃস্বার্থভাবে করবে। একজন পিতা যেমন তার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে ভরে রাখে, সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে তাকে আগলায়, তাকে জীবনে স্বমর্যাদায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা করে থাকে বিদুরও তাই করবে, এ আমি তোমায় বলে রাখলুম। পুত্রদের পিতৃপরিচয়ে তার নাম নাই বা থাকল, কিন্তু সে তো জানে, পুত্রও জানবে বিদুরই তাদের পিতা। তার প্রাণের অম্লান শিখা তো রয়ে গেছে তাদের ভেতর। তার রক্তের ধারা তো বইছে তাদের ধমনীতে। দেখা হলেই দুটি রক্তস্রোত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবে।

আর কথা নয়, বিদুরকেই বরণ কর।

স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বুক থেকে অপরাধবোধের একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। বড় পবিত্র লাগল। একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল ঃ বাঁচালে আমায়।

কয়েকমাস পরে পাণ্ডুর দু'চোখে সহসা কেমন একটা সন্দেহ নিবিড় হলো। কী গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে আমিও অপলক চেয়ে আছি ওর মুখের উপর। সাহস করে জিগ্যেস করতে পারলাম না ঃ অমন করে দেখছ কী? আমাকে দেখার আছে কী? সন্তান এলে সব নারীর শরীরেই কতরকমের রূপান্তর হয়। তুমি তো আর মেয়ে নও জানবে কেমন করে?

সন্ধানী চোখ দিয়ে পাণ্ডু কী দেখল কে জানে? বিষন্ন মন নিয়ে আর্ত গলায় বলল ঃ তোমার মনের কষ্ট, যন্ত্রণা আমি বুঝি। তোমার কাছে স্বামীর পরিচয় ছাড়া আর কিছু দাবি করার নেই আমার। আমার মতো হতভাগ্য কে আছে? ভাগ্য আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করল। ভাবতে কষ্ট হয়, তোমার কাছে আমার কোন দাম নেই। কী করব বলো? ভাগ্যের উপরে তো কারো হাত নেই। এক টুকরো দিয়ে আর এক টুকরো যদি পাই, তাই বা কম কিসে? সে টুকরোর ভেতর নাই বা থাকলাম আমি। কিন্তু তুমি আছ, আমার প্রেম আছে। সন্তানদের সমস্ত আত্মপরিচয়ের ভেতর আমি আছি। ভীষণভাবে আছি এবং থাকব। আমার দেহ মন আত্মা থেকে তারা জাত না হলেও তারা তো আমার নামের দীপ থেকে তো আত্মপরিচয় এবং বংশপরিচয়ের দীপ জ্বেলে নেবে। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের দীপ জ্বেলে নেয়ার নাম তো বংশগতি। তোমার মধ্যে দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। একি কম আনন্দ!

আমার সামনে দাউ দাউ অরণ্য জ্বলছে। মৃত্যু পরোয়ানা হাতে করে অন্তিম সময় গুণছে। যে কোন মুহূর্তে প্রলয় অগ্নি নদী টপকে আমার দিকে ধেয়ে আসতে পারে। অথচ, আমি একটুও বিচলিত নই। সত্যকে অকপটে স্বীকার করার জন্যে আমার সমস্ত মন প্রাণ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অতীতকে। অনেককাল আগের ঘটনা। তবু অতীতের সব কিছু খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল।

সে এক আশ্চর্য রাত। হয়তো মাঝরাত হবে। মাঝরাতের বোধ হয় একটা আশ্চর্য যাদু আছে। বিশেষ করে বসন্তকালের মাঝরাতে। আকাশে তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। অন্ধকারে গাছগুলো চুমকীর মতো অন্ধকারে জ্বলছিল নিভছিল।

স্বপ্নে দেখলাম গান্ধারী দমকা বাতাসের মতো এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘুমের মধ্যে আমি চমকে তার দিকে তাকালাম। দুচোখে তার আগুন। মুখখানা রাগে গনগন করেছিল। কথা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে গেল। বলল ঃ অন্যদের চোখ ফাঁকি দিলেও আমার চোখ ফাঁকি

দিতে পারবে না। তোমার পেটে কার সন্তান? তোমার একটু লজ্জা করল না।

স্বপ্নে গান্ধারীর উত্তেজনা দেখে আমি খুব হাসছি। কৌতুক করে বললাম ঃ তোমায় ঈর্ষা হচ্ছে? কী করব বল, এসব তো আর জানিয়ে আসে না, হঠাৎ হয়ে যায়।

গান্ধারী আমার কথা শুনে রাগে ঘেন্নায় জ্বলে উঠল। ধিক্কার দিয়ে বলল ঃ ছিঃ! বলতে তোমার লজ্জা করল না?

নির্বিকারভাবে তার প্রশ্নের জবাবে সকৌতুকে বললাম ঃ লজ্জা করবে কেন? লজ্জা করলে তো আর মা হওয়া যায় না। বংশরক্ষাও হয় না।

গান্ধারী তার ঘেন্না উজার করে বলল ঃ লজ্জা! কী লজ্জা!

থমথমে গম্ভীর গলায় উত্তর দিলাম-- তোমরা কি আমার লজ্জার মুখ রেখেছ যে লজ্জা পাব? আমি যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি। বাঁচবার জন্যে করেছি। সবাই একটা অবলম্বন চায়। সারাজীবন কী নিয়ে কাটাব?

আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেহায়ার মতো এমন করে কবুল করতে একটু সরম হল না।

কেন?

লোকে বলবে কি? রাজপরিবারের একটা মর্যাদা তো আছে।

আছে বুঝি?

কেন, সন্দেহ হচ্ছে?

অবাক হচ্ছি। সত্যি কথা বললে বাইরের লোকে কী বলবে বল তো। বাড়ীর বউ হয়ে সে সব কথা সকলের কাছে কি বলা যায়? কারণ, এতো আমার শ্বশুর কুলের ব্যাপার। তাঁদের কুলের পুত্রবধূ হয়ে কি তাঁদের নামে নিন্দে করতে পারি? তাঁদের নামে যেমন নিন্দে করতে নেই, শুনতেও নেই।

গান্ধারী রাগে গজর গজর করতে করতে চলে যাওয়ার সময় বলল ঃ আমার শত্রু। পথের কাঁটা। আমার ছেলেকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার দুষ্টু বুদ্ধি। কিন্তু আমি বলে রাখছি সব ভেস্তে যাবে।

গান্ধারীকে তাতানোর জন্য এবং হতাশ করার জন্য চেঁচিয়ে বললাম ঃ তুমি ভেস্তে দেবার কে? স্বামীর ইচ্ছে মেটাতে তার বংশ রক্ষা করতে আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি শুধু তাই করেছি। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? অন্যায় যদি কেউ করে থাকে, সে তো তোমরাই করছ।

গান্ধারী থমকে দাঁড়াল কিছু বলবে বলে। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রমত্ত ঝড়ের মতো বলতে লাগলাম ঃ আমার শান্তি, সৌভাগ্য কেড়ে নিয়ে ভেবেছ তোমরা সব একা ভোগ করবে। মেয়ে বলে আমাকে তুচ্ছ করারও কিছু নেই। প্রয়োজনে আমি বিদ্রোহ করতে পারি, আঘাত হানতে পারি। স্বপ্ন ভেঙে খান খান করতে পারি। সহসা গলার স্বরটা বদলে গেল বিতৃষ্ণায়। বললাম--অমন প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকার তো কিছু নেই। আমি কেমন করে ভুলব তোমরা আমাকে গৃহছাড়া করলে, রুগ্ন স্বামীর সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে সিংহাসনচ্যুত করলে। রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে নিষ্কণ্টক হতে চাইলে। তোমরা কী ভেবেছ মুখ বুজে আমি সহ্য করব? কক্ষনো না। না-আ-আ।

ঘুমের ভেতর বিকট গলায় চিৎকার করে জেগে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসি। ঘরটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। গান্ধারী কোথাও নেই। খোলা জানালা দিয়ে ফাল্গুনের হিমশীতল ফুরফুরে হাওয়া বনফুলের গন্ধ নিয়ে ঘরে ঢুকছে। থমধরা বিষন্নতা, অবসাদ, ক্লান্তিতেও চোখের পাতা দুটো অতিকষ্টে খুলে রেখেছি। আর ঘুম আসছে না। কিন্তু অদ্ভুত স্বপ্নটা বুকে গেঁথে থাকল।

কিন্তু এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম কেন? বার বার মনে হতে লাগল এটা শুধু স্বপ্ন নয়। আরো কিছু আমার মনের গভীর অভ্যন্তরে সন্তান সম্পর্কে যে ভয় ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা লুকোনো ছিল স্বপ্নে তা একটা রূপ পেল যেন। এ হয়তো আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কথা। সে রাতে আর ঘুম হলো না। সারা রাত নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

ঘর সংসার সাজিয়ে পুতুল খেলা করতে আমি জন্মায়নি। সমস্যার সমুদ্র পেরিয়ে, পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়ে জঙ্গল সাফ করে চলেছি যেন। সে নির্ভয় যাত্রা পথের একমাত্র সঙ্গী বিদুর। সে আমার স্বপ্নের পুরুষ। সে সাধারণ নয়। অপাপবিদ্ধ দুর্মর সাহসী বিশ্বজয়ী বিদুরেরঁ মধ্যে আমার আকাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটিকে আচমকা পেলাম। তাকে না পেলে আমার স্বপ্ন দেখা হতো না। আমি হারিয়ে যেতাম।

বিদুরের স্বপ্নালু দু'চোখের উপর মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে ধরে আমি টের পাই ওর বুকের ভেতরেও লুকোনো আগুন আছে। বিদ্বেষ বহ্নিতে ওর ভেতরটা তুঁষের আগুনের মতো পুড়ছে। কিন্তু ও কিসের বিদ্বেষ? ওর উৎসই বা কোথায়? কতবার মনে হয়েছে ওকে জিজ্ঞেস করে জানব। কিন্তু নারীসুলভ লজ্জা, সংকোচে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি সমস্ত মন দিয়ে তার উত্তাপ অনুভব করলাম।

বিদুর বড় চাপা স্বভাবের। মুখ খুলতে চায় না। সে তার কর্মপথের এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ইতিহাসের কোন্ প্রয়োজন মেটাতে সে এত নীরব? কুরু বংশের সঙ্গে তার অদৃষ্ট কোন রহস্যসূত্রে বাঁধা? উত্তর মেলে না।

একদিন আচমকা তারা জবাব পেয়ে গেলাম। বিদুরের সেদিন মনই ভালো ছিল না। আমারও ঘরে থাকতে ভালো লাগল না। কী ভেবে বিদুরের কাছে গেলাম। একমাত্র ওর কাছে গিয়ে বসলেই একটু শান্তি পাই, নতুন করে প্রাণ পাই, ফুরিয়ে যাওয়া জীবন যেন নবীকৃত হয়ে উঠে। আমায় দেখে বিদুর উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ তোমার কথাই ভাবছিলাম ক'দিন ধরে। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। কী ভালো যে লাগছে! এক গাল হেসে বলল ঃ 'আপনি কেন এলে বধূ আমার বোঝা বইতে'?

তার আকুল করা মনের ভাষার, বুকের সৌন্দর্যের রহস্যময় আকর্ষণে আমি বোবা হয়ে গেলাম। মুগ্ধ দুটি চোখ তার চোখের উপর এমন করে মেলে ধরলাম যেন একটুও উপছে, পড়ে বাইরে নষ্ট না হয়ে যায়।

বিদুরের শান্ত ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল। আমার নীরবতায় বিদুর একটু অস্বস্তিবোধ করল। তাই বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্যেই বলল ঃ কথাগুলো বানিয়ে বললাম ভাবছ, তাই না? মাঝে মাঝে মনের মধ্যে যখন ঝড় উঠে, পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধেই যখন বড়ই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি, তখন তোমার কথা ভীষণ ভাবে মনে পড়ে। মানুষ হলেই তার মন বলে একটা ব্যাপার থাকে। মন থাকলেই সে ভাবে। ভাবলেই মনের মধ্যে ঝড় উঠে। ঝড় উঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে নোঙরহীন নৌকোর মতো বড় অসহায় লাগে।

বিদুরের কথা শুনে মন ভরে যায়। কে জানে? কী ছিল তার ঐ কথার ভেতর। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার বিস্ময় ভরা উজ্জ্বল দুই চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বিদুর বলল ঃ হাঁ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে তুমি কী দ্যাখ বল তো।

স্নিগ্ধ হাসির মাধুর্যে লাবণ্যময় হলো আমার অধর। বললাম ঃ তোমার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের শীতলতার ভেতব, বরফ কঠিন স্বচ্ছ স্ফটিকের ভেতর চাপা পড়া তোমার আত্মাকে দেখি। তোমার ভেতর আমি নিজেকে খুঁজে পাই। বড় আপন মনে হয় তোমাকে। আমার মতোই তুমিও চির অনাদৃত, বঞ্চিত, ভাগ্যহত। আমরা দুজনে এ বংশের কেউ নই, তবু বিনিসূতোর মালার মতো গাঁথা হয়ে আছি হস্তিনাপুরের সঙ্গে। এ বড় আশ্চর্য বন্ধন। আমার মতো তোমার বুকে বিদ্বেষের আগুন তুঁষের মতো জ্বলছে। তোমার ও আমার জীবনের অনেক অপমান, অবহেলা, রাগ–বিদ্বেষের তারগুলো এক সুরে বাঁধা যেন। তোমার চোখের ভেতর দিয়ে আমার হৃদয়খানি দেখি তখন বড় আপন করে মানি।

বিদুর কৌতুকে হাসল। কী অদ্ভুত মাদক হাসি। মনে হলো ভূমিকম্প হলো। আমার পায়ের তলায় মাটি কেঁপে গেল। কোথাও প্রলয় ঘটল। বুক উথাল পাথাল করল।

বিদুর সহসা আমার হাত দু'খানা তার হাতের ভেতর ধরে আবেগ গাঢ় স্বরে বলল ঃ কুন্তী

চলো আমরা পালাই। এই পরিবারের বাঁধন ছিঁড়ে অন্য কোথাও। পারবে? সাহস হবে পালানোর? চলো দু'হাতে তালি দিয়ে, হস্তিনাপুরের মানুষদের চমকে দিয়ে বন পরীদের ঘুম কেড়ে নিয়ে, গেরস্থদের খোকা হোক বুলি আওড়ে, নীল পাখির মতো রৌদ্র ঝলমলে আকাশের দিকে উড়ে যাই। চল যাই এই মিথ্যে জীবনের বুকের শূন্য অন্ধকার গুহা থেকে অন্য এক মুক্ত দৃপ্ত জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে।

দিশাহারার মতো বিদুরের দিকে চেয়ে থাকি। বুকের উপর মাথা রেখে বলি ঃ বিদুর তোমার কী হয়েছে বল তো? আজ তোমার মন ভালো নেই। তুমি ভীষণ অশান্ত, অস্থির। তুমি যা বলতে চাইছ কথার ফুলঝুরি হয়ে যাচ্ছে। ও সব রঙ বাহারে কথা দিয়ে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার মনের কথাটাই শুনব। আমার মতো করে গুছিয়ে বল। ওগো প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু দুখের বন্ধু তোমাকে চেনা আমার শেষ হবে না কোনদিন।

শান্ত ভাবলেশহীন কণ্ঠে বিদুর বলল ঃ জান কুন্তী, রাজপদের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও শূদ্রানী মায়ের সন্তান বলেই আমার ভাগ্যে রাজা হওয়া হলো না। রাজাকে রাজবংশের ব্যক্তি হতে হবে। কিন্তু আমার তো তা ছিল না। পিতা বনবাসী ঋষি, মাতা শূদ্রানী দাসী। রাজবংশের সঙ্গেও কোন যোগ নেই। এমনকি বংশপরিচয়ে কৌরব নামের লেজুরটুকুও নেই। তাই রাজন্যস্বীকৃতি আমার ভাগ্যে জুটল না। কিন্তু ক্ষাত্রস্বীকৃতি দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করা হলো। একটি জন্মসূত্রে অর্জন করা সম্ভব হয়, অপরটি শুধু জন্ম নয়, জাতিগত কৌলীন্য ও বৃত্তিগত শ্রেষ্ঠত্বে অধিকৃত হয়। অথচ, জন্মসূত্রে আমাদের পিতা একই ব্যক্তি। আমাদের তিনজনের শরীরে একই রক্তধারা বইছে। জননী শূদানী বলে আমাকে হেয় করে দেখা হলো। আর্যত্বের অহঙ্কারে শূদ্র বলেই অবজ্ঞা করা হলো। কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, দক্ষতার, কোন মূল্য নেই? এই অসম্মান আমি ভুলতে পারছি না। শূদ্র কী মানুষ নয়! তার কী কূল-গৌবব থাকতে নেই! আর্য বলে কি সভ্যতার গর্বে অনার্যদের অপমান করবে? ঘেন্না করবে? তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আর্যদের অহং এ শিবও নেই, সুন্দরও নেই, সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ ভয়ংকর। তেমনি একটা ভয়ংকর রাগ বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর। তাকে আর থামানো যাবে না। কুন্তী তোমার বুকেও ঝড়ের কলধ্বনি। এসে আমরা হাত ধরাধরি করে চলি। আমি নেব ধবজা, তুমি পরিয়ে দেবে তাতে বিজয় কেতন। বল, কুন্তী পারবে।

আস্তে আস্তে উচ্চারণ কবি—পারব। খুব পারব। বিধাতার হাতে দুটি ঘুঁটি আমরা। ছকে বন্দী দুটি মানুষ। আমরা তো নিমিত্ত। ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে আমরা দু'জনে একজায়গায় জমায়েত হয়েছি।

বিদুর দার্শনিকেব মতো গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল ঃ কুন্তী, এ কার বিধিলিপি? তোমার, না আমার? পাণ্ডুর, না ধৃতরাষ্ট্রের? ভীষ্মের, না মহর্ষি দ্বৈপায়নের? না সকলের?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎই মনে হলো আড়াল থেকে সত্যবতীই সব কলকাঠি নড়ছেন। সেটা মনে করা কিছু অসংগত নয়। কারণ, আর্যঋষির লালসা-বহ্নিতে আহুতি দেয়ার অমর্যাদাকে সত্যবতী ভোলেননি, প্রৌঢ় রাজা শান্তনুর অভিলাষ পূরণে বাধ্য হওয়ার ভেতর যে নিরুপায় আত্মসমর্পণতা ছিল তাকেও ভুলে যাননি তিনি। তাই আর্যজাতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ঘৃণার প্রতিশোধ নেয়ার সঙ্কল্পে শান্তনুর কণ্ঠে বরমাল্য দেয়ার আগে ভীষ্মকে দিয়ে আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকা এবং শান্তনুর সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকার দাবি না করার এক কঠিন শপথ করে নিয়েছেন।

তারপর যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল তাতে সত্যবতীর কোন হাত ছিল না। সত্যবতী না চাইলেও তাঁর অনুকূলে ঘটনাগুলো ঘটছিল। আর তিনি ঘটনাপ্রবাহের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। তাই তাঁর ধাক্কাটা তাঁর সমস্ত কর্মের গায়ে লাগল। সত্যবতীর স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রীতি গোষ্ঠী ও বর্ণের প্রতি গভীর প্রেম খুব গোপনে সুচতুরভাবে সকল সন্দেহের ঊর্দ্ধে রেখে রাজনীতির পুরোভাগে একটু একটু করে টেনে এনেছেন। কৌরববংশকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে দ্বৈপায়নকে দিয়ে কৌরববধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করার পরিকল্পনা কৌশলটি তাঁর উজ্জ্বল স্বজাতি প্রীতির

নিদর্শন। কৌরববংশের মধ্যে শূদ্রদের একটা চিরস্থায়ী জায়গা করে দেয়ার সঙ্কল্পে শূদ্রানীর গর্ভজাত দ্বৈপায়নকে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করা আর এক কৌশল তাঁর। নিঃশব্দে আর্যদের হাত থেকে শূদ্রদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং পালাবদলের এক নাটক করলেন। একটি সুপ্রাচীন রাজবংশের বংশকৌলীন্য মুছে ফেলে তার স্থলে আর এক গোষ্ঠীকে নিঃশব্দে স্থানান্তরিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত বদলের এক আশ্চর্য ফন্দী। এই অপূর্ব কৌশলটি সম্পূর্ণ করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যার মধ্যস্থতা করতে দ্বৈপায়নের উপর ভার দেয়া হলো। কায়েমী স্বার্থের প্রভাব থেকে শাসন ক্ষমতা মুক্ত করার উদ্দেশ্যই দ্বৈপায়ন পান্ডুকে রাজা করলেন। আর শাসনদন্ডটি পুত্র বিদুরের হাতে তুলে দিয়ে ভেদনীতি প্রয়োগ করে কৌরব বংশের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। পান্ডুর গুরুত্ব যাতে না কমে এবং তাকে সববিষয়ে সুপরামর্শ দেয়ার জন্যই গোপনে আমার সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে একটা হৈ-চৈ ফেলে দিলেন। এভাবে রাজনীতির পুরোভাগে আমার আসা অনেকের মনঃপুত হলো না। আমার গুরুত্ব খর্ব করার কোপ পড়ল পান্ডুর উপর। কিন্তু ইতিহাস নিজের নিয়মে রাজবংশকে মুছে ফেলার এক নিঃশব্দ ভূমিকা নিল।

খুব আশ্চর্য লাগল ভাবতে। জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যার কোন প্রস্তুতি থাকে না। বোধ হয় এরকম ঘটনা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন দুর্ঘটনা বহুল হতো না। দুর্ঘটনাই আর এক ইতিহাসের জায়গা করে দেয়। এভাবেই ইতিহাস বদলায় অনেকদিন ধরে, একটু একটু করে নিজের পথে, নিঃশব্দে। ইতিহাসের স্রষ্টা কেউ তৈরী করে না। মহাকাল নিজের মতো করে গড়ে পিটে নেয়। বিবিধ ঘটনা-দুর্ঘটনা টানাপোড়নের ভেতর দিয়ে, বহু বাধা বিপত্তির পথ পেরিয়ে বহু সুখ দুঃখ, আঘাত-যন্ত্রণা, ব্যর্থতা-হতাশার পাহাড় ঘেঁষে তবেই ইতিহাসের আবর্তে গিয়ে পড়ে। অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তবেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া যায়। এ ভাবেই মানুষের ইতিহাস এক ধারা থেকে আর এক ধারায় গিয়ে মেশে।

দূরে কোথাও উচ্চৈঃস্বরে বন মোরগ ডেকে উঠল। ভোর হচ্ছে। দিনের আলো ফুটবার আগেই রাতের সব তারা মুখ লুকিয়েছে। কেবল ধ্রুবতারা নির্ভয়ে জ্বলজ্বল করছে। কৃষ্ণ পক্ষের মরা চাঁদ আকাশের বুকে ঝুলে আছে। রাত্রির ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি তার নেই, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবতারা এবং মরা চাঁদও বিদায় নেবে। সূর্য একা আধিপত্য করবে। রাতের গ্রহ তারার সঙ্গে দিনের সূর্যের ঝগড়া। এ ঝগড়া চিরদিনের! আস্তে আস্তে পৃথিবীতে দিন হলো। দিগন্তে সূর্য উঠল। নিবিড় ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা রাতটা সূর্যের আলো পড়ে জেগে উঠল। লোকালয় জুড়ে কোলাহল পড়ে গেল। কে যেন আমার বুকের মধ্যে ফিস ফিস করে বলল, কুন্তী এখানে তোমার সুখ নেই। গৃহবন্দী হয়ে থাকাকে কেউ বাঁচা বলে? তুমি মুক্তি চাওনা? প্রতিশোধ নেবে না? বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবে না? তা হলে পালাও। এখানে বসে মুক্তির জন্য কিছুই করতে পারবে না। বেরিয়ে পড় মহাপৃথিবীর দিকে। পৃথিবীতে যারা একটা বাঁধা ধরা পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে বিদ্রোহ করে। আরামের সংসার ছেড়ে এক অনিশ্চয়তার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখার সাহস পায় তারাই আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। শুধু আলাদাই নয়, বিশেষ একজনও বটে।

সকাল হয়ে গেছে। রোদ ঝলঝল করছে চারদিক। তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভালো লাগছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন প্রচন্ড বেগে দৌড়ে গেল। গাছগুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ছায়ার আলপনা মাড়িয়ে মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ সেই দিকেই যেন দৌড়ে গেল। অশ্বখুরধ্বনি একটি বিপদ সংকেতের মতো বাজতে লাগল বুকে। আত্মসুখের প্রসন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল।

ঘরের দরজার বন্ধ কপাটের উপর মৃদু হাতের টোকা পড়তে চমকে উঠি। ও শব্দ আমার চেনা। দ্বার খুলে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। মুগ্ধ গলায় বললাম ঃ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

ঘরে ঢুকে বিদুর আমার চোখের উপর চোখ রেখে বলল ঃ তোমার ভাবা মাত্র এসেছি। কী ভালো বল আমি।

বলার তো অপেক্ষা নেই। সত্যি, তুমি ভীষণ ভাল।

সে তো আমি জানি। তাই তো নিজের তদারকিতে শতশৃঙ্গ পর্বতে তোমাদের জন্যে সুন্দর বাসস্থান তৈরি করেছি। আর তোমার ঘরটা তোমার মতই অনন্য।

কপট রাগ দেখিয়ে বলি ঃ নিষ্ঠুরের মতো সাত সকালে এই কথাটা শোনাতে এলে? হস্তিনাপুর থেকে আমাকে তাড়াতে পারলে যেন বাঁচ তুমি। পরাশরী তোমার কানে কী মন্ত্র দিয়েছে? বশীকরণের কোন ওষুধ করেছে।

বিদুর লাজুক অপ্রতিভতায় মৃদু ধমক দিয়ে বলল ঃ ছি, অভিমানের বশে মিছেমিছি একজনকে দুষছ কেন? ও আমাদের সাথে পাঁচে নেই। ভীষণ ভালো মেয়ে।

অভিমানের সমুদ্র দুলে উঠল বুকে। মেয়েলী অভিমান করে বললাম, তা-হলে তোমার কাছে আমি খারাপ একটা বাজে মেয়ে এই তো। সে জন্যেই আমাকে তাড়াতে চাইছে। আমার জন্যে বুকে যদি একটু দরদ থাকত তা-হলে এভাবে নিজের তদারকিতে নির্বাসনে পাঠানোর ঘর করতে না। তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। আগে তো এত নিষ্ঠুর ছিলে না। তবে কি আমায় তুমি ভালোবাস না। আমি হয়তো তোমার কাছে ফুরিয়ে গেছি, তাই এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ।

বিদুর বেশ একটু অপ্রস্তুত হলো। বিব্রত গলায় বলল ঃ তুমি মিছিমিছি রাগ করছ। অবুঝের মতো তোমাকে কথা বলতে আগে কখনো শুনেনি ! তুমি তো সাধারণ রমণী নও। কেন বুঝছ না, আমি একজন আজ্ঞাবাহী কর্মচারী। আমার দোষ কী বল? রাজাদেশ তো অমান্য করতে পারি না।

দপ করে দুচোখ ক্রেধে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম ঃ কে রাজা? অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে তোমরা মানছ বলেই রাজা, নইলে সে রাজা কিসে? এরাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান পাণ্ডু।

সত্য। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দখলে সিংহাসন। আমার মানা না মানায় কিছু যায় আসে না। অকারণে রাজার বিরাগভাজন হওয়ার চেয়ে বিশ্বাসভাজন হওয়ার মূল্য অনেক বেশি। বিশ্বস্ততার অগ্নিপরীক্ষায় আমি সফল হয়েছি। এটা আমার মূলধন হয়ে থাকবে। পরে টের পাবে, বিদুর যা করছে তোমার ভালোর জন্য করছে। তার নিজের জন্য করছে। এ করাটা কোনদিন ফুরোবে না। শতশৃঙ্গ পর্বতে গেলে পুত্রদের জন্যে যেভাবে করতে পারি, এখানে বসে কিছুই করতে পারব না। শতশৃঙ্গ পর্বতে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি অবুঝ হয়ো না। আমাকে বিশ্বাস কর—এই নির্বাসিন তোমার পুরস্কার।

হঠাৎ বিদুর আমার হাতখানা তার হাতের উপর রাখল। আস্তে আস্তে ওর মুখটা নেমে এল আমার হাতের উপর। ওর অধরের উষ্ণ স্পর্শ পেলাম হাতে। লালা নিঃসৃত ভিজে ঠোঁট দিয়ে আমার ভেতরের সব উত্তাপ শুষে নিতে লাগল। মনে হলো দীর্ঘ উত্তপ্ত নিদাঘের পর প্রথম বৃষ্টি নামল। এক সুখকর অনুভূতির আবেশ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। অভিভূত গলায় বললাম ঃ আমার পেটে তোমার ছেলে এসেছে; কেমন করে জানলে?

আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। ফুলে আলো পড়লে যেমন পাঁপড়িগুলি মেলে ধরে তেমনি মাতৃত্বের শ্রী তোমার পয়োধরে, উদরে, নিতম্বে, অঙ্গে অঙ্গে এক অন্য নারী করে তুলেছে তোমাকে। কাউকে বলে দিতে হয় না সে কথা। তাই তো শতশৃঙ্গ পর্বতে তোমার যাওয়ার প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। সেখানে কোন বাধা নিষেধ নেই। নিজের মতো করে বাঁচতে পারার সুখ কী কম! এখন তো আমাদের আর নিজের জন্যে বাঁচা নয়, তোমার পেটে যে এসেছে তার জন্যে বাঁচা। সে আমাদের স্বপ্ন, সাধনা, প্রত্যাশা। হস্তিনাপুরে তাকে লুকোনোর জায়গা নেই। তুমি একটুও মন খারাপ কর না। ভুলে যেও না রাজনীতি ও জীবন নীতির মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। এই তফাৎটুকু যে বোঝে না, কিংবা মেনে নিতে পারে না সে বাঁচতে শেখেনি। একজন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে অনেক কলা কৌশল অবলম্বল করতে হয়।

কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! আমি আশি বছর আগের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি এবং কানেও শুনছি। বিদুরের কথাগুলো শুনে যদিও আমার শরীর মন চমকে উঠল, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তে ওর দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো—ও চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে? আমার কান্না পাচ্ছে।

বিদুরের কাঁধের উপর মাথা রেখে আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় আমি কাঁদছি—আর মনে মনে বলছি 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! এর ঘোর কাটতে চায় না। কারণ এতক্ষণ বা একটি ক্ষণে- কিংবা একটি মুহূর্তে কিংবা সময়ের অতীত কিছুতে যা কিছু ঘটল তা স্মৃতি নয়, মনে পড়াও নয়, বাস্তব অনুভূতি, এককালের ঘটনা। যা সমস্ত চিত্ত জুড়ে অতীত ও বর্তমানের এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব চলেছে। আজ আমার কোন অভাব নেই, দৈন্য নেই।

চোখেতে শতশৃঙ্গ পর্বতের ছবি ভাসছে। পর্বতের পর পর্বত, আবার পর্বত। বিশাল বিশাল সমুদ্রের ঢেউ যেন অচল পাষাণে পরিণত হয়েছে। দিগন্তরেখা পর্যন্ত শত শত শৃঙ্গ যেন ঢেউ এর মতো জেগে আছে। পাহাড় খুব খাড়াই নয়। গাছপালা জঙ্গল খুব গভীর নয় এখানে। বিশাল বিশাল দেবদারু আর শমীবৃক্ষের বন যেন পাহাড়কে পাহারা দিচ্ছে। বহু নিচে রূপোর পাতের মতো চকচক করছে পাহাড়ী নদীর জল।

এখানে আসার অল্পকাল পরে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হলো। তারপর আরো দুটি পুত্র জন্মাল। এরা সকলেই বিদুরের ছেলে। পাছে সে কথাটা জানাজানি হয়ে যায়, তাই বিদুরকে আড়াল করতে এক অলৌকিক গল্পের অবতারণা করতে হলো। ক্ষ্যাপা দুর্বাসার মন্ত্রদানের সেই পুরনো গল্পটাই কাজে লাগাতে হলো। এক অলীক অলৌকিক দেব মাহাত্ম্যের মোড়কে পুত্রদের জন্মরহস্য ঢেকে রাখা হলো। লোকে জানল তারা ধর্মের পুত্র পবনের পুত্র, ইন্দ্রের পুত্র। কিন্তু হস্তিনাপুর শুধু যুধিষ্ঠিরের জন্মের সংবাদ জানল। বিদুর যথা সময়ে তার জন্মের বার্তা হস্তিনাপুরের রাজ অন্তঃপুর পৌঁছে দিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বপ্নের মায়া আয়না ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এক কুৎসিৎ আত্মসংগ্রামে তাকে লিপ্ত করা ছিল বিদুরের কৌশল। ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী চিন্তায় কাতর করা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারানের শঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় তিলে তিলে তাকে ক্ষয় ও নিঃসহায় করে তোলাই ছিল বিদুরের চক্রান্ত। ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশ সাধনের সংঘাতকে মনের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যুধিষ্ঠিরের জন্মের ঘটনাকে অলৌকিক এবং একটা দৈব ব্যাপার করে তুলল বিদুর।

আমার পুত্র হওয়ার সংবাদে গান্ধারীই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হল। তার বিস্ময়ের অন্ত নেই। বলল ঃ কুন্তীর পুত্র! বলছ কী দেবর? পাণ্ডু তো—

বিদুর তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল ঃ এতো বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্ষেত্রজ পুত্র হতে তো বাধা নেই।

তারও তো একটা নিয়ম আছে।

পাণ্ডুই কুন্তীকে অনুমতি দিয়েছে।

গান্ধারী বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল ঃ দেবর এভাবে ক্ষেত্রজ পুত্র হয় না। পরিবারের লোকদের মেনে নেয়ার ব্যাপার তো আছে। কুন্তীর বিদ্রোহ কার উপর? সে কি চায়?

ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন গলায় বলল ঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে আবার বোধ হয় একটা জট পাকাল।

গান্ধারী হতাশ গলায় বলল ঃ স্বামী আমার পেটে যে এসেছে তাব জন্মানোর সার্থকতা কি? তার তো কোন ভবিষ্যৎ নেই। পৃথিবীতে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে অবাঞ্ছিত।

ধৃতরাষ্ট্র তার মনের ভয়টাকে চাপা দেয়ার জন্যে জোর গলায় বলল ঃ কী সব আবোল তাবোল ভাবছ বল তো। এই সিংহাসন ন্যায়ত ধর্মত আমার। এর ভেতর পাণ্ডু পুত্রের কোন স্থান নেই। তার ছায়ার সঙ্গে আমাদের লড়াই করা বৃথা।

স্বামী, কুন্তী সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। সে বসে নেই। গোপনে কিছু একটা করার মতলব করেছে। বাইরের তৃতীয় শক্তি হিসেবে দেবতাদের এর ভেতর ডেকে আনাটা আমার ভালো লাগছে না। আমার একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

বিদুর গান্ধারীকে শান্ত করার জন্যে বলল : বৌঠান সামান্য ঘটনায় এত উতলা হলে চলে? একটা কাল্পনিক আতঙ্কে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করার সুখ কি? এ সব তোমার চেয়ে বেশি কে জানে? তুমি তো অবুঝ নও।

পাছে গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়, ধৃতরাষ্ট্রের কুনজরে পড়ে কুন্তী, তাই ধৃতরাষ্ট্রকে কপট প্রবোধ দিয়ে বিভ্রান্ত করল বিদুর। বলল : অগ্রজ তোমরা মিথ্যে দুর্ভাবনার কষ্ট ভোগ করছ। একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী থাকতে পারে? সহায়হীন, বান্ধবহীন, পাণ্ডুপুত্রের জন্যে কুন্তী কিছুই করতে পারে না। ধর্মরাজ তো ভোগ-বিলাসের পদ। তাঁর কার্যত কোন ক্ষমতাই নেই। ধর্মের দোহাই দিয়ে দেবতারা তাঁকে দিয়ে অপ্রিয় কাজ করান। তাঁকে তৃতীয় শক্তি ভাবাটা কল্পনা বিলাসিতা মাত্র। তা-ছাড়া কুন্তীর কাছে কারো পাওয়ার কিছু নেই। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে হস্তিনাপুরের বিরাগভাজন হওয়াব মতো মূর্খতা কোন নৃপতি করবে না। কুন্তীকে তারা সাহায্য করবে কেন? তার কোন ভবিষ্যতই নেই।

ধৃতরাষ্ট্র লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তুমি যথার্থই বলেছ। মিথ্যে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি। শিশু পুত্রকে নিয়ে এত মাথা না ঘামালে চলবে।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া টের পাওয়ার পরে বিদুর আর দুই পুত্র সম্পর্কে নীরব থাকল। তাদের জন্মের কোন খবরই হস্তিনাপুরে পৌঁছল না। সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হলো। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রের মনের অবস্থাও ভালো ছিল না। আমার সম্পর্কে তার কোনরকম কৌতূহল যাতে উদ্রেক না হয় সেজন্যে এক দুঃসহ মানসিক সংকট সৃষ্টি করে বিদুর তার সমস্ত নজর এবং ভাবনাকে হস্তিনাপুরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখল। বিদুরের অনুগত ব্রাহ্মণ, পুরোহিতরা ধৃতরাষ্ট্রের সদ্যোজাত পুত্র দুর্যোধনকে নিয়ে এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হলো। বিধাতাই সুযোগটা করে দিল। দুর্যোধনের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রকৃতির অভ্যন্তরে এক ভয়ঙ্কর গোলমাল সুরু হয়েছিল। চৈত্রের নীল আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সারি সারি গাছপালা ম্লান মুখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাখিরা হঠাৎ ভয় পেয়ে দিগন্ত কাঁপিয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ছিল। পশুরা অসহায়ের মতো ডুকরে কেঁদেছিল। আকাশ ক্রোধে ক্ষোভে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বজ্রের ভীম প্রহরণে ধরিত্রীর নাভিশ্বাস উঠল। দুর্যোধন পাপাত্মা বলেই তার জন্মের নিমিত্ত এই সব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল। লোকে তাই নিয়ে বলাবলি সুরু করল, দুর্যোধন দুরাত্মা, পাপী ঘোর কলি। এ হেন শিশু রাজ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। তাই ধরণী তার আবির্ভাবে এত অধীরা। চরাচর ক্ষুব্ধ। বিশ্বপৃথিবী ভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার। রাজ-অন্তঃপুর পর্যন্ত এই অপব্যাখ্যার ঢেউ পৌঁছল। প্রতিশোধ নেয়ার সেই সুরু। সূচনাটা ভালোই হলো। এই ষড়যন্ত্র ধৃতরাষ্ট্রের মনের বেশীভাগ শক্তি ক্ষয় করে ফেলল এবং ক্ষমতা লড়াইর বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ত করার এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

ছেলেরা বড় হচ্ছে। বিদুরের আসা-যাওয়া ভীষণভাবে কমে গেছে। কালে ভদ্রে কদাচিৎ আসে। আত্মীয়-স্বজন-বান্ধবহীন দেশে বিদুরকে পেলে তারা আর ছাড়তে চায় না। ছায়ার মতো লেপ্টে থাকে। আমাদেরও যে কিছু গোপন কথা থাকতে পারে ছেলেদের জ্বালায় তা হওয়ার উপায় থাকে না। ভেতরটা তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে। সামনা সামনি থেকেও বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করি। মনটা বিস্বাদে ভরে যায়। ছেলেদের উপর রাগ হয়। ঈর্ষা হয়। ছেলেরা বড় হলে এই হয় মুস্কিল।

দুজনের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে হাসি দু'জনে। চোখে চোখে নীরব খুশি ও অনুরাগ বিনিময় করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু তাতে কি মন ভরে? মনের তো একটা ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আরো কত কি লুকনো থাকে—মনও তো ভালো করে জানে না। একটা অতৃপ্তিতে ভেতরটা টাটায়। বিদুর বোকার মতো হাসে। আমার গা জ্বলে যায়। রাগ হয় খুব। এভাবে জব্দ করে ওর মজা দেখাটায় আমি খুব বিরক্ত হতাম। ইচ্ছে করত, সকলের সামনেই দুম দুম করে পিঠে বেশ কিছু কিল চড় বসিয়ে দিই।

একদিন হঠাৎ কী হলো কে জানে? শরীরের ভেতর একটা অদ্ভুত রাগ ঢেউ দিয়ে গেল। প্রেমের অমৃত ছাপিয়ে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধের হলাহল ছড়িয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গে। বিষের জ্বালায় সেদিন বিদুরের সঙ্গে ঝগড়া করতেই রাত দুপুরে ওর ঘরে কড়া নাড়লাম।

দ্বার খুলে আমায় দেখে বিদুর একটু অবাক হয়েছিল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ তুমি! এত রাতে!

এত রাতে তোমার ঘরে তো কতবার এসেছি। কৈ সেদিন তো অবাক হওনি। বরং খুশি হতে ভীষণ। এখন তুমি অনেক বদলে গেছ। যাওয়ারই কথা। কারণ পরাশরীর গর্ভে তোমার ছেলে হয়েছে অনেকগুলি। তারাও বড় হচ্ছে। সুতরাং ভুলে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। পরাশরীর ছেলেরাই পারবে তোমার মনস্কামনা পূরণ করতে। তোমার কাছে আমরা ফালতু হয়ে গেছি।

বিদুর অবাক চোখে আমাকে বুঝবার চেষ্টা করল। তার চোখের চাহনিতে তখনও ঘুমের একটা ঘোলাটে ভাবছিল। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে বেশ একটু সময় নিল। আস্তে আস্তে বলল ঃ এত বাতে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছ?

একে কি ঝগড়া বলে? তোমার ছেলেরা যদি প্রত্যাশা পূরণে যোগ্য হয় তা হলে আমার ছেলেদের প্রয়োজন কি? তুমি এক নতুন প্রজন্মের স্রষ্টা। যাদের দেহে শূদ্রের রক্তধারা বইছে তাদের হাতেই তুমি শাসনভার দিতে চাও। তোমার নিজের পুত্রদের ফেলে অন্যের কথা ভাববে কেন? কোন পিতাই ভাবে না। আমার কণ্ঠস্বরে ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্রূপের এক ঐকতান সৃষ্টি হলো মুহূর্তে।

বিদুর ভীষণভাবে চমকাল। তার মুখ কাগজের মতো সাদা। অবিশ্বাস ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ তোমার ছেলে, আমার ছেলে নয়? ওদের এই পৃথিবীতে আনতে আমি নিঃশেষে নিবেদন করেছি নিজেকে ওদের দেহ, আত্মা, মেদ, মজ্জা রক্ত সব আমার বীর্যে গঠিত। পরাশরীর সন্তানদের আগেই ওরা দিয়েছে আমাকে পিতৃত্বের অনুভূতি, আনন্দ। নাই বা ঝুলে থাকল ওদের নামের সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু আমি তো জানি ওরা আমারই পুত্র। বাইরের পিতৃপরিচয় কুলপরিচয়টা সব। রক্তের সম্পর্ক, মনের সম্পর্কের কোন দাম নেই। পরাশরীকে তুমি ঈর্ষা কর। তার গর্ভে পুত্র হয়েছে বলেই আমাকেও অবিশ্বাস করছ। পরাশরীর পুত্রদের তোমার পথের কাঁটা বলে ভাবছ। কিন্তু এ তোমার ভুল ধারণা। সম্পর্কের শেষ সূতোয় বাঁধা কাঁটার ফুলটি নিয়ে তুমি অনর্থক নিজে হৃদয়ের রক্ত ঝরাচ্ছ। আমার বুকে তার কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে রক্তপাত করলে। নিজের সঙ্গে এই সর্বনাশা খেলা তুমি কর না। রাজ অন্তঃপুরের ভেতর থেকে ওরা কোনদিন স্বাধীনভাবে হস্তিনাপুরে সিংহাসন দখল করার মতো কোন আত্মঘাতী সংগ্রামে নিজেদের জড়াতে পারে না। আমিও সে চেষ্টা করব না। তাতে আমাকে দুকুল হারাতে হবে। কুন্তী ভালোবাসার উপর বিশ্বাস রাখ।

বিদুরের কথা শুনে কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। একটা অপরাধবোধে আমার ভেতরটা অনুশোচনায় ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। মেয়েরা যখন কথায় পেরে উঠে না, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে না অসহায়ের মতো তখন ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলে। আমিও কাঁদলাম বিদুরের বুকে মুখ রেখে। বুকের ঘন কালো লোমের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গায়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে অশ্রু বর্ষণ করলাম। কথা আমি বলতেও চাইনি। তবু কেন যে মুখে এসে গেল জানি না। এখন অনুশোচনা হচ্ছে। লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। আসলে আমার মাথার ঠিক নেই। যোল বছব এই বনে জঙ্গলে পড়ে আছি। কিছু ভালো লাগে না। ছেলেরা বড় হচ্ছে। দিন চলে যাচ্ছে। অথচ, কিছুই করা হলো না তাদের জন্যে। এক জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি যোল বছর। এতে কি মাথা ঠিক থাকে বল? আমি শুধু তোমার ডাক শুনবার অপেক্ষায় আছি।

কুন্তী তোমার কথা আমি বুঝি। কিন্তু উতলা হলে চলবে না। সব কিছুর জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে।

অবুঝ মনটা আমাকে পাগল করে দেয়। সব সময় মনে হয়, শপথ রাখা হলো না। স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। আমি হেরে যাচ্ছি। আমার যে তুমি ছাড়া কেউ নেই। ছেলেরাও না। তুমি আমার বন্ধু,

আমার পরামর্শদাতা পথপ্রদর্শক নির্দেশক, আমার গৌরব, ইজ্জত সব তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছি। বিদুর! বিশ্বাস কর হেরে যাওয়ার মতো লজ্জা আর কিছু নেই। হারতে আমার বড় ভয়। হারলে বাঁচব না। বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা খুঁজে পাব না। আমি তা হলে আত্মহত্যা করব।

উদ্বিগ্ন গলায় বিদুর বলল ঃ তোমাকে কিছু করতে হবে না। অবস্থা এখন বদলে গেছে। পাণ্ডু এখন একা নয়। তোমাদেরও নির্বান্ধব ভাবার কারণ নেই। পার্বত্য রাজ্যগুলির রাজা ও প্রজার সঙ্গে তোমাদের সুসম্পর্ক বাহুবল ও লোকবলের অভাব পূরণ করবে। এই অঞ্চলের বেশ কিছু মুনি ও ঋষি তোমাদের গুণে মুগ্ধ। তাঁরাও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ষোল বছর ধরে যে নাটকের মহড়া এখানে চলেছে, সে নাটক এবার হস্তিনাপুরের রাজগৃহে হওয়ার ছাড়পত্র অবশ্যই পেতে পারে। কিন্তু তুমি কতখানি প্রস্তুত সেটা তুমিই ভালো জান। হস্তিনাপুরের প্রত্যাবর্তনের সাফল্য নির্ভর করছে তোমার উপরে।

বিদুরের কথায় হঠাৎ সব গুলিয়ে গেল। নিজেকেই অবিশ্বাস করছি আমি। আমার প্রবল আত্মবিশ্বাস কোথায় গেল? ভেবে পাচ্ছি না কী করব? আমি ঘেমে উঠেছি! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বিদুরের চোখে চোখ রাখলাম। স্ফুরিত অধরে একটু অভিমান জাগল। বললাম ঃ পাণ্ডবদের আপনজন তুমি। কী করলে ভালো হয় সে তো তুমি দেখবে। পিতা হিসাবে সেটাই তোমার করণীয়। আমার জন্যে না হোক তোমার ছেলেদের কথা ভেবে তো কিছু একটা করবে।

হঠাৎ বর্তুল হাসি ফুটে উঠল আমার অধরে। চোখে নির্মল কৌতুক। বললাম ঃ কী বলে ডাকব তোমায়--নেপথ্যের কুশীলব না খল নায়ক।

বিদুর্ কুটিল চোখে আমার দিকে চেয়েছিল। তারপর বলল ঃ একটু বুঝে সুঝে কথাবার্তা বোলো। কথায় বলে দেয়ালেরও কান আছে।

হস্তিনাপুরের পথেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাণ্ডু মারা গেল। এরকম একটা বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই একটু দিশেহারা হয়ে পড়ি। এমন একটা বিপদ আমাদের সকলের বিপদ হয়ে মাঝপথে সব কিছু পণ্ড করার উপক্রম কববে কে জানত? পাণ্ডুকে হারানোর শোক আমার ছিল না। এক অকূল সমুদ্রে ভাসছি। স্বার্থপরের মতো ভবিষ্যৎ ভাবনায় অধীর। এই বিপদ এ-যাত্রার মতো কাটিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরতে পারব কি? এই প্রশ্নে আকুল হলো মন।

পাণ্ডুর মৃত্যু হঠাৎ আমাকে এমন একলা করে দিল যে ভালো করে কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ঈশ্বর সত্যি কি চায় কে জানে? একদিন পাণ্ডুর ভাগ্যোদয়ের যে সূর্য হস্তিনাপুরের আকাশে উদয় হয়ে হস্তিনাপুরেই অস্ত গিয়েছিল, তা যে আবার এমনি করে নবোদয়ের আগেই এক খণ্ড কালো মেঘ হয়ে উদিত সূর্যকে ঢেকে দেবে তা কে ভাবতে পেরেছিল।

পাণ্ডুর জীবদ্দশায় একবারও তার প্রয়োজন টের পায়নি। একটা সন্ধি মুহূর্তে মারা গিয়ে সে বুঝিয়ে দিল রুগ্ন অযোগ্য মানুষেরও সংসারে একটা দাম আছে। দেহান্তির পরে মনে হলো এই লোকটি ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। এই মানুষটাকে বাদ দিয়ে আমার বেঁচে থাকা নিরর্থক, আমার কোন মূল্য নেই। পাণ্ডু আমার পরিচয় মাত্র। তার না থাকা মানে আমার সব পরিচয় হারিয়ে গেল। আমি ঠিকানাহীন হয়ে গেলাম। পাণ্ডুর অস্তিত্বহীনতা তো আমার অনস্তিত্ব। তা হলে হস্তিনাপুরে যাব কিসের আশায়? তার মৃত্যুতে যে সংকট সৃষ্টি হল তা কাটিয়ে হস্তিনাপুরে আর যেতে পারব কি-না সন্দেহ হলো।

পাণ্ডুর শবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। এক প্রবল সম্মোহনে আটকে আছে আমার দৃষ্টি। দৃশ্যটি আমি দেখতে চাইছি না, কিন্তু না দেখেও যেন উপায় নেই। পাণ্ডু কী একা, কী আত্মীয় পরিজনহীন আজ পাণ্ডু। মৃত্যু মানেই কী একাকীত্ব ও পরিজনহীনতা? পাণ্ডুর প্রাণহীন দেহ, ইন্দ্রিয় কি এই মুহূর্তে অনুভব করতে পারছে তার দুই স্ত্রী এবং পাঁচ পুত্র তার খুব কাছে বসে অশ্রুবর্ষণ করছে। সে কী একবারও ভাবছে তার পুত্রেরা হস্তিনাপুরের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর তাদের

অধিকার আদৌ ফিরে পাবে কিনা? ফর্সা ও সুন্দর ছিপছিপে রোগা দেহটির আজ কী দশা!

পাণ্ডুর শবের পাশে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছি। মনে হলো ওর ঠোঁটটা নড়ে উঠল। নিঃশব্দে আমাকে বলল যেন—পৃথা কুন্তী তুমি কাঁদছ? কেঁদে কিছু হয়? তোমার তো ভেঙে পড়লে হবে না। কেন বোঝ না, জীবনে দুর্যোগ যখন আসে তখন আপাতত তার আসার রকমটা দেখে অনেক সময় মনে হয় এটা বুঝি হঠাৎ উদয় হলো। কিন্তু ঝড় উঠার অনেক আগেই ঝড়ের সঙ্কেত পৌঁছে দেয়া। ঘরের চালে যখন আগুন লাগে সে আগুনের উদ্ভব যে তার কত আগে রান্না করার অসাবধানে, কিংবা কারো তামাক খাওয়ার নেশার ঝোঁকে ঘটে যায় তার খোঁজ রাখি না আমরা। কিন্তু আমি তো জানি যে ঝড় নিয়ে তুমি হস্তিনাপুরে ঢুকছ, সে ঝড়ে হস্তিনাপুরের ছাদ উড়বে না, দেয়ালও ভেঙে পড়বে না। কেবল তুমি ঝড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে বিধ্বস্তের মতো পড়ে থাকবে। তোমার সে দুর্দশা দেখতে পারব না বলেই এভাবে চলে যেতে হলো। সত্যি, এমন করে না গেলে হয়তো হস্তিনাপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে না তোমরা। আমি না মরলে হয়তো ইতিহাস তার আপন গতিপথ পরিবর্তন করতে পারত না। আমার মৃত্যুটা দরকার ছিল। এই মৃত্যুটা তোমার নিজের পথে, তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। আত্মবিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় তুমি নতুন হয়ে উঠবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাস হারালে মানুষ বড় একলা হয়ে যায়। হেরে গিয়ে নিজের কাছ থেকে শুধু পালানোর চেষ্টা করে। তুমি হেরে যাবে একথা কল্পনাও করতে পারি না। তোমার জেতার জন্যে আমার মৃত্যুই দরকার ছিল। হস্তিনাপুরে গেলেই বুঝতে পারবে আমার মৃত্যুটা কত প্রয়োজন ছিল।

পাণ্ডুর দিকে এভাবে কতক্ষণ তাকিয়ে আছি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলাম। একজন মুনির ডাকে চমক ভাঙল। সুধা স্নিগ্ধ শান্ত গলায় বললেন মুনিবর ঃ মা, শোকে এমন পাথর হয়ে থাকলে তো হবে না। আমাদের তো একটা কিছু করতে হবে।

মুহূর্তে প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল। মাদ্রী সংজ্ঞাহীন হয়ে পাণ্ডুর বুকের উপর পড়ে আছে। পঞ্চ পাণ্ডব উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। তাদের চাউনি লক্ষ্যহীন। পরিস্থিতিই হঠাৎ এক দায়িত্বশীল রমণীতে পরিণত করে দিল আমাকে। আস্তে আস্তে বললাম ঃ মুনিবর, হস্তিনাপুরঁ যাব বলে বেরিয়েছি। এখন তো ঘরের ছেলেকে ঘরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব চাপল। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম যা কিছু করার তা হস্তিনাপুরে গিয়ে করব কৌরববংশের পারিবারিক নিয়ম মেনে। হস্তিনাপুরে আসার একটা ভালো অজুহাতও আমরা পাব। আপনি সেই আয়োজনই করুন।

মুনিবর বললেন ঃ হস্তিনাপুর যেতে এখনও দিন দুই সময় লাগবে।

শুনেছি, ইঙ্গুদি তৈল পূর্ণপাত্রে শব সংরক্ষণ কবা হয়। যে করে হোক ঐ শব হস্তিনাপুরে নিয়ে যাব।

হস্তিনাপুরের দূরত্ব যত কমে আসে আমার বুকে ধকধকানিটা তত বাড়ে। কিন্তু হস্তিনাপুর পৌঁছে যাওয়ার পরে সব থেমে গেল। কেমন একটা প্রশান্তির ভাব এল। অবাক লাগল হস্তিনাপুরে অগণিত নাগরিক পাণ্ডু পুত্রদের দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পথে অপেক্ষা করছে। উৎসুক জনগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, পাণ্ডুপুত্রেরা দেবতার সন্তান। পৃথিবী থেকে ভেদাভেদ, বৈষম্য দূর করতে দেবতার অংশে তারা জন্মেছে। তাদের চোখে পুত্রেরা সব এক আশ্চর্য অসাধারণ মানুষ। এসব যে বিদুর এবং তার লোকেরা করেছে তা বুঝতে বাকি রইল না। এক দারুণ দুঃখের মধ্যে সংকট কাটিয়ে উঠার তীব্র আনন্দ ও সুখের অনুভুতি বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল।

বিদুর সকলের অলক্ষ্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এসব অনেককাল আগের ঘটনা। তবু এতকাল পরে সেদিনকার ঘটনাগুলোর সব একটা নতুন মানে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। দেড়যুগ আগের হস্তিনাপুরের বাইরেটা খুব বদলায়নি কিন্তু ভেতরে ভেতরে হস্তিনাপুর সেরকমটি আর নেই। বাইরে থেকে তা চোখে দেখা যায় না, বোঝাও যায় না। অনেক পুরনো ঘটনার তাৎপর্য আজ যেন মনেতে ছায়াপাত করছে, আগে কখনো করেনি।

পৃথিবীতে কোন ঘটনা—দুর্ঘটনা কাউকে চিরকালের মতো অভিভূত করে রাখে না। রাখলে হস্তিনাপুর আমাদের মেনে নিয়ে জীবনস্রোতে ফেরার অনুকূল অবস্থা কখনও তৈরী করত না। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যখন সব জিনিসের আসল নকল যাচাই হয়ে যায় তখন হস্তিনাপুরেরও হয়তো একটা নতুন যাচাই অলক্ষ্যে হয়ে গেছিল নিশ্চয়ই।

সংসারে মিষ্টি ভালোবাসার আকর্ষণে গা ঢাকা দিয়ে অতীতের কথা ভুলে গেলাম। বর্তমান নিয়েও আর দুর্ভাবনা নেই। পাণ্ডুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব মেনে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যুবরাজ পদে অভিষেক করে এক নাটক সৃষ্টি করল। এই নাটক না হলে আমার রাজমাতা হওয়ার উচ্চাশা পূরণ হতো না। যে ভাবেই হোক জয় হলো আমার। কৃতিত্ব পুত্রদের। তারা অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট এবং নম্র স্বভাবের। গুরুজনদের তারা শুধু বাধ্য ও অনুগত নয় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অপরিসীম। চারিত্রিক গুণেই পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীরও প্রিয়। কী শাস্ত্র বিদ্যা, কী অস্ত্রশিক্ষা, সর্বক্ষেত্রেই তাদের সাফল্য, কৃতিত্ব পারদর্শিতা, ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব পিতৃব্য ভীষ্মকে গর্বিত করল। তাঁরা খুব কাছের মানুষ হলো তাঁর। সরল, শান্ত, ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের ভালোমানুষী এবং অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যার কৃতিত্ব ভীষ্মকে মুগ্ধ করে রাখল।

মজার কথা আমার সম্পর্কে পিতৃব্যের অন্তরে যেটুকু বিরূপতা ছিল, পুত্রদের কল্যাণেই তা আর থাকল না। এখন তার সামনে দাঁড়াতেও ভয় করে না। অথচ, হস্তিনাপুর আসার আগে কত ভয় ছিল মনে। তা যে এমন করে কোনদিন মিটে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ার পরে আমি দুর্ভাবনামুক্ত হলাম। কিন্তু অন্তরের আশঙ্কা গেল না। রাষ্ট্রক্ষমতা তখনও ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। শাসনকার্য হস্তান্তর হলো না। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কোন কাজকর্মের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হলো না। ধৃতরাষ্ট্রের কপট কোন অভিপ্রায় নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিংবা পিতৃব্য ভীষ্মের নির্লিপ্ততা যে তাদের বঞ্চনার কারণ হবে এমন সন্দেহও আমার ছিল না। কারণ, আমার বিয়ের সময় পিতৃব্যের অন্তরে যে তীব্র কুন্তী বিরোধিতা এবং বিদ্বেষ ছিল যোলো বছর পরে হস্তিনাপুর ফিরে সেই বিরোধিতা তাঁর কাছে পায়নি। অনেক বদলে গেছেন তিনি। রুক্ষ স্বভাবের বদ মেজাজী নিষ্ঠুর মানুষটার বুকের অতলে লুকনো বাৎসল্যের সুধাসিন্ধুর মুখে যে জগদ্দল পাথরটি তার গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল পঞ্চপাণ্ডব মিলে তাকে সরিয়ে মুক্ত করে দিল যেন। ভীষ্ম একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

বড় সুখে আছি। অতীতের দিনগুলো দুঃস্বপ্ন মনে হয়। তবু তার ভেতর এককালে স্বপ্ন দেখতাম। কত সব অদ্ভুত বিচিত্র কল্পনা করতাম। কিন্তু আজ তার রাহুমুক্তি ঘটেছে। উৎকণ্ঠা, ভয় বলে কিছু নেই। সুখের শয্যায় শুয়ে ভাবি ঝড় চলে গেছে। এবার ঘুমোনোর সময়। নিশ্চিন্তে একটানা লম্বা ঘুম দিতে আর বাধা নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি ঘুমোলেও ইতিহাস ঘুমোয় না! ইতিহাসের নাকি ঘুমোতে নেই। ইতিহাস ঘুমোয় না, বলেই সময়ের গর্ভে এক নতুন ইতিহাসের ভ্রূণ সঞ্চার হয়। ইতিহাসের পুরনো কুটিল সৃষ্টি লীলার ফসল হয়ে একদিন তা ভূমিষ্ঠ হয়। অন্ধকার গহ্বর থেকে হঠাৎ কখনও তা সাপের মতো ফণা ধরে। সেই ফণার ছোবলে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর ছেড়ে বারনাবতের আদিবাসী অধ্যুষিত অরণ্যাঞ্চলে পাঠানো হলো। এমনটা যে আবার ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাবব কী করে? বিপর্যয় হওয়ার কথা ছিল যখন, কিছুই ঘটল না। অদূর ভবিষ্যতের জন্যে যে তা মুলতুবি রইল এই সহজ কথাটা আমি ভাবিনি। নির্বুদ্ধিতা অভিশাপের মতো আমার জীবনে যখন দেখা দিল, মনে হলো, এটা বুঝি হঠাৎ উদয় হলো।

সত্যিই হঠাৎ বলে কিছু নেই। আপাততভাবে যাকে হঠাৎ মনে হয়, তার শিকড় কিন্তু থাকে ঘটনার গভীরে। বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারাগাছ যেমন মাটির নীচে সর্বাগ্রে শিকড় চারিয়ে দিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরোয় তেমনি পাণ্ডুপুত্রদের বারণাবতে পাঠানোর পেছনেও অনেককালের একটা ষড়যন্ত্র আছে। তার তাৎপর্য খুঁজে বার করতে গিয়ে ভীষ্ম সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত কথা মনে পড়তে লাগল। এসব কথা আগে মনে হয়নি কোনদিন। দাবানলের রাঙা আলো পড়েছে আমার ভাবনার ভীষ্মের

গায়ে। মনে হচ্ছে রক্তের সাগরের স্নান করে উঠে আসছেন তিনি। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অচেনা মনে হচ্ছে। ভীষ্মকে এভাবে আগে কখনো দেখিনি। দাবানলের আলো পড়ে চিরচেনা ভীষ্ম চরিত্রটাই বদলে গেল। অথচ কোথাও এতটুকু মিথ্যে নেই।

দাবানলের আলোয় আমার ভাবনার ভীষ্মকে অতীতের সমস্ত ঘটনার ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত দেবতার মূর্তির মতো দুর্জয় দেখাচ্ছে। প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব কিছু কায়েম করে ভীষ্ম সকলের মাথার উপর বসে আছেন। তিনি কিছুই করছেন না, অথচ সব কিছুর ভেতর ভীষণভাবে আছেন। সব ব্যাপারেই কী ভীষণ নির্লিপ্ত, উদাসীন এবং নিরপেক্ষ।

ক্ষণে ক্ষণে মনে হতে লাগল আমাদের বারণাবতে পাঠানোর ব্যাপারে ভীষ্ম অনায়াসে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। বাধা দিতে পারতেন। তিনি একটু চাইলেই আমরা হস্তিনাপুর থাকতে পারতাম। শুধু তিনি চাননি বলেই আমরা এক জীবন থেকে আর এক জীবনের দিকে ভেসে গেছি। ভীষ্ম পান্ডবদের কাছে সত্যি কী চেয়েছিলেন তিনি জানেন। এতকাল পরে আমার অন্য কথা মনে হলো। কৌরব পান্ডবদের সুখ শান্তি তিনি চাননি। নিরন্তর দ্বন্দ্ব, বিরোধ, গন্ডগোল, অশান্তিতে তাদের জীবনটা বিষিয়ে উঠুক এটাই তো চেয়েছিলেন। রাজনীতির গর্ভদেশে তার উত্তাপ সঞ্চার করতে পরোক্ষে ধার্তরাষ্ট্রদের সব অপকর্মকে নীরবে অনুমোদন করেছেন। কারণটা হয়তো পিতা শান্তনু তাঁর জীবনের সব সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন বাসনার নীড় ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল। তাই পিতার ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, মায়ের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে কুরুবংশকে সমূলে ধ্বংস করার এক পরিকল্পনা তাঁর মনের মধ্যে রূপ নিয়েছিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের গণগণে আলোয় তা যেন উদ্ভাসিত হলো।

অনেককাল আগের ঘটনা। তবু ভীষ্মকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই মানুষটা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। আমার সঙ্গে তাঁর বিরোধের কোন কারণ নেই, তবু আমাকে প্রতিপক্ষ ভাবতেন। এই প্রথম তার কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর ভেতর সিংহাসন নিয়ে একটা ঠান্ডা বিরোধ ছিল। থাকাটা কোন অন্যায় নয়। কিন্তু ভীষ্ম পান্ডুর রাজা হওয়া খুশি মনে মেনে নেয়নি। হস্তিনাপুরের রাজ ক্ষমতার উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পান্ডুর চেয়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকেই তাঁর বেশি প্রয়োজন। কারণ পান্ডুর কোন অনুগ্রহ কিংবা দয়া নিয়ে রাজা হয়নি। তার রাজা হওয়ার মধ্যে কোন অধর্ম কিংবা অন্যায় ছিল না। রাজাকে যেহেতু সবদিকে নজর রাখতে হয় তাই অন্ধত্বের জন্যে ধৃতরাষ্ট্রকে স্বেচ্ছায় দাবি ও অধিকার ছেড়ে দিতে হলো। কিন্তু পান্ডু রাজা হোক, ধৃতরাষ্ট্র চায়নি। ভীষ্মও চায়নি। ধৃতরাষ্ট্রের মতো অসহায় কিংবা পরনির্ভরশীল ছিল না পান্ডু। সে শুধু রোগগ্রস্ত। চিকিৎসা করলে সে রোগ ভাল হয়ে যায়। কিন্তু তার ভাল হওয়াটা প্রাণ দিয়ে কেউ চায়নি। পিতৃব্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পথে বাধা পান্ডু। পথের কাঁটা পান্ডুকে সরানো দরকার। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভীষ্মকে কিছু করতে হলো না। ঈশ্বর তাঁর সহায় হলো।

পান্ডুকে রুগ্ন করে রাখা হয়েছিল। তাকে সুস্থ করে তোলার আমার উদ্যোগ ভীষ্ম ভালো মনে মেনে নেয়নি। সেজন্যে আমি তাঁর চক্ষুশূল হলাম। আমার কাছ থেকে পান্ডু দূরে সরিয়ে দেবার মতলবে মাদ্রীর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে দিলেন। হস্তিনাপুরে থেকে পান্ডুর সুচিকিৎসা সম্ভব নয় বুঝে তাকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে যাত্রার পরিকল্পনা করলুম। কোথাও না কোথাও একজন ভালো বৈদ্যর ভেষজ চিকিৎসায় পান্ডু তো সুস্থ হয়ে উঠবে। তা হলে কারো মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে রাজকার্য করতে হবে না। ভীষ্ম হয়তো নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা করছিলেন মনে মনে। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভাই-ভাইর বিবাদ জীইয়ে রাখলেন। পান্ডুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি হস্তিনাপুরের শাসনভার ধৃতরাষ্ট্রের উপর অর্পণ করে কার্যত দু'ভাইর বিবাদ বিরোধের এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। তারপর, পান্ডু হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন করলে ধৃতরাষ্ট্র তাকে রাজ্য প্রত্যার্পণ করল না। এ জন্যে ভীষ্ম কোনরকম দায়ী হলেন না। ধৃতরাষ্ট্রকে কোন অভিযোগও করলেন না। ন্যায়-অন্যায়ের কথা বললেন না। এক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়বোধ করলেন। ভাবটা এমন দেখালেন যেন দুভাইর বিবাদের মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না তিনি। নিজের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতেই

চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। এর ফলে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেরও কোন অপব্যবহার করা হলো না। বরং তাঁর ঔদাসীন্যতায় সিংহাসন নিয়ে দু'ভাইর বিবাদ-বিরোধ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, বৈরিতা জটিল হলো। পাণ্ডুকে বঞ্চিত করে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হলে হস্তিনাপুরের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য ও ক্ষমতা থাকবে তাঁর হাতে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ার জন্যে সর্বদা তাঁর অনুগত ও বাধ্য থাকবে। তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে আজীবন ক্ষমতায় থাকতে হবে। যে ক্ষমতা কার্যত তাঁরই।

ভারত সাম্রাজ্যে মুকুটহীন অধীশ্বর হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভীষ্মকে আরো কপট করে তুলল। কী দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ সেই মনের গতিপথ! বোধ হয়, তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞাই যে রহস্যের সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমাগতই এক রহস্যময় অসাধারণ অতি মানুষ করে তুলল তাঁকে। এই অসাধারণত্বকে সযত্নে রক্ষা করতে গিয়ে অহংবোধে তিনি শুধু ভারাক্রান্ত হননি। হয়ে উঠেছিলেন ভয়ঙ্কর দুর্বিনীত, উদ্ধত জেদী, হিংস্র এক মানুষ।—আত্মকেন্দ্রিক এবং ক্ষমতা সচেতন এক কূট রাজনীতিক। সিংহাসনে আরোহণ না করেও কূট কৌশলে হস্তিনাপুরের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিজের হাতেই রাখলেন। কিন্তু সে কথা কাউকে জানতে দিতে চান না। স্মৃতিরূপে ধরে রাখতে চান নিজের মধ্যে। সে স্মৃতি ক্রোধের ঘৃণার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার। সত্যবতীর মুখে একদিন সে গল্প শুনেছিলাম।

হিম্‌বর্ষের কন্যা গঙ্গা রূপলাবণ্যে মুগ্ধ শান্তনু হঠাৎ একদিন পাহাড়ী উপজাতির গোষ্ঠী প্রধান গিরিরাজের কাছে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। পাছে অনার্যদলনকারী, অসুর দর্পহারী মহাবীর শান্তনুর রোষের শিকার হয়। স্বরাজ্য এবং স্বজাতি ধ্বংস হয় তাই গিরিরাজ ভয় পেয়ে শান্তনুর হাতে গঙ্গাকে সমর্পণ করল। কিন্তু ধীবর রাজ গিরিরাজের মতো ভুল করল না। সবিনয়ে তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বলল ঃ মহারাজ! কুরুবংশ অতি মহান বংশ। আপনি সেই বংশের একজন কীর্তিমান নৃপতি। আপনার হাতে কন্যা সম্প্রদান করার কতো পুণ্যকর্ম আর কী আছে! কিন্তু আমরা ছোট জাত। অসভ্য, বর্বর। সভ্য ও কৃষ্টি সম্পন্ন মহান আর্য বংশের নৃপকুল এবং অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আমাদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে ঘেন্না করেন। মহারাজ চাইলেও তাঁরা এই বিবাহকে সম্মান করবে না। আমার কন্যার জীবনটাই তাতে বিষময় হবে। তাই বলছিলাম মহারাজ পুনর্বিবেচনা করুন। এটা কোন অনুরাগ কিংবা প্রেম নয়—চোখের ক্ষুধা, ভোগ করার বাসনা। ভোগের পরের দিনগুলিতে যখন ক্লান্তি আসবে তখন ভোগ্য উচ্ছিষ্ট বস্তুর মত আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করতেও কষ্ট হবে না।

শান্তনু প্রতিবাদ করে বলল ঃ আমার কোন চাওয়া অতৃপ্ত থাকতে পারে না। বিশ্বাস করে তাকে নির্ভয়ে আমার হাতে সমর্পণ করুন।

দাসরাজ একটু আশাহত হয়েই বলল ঃ মহারাজ, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির আপনার মুখের উপর তর্ক করা শোভা পায় না। কিন্তু আমি তো পিতা। পিতা হওয়া বড় জ্বালা। তাই, অভয় দিলে নির্ভয়ে বলতে পারি।

বলুন।

শুনেছি, গিরিরাজ কন্যা গঙ্গার পাণিগ্রহণের পর আটবছর আপনারা একত্রে থেকেছেনণ আপনার অনেকগুলি পুত্র সন্তানও হয়। উপজাতি রমণীর গর্ভস্থ সন্তান হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক এটা রাজবংশের অভিপ্রেত নয়। তাই সাত সাতটি সন্তানকে মন্দাকিনীর জলে জীবন্ত বিসর্জন দিয়ে তাদের হত্যা করা হতো। মহারাজ চমকাবেন না। অমন করে তাকালে ভয়ে সব কথা বলতে পারব না আমি। অধমের বিচলিত পিতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনাকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। মহারাজ নিন্দুকে বলে, পতিব্রতা গিরিরাজ দুহিতা মহান রাজার নিষ্ঠুরতায় অসহিষ্ণু হতে থাকে। ভক্তির বদলে স্বামীকে ঘৃণা করতে সুরু করেন। প্রেমের মাধুর্য এবং উত্তাপ দুই নষ্ট হলো। ঘৃণার বিষে নীল হয়ে গেল দুজনের সম্পর্ক। অষ্টম সন্তান গর্ভে এলে হতভাগিনী গঙ্গা হস্তিনাপুরে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছিল না। আপনার হিংসার বলি হওয়ার আগেই গিরিরাজ দুহিতা সদ্যোজাত পুত্র দেবব্রতকে বুকে করে ঘেন্নায় সেই যে চলে গেল আর ফিরল না। তারপর ষোল বছর পরে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে ছেলেকে একজন মানুষের মতো

মানুষ করে আপনাকে অর্পণ করল। অনার্য উপজাতির প্রতি প্রীতির ভাব জাগাতে, মহীষী গঙ্গার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার করতে দেবব্রতকে যুবরাজ করলেন। মহারাজ কন্যার ভবিষ্যতের ভাবনা সব পিতারই থাকে। আমিও উদ্বিগ্ন। আমার বিশ্বাস এই বিয়েতে আমরা কেউ সুখী হব না! নবোদ্ভিন্না তরুণীর স্বামীত্ব গ্রহণের অনেক প্রতিবন্ধকতা-আছে। আপনার অবর্তমানে মা মরা মেয়েটা নিরাশ্রয় হবে। তাকে নিয়ে আপনার রাজ্যে ও অন্তঃপুরে অশান্তি হোক, আমি চাই না। আপনার ক্রোধের আগুনে আমার রাজ্য-ঘর ছারখার হবে। অনেক রক্ত ঝরবে রক্তের মাটিতে পা রাঙিয়ে আমার কন্যাকে আপনি হরণ করতে পারেন। কিন্তু যেখানে সে পা রাখবে রক্তের দাগ পড়বে সেখানে। সে দাগ মুছবে না। আপনার পুত্র দেবব্রত স্বেচ্ছায় যদি সত্যবতীকে জননীর সম্মান দিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। সত্যবতীর পুত্রকে যদি হস্তিনাপুরের নৃপতি করে, তবেই এ বিয়ে হওয়া সম্ভব।

দেবব্রতের কানে কথাটা পৌঁছল। পিতার উপর তার ঘেন্না হলো। এই মানুষটার পাপের বিষ তার শরীরে। স্বেচ্ছাচারী, ব্যভিচারী পিতার অসংযম পুত্র হয়ে দেখার বিড়ম্বনা এবং দুর্ভাগ্য যে কী যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে বোঝে না। অমন মহীয়সী মাকে এই মানুষটা কত কষ্ট দিয়েছে। তাকে সুখী হতে দেয়নি। মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে আর পাপ গোপনের জন্যে বলেছে, গঙ্গার সন্তান ধারণের অক্ষমতার কারণে অকালে মৃত ও বিকলাঙ্গ পুত্র প্রসব করেছে। দেবব্রতের বুকটা জননীর দুর্ভাগ্যের জন্যে কষ্টের জন্যে হাহাকার করে উঠল। জননী তাকে অজ্ঞাতস্থানে লুকিয়ে না রাখলে আর সাত ভাইর মতো এ পৃথিবীর আলো দেখতে পেত না। অভিমানের সাগর উথলে উঠল বুকে। মনে মনে বলল ঃ না দেখলেই ভালো হতো। মা গঙ্গা জীবন দান করে স্বেচ্ছাচারী পিতার অসংযত নির্লজ্জ ব্যাভিচার দেখার শাস্তি দিল কেন? যে মানুষের জীবনে প্রেম নয়, কামই সব, তাকে কেউ মানুষ বলে না। পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কি? পিতার স্বার্থপরতায় তার শুভ্র মনটি নীলবর্ণ হয়ে গেল। সে আর শান্ত থাকতে পারল না। নিজের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, প্রেমের সুন্দর অনুভূতিকে এক মুহূর্তে নিষ্ঠুর হাতে শ্বাসরুদ্ধ করতে ধীবররাজের শর্তের কাছে আত্মবলি দিল। প্রতিশ্রুতি দিল পিতার বাসনা পূরণ করতে কোনদিন বিবাহ করবে না। হস্তিনাপুরের নৃপতিও হবে না।

আত্মত্যাগ হলো তাঁর আত্মহত্যা। গঙ্গার অতি আদরের পুত্র দেবব্রত সেদিন থেকে হারিয়ে গেল বঞ্চনার উষর মরুভূমিতে। শান্তনু মহিষী সত্যবতী ভীষ্মের জীবনের রাহু। তাঁর স্বপ্ন, কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকে গ্রাস করল। মনের কোণে ব্যর্থ জীবনের ক্ষোভ, ক্রোধ, শূন্যতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। সেই ক্ষোভ রূপান্তরিত হলো জেদে, স্বার্থপরতায়, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায়। আসলে কঠিন প্রতিজ্ঞা মেনে চলার কঠোরতার তাপে শুকিয়ে গেল তাঁর মনের সুকুমার অনুভূতিগুলি। তাই অম্বার প্রেমের কোন মূল্য ছিল না তাঁর কাছে। পিতার বঞ্চনার প্রতি জমানো ঘৃণাটাই উগরে দিলেন অম্বাকে প্রত্যাখান করে। ভীষ্মের মধ্যে একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। এক নীরব পাশবিক ক্রোধ নিজের হৃদয়কে দুহাতে ছিঁড়ে কুটি কুটি করল। অনেক রক্ত ঝরল তবু হৃদয়ের কান্না কেউ শোনে নি। প্রেমহীনতায় অভিশপ্ত ভীষ্ম হয়ে উঠলেন এক ভয়ঙ্কর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি। মনের শুকনো জমিতে জন্ম নিল কূটনীতি। সিংহাসনে আরোহণ না করেও কুরুরাজ্যের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখে ভীষ্ম কার্যত পিতার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতিশোধ নিতেই পিতৃবংশ সমূলে ধ্বংস করার এক পরিকল্পনা করল মনে।

আমায় যদি কেউ জিগ্যেস করে বারণাবতে বিপদ আছে জেনেও গেলে কেন? তোমরা না গেলে কী হতে পারত, সেটা দেখার তর সইল না? সত্যি বলতে কি, যেতে আমাদের হতোই। কিছুদিন বিলম্ব করা যেত মাত্র। কিন্তু তাতে লাভ কী হতো? অসম্মান, অমর্যাদা নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আমাদের হস্তিনাপুর ছাড়তে হতোই। সেখানে আমরা নির্বান্ধব স্বজনহীন।

কেবল বিদুরই স্নেহপরায়ণ পিতার মতো আমার পুত্রদের আগলে রাখত। তাদের হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অনেক অভিযোগ করেছে। কিন্তু ফল হয়নি। যুবরাজ হয়েও যুধিষ্ঠিরের সত্যি কিছু করার ছিল না। তাকে যুবরাজের আসনে বসিয়ে ধৃতরাষ্ট্র কার্যত দুর্যোধন ও দুঃশাসনের ক্রোধ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণাকে ভয়ঙ্কর করে তুলল। ধার্তরাষ্ট্র ও পান্ডবদের বিবাদ বিভেদের ইন্ধন যোগাতেই পিতৃব্য ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হয়েছিল এই সত্যটা বড় দেরী করে বুঝলাম।

কী আশ্চর্য মানুষ ভীষ্ম! আমার পুত্রদের প্রতি কী অসীম স্নেহ, মমতা অনুরাগ তাঁর। তাদের সাফল্য, কৃতিত্ব তাঁকে গর্বিত করে। বিশেষ করে যুধিষ্ঠির আর অর্জুন তো তাঁর ফুসফুস আর হৃদয়। তাদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ কত গভীর এবং আন্তরিক তা বোঝাতে প্রায়ই বলতেন ঃ মাঝে মাঝে মনের মধ্যে যখন ঝড় উঠে, জীবনটা বোঝা মনে হয়, মন খারাপ লাগে তখন তোমাদের সঙ্গ পেলে তোমাদের কাছে এসে বসলেই মনটা ভরে ওঠে। বড় শান্তি পাই। তোমাদের সান্নিধ্য আমাকে নতুন প্রাণ দেয়। ফুরিয়ে যাওয়া শুকিয়ে যাওয়া আমার জীবনকে নবীকৃত করে।

মাঝে মাঝে অবাক মুগ্ধতায় তাদের শান্ত, শ্রীময় দুই আঁখি তারার দিকে তাকিয়ে অভিভূত গলায় প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কে গো? কোথা থেকে এলে? কেন এলে আমার দুঃখের বোঝা বইতে? প্রিয় আমার! সুন্দর আমার !

এই অদ্ভুত মানুষটিকে পান্ডবদের বড় আশ্রয় এবং ভরসার পাত্র ভেবেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, পান্ডবদের কোন সংকটে, কিংবা দুর্দিনে তাঁকে ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেনি। ন্যায়-অন্যায়,ভাল-মন্দর পক্ষে বিপক্ষে কোন কথাও বলেননি। ধার্তরাষ্ট্রদের কোন অন্যায় ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। পান্ডুপুত্রদের বড় প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সত্যাশ্রয়ী পিতামহ আপনজন হয়েও নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে ধার্তরাষ্ট্রদের নিন্দে কিংবা তিরস্কার কিছুই করেন না। নালিশ করলেও চুপ করে থাকেন। তাঁর নির্লিপ্ততার রহস্য পুত্রদের মনে নানা সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাঁর এই নিরাসক্তির কোন অর্থ খুঁজে পাই না। নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য একজন মানুষকে নির্লিপ্ত বা উদাসীন হতে হবে কেন? পান্ডু পুত্রদের মনে বিষ সন্দেহ ঢুকল। পিতৃব্যের কপট আন্তরিকতার প্রতি তাদের অবিশ্বাস জন্মাল। নিরপেক্ষ থাকার ভান করে অন্যায়কে, ভীষ্ম প্রশয় দিচ্ছেন। বিরোধ বাড়িয়ে তুলছেন। রেষারেষির ক্ষেত্র সৃষ্টি করছেন। পিতৃব্য নিশ্চয়ই তাদের হস্তিনাপুরে থাকা চায় না। একটু নির্লিপ্ত আর নিরাসক্ত থাকলেই যদি সে কথাটা বলা হয়ে যায় তা-হলে মুখে বলবে কেন? চুপ করে থাকাটা দোষের কিছু নয়। বিশ্বাসের উপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত গড়ে ওঠে। বিশ্বাস ভেঙে গেলে গোটা সম্পর্কটা নড়বড়ে হয়ে যায়। তখন সম্পর্কহীনতাকে জোড়াতালি দেওয়া মিথ্যে গোলমেলে এক সম্পর্ক বলে মনে হয়। তাকে জোর করে ধরে রাখার মতো বিভ্রান্তি জীবনে আর নেই। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে আছে আমার হস্তিনাপুরে বসবাসের স্মৃতি।

দেখতে দেখতে জীবনের তেরোটা বছর হস্তিনাপুরে কাটল। পান্ডবদের প্রকৃত হিতৈষী ছিল বিদুর। সন্তানের মতো তাদের আগলে বেড়িয়েছে। পিতার স্নেহ, মমতা আদর ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে তাদের। এতটুকু কার্পণ্য ছিল না সে দানে। ভরে উঠার পবিত্র সুখে হৃদয়টা বড় হয়ে যেত। বড় আদর্শের আলো পড়ত তার চোখে মুখে। বিদুর অনন্য। তার অবদান ভুলবার নয়। পাছে ধার্তরাষ্ট্ররা হেনস্তা করে,—তাই পান্ডবদের সর্বদা দূরে দূরে সরিয়ে রাখত। তাদের ছায়া মাড়াতে নিষেধ করত। তবু জীবনের অনেকগুলি অমূল্য সময় অপচয় হলো হস্তিনাপুরে। এগুলো তো আর ফেরানো যাবে না।

অন্তত জীবনের বাকী বছরগুলি একপক্ষের দয়ায়, ঘৃণায়, অনুকম্পায়, কিংবা ঔদাসীন্যে, নিরাসক্তিতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যেই পুত্রদের নিয়ে বারণাবতে যাওয়া। সেখানে গিয়ে কী করব। কোথায় যাব সেটা জানার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই। পথে বেরোলে কিংবা পথের দিকে চাইলেই আমার রক্তে এক ধরণের উন্মাদনা জাগে। চলতে চলতে পথ মিলে যায়। নিজেরও চলার ইচ্ছে করে। যারা থেমে থাকে, স্থবিরতার শিকার হয়েছে যারা জীবনে, তারা হয়তো জানে না সেকথা।

সংসারে বঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে আমার যাত্রাপথ অভিষিক্ত হলো। তার শেষ পরিণতি

যে কোথায় কেমন করে কোন চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা আমার অদৃষ্টও বোধহয় বলতে পারে না। কারণ যাকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয় ভাগ্যচক্রের পরিধিতে তাকে আঁটে না। অনেক বাঁধা, বাঁক, নদী, পথ, জঙ্গল,পাহাড় পার হয়ে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা সহ্য করে একা একা লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। বিধাতা তাকে অন্য ধাতুতে গড়ে বলে সে একেবারে আলাদা। তাকে কখনও বা মধুর কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই। তাই চিরটা কাল আমি বোধহয় একটু নিষ্ঠুর, একটু বেশী স্বার্থপর। পৃথিবীতে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর কে নয়? অমন যে রামচন্দ্র—তিনিও কর্তব্য করতে নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়েছেন। ধীবররাজ, শান্তনু, ভীষ্ম—নিষ্ঠুর হয়নি কে? যে সংগ্রামে নেমেছি তাতে জেতার জন্যে যখন যা করণীয়, তা করতে স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হওয়া কোন অন্যায় নয়।

যে অন্যায় অপরাধ আমি করে থাকি না কেন, একান্তে তার উন্মোচন করে নিজেকে দেখি। এসব অতীতের কথা। তার কিছুই নেই আজ, কিন্তু একদিন তো ভীষণভাবে ছিল। আমার সমস্ত জীবনে, অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে তার স্পর্শ লেগে রয়েছে এখনও। আমি কি কখনও ভুলতে পারি ভীষ্মের বঞ্চনা নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতার কথা! সে কথা মনে পড়লে এখনও বিস্ময়বোধ করি।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হস্তিনাপুরে সত্যবতীর পাশে বসে আছি। আর তিনি আমার মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছেন। বললেন : সংসারে সব হিসেব যদি সহজ হতো মা, তাহলে তো কোন ভাবনাই থাকত না। তোমার অনুমান নির্ভুল। ভীষ্ম নির্লিপ্ত, উদাসীন এবং নিরপেক্ষ থাকার ভান করে নিরঙ্কুশ শাসনের কর্তৃত্ব অবাধে ভোগ করছে। বাইরে থেকে তার কপটতা বোঝা যাবে না। পিতার বাসনা পূরণ করতে যে পুত্র আত্মবলি দিতে পারে তাকে তো মহান বলতেই হবে। তার মহত্ত্বে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু রাগও হয় ভীষণ। এই ছেলেটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে আমাকেই বিপদে ফেলল। মেয়েমানুষের মন তো; কেমন একটা সন্দেহ হলো। ক্রমেই মনে হতে লাগলো ভীষ্মের আত্মত্যাগের কোথায় যেন ফাঁকি আছে। তা মোটেই স্বার্থশূন্য নয়। অঙ্গীকারের পেছনে ভীষ্মের অঙ্ক ছিল অন্যরকম। আর ছিল দূরদর্শিতা।

কথার মধ্যে আমি বললাম : আমারও মনে হয় পিতৃব্য ভীষণ হিসেবী এবং স্বার্থপর।

মনে হওয়ার কিছু নেই। এটাই সত্য। সত্যি সে স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর বলেই খুব হিসেব করে আমাকে মৃত্যুর মুখ ঠেলে দিয়েছিল। মহারাজের যে যক্ষারোগ ছিল আমি জানতাম না। যখন জানলাম, মুক্তির পথ তখন বন্ধ। সেই প্রথম মনে হলো দেবব্রত জেনেশুনে এক ঢিলে দুই পাখী মারার মতলব করেছে। আমার শরীরে ঐ মারাত্মক ব্যাধি শুধু সংক্রামিত হবে না। আমাদের সন্তানরাও ঐ ব্যাধিতে নির্বংশ হবে। আর সে মহান আত্মত্যাগের এক আদর্শ পুরুষরূপে চিরদিন মানুষের হৃদয়ের পূজা পেয়ে কুরুরাজ্য শাসন করবে অনন্তকাল ধরে।

বুকের গভীর থেকে একটা লম্বাশ্বাস উঠে এল সত্যবতীর। নিস্তব্ধ ঘরে তার গভীর শ্বাসপতনের শব্দ শোনা গেল। ভারাক্রান্ত গলায় বলল : ভীষ্মকে কোনদিন বিশ্বাস কর না। ওর জন্যেই আমি পুত্রহীন। পাছে চিত্রাঙ্গদ রাজা হয়, তাই কিশোর পুত্রকে শক্তিশালীর গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করল। ভীষ্ম এভাবে তাকে হত্যা না করলেও পারতো। আমাকে জিগ্যেস না করেই বিচিত্রবীর্যকে বিয়ে দেবার জন্যে স্বয়ম্বর সভা থেকে কাশীরাজ কন্যাদের হরণ করে আনল। এ সব না করে তো স্বয়ম্বর সভায় তাকে প্রার্থী করে পাঠাতে পার তো। সেটাই তো নিয়ম। কিন্তু গায়ের জোরে যক্ষারোগাক্রান্ত বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে দুটি নিরীহ কন্যার বিয়ে দিয়ে সে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করল। ভীষ্ম জানত বধূরা কোনদিনই এই অসুস্থ মানুষটার ছায়া মাড়াবে না। যদি কোনভাবে তার সংস্পর্শে আসে তাহলে তাদের সন্তান হবে স্বল্পায়ু। এই বিয়ের ফলে কুরুরাজ্য ও সিংহাসনে উপর তার নিরঙ্কুশ অধিকার ও কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার কোন আশংকা রইল না। লোকে জানল ভীষ্ম কী কর্তব্যপরায়ণ, কী মহান! শান্তনুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্যে রুগ্ন ভাইকেও বিয়ে দিয়েছে। একজন নয়, দুই রাণী তার। ভীষ্মকে কেউ দুষবে না। একদিন তার কপটতায় আমিও ভুলেছিলাম।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থকার পর বলল : ভীষ্মকে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল। ভীষ্মের

কপট অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দেবার দুর্বার সঙ্কল্প নিয়ে বিচিত্রবীর্যের বধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে আহ্বান করলাম। এরকম একটা দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত ভীষ্মের সব হিসেব গণ্ডগোল করে দিল। কিন্তু বিধাতা তার সহায় হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে জন্মান্ধ করল আর পাণ্ডু জন্ম থেকেই পাণ্ডু (জণ্ডিস) রোগাক্রান্ত হলো। তাদের জন্মে সিংহাসনের উপর ভীষ্মের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলো না। কেবল দ্বৈপায়নই তার চক্ষুশূল। সিংহাসনের রাজা নির্বাচনে দ্বৈপায়নের ভূমিকা তাকে ঈর্ষান্বিত করল। আমার গোপন পরামর্শে দ্বৈপায়ন পাণ্ডুর রাজা হওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করল। এই প্রথম ভীষ্মের হার হলো। ভীষ্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রকে বাড়ানোর জন্যে দ্বৈপায়ন ভীষ্মের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা না করেই পাণ্ডুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিল। এ বিয়েতে ভীষ্ম খুশি হয়নি। কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, জেহাদ ঘোষণা করতেই যে দ্বৈপায়নকে আমি ডেকেছি, এটা বুঝে রাগটাকে কোনরকমে সংবরণ করে থাকল। নিরঙ্কুশর কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে বড় বেশি বিপন্নবোধ করতে লাগল। তোমার উপর যে কোনদিন তার চোট এসে পড়বে। তাকে সামাল দেবার মতো বুদ্ধি তোমার আছে। এটুকুই যা ভরসা।

কথাগুলো শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। কী বলব বুঝতে না পেরে হঠাৎ মাথা নত করে থমথমে গলায় বললাম : পিতৃব্য আমাকে শত্রুর চোখে দেখেন। তাঁর কাছ থেকে আমার পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু হারানোর ভয় আছে। কিন্তু হারিয়েও তো মানুষ অনেক কিছু পায়। হরিশ্চন্দ্র রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে সম্রাটের ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন। একেই বলে সত্যিকারে পাওয়া। আপনি আমাকে সেই আশীর্বাদই করুন।

ছ'যুগ আগের ঘটনা। তবু কি আশ্চর্য! কি বিস্ময়! দাবানলের মাঝখানে বসে আমি সত্যবতীকে দেখছি। তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ঘটনাগুলোকে অনেকবার মনে মনে বিশ্লেষণ করলাম। আধিপত্য আর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে হস্তিনাপুরে ষড়যন্ত্র চলেছে, সেই ষড়যন্ত্রের জাল পাতছে ভীষ্ম অনেককাল ধরে। তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের পথে অনুগত ও বাধ্য পঞ্চপাণ্ডব সহ যুধিষ্ঠির বাধা হবে আশঙ্কা করেই হস্তিনাপুর থেকে তাদের বিতাড়িত করা দরকার হলো। তাই বারণাবতের যাত্রার ব্যাপারে ভীষ্ম নীরব থেকে কৌরব-পাণ্ডবের বিবাদের ইন্ধন দিয়েছেন। এভাবেই বিরোধের মধ্যে তাদের টেনে এনে সর্বক্ষণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মশগুল রেখে ভীষ্ম রাজনৈতিক প্রাধ্যান্যকে অটুট রাখলেন।

কিন্তু আমি যে আবার হেরে গেলাম। কোথা থেকে একটা ঢেউ এসে হঠাৎ আমাকে অনেকদূর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এ আমার সহ্য হচ্ছিল না। রাগে, ক্ষোভে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। আমি কেন হেরে যাব? এখন তো আমি একা নই। পাঁচ পুত্রের জননী। হেরে যাওয়াটা যে আমারই লজ্জা। ছাই চাপা আগুনের মতো ভেতরে ভেতরে আমি গুমরে মরছিলাম।

বারণাবতে আমার অবস্থা দ্বীপে বন্দী মানুষের মতো। পালানোর পথ বন্ধ। দুর্যোধনের পাহাদারদের সদা সন্ধানী চোখ ফাঁকি দিয়ে সত্যি করার কিছু ছিল না। ভেতরটা আমার হাঁফিয়ে উঠল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা। জরাসন্ধের প্রতিপত্তি। তাঁর শরণাগত হওয়া মানে তো আর এক বন্দীত্বকে মেনে নেয়া। মরে গেলেও আমি কারো অধীনতা মেনে নিতে পারব না। আমি চাই সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব এবং সহকর্মীর মর্যাদা। কিন্তু সে সম্মানের কোনা যোগ্যতা তো আমার নেই। রাজনীতিতে সবটাই দেয়া নেয়ার ব্যাপার। কিন্তু আমার জমা-খরচের শূন্য খাতায় অন্যদের পাওয়ার মতো আছে কি? রাজনীতির হারজিতের খেলায় বড় জোর ঘুঁটি হতে পারি। হেরে গেলে ফেলে দেবে, জিতলে মাথায় তুলে রাখবে। কিন্তু তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। সাফল্যের গৌরব নেই। জেতায় পৌরুষের কদর নেই। শুধু পাঁচ পুত্রের শৌর্য বীর্যের ভরসা করে প্রত্যক্ষ সংঘাতে নামার কথা চিন্তা করা নিছকই পাগলামি এবং মূর্খতা। উপায় শুধু একটা। কৌশল। কৌশলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়।

অবশ্যই সে কৌশলের প্রথম কথা মুক্তি। বারণাবতে এই যন্ত্রণাময় দিনগুলো থেকে মুক্তির জন্যে অনেক কথাই মনে হলো। কিন্তু কোনটাই গ্রহণযোগ্য হলো না। জনারণ্যে মিশে গিয়ে সাধারণ

মানুষের দুঃখকষ্টের শরিক হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সংকট থেকে দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করে শ্রেষ্ঠ মানুষের একটা আলাদা পরিচয় তৈরী করা এবং তার একটা রাজনৈতিক রূপ দেয়া হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। তখনই দেশের নৃপতিরা পাণ্ডবদের একজন মানুষের মতো মানুষ ভাবতে সাহস পাবে। কিন্তু তাতেও ভয় আছে, বাধা আছে। ধার্তরাষ্ট্রেরা টের পেলে হত্যা করবে। সব কিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। সুতরাং এমন কিছু করা দরকার যাতে ধার্তরাষ্ট্রেরা কোন দিন সন্ধান না পায়। এজন্যে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তিকর কিছু একটা করা দরকার।

বেশ বুঝতে পারি, রোজই ভীষণভাবে বদলে যাচ্ছি। এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় আমার ভেতরটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। আমার নিষ্ঠুরতার রূপ বড় ভয়ঙ্কর। আমিও ভয় পাই নিজেকে। চোখ খুলে রাখলে আমি দেখতে পাই পাণ্ডুর সহমৃতা করার জন্যে মাদ্রীকে একদল লোক টেনে হিঁচড়ে চিতায় তোলার জন্য জোর খাটাচ্ছে। আর সে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। বাঁচার জন্যে কী আকুল কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে বলছে; তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচতে দাও। ছেলেদের নিয়ে বেঁচে থাকার বড় সাধ গো। তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও। ওদের ফেলে কোথাও যেতে পারব না। দিদি আমায় করুণা কর। বাঁচাও। আমি তোমার ছোট বোন হয়ে থাকব। দাসীর মতো চরণে ঠাঁই দিও। আমাকে তুমি দয়া কর। দয়া করে একটু বাঁচতে দাও।

কিন্তু কী আশ্চর্য। তবু মন গলল না। তার বুক ফাটা কান্নায় আমার একটু করুণা হলো না। মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সরে যাচ্ছে। ওকে আমি ঈর্ষা করি, ভয় পাই। ওর ভেতর আমার সর্বনাশের ছবি দেখি। আমার পথের কাঁটা সরে যাচ্ছে— আমি কখনো ওর প্রতি সদয় হতে পারি? শত্রুকে মায়া-মমতা করতে নেই। শত্রুকে নির্মূল করা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করা শাস্ত্রীয় নির্দেশ।

জ্বলন্ত চিতায় মাদ্রীর দেহটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সারা গায়ে আগুন, তার মধ্যে মাদ্রী। তার ভীষণ ফর্সা শরীর কালো থেকে কালো হয়ে যাচ্ছে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে বিবশ হয়ে চেয়ে আছি। কত কি ভাবছি? হঠাৎই মনে হলো চিতার আগুনে শুয়ে মাদ্রী চিৎকার করে আমাকে যেন বলল : সহমরণের নাম করে আমায় তুমি খুন করলে? খুন! দারুণ চমকে উঠি! নিরুচ্চারে বলি : খুন করব কেন? তোমার কর্মফলই তোমার সহমরণের জন্য দায়ী। সেজন্য আমাকে খুনী বলছ কেন? তুমি তো স্বেচ্ছায় আমাকে সহমরণে যেতে দাও নি। পাপ, অনুশোচনা থেকে মুক্তি পেতেই পাণ্ডুর সহমৃতা হলে। আমায় অকারণ দুষছ কেন?

মাদ্রী খিল খিল করে হেসে বলল : চমৎকার! এর মধ্যে ভুলে গেলে? পাণ্ডু ভীষণভাবে চেয়েছিল তার নিজের একটা সন্তান হোক। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সুচিকিৎসায় তার দেহ মনে নতুন যৌবন এল। আমার রূপ যৌবনে সম্ভোগের প্রবল বাসনা জাগল তার অন্তরে। কিন্তু তুমি তার ইচ্ছেয় বাদ সাধলে। কেন চাইলে, তুমি তা জান। পাছে পাণ্ডুর ঔরসজাত পুত্র সিংহাসনের দাবিদার হয় এই ভয়ে তুমি আমার সন্তান কামনা পূরণ করতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বরণ করতে বললে।

স্বামীর কথা ভেবে, তোমাকে নিষেধ করা কোন অন্যায় হয়নি আমার? স্ত্রীর কর্তব্য করেছি।

মিথ্যে কথা। আমার গর্ভে যদি পাণ্ডুর পুত্র হয় তা হলে রাজ্য ও সিংহাসনে তার অগ্রাধিকার থাকবে। যুধিষ্ঠির বঞ্চিত হবে ভেবেই তুমি পাণ্ডুকে পিতা হতে দাও নি।

মাদ্রী আমার ত্যাগের অপব্যাখ্যা করতে তোমার সরম হলো না? তুমি হাসছ। কী ভয়ঙ্কর তোমার হাসি।

দিদি। অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে পৃথক পৃথক ভাবে আহ্বান করলে আমার দুই পুত্র হয়। তুমি সহ্য করতে পারনি। ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে আমাকে 'বিশ্বাসঘাতক,, শঠ প্রতারক বলে গালি গালাজ করেছ। তুমি ভুললেও আমি ভুলিনি। তোমাকে রাগানোর জন্যে বলিঃ একঘর ছেলেপুলে না হলে সংসার মানায় না। সহদেব নকুলকে পেয়ে মনে হচ্ছে—নতুন জীবন পেয়েছি। বাঁচার একটা মানে খুঁজে পেয়েছি। আরো দু একটি সন্তান আসুক আমার পেটে। এক মানুষের ভেতর অনেকগুলো মানুষ বাস করে। সেই মানুষগুলিকে সব বাবা মা তার সন্তানদের মধ্যে এত বেশি করে চায় বলেই

বহু সন্তান কামনা করে। আমার কথা শুনে তুমি আঁৎকে উঠেছিলে। কেন? আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করনি। তুমি ভাবলে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্যেই আমি বহু সন্তান কামনা করছি। তোমায় ভয় পাছে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবলোকের সাহায্যে হস্তিনাপুর অধিকার করে তার সন্তানদের সিংহাসনে অভিষেক করে তাই আমার নামে অনেক কুৎসা গেয়েছ পান্ডুর কাছে। পান্ডুর মনকে বিষিয়ে দেয়ার জন্য, আমার প্রতি তাকে বিরূপ করার জন্য তুমি করনি এমন কাজ নেই। পাণ্ডুর মৃত্যুর জন্যও দায়ী তুমি। দিনের পর দিন তার দেহ ও মনের যৌবনোচিত চাহিদার বঞ্চনাকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। কান্ডজ্ঞানহীন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য বর্বরতায় উন্মাদ হয়ে একটা তীব্র দৈহিক সুখের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ একটা অদৃশ্য ভয়ে বেঁচে থাকা সম্পর্কে প্রবল সংশয়ে, আক্ষেপে, ভীরুতায় পাণ্ডুর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। অসম্ভব একটা কষ্টে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সর্বাঙ্গ ভীষণ কাঁপছিল। দম বন্ধ গলায় বললঃ কুন্তীর নিষেধ কেন শুনলাম না? তুমি কেন নিবৃত্ত করলে না? এখন কী হবে? মৃত্যুর আলিঙ্গনে চলে যাব? আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর চোখ মেলল না। এই ভয় না দেখালে, পাণ্ডুর কিছুই হতো না। আতঙ্কে, আর আত্মবিশ্বাসের অভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী। তুমি খুনী কুন্তী। ঠাণ্ডা মাথায় দু'দুটো খুন করলে।

এত জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারিত হলো যে, আমি ভয় পেয়ে চমকে উঠলাম। আশ্চর্য! আমি তো তখন বারণাবতের জতুগৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছি। মাদ্রী কোথাও নেই। তার সব অস্তিত্ব মুছে গেছে। তা-হলে এ কার কথা? হয়তো আমার পাপ অনুশোচনার আর্ত মনের গভীর অভ্যন্তরের কথা।

নিঃশব্দে এক আর্তনাদ বুক থেকে উঠে এল লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। অসহায়ের মতো উচ্চারণ করিঃ তা ঠিক। কিন্তু আমি কী করব? আমার করার কী আছে?

যা হয়ে গেছে তার জন্যে অনুশোচনা করব কেন? ন্যায়—অন্যায়, উচিত অনুচিত নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। রাজনীতির অন্যায়, অধর্ম পাপ বলে কিছু নেই। সাবধানের বিকল্প নেই। সেজন্যে সিদ্ধান্ত নিতে যদি ভুলও হয় তা করা উচিত। ভুলের জন্যে পাওয়ার কিছু নেই। ভুলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। এ সব শাস্ত্রীয় নির্দেশ। সংকটের সময় কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে পারা জরুরী। নিষ্ঠুর হলে যে সেটা নিতে না পারে, তাকে পরে পস্তাতে হয়। কথাগুলো আমার কানে কানে কে শুনিয়ে গেল।

মাদ্রী তেরো বছর আগে সহমৃতা হয়েছিল। হঠাৎ সে কথাটা মনে হওয়ার তাৎপর্য কি? বারণাবতে বাস করার সঙ্গে তো তার কোন যোগসূত্র নেই। এতে ঘটনা থাকতে সেই কথাটা মনে এল কেন? এর তো একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। সেই সূত্রটা কি? হয়তো মনই এরকম কোন নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে বলছে আমাকে।

কোন পথ ধরে অদৃষ্ট নিঃশব্দে মানুষের হাত ধরে গন্তব্যস্থানে পৌছে দেয় মানুষ নিজেও তা জানে না। আমার ক্ষেত্রেও অদৃষ্ট এল এক নিষাদ রমণীর রূপ ধরে। পাঁচ পুত্র নিয়ে নিষাদ রমণী রোজই জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে যায়। রোজ দেখা হয়। তবু ওর কথাটা মনে হয়নি কখনো। ছাদ থেকে নিচের দিকে তাকাতে ওকে দেখলাম পাঁচ পুত্রের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমি মাতা পুত্রদের দেখছিলাম না। দেখছি, আমার চোখের উপর জতুগৃহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সারা গায়ে আগুন মেখে নিষাদ রমণী পাঁচ পুত্রের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। তাদের কালো রঙ পোড়া কয়লায় মতো কালো থেকে কালো হয়ে যাচ্ছে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে। মাথার মধ্যে আমার বিদ্যুৎ খেলে গেল। পৃথিবীর আর কোন রমণী এবং পুত্রকে নয়, ঐ নিষাদ রমণী এবং তার পাঁচ পুত্রকে আমি চাই পুরোপুরি চাই!

এসব সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার পথে আমার মেধা বিদ্যুতের মতো জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। এক নিষ্ঠুর আনন্দে, অমানবিক নৃশংসতায় আমার ভেতরটা নেচে উঠল। পান্ডবদের জীবিত থাকা নিয়ে বিভ্রান্তির এক সুন্দব নাটক তৈরী হয় এদের দিয়ে। ভস্মীভূত জতুগৃহের ভস্মস্তূপ থেকে ছটি

দগ্ধ বিকৃত দেহ উদ্ধার হলে লোকে জানবে পাণ্ডবেরা আর জীবিত নেই। দুর্যোধন নিন্দিত হবে; ধৃতরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হবে। পিতৃব্য ভীষ্মের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের কৌশলটি কেন্দ্রচ্যুত হবে। এক লহমায় এত সব কথা মনে হলো। পরিচারিকা পাঠিয়ে নিষাদ রমণীকে ডেকে আনি।

গড় হয়ে প্রণাম করে বললঃ মা, আমায় ডেকেছ? কিছু আদেশ করবে?

নিরাবেগ চিত্তে বললামঃ হাঁ বাছা। পাঁচপুত্রদের সঙ্গে যখন জঙ্গলে যাও তখন তোমার মধ্যে আমি নিজেকে দেখি। তোমার পাঁচ পুত্র পঞ্চপাণ্ডব হয়ে যায়।

মার অশেষ কৃপা। কার সাথে কার তুলনা করছ?

কাল, ছেলেদের নিয়ে তুমি আমার এখানে রাতে খাবে এবং থাকবে।

কেন মা?

ব্রত পালনের নিয়ম। যে রমণী পাঁচ পুত্রের জননী হয় এই ব্রতে সন্তানদের সঙ্গে তাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে এবং তাদের সঙ্গে একরাত কাটাতে হয়। তাই আর কি?

মা, এত আমাদের পরম সৌভাগ্য। ছেলেরা শুনলে আনন্দে আটখানা হবে।

খুশি হয়ে ও চলে গেল। আমার খুব ভালো লাগতে থাকে। নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে এরকম এত তীব্র আনন্দ লুকানো আছে জানতাম না। আমার অধরে বঙ্কিম হাসি ফুটল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলি, যাদের নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তাদের জন্যে অনেক নিরীহ মানুষের আত্মবলি দিতে হয়। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। সব যুগেই সাধারণ নাগরিকের রক্তে লেখা হয় ইতিহাস স্রষ্টার বিজয় কাহিনী। এই নিষাদ রমণীর আত্মাহুতি পান্ডবদের বিজয়কাহিনীর পৃষ্ঠায় তেমনি জ্বল জ্বল করবে অনন্তকাল ধরে।

মানুষ তার সব ব্যাপারেই একটা অলৌকিক কিছু আশা করতে ভালোবাসে। মনে মনে আশার একটা সৌধও গড়ে তোলে। কিন্তু কোন কারণে সে সৌধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেলে অনেকে অদৃষ্টের লিখন বলে সহজে মানিয়ে নেয়। কিন্তু যারা তা পারে না, পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করে চলতে চায় তাদের হয় যত বিপদ। তারা নিজেকেও ক্ষমা করে না, পারিপার্শ্বিককেও না। এর ফলে শুরু হয় তার জীবনে এক নতুন সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষ নিজের সঙ্গে নিজের যেমন, আবার নিজের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর এক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পারিপার্শ্বিক যখন তার উপর প্রতিশোধ নিতে আসে তখন সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কখনও ধ্বংস হয়ে যায়, কখনও কখনও ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ী আসন রেখে যায়? কিন্তু সে জন্যে যে মূল্য দিতে হয় তাকে তা সইবার মতো শক্তি, সামর্থ্য মনোবল ক'জনের আছে? ইতিহাস কতটুকু তার দাম দেয় কে জানে? তার যা দাম মানুষের সংসারই দেয়। কবিই কেবল তার জন্য গর্ব অনুভব করে, সমবেদনা দেখাতে দু'ফোটা দুফোঁটা চোখের জলও ফেলে। কাব্যের পাতায় এক ফোঁটা চোখের জলের এই মূল্য কি কম!

বুকে প্রতিহিংসা, মনে অধিকার পুনরুদ্ধারের শপথ নিয়ে আমি পুত্রদের হাত ধরে মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিতপথ চলে গেছে সেইপথে অবিরাম এগিয়ে চলেছি আলোকিত প্রান্তরের দিকে। বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে আমাদের কিছু নেই। আমরা আমাদের যাত্রাপথে এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীদল।

দিনের পর দিন পুত্রদের নিয়ে চলেছি। নিয়তির এক অমোঘ আকর্ষণে।

কী ভালোই না লাগছিল। বনভূমি জুড়ে আছে কত অবাক বিস্ময়। কত শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য অনাঘ্রাত অশ্রুত অদেখা। এর আগেও বনভূমি দেখেছি—এতবার করে আর এতরকম করে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে দেখেছি—তবুও আশ মেটে না চোখের। বড় নতুন আর অচেনা মনে হয়।

হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে উঠি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। নিবিড় ঝোপ-ঝাড়ের লতাপাতায় জড়াজড়ির মধ্যে এসে দাঁড়াল একপাল হরিণ। অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ আর নবাগত অতিথিদের অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তারপর কি ভেবে চকিতে সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্যে দৌড়ে চলে গেল।

এক জায়গায় আমরা অধিকদিন কাটাইনি। নবাগতদের সম্পর্কে কোন আগ্রহ, কৌতূহল কিংবা সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার আগেই স্থান ত্যাগ করে চলেছি। যাযাবরের মতো এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় গেছি। ফলে, অল্প সময়ের ভেতর কত জায়গা, কত নগর, রাজধানী, গ্রাম, অরণ্য আমরা ঘুরে ফেলেছি। মাঝে মাঝে ছেলেদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়। তাদের কোনো ভবিষ্যৎ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি না। মন খারাপ হয়ে যায়। আমার মন্দ কপালের জন্যে ওদের কত দুর্ভোগ! অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গভীর দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল তা গভীর হতাশায় মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয়। তবে কি হেরে যাওয়াই আমার অদৃষ্টের লিখন?

পর্বতের চড়াই উতরাই ভেঙে ত্রিগর্ত দেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে যেন বাজখাই গলায় হেঁকে বললঃ দাঁড়াও পাণ্ডু মহিষী। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কোথায় চলেছে তোমরা?

বুনো মহিষের মতো বলিষ্ঠ দুই পায়ের প্রবল চাপে জঙ্গল মাড়িয়ে নির্ভয়ে পঞ্চপাণ্ডবের সামনে দাঁড়াল। মিশকালো গায়ের রঙ। শালতরুর মতো যেমন দীর্ঘ তেমনি পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারা। কোথাও এতটুকু বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েনি। কালো পাথর কুঁদে কুঁদে তৈরী যেন বলদর্পী মানুষটি। পাথরের একটা চাঙরার উপর পা রেখে পঞ্চপাণ্ডবকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আত্মপরিচয় দিয়ে দর্পভরে বলল, আমি এই অরণ্যের আধিপতি হিড়িম্ব। ভীম-অর্জুনকে ভালোভাবেই চিনি। একলব্যের গুরুদক্ষিণা অনুষ্ঠানে তোমাদের দেখেছি। চিনতে ভুল করার মতো দুর্বল স্মৃতি আমার নয়।

হিড়িম্বার কথা শুনে আমার ভেতরটা চমকে গেল। যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, কণ্ঠস্বরে সব সাহসটুকু উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বলিঃ বাছা, তুমি ভুল করছ। আমরা তীর্থযাত্রী। মানুষের আদলে মানুষ হয় বৈকি!

হিড়িম্ব আমার কপট অভিনয়ে অখুশি হয়ে রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বললঃ ও রত্ন লুকোনোর নয়। জঙ্গলের মানুষের চোখ বাঘের মতো। শিকার চিনতে ভুল করে না।

ভয়ে বুক কাঁপছিল। পাছে আমাদের পরিচয় জেনে ফেলে তাই কাকুতি-মিনতি করে বললামঃ বাছা! আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলব কোন দুঃখে? তুমি যাদের নাম করলে এ তল্লাটে ও নামে কেউ আছে বলে শুনিনি। ওরা বুঝি খুব খারাপ লোক? ওরা কারা বাপু।

হিড়িম্ব মুখ বিকৃত করে মূলোর মতো দুপাটি সাদা দাঁত বের করে ভেংচিকেটে বললঃ ন্যাকা! দুর্যোধনকে বোকা বানানো যায়, কিন্তু আমাকে যায় না। জতুগৃহে তোমরা কেউ পুড়ে মরনি। কিন্তু ভস্মস্তূপে ছটি মানুষের পোড়া শব এল কোথা থেকে? কাজটা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেই করেছ। কিন্তু লোকগুলো নিশ্চয়ই খেতে না পাওয়া নিষাদ, শবর পরিবারের কেউ?

হিড়িম্বর কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেল। ভয়ে হতভম্ব হয়ে ভীমের দিকে তাকাই। ওকে আমার বড় ভয়। অল্পে মাথা গরম করে বসে। চোখের ইশারায় শান্ত সংযত হতে বলি। বিপদে কখনো অবি-বিচলিত হই না। শান্ত এবং সতর্ক থাকার এক আশ্চর্য সংযম আমাকে অন্য মানুষ করে দেয়।

হিড়িম্ব রুক্ষ গলায় বললঃ তোমরা বিদেশী। বহিরাগত। আমার রাজ্যে অবাঞ্ছিত অতিথি। তোমাদের কার্যকলাপ সন্দেহজনক। উদ্দেশ্যে তোমাদের ভালো নয়। তোমরা আমার বন্দী।

যুধিষ্ঠির অবাক গলায় বললঃ আমাদের অপরাধ। সহায়হীন, সম্বলহীন, আশ্রয়হীন সামান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে তো আপনার মতো বীর পুঙ্গবের ভয় পাওয়ার কথা নয়। আমরা বন্দী হলে আপনার অপযশ হবে। কয়েকজন পরিব্রাজককে যে ভয় পায় তার মতো ভীরু দুর্বল কেউ হয় না। শত্রুরা একথা জানলে আপনার সমূহ ক্ষতি হবে। আপনার দুর্বলতা জানাজানি হয়ে যাবে। একজন নিঃস্বার্থ হিতার্থীর মতো একথাগুলো বলা কি খুব দোষের?

হিড়িম্ব জোর দিয়ে বললঃ তোমরা পরিব্রাজক নও। নতুন কোন রাজনৈতিক আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়েছ।

যুধিষ্ঠির বললঃ রাজা আপদ্‌কালে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। মিথ্যে সন্দেহ করে আপনি নিজের ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। এতে আপনারই ক্ষতি। আমাদের কিছু নেই, শত্রু ভেবে হত্যা করলে কিছুই হারাব না। কিন্তু আপনি হারাবেন বিশ্বাস, আনুগত্য, নিরাপত্তা।

হিড়িম্ব বললঃ তোমার কথাগুলো যুধিষ্ঠিরের মতো।

রাজা, সন্দেহ একবার হলে যায় না সহজে।

যুধিষ্ঠিরের কথার ভেতরে বললামঃ তর্ক করে লাভ নেই। আমাদের বন্দী করলে যদি নিরাপদ মনে হয়, তাহলে বন্দী করুন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। চলতে চলতে হঠাৎ এ কোন বাধা পথ আগলে দাঁড়াল। এমনই এক বাধা যে, মনে হলো সামনে চলার পথ বুঝি নেই। আমরা ঠিক বন্দীর মতো ছিলাম না। নজরবন্দী হয়েছিলাম। পালানোর পথ খোলা ছিল না। ভগিনী হিড়িম্বার উপর দেখাশোনার ভার ছিল। ভীমকে তার ভালো লেগে গেল। ভীমকে প্রেমাস্পদ করে একান্ত নিজের করে পেতে চাইল। মনে হলো মুক্তি যেন হিড়িম্বাররূপ ধরে এসেছে। তাকে কোনভাবেই ফিরিয়ে দেয়া চলবে না। সকলের কথা ভেবেই হিড়িম্বার প্রণয় স্বীকার করে নিল ভীম। হিড়িম্বা ও ভীমের প্রণয়টা গোপন রইল না। হিড়িম্ব চায় না ভগিনীর সঙ্গে ভীম মেলামেশা করুক। ভীমকে হত্যা করার জন্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। সেই ভয়ঙ্কর দ্বৈতযুদ্ধে হিড়িম্ব প্রাণ হারাল। হিড়িম্বর রাজ্য সম্পদ ঐশ্বর্য আমাদের হলো। আশ্রয়হীন, সহায়হীন পান্ডবেরা পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মাটি পেল। স্বজনহীনতার অভাব দূর হলো। নতুন বান্ধব পেল। লোকবল বাহুবল, লাভ হলো।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আটকা পড়ে থাকব বলে তো পথে বেরোয়নি। জীবনের কোন একটা মানে যদি থাকে তো সে মানেটা হলো হস্তিনাপুরে নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করা। প্রতিশোধ নেয়া। এই পরিপূর্ণতা পাওয়াটাই আমার আসল পাওয়া। কিন্তু যা পেলাম তা যত নগণ্য হোক না কেন, তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। জীবনের কোন পাওয়াটাই ছোট নয়। ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিয়ে দিয়ে তাকে বধূর মর্যাদা দিয়ে অনার্যকুলের চিত্ত জয় করে নিলাম। অরণ্য আমার নিরাপদ আশ্রয় হলো। সহায় হলো। হিড়িম্বাকে তার ভ্রাতার রাজ্যের অধিশ্বরী করে দিয়ে আবার পাঁচ পুত্রের হাত ধরে পথ চলা শুরু হলো।

কিন্তু কোথায় বা যাবে? আমার তো কোন ঘর নেই, আশ্রয় নেই। ভাবলে, সারা পৃথিবীটাই আমার ঘর। আমার সংসার। আমি এর সম্রাজ্ঞী। এ দুনিয়ার কত অসংখ্য মানুষের জীবন দেখতে পেয়েছি। আমার এই এক জীবনের উপর কত অসংখ্য মানুষের জীবনের যে ছায়া পড়েছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এক এক সময় ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের রাজ্য হস্তিনাপুর ত্যাগ করেছিলাম, যে স্বপ্ন নিয়ে বারণাবতের জতুগৃহে নিষাদ রমণী সহ পাঁচ পুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছি, সে উদ্দেশ্য কী সার্থক হয়েছে? এক চক্রানগরীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে পড়ে থাকার জন্যে কি আমি এত কষ্ট স্বীকার করছি? নিঃসহায় দরিদ্র, মানুষগুলোর দুঃখ সংকট প্রতিকারের জন্যে যে পান্ডবেরা এত করল তারা কি তাদের দাবি পুরণের যোগ্য হয়েছে? পান্ডবদের কোন কাজে লাগবে কি তারা?

এই প্রশ্নটা আমার কাছে খুব বড় হলো। কারণ তখনও আমার চোখের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। শুধু ছিল একটা অতীত। সে অতীতটা ছিল এত ভয়ানক যে তা স্মরণ করতেও লজ্জা হতো, ঘেন্না করত। পায়ের তলা থেকে মাটিটা পর্যন্ত সরে গেছল। হতাশায়, ব্যর্থতায় আত্মঘাতী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বুকে আশার দীপটা মিট মিট করে জ্বলছিল। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি ভবিষ্যৎ তারই থাকে যার আশা থাকে। এখনও আমি আশা করি, স্বপ্ন দেখি। প্রবল প্রতাপান্বিত রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব এবং বকের মতো আরো যারা আছে তাদের দমন পীড়ন, শোষণ অত্যাচার থেকে অগণিত সাধাবণ মানুষদের উদ্ধার করতে গিয়ে যদি একের পর এক তাদের রাজ্যগুলি

দখল করি তা-হলে ঐসব মুক্ত মানুষদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং আনুগত্য সহজেই আমরা পাব। এভাবেই একদিন অরণ্য অধ্যুষিত বিশাল দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হয়ে হস্তিনাপুর অভিযান করা আমার কোন আকাশ কুসুম কল্পনা নয়।

কিন্তু তবু কেমন যেন নিজের শক্তির উপর সন্দেহ হয়। আর সেই সময় একজন পুরনো মানুষের মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনি মহর্ষি দ্বৈপায়ন। হস্তিনাপুর তাঁর শরীরের রক্তের মতো প্রিয় ছিল। একচক্রানগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তখন বাস করছি। হঠাৎ মহর্ষি সেখানে উপস্থিত হলেন। সংকটে পড়ে যখনই এই অদ্ভুত মানুষটার অভাব বোধ করি, ভীষণভাবে চিন্তা করি ঠিক তখনই এসে উপস্থিত হন। কী করে যে আমার মনের কথাটা টের পান তিনিই জানেন।

অবাক মুগ্ধতায় তাঁর স্বপ্নালু দুই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ে। অভিভূত গলায় বলিঃ আমাকে বাঁচালেন মহর্ষি। ক' দিন ধরে শুধু আপনার কথাই ভাবছি। কিছু ভালো লাগছেনা। বড় দিশেহারা লাগছে। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

মহর্ষি বললেনঃ কল্যাণী! তুমি যেভাবে চলেছ তা ঠিক হচ্ছে না। পথের কী শেষ আছে জননী? সারা জীবন ধরে চললেও পথ শেষ হয় না। তোমার লক্ষ্যহীন চলার কোন দাম নেই। তুমি উদ্যমের অপচয় করছ। আত্মপ্রকাশ ভয়ে ভীত সঙ্কুচিত বলেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছ না। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-সংকটের প্রতিকার করে বড় জোর একজন মহামানব হওয়া যায় কিন্তু রাজনীতিক হওয়া যায় না। যে কোন ঐশ্বর্যে, সম্পদে, সমৃদ্ধশালী শক্তিশালী বৃহৎ রাজ্যের রাজনৈতিক সহায়তা এবং আশ্রয় ছাড়া তোমারা কোন কালে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। ছ'মাস ধরে বনে বনে ঘুরে নিজেদের পরিচয় গোপন করে—কী পেয়েছে? যা দিয়ে তোমরা প্রতিশোধ নিতে পার? একটা হিড়িম্ব, একটা বক রাক্ষসকে হত্যা করে হস্তিনাপুরে পৌছতে অনন্তকাল লেগে যাবে। কিন্তু রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের মূল্য কি? তারা তোমাকে কি দিতে পারে? এসব বিচার করে দেখার সময় হয়েছে। সময়ের বৃথা অপব্যয় অনেক হয়েছে। এবার কী করলে রাজনৈতিক ফয়দা তোলা যায় তার কোন ভাবনা মাথায় আছে? তোমাদের কার্যকলাপে বিদুরও বিরক্ত এবং চিন্তিত। বিদুর তোমাদের সব খবরই রাখে। গোপনে তোমাদের নিরাপত্তার উপর নজরও রেখেছে সে।

বিদূরের কথায় এই বয়সেও লজ্জায় মুখ রাঙা হলো। সত্যি এই মানুষটার কাছে পান্ডবদের চেয়ে প্রিয়তর আর কিছু নেই। তার শরীরের রক্তের মতোই প্রিয় তারা। নিজের চিত্ত চাঞ্চল্য সামালে নিতে কয়েকটা মুহূর্তে চুপ করে থাকি। আঙ্গুল দিয়ে কাপড়ের প্রান্ত জড়াতে জড়াতে বলিঃ কী যে করতে চাই, ভালো করে জানি না। দুরন্ত অস্থিরতায় আমি দিশেহারা। আপনি বলে দিন কী করলে ভালো হয়? জ্ঞান হওয়া থেকে সংগ্রাম করছি। সে সংগ্রাম এখনও পর্যন্ত থেমে নেই। বারে বারে সংগ্রামকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর একটা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি। সংগ্রাম তো শুধু বাইরের সঙ্গে হয় না। নিজের সঙ্গে এবং চারপাশের জগতের সঙ্গে অহরহ সংগ্রামে সত্যিই ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত। শুধু হেরে যেতে চাই না। বলেই নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছি। বড় একা লাগে।

দ্বৈপায়নের অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেনঃ তোমার মতো মানুষদের হয়তো সে অর্থে কেউই থাকে না। কেউ থাকার জন্যে তোমার মতো মানুষদের হয়তো জন্মই হয় না। কেউ যদি থাকে তা-হলে মানুষের মুক্তি, নিজের মুক্তি কী করে আসবে? কী করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হয় তোমার সে রকম যদি কেউ থাকত তা হলে পৃথিবীর চলার গতি স্তব্ধ হতো।

লজ্জা পেয়ে বলিঃ অমন করে বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। সত্যি আমার কেউ নেই একথা ভাবতেও ভয় করে। আমি একা কোথায়? এইতো আপনি আছেন, দেবর বিদুর ছায়ার মতো আছে, পুত্রেরা আছে বলেই তো মনে জোর পাই, বুকে ভরসা পাই। নইলে, আমার সাধ্য কী এত বড় একটা প্রতিশোধ একা একা নেয়ার। বরং বলা ভালো একটা বিরাট অন্যায়, অধর্মের প্রতিবাদ করার জন্য আমরা সবাই এক মঞ্চে মিলিত হয়েছি। সেই তো আমাদের শক্তি।

মহর্ষির মুখে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি। দুই চোখের নিবিড় চাহনিতে এমন একটা বিভোর বিহ্বলতা ছিল যে তাঁর মুখের এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। মৃদুস্বরে বললঃ শোন কল্যাণী, অনার্য রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করে তুমি যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কৌশল নিয়েছ তা বাস্তবোচিত হয়নি। দূরদর্শিতার অভাব হেতু পরে জটিলতা উদ্ভব হবে। তুমি তো জান সুর লোকের দেবতারা এবং আর্যাবর্তের আর্যরা এদেশের অধিবাসী অনার্য রাজন্যবর্গকে প্রীতির চোখে দেখে না। তাদের সঙ্গে এদের উভয়ের বৈরীতার সম্পর্ক। এ অবস্থার তাদের নিয়ে কিছু করতে চেষ্টা করলে এক মহা অনর্থের সুত্রপাত হবে। অকারণ রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনায় আসমুদ্র ভারতভূমি উত্তাল হয়ে উঠবে। তাতে অনার্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরাও বিপন্ন বোধ করবে। এই আত্মঘাতী মৈত্রী বন্ধন থেকে অচিরে তোমাদের সরে আসা দরকার।

আমার মাথা বন বন করে ঘুরতে লাগল। ভেতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাঁর দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে থেকে বলিঃ মহর্ষি, সে কথা যে একবারও ভাবিনি তা নয়। কিন্তু নিঃসহায় পান্ডবদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ ছাড়া কিবা করতে পারে তারা?

মহর্ষির অধরে স্মিত হাসি। দুচোখের তারায় রহস্যের দ্যুতি উজ্জ্বল করল তাঁর মুখমণ্ডল। স্নেহ মধুর কণ্ঠে বললঃ কিন্তু মা, গোড়ায় গলদ করে বসে আছ। পাঁচপুত্র সহ নিষাদ রমণীকে পুড়িয়ে মেরে আত্মগোপনের যে ধাপ্পাটা তোমরা দিলে তা খুব কাঁচা কাজ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের লোকের চোখে তোমরা মৃত। কিন্তু তোমরা যে সত্যি তা নও, এই কথাটা প্রমাণ করা এবং তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা খুব শক্ত কাজ। মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি আগেও করেছ তুমি। এবারেও করলে! কিন্তু এবার জেতাটা খুব কঠিন। জতুগৃহ দাহে তোমরা কেউ মারা যাওনি একথাটা প্রমাণ করার কোন উপায় চিন্তা করেছ?

বিব্রতবোধ করি। জবাব দেবার মতো উত্তর খুঁজে পাই না। হঠাৎই কথাটা কে যেন যুগিয়ে দিল আমার মুখে। বললামঃ মহর্ষি! সত্যিই কিছু ভাবিনি। সমস্যা যিনি সৃষ্টি করেছেন, উদ্ধারের রাস্তা তিনিই দেখবেন। আমি তো নিমিত্ত। এখন মনে হচ্ছে পরিত্রাতার রূপ ধরে আপনি এসেছেন আমাকে পথ দেখাতে।

দ্বৈপায়ন সহসা হেসে ফেললেন। রসিকতা করে বললেনঃ তোমার উদ্ধার কর্তাই বোধহয় মৃতকে জীবিত করার এক আশ্চর্য কৌশল তোমার অগোচরেই ছকে রেখেছেন অনেক কাল আগে। কবে জান? মহারাজ দ্রুপদকে বন্দী করে যেদিন অর্জুন আচার্য দ্রোণের গুরুদক্ষিণা দিল সেই দিনেই ছকা হয়েছিল।

বোবা বিস্ময় নিয়ে বললামঃ মহর্ষি, আপনার হেঁয়ালীর মর্মোদ্ধার করা আমার কর্ম নয়। অনুগ্রহ করে আপনি আমার কৌতুহল নিবৃত্ত করুন।

তুমি কী জান, দ্রুপদ ও দ্রোণ বন্ধু হয়েও পরস্পরের শত্রু। দ্রোণের অপমানের প্রতিশোধ নিতে দ্রুপদ তাঁর প্রিয় শিষ্যকেই দ্রোণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চান। তাই কন্যা পাঞ্চালীকে বীর্যশুল্কা করার জন্যে স্বয়ম্বর সভা করছেন। তৃতীয় পান্ডব অবশ্যই স্বয়ম্বরের প্রার্থী হবে। স্বয়ম্বর সভায় পাত্রীর স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা কিছুমাত্র নেই। বীর্যশুল্কা কন্যাকে লাভ করার জন্য অদ্ভুত পণ পূরণে যিনি সমর্থ হবেন তিনিই দ্রৌপদীর স্বামী হবেন। আশার কথা অর্জুনের কৃতিত্ব, পারদর্শিতা এবং শৌর্য বীর্যের কথা মাথায় রেখেই মহারাজ দ্রুপদ প্রতিযোগী প্রার্থীদের জন্যে এক বিশেষ ধরণের যান্ত্রিক ধনু এবং লক্ষ্যবস্তু নির্মাণ করেছেন। সভায় ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্যন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। বহুদেশের প্রতিযোগী প্রার্থীরূপে রাজপুত্র এবং নরপতি ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন, বণিক, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং শীর্ষস্থানীয়, মুনি, ঋষি এবং বহু রাজপ্রতিনিধি। অনুমান করা হচ্ছে স্বয়ম্বর সভায় একে একে প্রার্থীরা অকৃতকার্য হয়ে যখন নিজ নিজ আসনে ফিরে এসে হৈ চৈ বাঁধাবে তখন অর্জুন প্রার্থী হয়ে সভায় প্রবেশ করে লক্ষ্যভেদ করে সকলকে চমকে দেবে। তাঁদের সবার সামনে অর্জুনের এই আত্মপ্রকাশ জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যু সম্পর্কে জমানো রহস্যের যবনিকাপাত করবে। লক্ষ্যভেদের কৃতকার্যের সূত্রে তৃতীয় পাণ্ডবের কথাই সর্বাগ্রে সবার মনে হবে। জতুগৃহে

পাণ্ডবেরা যে নিহত হয়নি, তারা বেঁচে আছে এই সত্যটা সারা ভারতবর্ষের মানুষ স্বয়ম্বর সভায় জেনে যাবে। ধৃতরাষ্ট্রের লুকোচুরি করার তখন কিছু থাকবে না। তা-ছাড়া পাণ্ডবদের রহস্যময় আত্মগোপন সম্পর্কে তাঁদের মনে যে সব প্রশ্ন উদয় হবে তা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডব বিরূপতার নজির হয়ে তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। বঞ্চনা থেকে পাণ্ডবেরা মুক্ত হবে। একসঙ্গে রাজকন্যা এবং রাজত্ব পাবে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি জুটতে পারে।

মহর্ষির কথা শুনে আমি তো অবাক। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখে কোন কথা যোগাল না। আশ্চর্য লাগছিল, কোন রন্ধ্রপথ ধরে নিয়তি আসে বন্ধুরূপে মানুষ তা অনুমানও করতে পারে না। পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই নিয়তি এল দ্রৌপদীর রূপ ধরে, মহর্ষি দ্বৈপায়নের অনুকম্পার রন্ধ্র দিয়ে!

ঈশ্বর আমাকে আরো একবার নিষ্ঠুর হওয়ার শাস্তি দিল। এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা করতে আমাকে নির্দয় হতে বলল। দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রের ভার্যা হোক এরকম কোন ঘোষণা সত্যি আমি করতে চাইনি। সেরকম কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। জীবনে কিছু কিছু ঘটনা এত অতর্কিতে এবং দ্রুত ঘটে যায় যে, তার উপর মানুষের কোন হাত থাকে না। কিন্তু দোষের ভাগী তো তাকেই হতে হয়।

বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীর নিয়তি পঞ্চপাণ্ডবের রূপ ধরে আমার মুখ দিয়ে অদৃষ্টের ফরমানটা জারি করে নিল। মেয়ে মানুষের জীবনে এ যে কত বড় শাস্তি আমার চেয়ে বেশি কে তা জানে? দ্রৌপদীর জন্যে আমায় দুঃখ হয়, অনুশোচনা হয়। নিজেকে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। সত্যিই আমি ভীষণ স্বার্থপর। শুধু নিজের কথা, সন্তানদের স্বার্থের কথা ভেবেছি। দ্রৌপদীর মনের দিকে তাকাই নি। তার ইচ্ছে অনিচ্ছে কিংবা মেনে নেয়ার কথাটা একবারও মনে হয়নি। পাঁচ ভাইর প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, আনুগত্য, বিশ্বাস, সহযোগিতা, ঐক্য, সংহতির এক মালা গেঁথে দ্রৌপদীর কণ্ঠে আমি পরিয়ে দিলাম যেন। দ্রৌপদী তাদের জীবনে একমাত্র বন্ধন হয়ে রইল। সে বন্ধন কেউ এড়াতে গেলে দ্রৌপদী তাকে হাত বাড়িয়ে ডেকে নেবে। তার নিজের বন্ধনটুকু কখনও আলগা হতে দেবে না। সে আকর্ষণী ক্ষমতা তার আছে।

ঐ আকর্ষণই তার নিয়তি! তার মোহিনী আকর্ষণ যুধিষ্ঠিরের মতো জিতেন্দ্রিয় ছেলের চিত্তও বিচলিত করল। নির্লজ্জের মতো বাসনার কথা বলতে তার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপল। স্বয়ম্বর সভা থেকে ফিরে এসেই অকপটে বললঃ মা, সত্য গোপন না করে অকপটে বলছি, দ্রৌপদীতে চিত্ত আমার আসক্ত হয়েছে।

সবিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠি—যুধিষ্ঠির!

মা, জীবমাত্রই প্রবৃত্তির বশ। প্রবৃত্তিবেগের কাছে ছোট বড়, আত্মীয় ভ্রাতা, সুশ্রী, কুশ্রী, সমাজ, সংস্কৃতি, নীতি ধর্ম বলে কিছু নেই। সেখানে মানুষের পশুতে তফাৎ নেই।

ঘৃণায় আমার মন ছিঃ ছিঃ করল। পুত্রদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ও নৈতিক অধঃপতন দেখে সুদীর্ঘকালের গর্ব অহঙ্কার তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। নিজেকে বড় অসহায় লাগল। রাগে ঘেন্নায় অপমানে আমার কান্না পেল। বললামঃ তোমার কাছ থেকে এরকম জঘন্য প্রস্তাব শুনব কোনকালে প্রত্যাশা করিনি। তোমার মুখ দর্শন করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। ঘেন্নায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার চোখের সামনে থেকে দূরে হও।

মা, রাগ করে একজনকে তাড়িয়ে দেয়া সহজ, কিন্তু তাতে আত্মবিনষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবে না। জিতেন্দ্রিয় ঋষি, মুনির শরীর পর্যন্ত শাসন সংযমের বাঁধ ভেঙে বর্বর হয়ে উঠে। কাম খারাপ কিছু নয়। কাম হচ্ছে শারীরিক সুস্থতার লক্ষণ, প্রসন্ন জীবনী শক্তির উৎস। কেন জান? বিশ্বপৃথিবীর মূলে রয়েছে মিলন স্পৃহা। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনিও মিলনে উৎসুক। নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে তিনি আনন্দ রস পান করলেন! এটাই প্রকৃতির ধর্ম। পাণ্ডবেরা তো বিশ্বনিয়মের বাইরে নয়।

উদগত অভিমান বুকে নিয়ে বললামঃ পশুর কোন সমাজ নেই। সেখানে যা খুশি চলে। কিন্তু মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড় বলেই চিত্তকে সংযত রাখার জন্য নিয়ম নীতির অনুশাসনের পাকে পাকে ফেরে ফেরে নিজেকে বেঁধেছে। তা-ছাড়া, আপন ভ্রাতার জয়লব্ধা স্ত্রীকে ভোগ্য বস্তুর মতো পাঁচজনে মিলে ভোগ করার এই নির্লজ্জ বাসনা মেয়ে হয়ে আমি মেনে নিতে পারি না। শুধু তোমাদের নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে বর্বর যুগে ফিরে যাব না।

মা, পশুকে শৃঙ্খলিত করে রাখলে ক্রোধে, ক্ষোভে গজরাতে থাকে। শৃঙ্খল তাকে হিংস্র করে তোলে। মরিয়া হয়ে শিকল কেটে যেদিন বেরিয়ে পড়ে সেদিন দুর্দিন। তেমনি অতৃপ্ত বাসনা ও কামনার বিক্ষোভ পান্ডবদের স্বস্তিতে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। ঘৃণা—বিদ্বেষ, অসন্তোষ বিদ্রোহের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করবে বিরূপ হৃদয়কে। হৃদয়ের সঙ্গে ছলনা করলে মহা অনর্থ ঘটবে। পঞ্চপান্ডবের ক্ষতি হবে। আত্মক্ষয় থেকে পান্ডবদের শৌর্য বীর্য, ঐক্যকে রক্ষা করতেই একান্নভুক্ত ভাইদের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্কে অভিন্ন হওয়া দরকার।

আমি বিভ্রান্ত। দ্রৌপদীর মোহিনী আকর্ষণী শক্তি পঞ্চপান্ডবের মধ্যে যে একটি সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করবে এ কেবল তারই পূর্বাভাস। সুন্দ-উপসুন্দের অভিন্ন ভ্রাতৃপ্রেমের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। পান্ডবদের মতোই ভাগাভাগির কোন স্থান ছিল না। তিলোত্তমা তাদের জীবনে ঝড়ের বার্তা বহন করে আনল। বিবাদ বিভেদ বৈরীতায় দুই ভাই ধ্বংস হলো। সে কথা ভেবে আতঙ্কে আমার বুকে কেঁপে উঠল। স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা আমাকেও উদভ্রান্ত করল।

প্রবৃত্তিগামী পুত্রদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে ফুলের মতো নিষ্পাপ একটি মেয়ের স্বপ্ন, সুখ নষ্ট করতে পারব না। না, কিছুতেই না।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মানুষ তার নিজের মনের অয়নপথও ভালো করে চেনে না। সেখানে কতরকমের বিস্ময় যে লুকোনো আছে মানুষ নিজেই তা জানে না। জানে না বলেই কত কী আকস্মিক ভাবে ঘটে যায়। হঠাৎ ঝড়ে যেমন সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়, দ্রৌপদীকে দেখে তেমনি একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনের অভ্যন্তরে। দ্রৌপদীকে আনন্দে আবেগে বুকে টেনে নিয়ে বলিঃ তুমি রমণীর ঈর্ষার পাত্র। ভাবতে অবাক লাগে তোমাকে পাবার জন্যে দেশ দেশান্তর থেকে কত পুরুষ উন্মাদের মতো ছুটে এসেছে। না পেয়ে রাগে তরবারি খুলেছে, অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরিয়েছ। তোমাকে পেয়ে যেমন গর্ব হচ্ছে, তেমনি ভয়ও করছে। জয়ের পরের দিনগুলিতে কি ঘটবে কে জানে? তাই তো প্রশ্ন জাগে. তৃতীয় পান্ডব কাকে জয় করেছে? একটি রমণীকে, না বীরভোগ্যা রমণীকে? তুমি পান্ডবের জয়লক্ষ্মী। পান্ডবের মান, সম্মান, পৌরুষের বিজয় কেতন। পান্ডবের বিজয়ের গৌরব কোন একজনের নয়। তাতে পঞ্চপান্ডবের সমান ভাগ। পান্ডবের বিজয়লক্ষ্মীর উপরেও পঞ্চপান্ডবের সমান অধিকার, সমান দাবি। তুমি পঞ্চপান্ডবের ভার্যা!

কথাগুলো আচমকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। আমি নিজে হতচকিত হয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকি। নিজেকে ধিক্কার দিই ছিঃ! এ কী করলাম! সত্যি, আমি কিছুই করেনি। আমাকে দিয়ে কথাগুলো কে যেন বলাল।

পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে মানুষ আজ অনেক দূরে সরে এসেছে। বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক সম্পর্কের নিয়ম নীতি কঠোর করেছে। তবু কি মানুষ মেনেছে সেই অনুশাসন? স্বার্থের সংঘাতে নিজের মতো ভেঙেছে, গড়েছে। আমার বেহিসেবী অদ্ভুত একটা ঘোষণা চিরন্তন মূল্যবোধকে একটা বড় ধাক্কা দিল। তাতে মানুষের সমাজের ভূগোলটা হয়তো একটু বদলে গেলে। হয়তো সেই সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস সব কিছু বদলে গিয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সূত্রটা তাতে জটিল হলো, না সরল হলো—এ প্রশ্নের জবাব দেবে আগামীকাল। তবে নারীকে সম্পত্তির মতো ভোগ করার নিয়মের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে নারী যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হলো। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের চাকা কয়েক পাক পিছনের দিকে ঘুরে গেল। তেমনি এক উদারনীতি সহিষ্ণুতা এবং সংযমের এক নয়াদিগন্ত উন্মুক্ত করল। নারী

হলো বন্ধন এবং ঐক্য সংহতির প্রতীক চিহ্ন। সংসারে ভাবপ্রবণতার সত্যি কোন দাম নেই। সংস্কার নিছকই বিলাসিতা যতক্ষণ মন সংস্কারকে প্রাধান্য দেবে ততক্ষণ জীবনের কোন উন্নতি নেই। জীবনের কারবার বাস্তবতাকে নিয়ে। বাস্তবটাই সত্য। বাস্তব যত রূঢ় হোক তাকে ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। মন দিয়ে অনুভব করে তাকে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর হয়।

পান্ডবদের জীবন বাগিচার সেই সুন্দর ফুল দ্রৌপদী। পান্ডবদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী। তার জন্যেই পান্ডবেরা আজ একা নয়। নির্বান্ধব নয়। একসঙ্গে তারা রাজকন্যা এবং রাজ্য পেয়েছে। এক বিরাট রাষ্ট্রজোটের ছত্রছায়ায় দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে। জনগণমন অধিনায়ক কৃষ্ণ হলো পান্ডব সখা। যাদবদের সঙ্গে আমার ছিন্ন আত্মীয়সম্পর্ক বহুকাল পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। দ্রৌপদী বধূ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চর্তুর্দিকে একটা মুক্তির হাওয়া বইতে লাগল। পলাতক আসামীর মতো আত্মগোপনের পর্ব শেষ, ভিক্ষুকের জীবনের অবসান। এবার পান্ডুর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং তাঁর সিংহাসনের দাবি ও অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজধানী হস্তিনাপুর ফেরার পালা। তাদের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে রাজকীয় সমারোহে আড়ম্বরে ঐতিহাসিক করতে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে রাজা দ্রুপদ এবং পান্ডব সখা কৃষ্ণ করেনি এমন কাজ নেই। পাঞ্চাল রাজা ও যাদব সাম্রাজ্যের সম্মিলিত যুক্ত চতুরঙ্গ বাহিনী এবং বহু ছোট বড় সামন্তরাজা, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, রাজ-প্রতিনিধি সহ ভারত নায়ক কৃষ্ণ ও বলরাম পান্ডবদের হস্তিনাপুর যাত্রার সাথী হলো।

সর্বাগ্রে আমার বিজয় রথ। কী ভালো যে লাগছিল। সত্যি, আমি এক বিশাল দুনিয়া জয় করে হস্তিনাপুর ফিরছি যেন, গর্বে আমার বুক ভরে উঠছে। মনে মনে বলছি, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।

আমার জীবনটা এক অদ্ভুত ধরনের। অদ্ভুত কারণ, জ্ঞান হওয়া থেকে জীবন যাকে শুধু বঞ্চনা করেছে, জীবনের কাছে তার আকাঙ্ক্ষা করার সত্যি কিছু থাকে না। বিধাতা যোগ-বিয়োগের ভুলে শুধু দুর্ভোগই পেলাম। সারা জীবন ধরে সংগ্রাম করেছি। সংগ্রামকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর এক সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি। তবু পালিয়ে যাইনি আত্মসমর্পণ করিনি। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে সংসারের এবং জীবনের বন্ধনের মধ্যে দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে তার মুখোমুখি হয়ে মাটি কামড়ে সংগ্রাম করেছি। এক আপোষহীন দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে বীর্যশূল্কা দ্রৌপদীকে লাভ করে মনে হলো পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সেই প্রথম পান্ডবদের ভবিষ্যৎকে চোখ ভরে দেখলাম।

কুরুরাজ্যের সীমানায় আমাদের অভ্যর্থনা করতে হাজির ছিল বিদুর। আচার্য দ্রোণ, মন্ত্রী কনিক এবং আরো অনেকে। তাদের দেখে আমার একটু আশা জাগল। মনের ভেতর জোর পেলাম। কিন্তু বুকের পাষাণ ভারটা একেবারে নেমে যায়নি। বিদুরকে দেখে ভীষণ আনন্দ হলো। কতকাল পরে তাকে দেখলামঃ চুলে পাক ধরেছে। কাঁচা পাকা গোঁফের নিচে পুরনো হাসিটা এখনও তেমনি আছে। এক উপচানো আনন্দে, এক অসহনীয় সুখবোধে ঠোঁট দুটো কথা বলার দুরন্ত আবেগ থরথর করে কেঁপে উঠল আমার। চোখেও জল এসে গেল মুহূর্তে কেমন একটা স্থবিরতার শিকার হয়ে বোবা শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি।

নানা ঘটনার উলোট পালোট স্রোতে ভেসে গিয়েছি অনেক দূরে। স্পর্শকাতর মনটা তাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। তবু জীবনের একটা স্থির প্রত্যয়ের ভূমি বরাবরই ছিল বলে তার টানেই তো এই ফিরে আসা। বিদুরও আমার প্রত্যাশা। আমার প্রতি বিদুরের টানটা আজও কি তেমন আছে? তার মতো স্বার্থপরের সঙ্গে বিদুরের মায়া কিসে? বিদুর কি আজও ভালোবাসে তাকে? বিদুর আমার জন্যে অনেক করেছে? সকলের চোখের আড়ালে আমার মত সেও কম সহ্য করেনি। কিন্তু আজ তাকে দেখার পর মনে হচ্ছে আমি বোধহয় তার অভাব, শূন্যতা সইতে পারব না। বিদুরকে সত্যি আমার কিছু দেয়া হয়নি। তার কাছ থেকে স্বার্থপরের মতো শুধু দু'হাত পেতে নিয়েছি। মানুষটার

জন্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। এক অজানা স্পন্দনে আমার হৃৎপিন্ড আন্দোলিত হচ্ছিল। কিছু শিহরণ আমি টের পাচ্ছিলাম, যা দৈনন্দিন নয়, স্বাভাবিক নয়।

পান্ডবদের নিয়ে হস্তিনাপুরে এক নতুন নাটক হলো। নাটকে কোন সংঘাত নেই। কিন্তু একটা তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। হস্তিনাপুরে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রত্যাখ্যানের, অপমানের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনায় মন তোলপাড় করেছে। কত উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা এবং প্রতিকার সম্পর্কে কত রকমের কৌশল নিয়ে চিন্তা করেছি। কী আশ্চর্য! হস্তিনাপুরে পা দিয়ে তার কিছুই করতে হলো না। আমার সারা পথের উত্তেজনার উত্তাপের উপর ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্য ভীষ্ম যে এভাবে জল ঢেলে দেবে কল্পনাও করিনি। মুখে তাঁরা কিছু বললেন না। এমন ভাব দেখানো হলো যেন কিছু হয়নি। সেইজন্য একটা তীব্র সন্দেহে বুকটা উথাল-পাথাল করতে লাগল। এই নীরবতা বিশ্রী ঠেকল। একটুও স্বাভাবিক মনে হল না, ঝড় ওঠার আগে চরাচর জুড়ে যেমন থমথমে স্তব্ধতা বিরাজ করে, এও তেমনি। তবে কি ঝড় উঠবে? সংঘাত বাঁধবে? অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল!

তবে ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্য ভীষ্ম কী ভয় পেল? হবেও বা। তাঁর মুখে চোখে কেমন একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের ভাব ফুটে উঠেছিল। ওঁদের দিকে তাকালেই ভেতরের মন্দ অভিপ্রায়টা টের পাওয়া যায় যেন। তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার দিনগুলো কাটতে লাগল। বেশ বুঝতে পারি আমাদের কোনরকম পাত্তা না দিয়ে নীরবে উপেক্ষা করার কৌশল নিয়েছেন ওঁরা। বুক জুড়ে খই ফোটার মতো রাগ আর আক্রোশের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কিছুই চিন্তা করতে পারছি না, উচিত অনুচিত বোধও লুপ্ত হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্যর মতলব কী? তাঁরা কী চান? বুকের মধ্যে অভিমানের তুফান উঠতে চাইছিল। জোর করেই চাপা দিলাম সেটা। জটিল মন নিয়ে সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকি। চারদিকে ছোট মনের, ছোট, স্বার্থের মানুষ জনের অহরহ করিতে আচমকা পিতৃব্য ভীষ্মকে খুব বেশি করে মনে পড়তে লাগল।

মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পরে মেরুদন্ডহীন কৌরববংশের প্রকৃত কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভীষ্ম। বিচিত্রবীর্যের মতো ধৃতরাষ্ট্রও নামমাত্র সম্রাট। দুর্যোধনও নামে যুবরাজ। কিন্তু সব কর্তৃত্ব, নিয়ম নীতি প্রণয়ন এবং তার বিধিবদ্ধ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা ভীষ্মকে করতে হয়। কার্যত তিনি হস্তিনাপুরের সব, কৌরববংশের প্রাণভোমরা। এই মানুষটাই সব শাসন ক্ষমতা আগলে রয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবে পান্ডবেরা ততদিন হস্তিনাপুবের অধিকার পাবে না! একথাটার মতোই সত্য কৌরববংশকে ধ্বংস করার জন্য মনে মনে ছক করছেন তিনি। ভীষ্মের বুকে যে আগুন জ্বলছে সে আগুন থেকে কৌরববংশের ধ্বংসকে আটকানো যাবে না।

কারণ মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়নি। নিজের বঞ্চনার উপশম ঘটানোর জন্যেও কিছু করা হয়নি। আবার পিতার কাছে সত্যভঙ্গ না করেও কৌরববংশকে শৌর্য-বীর্য দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেও যে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া যায় তার এক পরিকল্পনা তাঁর মনে রূপ নিচ্ছিল। নব্বই বছর পরে আচমকা তাঁর মনের সেই বিচিত্র অয়ন পথটি উপলব্ধি করলাম হঠাৎ। আত্মহননকারী প্রতিজ্ঞার প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। নীরবতাকে নিজের পিতৃবংশ কুরুবংশকে সমূলে ধ্বংস করার এক অস্ত্র করেছেন। শত্রুতা করার কী ভয়ঙ্কর ক্ষমতা নীরবতার। নীরবতা মানে সম্মতি নয়; অসম্মতিও নয়, দুর্বলতা কিংবা বীর্যহীনতা নয়, বিরোধিতাও নয়, কারো পক্ষে বিপক্ষে যাওয়া বোঝায় না—অথচ কত সহজে সবাইকে খুশী রাখা যায়, সন্তুষ্ট করা যায়, নিজের অভিপ্রায়কে অন্যের কাছ থেকে গোপন না করা এবং আড়াল করার এমন ছদ্মবেশও হয় না। কোন আঘাত-ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে শত্রুকে এবং মূল লক্ষ্যকে নিঃশব্দে আঘাত হানার এমন মারাত্মক কূট অস্ত্র বিশ্বে আর নেই। বিনা রক্তপাতে, সংঘর্ষ না বাঁধিয়ে শত্রুকে পঙ্গু এবং অসহায় করে তোলার এমন কূটযুদ্ধ বোধ হয় রাজনীতিতে আর দ্বিতীয় নেই। কুরুবংশের উপর ভীষ্মের

আক্রোশ, রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, তাঁর মনের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ নিচ্ছিল। নীরবতা তার ভূমিকা।

দাবানলের আগুন ছোট্ট নদীর বাধা ডিঙিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আর আমি সেই ধ্বংস যজ্ঞ ও আসন্ন মৃত্যুর মাঝখানে নিশ্চল হয়ে দেখতে পাচ্ছি নব্বই বছর আগের বহু ঘটনার মধ্যে ভীষ্মের ভয়ঙ্কর নীরবতা ও কূটকৌশল কী করে কুরুবংশের মৃত্যু ঘন্টা বাজাচ্ছিল।

কী শতশৃঙ্গ পর্বত; কী স্বয়ম্বর সভা থেকে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তনকে ভীষ্ম নীরবে শুধু অনুমোদন করলেন না, নিঃশব্দে স্বাগত জানালেনও। ভীষ্মের নীরবতার জন্যেই ধৃতরাষ্ট্র কার্যত তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রেরা পাণ্ডবদের উপর যে অবিচার এবং অন্যায় করেছে প্রীতি দিয়ে পিতৃব্য তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর পাণ্ডবপ্রীতি ধার্তরাষ্ট্রদের আশাহত করেছে, তাদের অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বেলেছে। বিদ্বেষ বিষে নীল হয়ে গেছে তাদের সারা শরীর। ফলে কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোত কৌরববংশের আয়ু ও স্বাস্থ্য অনেক দিন ধরে ভিতরে ভিতরে ঘুণ পোকার মতো খেয়ে নিচ্ছিল।

ভীষ্ম তার কোন প্রতিকার করেনি। বরং তাদের দ্বন্দ্ব বিরোধ, রেষারেষিকে এক অনিবার্য সংঘর্ষে প্ররোচিত করে কুরুবংশের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর হাতেই সব রাষ্ট্র ক্ষমতা। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশেই চলে এসেছে। তবু ভীষ্মের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, ভীষ্ম নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা যদি গ্রহণ না করত তা-হলে কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদ বাঁধত না। কৌরববংশের ধ্বংস হওয়ার জমি তৈরী হতো না। আজ মনে হচ্ছে, শান্তনুর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে, দ্বৈপায়নের উপর জ্বালা ভরা আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্যে, সত্যবতীর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করার প্রয়াসে, জননী গঙ্গার নিদারুণ লাঞ্ছনা অপমানের এবং নিজের বঞ্চনার প্রতিহিংসা নিতেই কৌশলে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের ছোট ছোট বিবাদ-কলহ, স্বার্থবিরোধ, ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত, ভাই-ভাইর সংঘর্ষ, শরীকিয়ানা রেষারেষিকে প্রশ্রয় দিয়ে এক আত্মঘাতী সংঘর্ষের মদত ভীষ্মই দিয়েছেন। বাইরে থেকে তা টের পাওয়ার উপায় ছিল না। এই বিবাদকে নিঃশব্দে শুধু বাড়তে দিলেন না বিদ্বেষ বিষ থেকে জন্মানো ধ্বংসের বিষবৃক্ষের চারাগাছটি সযত্নে হস্তিনাপুরের রোপন করলেন। গোপনে তার নিয়মিত পরিচর্যাও করেছেন তিনি। কিন্তু এই নীরব ভূমিকাটির কোন দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপল না।

ভাবতে অবাক লাগে, কী আশ্চর্য কৌশলে সকলের অগোচরে ধার্তরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবদের দিয়ে নিজের বংশ কুরুবংশের ধ্বংসের মৃত্যু ঘন্টা বাজাতে সক্ষম হলেন। এই অদ্ভুত কূট কৌশলটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সর্বদা মৌন থেকেছেন। পাণ্ডবদের উপর ধার্তরাষ্ট্রদের অবিচার, অত্যাচারের কোন প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ না করে সর্বদা নির্বিকার থেকেছেন, তাঁর ঔদাসীন্য ধার্তরাষ্ট্রদের পাণ্ডব বৈরীতার ইন্ধন যুগিয়েছে। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অর্থহীন সহৃদয়তা এবং সমবেদনা তাদের কোন উপকার করেনি। বরং ধার্তরাষ্ট্রদের অন্তরে ঈর্ষা বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দিয়েছে। উভয়ের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বকে উস্কে দিয়েছে। মনোমালিন্য ও পারস্পরিক রেষারেষিকে তীব্র করেছে। কারণ, কুরুবংশের ধ্বংস করতে হলে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া দরকার।

সংঘর্ষ! সংঘর্ষের কথা মনে হতে আমি সহসা চমকে উঠলাম। বোধ হয় সংঘর্ষের সেই ছবি ভীষ্ম দেখতে পেয়েছিলেন পাঞ্চাল এবং যাদবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তনের ভেতর। কারণ, তাদের সঙ্গে জোট বাঁধায় পাণ্ডবদের শক্তি আরো বেড়ে গেল। হস্তিনাপুরের তোয়াক্কা না করেই পাণ্ডবেরা রাজনৈতিক জোটে যোগ দিয়ে আগেই তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করে ফেলেছে। সিংহাসন এবং রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী চিন্তা করেই পাণ্ডবেরা নিঃশব্দে তাদের ঘর গুছিয়েছে। হস্তিনাপুরের সঙ্গে যুদ্ধের মহড়া দিতে যে, তারা সক্ষম এই সত্যটুকু জানান দেবার জন্যেই কুরুবংশের প্রবল প্রতিপক্ষ পাঞ্চাল এবং যাদব প্রধানদের সঙ্গে একত্রে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছে। এঁদের সমর্থন এবং সহযোগিতা যে বাস্তব বা মিথ্যে কিছু নয় সেজন্যে সশরীরে তাদের হাজির করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। কৃষ্ণের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভীষ্মের মাথার মধ্যে সার্বিক ধ্বংসের রণদামামা বাজতে লাগল। দুর্যোধন বিচলিত। ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিত। এরকম একটা সন্ধিক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন দীর্ঘকাল। মনের কোণে লুকনো কৌরববংশ ধ্বংসের সংঘাতের বীজ বপন করার জন্যেই পাণ্ডবদের দাবিও অধিকার মেনে নিয়ে কুরুরাজ্য ভেঙে দু'খণ্ড করে তার অখণ্ডতা, শক্তি ও ঐক্যের উপর একটা বড় রকমের আঘাত হানলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জমি শুধু তৈরী হলো না, ধ্বংসের একটা অধ্যায় সমাপ্ত হলো। আমারও বিজয় সমাপ্ত হলো। একটানা দীর্ঘ সংগ্রামের উপর যবনিকা পড়ল।

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের নূতন রাজ্যপাট শুরু হলো। পুত্রেরা এখন নতুন রাজ্য এবং প্রশাসন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাদের চোখে এক পরিচ্ছন্ন রাজ্য গড়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের আমি কেউ নই। আমার কাজ শেষ। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ আমার ভূমিকা নিয়েছে। আমার ছুটি। সত্যিই আমার আর কোন কাজ নেই। দায়িত্ব, ভাবনা কিছু নেই। আমি এখন একা। একেবারেই একা। এক নিঃসঙ্গতাবোধ জন্ম নেয় আমার ভেতর। একা বলে পারিপার্শ্বিককে বড় বেশী করে অনুভব করি। সামান্য ঘটনাও অসামান্য হয়ে যায়। নির্জনতায় আমার চারদিকে ছায়াগুলি যেন বড় নিবিড় হয়ে উঠে। তারা যেন কিছু বলছে, কিছু প্রকাশ করতে চাইছে। কখনও বা আমি ছায়াদের সঙ্গে একা একা কথা বলছি। আসলে, এসবই আমার অন্তরের এক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু এসব হওয়ার কথা নয়। ইন্দ্রপ্রস্থের চতুর্দিকে খুশির হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সুখ, শান্তি প্রীতি, মমতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ভালোবাসা সব আছে। তবু কী একটা তীব্র অভাব কুড়ে কুড়ে খায় আমাকে। বুকের মধ্যে উথলে ওঠার ভাব হয়। তখন কিছু ভালো লাগে না। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির সত্যি কোন মানে নেই। তবু মনের মন যখন তার উপর দখল নেয় তখন সত্যি কিছু করার থাকে না তার। তখন সমৃদ্ধ মনেও সন্দেহ জাগে, এই পৃথিবীতে আমরা পরস্পরের কতটা আপনজন? অধিকাংশ সম্পর্কই বড় পলকা। হয়তো বা কৃত্রিম, বড় বেশি স্বার্থসম্পৃক্ত।

মনটা এখন যে জায়গায় আটকে গেছে, তা আমি খুব গভীরভাবে টের পাই। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নে মন ভারাক্রান্ত হয়। বড় অভিমান হয়। আমার উপর কারোর দাবি নেই আর। আমারও বোধ হয় দাবি করার নেই, এ সংসারে কোন মানুষের উপর। পুত্রদের এখন নিজের নিজের সংসার, স্ত্রী, পুত্র আছে। দায়িত্ব কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী মনটির অবসর নেই মায়ের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করার। আগের মতো তারা আর নেই। বড় দূর হয়ে গেছে যেন। বুকটা ভীষণ খালি লাগে। তাদের সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে তাদেরও সেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

কাছের মানুষ বলতে একজনও নেই। মানুষের সমস্ত সম্পর্ক বোধ হয় স্বার্থের। কেবল জন্মদাত্রী মায়ের কোন স্বার্থ নেই। সন্তানকে শুধু সন্তান হওয়ার সুখে, আনন্দে, ভালোবাসে। তার মঙ্গল চায়। বদলে কিছুমাত্র চায় না। শুধু দিয়ে ভরে উঠতে চায়। দেয়ার পাত্রটি যদি না থাকে তা-হলে দেবেটা কোথায়? অতৃপ্তি তাই মনটাকে কুড়ে কুড়ে খায়। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে মুক্তি বলে যাকে জানলাম, সে হলো জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধন। সেই বাঁধনে দড়ির চাপে, রক্ত চলার প্রতিবন্ধকতায়, দাঁত টিপে কষ্ট সহ্য করার চেষ্টায় সমস্ত সত্তা আমার লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে যেন। বাকি জীবনটা নিজের মনের কারাগারে এমন করে রুদ্ধ হয়ে কাটাতে হবে হয়তো।

অনেক ক্লান্তি অনেক গ্লানি জমেছে দেহে ও মনে। এবার কোনও মস্ত গভীর মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমোব, লম্বা ঘুম। কোনও কাজ নেই। জীবনে এরকম কোনও যতির বোধ হয় খুব প্রয়োজন থাকে। একটানা এই দীর্ঘ-পথচলা বড়ই ক্লান্তির, একঘেয়েমিতায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বুকের মধ্যেও বড় কষ্ট হয়। মনটা হু-হু করে।

জীবন অনেক বড় এবং জটিল। জীবনের কাছে সত্যি যে কী চাই আমি, নিজেও ভালো করে জানি না। মাঝে মাঝে চাওয়াটা প্রত্যাশাটা আকাশে উঠে যায়। মুগ্ধকরা কত সব আশ্চর্য ছবি ক্রমান্বয়ে ফুটে উঠে। ফুলের গন্ধের মতনই ভালো মানুষেরর মনের গন্ধও আপনিই ছড়িয়ে যায় মনের অভ্যন্তরে। তখন কী যে ভালো লাগে।

জীবন কী বিচিত্র! ঘটনার কী আকস্মিক পরিবর্তনে মানুষ আশ্চর্যভাবে বদলে যায়। আজ আমি পুত্রদের কাছে, রাজ্যের প্রজাদের কাছে স্পর্শাতীত এক দুর্লভ আসনে সমাসীনা; মহামহিম এক দেবীমূর্তির মতো পান্ডু মহিষী সম্রাজ্ঞী কুন্তী। আমি আর কারো নিকটবর্তী হতে পারি না। আমাকে সত্যি যদি কেউ বুঝত তা-হলে এমন যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পেতে হতো না। জীবন ভোর জেতার জন্যে অনেক অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি। পরিবারের লোকজনের কাছেও হয়তো অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। কিন্তু যাই করে থাকি না কেন, নিজের জন্যে নয় আমার ভালোবাসা জনদেরই জন্যে করেছি।

আজ নিজেই আমার বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানেই আমি বন্দী। হয় তো এ আমার কর্মফল। আমার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত তো একজন মানুষ এভাবেই করে। স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে যে মনটি পতিত হয়ে যায় তাকে আবার স্বস্থানে স্থাপন করাই প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আত্মনির্মাণ হয় না। এই নির্মাণের জন্যে দুঃখকে যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করে উত্তরণ খোঁজার জন্য। মনের আর্তিই মানস মুক্তির সুর হয়ে বুকের গভীরে দুঃখ ও আনন্দের সঙ্গে মিলে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি অতৃপ্তির ভেলায় ভেসে কোন দেবলোকের দিকে যেন নিয়ে যায়। গভীর ভালো লাগার সঙ্গে এক ধরনের খারাপ লাগাও মিশে থাকে। সেই ক্ষণটুকুই বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। এই আনন্দ ও বিষণ্ণতার কোন নাম নেই। ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার আগের এই নিঃশব্দ বিষণ্ণ বেদনাময় আর্তিই বোধ হয় ভুক্তভোগীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে থাকার দিন মাস বছরগুলো পেরোতে লাগল। দুই, চার, পাঁচ সাত বছর করে পান্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থকে গুছিয়ে নিচ্ছিল। শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থকে সাজাল। এক তিলোত্তমা হলো তাদের হাতে। আমার পুত্রেরা কাজের মানুষ। সেটাই আমার একমাত্র গর্ব। কাজ পাগল বলেই তো ইন্দ্রপ্রস্থ সকলের নয়নমনি, শত্রুর ঈর্ষাস্থল।

এইভাবে তেইশবছর কাটল। ইন্দ্রপ্রস্থ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। পুত্রেরা আগের মতো ব্যস্ত নয়। এখন তাদের অনন্ত অবকাশ। অবকাশের রন্ধ্রপথ দিয়ে পান্ডবদের নিয়তির রূপ ধরে দ্যূতক্রীড়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করল। হস্তিনাপুর থেকে একদিন তার বার্তা বহন করে আনল বিদুর।

ইন্দ্রপ্রস্থে পান্ডবদের সুখ সইল না। তাদের কপালটাই মন্দ। বনবাস অদৃষ্টের লিখন! কে ঠেকায় তাকে? নইলে, পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া করার দুর্মতি হবে কেন যুধিষ্ঠিরের? দ্যূতপণে পরাজিত হয়ে সত্যরক্ষা করতে পান্ডব মহিষী সহ পঞ্চপান্ডব বনে যাত্রা করল। যাওয়ার আগে অন্যান্য পান্ডব মহিষীরা যে যার পিত্রালয়ে গেল।

আবার আশ্রয়হীন হলাম। এমন ফাঁকা লাগছিল যেন আমি একা কোথাও দাঁড়িয়ে আছি, আশ-পাশে কেউ কোথাও নেই, কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু ধু ধু ফাঁকা স্তব্ধ নির্জন কোনো তেপান্তর আমার চারপাশে।

ইন্দ্রপ্রস্থের পাট চুকিয়ে সবাই চলে গেছে। অত বড় প্রাসাদ খাঁ খাঁ করছে। নিস্তব্ধ। থমথম করছে। চারদিকে এক অদ্ভুত শূন্যতা, আমি অন্তঃপুরের বাইরের খোলা জায়গায় বসে নিজের চোখমুখ ঢেকে মৌন হয়ে বসে আছি।

সেই সময় বিদুর এসে ডাকল! কুন্তী!

বার তিনেক ডাকল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছিল। কেমন করে বোঝাব, বিদুরের সহানুভূতি, সমবেদনা, অন্তরঙ্গতা আমাকে কিসের স্পর্শ দিচ্ছিল। তারপর আর থাকতে না পেরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলি।

পায়ে পায়ে বিদুর এগিয়ে আসছিল আমার দিকে।

বাইরের আলো যেভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ঘরের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে আলোয় ভরে দেয় তেমনি ভাবে এসেছিল। ও আমাকে দয়া করতে আসেনি। আমার সঙ্গী হতে এসেছিল, এসেছিল

সাহচর্য দিতে, বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়াতে। ও এল আমার আনন্দ হয়ে। চারপাশের মলিনতা দূর করে দিয়ে বিদুর যেন এসে বললঃ কুন্তী আর কেন? অনেক হয়েছে। এবার মায়া কাটিয়ে দ্বার খুলে বাইরে চল। দেখ কত জায়গা। পৃথিবী কত বিরাট। সেখানে কেউ আশ্রয়হীন নয়।

ওর মুখ এই কথাগুলো শোনার জন্যে হাঁ করে বসেছিলাম। বিদুর ছাড়া আর কেউ তো কুন্তীর বুকের তলায় কান পেতে অনুভব করল না, কোথায় তার ব্যথা, কত জায়গায় বেদনা, কোন্ শূন্যতা আর বেদনা তাকে এত অসহায় করে তুলেছিল। বিদূর আমার কাছে সেদিন কীভাবে দেখা দিয়েছিল সে শুধু আমি জানি।

বিদুরের ডাক শুনে, আমি নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হই। চোখ মুছতে মুছতে বলিঃ দেখ, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখছি। তোমার ডাকে ঘোর ভাঙল। আমি তো জেগে আছি। কোথায় অন্ধকার?

বিদুর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওর হাতে হাত রাখলাম। কী গরম তালু। আমার ঠাণ্ডা হাতের আঙ্গুল দিয়ে ওর উষ্ণ আঙ্গুলগুলো জড়াল। ধীরে ধীরে চাপ দিল। রক্তের উষ্ণতায় উষ্ণতায় মিলন হলো হৃদয়ের স্পন্দন। ওর মুঠোয় বন্দী হাতখানার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমরা কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। নিশ্চল হাতখানা শুধু ওর হাতে ধরা অবস্থায় ছিল। তাতেই আমার বুকের বরফ কাঠিন্য গলে যাচ্ছিল। বুক ভাসিয়ে এল করুণা, ভালোবাসা। বয়ঃসন্ধির প্রথম প্রেমের মতো সেই দুকুল ছাপানো গভীর প্রেমের সমুদ্রে অবগাহন করে সাঁতার দিতে দিতে অভিমান রুদ্ধ কণ্ঠে বলছি : দেবর, ঢেউ এসে পায়ের তলা থেকে হঠাৎ কেড়ে নিল মাটি। দমবন্ধ করা স্রোতের জলে পাক খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছিলাম। সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে মনে হচ্ছিল ঢেউয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন মানুষ। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠিকই চোরাবালি থেকে টেনে তুলে বাঁচাবে। কিন্তু কী দরকার ছিল? আমি তো ফুরিয়ে গেছি। হারিয়ে গেছি। এ সংসারে আমার কানাকাড়িও দাম নেই। আমার কী আছে যা তোমাকে দিতে পারি।

বিদুর উত্তর দিল না। হাসল। তার মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। আস্তে আস্তে বললঃ বৌঠান বেলা পড়ে আসছে। এবার তো যেতে হবে।

চোখ ভরে জল নামল আমার। কথা বলতে পারি না।

বিদুরের কাছেই আছি।

বুকটা সারাক্ষণ হু হু করে পুত্রদের জন্য। একযুগ হয়ে গেল তবু রাজ্যোদ্ধারের জন্যে কিছুই করল না। কবে কী করবে, কে জানে? দিন দিন আমিও হতাশ হয়ে পড়ছি। বাস্তবিক কেমন যেন একটা নেই নেই ভাবের মধ্যে আছি। যুধিষ্ঠিরেব নির্বুদ্ধিতাব উপর বাগ হয়। অভিমানে অনেক সময় একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

একদিন ধরা পড়ে যাই বিদুরের কাছে। স্থির দৃষ্টিতে ও দেখছিল আমাকে। ওর শান্ত স্থির অনুসন্ধানী চোখের উপর চোখ রাখতে পারি না। মুখখানা লুকোনোর জন্য নত হয়। আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরে জল মুছি। তারপর ভারি গলায় বলিঃ কিছু বলবে? ছেলেদের কোন খবর পেলে? ওরা কোথায় আছে?

বিদুর বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলে বললঃ পান্ডবেরা এখন বিরাটের গৃহে আত্মগোপন করে আছে। ওখানে বসেই রাজনৈতিক তৎপরতা সুরু করেছে।

চকিতে ভেজা চোখ দুটো উজ্জ্বল হলো। বিদুরের দিকে চেয়ে বললামঃ কী ভালো খবর যে দিলে!

বিদুর অপলক আমার মুখের দিকে চেয়েই আছে। বিষণ্ণ গলায় বললঃ তুমি কাঁদছিলে? কেঁদে কিছু হয়? তোমার দুঃখটা তাতে কমে কী? কাঁদে বোকারা।

ধরা পড়ে যাওয়ার বিব্রত ভাবটা চট করে লুকিয়ে ফেলে কপট রাগ প্রকাশ করে বললামঃ তুমি তো আমাকে শুধু কাঁদতে দেখ। কাঁদতে কেউ চায় না, তবু কান্না এসে যায়। কেন কাঁদি, কোনদিন জানতে চাওনি। আমার মনের ভার বইতে পারছি না বলে কষ্টে কাঁদি। এ কান্নাটা তোমার সৃষ্টি। তুমি দায়ী। তুমি তো আমাকে ভালবাস। পাণ্ডবেরা তো তোমারই রক্তে মাংস গড়া। এই কি স্নেহ মমতা ভালোবাসার লক্ষণ?

খুব সংশয় পূর্ণ এবং বিষণ্ণ চোখে বিদুর কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। শান্ত গলায় বললঃ তোমার অভিযোগের অর্থ বুঝলাম না।

বুঝতে চাও না বলেই পার না। কৌরব সভায় দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময় পিতৃব্যের মতো তুমিও প্রতিবাদ করনি; তোমার রহস্যময় নীরবতার অর্থ বুঝি না? তোমার এ হেন আচরণের অপমানে ভেতরটা জ্বালা করে। লজ্জায় ঘেন্নার অপমানে তোমার কাছে কথাটা উত্থাপন পর্যন্ত করিনি। কথাটা মনে হলে বুক ঠেলে কান্না আসে। পৃথিবীতে মেয়েরা বড় অসহায় জীব। স্বামী, পুত্র, কেউ তাদের নয়। তারা একা।

এ তোমার অভিমানের কথা। তুমিও জান পাণ্ডবদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তাতে মানুষের হাত থাকলেও দৈবও সমান দায়ী। দৈবই পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য, বিলাসের জীবন চায় না। ইন্দ্রপ্রস্থে তাদের সংগ্রামী চরিত্রটাই নষ্ট হতে বসেছিল। অথচ ভীষ্ম খুব প্রত্যাশা করে নিজের স্বার্থে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য দিয়ে কৌরব পাণ্ডবদের সংঘাতকে জীইয়ে রাখতে চেয়েছিল। একটা বিরাট যুদ্ধের মধ্যে তাদের টেনে আনা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা গেল, পাণ্ডবেরা যুদ্ধ চায় না। দেশের সমৃদ্ধি উন্নতিই তাদের কাম্য। তাদের সংগ্রামী চরিত্রটাই বদলে ফেলল। অপরপক্ষে জরাসন্ধের মৃত্যুতে দুর্যোধন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গকে তার রাজছত্র তলে সমবেত করতে সক্ষম হলো। দুর্যোধনের পেছনে যে রাজনৈতিক সমর্থন ছিল যুধিষ্ঠিরের তা ছিল না। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সঙ্গে সংঘাত বাঁধাতে রাজি নয় বলেই ভীষ্মের কুরুবংশ ধ্বংসের পরিকল্পনা থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্যূতক্রীড়ার পণে পরাজিত পাণ্ডব কুলবধূ দ্রৌপদী কৌরববংশ ধ্বংসের প্রলয়রূপিনী শক্তির রূপ ধরে কৌরব সভায় প্রবেশ করল যেন। বহ্নিকন্যা দ্রৌপদীর মধ্যে কৌরববংশ ধ্বংসের আগুন দেখলেন ভীষ্ম। মনে হলো, পৃথিবীতে আর কোন রমণী নয়, কেবল দ্রৌপদীর অসম্মানই পারে পাণ্ডবদের বুকে জ্ঞাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বালাতে। সেই আগুনে হস্তিনাপুরের প্রাসাদ পুড়বে, কৌরববংশ ধ্বংস হবে। তাই দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করতে নয়, অসম্মানের ইন্ধন দিতে, নিজের প্রতিহিংসাকে ত্বরান্বিত করতে কৌরবদের নিন্দনীয় আচরণের একজন দর্শক হয়ে রইলেন। তার প্রতিবাদ তো দূরের কথা দ্রৌপদীর উত্থাপিত ধর্মের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা নিয়ে এক কূট বিতর্কের অবতারণা করে কৌশলে নিজের দায় এবং কর্তব্য এড়ালেন। পঞ্চপাণ্ডবকে অভিযুক্ত করে তাদের নিভন্ত আগুনে ক্রোধের বাতাস দিলেন। ভীষ্ম তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে টের পেয়েছিলেন, দ্রৌপদীর এই অপমানই পাণ্ডবেরা কোনদিন ভুলবে না, দ্রৌপদী তাদের ভুলে থাকতে দেবে না। তাই কৌরবদের দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দিয়ে কুরুবংশের সার্বিক ধ্বংসের এক ক্ষেত্রে প্রস্তুত করলেন। এ তো আর বাইরে থেকে দেখার জিনিস নয়, বোঝার ব্যাপার। তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পেরেই আমিও ঘটনার প্রশ্রয় দিয়েছি।

কষ্টের হাসি ফুটল আমার অধরে। ঘৃণায়, ক্রোধে, অপমানে বঙ্কিম হলো সে হাসি। থমথমে বিষণ্ণ গলায় বললামঃ চমৎকার যুক্তি।

বিদুর একটু অপ্রস্তুত হলো। থম থমে গম্ভীর গলায় বলল, বৌঠান বড় দুঃখ, বড় ত্যাগ ছাড়া বড় কিছু অর্জন করা যায় না। মাকেও অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তান জন্ম দিতে হয়।

আরো একবার বলি চমৎকার। সারাজীবন ধরে আমাকে আর আমার পুত্রদের এক অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। কত দুখে, কষ্ট তারা পেয়েছে, কত স্বার্থ ত্যাগ করেছে তবু হস্তিনাপুরের ভীষ্মের মনের মতো মানুষ হতে পারেনি। তাদের কাছে হস্তিনাপুর কী প্রত্যাশা করে? হস্তিনাপুর তাদের কী দিতে পারে? পাণ্ডবেরা তো দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছিল। তারা তো একটা বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। তবু কুরুজাঙ্গালের মানুষ তাদের কথা শুনল কৈ?

বিদুর হেসে বললঃ তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। কাউকে সুখ দেয়াটা কঠিন। কিন্তু দুঃখ দেওয়া তো সহজ। তার জন্যে কষ্ট করার দরকার হয় না। পিতৃব্য ভীষ্মকে, সত্যবতীকে, আমার দুঃখ দিয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষ,। পিতৃব্য তার দায়ভাগ নিয়ে দুঃখের ভাগী করেছেন তোমাকে। তারপর তা অতিক্রম করে গেছে তোমার পুত্রদের দিকে। জীবনকে কেন্দ্র করে এই দুঃখে আবর্তিত হতে শুরু করেছে যেসব মানুষ, নিয়তির অন্ধ আঘাতে তারা কে কোথায় ছিটকে যাবে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে কেউ জানে না। ইতিহাসের রথচক্রতলে আমরা শুধু নিষ্পেষিত এবং ছিন্নভিন্ন হতে আছি। এভাবেই মানুষের নতুন ইতিহাস সূচনা হয় নিঃশব্দে, তা না হলে কৌরববংশের স্তম্ভ পিতৃব্য ভীষ্ম নিজের বংশের উপর নৃশংস প্রতিশোধ নিতে এত নির্দয় হবেন কেন? তাঁর বুকের গভীরে প্রতিহিংসা নিঃশব্দে আর্তনাদ করে মরছে।

বুকের গভীর থেকে সহসা একটা গভীর দুঃখ, বিষণ্ণ আর্তি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ল। নিজের মনেই বিলাপ করে বললঃ হায়রে মানুষের স্বপ্ন! কত আশা করেই না মানুষ সংসার গড়ে আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত নিপুণভাবেই সেই সংসার এবং আশার সৌধ ভেঙে দেয়। পিতৃব্য ভীষ্ম পিতৃ-পিতামহের সেই স্বপ্নের রাজ্য হস্তিনাপুরকে শৌর্যবীর্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশাল কুরুজাঙ্গালকে এমন করে বিশ্বাসঘাতকের মতো ভাঙবেন, ধ্বংস করবেন, কেউ কল্পনা করেছিল? দেবর, সংসারে এমন ঘটনা কেন ঘটে।

আমার জীবনের ইতিহাস যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে এখন অনেকদূর সরে এসেছি। হঠাৎ অদৃষ্টের অমোঘ নিয়মে জীবন সায়াহ্নে যদি ফিরতে হয় সেখানে, তার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। অনেক কিছুই বদলে গেছে। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। তবু কৃষ্ণ সব হিসেব গোলমাল করে দিল। তার কথায় যে যুক্তিই থাক না কেন, জীবনের ছকের খুব একটা হেরফের হয় না। কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হবে! পাপই বটে! কত পাপ করেছি এক জীবনে। মানুষ হয়ে জন্মানোটাই আমার পাপ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় পাপ করেছি কর্ণের কাছে। লোকলজ্জায় একদিন যাকে বিসর্জন দিয়েছি, আজ সব লাজ-ভয় জয় করে জননীর অধিকারে সন্তান বলে তাকে দাবি করতে হবে। সেই প্রার্থনা নিয়ে তার কাছে গেলাম দীন ভিক্ষুকিনীর মতো।

সে এক আশ্চর্য সকাল।

আকাশ থেকে সূর্যোদয়ের স্নিগ্ধ আলোর রশ্মি পড়েছে কর্ণের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর। কী অসাধারণ সুন্দর লাগছে তাকে! চক্ষুমুদিত কর্ণের ধ্যান সমাহিত শান্ত, সৌম্য মূর্তির অপরূপ কান্তির দিকে বিমোহিত হয়ে চেয়ে আছি। এই প্রথম তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে নয়নভরে দেখছি। দেখে গর্ব হলো আনন্দ হলো। এক তীব্র ভালো লাগার আবেশ চোখে লেগে রইল।

ও আমার দেহ, মান প্রাণ আত্মা থেকে জাত কিন্তু আমাব কেউ নয়। জননীর কোন কর্তব্য করেনি। কোন অধিকারে তাকে নিজের বলে দাবি করব? তবু কী আশ্চর্য! আত্মজার আবেগে বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল না। আসলে, তার সঙ্গে পুত্রের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি বলেই বোধহয় আমার সমস্ত আবেগ দিয়ে তাকে অনুভব করার মতো কোন অনুভূতি হলো না। পুত্র বলে মনে করলেই সে পুত্র, যদি 'না' ভাবি তবে কেউ নয়। এমন একটা সম্পর্কশূন্য, আবেগশূন্য, অনাত্মীয় মানুষের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে বোধহয় কোন লজ্জাই থাকে না। কিন্তু জননীর আত্মসম্মান জ্ঞান, বিশ্বস্ততার কী হবে? ভিক্ষে চাওয়া আর নিজের অধিকারে কিছু দাবি করা তো এক নয়। ভিক্ষুকের কোন অধিকার নেই, চেয়ে না পাওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কোন লজ্জা বা অপমান নেই। প্রার্থনার জন্য তাকে কোন দাবি কিংবা তিরস্কার শুনতে হয় না। কিন্তু আমি তো তার কাছে ভিক্ষুকের মতো আসেনি, এসেছি আমার অনেক দাবি, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। সে অধিকারকে কেউ যদি না বলে ফিরিয়ে দিয়ে অপমান করে তা-হলে সইতে পারব না, অথচ সেরকম একটা আশঙ্কা নিয়ে কর্ণের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

অনন্ত সময় বয়ে যায়। অবশেষে কর্ণ চোখ মেলল। দেখা হলো। অবাক মুগ্ধ চোখে পুত্র দেখছে তার জন্মদাত্রীকে, আমি দেখছি আত্মজাকে। কতকাল পরে দেখছি। আর মনে মনে ভাবছি, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত চির অভাগা কর্ণকে কোন প্রাণে জননী হয়ে ঠকাব আজ। জননীর পবিত্রতা নোংরা হয়ে যাবে, পৃথিবীর কোন জননী সন্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, হীন প্রতারণাও করেনি কোনদিন। পৃথিবীর সব জননী যেন আঙুল উঁচিয়ে তাকে তিরস্কার করছে। ছিঃ ছিঃ করছে। মাথার ভেতরটা আমার ঘুরতে লাগল। ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হতে লাগল অপরাধবোধে। ইচ্ছে করল কর্ণের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাই দূরে কোথাও।

মস্তিষ্কের মধ্যে আলোড়িত হতে লাগল কৃষ্ণের কথাগুলো। জীবনে যা কিছুই ঘটে তা নিজ কৃতকর্মের ফল। তা থেকে তো পালিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না। এক জীবনে তো কত ঘটনাই ঘটে। তার সব কিছুর জন্যে একজন মানুষ দায়ী না হতে পারে, তবু তার দায় বহন করতে হয় তাকে একা। তার ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, পারা-না-পারা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামানো কিংবা দুঃখিত হওয়ার মতো কিছু নেই। কারণ, যা ঘটার তা তো ঘটবেই। এটাই বাস্তব এবং একান্ত সত্য।

এরকম একটা সংকোচ, সংশয়ে যখন ঘেমে উঠেছি তখন দীপ্ত হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে কর্ণ বিনম্র কণ্ঠে ডাকলঃ জননী, কে তুমি?

বিব্রত লজ্জায় অস্ফুট স্বরে বলিঃ পুত্র, কুন্তী আমি?

চমকানো বিস্ময়ে কর্ণ আর্তকণ্ঠে বললঃ তুমি অর্জুন জননী!

আমি জননী তোমার।

চমৎকার! ও শব্দ উচ্চারণ কর না তুমি। তোমার মুখে জননী কথা মানায় না দেবী। তুমি এক দায়িত্বজ্ঞানহীনা নারী শুধু। সন্তানের চেয়ে নিজের লজ্জা, অপমান পাপ গোপন করা বড় যার কাছে, সে কি জননী হতে পারে? শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান জননীর কোল। তার বিশ্বাসের আশ্রয়, বড় নিশ্চিন্ত, নিরাপদ বিশ্রামের জায়গা। সে আশ্রয় থেকে তাকে যে বঞ্চিত করে সে জননী কখনো নয়।

পুত্র তোমার তিরস্কার আমার প্রাপ্য। আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে শুচি হতে এসেছি। অভিযোগ, অভিমানের বিষ উগরে দিয়ে তুমিও নির্বিষ হও। পুত্র, কোন দাবি নিয়ে আসেনি আমি। একান্ত দীনা জননীর মতো ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে করুণা পেতে এসেছি।

মানুষের করুণার যার জীবন ধন্য, সে করবে করুণা তোমায়। তোমার করুণা পেলে যে মানুষ হয়ে উঠত, তোমার নির্দয় অকরুণ অবহেলা দিয়ে তার হৃদয়কে পাথর করে দিলে কেন?

পুত্র!

দেবী, পৃথিবীর কোন মানুষকে তোমার পাপের কথা জানাতে চাও না বলে লোকালয়ের বাইরে নির্জন নদীতীরে প্রত্যূষে একাকী এসেছ। ধিক ধিক তোমাকে। জননী বলে ডাকতে আমার ঘেন্না করছে। তোমার গর্ভে জন্ম হওয়ার কলঙ্ক, লজ্জা অপমান আত্মগ্লানিতে বুক আমার পুড়ে যাচ্ছে। আমার সামনে থেকে দূর হও। হে ঈশ্বর। আমাকে তুমি অন্ধ করে দাও, বধির করে দাও!

বসুসেন!

চমকে তাকাল কর্ণ! হাসল এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে। বললঃ আমার কবচ কুণ্ডলের মধ্যে লুকোনো জন্মপত্রে ঐ নাম শুধু জননী রাধা আর পিতা অধিরথ জানে। আমার সঙ্গে তোমার নাড়ীর সম্পর্ক বোঝাতেই ঐ নাম ধরে ডাকলে। আশ্চর্য তোমার অভিনয় প্রতিভা! দেবী, জীবন-নাটকের এই চরম আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করার কোন দরকার আছে কি? নীচ স্বার্থপর বলেই নিষ্পাপ শিশুকে মুছে ফেলতে ভয়ঙ্কর অশ্বনদীর উত্তাল স্রোতে মঞ্জুষায় ভাসিয়ে দিয়েছিলে তাকে। একটু মমতা হলো না তোমার! এ কী জননীর কাজ! মাতৃকুলের কলঙ্ক তুমি। করুণা করব তোমায়?

আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম ঃ বসুসেন! তুমি কী আমার শুধু তিরস্কার করবে।

দেবী, তোমার পাপের কথা বলে আমার সমবেদনা, সহানুভূতি আদায় করতে এক নতুন নাটক করছ তুমি।

সমস্ত আবহাওয়াটা নিথর স্তব্ধতার থম থম করছে। সময় কোথা দিয়ে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কেউ টের পাইনি। অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে কাঁদছি। ভালো-মন্দর বিচার করার ভার অনির্দেশ এক মহাকালের কাছে দিয়ে আমরা দুজনা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

সময়ের গতি দুরন্ত। অদ্ভুত মানুষের মন, আর অদ্ভুত সেই মনের গতি সেই মনটা কাউকে আঘাত করে, দুঃখ দিয়ে শান্তি পায় না, আবার তাকে স্বস্তিতেও থাকতে দেয় না! দুঃখে, বেদনায় ক্লান্ত হয় না। বরং খুঁজে বেড়ায় নিজের ভেতর নিজেকে, তার আত্মাকে। তাকে সে দেখতে পায় না কখনও। তবু সেই এসে মনের হাল ধরে।

কী যেন ঘটে গেল কর্ণের বুকের ভেতর। আস্তে আস্তে স্বগতোক্তি করে বললঃ দেবী, পৃথিবীতে কর্ণের মতো মানুষদের হয়তো সত্যিই কেউ থাকে না। কেউ থাকার জন্যে কর্ণের মতো মানুষদের হয়তো জন্মই হয় না। কেউ যদি থাকবে তা-হলে স্বার্থপর মানুষদের, পাপ, অন্যায় অপরাধের বিষ গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হবে কে? মনের কারাগারে বন্দী মানুষকে মুক্তি দেবে কে? কী করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? আমি শুধু মহাকালের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হতে এসেছি। বল দেবী, তোমার জন্যে কী করতে পারি?

অগ্রজ পুত্র তুমি।

দেবী, এমন সুন্দর সকালে কোন স্বার্থে চেনাতে এলে আমাকে।

পুত্র, সব তিরস্কার, অপমান সহ্য করে আমি তোমাকে ফেরাতে এসেছি।

সেই এলে দেরী, বড় দেবী করে এলে। এখন এ ফেরার কোন মানে হয় না।

সব কিছুর একটা সময় থাকে। সেই সময় না হলে মানুষ শত চেষ্টা করে কিছু করতে পারে না। তুমি চাইলেই কি, বসন্তের ফুল শরতে ফোটাতে পার? বিধাতাও পারে না।

হাসল কর্ণ! বললঃ ঋতুর ফুল ঋতুতে ফোটে ঠিক। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তার ভেতরে ফুল ফোটানোর আয়োজন চলে নিঃশব্দে। তারপর একদিন কলি হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সন্তান সম্পর্ক স্বীকার করার জন্যে জননী হয়ে তুমি কী করেছ? দেবী বড় স্বার্থপরের মতো এসেছ।

অভিমানী পুত্র আমার! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর পঞ্চ-পান্ডবেরে—

জ্বালাভরা দুই চোখে কর্ণের কী ঘৃণা! বললঃ ক্ষমা! মুখের ক্ষমাই কী ক্ষমা! ক্ষমা চাইলেই কী ক্ষমা করা যায়? হাজার অপরাধের পরে যে ক্ষমা চায় তার ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব কিংবা অনুতাপ নেই তেমনি তাকে ক্ষমা করার ভেতরও কোন উদারতা কিংবা মহত্ত্ব কিছু নেই। পঞ্চপান্ডব কে আমার? তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? বিনিসূতোর মালার মতো পলকা একটা সম্পর্কের জন্যে কোন কিছু ত্যাগ করা যায়? মনকে দেখানোর কোন আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতে কত ঘৃণা করি তাদের। এটা জানার মতো যদি মন থাকত তা-হলে অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে আসতে না। দেবী কর্ণকে ফেরাতে আসনি, কপটতা করে পঞ্চপান্ডবের জীবিত থাকার প্রতিশ্রুতি চাইতে এসেছ। কর্ণ যে বঞ্চিত, সেই বঞ্চিত থাকছে। বড় হৃদয়হীন নিষ্ঠুর তুমি।

বৎস, অভিমানে অন্ধ তুমি। তাই আমার হৃদয়খানি দেখতে পাচ্ছ না। তোমার সব রাগ, ঘেন্না, ঝগড়া তো আমার সঙ্গে। আমাকে যত পার ঘেন্না কর। কিন্তু পঞ্চপান্ডবের সঙ্গে তো তোমার কোন বিবাদ নেই।

দেবী, শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের মতো জননীর ভূমিকায় অভিনয় করে আমায় ঠকাচ্ছ। শুধু পঞ্চপান্ডবের জীবনের নিরাপত্তা চাও? কর্ণ তোমার কেউ নয়, তার বাঁচা মরা নিয়ে তোমার কোন উদ্বেগ নেই, দুর্ভাবনাও না। বড় স্বার্থপর তুমি। হাত পেতে শুধু নিতেই এসেছ, দিতে আসনি। তোমার মতো গর্ভধারিণীর সন্তানেরা পৃথিবীতে বড় হতাভাগা।

ওরে অভিমানী তোকে আমি নিতে এসেছি তৃষিত বক্ষের মাঝে। সর্বাগ্রজ তুই!

এতকাল পরে জানলে! এতদিন তৃষিত বক্ষে কেন জায়গা হয় নি—তার জবাব দেবে কি জননী? দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপরীক্ষার রণভূমিতে পাছে অর্জুনের বীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, তাই সংজ্ঞা হারা হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত করলে। তুমি ভুললেও আমি ভুলেনি। কর্ণ চিরদিনই অবহেলার

পাত্র। তবু তুমি জননী আমার। বড় আশা করে এসেছ। বিমুখ করব না তোমায়। তুমি চিরকাল পঞ্চপুত্রের জননী থাকবে।

কর্ণের প্রতিশ্রুতি মিথ্যে হয়নি। আমি পঞ্চপুত্রের জননী আছি। তার প্রার্থনা আমাকে অপ্রস্তুত করল। মায়ের কাছে সন্তানের কত দীন প্রার্থনা! "দেবী আমার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না কর্ণ যখন থাকবে না তখন শুধু তাকে তোমার বলে ভেব একটু। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল তার জন্য, তা-হলেই তার মায়ের ভালোবাসা পাওয়া হবে।"

হতভাগা কর্ণের প্রাণহীন দেহের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি। চোখ দুটো বিষণ্ণ বেদনায় ছোট হয়ে এল। তবু চোখ ফেটে এক ফোঁটা জলও পড়ল না। এ এক রহস্য। বড় অদ্ভুত জটিল রহস্য। কর্ণের সঙ্গে আমার পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি বলেই আত্মীয় বন্ধন বড় শিথিল ছিল। তার মৃত্যুতে সৌজন্যমূলক একটা শোকভাবে আমার ভেতরটা ভীষণ মৌন, গম্ভীর এবং বিষাদে ভরে ছিল। একটা গভীর থমথমে শোকের ভাব আমার চোখে মুখে লেগে রইল।

হায় রে কপাল! তবু পাষাণ চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জলও গড়াল না। কিন্তু তার মৃত্যুটা আমার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে এক খণ্ড পাথরের মতো ঝুলে রইল।

কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল কর্ণের দীন আর্তি, মানব জন্মের তীব্র ব্যাকুলতা। মাগো জীবনের বড় কোন মর্ম যেখানে নেই, সেই জীবন তো বহন করা যায় না। আমার বঞ্চিত, অবহেলিত, ব্যথিত জীবনের কত জায়গায় কত দুঃখ, বেদনা, দৈন্য, হাহাকার, শূন্যতা তা বোঝার মতো তোমার সে মন কোথায়? তাই যখন আমি থাকব না, আমাকে ছোঁয়ারও যখন সাধ্য থাকবে না, আমার বিরুদ্ধে যখন আর কারো নালিশ থাকবে না; রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা থাকবে না, মাতৃস্নেহের অবহেলায় যখন তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকব, তখন তাকে একটু করুণা কর। তোমার পুত্র বলে ভেব। বেঁচে থেকে যে মায়ের আদর, মমতা, স্নেহ ভালোবাসা পেল না, মরণে তার সব সুধাটুকু চোখের জলে বুক নিঙরে দিও তাকে। তোমার বুকে সাগর হয়ে যেন মিশে যাই।। তখন আর আমার কোন কষ্ট থাকবে না।"

আর থাকতে পারলাম না। দীর্ঘ তপ্ত মাতৃত্বের শুষ্ক মরুভূমিতে প্রথম বৃষ্টি নামল। বুক ভাসিয়ে এল কান্না, করুণা, মায়া, ভালোবাসা। আমার সব লজ্জা, দ্বিধা, সংকোচ ভেসে গেল অশ্রুর সাগরে। কর্ণের দেহে সত্যিই সাগর হয়ে মিশে গেলাম। কী সুখে ভরে যাচ্ছিল ভেতরটা। বললাম, পুত্র আমার। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তোর অভাগিনী কুমারী জননীকে!

এখনও আমরা প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি। দীর্ঘকাল ধরে আমি তার প্রতীক্ষা করছি। প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত ভীষণ অপবিত্র লাগছে। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করব বলেই তো বনভূমিতে এসেছি। সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে এসেছি। বিদুর পারেনি। আত্মগ্লানিতে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ওভাবে আমি হেরে যেতে চাই না নিজের কাছে। মৃত্যু দিয়ে তো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। স্বেচ্ছা মৃত্যু মানেই জীবনের উপর ছেদ টেনে দেয়া। আমার অস্তিত্বকে স্বেচ্ছায় মুছে ফেলতে চাই না। এরকম আত্মহননের পেছনে কোন আদর্শ নেই, নীতি নেই। পলাতকী মনোবৃত্তি নিয়ে মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বাঁচার জন্যে আত্মহনন করে। ভালো-মন্দ যাই করে থাকি, নিজের জন্যে করেছি। তার সব দায় আমার। সে জন্যে পালানোর কী আছে! আত্মরক্ষার জন্যে পালাব, কিন্তু কৃতকর্মের দায় এড়াতে পালাব কেন? প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমি অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করব। মহাকালের রথ যতদিন না আমাকে নিতে আসবে ততদিন আমি প্রতীক্ষা করব। কান পেতে আমি তাঁর পায়ের ধ্বনি শুনছি। কী ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে মহাকাল অগ্নির রূপ ধরে আসছে, হাতে তাঁর আগুনের শিখা, গলায় আগুনের মালা, গায়ে অগ্নি বরণ বসন, কপালে আগুন রঙের টিপ

জ্বল জ্বল করছে। আমার মনের সমস্ত তারগুলি যেন তাঁর আগমনের সুরেই বাঁধা হয়ে গেছে। তাই এক আশ্চর্য সুখে দেহ মন ভরে যাচ্ছে। মহাকাল আগুনের রূপ ধরেই যেন আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছেন।

দাবানলের মধ্যে আমার জীবনের এ কোন বিশ্বরূপ দেখলাম। যেখানে বিশ্বের সব সত্য পৌঁছয়। কথাটা মনে করে আমার গায়ে কাঁটা দিল। এর আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই। যাকে আমি অতীত বলে ভেবেছি প্রকৃতপক্ষে তা অতীত হয়ে যায় নি, আমার সমস্ত ভাবনার মধ্যে অনুশোচনার মধ্যে অনুক্ষণ বর্তমান। তার তাপে আমার দেহ মন পুড়ছে সর্বক্ষণ। আগুনের মতোই তার দাহ। স্নায়ুতে স্নায়ুতে তার ভয়ঙ্কর জ্বালা আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। মনের আগুনে প্রতিদিন পুড়ে মরার চেয়ে দাবানলের আগুনে পুড়ে মরা অনেক শান্তি। নইলে, মাদ্রীর সহমরণের পাপ, নিষাদ রমণী ও তার পাঁচ পুত্রকে বারণাবতে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করার পাপ, কর্ণকে বঞ্চনা করা, প্রতারণা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? আমি সর্বক্ষণ প্রার্থনা করছি, হে রুদ্র আগুনের বেশে এসে আমাকে তুমি গ্রাস কর। আমার পাপ, অপমান, লজ্জা, গ্লানি সব পুড়িয়ে ছারখার করে দাও। তোমার পরশে আমাকে পবিত্র কর : ধন্য কর।

রুদ্র আমার প্রার্থনায় সাড়া দিতেই যেন শুকনো গাছের একটা জ্বলন্ত ডাল হয়ে কুটীরের চালে ভেঙে পড়ল। শুকনো খড়ের চাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট হলাম। এই প্রথম মৃত্যু ভয় হলো। যে ভয় সব জীবের আদিম এবং অকৃত্রিম। ঘাতকের মতো মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে জ্বলন্ত ডাল আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। পালানোর পথ বন্ধ। সারা গায়ে দুঃসহ তাপ অনুভব করছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখে বিভীষিকা দেখছি। ঘুম নামছে চোখে। মরণের ঘুম।

দ্রৌপদী চিরন্তনী



আমার দুই জ্যাঠামশাইকে
ডাঃ অমূল্যকুমার চন্দ্র
ও
সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র, অ্যাড্‌ভোকেট
শ্রীচরণকমলেষু

দৃষ্টিকোণ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়িকা দ্রৌপদীকে নিয়ে এককভাবে কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বাংলা ভাষায়। অথচ, দ্রৌপদীর নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি সকলের কৌতূহল দুর্বার। মানুষের সেই কৌতূহলিত বাসনার পটে দ্রৌপদীকে দেখতে ও দেখাতে পরিচিত পৃথিবীর বাস্তব সীমানায় তাকে হাজির করেছি। দ্রৌপদীকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি এই প্রথম।

বলাবাহুল্য, পৌরাণিক নাটকে এবং উপন্যাসে আমার খণ্ডিত দ্রৌপদীকে পেয়েছি। কাহিনীর প্রয়োজনে যে দ্রৌপদীকে পেলাম সে শুধু নির্যাতিতা অপমানিতা, লাঞ্ছিতা। আহত নারীব্যক্তিত্ব নিয়ে সে ক্রোধে প্রতিহিংসায় হিংস্র শার্দুলের মত ফুঁসছে। ফলে, দ্রৌপদী সম্পর্কে আমাদের ধারণাই অন্য। এজন্য দায়ী মহাকবি ব্যসদেব। দ্রৌপদী তাঁর প্রতিহিংসার যন্ত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে সৃষ্টি। জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মত তার রূপ। রূপের চুম্বকে বন্দী হয় সহস্র মানুষের ভাগ্য। চোখে সে শুধু কামনার দীপশিখা। তার বুকে আগুন। সে আগুনে নগর পুড়েছে, সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, পাণ্ডবেরাও নিঃশেষ হয়েছে। মহাকবির কোন সহানুভূতি সমবেদনা পায়নি দ্রৌপদী। তাঁর বিশাল মহাকাব্যে কুরুক্ষেত্রের নায়িকার নিভৃত মনের দুঃসহ অন্তর্জ্বালা ও যন্ত্রণার কোন হৃদয়গ্রাহী ছবি নেই। সেজন্য অনেক ফাঁক, অনেক ঘাটতি থেকে গেছে দ্রৌপদীর চরিত্রে। দ্রৌপদীর রক্তমাংসের মানবীতে রূপান্তরিত করার জন্য তার বুকে হৃৎপিণ্ড সংস্থাপন করতে হয়েছে। তারপরে যে পেয়েছে প্রাণের লাবণ্য। জীবনের আবেগ।

দ্রৌপদী ভারতীয় নারীর জীবন দর্পণ। ভারতবর্ষের প্রথা সংস্কার, ধর্ম এবং সমাজের, নিয়মনীতির বাঁধনে বন্দী নারীর সংস্কার, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, জ্বালা-যন্ত্রণা, চিত্তসঙ্কট, তীব্র দেহসচেতনতা, দেহমনের যন্ত্রণা, আত্মগ্লানির রহস্য, সতীত্বের ধারণা, তার দুঃসহ অসহায়তা, দেহমনের যন্ত্রণা, আত্মগ্লানির রহস্য, সতীত্বের ধারণা, তার দুঃসহ অসহায়তা, এবং প্রেম প্রতিহিংসার অব্যক্ত অনুভূতি দ্রৌপদী চরিত্রকে জটিল করেছে। ক্রোধ প্রতিহিংসার অন্তরালে তার নারী অন্তরের কান্না ও আকৃতি তার জীবন ট্রাজেডিকে করেছে করুণ।

গ্রন্থ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। দ্রুপদের স্ত্রীর নাম মহাভারতে পাইনি। তাই তাঁর নাম দিয়েছি সুদেষ্ণা। অর্জুনের বনবাসের পশ্চাতে ব্রাহ্মণের গোধন হরণের গল্প অবাস্তব বলে বর্জন করেছি। কারণ দুর্বৃত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যে বিপুল অস্ত্রের প্রয়োজন তা কখনও শয়নকক্ষে থাকা সম্ভব নয়। অর্জুনের বনগমনের উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য এই উদ্ভট গল্পের সৃষ্টি। যাই হোক, যুধিষ্ঠিরের সংলাপে তার যাত্রার কারণ ব্যক্ত হয়েছে। আবার রাজ্যের লোভে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সঙ্গে পাশা খেলতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় শকুনি যে কপটতা করেছিল তা মহাভারতে

নেই, আছে যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্যে কপটতার সেই দৃশ্য এঁকেছি উপন্যাসে।

দেবতার কোন অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিনি। তবু আমাদের ধারণায় এক স্বর্গলোক এবং দেবতা আছে। চরিত্রদের কথাবার্তায় সেই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তারা কেউ ট্র্যাডিশনাল দেবতা নয়। এরা মানুষ। হিমাচল প্রদেশে বসবাস করত বলে গবেষকদের বিশ্বাস। তাঁদের মতে, বর্তমান সাইবেরিয়া অঞ্চলে সুমের-এ বাস করতেন দেবতা নামধারী এক বিশেষ নরগোষ্ঠী। জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রযুক্তি বিদ্যায় সভ্যতায় তাঁরা উন্নত ও প্রগতিশীল ছিলেন। অর্জুন এঁদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। রাজনৈতিক কারণে তাঁরা অর্জুনকে মিত্ররূপে বরণ করে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছিলেন। সেইসব আশ্চর্য আশ্চর্য বিপুল অস্ত্র কখনই শমীবৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। পুরাণকারদের এই আজগুবী আখ্যান বর্জন করে উপন্যাসে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রভাণ্ডারের স্থান চিহ্নিতকরণের নিদর্শন হিসাবে শমীবৃক্ষকে ব্যবহার করেছি।

পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস করেছে বিরাটের গৃহে। বিরাট জেনেশুনেই তাদের রাজঅন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু রাণী সুদেষ্ণা সে কথা জানত না। কারণ, রাণীর ভাই কীচক তলে তলে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটানোর এক ষড়যন্ত্র করছিল। পাণ্ডবদের আশ্রয় দিয়ে বিরাট-রাজ সিংহাসনকে নিরাপদ করলেন। উপন্যাসে তার ইঙ্গিত দিয়েছি। এমনি করে মহাভারতের কাহিনীগুলি ভেঙেছি, গড়েছি। কিন্তু ইচ্ছাকৃত বিকৃতি করিনি। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাসূত্রের মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে যুক্তি পরম্পরায় তার স্বরূপ উন্মোচন করেছি।

আগুন! বাঁ-চা-আ-ও-অ। নারী কণ্ঠের অতি অসহায় যন্ত্রণাকাতর আর্ত চীৎকার সহসা রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করল। নিঃশ্বাসের দরজা বন্ধ করে গলনালীতে আটকে থাকা স্বর অপার বেদনায় একটানা নারী কণ্ঠ থেকে নির্গত হতে লাগল।

সেই শব্দে পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন চমকে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল।

ত্রস্তে শয্যায় উঠে বসল। উৎকর্ণ হয়ে শুনল সে অস্পষ্ট গোঙানো শব্দ। কাছেই কোথায় ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শোনা গেল। আচ্ছন্নতার ভেতর স্পষ্টত অনুভব করতে পারল, এ কণ্ঠস্বর সুদেষ্ণার। অমনি একটা তীব্র উৎকণ্ঠায় পালঙ্ক থেকে নামল। দৌড়ে সুদেষ্ণার কাছে গেল।

আসন্ন প্রসবা সুদেষ্ণা তার পাশের পালঙ্কে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু ঘুমের ভেতর অস্থিরভাবে মাথা নাড়ছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল তার। মুখের অনেকখানি চুলে ঢেকে গিয়েছিল। তবু, চোখে মুখে প্রগাঢ় যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। সুদেষ্ণার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক, চোয়াল শক্ত, বন্ধ মুখ থেকে গোঙানির মত একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ হচ্ছিল। সুদেষ্ণার অবস্থা অনুমান করতে না পেরে যজ্ঞসেন ভীষণ অসহায়বোধ করল। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে সুদেষ্ণাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার কালো চুলের ওপর মাথা রেখে কানের কাছে মুখ এনে উদ্বিগ্নস্বরে ডাকল: রাণী! রাণী! কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন? তুমি স্বপ্ন দেখেছ? কি কষ্ট হচ্ছে? কথা বল? চুপ করে থেক না। উত্তর দাও।

যজ্ঞসেনের প্রশ্ন সুদেষ্ণা স্বপ্নের ঘোরে শুনল। নিশি পাওয়ার আচ্ছন্নতা তার চোখেমুখে। ঘুমে জড়ানো ক্লান্তস্বরে বলল: দাউ দাউ করে সারা অঙ্গ জ্বলছে। ওকে বাঁচাও। ও গেলে আমি কি নিয়ে থাকব? উঃ! অস্ফুট অতি যন্ত্রণাকাতর একটা আর্তস্বর শোনা গেল তার কণ্ঠে। সুদেষ্ণার সমস্ত শরীর হঠাৎ নড়ে উঠল। চোখ খুলল। একটা ভয় ধরা আতঙ্কে যজ্ঞসেনকে জাপ্টে ধরল। যজ্ঞসেন কথা খুঁজে পেল না। অসহায় বোধ করল।

সুদেষ্ণার স্বাভাবিক হতে কিছু সময় লাগল। বিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কালো চোখের দৃষ্টিতে তার উদাস বিষণ্ণতা। বুকের ভেতর থেকে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস পড়ল। স্বপ্নে দেখা সব ঘটনা বিদ্যুৎ চমকের মত মস্তিষ্কের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল। তারপর বেশ কিছুপরে সুস্থ হয়ে বলল: আমি স্বপ্ন দেখছিলাম মহারাজ। বিশ্রী স্বপ্ন। চোখের ওপর আমার সে দৃশ্য এখনও ভাসছে। উঃ! কী ভয়ানক! বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

ভয়ে সুদেষ্ণা চোখ বুজল। বুকের কাছেও তার একটা ভীষণ কষ্ট বোধ হল। দেহটা যন্ত্রণায় মোচড় দিল। পীনোন্নত পয়োধর নম্র বুকের নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করতে লাগল। চোখে চকিত কষ্টের ছায়া ঘন হল।

যজ্ঞসেন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল।

উদ্বেগ আকুল স্বরে জিগ্যেস করল: কী স্বপ্ন দেখেছ রাণী?

সুদেষ্ণা যজ্ঞসেনের আরো ঘন হয়ে শরীরের নিচ্ছিদ্র সান্নিধ্যে এল। গাঢ় স্বরে বলল: জান, কোল আলো করা যমজ শিশু হয়েছে আমার। একটি পুত্র অপরটি কন্যা। আগুনের মত তাদের রঙ। চুলের কি বাহার! ঢেউ খেলানো কালো সমুদ্র যেন। দুজনের ভীষণ ভাব। হঠাৎ দেখলাম কন্যাটির সারা অঙ্গে আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাকে বাঁচানোর জন্য যেই ছুটে গেছি, অমনি খিল খিল করে হেসে উঠল সে। দেখতে দেখতে সে আগুনে নগর জ্বলে উঠল। প্রাসাদ পুড়তে লাগল। রাজ্যে রাজ্যে লেলিহান অগ্নির বহ্নুৎসব আরম্ভ হল। অমনি ঘুম ভেঙে গেল।

আশ্চর্য হল উগ্রসেন। এই ভীষণ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে গর্ভিনীর সন্তানের ভবিতব্যের কোন যোগ আছে কি? না, এ নিছক স্বপ্ন? ভাবী সন্তান সম্পর্কে গর্ভিনী নারীর মনে যে বহু বিচিত্র অনুভূতি

জাগে, যে ভয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়—এ কি তার অভিব্যক্তি? যজ্ঞসেনের মস্তিষ্কের অন্ধকার সীমানায় এক বিস্মিত জিজ্ঞাসা তাকে উদাস এবং অন্যমনস্ক করল।

মহারাজকে নির্বিকার দেখে সুদেষ্ণা অন্তরে একটা ভয়চকিত জিজ্ঞাসা জাগল। স্বামীর বুকের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখে রাখল সুদেষ্ণা। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কথা বলছ না। কেন?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল যজ্ঞসেন। ভুরু কুঁচকে গেল তার। কিন্তু আচ্ছন্নভাব কাটল না। অপ্রস্তুতের মত আস্তে আস্তে বলল: আমাকে বলছ?

যজ্ঞসেনের কথায় রাগ হল সুদেষ্ণার। মহারাজকে ঠেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে পালঙ্কে বসল। অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল: আশ্চর্য মানুষ বটে! ঘরে তুমি ছাড়া কে আছে আর?

যজ্ঞসেন স্বপ্নাবিষ্টের মত উচ্চারণ করল—ওঃ!

পরদিন প্রভাতে রাজ-জ্যোতিষীদের ডাকা হল। সুদেষ্ণার ভাগ্যফল বিচার করে তারা একবাক্যে বলল: মহারাণী সত্যিই যমজ জননী হবে। সন্তানদ্বয় পিতৃবৈরী নিধন করবে।

কিন্তু স্বপ্নের ঘটনা সম্পর্কে জ্যোতিষীদের কেউ কিছু বলল না। জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের নিয়ে পুনরায় সভা বসল। মহারানী সুদেষ্ণা পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করল। বহু তর্ক-বিতর্ক করে পণ্ডিতেরা একমত হয়ে বলল: নিঃসন্দেহে এ স্বপ্ন অত্যন্ত গুরুতর। সন্তান সৃষ্টিকালে জননীর কারো মন যদি অশুভ চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় তাহলে সন্তানও সে স্বভাব প্রাপ্ত হয়। জননীর মনে তার প্রবল প্রতিক্রিয়া জন্মে। সেই দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগ স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়।

সভা পণ্ডিত এক মুহূর্তের জন্য থামল। যজ্ঞসেনের মুখের ভাব বদলে গেল। তাকে অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিমর্ষ দেখাল। সুদেষ্ণা ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে তাকাল। অমনি যজ্ঞসেন অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। মিলনে সেই মুহূর্তটা তার চোখের ওপর জ্বল জ্বল করে উঠল। গভীর বিহ্বলতার মধ্যে যখন দুটি শরীর ডুবে গিয়েছিল তখন সুদেষ্ণার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল: রাণী, আমাদের এ মিলনের যে সন্তানই আসুক তারা যেন আমার প্রতিহিংসার বাসনা নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে। দ্রোণের অপমান, কুরুরাজের শত্রুতার প্রতিশোধ—বলতে বলতে দেহ বিবশ এবং নিষ্পন্দ হয়ে গিয়েছিল। মুখের কথা তার মুখেই থেকে গেল।

যজ্ঞসেনের বিহ্বল, বিভ্রান্ত চোখ দুটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুদেষ্ণা। মুখে যন্ত্রণা মেশানো আবেগ তার। কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি বলল: প্রতিহিংসার ইচ্ছা নিয়েই আমরা মিলিত হয়েছিলাম। তবে আজ নিরানন্দ কেন? আমাদের সন্তানেরও প্রতিহিংসার বাসনা নিয়ে জন্মাচ্ছে। তাহলে এত ভাবছ কেন?

যজ্ঞসেন উত্তর দিল না। কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। নিশ্চল পাষাণের মত স্তব্ধ সে। জ্যোতিবিহীন দুটি চোখ অপলক স্থির হয়ে বিদ্ধ রইল সুদেষ্ণার মুখের ওপর। সত্যিই কি নিয়তির অমোঘ সঙ্কেত সুদেষ্ণা জঠরে বহন করছে?

ক্ষণকালের জন্য চুপ করেছিলেন সভাপণ্ডিত। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে নিজের মত সমর্থন করে বললেন: এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য অলৌকিক স্বপ্ন। স্বপ্নতত্ত্বের পরিভাষায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায়, রাণীর গর্ভের কন্যা-সন্তান হবে রূপবতী। তার রূপের আগুনে নগর জ্বলবে। প্রাসাদ পুড়বে, রাজ্যে রাজ্যে লেলিহান অগ্নির বহ্ন্যুৎসব হবে। রাজপরিবার ছারখার হবে। সে নিজেও এ আগুনে পুড়ে পুড়ে খাক্ হবে।

সভাপণ্ডিতের কথা শুনে যজ্ঞসেন ও সুদেষ্ণা একসঙ্গে চমকে উঠল। মুখ পাংশু হল। জিজ্ঞাসু চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। একটা অজ্ঞাত উদ্বেগ আর ভয় তাদের মুখে কষ্টের ছায়া ফেলল। কারো মুখে কথা নেই। ভাগ্যের এক অদ্ভুত অসহায়তর সঙ্গে তাদের ভাগ্যসূত্র যেন জড়িয়ে গেল।

একটা আহত বিষণ্ণতায় রাজা ও রাণী নীরব। সম্মোহিত অবস্থা তাদের। রাজপুরোহিত উপযাজের

কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বিস্ময়কর এবং রহস্যপূর্ণ মনে হল। তাদের কষ্ট দেখে মমতায় ভরে গেল তার বুক। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় বলল: মহারাজ, উতলা হবেন না। মনকে শক্ত করুন। স্বপ্ন কোনদিন সত্য হয় না। যাগ-যজ্ঞ করলে অশুভ কেটে যায়। আপনার মনের তুষ্টির জন্য অনতিবিলম্বে ঋষিদের দিয়ে ধুমধাম করে যজ্ঞ করুন। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া অবধি এই যজ্ঞ করলে আপনার কোন অনিষ্ট বা অকল্যাণ হবে না।

উপযাজের যজ্ঞের প্রস্তাব দ্রুপদের (যজ্ঞসেনের অন্য নাম) মনে ধরল। মন্ত্রণাকক্ষে তার সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করল: বিপ্রবর, যজ্ঞ করলে আমার কোন স্বার্থ রক্ষা হবে বলে মনে করেন?

প্রত্যুত্তর উপযাজ বলল: মহারাজ আপনার উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগের কথা অবগত আছি। বর্তমানে অবস্থায় দ্রোণ কিংবা কুরুরাজের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা আমাদের আকাশকুসুম কল্পনা। এ অবস্থায় একমাত্র কৌশলে আমরা কার্যোদ্ধার করতে পারি। প্রস্তাবিত যজ্ঞকার্য হবে খুবই সংগোপনে। এর উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি উদ্রেক করা। সেজন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবেশের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকবে। শুধুমাত্র, সহজ, সরল, সাধারণ জনগণই যজ্ঞ কার্য দেখার অধিকারী। এদের সরল বিশ্বাস, অন্ধ দৈব ভক্তি হবে বিভ্রান্তি উদ্রেকের মূলধন।

দ্রুপদ বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল উপযাজের দিকে। তারপর, অবাকস্বরে জিগ্যেস করল! বিপ্রবর, আপনার সব কথা আমার বোধগম্য হল না। অনুগ্রহ করে খুলে বলুন।

গম্ভীর কণ্ঠে উপযাজ বলল: মহারাজ, যজ্ঞ আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই রাণী সন্তান প্রসব করবেন। তারপব যজ্ঞাগ্নিতে কৃত্রিম উপায়ে এমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হবে যে কিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে না। সে সময় একজন ঋষি সদ্যজাত শিশুকে ক্রোড়ে করে ধুম্রজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসবেন। তখন সাধারণ মানুষের ধারণা হবে যে, এই শিশু অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই ঘটনাকে তারা অলৌকিক কাণ্ড ভাববে। এবং অচিরেই হাওয়ার বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। শত্রুরা শুনে অবাক হবে। দেবতার বিরূপতা স্মরণ করে দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র প্রমাদ গুণবে। মনে মনে শঙ্কিত হবে। অগাধ আত্মবিশ্বাস এবং মনোবলের পাত্র শূন্য হবে তাদের। দৈবানুকুল্য স্মরণ করে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ মুক্ত মন নিয়ে পাঞ্চালের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহ হবে। পুত্রকন্যারা বড় হয়ে যখন এই অলৌকিক বৃত্তান্ত জানবে তখন তারাও নিজেদের দৈবপ্রেরিত মনে করে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অধিক সচেতন হবে। এবং আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

দ্রুপদ স্তম্ভিত। মুখে তার বাক্য সরে না। অবাক বিস্ময়ে উপযাজের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর, একটা ভারী নিশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। অস্ফুট স্বরে বলল: আশ্চর্য!

শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে কৈশোরে পৌছল দ্রৌপদী। অঙ্গ ছুঁয়ে উচ্ছল তারুণ্যের নৃত্য। তারপর একদিন পাহাড়ী ঝর্ণার ঢল নামল দেহে। বসন্ত উতলা হল, নদী চঞ্চল হল, খুশির নেশা লাগল সুনীল আকাশে। দিগবধূর বাঁশির সুর ছড়িয়ে গেল চরাচরে। বাজল দ্রৌপদীর বিবাহের আগমনী গান।

একদিন মহারাণী সুদেষ্ণা জিগ্যেস করল: কাকে তুমি বিয়ে করবে দ্রৌপদী?

দ্রৌপদীর সরল নিষ্পাপ চোখ দুটি লজ্জায় আনত হল। মুখ হল আরক্ত। মাথা নিচু করে বলল: জানি না তো?

কন্যার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুদেষ্ণা বলল: তা'হলে, পিতা তোমার উপযুক্ত পাত্র সন্ধানের ব্যবস্থা করবে'তো?

নিস্পৃহ স্বরে বলল দ্রৌপদী : আমি কি বলব?

সুদেষ্ণা বলল: আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নও বলেই'তো তোমাকে জিগ্যেস করছি? সংসারে তোমাকে সুখী, এবং প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

তোমার দুর্ভাবনা কিসে?

জানি না। সব সময় একটা ভয় ভয় ভাব চিন্তা করলে ভয়ে বুক কাঁপে।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। মায়ের বুকে মাথা রেখে বলল: আমার জন্য তোমার বড্ড বেশি ভাব, তাই না?

সুদেষ্ণা কথা বলতে পারল না। চোখ দুটো অকারণ অশ্রুসিক্ত হল। হৃদয়ে উথলে ওঠা স্নেহ আর বোবা ভালবাসা বোঝানোর জন্য দ্রৌপদীর পিঠের উপর হাত রাখল।

মাতা ও কন্যার মিলন দৃশ্য যজ্ঞসেনের অধরে কৌতুক হাস্যের উদ্রেক করল। কিন্তু তার লুব্ধ চোখের দৃষ্টি কন্যার ওপর ন্যস্ত। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল: সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যেন দ্রৌপদীর কালো চুল, যুগল বুক যেন সুউচ্চ পর্বতের দুই শিখর, নীলোৎপল কালো আঁখি দুটি যেন শ্রাবণের সজল কালো মেঘ। প্রকৃতি ও বিধাতা মিলে যেন তৈরি করেছে তাকে। সৃষ্টিকর্তার এক অনুপম শিল্পকর্ম যেন সে। তার সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। সে নিরুপম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী কন্যার জন্য দুর্ভাবনা বাড়তে লাগল। কন্যার বিবাহের বয়স অনেক কাল আগেই হয়েছে। তবু দ্রুপদ ইচ্ছে করে, নানা অজুহাতে তার বিয়েটাকে দেরি করেছিল। কিন্তু এবার মহারানী সুদেষ্ণা নিজেই উদ্যোক্তা। দ্রুপদ নিরুপায়। পিতৃহৃদয় দ্রৌপদীর শূন্যতা বোধ করে ক্লিষ্ট হতে লাগল। বুক ঠেলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ঝাউ গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় তার শব্দ মর্মরিত হল যেন।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণা একসঙ্গে চমকে ফিরে তাকাল তার দিকে। যুগপৎ বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোল দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বরে। অস্ফুট স্বরে ডাকল: বাবা!

দ্রুপদ নিজের বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠে হাসতে হাসতে বলল: শোন রাণী, কৃষ্ণা নিজের বর নিজে পছন্দ করবে। আমি সেরকম ব্যবস্থাই করব।

অমনি লজ্জা রাঙানো হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখমণ্ডল। মাথা নেড়ে দ্রৌপদী তার সম্মতি দিল। দ্রুপদ খুশি হয়ে বলল: দেখলে রাণী, মা হয়ে যা পারলে না, বাবা হয়ে আমি কৃষ্ণা-মায়ের মনের কথাটা ঠিক টের পেয়েছি।

দ্রৌপদীর জন্য স্বয়ম্বর সভা ডাক হল। লিপি হাতে দূত রাজ্যে রাজ্যে উপস্থিত হল। অচিরেই ভারতবর্ষের সর্ব প্রান্তে সে আমন্ত্রণ পৌছল।

দ্রৌপদীর ভুবনমোহিনীরূপ এবং তার অলৌকিক জন্মের কথা ভারতবর্ষের সব নৃপতিই জানত। সুতরাং তাকে দেখার আকর্ষণ এবং বধুরূপে পাওয়ার বাসনা সকলের মনে সুপ্ত ছিল। তাই, নিমন্ত্রণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজারা পাঞ্চালে ছুটল।

চোখে না দেখলেও প্রত্যেকে দ্রৌপদীর জন্য পাগল। নামী রাজাদের সকলে পাঞ্চালে উপস্থিত হল। দ্রৌপদীর নজরে পড়ার জন্য কেউ এল রাজবেশে, মাথায় মুকুট, কণ্ঠে মুক্তার মালা, গজমতির হার, পরনে সোনার চুমকী এবং মণিমুক্তা বসানো বহু মূল্যবান পোশাক, কোমরে তরোয়াল। বীর-ভোগ্যা নারীর মনে ধরার জন্য কেউ এল যোদ্ধাবেশে। পৃষ্ঠে তাদের ধনুর্বান, হাতে ঢাল। মন ভেজাবার জন্য অনেকে আনল সেরা উপঢৌকন। দেখতে দেখতে অতিথিশালা ভরে গেল। নতুন করে অতিথিশালা প্রস্তুত করতে হল দ্রুপদকে।

শৌয-বীর্য, ক্ষমতা এবং দক্ষতার পরীক্ষায় যে কৃতকার্য হবে, দ্রৌপদী তার ভার্যা হবে। স্বয়ম্বরের এই শর্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রদের আত্মপ্রশংসায় উন্মাদ করল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঈর্ষা করতে লাগল। রোষকষায়িত বহ্নি দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। ক্রোধে কারো কারো দাঁত কিড়মিড় করছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের মেজাজ দেখে মহারাজ দ্রুপদ মনে মনে প্রমাদ গুনল। আমন্ত্রণের বাঁশি, অবশেষে অস্ত্রের ঝনঝনিতে পরিণত হবে না তো? বিফল মনোরথ পাণিপ্রার্থীরা তাদের ব্যর্থতা যদি নীরবে

মেনে না নেয়, তা হলে? শান্তির নীলকাশে যদি যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে উঠে, তা-হলে কে তার পাশে দাঁড়াবে? যাকে মনে রেখে স্বয়ম্বরের পরিকল্পনা, এবং সব রকম সতর্কতামূলক আয়োজন সেই তৃতীয় পাণ্ডব যদি স্বয়ম্বর উপস্থিত না হয় তা-হলে দ্রৌপদীর বিবাহের কি হবে? যদি অন্য কোন নৃপতি আকস্মিকভাবে কৃতকার্য হয়, তা-হলে?

দ্রুপদ আর ভাবতে পারল না। ভাবনায় ভাবনায় তার রাতের ঘুম গেল। মনের শান্তি নষ্ট হল। স্বয়ম্বরের দিন যত নিকটতর হতে লাগল ততই তার হা-হুতাশ বৃদ্ধি পেল।

অবশেষে, দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে উপস্থিত হল। তার রূপের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের

॥ দুই ॥

স্বয়ম্বর সভার গণ্ডগোল থেমে গেলে বিপ্রবেশী ভীম ও অর্জুন মহারাজ যজ্ঞসেনের অনুমতি গ্রহণ করে জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে নিয়ে পদব্রজে ভার্গব কুটীরের অভিমুখে যাত্রা করল।

অগ্রহায়ণ মাস।

আকাশের রঙ বদলায় প্রতিদিন। বাতাসও দিক পরিবর্তন করে। নীল আকাশে তুলোর পেঁজা সাদা মেঘ বাউলের মত উদাসী। একতারার তারে উদাসী ঝংকার, সুখ দুঃখের গান গেয়ে তারা ভেসে যায় সুদূরে।

পথে দ্রৌপদীকে চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক মনে হল। অচেনা মানুষ, অজানা পরিবেশ সম্পর্কে দ্রৌপদীর মনে ভয় এবং উৎকণ্ঠা জাগল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। নতুন জীবনের পুলকানুভূতি আবেগ, কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা ক্ষণে ক্ষণে তার অনুভূতিকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ জাগল। চোখের তারা সুখানুভূতির আবেশে সুনিবিড় হয়ে উঠল। নিজেকে দ্রৌপদীর ভাগ্যবতী মনে হল। রূপবান. বীর্যবান, গুণবান পতি সব নারীই কামনা করে। তবু ক'জনে পায়? প্রসন্ন ভাগ্যদেবতা তার সে চাওয়া-পাওয়া মিলিয়ে দিল জীবনে। সত্যিই এ আশ্চর্য পাওয়া!

আত্মতৃপ্তির রোমন্থন ভাল লাগল দ্রৌপদীর। স্বয়ম্বর সভার অনেক ঘটনা তার মনে পড়তে লাগল। সভাস্থ নৃপবর্গের স্ফীত গর্ব ও অহংকারের আস্ফালন এবং ধনু উত্তোলনের সময় তাদের বিবিধ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি এবং ভূতলশায়ী হওয়ার দৃশ্য দ্রৌপদীর হাসি উদ্রেক করল।

অর্জুন তাকে লক্ষ্য করছে কি না দেখার জন্য দ্রৌপদী আড় চোখে তাকাল। অমনি বুকের মধ্যে তার কিসের আকুলতা জাগল। অনুরাগ রঞ্জিত হল অনুভূতি। যেমন হয়েছিল স্বয়ম্বর সভায়। প্রথম দর্শনের আবেগ মধুর স্মৃতি-স্বাদে মন হল অভিভূত।

দেবতুল্য, রূপবান, কৃষ্ণাজিনধারী, লোহিতবর্ণময় বিপ্রবেশী অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মন্থরপদে দেবীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তাকে নিয়ে এক নীরব ঔৎসুক্য জাগল সকলের অন্তরে। তার শান্ত, সৌম্য, স্তব্ধ গম্ভীর, মূর্তি, স্নিগ্ধ দেহকান্তি দীপ্ত পৌরুষ, অনমনীয় তেজ, সাহস, ব্যক্তিত্ব, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখতে লাগল তারা।

বেদীর সম্মুখে অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিপ্রবেশী অর্জুন। চোখ দুটি বন্ধ তার। নিবিষ্টচিত্তে সে যে ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করছিল। বেশ বোঝা গেল। তার আচরণ ছিল সংযত। কোন অস্ফালন করল না সে। একাগ্র চিত্তে মনোবল এবং শক্তিকে সে যেন আহরণ করছিল নিজের মধ্যে। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটল। তারপর, বেদী প্রদক্ষিণ করল। দুই হাত প্রসারিত করে কি যেন নিবেদন করল কাকে। সেই সময় চাপা গুঞ্জন হচ্ছিল সভায়। কিন্তু অর্জুন কোন কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে অবলীলায় ধনুক হাতে নিয়ে তাতে শর সংযোগ করল। অমনি গুঞ্জন থেমে গেল। সভা নিস্তব্ধ হল। সে নীরবতায় সূচী পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়।

সে দৃশ্য দেখে দ্রৌপদীও আত্মবিহ্বল হল। চোখে তার মুগ্ধতা, মনে বিভোরতা। বুকে মৃদঙ্গের ধ্বনি।

সময়ের গতি হল দ্রুত।

থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। সকলেই কৌতূহলী। নিশ্বাসে বুক উঠে না, নামেও

না তাদের।

দ্রৌপদীও এক উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় স্তব্ধ।

বিপ্রবেশী অর্জুন ধনুকে শর সংযোগ করতেই দ্রৌপদীর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হল। নিশ্বাসরুদ্ধ করে একাগ্রচিত্তে ইষ্টদেবতা শংকরের কাছে প্রার্থনা করল। হে ভবেশ, হে শংকর তোমার কিংকরী দ্রৌপদীর মনোবাঞ্ছা পূরণ কর। বিপ্রবেশী যুবককে দেখে চিত্ত আমার আকুল হয়েছে। তাকে পতিরূপে বরণ করেছি মনে। নারীর সর্বস্ব নিবেদন করেছি। হে জগৎ নাথ, আমাকে দ্বিচারিণী কর না। আমার দেহ মনের সতীত্ব রক্ষা কর ঠাকুর। শান্ত কর আমার অশান্ত হৃদয়।

অকস্মাৎ কল্লোলিত সমুদ্রের তরঙ্গ নির্ঘোষ উত্থিত হল স্বয়ম্বর সভায়। চতুর্দিকে বিপ্রবেশী অর্জুনের জয়ধ্বনি হতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে যুবকের উদ্দেশ্যে স্বস্তিবচন পাঠ করতে লাগল। উল্লসিত দর্শক দু'হাত ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করে তাকে অভিনন্দন জানাল।

দ্রৌপদী নিমীলিত দুই আঁখি ধীরে ধীর উন্মুক্ত করল। চোখেতে তখনও লজ্জার ঘোর। কেমন একটা মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন। কোলাহলে কৌতুহলী হয়ে সে অবাক বিস্ময়ে তাকাল। দেখল, পঞ্চশর বিদ্ধ লক্ষ্যবস্তু ভগ্ন হয়ে পড়ে আছে যজ্ঞবেদীর সম্মুখে। বিপ্রবেশী অর্জুন দর্শকদের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বীরের মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে তার খুশির আবেগ। মুখে সাফল্যের প্রত্যয় দৃপ্ত স্মিত হাসির স্নিগ্ধ লাবণ্য। আনন্দে, উত্তেজনায় দ্রৌপদীর বক্ষঃস্থল কেঁপে উঠল। সর্বাঙ্গে পুলকানুভূতির আশ্চর্য শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। অবশ দেহ। বিকল মন। প্রগাঢ় অনুভূতির আবেশে চোখের পাতা ঢুলু ঢুলু হল। মুখেতে গভীরে আগ্রহের ভাব ব্যক্ত হল।

অর্জুনও দ্রৌপদীকে দেখছিল। বিস্ময় বিমোহিত দুই চোখের পলক পড়ছিল না তার। অনুসন্ধিৎসু নিবিড় দৃষ্টিতে অনুরাগ ফুটল। মিলনোৎসুক আনন্দে দুই চক্ষু তারকা চকচক করছিল। রহস্য গম্ভীর অধরে তার কৌতুক হাস্যের এক আশ্চর্য মাধুর্য ফুটে উঠল।

দ্রৌপদী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। অধরোষ্ঠে মৃদু মধুর হাস্য এক অপূর্ব ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছিল সে। অর্জুনের মুগ্ধতা তার বুকে আনন্দের শঙ্খধ্বনি হয়ে বাজল। আকাঙ্খিত পুরুষের সান্নিধ্যে এবং স্পর্শের সুখানুভূতি কল্পনা করে মুহুর্মুহু শিহরিত হল।

ঠিক এরকম একটা আবেগময় মুহূর্তে পিতা যজ্ঞসেন মনে দ্বিধা এবং সংশয় নিয়ে দ্রৌপদীকে পণ-জয়ী বিপ্রবেশী অর্জুনের করে সমর্পণ করল। বললঃ বৎস, এই স্বয়ম্বর সভা সর্ব বর্ণ এবং জাতির জন্যে উন্মুক্ত ছিল। স্বয়ম্বরে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষত্রিয়ের মত পরাভূত করে এ কন্যারত্ন জয় করে তুমি এই বিবাহের অধিকারী হলে। তোমরা দুজনে যুক্ত হয়ে এখন থেকে ধর্মানুমোদিত দাম্পত্য জীবন-যাপন কর। আজ থেকে কৃষ্ণা তোমার ভার্যা। কিন্তু কৃষ্ণার কথা ভেবে আমি একটু অস্থির হচ্ছি। সব পিতাই বোধহয় এমন হয়। যাইহোক, বীর্য বলে তাকে জয় করেছ তুমি। বুক ভাঙা বেদনা নিয়ে কথাগুলো কেটে কেটে থেমে থেমে বলল যজ্ঞসেন। বলতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

যজ্ঞসেনের চাহনি অনুসরণ করে দ্রৌপদী অর্জুনের কণ্ঠে বরমাল্য দিল। অমনি পুরনারীর শঙ্খধ্বনি করল। উলু দিল। দর্শকেরা অনেকক্ষণ ধরে করতালি দিল। সেই সঙ্গে সুমধুর ঐক্যতানে নানা বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল।

সলাজদৃষ্টিতে দ্রৌপদী অর্জুনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে অর্জুনও তাকাল তার দিকে। চোখে তাদের পলক পড়ল না। স্নিগ্ধ সুনিবিড় চাহনি উভয়কে মুগ্ধতায় স্বপ্নাচ্ছন্ন করল। কন্দর্পবাণে জর্জরিত হল উভয়ের তনু-মন-প্রাণ।

এমন সময় ভৈরব কল্লোল উত্থিত হল স্বয়ম্বর সভায়। ব্যর্থ, পরাজিত নৃপবর্গ অর্জুন ও দ্রৌপদীর প্রণয়মধুর মিলনে ঈর্ষান্বিত হয়ে রোষবশে ক্ষিপ্ত অসুরের মত যজ্ঞসেন এবং অর্জুনকে হত্যা করার জন্য কোষমুক্ত অসি হস্তে ধাবিত হল। 'মার মার' শব্দ করে যখন তারা ছুটে এল তখন যজ্ঞসেন প্রাণভয়ে বিচলিত এবং বিভ্রান্ত। অসহায় দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর ভয় দূর করার জন্য আরো ঘন হয়ে দাঁড়াল। অর্জুনের ঋজু, অনায়াসে রণকুশলী যোদ্ধার ভঙ্গি এবং তার অধরে প্রসন্ন কৌতুক হাসির

দীপ্তি দ্রৌপদীকে অবাক করল। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই দ্রৌপদী দেখল ভয়ার্ত দর্শকদের ভীড় ঠেলে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে অসুরাকৃতি এক বিপ্র-যুবক। দেহে তার হস্তীর বল। মুষ্টাঘাতেই অনেক বীরকে ধরাশয়ী করল। বিস্ময়ের অবধি রইল না তার। মানুষের এত শক্তি তার কল্পনাতেও আসে না।

দ্রৌপদীর মুগ্ধ দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন নিঃশব্দে ধনুর্বাণ হাতে ভীমের পাশে দাঁড়াল। অমনি যুদ্ধের চেহারা গেল বদলে। নিমেষেমধ্যে অস্ত্রহীন হল বলদর্পী নৃপবর্গ। বিস্ময়ে বিস্ফারিত দ্রৌপদীর দুই চক্ষু। নিশ্চল দৃষ্টিতে কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা। চন্দনচর্চিত অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল তার এক অবর্ণীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হল। বিপ্রদ্বয়ের অদ্ভুত আশ্চর্য মানবরূপ প্রতিভাত হল তার কাছে। গর্বে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় দ্রৌপদীর বক্ষ স্ফীত হল। মনে মনে সে নিঃসন্দেহ হল যে, এরা সাধারণ মানুষ নয়; ছদ্মবেশী দেবতা অথবা গন্ধর্ব। বিদ্যুৎ চমকের মত পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের শৌর্যবীর্যের কথা তার মনে উদয় হল। অর্জুন নামটা তার সারা অঙ্গে পুলক সঞ্চার করল। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। তারা কেউ জীবিত নেই বলে অধিকাংশের বিশ্বাস। পিতা দ্রুপদ এবং যদু-কুলপতি শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য এ জনশ্রুতি বিশ্বাস করেন না। তবু, কোথায় যেন একটা সন্দেহ আছে তাদের মনে। তা-হলে এরা কারা? কাদের সঙ্গে যাচ্ছে সে? কোথায় যাচ্ছে? সেখানে কি অবস্থায় থাকতে হবে? এসব ভাবনা চিন্তায় সর্বক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

অকস্মাৎ ভীমের উচ্ছসিত মাতৃ সম্বোধন চমকে উঠল দ্রৌপদী। আত্মসম্বিত ফিরে এল। চমকে যাওয়া ভাবটা সামলে নিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। চোখের তারায় এক আশ্চর্য কৌতুক হাস্যের মাধুর্য সৃষ্টি করে অর্জুন তাকিয়েছিল তার দিকে। দ্রৌপদীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মৃদু স্বরে বললঃ এই হল গরীবের পাতার কুটীর। আমাদের আশ্রয়। সুখের নীড়।

দ্রৌপদীর আয়ত চোখের তারা কয়েক পলক স্থির হয়ে থাকল অর্জুনের চোখে। মুখের অভিব্যক্তিতে একটা ভয় ভয় ভাব। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার অন্বেষণের আগ্রহ। অর্জুনের চক্ষু-তারকা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে দেখতে লাগল চারপাশের বনপ্রকৃতির, নিবিড় নির্জনতা এবং এখানকার জনপ্রাণহীন নিরালা।

দ্রৌপদীর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে অসহায় ভাব ফুটে উঠল।

দ্রৌপদীর মনের অবস্থা বুঝতে অসুবিধা হল না অর্জুনের। তার অবাক বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তার কৌতুক হাসি দ্রৌপদীকে আত্মসচেতন করল। তাড়াতাড়ি নিজের মনের ভাব গোপন করার উদ্দেশ্য মেয়েদের সহজাত মৃদু হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করল। অর্জুনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবাক স্বরে উচ্চারণ করলঃ আশ্চর্য! অমনি লজ্জায় তার চোখ মুখ রাঙা হয়ে গেল।

দ্রৌপদীর সবিস্ময়ে উক্তি অর্জুনকে আশ্চর্য করল। এমন বিস্ময়কর কথা সে যেন কখনো শোনেনি। অর্জুনের প্রাণের দিগন্তে সন্ধ্যার শুকতারার মত দ্রৌপদী তখন জ্বলজ্বল করছিল। খুশি মন নিয়ে আবেগ গাঢ় স্বরে বললঃ সব আশ্চর্যের সেরা তুমি। সাত রাজার মানিক। তোমায় পেয়ে গর্বিত আমি। তুমি আমার অহংকার, আমার ঐশ্বর্য। আমার মানমর্যাদা সব।

কথাগুলো ভীষণ ভালো লাগল দ্রৌপদীর। মনে হল, অর্জুন বিস্ময় ভরা এক আশ্চর্য সুন্দর মানুষ। মুগ্ধতার এক অনির্বিচনীয় চমৎকারিতার নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল সে। মুখে তার কথা জোগাল না। অর্জুনের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনকে বাক্যালাপ করতে দেখে ভীমের বুকের মধ্যে মোচর দিয়ে উঠল। একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে কুণ্ডলাকৃত হয়ে পাক খেতে খেতে যেন উপরের দিকে উঠে আসছিল। এরকম আকস্মিক অনুভূতির তাৎপর্য খুঁজে পেল না ভীম। দ্রৌপদীর সপ্রতিভ নীরবতা এবং অপলক দৃষ্টির মুগ্ধতা অর্জুনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাকে সংকেত করছিল। সে দৃশ্য দেখা থেকেই তার বুকে এ কিসের অস্বস্তি? ভীম বেশ অনুভব করতে পারল; দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের বাক্যালাপ এবং ঘনিষ্ঠতাকে সে সহ্য করতে পারছিল না। ভীষণ ঈর্ষা হচ্ছিল। মনে হলে অর্জুন যেন তার

ও দ্রৌপদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে। অর্জুনের দ্রৌপদী প্রাপ্তি তার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্যই সম্ভব হল। সে ছাড়া অর্জুন একা ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপবর্গকে দমন করে দ্রৌপদীর উদ্ধার করতে পারত না। ইচ্ছে করলে স্বয়ম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী সেও হতে পারত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে দ্রৌপদী তার হতে পারত। সেজন্য বোধহয় অর্জুনের সৌভাগ্য দেখে তার ঈর্ষা হচ্ছে। হবেই বা না কেন? ঈর্ষার কোন বয়স নেই। আত্মীয়, বন্ধু, ভ্রাতা সে মানে না। কারো স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে না। সুতরাং দ্রৌপদী অর্জুনের একার ভার্যা হবে কেন? দ্রৌপদীর ওপর তার অধিকার থাকবে না কেন? এই জিজ্ঞাসায় তার বক্ষদেশ আলোড়িত হল। মস্তিষ্কের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেল। মনটাও আর্ত হল। অকস্মাৎ একটা দারুণ লজ্জা অভিভূত করল তাকে। মনে হল, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই সে বাঁচে। ধিক্কারে ধিক্কারে নিজেকে জর্জরিত করল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! নিজের সহোদর সম্পর্কে এ সব কি ভাবছে সে? অর্জুনকে ঈর্ষা করার জন্য তার মনে অনুতাপ হল। একটা অপরাধবোধে পীড়িত হতে লাগল তার চিত্ত।

চিত্ত বিক্ষোভকে সংযত করে এবং প্রশমিত করার জন্য ভীম অস্থিরভাবে উচ্চৈঃস্বরে 'মা-মা' করে ডাকল।

জননীর নীরবতায় দ্রৌপদী অবাক হল। চোখে তার বিস্ময়ের ভাব ছিল না। ছিল তীক্ষ্ণ সন্দেহ আর তীব্র অনুসন্ধিৎসা। দ্রৌপদীর চিত্তে গভীর সংকট সৃষ্টি হল। যার স্বরূপ সে নিজেও ভাল করে জানে না। একটা অজ্ঞাত উদ্বেগ, ভয় তার মস্তিষ্কে জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। ভাগ্যের এক অভূতপূর্ব অসহায়তার মধ্যে থাকতে থাকতে সে হাঁফিয়ে উঠল।

কক্ষের অভ্যন্তর থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে এল। পাগল ছেলে। অমন করে 'মা-মা' করছিস কেন? কি হয়েছে?

ভীম সোল্লাসে উত্তর করল : কি হয়নি? দারুণ হয়েছে। শুনলে তুমিও অবাক হবে। এমন আশ্চর্য জিনিস কখন তুমিও দেখনি।

ঘরের ভেতর থেকে কুন্তী প্রত্যুত্তরে বলল : তোমরা দেখলেই হবে। এখন আমায় একটু একা থাকতে দাও।

ভীম উৎসাহিত হয়ে আরো উচ্চৈঃস্বরে বলল : পাঞ্চালের এক আশ্চর্য মানিক বাজি ধরে জিতেছি।

বেশ হয়েছে। তোমরা পাঁচ ভাইতে ভাগ করে নাও।

ভীমের কণ্ঠে নানা স্বরে উচ্ছ্বসিত হাসি এবার প্রবলতর হয়ে উঠল। বলল : ভাগ করার জিনিস নয়। দ্যাখই-না চেয়ে।

ছোট থেকে তোমরা সব কিছু ত্যাগ করে ভোগ করার শিক্ষা পেয়েছ। আজ কেন নিয়ম ভাঙতে চাইছ? আবার বলছি যা পেয়েছ তা তোমাদের পাঁচজনেরই জিনিস। পাঁচ ভাই-এর সমান অধিকার। একথা কি নতুন করে মনে করে দিতে হবে?

ভীম তৎক্ষণাৎ কথা বলতে পারল না। স্থির অনুসন্ধিৎসুর চোখে তাকাল দ্রৌপদী এবং অর্জুনের দিকে। তৃতীয় পাণ্ডবেরা সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে এক টুকরো বিষণ্ণ হাসি বিদ্যুৎ চমকের মত তার অধর প্রান্তে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটতে গিয়েও ফুটল না। মমতা মাখানো সহানুভূতিতে চিত্ত অস্থির হল।

অর্জুন বিচলিত হল। মুখের ওপর ক্লান্ত ঔদাসিন্যের বিষণ্ণ মলিন ছায়া থম থম করছিল। তার বিস্মিত বিহ্বল চোখের পাতায়, ভ্রূপল্লবে যেন কি এক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে উঠল। নিশ্চল পাথর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টির সম্মুখে তার অতল অন্ধকার। পূব আকাশে সন্ধ্যাতারার আলো কেবল দ্যুতিময়।

মনে তার হাজার প্রশ্ন।

অসহ্য অস্থিরতার মধ্যে যে সব প্রশ্ন জাগল মনে তা কাউকে বলে বোঝানোর নয়। নিজের কাছেও সে সব কথা উন্মুক্ত করতে লজ্জা হয়। অনুতাপ জন্মে। তাই, অর্জুন জোর করেই আপত্তিকর সব চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিল। তবু কতকগুলো মূল জিজ্ঞাসা মনকে আঁকড়ে রইল।

জননী কুন্তীর ওপরেই অর্জুনের অভিমান। মনে হল, জননী না বুঝে এক নিষ্ঠুর কৌতুক করছে তার ও দ্রৌপদীর সঙ্গে। কৌতুক শব্দটা অর্জুনের ঠিক পছন্দ হল না। এটাকে জননীর কোন কৌশল বলে মনে হল। প্রাতে মাতৃচরণ বন্দনা করে তারা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে গিয়েছিল। দ্রৌপদী তার জয়লব্ধা হয়েছে এ সংবাদ অগ্রজ এবং অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে পূর্বেই অবগত হওয়ার কথা তার। স্বয়ম্বর সভায় বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গের সঙ্গে তারা যখন সংগ্রামে লিপ্ত তখন যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবকে নিয়ে সভা মণ্ডপ ত্যাগ করেছিল। তারপর, বহুক্ষণ গত হয়েছে। তবু কুটীরে ভাইদের কোথাও দেখতে না পেয়ে বিস্ময়বোধ করল। ভাবল, নববধূ বরণের আয়োজন করতে নিশ্চয় কার্যোদ্দেশ্যে বাইরে গেছে তারা। না-হলে, এতক্ষণ তাদের দেখা মিলত।

অর্জুনের ভ্রূকুঞ্চিত হল। বিভ্রান্তির কোন ঘটনাই এ নয়। তাহলে জননী এ ভুল করল কেন? এর পেছনে কি কোন সুগভীর মতলব আছে তার? কিন্তু, সে মতলব কি? অর্জুন চেষ্টা করেও তার রহস্যের তল পেল না।

সংশয় প্রবল হল। নিজের কাছে তার জিজ্ঞাসা — এ কার অদৃষ্টলিপি? তার, না দ্রৌপদীর? না, মানুষের ভুলে তৈরি দুর্ভাগ্য? এজন্য দায়ী দৈব, না মানুষের প্রতারণা? কোনটা? মস্তিষ্কের মধ্যে আকুল করা এইসব প্রশ্ন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কুন্তীর উক্তি শুনে অবাক হল দ্রৌপদী। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি-মেলে অর্জুনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু মুখে প্রশ্ন ছিল না তার। জননীকে কি জিগ্যেস করবে ভেবে পায় না। মুখে অসহায় উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল। ম্লানমুখী দ্রৌপদীর চোখের ওপর চোখ পড়তে অর্জুন ত্রস্তে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। জননীর বাক্য শুনে দ্রৌপদীই বা কি ভাবল তাদের সম্পর্কে, ভেবে লজ্জিত হল সে। ঘৃণায় দুঃখে তার অন্তর ছিঃ ছিঃ করে উঠল। দ্রৌপদীর দিকে চোখ তুলে তাকানোর মনোবল পেল না অর্জুন। দ্রৌপদীর অব্যক্ত জিজ্ঞাসা তাকে তীরের মত বিদ্ধ করতে লাগল।

দ্রৌপদীর চোখে অপলক বিস্ময়। জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত ভুরু। মুখে অবাক অভিব্যক্তি। অর্জুনের আচরণে সে কেমন একটা উদ্বেগ বোধ করে। মনে তার শঙ্কা জাগল। মানুষগুলোকে তার অদ্ভুত মনে হল। সচেতন মনে জিজ্ঞাসা জাগল, এরা কারা? আকস্মিক ঘটনার গভীরতা তার চিন্তার জগতকে কেবল আলোড়িত করতে লাগল। নিজেকে এক অদৃশ্য ঘটনার ক্রীড়নক মনে হল। বুক ঠেলে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কুন্তীর উক্তিতে স্তব্ধতা নামল সেখানে। অখণ্ড নীরবতা তাকেও আকুল করল। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট বাড়ছিল।

কুন্তীর কৌতূহলিত দৃষ্টি ছিল ভেজানো দরজার দিকে। সেখান দিয়ে দ্রৌপদীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আগুন রঙের রেশমী শাড়ি আর বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিতা মূর্তিময়ী প্রতিমার মতো দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে কুন্তীর মনে অশুভ একটা আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল। দ্রৌপদী অসামান্যা সুন্দরী। জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা মাখানো তার শ্যামরূপ। সূর্যের আলোয় পদ্মকলি পাঁপড়িগুলো যেমন একটু একটু করে মেলে ধরে তেমনি দ্রৌপদীর স্ফুটোন্মুখ যৌবন নারীর অপূর্ব দেহসম্ভার মেলে ধরেছে। তার অনিন্দ্যসুন্দর চোখের মাধুর্য দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করে। পরম প্রার্থিত বস্তুর মত বুকের ভেতর দেখার কৌতূহল এবং ইচ্ছাটাকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েলী মন দিয়ে কুন্তী বুঝতে পারল, সে পুরুষের কামনার ধন। নারীর ঈর্ষার বস্তু। তাকে দেখলে সব নারীই তীব্র আশংকায় কাঁপবে। পুরুষের চিত্তে ছন্দে ছন্দে নেচে উঠবে রক্ত ধারা। দ্রৌপদীকে বহ্নিকন্যা বলে মনে হল কুন্তীর। একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেন। রূপের আগুনে সে জ্বল জ্বল করে। তার চোখ জ্বালা করে। এ রূপ পুরুষের বুকের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার চিত্ত আত্মহারা হয়। মুনি ঋষি পর্যন্ত তপস্যার ফল রূপবহ্নিতে আহুতি দেয়। দ্রৌপদী উদ্ভিন্ন যৌবনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রমণীয় রূপের মদির আকর্ষণ গভীর সূক্ষ্ম এবং অবাধ্য। কোন শাসন মানে না। সংযম জানে না। যুধিষ্ঠিরের মত সংযমী পুরুষের নির্বিকার চিত্তও পাবক শিখারূপিনী দ্রৌপদীর রূপবহ্নির আগুনে উদ্ভাসিত হল। নিজের অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। আর অবাক হয়ে দ্রুতপদে ছুটে এসেছে জননীর কাছে।

তখন মধ্যাহ্ন। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল চারদিক। নিষ্পত্র বৃক্ষশাখে পাখীরা ডাকছিল তাদের সঙ্গীকে। কুটীরের চালে দুটি কপোত পাখা ঝাপ্টাঝাপ্টি করছিল। আর কপোতী অদূরে আপন মনে বক্ বকম করছিল। পুরুষে পুরুষে এই বিবাদ যে তার মোটেই পছন্দ নয়—সেই কথাই যেন বলছিল সে। কুন্তী নিবিষ্ট মনে সে দৃশ্য উপভোগ করছিল।

যুধিষ্ঠিরের আগমন তাই কুন্তী জানতে পারল না। ভারী নিশ্বাসের উত্থান পতনের শব্দে সচকিত হয়ে সে ফিরে তাকাল। যুধিষ্ঠিরকে দেখে অবাক হল। চোখ দুটো তার অস্বাভাবিক লাল। বুকে সমুদ্রের অস্থিরতা। মুখে যন্ত্রণাদায়ক অভিব্যক্তি। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির ও শক্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করছিল যুধিষ্ঠির। কিন্তু তার জ্যোতিহীন দুটি চোখ অপলক স্থির হয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকল কুন্তীর মুখে।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কুন্তী তাকাল তার দিকে। অনুভব করতে চেষ্টা করল তার দুঃসহ মানসিক অবস্থাকে। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জিগ্যেস করল : পুত্র, তোমার কি হয়েছে? তোমাকে তো এত বিচলিত দেখিনি কখনও। ভীমার্জুন কোথায়? তাদের কোথায় রেখে এলে তুমি? তাদের কিছু হয়নি'ত? চুপ করে থেক না, পুত্র। জবাব দাও। তাদের জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়েছে।

যুধিষ্ঠির বিব্রতবোধ করল। বিভ্রান্তভাবে ঘাড় নাড়ল। ইঙ্গিতে যেন বলল কিছু হয়নি তাদের।

তা হলে, তুমি অমন করছ কেন? তোমার মুখমণ্ডল উত্তেজনায় আরক্ত কেন? নাসারন্ধ্র কাঁপছে কেন? ঘন ঘন নিশ্বাসই বা পড়ছে কি কারণে? তোমার সব কথা আমায় খুলে বল। আমি তোমার মা। মায়ের কাছে সন্তানের কোন কিছু গোপন করতে নেই। একমাত্র মায়ের কাছে সব কথা বলা যায়।

যুধিষ্ঠির হঠাৎ লজ্জা পেল। চোখের পাতা তুলে কুন্তীর দিকে তাকাল, আবার পাতা নামাল এবং আবার তাকাল। ভুরু কোঁচকাল। পরক্ষণেই দুই ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে হাসি উদ্ভাসিত হল। আবার লজ্জা পেয়ে বলল : পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী আজ পাণ্ডবের। তাকে পেয়ে আমরা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করলাম। সহসা এরকম একটা অনুভূতি হল কেন জানি না। মাঝে মাঝে আকস্মিক ঘটনাসমূহ কোন দিকে মোড় নেয়, কোথায় নিয়ে যেতে চায়, কি পরিণতি ঘটায় কিছুই অনুধাবন করার উপায় থাকে না। তবু এসব অনিবার্যভাবেই ঘটে। এবং অতিবাস্তব।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে কুন্তী তাকিয়ে রইল, যুধিষ্ঠিরের কথায় অন্তর্নিহিত অর্থ কিছুই অনুধাবন করতে পারল না। কৌতূহল গভীর হল তার দৃষ্টিতে। মুখে সমবেদনার অভিব্যক্তি অনিবার্যভাবে জাগল। বলল : এ'তো ভাল কথা, আনন্দের কথা। এতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? সংকোচই বা কেন?

যুধিষ্ঠির তবু সংকুচিত হল। লজ্জার হাসি হাসল। মুখে প্রকৃতই একটা অস্বস্তির ভাব জাগল। সত্যের সঙ্গে সংশয় জড়ানো একটা গ্লানিবোধ এবং সংকোচ তার বলার বাধা হল। বিব্রতস্বরে বলল : মাগো মন আমাদের কলুষিত। দেহ ও আত্মা বোধ হয় আমাদের অপবিত্র। যা সত্য গোপন না করে অকপটে বলছি, দ্রৌপদীতে চিত্ত আমাদের আসক্ত হয়েছে। তুমি—

বিস্ময়ে চমকে উঠল কুন্তী। দৃষ্টিতে তার শংকিত জিজ্ঞাসা। অবাক স্বরে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল : পুত্র!

যুধিষ্ঠিরের কোন গ্লানি বা যন্ত্রণাবোধ নেই। যথাসম্ভব জোর দিয়ে বলল : জীব মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের বশ। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় মানুষ তার সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, নীতি বিস্মৃত হয়। প্রবৃত্তিবেগের কাছে ছোট বড়, আত্মীয়, ভ্রাতা, সুশ্রী কুশ্রী বলে কিছু নেই। নর-নারীর জৈব সম্পর্কই একমাত্র সত্য। জৈব তাড়নায় আমার ভ্রাতাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন। নিত্য দেখা শোনায় এ আকর্ষণ আরো তীব্র হবে। অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষোভে মন বিরক্ত ও অশান্ত হবে। এই আত্মবিনষ্টি থেকে ত্রাণ করতে পার তুমি।

কুন্তী স্তম্ভিত। উদ্দীপ্ত চোখে গভীর বিস্ময়। দৃষ্টিতে উদ্যত জিজ্ঞাসা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না সে। ঘৃণায় কুন্তীর মন ছিঃ ছিঃ করে উঠল। পুত্রদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ও নৈতিক অধঃপতনে তার অন্তর ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সম্পর্কের কুন্তীর

জননী হৃদয়ে প্রবল গর্ববোধ সেই মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ভেঙে যাওয়ার মর্মান্তিক দুঃখে চোখ ছলছল করে উঠল। ঠোঁট কেঁপে গেল। মুখের চোয়াল শক্ত হল।

নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাল। ওদের চোখে তাদের উদ্যত জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল খদ্যোতের মত জ্বলছিল।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষণ গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক মনে হল। উদাস চোখের তারায় এক অব্যক্ত আকুতি ফুটে উঠল। উচ্চকিত রক্তের অসহ্য তাপে তাকে ভীষণ অসহিষ্ণু এবং উত্তেজিত মনে হল। মুখের ভাব পরিবর্তন হল। লজ্জা, সংকোচ, কুণ্ঠায় তার মুখখানি রক্তাভ হল। ইতস্তত করে আপনি মনে বলল : বিস্মৃতি মানুষের ধর্ম। কিন্তু জৈব ক্ষুধায় তার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সর্বদা সজাগ। সেখানে বিস্মৃতি নেই। মানুষ ও পশুতে তফাত নেই। জীবদেহ ধারণ করলেই দেহজ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হতে হয়। জিতেন্দ্রিয় ঋষি, মুনির শরীর পর্যন্ত শাসন সংযমের বাঁধ ভেঙে বর্বর হয়ে ওঠে। মূলে রয়েছে মিলন স্পৃহা। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনিও মিলনে উৎসুক। তাই নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে তিনি তার আনন্দরস পান করলেন। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উদ্বেলিত হয়। রবি শশী মিলে শুভ্র, স্নিগ্ধ আলোয় ধরাতলকে মনোরম করে। এটাই'তো প্রকৃতির নিয়ম। বিশ্ববিধানের বাইরে'তো আর পাণ্ডবেরা নয়;

বুক ঠেলে একটা গভীর শ্বাস সজোরে বেরিয়ে এল কুন্তীর। ধীর শান্ত গলায় বলল : তোমার কথা সত্য পুত্র। কিন্তু আপন ভ্রাতার জয়লব্ধা স্ত্রীকে পাঁচজনে মিলে ভোগ করার এই নির্লজ্জ আকাঙ্খা বর্বর যুগেই শোভা পেত।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইল যুধিষ্ঠির। কিছুক্ষণ কাটল নীরবতার ভেতর। তারপর যথাসম্ভব জোর দিয়ে চিন্তিত স্বরে বলল : সচেতন মনে কোন চিন্তা ও ইচ্ছার ক্ষয় হয় না। আপাতভাবে মন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমরা নীতি ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু নির্বাসিত ইচ্ছাটি মনের বন্দীশালায় মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারপর, একদিন চিৎকার জুড়ে দেয়, সেদিন থেকে শুরু হয় তার বিদ্রোহ। অতৃপ্ত ও ইচ্ছার বিক্ষোভ আত্মাকে আর স্বস্তিতে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধের মূর্তি ধরে সে বিদ্রূপ করবে বিরূপ হৃদয়কে। সেই আত্মক্ষয় থেকে পাণ্ডবদের শৌর্য-বীর্য, ঐক্য রক্ষা করতে হলে, সকল প্রকার সংঘর্ষ এড়াতে হলে একান্নভুক্ত ভাইদের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্কে অভিন্ন হওয়া দরকার। দ্রৌপদীর আকর্ষণ এবং বন্ধনে পঞ্চপাণ্ডবের সম্পর্ক চিরকাল একসূত্রে নিবিড় হয়ে গাঁথা থাকবে। সে হবে আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা।

কুন্তীর গলায় আর্তি ফুটল : পুত্র!

মাতা, পাণ্ডবদের জীবনস্রোতে দ্রৌপদী অকস্মাৎ যে জোয়ার আনল তা সংযমের বাঁধ ভেঙে শিক্ষা দীক্ষাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার চুম্বক আকর্ষণ থেকে পঞ্চপাণ্ডবকে বিচ্ছিন্ন করবে কোন মন্ত্রে? হৃদয়ের সঙ্গে ছলনা করলে মহা অনর্থ ঘটবে। পঞ্চপাণ্ডবেরই ক্ষতি হবে তাতে। তাই অকপটে সত্য বিবৃত করলাম। মহতি ইচ্ছার মৃত্যু ঘটতে দেয়া উচিত নয়। ইচ্ছার তৃপ্তি শুধু আনন্দ দেয় না, আত্মবিস্তারের প্রেরণা যোগায়। জীবনে এর মূল্য বিরাট। আমাদের জীবনের দ্রৌপদী এক আশীর্বাদ। বিধাতাই মিলিয়ে দিয়েছেন তাকে। নইলে এমন করে আমাদের সকলের চিত্ত তার প্রতি আকৃষ্ট হবে কেন? তার মোহিনীরূপ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব করার অসম ক্ষমতা, দৃঢ়তা, তার আশ্চর্য মনোবল, তেজস্বিতা পঞ্চপাণ্ডবের বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। দ্রৌপদীর মত মোহিনী নারীর শুধু একজনের বধূ হওয়া বিপদ অনেক। আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ের মধ্যে তাকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি যদি না চাও তা হলে দ্রৌপদীর ওপর পাঁচজনের অধিকার সমান হওয়া উচিত। অন্যথায় দ্রৌপদীর রূপবহ্নিতে পাণ্ডবেরা পুড়ে মরবে।

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরের জন্য আর দাঁড়াল না। ত্রস্ত ব্যস্ত লজ্জায় দ্রুত প্রস্থান করল।

কুন্তী পুত্তলীবৎ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। যুধিষ্ঠিরের উচ্চ গম্ভীর স্বর তার কানের মধ্যে দামামা বাজাতে লাগল। মনে হল, এক দিব্যচক্ষু পেয়েছে সে। যুধিষ্ঠিরের মত জীবনকে তলিয়ে দেখেনি সে। সত্যিই সুন্দ-উপসুন্দর ভ্রাতৃপ্রেমের গর্ব খর্ব করল তিলোত্তমা। তার আসামান্য রূপ লাবণ্যে

বিমোহিত চিত্ত তাদের ভ্রাতৃপ্রীতির সংকট ঘনিয়ে তুলল। বড় হল জীবনের দাবি। দেহ ও মনের অধিকার। জৈবিক তাড়না বিভেদ বিদ্বেষের অন্তঃস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের মনোবৃত্তি। চিরকাল ধরে যা পেয়েছো তাকেই সমানভাবে ভোগ করছে দুভাই। কিন্তু তিলোত্তমা তাদের সব গণ্ডগোল করে দিল। এত বড় সংকটে কখনও পড়েনি তারা। জীবনে সেই প্রথম অনুভব করল যে জীবনের সবকিছু সমানভাবে ভাগ করা যায় না। নারীর সঙ্গ-প্রেম-ভালবাসায় কোন ভাগীদার যে কল্পনা করা যায় না এই চেতনাই তাদের পরস্পরকে বৈরী করে তুলল। বিরোধের নিষ্পত্তি হল মৃত্যুতে।

এরকম একটা অশুভ আশঙ্কায় কুন্তীর বুকের মধ্যে কেঁপে গেল। তারপর থেকে সর্বক্ষণ এই একটি ভাবনা তার মন জুড়ে রইল। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে বুঝল যুধিষ্ঠিরের প্রজ্ঞাদৃষ্টিই সত্য। দ্রৌপদীর ওপর পাঁচ ভাই-এর অধিকার সমানভাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, বিশ্বাস এবং ভাইয়ে ভাইয়ের ঐক্যকে সুদৃঢ় করা। স্বেচ্ছায় এবং অকাতরে ভোগের অধিকার ত্যাগ করার ঔদার্য ও মহানুভবতা তাদের আছে। কিন্তু এ এক অভিনব জীবন পাঠ। কোন পুরুষই তার আকাঙ্খিত নারীর ওপর অন্যের কর্তৃত্ব ও অধিকার স্বীকার করে না। করা যায় না বলেই মানে না। তার সঙ্গে মনের বন্ধন দেহের সম্বন্ধ। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তাকে ভোগ্যপণ্যের মত পাঁচজনের ব্যবহারের বস্তু করা যায় না। সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ের প্রশ্নটিও গৌণ করে দেখা যায় না। কিন্তু সৃষ্টির আদিযুগে নারী ছিল পরিবার তথা গোষ্ঠীর একমাত্র বন্ধন। পরিবারের কর্ত্রী সেদিন ছিল নারী। গোষ্ঠীর সকল পুরুষকে তার আদেশ নির্দেশ মানতে হত। গোষ্ঠীর ভেতর নারী তার নিজের প্রভাব ও কর্তৃত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বহু পুরুষকে দেহ সঙ্গী করত। এই দেহের নিগড়েই নারী বেঁধেছিল গোষ্ঠীর পুরুষগুলোকে। নারীর দৈহিক আকর্ষণে পুরুষগুলি ছিল ঐক্যবদ্ধ। গোষ্ঠীর সংহতি ও ঐক্যের মূলাধার ছিল নারী। এক নারীকে বহু পুরুষ মিলে ভোগ করার সংযম সহিষ্ণুতা, উদারতা ছিল সে সমাজে। সে যুগে নারী ছিল অরণ্য প্রকৃতির মত স্বাধীন এবং মুক্ত। খাদ্য, মাংস, মধুর মত নারীও পরিবার ও গোষ্ঠীর সকলের সম্পত্তি ছিল। সকলের সমান অধিকার তাতে। সকলে মিলে ভোগ করত তাকে। পরিবার বা গোষ্ঠী থেকে পৃথক করে নারীকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে ভাবা হত না। ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ হয়নি তখন। তাই সে যুগে যা সম্ভব হয়েছে বর্তমানে তা যে হয় না এ কথা ভাববার মত বুদ্ধি হয়েছে যুধিষ্ঠিরের। তার মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ ভাই-এর বিবাহের প্রস্তাব দিল তখন কিছু ভেবেই বলেছে সে। কিন্তু তার ভাবনাটা কি? দ্রৌপদীর দেহ-সৌন্দর্যের আকর্ষণে কি বাঁধতে চাইছে তাদের ভাইয়ে ভাইয়ের ঐক্য? কিন্তু কি করে যে তা সম্ভব, কুন্তীও পারে না তার সমাধান করতে। তথাপি, অনেক ঘটনা তার মন ছুঁয়ে গেল।

জন্ম থেকে পুত্রেরা তার অরণ্য পরিবেশে মানুষ। জীবনের বেশির ভাগ সময় তাদের কেটেছে অরণ্যে। অরণ্যের জীবন মুক্ত, স্বাধীন এবং উদার। সেখানে কোন অবগুণ্ঠন নেই। নেই ছলনা, প্রতারণা, মাৎসর্য। বনভূমির সম্রাট যে বনস্পতি, জীবকুলের বন্ধু সে। তাদের একমাত্র আশ্রয়। ছায়া দিয়ে, ফল দিয়ে, শাখা-প্রশাখা দিয়ে জীবকুলকে রক্ষা করেছে সে। এই বনভূমি থেকে পাণ্ডবেরা শিক্ষা দিয়েছে। অরণ্য পরিবেশেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ঐক্য এবং সহযোগিতার দরকার। অরণ্যের জীবন যেমন বিপদসংকুল, তেমনি অনিশ্চিত। ভোগ্য দ্রব্য প্রতিদিন সমানভাবে মেলে না। তাই পুত্রদের সে শিখিয়েছে, যা কিছু তোমাদের শক্তি তাও পাঁচজনের। এই ঐক্যবোধই দুর্দিনে এবং বিপদে-আপদে তাদের রক্ষা করবে। প্রাণ থাকতে কেউ কাউকে ত্যাগ করেনি কখনও। পুত্রেরা তার এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে। তাই তাদের ভ্রাতৃপ্রীতিতে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রতারণা, অধর্মের স্থান নেই। বনভূমির মত উদার, সরল, মহান তারা। কিন্তু দ্রৌপদী তাদের জীবনের অনুশাসনগুলি হঠাৎ ওলোট পালোট করে দিল। জীবনের সব কিছু যে ভোগ করা যায় না, এ চিন্তা সেদিন কুন্তীর মনে হয়নি। এরকম একটা সংকট যে কোন দিন আসবে তার জীবনে, স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। উদ্বেগ আশঙ্কায় তার মন ক্রমেই অস্থির হল।

ভীমের আকুল করা 'মা-মা' ডাক শুনে কুন্তী ভীষণ বিব্রত অসহায় বোধ করল। সাড়া দেবার জন্য বুক তার টন টন করছিল। কিন্তু ভীমের জিজ্ঞাসার কি উত্তর দেবে সে? এক অজ্ঞাত ভয় এবং অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে অস্থির করে তুলল। হৃদয় সংকটের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত তার মাথার মধ্যে খেলে গেল। দ্রৌপদী এবং বনের বনস্পতির মধ্যে একটা মিল দেখতে পেল সে। বনস্পতি যেমন জীবকুলের আশ্রয় দ্রৌপদী তেমনি পাণ্ডবদের অবলম্বন। তাদের ঐক্যের প্রতীক। শক্তির স্তম্ভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহান উদার নারী সে। তার শরীর, প্রেম, কর্তব্য, কর্তৃত্ব, হবে পঞ্চ পাণ্ডবের বন্ধন।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দ্রৌপদীকে দেখার পর সে প্রত্যয় দৃঢ় হল। দ্রৌপদী সাধারণ রমণী নয়। এক অদ্ভুত আশ্চর্য নারী। বাইরে থেকে তাকে পরিমাপ করা শক্ত। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে এমন একটা অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ পেল যা দেখে মনে হয় বিধাতা কর্তৃত্বের শক্তি দিয়েছেন তাকে। পঞ্চ পাণ্ডবের লাগাম কেবল সে পারে শক্ত হাতে ধরতে। তবু কুন্তীর নারী-হৃদয় বিচলিত হল। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী বরণের অসংগত প্রস্তাব উচ্চারণ করতে তার সরমে লাগল, কে যেন জিহ্বা টেনে ধরল। প্রবৃত্তিগামী পুত্রদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে ফুলের কত নিষ্পাপ একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারবে না। না, কিছুতেই না। নারী হয়ে দ্রৌপদীর নারীত্বকে অপমান করার মত লজ্জা গ্লানি আর কিছু নেই।

ক্ষণকালের জন্য কুন্তী স্তম্ভিত মূক হয়ে গেল। এক গভীর দুশ্চিন্তায় সে অন্যমনস্ক, উদাসীন। দ্রৌপদীর সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছিল তার। তাই কক্ষ থেকে বাইরে এল না। ভীমের সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে আচমকা অন্যমনস্কের মত বলল : যা পেয়েছ তা পাঁচভাইয়ে ভাগ করে নাও। এবং চকিতে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তারপরেই কেমন একটা লজ্জায় বিব্রত এবং সংকুচিত হল। বুকের মধ্যে হায় হায় করে উঠল। কথা বলবে না, বলবে না করে মনকে শক্ত করল অথচ সেই কথাটাই মুখ দিয়ে হঠাৎ উচ্চারিত হওয়াতে বিস্মিত হল সে। কথাটা বলার পরে বুকের ভারও নেমে গেল। কিন্তু মনের লজ্জা ঘুচতে চায় না। তাই কক্ষ থেকে বাইরে আসা তার কঠিন হল। কোন মুখে সে দ্রৌপদী অর্জুনের সামনে দাঁড়াবে? কি করে বোঝাবে যে, এ তার মনের কথা নয়। নিজের অজান্তে বাধ্য হয়েই বলেছে। এখন পুত্রেরা ভুল আদেশকেই যদি মাতৃ-আজ্ঞা বলে পালন করে তা হলে বুঝতে হবে পঞ্চ স্বামী নিবন্ধন দ্রৌপদীর ললাট লিখন।

অনেকক্ষণ ধরে সেখানে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। মাথা হেঁট করে বসেছিল পঞ্চপাণ্ডব। কেবল, দ্রৌপদীর কৌতূহলিত দুটি চোখ দ্বারের দিকে নিবদ্ধ ছিল। গৃহ-দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হল। কুটীরের চাল নিচু থাকার জন্য দেহের নিম্নাংশ দেখা গেল। শুভ্র বসন পরিহিত এক মহিলা দরজার মুখে দণ্ডায়মান। তারপর, তার পদদ্বয় দেখা গেল চৌকাঠের বাইরে। এক-পা, এক-পা করে নিঃশব্দে এগিয়ে এল সে। দ্রৌপদীর বিস্ময়ের অবধি নেই। কে এই রমণী? পঞ্চ-পাণ্ডব জননী কুন্তী! এরকম রহস্যময় আচরণ কেন তাঁর? কেন? দ্রৌপদী আকুল করা জিজ্ঞাসার কোন জবাব খুঁজে পেল না। কেবল অবসন্ন হল শরীর।

জ্যোৎস্নার আলো পড়ল দ্রৌপদীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর। চাঁদের আলোয় ঝলকে উঠল তার সারা দেহের রত্ন অলংকার। ছাই ছাই অন্ধকারে তাকে রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল।

কুন্তী থমকে দাঁড়াল তার সামনে। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। দ্রৌপদীর ডাগর চোখ দুটিতে অনিশ্চয়তার ভয় ও জিজ্ঞাসা। কুন্তীর প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতার মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। সহসা বাতাস উত্তর দিকে থেকে এসে দুলিয়ে দিয়ে গেল কুন্তীর এলায়িত কুন্তল। দ্রৌপদীর মুখের ওপর উড়ে পড়ল। আঙুল দিয়ে কুন্তী সেগুলো সরিয়ে দিল। তার স্পর্শে দ্রৌপদীর সারা অঙ্গ শির শির করে উঠল। কুন্তীর বুকের মধ্যেও চিন্‌চিন্ করছিল। মনে হল, অন্তর রাজ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট দুর্যোগ ঘটে গেছে। জমাট বাঁধা স্তব্ধতার বরফ হঠাৎ গলে জল হয়ে গেল যেন। রুদ্ধ আবেগে দ্রৌপদীকে দু'হাত দিয়ে বুকে টেনে নিল। কিন্তু তার শরীর ভীষণ ঠাণ্ডা। চমকে উঠল কুন্তী। দ্রৌপদীর দেহে উত্তাপ নেই কেন? সে কি তবে ভয় পেয়েছে? ভয়ে মানুষের শরীর

হিম হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় অনুভূতি অবশ হয়। দ্রৌপদীরও তাই হয়েছে মনে করে, তার শরীরে উত্তাপ সঞ্চারের জন্য মাথাটা কাঁধের ওপর টেনে নিল, কখনও বা মুখের ওপর মুখ ঘষে তাকে আদর ও স্নেহ জানাতে লাগল।

দ্রৌপদী কথা বলল না। কুন্তীর মনের কষ্ট বুঝতে অসুবিধা হল না তার। কুন্তীর অবাক বিভ্রান্ত মুখের দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল দ্রৌপদী। একটা জিজ্ঞাসায় তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না।

কুন্তী প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল : কে দিয়েছিল তোমার ঐ কৃষ্ণা নাম। সার্থক নাম তোমার। কালের কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন খুলবার জন্যে বিধাতা বোধ হয় তোমার জনকের কণ্ঠে ঐ নাম দিয়েছেন। অপ্রাপনীয় তুমি। তাই, এক দুর্লভ শর্ত ছিল তোমার স্বয়ম্বরে। বোধ করি, সেও বিধাতার ইচ্ছায় হয়েছিল। শুনেছি, দেবকন্যা তুমি। দেবকার্য সাধনের জন্যে মানুষের ঘরে এসেছ। তবু, সেকথা কখনো শুধিয়ো না আমায়। মুনি, ঋষি, জ্যোতিষীরা জানে তোমার অদৃষ্ট। শুধু মনে রেখ, অপূর্ব তুমি! তোমার চোখে চুম্বক, রূপে মোহ, স্পর্শে দাহ। অপূর্ব তোমার ভাগ্য! ভাগ্যের চেয়ে বড় আর কিছু-আছে? পিতার বুকের আগুনে তোমার উদ্ভব। বহ্নিকন্যা তুমি। তোমার রহস্য বাঁকা ওষ্ঠরেখার দিকে তাকালে মানুষ উন্মাদ হয়। তোমার সামান্য ছোঁয়া লাভের জন্য পুরুষের হৃদয়ে আগুন জ্বলে। তোমার রূপ হল ভয়ংকর সর্বনাশা। ঐ, অতুল রূপ নিয়ে তোমার একজনের ভার্যা হওয়া নিরাপদ নয় মা। দৈব-ইচ্ছা যাই হোক মানুষ বিচার করে কার্য-কারণ ঘটনাকে। আমিও তেমন ভেবেছি, পুত্র আমার কাকে জয় করল? একটি রমণীকে, না বীরভোগ্যা কামিনীকে? সে জয় সুরক্ষিত করতে হয়েছে শক্তি দিয়ে, অসুরত্ব দিয়ে। তবু বলব, আশ্চর্য এক মহান জয়লক্ষ্মী তুমি পাণ্ডবের। সহস্র ভাগ্যকে শেকলে বেঁধেছ। তুমি পাণ্ডবের মান, পাণ্ডবের সম্মান। তুমি তাদের পৌরুষের বিজয় কেতন। পাণ্ডবের সেই বিজয় গৌরবও কোন একজনের নয়। পঞ্চপাণ্ডবের তাতে সমান ভাগ। পাণ্ডবের জয়লক্ষ্মীর ওপর পঞ্চপাণ্ডবেরও তেমনি সমান দাবি। তুমি শুধু অর্জুনের নও, পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা।

দ্রৌপদী নির্বাক। মুগ্ধতার এক অপরূপ ছবি সে। কুন্তীর প্রতিটি কথা তার মস্তিষ্কের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল। যা উচ্চারিত হতে হতে সে নিজেকে আবিষ্কার করল। অনুভব করল। দ্রৌপদীর বিস্ময় মুগ্ধতা তার চোখে মুখে সঞ্চারিত হল। কিন্তু তারপরে কেমন একটা বিভ্রান্ত বিস্ময়ে মুখখানি আঁধার হয়ে গেল। সহসা অভিমানাহত কণ্ঠে বলল : সবই ভাগ্য! বিধাতার ভ্রূকুটি।

কুন্তীর মুখে সমবেদনার অভিব্যক্তি অনিবার্যভাবে জাগল। বলল : নারীর ভাগ্যে শুধুই বন্ধন। বিধিলিপির দুর্জ্ঞেয় বন্ধন শুধু নয়, বাহুর এবং শৃঙ্খলের নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় আত্মার নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় ভয়ংকর বেদনাদায়ক। কিন্তু পাণ্ডবদের উষর মরুতে তুমি এক আশ্চর্য শতদল। তোমার কাছে তারা প্রেম চায়। প্রেমের বীর্যে নিঃশঙ্ক হতে চায়। সত্যকারের প্রেম কখনও ভোগে মলিন হয় না। প্রেম হল ত্যাগের ঔদার্যে, বিশ্বাসের মহানুভবতায়, নির্ভরতার শক্তিতে, সহযোগিতায়, দাক্ষিণ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। প্রেম বিশ্বাসে বলীয়ান, ত্যাগে মহান, বাসনায় সুন্দর। সেই জীবন পাঠ গ্রহণের জন্যে বোধ করি বিধাতা তোমাকে তাদের ললাট লিখন করেছে। এ তোমার বিধিলিপি। মনস্তাপের কিছু নেই। পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হয়ে তুমি ভাল কাজ করলে।

স্তব্ধ পঞ্চ পাণ্ডব।

নিরুত্তর দ্রৌপদী। উদ্দীপ্ত চোখে মুখে বিস্ময়। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা অসহায় কষ্টকর অবস্থা।

রাত গভীর হল। নিথর ঘুমে স্তব্ধ চরাচর। কেবল দ্রৌপদীর চোখে ঘুম নেই। জেগে আছে অর্জুনও। খোলা জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না ঢুকছে ঘরে। উজ্জ্বল আলোয় কক্ষ উদ্ভাসিত। সে আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সকলকে। দেয়ালের গায়ে মানুষের ছায়া নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দ্রৌপদী। পা টিপে টিপে তৃতীয় পাণ্ডব উঠোনে নেমে গেল। জ্যোৎস্নায় তাকে স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছিল। চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে আড়ষ্টতা এবং লজ্জা কাটিয়ে দ্রৌপদীও চুপি চুপি দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে এল। অস্তমুখী চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দ্রৌপদী। দূরে আকাশে তার উদাস চোখ।

অর্জুনের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল দ্রৌপদী। পলকের তরে চমকে উঠেছিল অর্জুন। বসন প্রান্তের স্পর্শে থরথরিয়ে উঠল তার শরীর। কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল পুলকিত শিহরণ। অপরিসীম বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গেল। নাসারন্ধ্র একটু কাঁপল। ঠোঁটের কোণ বক্র হল। বিস্মিত অর্জুন জিগ্যেস করল : দ্রৌপদী! তুমি! তুমি ঘুমোওনি?

দ্রৌপদী একটুও চমকাল না। পদ্মপলাশতুল্য অপলক দুটি চোখ অর্জুনের চোখের ওপর রাখল। শান্ত গলায় বলল : তুমি কেন ঘুমোওনি প্রিয়তম?

অর্জুনের বুকের মধ্যে একটা কষ্ট মোচড় দিল। উত্তর দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। না জানার কাতরতা অর্জুনকে গম্ভীর আর অন্যমনস্ক করল। অপলক দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে থাকল সলজ্জ হাসিতে উদ্ভাসিত হল মুখখানা।

দ্রৌপদীর আকুল উদ্বিগ্নতা চেপে রাখা অসম্ভব হল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল : প্রিয়তম আমি তোমারই জয়লব্ধা। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানি না। আমি চাই তোমাকে।

এরকম অদ্ভুত দাবি নারীর মুখে শোনেনি পুরুষ। চাইবার দাবিটা চিরকাল পুরুষের। দ্রৌপদীর মুখে কেশর ফোলানো সিংহের সেই অপ্রত্যাশিত হুঙ্কার শুনে চমকে উঠল অর্জুন।

পুরুষ বীর্যবান, নারী বীর্যহীন। বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে দাবী করে। পৌরুষ বলে অধিকার করে থাকে। পুরুষের বলগর্বিত দাবীর কাছে নত হয় নারী, তার বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই জোর করে আদায় করাকে নারীর চরম এবং পরম সম্পদ মনে করে তৃপ্ত হয়। কিন্তু দ্রৌপদী তাদের মত নয়। সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নারী। তার দৃপ্ত ভঙ্গি, চোখের দ্যুতির দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, মূর্তিমতী আদেশ সে। তাকে উপেক্ষা করা যায় না, অবহেলাও করা যায় না। নীরবে অনুসরণ করতে হয়। কর্তৃত্বের এক আশ্চর্য শক্তি তার মধ্যে আছে। স্বয়ম্বর সভায় কর্ণের মত ব্যক্তিও তার ইচ্ছাতেই ধনুর্বাণ রেখে দিয়ে ফিরে যায় নিজের জায়গায়। দ্রৌপদী এক অনন্ত বিস্ময়। বিস্ময়ে পুলকে অর্জুনের বুক কেঁপে উঠল। দ্রৌপদীকে ভীষণ ভাল লাগল তার। দ্রৌপদী এক অনন্য রমণীরূপে প্রতিভাত হল তার চোখে। মনে হল, জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতায় দ্রৌপদী একক। অথচ তার মধ্যে একটা নিষ্পাপ শিশু আছে। যার মনে অনন্ত সরলতা, বুকে প্রেমের মধু, চোখে প্রেমের ভাষা, কণ্ঠে আহ্বানের বাণী। সেই মুহূর্তে অনুভব করল, কিসের ভারে বুকটা ভেঙে পড়ছিল, যা প্রায় অসহনীয় ছিল তার। গভীর আবেগে অর্জুন দ্রৌপদীকে বুকে টেনে নিল। বুকের ভেতর তরঙ্গ বয়ে গেল, আপনা থেকে দ্রৌপদীর দেহ শিথিল হয়ে এল। আত্মদানের আবেগে থর থর করে কাঁপছিল। শরীরের কোষে কোষে যে এত উল্লাস ও যাতনা থাকতে পারে জানা ছিল না। অনির্বচনীয় মহিমময় সুখের আবেশে অর্জুনের একখানি হাত নিবিড় আবেগে বুকে চেপে ধরল। মুখ ঘষতে লাগল তার পেলব বলিষ্ঠ বাহুতে।

সোহাগের আবেগে অর্জুন তার মাথায় মুখ রেখে চুলের ঘ্রাণ নিল। মুক্ত কেশের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল, আর একটা অসাধারণ সুখের অনুভূতির আবেশে বিভোর হয়ে রইল গভীর অনুরাগে এবং সুখের নেশায় দ্রৌপদীর নরম শরীরটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

মগ্ন সুখে অভিব্যক্তিহীন এক অচৈতন্যের ঘোরে আচ্ছন্ন দ্রৌপদী এবং অর্জুন। অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে।

দ্রৌপদীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বিভ্রান্ত বিস্ময়ে অর্জুনের চোখের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন খুঁজল। উৎকণ্ঠায় তার বুক কেঁপে উঠল। হারানোর শঙ্কায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মুখে কষ্টের ছাপ। একটা কাঠিন্য ফুটে বেরোচ্ছিল। আস্তে আস্তে শান্ত গলায় বলল : আমি শুধু তোমারই।

বিহ্বল কণ্ঠে অর্জুন বলল : কে বলে তুমি আমার নও? তুমি আমাদের সকলের। তোমায় পেয়ে ধন্য হলাম আমরা।

স্তব্ধ বিস্ময়ে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে রইল দ্রৌপদী। অব্যক্ত বেদনায় ঠোঁট দুটি তার কেঁপে উঠল। অর্জুন মনকে শক্ত করল। শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল : প্রিয়ে! তোমার কষ্ট আমি অনুভব করি। জননী কুন্তী নিষ্ঠুর নয় তোমার প্রতি। তবু সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। এজন্যে আমাদের কারো দুঃখ করা উচিত নয়। এ আমাদের ভাগ্যলিপি। বিধি নির্বন্ধ কে কবে অতিক্রম করেছে? অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্র অভিষেকের দিনেই হলেন নির্বাসিত। মানুষ বিধিলিপির দাস। আমরা জীবন দিয়ে অনুভব করছি। কোন দোষ আমরা করিনি, তবু রাজপুত্র হয়েও রাজ্যহীন। গৃহ থেকেও নিরাশ্রয়। সিংহাসনের অধিকারী হয়েও বনবাসী আমরা। কেন? কার দোষে? অদৃষ্ট আমাদের ভিখারী করেছে। সেজন্য তাকে দোষ দিই না। নতমস্তকে বিধাতার ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছি। ঈশ্বরের কৃপাতেই আমরা এক অভিনব জীবনকে জেনেছি। লক্ষ মূঢ় মূক জনসাধারণের দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট, দুর্ভোগ, শোষণ-পীড়নের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের। বিভিন্ন স্থান ঘুরে আমরা মানুষকে জেনেছি, রাজনীতিকে বুঝেছি। দুঃখী মানুষদের প্রতি মমতা জাগানোর জন্যেই বিধাতা বোধ হয় আমাদের এই দুর্দশার সৃষ্টি করেছেন। মদগর্বী ঐশ্বর্যলোলুপ, ক্ষমতালোভী অধার্মিক স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের দম্ভ, অহংকারে ভরে গেছে ভারতবর্ষ। তাদের অত্যাচার অবিচারে তারা ভীরু ও দুর্বল। রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি সাহস তাদের নেই। ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে যুগ যুগান্তর ধরে তারা অসম্মানের বোঝা হয়ে চলেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, অসহায় অবস্থা তাদের মতই করুণ, মর্মান্তিক। কিন্তু রাজরক্ত আছে আমাদের ধমনীতে। তাই, কাপুরুষের মত অসহায়তার লজ্জা বয়ে বেড়ায়নি। দেশে দেশে বিপ্রের বেশে পরিভ্রমণ করে মানুষের মন পরিবর্তন করেছি। তাদের প্রাণে সাহস, বুকে বল সঞ্চার করেছি। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের কথা মনে রেখে আমাদের স্বার্থে নিয়োগ করেছি তাদের। একটু একটু করে পাণ্ডবের অনুকূলে হাওয়া বইতে শুরু করল। জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়ে লোকের মনে সংশয়ের জট সৃষ্টি হল। এমন সময় ব্যাসদেবের পরামর্শে তোমার পিতা স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করলেন। ব্যাসদেবের নির্দেশে ধনু লক্ষ্য সব নির্মিত হল। ঘটনাচক্রে জয়ী হলাম আমরা। তুমি আমাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। কিন্তু তোমাকে বরণ করার সম্পদ পান্ডবের ঘরে নেই। তাই পঞ্চভাই-র হৃদয়-কমল নিবেদন করে অর্চনা করছে তোমায়। এই পূজা গ্রহণ কর তুমি। প্রসন্ন হও। তোমার দেবার ধন অনেক। নিঃস্ব, রিক্ত পাণ্ডবদের জীবনে ঐশ্বর্য তুমি। তোমাকে নিয়ে তাদের গর্ব। এই আত্মনিবেদনের মুখ থেকে নিজেকে দূরে দূরে রেখে শুভলগ্ন ব্যর্থ হতে দিও না। তাহলে পাণ্ডবদের উদয়রবি জন্মেই রাহুকবলিত হবে। বল, দ্রৌপদী পারবে না? পাণ্ডবদের জন্য এটুকু করতে পার না তুমি? বল, চুপ করে থেক না।

দ্রৌপদী বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বিহ্বল। কি জবাব সে দেবে? বাইরে নিশ্চল স্থৈর্যের মধ্যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অস্থিরতা। কেমন করে সে বোঝাবে অর্জুনকে? ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। অর্জুনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক ঠেলে একটা ভারী নিশ্বাস বেরিয়ে এল। চোখে মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটল। ওষ্ঠাধর রহস্যময় হাসিতে ঈষৎ বক্র এবং ভ্রুকুঞ্চিৎ হল। স্বগতোক্তির স্বরে বললঃ আশ্চর্য তোমার যুক্তি। মাতার ইচ্ছাটাই তোমাদের বড়, আমার মনটা কিছু না। নারী বলে কি আমার পছন্দ, ইচ্ছা থাকতে নেই। নিষ্ঠুর তুমি। তোমার মন বলে কিছু নেই।

দ্রৌপদীর অশ্রুসিক্ত দুটি নয়ন প্রেমের নির্ঝরণী হয়ে অর্জুনের মনকে প্লাবিত করল। অবাক স্বরে বললঃ প্রিয়ে, কাননে যে ফুল ফোটে তার বুকে যেমন মধু থাকে, তেমনি ভুবন আলো করা যে নারী তার বুকে থাকে প্রেম। প্রেমই অমৃত। তাকে একলা ভোগ করতে নেই। করতে গেলে বিরোধ বাঁধে। অমৃত নিয়ে দেবতা অসুরের কাড়াকাড়ি, বিবাদ চিরকাল।

অশ্রু জড়িত কণ্ঠে দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিল। বললঃ কিন্তু প্রিয়তম, প্রেম অমৃত হয় প্রেমময় হৃদয়ে। যেখানে ভালবাসা নেই, প্রেম নেই শুধু আছে দেহের দাসত্ব, সেখানে বিবাদ নিত্য। একটা গোপন জ্বালা নিভৃত অবসরে প্রেমিকের মনকে পোড়ায়। সে দাহ শীতল করব কি দিয়ে?

শোনো কৃষ্ণা, বাসনা, কামনা, প্রেম মানুষকে বড় করে আবার ছোটও করে। আমাদের অন্তরের এই আলাদা আলাদা বৃত্তিগুলোকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। দেবতাদেরও মানুষের মত কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য আছে। এই প্রবৃত্তির ভাগ পেয়েও তারা অমৃতলোক অধিষ্ঠিত। আব মানুষ ষড়রিপুর ইন্দ্রজালে বিভ্রান্ত হয়ে ভাগ্যহত। মানুষের জীবনের সব প্রচেষ্টা আর সব পুরুষকারের পেছনে রয়েছে ষড়রিপুর নিষ্ঠুর ছলনা। মানুষই পারল না তাকে অবহেলা করতে?

কি উত্তর দেবে দ্রৌপদী? চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার দীঘল চোখের ঘন পল্লবে ব্যথা জমে উঠল। আবেগ বিহুল কণ্ঠে বললঃ নিষ্ঠুর. এ কথা বলতে কষ্ট হল না। রূপসর্বস্ব এই দেহটা তোমার ভাইরা ছেঁড়াছেঁড়ি করলে তোমার পুরুষ প্রাণে তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না? করুণা হবে না আমার জন্য। নিজের অধিকারের উপর অন্যের কর্তৃত্ব মেনে নিতে তোমার কষ্ট হবে না? চুপ করে থেক না।

অর্জুনের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। ধরা গলায় বললঃ প্রিয়ে আমার বুকে স্পন্দনহীন শীতল তুষারের মত অনুভবহীন প্রেম তোমার প্রেমের উত্তাপে আজ তটিনীরূপ ধারণা করেছে। দেহ সুবাসে মন হয়েছে উতলা। এ অবস্থায় তুমি দুর্বল করে দিও না আমায়। প্রেমের শক্তি দিয়ে জয় কর সব বাধা। প্রেমের ফাঁদে আঁটকে রাখ পঞ্চ পাণ্ডবকে। এ অর্জুনের মিনতি।

কানে আঙুল দিয়ে দ্রৌপদী আর্তনাদ করে উঠলঃ আঃ-চুপ কর। আর সইতে পারছি না। আমায় একটু একা থাকতে দাও।

অর্জুন স্তব্ধ। চোখে তার বেদনা ঘনিয়ে উঠল। মৌন বিস্ময়ে দ্রৌপদীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাষাহারা প্রেম এক অনির্বচনীয় আবেগে বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। নিবিড় বাহুপাশে বাঁধল তাকে বুকের মধ্যে। চোখের উপর চোখ রাখল। কি যেন তন্নতন্ন করে খুঁজল তার দুই চোখ। তারপর আবেগ গাঢ় স্বরে বললঃ প্রিয়ে ধনৈশ্বর্য দিয়ে যা কেনা যায় না, শক্তি দিয়ে যা জয় করা যায় না, তা হল নারীর প্রেম। নারী প্রেমিকা হয় অনুরাগের বাঁধনে। তুমি মূর্তিমতী প্রেম। শুধুই পুরুষের প্রেমিকা। প্রেম তোমার সাধনা। প্রেমের মহত্ত্বে তুমি হবে কলঙ্কশূন্যা। একনিষ্ঠ প্রেমেই পতিব্রতা নারীর একমাত্র সম্পদ। প্রেমের একনিষ্ঠতার জোরে নারী-বহুপুরুষের সংসর্গেও ব্যাভিচারিণী হয় না।

দ্রৌপদীর বুক ঠেলে যেন এক আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল। প্রিয়তম!

অর্জুন নির্বিকারভাবে বললঃ প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, বাসনার বুকে তেমনি প্রেমের প্রতিষ্ঠা। নারী পুরুষের অনন্ত বাসনার অমর প্রেম শিখা। প্রেমিকের জন্য তোমার দেহ-প্রদীপ জ্বাললে আলোয় ভরে যাবে তোমার হৃদয়। তখন বুঝতে পারবে যে, তুমি পাণ্ডবের লালসার খাদ্য নও, আকাঙ্ক্ষাতে অমৃত। আমার হৃদয় সিন্ধু।

দ্রৌপদীর তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করে বললঃ না, না, অমন করে বল না। তোমার বুকের কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি। শুধু কথা দিয়ে আমায় ভোলাতে চাইছ, নিজেকেও ভোলাচ্ছে। এ ভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্তরের সঙ্গে সন্ধি হয় না। হয় না-গো—

রুদ্ধ কান্না বুকে নিয়ে দ্রৌপদী দ্রুত পায়ে সেখান থেকে দৌড়ে চলে গেল। হতভম্বের মত একা দাঁড়িয়ে রইল অর্জুন। চোখের কোণ দিয়ে নিজের অজান্তে তার দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

॥ তিন ॥

পাণ্ডবদের পরিচয় জ্ঞাত হওয়ার পরেই দ্রুপদ রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন পৃথক একটি অট্টালিকায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। দ্রৌপদী ছাড়া পাণ্ডবেরা সকলেই সেখানে থাকল। আর দ্রৌপদী সখী পরিবৃতা হয়ে তার নিজের কক্ষেতে প্রবেশ করল।

দ্রৌপদীকে নিয়ে সখীবৃন্দের নানা কৌতুহলিত জিজ্ঞাসা। কিন্তু তাদের সঙ্গে হাসি তামাসায় যোগ দেবার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। হাতের ইশারায় তাদের সকলকে বিদায় দিয়ে সে একটু নিরিবিলিতে একা থাকতে চাইল।

গত কয়েকদিন ধরে তার মনের ওপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেছিল। সে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে তার স্বপ্ন, কল্পনা। আশার সৌধ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে। স্বয়ম্বরের আগের দিনগুলোর ভাবনার

সঙ্গে পরের দিনগুলোর কোন মিল নেই। অর্জুনের বীরত্ব, পাণ্ডবদের মহত্ব, তাদের লোকরঞ্জন ক্ষমতা, ভ্রাতৃপ্রেম, মাতৃভক্তি, কুন্তীর পতিব্রতের বিচ্ছিন্ন কাহিনী শুনতে শুনতে সে একটা নিজের ধারণার জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল। শ্বশুরালয়কে নিয়ে এরকম কল্পনার প্রাসাদ বিয়ের আগে সব মেয়েই গড়ে তোলে। কিন্তু আশার সে সৌধ বিয়ের দিনেই যে ভেঙে পড়বে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। দ্রৌপদীর সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটি স্ফুরিত ঝংকার বাজছিল, কেন? কেন অমন হল? কি পাপ করেছে সে? প্রশ্নটা বারংবার যেন তার বুকের মধ্যেই আঘাত করছিল। উত্তেজিত আচ্ছন্নতার মধ্যে কুন্তীর মুখের বিব্রত অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি তার চোখে ভাসছিল। অর্জুনের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আহত অভিমান নিয়ে দৌড়ে যখন কুটীরে ঢুকল কুন্তীকে বিছানায় জেগে বসে থাকতে দেখে ভূত দেখার মত চমকাল। মনের দৃঢ়তা সত্ত্বেও কেমন একটা অপ্রস্তুতিবোধে সে সংকুচিত হল। মুখে অসহায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। অপরাধীর মত একটা কৈফিয়ৎ দেয়ার চেষ্টা করলে কুন্তী কাছে ডাকল তাকে। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দ্রৌপদীর চোখের জল মুছিয়ে দিল। কুন্তীর স্নেহস্পর্শ পেয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নার ডুকরে কেঁদে উঠল। দ্রৌপদীর বুকের মধ্যে তখন যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল এবং অস্ফুট।

কুন্তী অসহায়ের মত তার চুলের ভেতর আঙুল চালনা করতে লাগল। বললঃ দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে শরীরটা শুকিয়ে গেছে। দুর্ভাবনায় চোখের ঘুম পর্যন্ত গেছে। অথচ দ্যাখো, আমি নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছি। তোমার ও অর্জুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য আমার কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। সত্যিই, আমি অতি নিষ্ঠুর। স্নেহ-মমতা সব বিসর্জন দিয়েছি যেন। তাই না? তোমার মত আমারও একদিন ব্যভিচার, প্রেম, সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ছিল। আকুল হয়ে উত্তরের অন্বেষণ করেছি। তারপর, হঠাৎ নিজের জীবন থেকে একদিন তার জবাব আবিষ্কার করলাম। নারী দ্বিচারিণী হয় দেহে, মনে নয়। মন তার পূজোর ফুল। থাক, আমার কথা। এখন আমি তোমার কথা ভাবছি। পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও—কথাটা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। দ্যাখো মা, অনেক সময় অনেক অবাস্তব, অসম্ভব কথা আমাদের মনে আসে। কিন্তু সচেতনভাবে তা কখনও প্রকাশ করা হয় না। তবে মনের অগোচরেই কখনও কখনও আকাঙ্খা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমার মুখে কথাটা তেমন হঠাৎ বেরিয়েছিল। এখনও সেজন্য অনুতাপের অন্ত নেই। তুমি রাগ করে ঝগড়া করলে দুটো মন্দ কথা বললে আমি শান্তি পেতাম। কিন্তু তোমার নীরব তিরস্কার আমাকে ছুঁচের মত বিঁধছে। প্রতিমুহূর্তে আমার অপরাধেরর গুরুত্ব অনুভব করে মরমে মরে যাচ্ছি। এর চেয়ে আর কি করে আমার দোষের কথা জানাতে পারি বল? বুঝতেই পারছি, তোমার যা কিছু কষ্ট তার জন্য আমিই দায়ী।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল কুন্তী। দ্রৌপদীর চোখের জল অনেকক্ষণ শুকিয়ে গিয়েছিল। শুনতে শুনতে সেও অভিভূত হয়েছিল। কুন্তীর আকস্মিক ক্রন্দনের তাৎপর্য নির্ণয় করতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তাকে শান্ত করার জন্য বলল: আপনি চুপ করুন মা। আপনি স্থির হোন। আপনার চোখের জলে ছেলেদের অকল্যাণ হবে।

প্রত্যুত্তরে কুন্তী বললঃ শান্ত হতে পারছি না। আমার বুকের মধ্যে বলিদানের নাকাড়া বাজছে। আমি কি করে স্থির থাকব? আমাকে মা বলে ডেক না তুমি। আমি মায়ের মত কাজ করেনি।

বিভ্রান্তি কাটিয়ে দ্রৌপদী হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসি ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল। বললঃ মিছিমিছি ওসব কথা বলে কেন দুঃখ পাচ্ছেন? এসবের কোন মূল্য নেই। আসলে দুর্ভাগ্যকে জয় করার একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ছিল আপনার। কিন্তু আমার পোড়ারূপ তার বিঘ্ন হবে মনে করেই আপনি সাবধান হলেন। এখনও সময় আছে। পুত্রদের বুঝিয়ে বলুন, এ রকম বিয়ে অসিদ্ধ। অসুর বিয়ের চেয়েও জঘন্যতম। একমাত্র আপনিই পারেন এ বিয়ে বন্ধ করতে।

দ্রৌপদীর উক্তি শুনে কুন্তী মুগ্ধ হল। অবাক জিজ্ঞাসা চোখে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, সে যেন ক্ষণজন্মা এক আশ্চর্য নারী। তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, চরিত্র মাধুর্য, দৃঢ় মনোবল এবং আত্মবিশ্বাসের মধ্যে এমন একটা অসাধারণত্ব আছে যা চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। তাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্তীর মনে খুশি আর লজ্জার ঝলক লেগে গিয়েছিল।

চিন্তিত স্বরে অনেকটা আপন মনেই কুন্তী বললঃ যদুকুলপতি কৃষ্ণকে দিয়ে সে চেষ্টা যে করিনি তা নয়।

তাদের কথাবার্তা পুত্রদের নিদ্রাভঙ্গ করল। কিন্তু চুপ করে নিদ্রার ভান করে শুয়েছিল তারা। অকস্মাৎ ভীম কুন্তীর কথার মধ্যে বলল: মহারাজ দশরথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামচন্দ্র পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বনে গিয়েছিল। আমরাও জননীর আদেশ শিরোধার্য করতে বদ্ধপরিকর।

যুধিষ্ঠির বলল: আদেশ কখনও ফিরিয়ে নেয়া যায় না। করলে সত্যভঙ্গ হয়। সত্যাশ্রয়ী পাণ্ডবেরা জননীকে কখনও সত্যভঙ্গ করতে দেবে না। পাণ্ডবদের দুর্নাম হোক এমন করে কোন কাজ করতে বলা জননীর উচিত নয়।

কুন্তী আবছা অন্ধকারের মধ্যে দ্রৌপদীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখতে না পেলেও তাব কণ্ঠস্বর শুনে অনুমান করতে পেবেছিল কুন্তীর উদ্বিগ্নস্বরে ছিল ব্যাকুল আর্তি।

মিথ্যে, মিথ্যে। সব মিথ্যে। ভগবানের পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত আচরণ তার প্রয়োজনে। সেজন্য নিজের সঙ্গে তার ছল চাতুরির অন্ত নেই। চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র-গ্রহ সকলেই জানে আমার কথা কত মিথ্যে। এক নারীর পঞ্চ স্বামী কখনও হয় না, হতে পারে না।

সেই মুহূর্তে দ্রৌপদীর বুকের মধ্যে আশার নাকাড়া বেজে উঠল। চোখ দুটো আনন্দে চক্ চক্ করে উঠল। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে যুধিষ্ঠিরের উত্তর শোনার প্রতীক্ষা করছিল।

যুধিষ্ঠির শান্ত গলায় বললঃ বৈদিকযুগে নবপরিণীতার বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হত না। তার সমস্ত সহোদর ভ্রাতাগণের সঙ্গেই হতো। আপকল্প-সূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের, সমস্ত ভ্রাতাকে। ঋগ্বেদে অথর্ববেদেও আছে যদিও কন্যাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করতো তা হলে তার কনিষ্ঠ সহোদরগণেরও তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অধিকার আছে। অসূর সমাজে যেখানে স্বামীরা সকলে সহোদর ভাই সেখানে ভ্রাতৃমূলক বহুপতি গ্রহণ করা হয়। ত্রেতাযুগে মুনিকন্যা ব্রাক্ষী একই সঙ্গে দশজন পতিকে বরণ করেছিল।

যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে সেখানে স্তব্ধতা নামল।

দ্রৌপদী এমন বিস্ময়ের কথা আগে কখনো শোনেনি। প্রাণের সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নিশাবসানের ঘন কালো অন্ধকার নামল। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট কুণ্ডলাকৃত হয়ে তাকে আষ্টে পিষ্টে পেঁচাল।

জানলার গরাদ আঁকড়ে ধরে সে যেন কষ্টটাকে প্রাণপণে নিবারণ করছিল। তারপর গরাদের ওপর মাথা রাখল। তবু উদ্গত অশ্রু বাধা মানল না। তার সমস্ত শরীর তরঙ্গের মত ফুলে ফুলে উঠছিল।

ভেজানো দরজা ঠেলে সেই মুহূর্তে কক্ষে ঢুকল রাজমহিষী সুদেষ্ণা। এমন অকল্পনীয় দৃশ্য যে তাকে দেখতে হবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সুদেষ্ণার জননী হৃদয়ে উদ্বেগে আচ্ছন্ন হল। নানা আতঙ্কিত সংশয়ে ও জিজ্ঞাসা তার মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে উঠল। দ্রৌপদীর অবস্থা দেখে তার বুকের ভেতর একটা কষ্ট হচ্ছিল। মাথা ঝিন্‌ঝিন্ করছিল। চোখের কোণে বড় বড় জলের ফোঁটা টল টল করতে লাগল। গলায় দরদ ঢেলে জিগ্যেস্ করল—কি হয়েছে মা? কেউ কিছু বলেছে? কি কষ্ট আমায় খুলে বল।

সব শোনবার পর সুদেষ্ণা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না। চিন্তিত স্বরে আপন মনে বললঃ এত বড় অধর্মের কোন প্রতিকার নেই? নারীর লজ্জা, সম্ভ্রম কেড়ে নেবে এমন দুরাত্মা তো পাণ্ডবেরা নয়। কৌরবেরা হলে বিশ্বাস করা যেত। কিন্তু—

সুদেষ্ণা কণ্ঠস্বর যুগপৎ সংশয় এবং বিস্ময়ে অভিব্যক্ত হল।

এমন সময় কন্যার কুশল জানতে সেখানে এল মহারাজ দ্রুপদ। ততক্ষণে দ্রৌপদী নিজেকে সামলে নিয়েছে। স্থির, নিশ্চল দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাল। ম্লান হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখমণ্ডল। কিন্তু চোখে মুখে একটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। কেমন একটা জড়সড় ভাব তার। বিব্রত লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। মাথা হেঁট করে বসে রইল।

দ্রৌপদীর আচরণে দ্রুপদ অবাক হল। বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল। তার কৃশ, শরীর, ম্লান, মুখ, শুষ্ক, চোখ, গম্ভীর বিষণ্ণ চেহারা দ্রুপদকে উদ্বিগ্ন করল। সুদেষ্ণার চোখে মুখে অবাক অবুঝ অভিব্যক্তি

তাকে ভাবিয়ে তুলল। চিন্তাকে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য অবাক স্বরে দ্রৌপদীকে জিগ্যেস করলঃ তোমার কি হয়েছে? খুলে বল মা। আমি তোমার পিতা। পিতাকে গোপন করতে নেই কিছু। পিতার মত নির্ভর, এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পিতার সস্নেহ আন্তরিক জিজ্ঞাসায়, দ্রৌপদীর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। চোখ মুখের ভাব বদলে গেল। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে। তবু মনে হল, পিতার জিজ্ঞাসু প্রশ্নের জবাব দেবার সাধ্য তার নেই। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মুর্ছা যাওয়ার মত একটা অসহায় কষ্টকর অবস্থা তার। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে কে কতো নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কোটে কে তা দেখতে পায়? কিন্তু কেউ কেউ অনুভব করতে পারে। পিতা দ্রুপদের সেই অনুভূতি তাকে অবাক করল। কিন্তু পিতাকে কি করে বোঝাবে তার মনের ভাষা? অর্জুনের নীরব নিষ্ক্রিয়তা যে তার জীবন সংকটের জন্য দায়ী এ কথা বলতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। মনকে শক্ত করে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলল তার সেই দৃপ্ততাকে, যা তাকে পৃথিবীর অন্য সব নারী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। তার এই অসাধারণ ভিন্নতা কারো কাছে প্রচ্ছন্ন নয়। সকলের কাছে সকল অবস্থাতেই সে তেজোদৃপ্ত এবং নির্ভীক। এই অনুভূতি তাকে দৃঢ় করে তুলল। দ্বিধা সংকোচের জড়তা কেটে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক অভিনব উপলব্ধিতে তার সত্তা আচ্ছন্ন হল। মনে হল সে আর দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদী নয়। সে পাণ্ডব কুলবধূ। বধূ জীবনের কর্তব্যবোধ, পারিবারিক দায়িত্ব সচেতনতা তাকে অন্য এক রমণীতে পরিণত করল। সঙ্কুচিত অনুভূতির মধ্যে অনুভব করল অর্জুনের প্রত্যাশা পুরণের সংকেত।

ভার্গবের কুটীর থেকে পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের জননী কুন্তীর সঙ্গে যখন পিত্রালয়ে সে যাত্রা করল তখন কুন্তীর নির্দেশে অর্জুনের সঙ্গে একটি পৃথক রথে আরোহণ করল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন কথা হল না। এক সময়, অর্জুন তার ডান হাতখানা নিজের মুঠোয় নিয়ে একটু একটু করে চাপ দিল। তারপর, মুখের ওপর মুখ রেখে আদর করল, চুম্বন করল।

এর পর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললঃ জান কৃষ্ণা, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না তুমি। কিন্তু বিশ্বাস কর, একটুও মিথ্যে বলছি না! কী করে যে আমি ভাইদের সঙ্গে মানিয়ে নেব শুধু তাই ভাবছি।......

অর্জুনের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ছিল। দ্রৌপদীর মন ভিজে গেল। কিন্তু যে উত্তর দেবে কি? বুক ফেটে তার কান্না আসছিল। দুর্জয় অভিমনে কণ্ঠ রুদ্ধ হল। উদ্গত অশ্রু সংবরণক করল বহু কষ্টে। তারপর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ শলাকায় অর্জুনকে বিদ্ধ করার জন্য বললঃ সংসারে জীবনের যাত্রাপথ যার রক্ত দিয়ে অভিষিক্ত হল তার শেষ পরিণতি কোথায় কেমন করে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা বোধ হয় সৃষ্টিকর্তারও বলা সম্ভব নয়। নারীর জীবনের শাশ্বত আশ্রয় তার স্বামী। সে যদি বিমুখ হয় তা হলে কিছু করার থাকে না তার। আমারও নেই। সবই অদৃষ্ট। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মানুষের সৃষ্টি। পুত্রের বাধ্যতার জন্য সংসারে এরকম অসহায় জীবনের করুণ বলি অনবরতই হচ্ছে। কে তার খোঁজ রাখে? পরিবার, সমাজ এবং দেশের দাবি'তো একটা জীবনের চেয়ে অনেক বেশি। একজন নারীর মনোরঞ্জন করার দায় কারো নেই। আবার, একজন বিশেষ কারোর মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও চলে না মাতৃভক্ত পুত্রের। শুধু জননীর জন্যই তাকে নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত নির্বিকার থাকতে হয়।

অপরাধী মত মাথা নত করল অর্জুন। দ্রৌপদীও অন্যদিকে মুখে ঘুরিয়ে বসল। পড়ন্ত রোদ ক্রমে ম্লান হয়ে এল। রক্তিম গোল সূর্য আরো ঢলে গেল পশ্চিম আকাশে।

পালঙ্কের উপর মুখ নিচু করে চুপচাপ বসেছিল দ্রৌপদী। তাকে নিরুত্তর দেখে দ্রুপদ আপন মনে বলল, এমন কী হল যে, দু'দিনে ওলোট পালোট হয়ে গেল সব? তারপর ইতস্তত করে বললঃ জীবনে পাওয়াটাই বড় কথা বড় নয় মা। পেয়েও অনেক যেমন হারায় তেমনি হারিয়েও আবার অনেকে পায়। হরিশ্চন্দ্র রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে সম্রাটের ঐশ্বর্য পেয়েছিল। একেই বলে সত্যিকারের পাওয়া। পাণ্ডু পুত্রেরা পিতার রাজ্য পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি। সর্বহারা হয়ে আজ তারা যাকে মহিষীরূপে লাভ করল সে হল তাদের সৌভাগ্যের জয়টীকা। এখন পাণ্ডবরাই তোমার সব। স্বামীর ঘরই তোমার ঘর, তোমার আপন জায়গা। তাদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে

নেওয়া সহধর্মিণীর কর্তব্য।

পিতার মুখের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দ্রৌপদী। অনেকক্ষণ পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলঃ সত্যি। কিন্তু ভাগ্যদেবতার অমোঘ নির্দেশে সব বানচাল হয়ে গেল।

বঞ্চনার কষ্টে তার বুকের ভিতর টন্‌টন্‌ করতে লাগল। একটা তীব্র অভিমানবোধে তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ হল। বজ্রগম্ভীর স্বরে জিগ্যেস করলঃ পিতা কেন তুমি স্বয়ম্বর করলে? কেন বললে অর্জুন তোমার-মনোনীত পাত্র? তাকে তোমার ভীষণ দরকার। তাই ধনুর্বাণ এবং লক্ষ্য তার মত করে তৈরি করলে। সে ছাড়া অন্য কেউ তার ব্যবহার জানে না। এ কথা কতবার বলেছ আমাকে। তৃতীয় পাণ্ডব বীর, মহাশক্তিধর। একমাত্র কর্ণ তার সমকক্ষ। তাই, তুমি নিশ্চিত হতে পারছিলে না। কর্ণ সম্পর্কে আমার মনে বিরাগ সৃষ্টির জন্য বারংবার সাবধান করে দিয়েছ, কুল শীল মানে যে নিকৃষ্ট তাকে কখনও বরণ করা উচিত নয়। কর্ণ সূতপুত্র. কোন ক্ষত্রিয় রমণী তার কণ্ঠে বিজয়ীর বরমাল্য দেয় না। বংশমর্যাদায় অনেক নিচে সে। শুধু তাই নয় দ্রৌপদীর যোগ্য নয় সে। মানুষ সব ব্যাপারে একটা অলৌকিক আশা করতে ভালবাসে। মনে মনে আমিও আশার সৌধ গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু এমন করে আশার সৌধ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে স্বপ্নে ভাবিনি। অথচ কত আশা নিয়ে সভামধ্যে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তার শত্রু হলাম। বলো, কার জন্যে? কেন তুমি বিভ্রান্ত করলে আমাকে? আমার কথাটা একবারও ভাবলে না কেন? তোমার মনোনীত পাত্র তৃতীয় পাণ্ডব কি দিয়েছে আমায়? বল? তার চোখে আমি নারী। শুধুই সঙ্গিনী। কার দোষে আমার এই অবস্থা? বলো?

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন আর অভিযোগ ছুঁড়ে দ্রৌপদী ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে আকুল স্বরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বুক ও পিঠ তার তরঙ্গের মত দুলছিল। কন্যার ক্রন্দনের মর্মোদ্ধার করতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে দ্রুপদ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যুধিষ্ঠির গৃহে প্রবেশ করল। সেখানে কৃষ্ণকে দেখে অবাক হল দ্রুপদ। প্রসন্ন হাসির আভা ফুটল কৃষ্ণের অধরে।

দ্রুপদের মুখেতে তীব্র উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি। উদ্‌ভ্রান্ত বিমর্ষ চোখের তারায় কৌতুহলিত জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণের চোখে চোখ পড়তে দ্রুপদ ম্লান হাসল। নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবেছিল দ্রুপদ, তাই যুধিষ্ঠিরের দ্রুত আসন ছেড়ে ওঠা এবং দাঁড়ানোটা সে দেখেও দেখল না। দ্রুপদের অন্যমনস্কতা যুধিষ্ঠিরকে এক অনির্বচনীয় চমৎকারিতায় নিশ্চুপ করে দিয়েছিল। সৌজন্য প্রকাশের প্রথম আলাপটুকু পর্যন্ত সে করতে পারল না। দ্রুপদের মুখের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে রইল।

কৃষ্ণের চোখে একটা সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল। দ্রুপদ একটা কিছু বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কৃষ্ণ তার আগেই বিস্ময়ের সুরে দ্রুপদকে বললঃ মহারাজ, পাণ্ডুপুত্রেরা প্রকৃতই নির্যাতিত মানবসমাজের যোগ্য প্রতিনিধি। মানুষের দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা তারা নিজের জীবন থেকে পেয়েছে। দেশের দেশে বিভিন্ন মানুষের অবস্থা এবং তাদের মনোভাব তারা অবগত। লক্ষ মূক মানুষের বুকে বল, প্রাণে ভরসা জাগানোর মত প্রেম ও শক্তি তাদের বুকে আছে। আমার ভাবতে ভাল লাগছে এই গণদেবতাবাই আমাদের সখা এবং আপনার পরমাত্মীয়।

আত্ম প্রশংসা শুনে যুধিষ্ঠির বিব্রত বিস্ময়ে মাথা নিচু করল। দ্রুপদের শরীরে শিহরণ লাগল। কৃষ্ণ তার পুলকানুভূতির শিহরণ হৃদয়ঙ্গম করে পুনরায় বললঃ সারা ভারতের অচল, অনড় জনরথ টেনে নিয়ে যাওয়ার শক্তি ও প্রেরণা জাগানোর মন্ত্র আছে দ্রৌপদীর প্রেমে ও ব্যক্তিত্বে। পঞ্চপাণ্ডবের রাশ শক্ত হাতে ধরার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব একমাত্র দ্রৌপদীরই আছে।

দ্রুপদের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ তার মনের গতি পরিমাপ করল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে বললঃ স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণার নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, দৃপ্ত মনোবল, তেজ প্রকাশের সেই দৃশ্যটি আমি ভুলতে পারছি না।

কৃষ্ণের উক্তিতে দ্রুপদের ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হল। অস্বস্তিকর অস্থিরতার স্থলে একটা

প্রশান্তির ভাব সঞ্চার হল। ইতস্তত করে বললঃ মানে আমি বলছিলাম, পাণ্ডপুত্রেরা সকলে মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করা অশাস্ত্রীয় আচরণ। ব্রাহ্মণ এবং ঋষিরা শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্ক সমর্থন করে যাই বলুন, এ বিবাহে দ্রৌপদীর নিজের অসম্মতিটা বড় কথা।

যুধিষ্ঠির গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তার মুখের ভাব শুকনো ও কঠিন হল। দম বন্ধ করে দৃঢ়স্বরে বললঃ মহারাজ আমাদের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে অরণ্য পরিবেশে। সেখানে সভ্যতার আলো এখনও ভাল করে প্রবেশ করেনি। অরণ্যে যে সব মানুষের বসতি, আমরা তাদের অন্ন ও আশ্রয়ে থেকেছি। তাদের জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের সমাজে কোন কিছুর উপর কারো একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। সব সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার। এমন কি একজন নারীকে পরিবারের সকল পুরুষ মিলে মিশে ভোগ করে। তাদের সমাজে নারী সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। নারী পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী। কিন্তু উন্নত আর্য সমাজ নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত একা একা ভোগ করে। নারীর রক্ত মাংসের দেহটা পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত ধন। দেহের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পুরুষ নারী চায়। তাই, এক নারীতে তৃপ্ত নয়। সম্পত্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধির মত স্ত্রী ও চিত্ত বিনোদনের সঙ্গিনী ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। পুরুষের বহুপতিত্ব গ্রহণ কারো কাছে দোষবহ নয়। কিন্তু স্ত্রীর বহু বল্লভ থাকা পাপ। অমার্জনীয় নৈতিক অপরাধ। কেন? স্ত্রীকে সম্পদের মত কেনা-বেচা করার অধিকার আছে স্বামীর। কিন্তু স্ত্রীর নেই। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তাঁর দুর্ভাগ্যের দিনে পতিব্রতা স্ত্রী শৈব্যাকে বিক্রি করতে দ্বিধা করেনি। মহারাজ, নারীর উপর অবিচারের অবসান চাই।

মুগ্ধ হয় শুনছিল দ্রুপদ। হঠাৎ অস্ফুটস্বরে জিগ্যেক করল, কি করে?

নারীর বহুপতি গ্রহণের স্বাধীনতা যখন ছিল তখন সমাজে ব্যাভিচার পতিতাবৃত্তি ছিল না। নারীর বহুপতি গ্রহণের বাধা ছিল না বলে পুরুষের মেয়ে খুঁজে বেড়াতে হত না। মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় বলে নারীর দেহগত বাধা কখনও সমস্যা সৃষ্টি করত না। কিন্তু যেদিন থেকে এক পতিত্বের শৃঙ্খল নারীকে পরানো হল সেদিন থেকে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনা। এক পতিত্ববোধ তার জীবনের অভিশাপ। সতীত্বের মত ঠুনকো ধারণা অল্পেতেই তার সম্ভ্রম বিপন্ন করল। জবরদস্তিমূলক এক সতীত্ব ধারণা নারীর গৌরব বৃদ্ধি করল না। বরং তার মর্যাদাহানি করল। তার জীবনের সুখ নষ্ট হল। শান্তি অশান্তিতে পরিণত হল। পতির কাছে পত্নী বংশরক্ষার যন্ত্র। নিজে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে অন্য পুরুষের কাছে স্ত্রীকে সমর্পণ করত। পিতামহ দ্বৈপায়নের ঔরসে পিতামহীদের গর্ভে জন্ম হয়েছিল যুধিষ্ঠির পিতা পাণ্ডু এবং পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র। মহারাজ! পাণ্ডবের বিজয়লক্ষ্মীকে সতীত্বের সংস্কারে বন্দী করে তার সত্তার প্রকাশকে অবরুদ্ধ করলে ক্ষতি হবে পাণ্ডবের। পাণ্ডবদের মরুভূমির মত জীবনে সে অমৃতলোক থেকে এনেছে হর্ষধারা! ঝর্ণার মুক্তধারার মত প্রেম এনেছে সে জীবনে। পাণ্ডবেরা তাকে বলে জীবন। প্রেম, প্রীতি মৈত্রী. সৌভ্রাত্র সংহতির বন্ধন সে। সে হল তাদের জীবনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির দিকে অপলক দৃষ্টিতে ক্ষণকালের জন্য তাকিয়ে থেকে দ্রুপদ স্বগতোক্তি করে বললঃ আমি কিছু বুঝতে পারছি না কৃষ্ণ। আতঙ্কে বুক কাঁপছে। আমারই ভবিতব্য হয়ত এতদিনে আমাকে নিবিড় বাঁধনে বাঁধল। আমার সামনে সব অন্ধকার অন্ধকারেই নামতে হবে আমাকে। দ্রৌপদী শুধু উপলক্ষ্য! হায়! আমি তার অসহায় পিতা।

॥ চার ॥

দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠিরের পরিণয়ে উৎসব মুখর হল সমগ্র পাঞ্চাল রাজ্য। পত্রপুষ্পে, পল্লবে, মাল্যে এবং পতাকায় সজ্জিত করা হল সমগ্র নগর। বড় বড় রাস্তার প্রবেশ পথে বিশাল সুসজ্জিত তোরণ নির্মিত হল। ঘরে ঘর আনন্দের বন্যা। দূর দুরান্তে থেকে এসেছে রাজামহারাজ, সামন্ত, শ্রেষ্ঠী অভিজাত ব্যক্তিরা। এসেছে গুণী জ্ঞানী মানী ব্যক্তির দল। রাজ্যের প্রজারাও উৎসবের আনন্দে যোগ দিল। বহুকাল পর পাঞ্চালের শুষ্ক মাটি দ্রৌপদীর বিবাহের হর্ষধারায় সিক্ত হল। পুলক লাগল

পাঞ্চালবাসীর তনু-মন প্রাণে।

পুষা, নক্ষত্র, মঙ্গলবার, গোধুলি লগ্নে বিবাহের সানাইতে আশাবরীর সুর বাজল। পরিবারের প্রধান এবং ভ্রাতাদের জ্যেষ্ঠ বলে যুধিষ্ঠির এল বরবেশে। বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অগ্নি সাক্ষী রেখে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পরিণয় হল। শুভদৃষ্টির সময় পাঞ্চালীর পদ্মকলির মত চক্ষু দুটির বন্ধ পাতা প্রিয় সখীদের সাধ্য সাধনায় যখন উন্মুক্ত হল তখন তার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। দ্রৌপদীর মনে তখন অর্জুনের চিন্তা। চোখের তারায় অর্জুনের মুখ, অর্জুনের চোখ, শরীর সে দেখতে লাগল। অর্জুনের প্রতিভূ মনে করে তার কণ্ঠে মালা পরাল। একবারও ভাল করে তাকাল না যুধিষ্ঠিরের দিকে।

দ্রৌপদীর আচরণের আকস্মিক বিস্ময়কর চমকে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। বাইরের নানাবিধ সংঘর্ষের সংঘাতে তার অন্তরাজ্যে এক সংকট সূচনা করল। জিজ্ঞাসায় আর্ত হল তার অন্তর। দ্রৌপদী কি তার হৃদয়ের আলোড়ন বোঝে না? অনুমান কতে পারে না। তার অবস্থা? তবে কি এ বিবাহের সুখী হয়নি সে? এ কি শুধুই বন্ধন তার জীবনে? প্রেম এবং যুগপাৎ বোধের দ্বারা আক্রান্ত এবং আচ্ছন্ন হল যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদীর বেপরোয়া আচরণ, তার অনিচ্ছার মনোভাব যুধিষ্ঠির চোখে কেমন নিষ্ঠুর আর রহস্যজনক মনে হল।

বিয়ের পর দ্রৌপদী ভীষণ বদলে গেল।

একটা একটা করে দিন যায়। মাস যায়। আর, এক নিষ্ক্রিয় বিষাদের গহ্বরে ডুবে যায় তার সত্তা। চেষ্টা করেও হৃদয় দুমড়ে দেওয়া চিন্তাগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। থেকে থেকে মনে হয়ে নিজের ছায়ার মধ্যে সে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে একটা হারানো স্রোত বয়ে চলেছে তার। এখন অনেক অনুভূতি জাগে. যা আগে কখনো মনের কোণে আসেনি। সব সময় কিসের চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন থাকে তার চিত্ত। দেখলে মনে হয়, ভীষণ দুঃখী সে।

তার ঔদাস্য, অন্যমনস্কতা যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার কারণ হল। দ্রৌপদীর এই ঔদাসীন্যের মধ্যে নব বিবাহিতা তরুণীর তীব্র বিতৃষ্ণাই দেখতে পেল। একটা চাপা উদ্বেগ আর অস্বস্তি নিয়ে কক্ষময় পচদারণা করছিল সে। মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিল। খোলা আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কি যেন দেখল। বুক ঠেলে একটা গভীরর দীর্ঘশ্বাস বেরোল। আপন মনে বিড় বিড় করে বলল, এ কী হল? আর, কতকাল এভাবে থাকবে? দ্রৌপদীকে বিবাহে বাধ্য করে কি লাভ হল তাদের? আর কতদিন এ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে?

কতবার মনে ভেবেছে, স্পষ্ট করে দ্রৌপদীকে বলবে; তুমি হবে আমাদের মন্ত্রের স্রষ্টা। আমাদের পথ দ্রষ্টা। এই যে রাজপুরী-নগর-সমাজ-সভ্যতা তুমি এর মধ্যে বিহঙ্গের মত বন্দী থাকবে? দেশাচরের ঊর্ণিজালে তোমাকে মানায় না। তুমি কামনার আগুন, তৃষ্ণার অতৃপ্তি, প্রেমের দীপ্তি, জীবনের শ্রী। তুমি প্রতিমুহূর্তের আনন্দ। তুমি আমাদের শপথের বাণী। নতুন জীবনের প্রত্যয়।

কিন্তু দ্রৌপদীর সামনে দাঁড়ালে যুধিষ্ঠিরেব সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়। জিহ্বা অবশ হয়ে আসে। দ্রৌপদীর কাছে কিছুতেই সহজ হতে পারে না। একটা অপরাধবোধ ক্লিষ্ট হয় তার চিত্ত।

সেদিন বিকেল বেলা। জাফরি ঘেরা অলিন্দের সুদৃশ্য খচিত স্তম্ভের ওপর পিঠ দিয়ে দ্রৌপদীর সুদূর আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কেমন একটা ভাল লাগার মোহে আবিষ্ট ছিল দুই চোখ। তাই দ্রৌপদী জানতে পারল না যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি।

বিকেলের আলো ফিকে হয়ে গেল। হলুদ আলোর রঙ মিলিয়ে গিয়ে আঁধারে মলিন হল পৃথিবী। পাখীরা দল বেঁধে নীড়ে ফিরে গেল। তবু দ্রৌপদী নড়ল না। মনে হল তার দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই। মুখে নেই এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন।

স্তব্ধ নীল আকাশের নীচে দিয়ে সঙ্গীহীন একটা পাখী একা একা উড়ে যাচ্ছিল। তার মন্থর যাত্রাপথের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্রৌপদীর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। একটা দারুণ দুঃখ আর অভিমান তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। মনে হল, পাখীর মত সেও অসহায়

একা। এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস আটকে গেল যেন। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হতে লাগল।

আকাশ ভরা নক্ষত্রের দিকে অশ্রু ভরা চোখে কি যেন অন্বেষণ করে। দ্রৌপদীর দৃষ্টির কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হয়। এক আবেগ তীব্র জিজ্ঞাসায় আকাশকেই প্রশ্ন করার জন্যে জোরে জোরে কথাগুলো উচ্চারণ করল। বললঃ ভাগ্য কি? তার পশ্চাতে কি থাকে? সকলের ভাগ্য এক রকম হয় না কেন? কেন কল্পনায় অনুভব করা যায় না ভাগ্যের পরিণামকে? বল আকাশ, আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে?

অকস্মাৎ যুধিষ্ঠির পিছন থেকে বললঃ আমার অহঙ্কার, আমার মূঢ়তা।

দ্রৌপদী অকম্পিত নিশ্চুপ, এক ভাবে স্থির থেকে জিগোস করলঃ একথা বলছ কেন?

দ্রৌপদীর সুধাস্নিগ্ধ স্বর যুধিষ্ঠিরের বুকে দলিত হয়ে ঢেউয়ের মত উত্তাল হল। বললঃ নিজেকে চেনা নিয়ে আমার একটা অহংকার ছিল। কিন্তু সে যে কতখানি মূঢ়তা বিয়ের পর মর্মে মর্মে অনুভব করছি। মানুষ নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি অনাবিষ্কৃত। নিজের অজ্ঞাত হৃদয় যখন নিজের কাছে আবিষ্কৃত হয় তখন তার ফাঁক ও ফাঁকি যে কি দুঃসহ কষ্ট দেয়, কত অসহায় করে, তা বোঝানোর নয়।

দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ নির্লিপ্তভাবে বললঃ আমিও তোমার মত অনুভব করি।

যুধিষ্ঠির ব্যগ্র অস্থির স্বরে বললঃ তুমি!

দ্রৌপদী চোখের তারা ঘুরিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল। তারা ভেজা চোখ আরক্ত। মুখে বিরাগের ছায়া। বুকেতে কষ্ট। শান্ত অথচ গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। বললঃ তুমি কী ভেবে দুঃখ পাচ্ছ জানি না। তবে, আমাদের দুজনের কষ্ট এক নয়। তোমার কাছে আমার অভিযোগ একটাই। মেয়েমানুষের মন বলে কি কোন পদার্থ নেই? সে কি এতকাল কাদা? যা খুশি তাই মূর্ত্তি গড়বে তাকে নিয়ে? আমার শরীর যে খুশি সে ছিঁড়ে খাবে?

যুধিষ্ঠিরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন থেমে যায়। বজ্রাহত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুটস্বরে ডাকলঃ দ্রৌপদী! ফুল শুধু নন্দিত করে না, সুগন্ধ বিতরণ করাও তার অন্যতম ধর্ম।

তাতে ফুলের কি সুখ?

বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ, গুণ ও ধর্ম আলাদা। প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণ ধর্ম অনুসারে কাজ করে— এটাই জাগতিক বিধান। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেও তুমি এবং আমি স্বরূপে এবং প্রকৃতিতে পৃথক। গুণ ও কর্ম আলাদা। তোমার কাজ—

শুনবো না, শুনতে চাই না তোমার কথা। তোমার দেয়া এই অপমান সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে। কেন? চলে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। চলে যাও।

দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠতে উঠতে সহসা তীক্ষ্ণ কান্নায় ভেঙে পড়ে। যুধিষ্ঠির হতভম্বের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীর পায়ে দ্রৌপদীর পাশে এসে দাঁড়াল। গা স্পর্শ করে বসল। তার কাঁধে হাত রাখল। দ্রৌপদী একভাবে স্থির হয়ে রইল। নড়ল না। আপত্তিও করল না। দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল। চিবুক নতপ্রায় হয়ে কণ্ঠাকে স্পর্শ করে রইল। ঢেউ খেলানো কালো চুলের মধ্যে সিঁথিতে তার আঁকা হাতের সিঁদুর জ্বল জ্বল করছিল। কাঁচুলিবদ্ধ স্তনান্তরের দুপাশ বুকের পর অনেকখানি উন্মুক্ত। দ্রৌপদীর শরীরের গন্ধে যুধিষ্ঠিরের বুকের ভেতর এক আকুল আবেগে অস্থির করে তুলল। পুরুষের কামনা দপ্ করে জ্বলে উঠল তার শরীরের কোষে কোষে। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাসনার তরঙ্গ নির্ঘোষের ধ্বনি বাজতে লাগল। দ্রৌপদীর ঘন-সান্নিধ্য লাভের আকাংখায় তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল যুধিষ্ঠির। গভীর আবেগে ডাকলঃ কৃষ্ণা!

দ্রৌপদীও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। যুধিষ্ঠিরের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা সে সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করছিল। আর কেমন একটা সুখের নেশায় তার সংযমের কাঠিন্য একটু একটু করে শিথিল হয়ে গেল। চোখ বুজে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত স্খলিত ভেজা স্বরে উত্তর করলঃ বল।

যুধিষ্ঠির আরো ঘন হল। নিবিড় সান্নিধ্য লাভের আশায় তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে নিজের মুখ নামিযে এনে চুম্বন করল তাকে। ঠোঁট বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে যুধিষ্ঠিরের দুটি ঠোঁটকে নিজের মধ্যে নিযে দ্রৌপদী আস্তে আস্তে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বিভোর বিহুলতায় চোখ তাদের অর্ধনিমীলিত প্রায়। দুজনের নিঃশ্বাসের সঘন শব্দ ঝাউবনের ঝড় তুলল।

দ্রৌপদীর কথা মনে হলে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে অর্জুনের বুক। নির্জনের একা থাকলে বারে বারে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে দ্রৌপদীর নাম। অন্যমনস্ক হয়ে বালির বুকে কিংবা ভোজনের থালায় আঙুল দিয়ে লেখে: দ্রৌপদীর আমার। ভালবাসার ধন আমার! দ্রৌপদীর জন্যে অর্জুনের মন হল চঞ্চল। অস্থিরতা ক্রমে প্রবল হল তার। একদিন দেখার বাসনা নিয়ে এল দ্রৌপদীর কক্ষে। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সেখানে। দ্রৌপদী খোলা জানলার ধারে অনুভূতিশূন্য নিশ্চল পাষাণ মুর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধ থেকে খসে পড়া আঁচলখানা মাটিতে লুটোচ্ছিল। তবুও হুঁশ নেই দ্রৌপদীর। এ রকম একটা অবস্থায় তাকে দেখতে হবে, স্বপ্নেও কল্পনা করেনি অর্জুন। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। মনে হল, দ্রৌপদীর সব অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। তার ঔদাসীন্য এবং ভীরুতাই যেন এই অবস্থার জন্য দায়ী। সহস্র অন্যায় তার প্রশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রকৃত দোষী সে।

হঠাৎ, একটা সশব্দ গভীর দীর্ঘশ্বাস পতনের শব্দে চমকিত হযে দ্রৌপদী ফিরে তাকাল। অর্জুনকে দেখে স্তম্ভিত হল। দুই চোখে আগুন জ্বেলে অর্জুনেব সামনে এসে দাঁড়াল। কাছে যেতেই পল্লবঘন আঁখিদ্বয়ে কিসের একটা নিবিড়তা নেমে এল। মৃদুস্বরে বললঃ প্রিয়তম, এখন হয়েছ তৃপ্ত।

অর্জুন মাথা নেড়ে বললঃ হয়েছি অশান্ত। অধীর!

কেন? আমার যা ছিল দিয়েছি' তো সব। পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা আমি। এক পঞ্চমাংশের স্ত্রী তোমার। বিজয়লক্ষ্মীকে ভাগ করে নিযেছ। তবু অশান্তি কেন?

প্রেয়সী, নিষ্ঠুর, কৌতুকে বিদ্ধ কর না আমায়। তোমাব মত আমিও দুঃখী, তোমার মতই অসহায়। নিঃস্ব, রিক্ত, ক্লান্ত প্রাণ এক।

দ্রৌপদীর দুটি ঠোঁট কেঁপে উঠল। আঁখি কোণে জল টস্ টস্ কবতে লাগল। মুগ্ধ চোখে অর্জুনের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল আর কত ব্যথা দেবে আমায়! কেউ আমায় নয়! আমি শুধু যন্ত্র, শুধু উপায়!

অমন করে বল না। তুমি আমার চোখের মণি, বুকের পাঁজব। আমার সুখ, আমার শান্তি সব! সব যে তুমিই।

দ্রৌপদী বলল: কঠিন আমার ব্রত। দুর্বলতা আমাকে মানায় না। প্রচ্ছন্ন থাকাই আমার ধর্ম। আমার প্রথম কর্তব্য—

বেশ তোমার যদি কষ্ট হয়, তা-হলে সে কথাও বলব না আর।

স্বামী! কণ্ঠস্বরে দ্রৌপদীর ব্যাকুল আর্তি ফুটল।

কি হল কৃষ্ণা? তোমার ব্রত, তোমার কর্তব্য—

তুমি স্বামী। আমার ঈশ্বর। আমার বাসনা। আমার আনন্দ। আমার গর্ব!

অর্জুনের চোখে বিভোল যৌবনের বিভা। চোখের দৃষ্টি, মুখের অভিব্যক্তি প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে দ্রৌপদীর মন প্রাণ প্লাবিত করল। শান্ত গলায় দ্রৌপদী জিগ্যেস করলঃ কি দেখছ অমন করে?

তোমাকে। পঞ্চশরের ধনু তোমার ভুরু, তোমার ললাট। তোমার আঁখির কটাক্ষে মদনের ফুলশর, অতনুর তূণ তোমার গ্রীবা, তোমার সর্বাঙ্গে-তার অভিসন্ধি।

তাই'তো আমার রূপের সঙ্গে শরীরেব সঙ্গে বিয়ে হল পঞ্চশর পঞ্চপাণ্ডবের।

দ্রৌপদীর মুখে চটুল হাসি। নয়নে মদির কটাক্ষ।

অর্জুন বিব্রতস্বরে বলল: তুমি পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা। তাদের সহধর্মিণী। গৃহলক্ষ্মী বিজয়লক্ষ্মী-সব। তুমি তাদের নর্মসঙ্গিণী নও। তুমি প্রেম, শ্রদ্ধা, করুণা, জীবন।

বিচিত্র হাসল দ্রৌপদী। বললঃ বিনিময়ে আমাকে কি দিতে হবে জান?

অন্যদের সঙ্গে আমাকে ভাগ করে নিয়ে তৃপ্ত হওনি তুমি। তাই, এত খেদ এবং দুঃখ নিজেকে

এককভাবে একা ভোগ করতে চাও বলে কষ্ট পাচ্ছ মনে?

দপ্ করে জ্বলে উঠল দ্রৌপদী। দৃপ্তভাবে মুখ তুলে অর্জুনের চোখের দিকে তাকাল। আগুনের গোলার মত জ্বলে উঠল দুটি চোখ। মুখে তার দৃঢ়তার অভিব্যক্তি। ব্যগ্র অস্থির স্বরে আর্তনাদ করে বলল: নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর তুমি। তোমার হৃদয় নেই। মানুষের অন্তঃকরণ তোমারি নয়। আমাকে বোঝার অনুভূতি পর্যন্ত নেই তোমার। তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? কিন্তু কি করব বল? মুখে থমথমিয়ে উঠল কান্না। বললঃ আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিতে পার? স্বপ্নে জাগরণে আমি তোমাকেই দেখি। কিন্তু সে তোমার সহ্য হল না। তাই শেষবারের মত তোমাকে দেখার সে সাধ আমি পূর্ণ করে নিলাম। আমার দিকে একবার তাকাও। দ্যাখ চোখ আমার শুষ্ক। আমি কাঁদছি না। কার কাছে কাঁদব? কোন আবেদন নিবেদনও করব না তোমার কাছে। নিজেকে শুধু আহুতি দেব। এবার তুমি সুখী'তো। বল আনন্দিত। আশীর্বাদ কর, চোখের আলোয় যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। আমার আর ভুল হবে না।

দ্রৌপদী!

প্রিয়তম। আমার ধর্ম পরিচর্যা। আত্মনিবেদন আমার ইষ্ট। আমার কর্ম। আমি তাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিলাম।

শুচিস্মিতা, তোমার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। মনে হচ্ছে, ছলনা অভিনয় শেষ হল আজ। নিজেকে বড় নিঃস্ব, রিক্ত মনে হচ্ছে। সকলকে তুষ্ট করতে গিয়ে কি যেন হারিয়ে বসলাম। বুকটা ভীষণ খালি লাগছে। তোমার মুখখানা আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? এ আমার কী হল? দ্রৌপদী তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

দ্রৌপদী নির্বাক, নিস্পন্দ। তার অনুভূতির তীব্রতার মধ্যে এক গভীর নিঃশব্দে আর্তনাদ হাহাকার করে উঠল যেন। সে স্থির। শরীর সোজা। দুই হাতে জানলার গরাদ শক্ত করে ধরে তার ফাঁকে মুখ রাখল। চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

দ্রৌপদীকে বিবাহ করার অল্পকাল পরেই পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যে তাদের পিতৃরাজ্যের বিনিময়ে খাণ্ডববন পেল। সেখানে নতুন রাজ্য, রাজধানী, রাজপ্রসাদ গড়ে উঠল। তাদের রাজ্যের নাম হল ইন্দ্রপ্রস্থ। ভারত বিখ্যাত কুশলী কারিগর ময়দানবের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠায় গড়ে উঠল এক অলকাপুরী। ভূ-ভারতে ইন্দ্রপ্রস্থের তুল্য রাজপ্রাসাদ এবং পরিকল্পিত একটি নগরও ছিল না। তাই পান্ডবদের শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে তাদের ঐশ্বর্য এবং ভার্যাও সকলের ঈর্ষায় বস্তু হল। জন্মলগ্ন থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ হল ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রমূল। তাকে নিয়ে ভারত নৃপতিদের কৌতুহলিত জিজ্ঞাসা এবং অন্তহীন বিস্ময়।

বিস্ময় দ্রৌপদীরও।

ইন্দ্রপ্রস্থ যেন পান্ডবদের অনন্ত বাসনার শিখা হয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল। ইন্দ্রপ্রস্থ। তাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ভুলিয়েছে অপমানের জ্বালা। ফিরিয়ে এনেছে হৃত সম্মান। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবেরা শপথের মশাল অনির্বাণ করে জ্বালল। প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, বাসনার বুকে তেমনি প্রেম। অনন্ত বাসনার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করল তাদের জীবনলক্ষ্মী দ্রৌপদীকে। প্রেমের সেই পরশমণি বুকে তুলে নিয়ে দ্রৌপদী এল ইন্দ্রপ্রস্থ। এখানে সে আর রাজকন্যা নয়, রাজবধূ রাজরাণী। সে শুধু পঞ্চপাণ্ডবের প্রেমিকা। তাদের বাসনার দীপশিখা। তার দায়িত্ব হল তাকে অনির্বাণ করে রাখাব। কিন্তু এতবড় একটা কঠোর দায়িত্ব কেমন করে বহন করবে সে? ইন্দ্রপ্রস্থ পদার্পণ করার পর থেকে এই ভাবনাই প্রবল হল তার মনে।

প্রেমে একনিষ্ঠ হওয়া নারীর ধর্ম। কিন্তু পাঁচজন পুরুষের হৃদয়ের দাবিকে একা সে পূরণ করবে কি দিয়ে? প্রেমকে যথার্থই কি ভাগ করা যায়? জননীর স্নেহ যেমন একাধিক সন্তানের ওপর বর্ষিত হয়, নারীর প্রণয়, তার উদ্দাম ভালোলাগা, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আকুলতা, মন দেয়ার আনন্দ,

চরিতার্থ হওয়ার সুখ তেমনি বহুপতিকে দেয়া সম্ভব কি? প্রেম শতদলকে ছিন্ন করা যায়? শতদলের দলগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লে তার কোন কদর থাকে না, একটি হৃদয়ের প্রেমকে তেমনি ভাগ করে দিলে তারও আদর থাকে না, আকর্ষণ এবং বন্ধন উভয়ই শিথিল হয়। এই মানসিক সংকট কাটিয়ে ওঠা দ্রৌপদীর কঠিন হল।

মনের এরকম একটি সংকটময় মুহূর্তে দেবদূতের মত হিমালয় নিবাসী নারদমুনি এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। শতশৃঙ্গপর্বতে বসবাসকালে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে তাঁর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দূতের মুখে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের বার্তা পেয়ে তিনি এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। রাজপ্রাসাদেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। রাজপরিবারেরর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে মাসাধিককাল অবস্থান করলেন। রাজবধূ দ্রৌপদী তাঁর দেখাশুনা এবং পরিচর্যার ভার পেল। পঞ্চস্বামী সোহাগিনী কৃষ্ণার সেবায় মুগ্ধ ও পবিতুষ্ট হলেন ঋষি। কিন্তু দ্রৌপদীর জন্য মনটা হল অশান্ত। ফুলের মত একটা সুন্দর জীবন চোখের উপর শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে কষ্ট হল নারদ মুনির। পাণ্ডবদের ভয়ংকর ভোগ বাসনায় রূপ দেখে ব্যথিত হল তাঁর চিত্ত। মনে হল, দ্রৌপদী যেন কর্তব্যের প্রতিমূর্তি। বহুভর্তৃকা নারীর যৌথজীবনের প্রতি যে দায়িত্ব সচেতনতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীল সহযোগীর মনোভাব থাকাব দরকাব হয় এ যেন অনেকটা তাই। জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ হতাশা সব কিছু পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে সে। তাই, তার অন্তরের ফাঁক ফাঁকি দেখতে পায় না কেউ। দ্রৌপদী হয়তো নিজেও রাখে না তার অন্তঃসারশূন্য জীবনের সংবাদ। কিন্তু কথাবার্তায়, আচাব-আচরণের মধ্যে কি যেন একটা অভাব সব সময় চোখে পড়ে তা'র। কান পাতলে দুঃখের রাগিণী শোনা যায়। দ্রৌপদীকে দেখে কতবার মনে হয়েছে সে সুখী নয়, শান্ত নয় তার চিত্ত। সে স্বস্তিতেও নেই, শান্তিতেও নেই। তার মন পুড়ছে, বুক জ্বলছে। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তার দহন ক্রিয়া দেখতে পায় না। কিন্তু নারদ দ্রৌপদীর বুকে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিব সন্ধান পেলেন। সত্তার গভীরে অনুভব করল তার আকুল কান্না। দ্রৌপদীর এই অসহায় মানসিকতা কেন?

একদিন নারদ মুনি আকস্মিকভাবে তার কৌতূহলিত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেলেন। সেদিন সায়াহ্নবেলা। নারদ মুনি একাকী রাজ-উদ্যান পরিভ্রমণ করে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করছিলেন। হঠাৎ একটি কুঞ্জে অর্জুনকে একা থাকতে দেখে অবাক হলেন। মনে হল, উৎসুক চোখ দুটি কাকে খুঁজছে যেন। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অর্জুন কিছু বুঝবার আগে নিকটের একটি লতাগুল্মের ঝোপে আড়াল করল নিজেকে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অর্জুনের ওপর নিবদ্ধ রইল।

ছাই ছাই অন্ধকার ঢেকে গেছে উদ্যান। দূর থেকে ভাল করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেবল ছায়ার নড়াচড়া দেখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, সেখানে একটি মানুষ আছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি ছায়ার উপস্থিতি নজর পড়ল। সমস্ত শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত। মাথায় অবগুণ্ঠন। নারদের কৌতূহল আরো দুর্নিবার হল।

লঘুস্বরে তারা কথা বলছিল। হাওয়াতে কথাগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। তাই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নারদ তাদের কাছাকাছি হয়ে আত্মগোপন করলেন। চেনা কণ্ঠস্বর। অবগুণ্ঠনবতী হল অর্জুনের বিজয়লব্ধা দ্রৌপদী। অর্জুনের হাতে হাত রেখে দ্রৌপদী বললঃ প্রিয়তম, তুমি এক আশ্চর্য যাদুকর! তোমার কুহক মন্ত্রের টানে দিনান্তে একবার এখানে না এসে পারি না।

সারাদিন আমিও উন্মুখ হয়ে থাকি তোমায় পাওয়ার জন্য। নারী কাকে বলে আমি জানতাম না জীবনে। তোমাকে পেয়ে আমরা জানা হল, প্রেম কি? বিরহ কাকে বলে? তোমার সান্নিধ্যে আমি শিহরিত হই। সারা অঙ্গে আমার পুলক জাগে।

কাকে একথা বলছো? আমার মনতো শুধু তোমাকেই চায়। তোমার মুখ আমার নয়ন থেকে হারিয়ে যায়নি কখনও। তাই রাত্রে অন্ধকারে আমি যখন কারো কণ্ঠলগ্না হই বা বাহু বন্ধনে ধরা পড়ি তখন তোমাকে দেখি তাদের চোখে। কল্পনা করি, সে তুমিই।

দ্রৌপদী! আমি নিজের সঙ্গে ছলনা করেছি বলে, তুমিও ছলনা করবে? শাস্তি দেবে আমায়? তোমার কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমাকে ওসব কথা বলে আঘাত কর না। এই

মুহূর্তটুকু সুন্দর হয়ে থাক তোমার আমার।

তুমি তো নারী নও। বুঝবে না আমার অন্তরের কষ্টটা কি। নারীর দেহটা তার জীবনের বিড়ম্বনা। দেহ পরাধীন বলে নির্যাতনের লাঞ্ছনা সইতে হয়। কিন্তু মনের কোন বন্ধন নেই। সে যা খুশি কল্পনা করতে পারে। ভাবনাতে পাপ নেই। পাপ আচরণে।

দ্রৌপদী তোমার কি হয়েছে বল'তো?

তোমার নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবটা আমি সইতে পারি না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে পাওয়ার জন্য কত শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে মেয়েমানুষের কত বড় লজ্জা এবং অপমান, তুমি জানো না। জানতে চাও না। এটাই আমার দুঃখ। সেই দুঃখের আগুনে মন পুড়ছে, দেহ জ্বলছে। তবু, মনেতে আমি সতী-সাধ্বী রমণী। দ্বিচারিণী কখনো নই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্জুনের মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। এক চিরজিজ্ঞাসার কাছে উৎকর্ণ বোবা। অর্জুনের নীরবতা একটা অপরাধবোধের অভিব্যক্তি বলে মনে হল, নারদ মুনির। দ্রৌপদীর প্রত্যাশায় ব্যথা লাগছে বলে তার চোখে একটা ব্যথা ঘনিয়ে উঠল। আবেগ তীব্র জিজ্ঞাসায় নিবিড় হল চোখের চাহনি। নিশ্বাস ঘন হল। বুক ঠেলে অকস্মাৎ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল যে নিশ্বাসে গাছের পাতাগুলো হাহাকার করে উঠল। আন্দোলিত ডালপালায় যন্ত্রণা মর্মরিয়ে উঠল।

দুর্জয় সাহসে অর্জুন দ্রৌপদীর হাতখানা তার বুকের ওপর চেপে ধরল। বুকের ধক্ ধক্ আওয়াজ দ্রৌপদী তার স্পর্শের মধ্যে অনুভব করল। মস্তিষ্কের কোষে ঝড়ের কম্পন লাগল।

আকাশের কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঁকি দিল। স্নিগ্ধ আলোয় ভুবন ভরে গেল। গাছের পাতায় পাতায় খুশির হুড়োহুড়ি। ডালে ডালে লাগল দোলা। অনুরাগে রাঙা হল কৃষ্ণচূড়া। কৃতজ্ঞ চোখে অর্জুন দ্রৌপদীর দিকে তাকাল। আশ্চর্য উজ্জ্বল, আর দ্বিধাভরা চোখ। কাঁপা ঠোঁট। কথা বলার শক্তি নেই। অর্জুনের ঘন সান্নিধ্যে, শরীরের নিবিড় স্পর্শে দ্রৌপদীর অনুভূতির মধ্যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি কবল। একটা অদ্ভুত তৃপ্তিতে তার চোখ দুটি বুজে গেল। রক্তে আগুনের হল্কা বইছিল। অর্জুনের গলা জড়ানো চুম্বক আকর্ষণে মুখখানা তুলে ধরল তৃষ্ণার্ত্ত অধরের কাছে। চাঁদের আলো পড়ল দ্রৌপদীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে।

বিহ্বল অর্জুন মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। আবেগ গাঢ় স্বরে চুপি চুপি ডাকল : প্রিয় আমার! দগ্ধ হচ্ছি তোমার বিরহে। তৃষ্ণার্ত্তের যেমন জল, তেমনি আমারও তুমি। আমাকে তুমি করুণা কর। দ্রৌপদীর তখন সম্মোহিত অবস্থা। তার চেতনা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে এল। নিঃশ্বাস কণ্ঠের কাছে আটকে গেল। বুকের মধ্যে একটা ভীষণ কষ্ট হল। ফিস্ ফিস্ করে বলল : স্বামী আমার, দেবতা আমার, আমাকে তুমি নন্দিত কর। পরিতৃপ্ত কর তোমার অধর।

নারদ আর ওদের দিকে তাকাতে পারলেন না। মাথা নিচু করে নিঃসাড়ে গাত্রোত্থান করলেন। কিন্তু অর্জুনের অপরাধবোধের যন্ত্রণা যে, তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বিরাজ করছিল, এ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। অর্জুনেব বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিল। মনে ছিল অনুশোচনা ও চিত্তে ক্ষোভ।

দ্রৌপদীর বুকেও প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের জ্বালা। এরূপ অবস্থা আদৌ-শুভ নয়। যে কোন মুহূর্তে তা বিপদের কারণ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্যভাবে জীবনের গতি বদলে দেয়। তখন বিশ্বাস হয় না, কেন এমন হল? কি করে হল? কে দায়ী এজন্য? শুধু বিধাতা পুরুষকে দায়ী করলে সত্যের অপলাপ হয়। মানুষের শঠতা, নীচতা, ঘৃণ্য রাজনৈতিক স্বার্থ ও চক্রান্ত, ব্যক্তিগত আক্রোশ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, নির্লজ্জ কামাচারও এজন্য দায়ী। দ্রুপদ-দ্রোণ, বেদব্যাস-ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ-দুর্যোধন, বিদুর-কুন্তী, জরাসন্ধ-শিশুপাল সকলে দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্যের জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী। প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে দ্রৌপদীকে বলি দেয়া হয়েছে। দ্রৌপদী নিজেও সে কথা অনুমান করতে পারে। সেজন্যই মানুষের নির্মম স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। এই অবস্থাকে কিছুতেই ভাল বলে মেনে নেওয়া যায় না। এ তার মারাত্মক ভ্রম। এই বিভ্রান্তি অচিরেই দুর করা প্রয়োজন বলে নারদ মনে করলেন।

দ্রৌপদীর ভাগ্য এমনিতে ভারত রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সে জট আর খুলবার নয়। স্বয়ম্বর সভায় দ্রুপদের রাজনীতির জন্যে দ্রৌপদী ভারতীয় নৃপতিদের শত্রু হয়ে রইল। আর তেজ, দর্প, স্পর্ধা, অহংকার চূর্ণ করার জন্য তারা গোপন ষড়যন্ত্রে এখন লিপ্ত। প্রার্থীরা সমানভাবে লাঞ্ছিত বলে অপমানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যমণি কর্ণ। দ্রৌপদীর প্রধান শত্রু সে। সুতরাং দ্রৌপদীকে তার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক এবং সাবধান করলে উদ্দাম বাসনা তার কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। মনের ভেতর সর্বক্ষণ ভয়, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা থাকলে সে আত্মসচেতন হবে। নিরাপত্তার জন্য পঞ্চস্বামীর সবিশেষ অনুগত হবে। কারণ, নারী জাতি সর্বাগ্রে চায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়। পঞ্চপাণ্ডবের বাহুবল, শৌর্য-বীর্য, তেজ-বিক্রম তার নিরাপদ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কিন্তু দ্রৌপদীকে সতর্ক সাবধান করা এক কঠিন সমস্যা। কারণ, নারীজাতি স্বভাবে ও প্রকৃতিতে অনুদার, সদা সন্দেহপরায়ণা, কোপনস্বভাবা, অবুঝ এবং আবেগ চালিত। সরল সহজ করে কোন কিছু গ্রহণ করা বা বিচার করা তাদের জাতিগত প্রবণতা নয়। তাদের বিশ্বাসে সন্দেহ, সিদ্ধান্তে দ্বিধা, প্রত্যয়ে সংশয়। তাই, কিছু বলা বিড়ম্বনা তাকে। এসব চিন্তা করে দ্রৌপদীকে সুপরামর্শ দেয়া থেকে বিরত হলেন নারদ।

কিন্তু হিমালয় নিবাসী রাজন্যবর্গের কূটজ্ঞ প্রতিনিধি তিনি। পাণ্ডবদের দেখাশুনার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত। মূলত বিপদ-আপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক এবং সাবধান করে দেবার জন্যেই পার্বত্য রাজারা তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছেন। সুতরাং দ্রৌপদীর ব্যাপারে নীরব থাকার অর্থ কর্তব্যে অবহেলা করা। তাই, কিছু একটা করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু উপায়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ভারতবর্ষের রাজনীতির চিত্র তাঁর চোখে ভেসে উঠল।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখে অবাক হলেন তিনি। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক উপলক্ষ্য করে যে বিরাট রাজনৈতিক সম্মেলন হল তার ধরন-ধারণ সম্পূর্ণ আলাদা। জোট বন্ধনের খেলায় কে কতখানি জয় আদায় করে নিতে পারে তার প্রতিযোগিতা ইন্দ্রপ্রস্থের মাটিতে দেখার সুযোগ পেলেন নারদ। সৈন্যবল এবং অস্ত্রবল হল রাজনৈতিক কৌলিণ্যের মাপকাঠি। মজুত সামরিক ভাণ্ডার, সৈন্য সংখ্যা এবং অন্য রাজ্যের ওপর প্রভাব ও প্রতিপত্তি যার যত বেশি রাজনীতিতে তার আধিপত্য তত অধিক। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রদের সে সব কিছুই নেই। তবু তাদের চুম্বক আকর্ষণ বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে ছিল। তাই তাদের দলে পাওয়া নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই সূচনা হল। পাণ্ডবেরা উদ্যমী, বীর, লোকপ্রিয়, ধার্মিক, বিশ্বস্ত। এটাই তাদের রাজনৈতিক মূলধন। এই মূলধনের আকর্ষণ পার্বত্য রাজাদের মত সমতলভূমির নৃপতিদেরও ছিল। প্রত্যেকেই নিজ স্বার্থে তাদের পেতে চাইছিল। সমতলভূমিতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পার্বত্য রাজারা বহুপূর্ব থেকেই গোপনে তাদের রাজনৈতিক সাহায্য দিয়ে আসছিল। তাই, পাণ্ডবেরা তাদের কাছে আনুগত্যের সূত্রে বাঁধা। পাণ্ডুপুত্রদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে সুশিক্ষিত করে তোলা দরকার। পার্বত্য প্রদেশের রাজন্যবর্গের স্বার্থেই তা করা প্রয়োজন। ইন্দ্র, বরুণ, পবন, যম প্রমুখ নৃপতিবর্গের গোপন কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য পাণ্ডবদের অস্ত্রদান এবং অস্ত্রশিক্ষা দুয়েরই প্রয়োজন। অমনি বিদ্যুত চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল।

এক ঢিলে দুই পাখী মারার মতলব নিয়ে তিনি এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। পঞ্চভ্রাতার সম্মুখেই যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : বৎস, দীর্ঘকাল তোমাদের কাছে কাটালাম। এবার যাওয়ার সময় হল। তোমরা প্রসন্ন চিত্তে আমায় বিদায় দাও।

ঋষিবর, আপনার সান্নিধ্য মধুর। তাই বিদায় দিতে ইচ্ছা হয় না। অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয় বন্ধু একে একে বিদায় নিয়েছে। তাদের বিচ্ছেদ এবং শূন্যতায় মন কাতর। এই অবস্থায় আপনাকে বিদায় দিতে মন চাইছে না। আপনার অভাবে আমরা অভিভাবকহীন হব। রাজনীতি, কর্মনীতি, কিছুই স্থিরীকৃত হয়নি। এ অবস্থায় আপনাকে বিদায় দিই কেমন করে? আরো কিছুকাল আমাদের মধ্যে অবস্থান করে কৃতার্থ করুন আমাদের।

বৎস, তোমার এরূপ অভিলাষের কারণ আমাকে খুলে বল।

ঋষিবর। ইন্দ্রপ্রস্থের মিত্র বলতে পাঞ্চাল রাজ্য এবং যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ। আর যাঁরা আছেন তাঁদের মনের গতিবিধি অবগত নই। তবে প্রচ্ছন্ন শত্রুর সংখ্যা নগণ্য যে নয়, এটা বুঝতে পারি। স্বয়ম্বরসভায় দ্রৌপদী পাণ্ডবের জয়লব্ধা হওয়া অনেক নৃপতি ঈর্ষান্বিত। পাণ্ডবের চিরশত্রু হয়েছে তারা। তাদের মনের হিংসার আগুন, বুকে রূপ তৃষ্ণার জ্বালা।

বৎস, তোমার অনুমান নির্ভুল। তাই বিদায় কালে তোমাকে কিছু পরামর্শ দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সংকোচে বলতে বাঁধছিল। প্রসঙ্গ যখন উত্থাপন করলে তখন দুটো পরামর্শ দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। এই মুহূর্তে রাজ্যে রাজ্যে মিত্র সংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধি পাঠানো অবশ্য কর্তব্য। শত্রুর শত্রুতাকে গোপনে বাড়তে দিতে নেই। প্রীতিমন্ত্রবলে শত্রুকে বশীভূত করা অথবা দমিত রাখাই রাজনৈতিক বিধি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলে পারস্পরিক বিভেদ বৈষম্য হ্রাস পায়। হৃদয়ের আকর্ষণে রাজনৈতিক মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভারতবর্ষের মিলনাত্মক ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আশা জাগ্রত করে তোমার রাজছত্রতলে তাদের সমবেত কর। প্রেম-প্রীতির রহস্য-কাঠির ছোঁয়ায় বিনা রক্তপাতে এক মহান রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটা কিছু অসম্ভব নয়। আর এই কার্যে পারদর্শী হল তৃতীয় পাণ্ডব। সে পাণ্ডবের মুখোজ্জ্বল করবে। কালক্ষয় না করে, সত্বর তার মৈত্রী-সফরের উদ্যোগ কর। তাহলে সব বিপদ ভয় দূর হবে।

নারদের উক্তি শুনে অর্জুন স্তম্ভিত কি অভিভূত বোঝা গেল না। তার চোখেরদৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন। কি যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

যুধিষ্ঠির স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছিল কথাগুলো। মুখে তার দীপ্তি ফুটে বেরোল। খুশি হয়েই অর্জুনের দিকে তাকাল। কিন্তু তার নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মনোভাব, উদাস বিহ্বলতা তাকে অবাক করল। তার উৎসাহ কেমন মিইয়ে গেল। আস্তে আস্তে গম্ভীর মুখে বলল : প্রস্তাব অতি উত্তম। কিন্তু —

যুধিষ্ঠিরের অর্ধসমাপ্ত উক্তি পূরণ করে বলল : মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র এবং অদ্ভুত। অনেক সময় সব কিছু স্পষ্ট করে বলা যায় না। দুরন্ত কামনার ঊর্ণজালে আবদ্ধ মানুষ। তার আকর্ষণ ও মোহ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আর আপনারা তো ভাইয়ে ভাইয়ে এক কঠিন প্রতিশ্রুতির বাঁধনে বাঁধা। কিন্তু সে বন্ধন শিথিল হয়ে যেতে কতক্ষণ? স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ভোগপরায়ণ। প্রবল ভোগাকাঙ্ক্ষার কাছে ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিক বন্ধন, লোকলজ্জার ভয় গৌণ হয়ে যায়।

অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থল কম্পিত হল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ভীমের চক্ষু তারকা স্থির। তার মুখে ক্রোধের অভিব্যক্তি। চক্ষে আগুনের ফুলকি। অর্জুন অপরাধীর মত অধোবদন হল। নকুল সহদেব বোবা দৃষ্টি মেলে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করল। নারদের ভুরুতে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অভিব্যক্তি। জীবনকে বুঝতে পারার কৌতুক।

পঞ্চপাণ্ডবের মনের গতি পরিমাপ করে নারদমুনি বললেন : দ্রৌপদীর প্রেম-সত্য। কিন্তু বহুবল্লভা নারীর পক্ষে সব স্বামীকে সমানভাবে মনোরঞ্জন করা অথবা দেহ-মন-প্রাণ নিবেদিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ, তার ভালবাসায় মুগ্ধ আবিষ্ট মন অপ্রাপ্তির বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে পারে। ক্ষুব্ধ মনের যন্ত্রণামথিত দীর্ঘশ্বাসে জীবন দুর্বিষহ এবং অভিশপ্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। এই যে নিবিড় ভ্রাতৃপ্রেম তাও বিবাদ-বিভেদের অন্তঃস্রোতে ভেসে যেতে কতক্ষণ? কাঁচ পাত্রের মত হাত থেকে পড়লেই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সুন্দ-উপসুন্দের অমন যে ভ্রাতৃপ্রেম তাও নারীর রূপজ মোহে পতঙ্গবৎ ধ্বংস হল। চপল মনের অসতর্ক মুহূর্তে, অনুরূপ বিপদ সবসময়ে আসতে পারে। ভাইয়ে ভাইয়ে প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে, সহজ এবং স্বাভাবিক ও মধুর করে তুলতে হলে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দ্রৌপদী এক এক ভাই-এর সঙ্গে সহবাস করবে। এমনি করে পালা ঘুরে ঘুরে সব ভাই-এর সঙ্গে সহবাস করবে, আর এই প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য থাকবে কঠিন শর্ত। ভুল বশত সত্যভঙ্গ করলে তাকে স্বেচ্ছায় বারো বৎসর বনবাসের দণ্ড ভোগ করতে হবে। এরকম প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকার বদ্ধ হলে দেহমনের বিরোধ গ্লানি প্রশমিত হতে পারে।

বাক্যহারা অসহায়ের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল অর্জুন। যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তৎক্ষণাৎ নারদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল। এবং তার সামনেই অঙ্গীকার বদ্ধ হল। অর্জুনও হতাশ অন্তরে

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় মহাব্যস্ততায় তাদের সঙ্গে শপথ বাক্য পাঠ করল।

অর্জুনের বনবাস যাত্রার সংবাদ শুনে দ্রৌপদী পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইল। দুঃসহ বেদনার আঘাতে অস্থির হল তার চিত্ত। বুকের মধ্যে অব্যক্ত কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। মনে হল, কি যেন নেই তার। বুকটা অসম্ভব খালি বোধ হল। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশপটের মত অসীম শূন্যতা তার বুক জুড়ে। মধুপ গুঞ্জনের মত একটি প্রশ্ন অবিরত তার মনে আলোড়িত হতে লাগল। এও কি সম্ভব? যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বারো বৎসর বনবাসের আদেশ দিয়েছে? কেন? কোন অপরাধে সে নির্বাসিত হয়েছে? নির্জনে বনে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে কত কষ্ট হবে তার? ধর্মরাজ একবারের জন্য সে কথা ভাবল না কেন? অর্জুন কখনই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করতে পারে না। তবু ধর্মরাজ তার প্রতি নিষ্ঠুর হল কেন? অর্জুনের প্রতি তার প্রণয়, আকর্ষণ.. পক্ষপাতিত্ব অধিক বলে, ধর্মরাজ কি ঈর্ষা করে তাকে? এ দণ্ড কি সেজন্য ভোগ করতে হচ্ছে তাকে? অর্জুনকে নির্বাসিত করে ধর্মরাজ কি তার মন পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে? নিষ্ঠুর আঘাতে জীবনের সব আনন্দ দলিত মথিত নিঃশেষিত করে শুধু একটা দেহ নিয়ে প্রেমকুঞ্জ রচনার আকাঙ্খা জেগেছে তার মনে? এ অনুমান যদি সত্য হয়, ধর্মরাজ কোনদিন পাবে না তাকে। দ্রৌপদীর নিষ্প্রাণ দেহটাকে ভোগ করবে, কিন্তু পাবে না তার উষ্ণতা, উচ্ছ্বাস, আলিঙ্গন, আনন্দ।

রুদ্ধ অভিমানে দ্রৌপদীর বুকের ভেতর টনটন করতে লাগল। বঞ্চনার কষ্টে উদগত নিশ্বাস কণ্ঠের কাছে আটকে গেল। প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতায় কেঁপে উঠল দ্রৌপদী। অনুভূতির মধ্যে দুঃখের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে আকুল করে তুলল তাকে। বিদায়ের আগে অর্জুন তার সঙ্গে একটিবার দেখা করল না কেন? কেন ভাবল, দ্রৌপদী তার পথ আগলে দাঁড়াবে? প্রণয় আকর্ষণের বন্ধনে চিত্ত দুর্বল হলেও সে প্রিয়তমের সত্যভঙ্গ হতে দিত না কখনও। দ্রৌপদীর তাপিত অন্তর হতে নির্গত হল গভীর কম্পিত দীর্ঘশ্বাস।

বিষণ্ণ দ্রৌপদী একাকী বসেছিল প্রাসাদপুরীর অলিন্দে। বিনাবার্তায় সেখানে উপস্থিত হল মহারাজ যুধিষ্ঠির। ভূমিকা না করে বলল : রাণী কৃষ্ণা। কী হয়েছে তোমার? সর্বকার্যে তোমার নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের কারণ অবগত হতে পারে কি? আমি জানি, অর্জুনের আকস্মিক বনগমন সংবাদে তুমি খুশি নও। তবু, নিরুপায় হয়ে আমাকে সে আদেশ দিতে হল।

কারণ জানতে পারি? জ্যা-মুক্ত শরের মত প্রশ্ন করল দ্রৌপদী।

সে কথা বলার জন্যে এসেছি। সব কথা না শুনলে তোমার অন্তরের বিষণ্ন অন্ধকার আলোকময় করে তুলতে পারবে না। তুমি পাণ্ডবদের জীবনের সুর এনে দিয়েছ। তাদের জীবনে ছন্দ তুমি। তোমার তালভঙ্গ সইবে না আমাদের।

স্বামী, তৃতীয় পাণ্ডবের জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত। তার বনবাসের কারণ আমাকে খুলে বল।

অবশ্যই বলব। তার পূর্বে অনুরোধ করব, মমত্বশূন্য কর না চিত্ত। দীনের প্রতি তোমার করুণা যেন বর্ষিত হয়। আমায় ভুল বুঝ না। তুমি জান, পাণ্ডবেরা অত্যাচারী নয়। অন্যায়ের পদতলে তারা শির নোয়ায় না কখনো।

তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে পুনরায় বাধা দান করে বলল : স্বামী অশান্ত হয়েছে আমার হৃদয়। শীঘ্র বল, তৃতীয় পাণ্ডবে কোন্ অপরাধে অপরাধী?

কে করেছে অপরাধী তারে?

তুমি।

মিছে কথা। শত্রুর রটনা। তোমাকে কেউ করেছে বিভ্রান্ত। তাই এই ক্ষোভ, রোষ তোমার অন্তরে। সব কথা ভাল করে বোঝা দরকার তোমার। তুমি রাজার দুহিতা। রাজনীতি ভাল করেই বোঝ। দুর্যোধন আমাদের শান্তি, সুখ কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। শত্রুরা চায় দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাদ, বিদ্বেষ এবং বিভেদ ঘটুক। তাই বিভ্রান্তি করার নানা ফন্দী তাদের। সন্দেহ, ঈর্ষা,

ঘৃণা. বিদ্বেষের বিষ ছড়ানোর জন্য দুর্যোধন অনেক রাজকর্মচারীকে অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করেছে। কুৎসা, নিন্দা, অপবাদ বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ষড়যন্ত্র এবং উদ্দেশ্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট। তাই পাণ্ডবদের মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। অর্জুন সেই জন্যে বিদেশে গিয়েছে। পর্যটকের বেশে বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে মিত্র সংগ্রহের দায়িত্ব যেমন পালন করবে, বিভিন্ন দেশের রাজনীতি অর্থনীতি এবং জনগণের অবস্থা, দেশের সমৃদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। পাণ্ডবেরা এক সাংকেতিক অর্থে বনবাস কথাটি ব্যবহার করে। বনবাস মানে রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস, শক্তি সংগ্রহের গোপন কার্যকলাপ। শত্রুকে সহজে প্রতারিত এবং বিভ্রান্ত করা যায় তাতে।

বিস্ফারিত নয়নে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ভ্রূযুগলে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসার বিস্মিত অভিব্যক্তি। অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল দ্রৌপদী। তাহলে অর্জুনের যাত্রা আমাকে গোপন করা হল কেন? যাত্রার পূর্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল না কেন? আমার অপরাধ জানতে পারি কি?

বর্তমানে তুমি আমার ভার্যা। শর্তভঙ্গের আশঙ্কায় তোমার কক্ষে প্রবেশ করেনি সে।

অদ্ভুত যুক্তি তোমার। একটা পরিচারিকাকে দিয়ে সংবাদ দিলে'তো পারতে।

যুধিষ্ঠির বিব্রত হয়ে কথা খুঁজতে লাগল। বলল : তা, অবশ্য করা যেত, কিন্তু বিদেশ পর্যটনের সংবাদ শত্রুর কাছে গোপন রাখার জন্য এই সতর্কমূলক ব্যবস্থা।

রুষ্ট স্বরে দ্রৌপদী বলল : খুব হয়েছে। তোমার মতিগতি বুঝতে আমার বাকি নেই।

যুধিষ্ঠির তার উক্তির তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হল। সরল মনে বলল : শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য দুর্বৃত্ত কর্তৃক ব্রাহ্মণের গোধন হরণের এক মিথ্যে গল্প প্রচারিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের জন্য পরোপকারী অর্জুন বাধ্য হয়ে আলাপরত দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রবেশ করে শপথের শর্তভঙ্গ করেছে, তাই তৃতীয় পাণ্ডব স্বেচ্ছায় তার নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে বনে যাচ্ছে। লোকে বিশ্বাসও করেছে তাকে।

গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদী গম্ভীর স্বরে বলল : কিন্তু তোমার সততাকে আমি বিশ্বাস করি না। তৃতীয় পাণ্ডবকে তুমি ঈর্ষা কর। তাকে সহ্য করতে পার না। তাই পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত হলে। আমাকে হারানোর ভয়ে তুমি বিচলিত।

চমকে উঠল যুধিষ্ঠির। অসহায়ের মত আর্তস্বরে উচ্চারণ করল : দ্রৌপদী। তোমার বাক্য নির্মম। নিষ্ঠুর তোমার হৃদয়।

যুধিষ্ঠিরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করাার জন্য দ্রৌপদী বলল : প্রিয়তম, এর চেয়ে তোমার বাসনা কি নিষ্ঠুর নয় বেশি? পৌরুষময় পুরুষে আমার প্রেমপুষ্প বিকশিত হওয়ার পূর্বেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কামের উপাচারে পরিণত করেছ। বিশ্বাস ভঙ্গ করনি তুমি?

গভীর হতাশা মর্মরিত হল যুধিষ্ঠিরের কম্পিত দীর্ঘশ্বাসে। বলল : হায়, দ্রৌপদী? তুমি পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারছ না। তুমি জান না, যুধিষ্ঠিরের জীবনে এতবড় বিচ্যুতি কত কলঙ্কময়! এ কলঙ্ক নিয়ে আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পাবব না।

চিন্তার দ্বন্দ্বে বিমূঢ় হয়ে দ্রৌপদী বোবা দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল। যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে হঠাৎ কুঁকড়ে গেল সে। একটা প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ ফুটল মুখে। উদ্গত নিঃশ্বাসে বুক চেপে ধরল।

যুধিষ্ঠিরের মুখের রঙ অপমানে রাঙা হল। অপমান এত গভীরভাবে তার বুকে বাজল যে তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আত্মানুশোচনা করে বলল : বিশ্বাস কর নিজের জন্যে কিছু করেনি। পাণ্ডবদের কথা ভেবে তোমাকে প্রতারিত এবং বঞ্চিত করে আমি সত্যিই অপরাধ করিনি। নির্দয়তা, শালীনতা-এসব কিছুই ভেবে দেখেনি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার অনিচ্ছার ওপর এতবড় একটা জুলুমের দায়ভাব চাপিয়ে দিয়ে আমি পাপ কাজই করেছি। আজ, তোমার তীব্র তীক্ষ্ণ শাণিত বাক্যে আমার সে অনুশোচনা এবং অপরাধের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হল।

যুধিষ্ঠিরের হৃদয় ভেদ করে নির্গত হল একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস। অপরাধীর নত মাথা নিচু করে সে চলে যেতে উদ্যত হল।

দু'পা বাড়াতেই দ্রৌপদীর ভাবান্তর হল। যুগপৎ ওর মনের মধ্যে অনুশোচনা ও অভিমান সমস্ত

মস্তিষ্ক জুড়ে একটি অপরাধবোধ জেগে উঠল। তাকে সহস্র প্রশ্নে বিদ্ধ করল : কেন? কেন? কেন? রাগের মাথায় এ কি করল সে? ধর্ম-কে ক্ষুব্ধ করে কোন পরমার্থকে লাভ করবে সে? বারংবার এই প্রশ্নে তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হল। সেই উত্তেজিত আচ্ছন্নতা, চেতনায় ত্রস্ত হয়ে গমনোন্মুখ যুধিষ্ঠিরকে কম্পিত স্বরে ডাকল : শোন; যেয়ো না। মূঢ় নারী আমি। কি বলতে কি বলেছি জানি না। না বুঝে রূঢ় বাক্য বলেছি। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমায়। অনুশোচনায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। আত্মনির্যাতনের কঠোর কৃচ্ছ্রতায় আমি কেমন যেন রুক্ষভাষী হয়ে গেছি। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর চোখের দিকে অসহায় অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। দরদে বুকটা টন্ টন্ করতে লাগল। আশ্চর্য এক গভীর অনুরাগও অনুভব করল বুকের ভেতর। ইচ্ছে করছিল, দ্রৌপদীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আদর করে, চোখের জল মুছিয়ে দেয়। কিন্তু একটা তীব্র অভিমানবোধে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ছয় ॥

প্রাসাদের অলিন্দে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল দ্রৌপদী। তার চোখ ছিল রাজপথের দিকে। গাছপালার ভেতর দিয়ে যে লম্বা রাজপথটা সোজা চলে গেছে দ্বারকায় সেইদিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল দ্রৌপদী। ওই রাস্তায় অর্জুনের রথ আসবে। সে একা আসছে না। নবপরিণীতা বধূ শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রাকে নিয়ে সে আসছে মহা সমারোহে। তাদের সঙ্গে আছে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং অন্যান্য যাদব প্রধানেরা। রাজধানীর চতুর্দিকে উৎসবের আয়োজন। রাজপথ জনপথ পত্র-পুষ্প-মাল্যে সজ্জিত করা হয়েছে। বিরাট বিরাট তোরণ নির্মিত হয়েছে। সর্বত্র খুশির আনন্দের বন্যা বইছে। এসব ভালো লাগল না দ্রৌপদীর। মানুষের সংস্রব থেকে একটু দূরে থাকার জন্য সে অলিন্দের কোণটায় এসে দাঁড়াল। মনের মধ্যে এলোমেলো অসংখ্য ভাবনায় তার চিত্ত ভারাক্রান্ত হল।

অনেকক্ষণ তাদের আসার সময় হয়ে গেছে। তবু, আসছে না কেন? এই প্রশ্নটা হঠাৎ মনে এল তার। তারপরেই সে আবার নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার চিত্র ফুটে উঠল তার মনে। কুন্তির কথা শুনে তার মনে হয়েছিল, এ কোথায়, কোন্ পরিবেশে পড়ল সে? সবাই তাকে নিয়ে এত টানাটানি করছে কেন? সেই সময় কোথাও তার কোন আশ্রয় খুঁজে পেল না। মন সেই থেকে আশ্রয়হীন, সঙ্গীহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ, এই মুহূর্তে অর্জুনের সেদিনের ঔদাসীন্য অন্যমনস্কতা এবং নিরাসক্তির অর্থ বুঝতে পারল।

দ্রৌপদীর ওপর অর্জুন একার অধিকার চেয়েছিল। সেই চাওয়া সম্পূর্ণ হয়নি বলেই অর্জুন কোন ঔৎসুক্য দেখায়নি। দ্রৌপদীর চিত্ত সংকট নিয়ে কোন মাথা ঘামায় নি। আজ বুঝতে পারল তার বন্ধন থেকে অর্জুন মুক্তি চেয়েছিল। তাই বনবাসের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়েছিল। গমনকালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করল না। উলুপীর প্রেম তার হৃদয়ে মুক্তির মশাল জ্বালল।

অথচ, একদিন প্রণয়ের ভাগাভাগি নিয়ে তার জটিল জিজ্ঞাসা জেগেছিল। কিন্তু আজ তার কোন দ্বিধা নেই, প্রশ্ন নেই। দেহ মনের বিরোধ গেছে, অনুরাগের রঙ গেছে ফিকে হয়ে। কর্তব্যের চোখ ধাঁধানো এমন একটা আলো এসে পড়ল মনের ওপর যাকে বিবেক উপেক্ষা করতে পারল না। এটা সম্ভব হল অর্জুনের বনবাসের ফলে। প্রকৃতপক্ষে, অর্জুন তার দেহের মনের সংযম এবং শাসনের বাঁধ ভেঙে দিল। সব সংশয় দ্বিধা সংকোচ থেকে মুক্তি দিল। যেদিন জানল অর্জুন উলুপীকে বিবাহ করেছে এবং তার সন্তানের জননী হয়েছে সেদিন থেকে দ্রৌপদীর মনেও প্রশ্ন জাগল একনিষ্ঠতাই যদি প্রেম হয়, সে একনিষ্ঠতা অর্জুনের কোথায়? বহু নারীকে প্রণয় নিবেদন করে পুরুষ যদি প্রেমে একনিষ্ঠ হয়, নারীর প্রেমেই বা হবে না কেন? পুরুষের বহু ভার্যা গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু নারীর বহুপতি গ্রহণ অশাস্ত্রীয় বিধি। কিন্তু সে যখন শাস্ত্রসম্মত পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী, তখন একাধিক পুরুষের প্রণয় নিবেদনের কোন বাধা তার নেই। শুধু অর্জুনকে আঘাত দেবার জন্য কর্তব্য বোধে সে অন্য পাণ্ডবদের ভার্যা হল পালাক্রমে।

পুরুষ একাধিক নারীর মধ্যে কোন্ তৃপ্তি অন্বেষণ করে? বহুপতির সংস্রবে এসে দ্রৌপদী তা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু কতখানি অনুভব করল তা সে জানে না। তবে, তার স্বামীরা, তার নারী দেহ নিয়ে মত্ত। রক্তমাংসের দেহটাকে নিয়ে কি করবে, কোথায় রাখবে, কেমন করে তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ, উত্তেজনা আর স্ফূর্তি পাওয়া যায় কেবল তার অন্বেষণ করে। দেহটাই তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। দেহ পেলেই সন্তুষ্ট তারা। আর তা থেকে বঞ্চিত থাকলে অসহিষ্ণু। ভ্রমর যেমন মধুর জন্য ফুলের পাঁপড়ি ঘিরে গুঞ্জন করে, পুরুষও নারীর দেহটাকে পাওয়ার জন্য তেমনি প্রণয়ের ছল কলা করে। পুরুষের কামোন্মত্ততা তাকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে। নারী অবশ্য পুরুষের নিপীড়ন চায়, চায় তার দেহ সম্পর্কে কৌতুহল এবং আগ্রহ। কিন্তু বন্য পশুর উল্লাস আর ক্ষুধা থাকে পুরুষ জাতটার প্রতি বিরূপ করে তোলে।

দ্রৌপদীর হঠাৎ মনে হল সে সুরা পাত্র, আর তার প্রেম হল সুরা। সুরা যেমন পাত্রে পাত্রে বিতরণ হয়, দ্রৌপদীর তার প্রেমকে তেমনি তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এক এক পাণ্ডবের ওষ্ঠাধরে তুলে ধরছে। তাতে তারা পুলকিত এবং শিহরিত হয়েছে। কিন্তু সুরাপাত্রের তাতে লাভ হল কি? সে শুধুই শূন্য ও রিক্ত হল। যুধিষ্ঠির কাছে থাকলে তৎক্ষণাৎ বলতঃ "পৃথিবীর নিঃস্ব রিক্ত হওয়ার জন্য কেউ আসেনি। অমন যে শূন্য সুরার পাত্র তারও বুক ভরে আছে সুরার সুগন্ধে। স্মৃতির অনির্বাণ শিখাই নিঃস্বের সম্বল ও পাথেয়।" যুধিষ্ঠির সব কিছু তলিয়ে ভাবে। তাই, কঠিন জিনিসটাকে সহজ করে দেখাতে এবং বোঝাতে পারে। সত্যিই, পাণ্ডবদের প্রণয় ও অনুরাগে তার চিত্তও রঞ্জিত হয়েছে। আকুল করার প্রেমানুভবের স্বাদে, গন্ধে, মুগ্ধতার তার মন রাঙিয়ে আছে। বহু সন্তানের জননীর স্নেহ যেমন সব সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়, নারীর প্রেমসুধাও তেমনি জনে জনে বিতরণে কোন বাধা হয় না বলেই দ্রৌপদীর প্রত্যয় হল। অর্জুন বনবাসে না গেলে, এ অভিজ্ঞতা তার হত কি-না সন্দেহ!

অর্জুনের কথা মনে হতেই একটা দারুণ দুঃখ আর অভিমান তার বুকে তরঙ্গ তুলল। নানা কথা মনে পড়ল, আর আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠল মন। সবচেয়ে দুঃখ হয় যুধিষ্ঠিরের জন্য। অর্জুনের আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরের মহৎ প্রেম, উদার ভালবাসাকে অপমান করেছে। নিরীহ, সরল, শান্তিপ্রিয় মানুষ যুধিষ্ঠির। কোন কিছুতে তার দাবি নেই। সে কেবল নিজেকে দিয়ে তুষ্ট। পাওয়ার লোভ তার মনে নেই। সেজন্য অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দেয়নি। নিবিড় আকর্ষণে বুকে টেনে নিয়ে দুঃখের উপর সহানুভূতির প্রলেপ দিয়েছে। তথাপি তার মনের মন্দিরের বাইরে বসে দিনযাপন করছে সে। কেন? কি জন্য? এ কেন'র উত্তর কি, তা সে ভেবে ঠিক করতে পারেনি। আজ মনের আকাঙ্ক্ষা তার কাছে স্পষ্ট।

ভীম উদ্দাম বাসনার জলন্ত অঙ্গার। কামনার হুতাশন। দ্রৌপদীর গল্পের রূপকথার রাজপুত্র। পক্ষীরাজ ঘোড়ার চড়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে রূপকথায় যেমন ঘুমন্ত পুরীতে হানা নিয়ে রাক্ষসদের মেরে ফেলে সোনার পালঙ্কে নিদ্রিত রাজকুমারীকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় ভীমও তেমনি অসম সাহসী, দুর্মদ। এই রাজপুত্রকে সে ঝড়ের মত আসতে দেখেছিল স্বয়ম্বর সভায়। তারপর থেকে মন তাকে আঁকড়ে ধরল। যেমন বল্লরী করে বনস্পতিকে। ভীম তার নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়। তাকে নিয়ে স্বপ্ন,, কল্পনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মুকুলিত হয়। তার মধ্যে একটা দৃপ্ত পৌরুষ আছে। অতুল শক্তি তার দেহে। বুকের ভেতরটা দরদ আর প্রেমে ভরা। প্রেমের কাঙাল সে। নিজেকে উজার করে দিয়ে সে চায় দৌপদীকে। তাই দ্রৌপদীর সুখের জন্য উন্মুক্ত। তার তৃপ্তির জন্য যে কোন কাজ করতে সে কুণ্ঠিত নয়। ভীমের অনুরাগের আকর্ষণ তীব্র। তার সান্নিধ্যে মন বিকশিত হয়, হৃদয় প্রফুল্লিত হয়। ভীমকে তাই দ্রৌপদীর রূপকথার রাজপুত্র মনে হয়।

কিন্তু অর্জুন ভীষণ স্বার্থপর। শুধু নিজের সুখ, আর তৃপ্তির কথাই ভাবে। অর্জুন নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর। সে বিশ্বাসের স্বর্গরাজ্যে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল দ্রৌপদীর। "ভীরু কোথাকার" মনে মনে উচ্চারণ করল সে। বনবাসে যাওয়ার সময় একবার মুখের বলাটাও প্রয়োজন বোধ করল না। মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বার্থের। বুলিভরা আদর্শের, গালভরা মতবাদের। ভালবাসার নয়। এই

দুঃখ ক্ষোভ তার মনে অনির্বাণ হয়ে জ্বলতে লাগল।

উলুপী, চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে অর্জুন দ্রৌপদীর চোখ খুলে দিয়েছে। তার দৃষ্টি আরো স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়েছে। সুভদ্রার সঙ্গে উলুপী-চিত্রাঙ্গদার বিবাহের একটা পার্থক্য আছে। তারা কেউ অর্জুনের সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে আসেনি! কিন্তু সুভদ্রা আসছে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজবধূ হয়ে। তার কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। অর্জুন ইচ্ছে করে তাঁর নিরুঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং একাধিকপত্য খর্ব করার জন্য এ বিবাহ করেছে। তার মত বড় শত্রু কেউ হয় না। অথচ তার ওপরেই ছিল অধিক প্রত্যয়। কিন্তু অর্জুন তার মূল্য দিল না। আর কোনভাবে বিশ্বাস করা যায় না তাকে! বিশ্বাসভঙ্গের নিদারুণ দুঃখ ও অভিমানে তার বুক পুড়তে লাগল। এতবড় একটা অগ্নুৎপাত হবে তার হৃদয় রাজ্যে দ্রৌপদী কোনদিনই ভাবেনি। এখন কোন, স্মৃতি নিয়ে থাকবে সে? মনকে সান্ত্বনা দেবে কি বলে? তার অবলম্বনই-বা কি থাকল? মনে হল, স্বার্থের মশাল, রাজনীতির মশাল, দুর্নীতির মশাল, আদর্শের মশাল তার চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার অসহ্য উত্তাপে দেহ তার জ্বালা করছে। সুকোমল মনটা অসহ্য উত্তাপে যেন শুকিয়ে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে এলোমেলো অনেক কথা তার মনে হল। মানুষের অস্পষ্ট কোলাহল, অশ্বের খুরধ্বনি তাকে উৎকর্ণ করল। একটি রথ উল্কার বেগে ছুটে আসছিল। অর্জুনের পাশে সুভদ্রাকে উপবিষ্ট দেখে বুকের মধ্যে তার তড়িৎ প্রবাহ বয়ে গেল। আচমকা তার নিশ্বাসটা বুকের কাছে যেন আটকে গেল। ব্যথায় বুকের ভেতর টন টন করতে লাগল। মনে হল, অর্জুন যেন নির্দয় হস্তে তার হৃৎপিণ্ডটাকে উপড়ে নিচ্ছে। আর সে অসহায়ভাবে মুখ বুজে তার সব যন্ত্রণা সহ্য করছে।

দ্রৌপদীর মনের যখন এরকম অসহায় অবস্থা, তখন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। নূপুরের মৃদুধ্বনি তুলে কে যেন শ্লথ পায়ে অলিন্দে এসে দাঁড়াল। পদধ্বনি থেমে গেল কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, নববধূ সজ্জিত সুভদ্রা অবাক চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে তার পদধূলি গ্রহণ করল। তারপর নম্র বিনীত স্বরে বললঃ আজ থেকে সুভদ্রা দাসী হল তোমার। জ্যেষ্ঠের আসন থেকে ছোট বোনকে আদেশ কর, এটুকুই মিনতি আমার।

দ্রৌপদীর চোখে অবাক বিস্ময়। এরকম যে একটা কিছু হবে বা হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সুভদ্রার বিনয় আচরণ, নম্র, শান্ত স্নিগ্ধ ব্যবহার দ্রৌপদীকে বিহ্বল করল। এতক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে মনের ভেতর যে বিবিধ অনুভূতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া চলছিল আচমকা প্রবল ধাক্কা খেল তা। সপত্নীগত ঈর্ষা, বিদ্বেষের মূলে সুভদ্রা কুঠারঘাত করল নিজেকে দ্রৌপদীর খুব ছোট মনে হল। সুভদ্রার ঔদার্য মহত্বের পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগল। সুভদ্রার মন কত বড়? ঈর্ষা তার মন স্পর্শ করেনি। সাধারণ রমণীর মত প্রেমের ওপর একাধিপত্য বজায় রাখার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তার মনে। ত্যাগের বৈভবে তার প্রেম সুন্দর। পার্থসখা শ্রীকৃষ্ণ প্রায়ই বলতঃ "সখী, প্রেমের দেবতাকে প্রেমময় করে পাবার জন্য একটু ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগে সুখ আছে, আনন্দ আছে, মোহহীন না হলে ত্যাগ করা যায় না। সত্যকার প্রেম, ভালবাসা ত্যাগ ছাড়া হয় না।" সুভদ্রা তার ও ভাইয়ের আদর্শ, অনুভূতিতে গড়া এক মানবী প্রতিমা। সে শুধু আকৃষ্ট করে না, মুগ্ধও করে। সুভদ্রার প্রেম প্রগাঢ়। স্বামী তার একার, এ বোধ তার নেই। নিজের বলে আগলে রাখারও কোন অভিপ্রায় নেই। সুভদ্রার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে তার নিজের লজ্জা হল। সে স্বার্থপর। একার সুখ, তৃপ্তি আনন্দে সে চায়। মন তার সত্যিই সংকীর্ণ। নিজেকে সে ধিক্কার দিল। ঘৃণা হল নিজের ওপর।

এইসব চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক করে দিল। প্রস্তরীভূতপ্রায় অবস্থা তার। দৃষ্টি তার আচ্ছন্ন। মুখে তার অবাক বিস্ময় সুভদ্রাকে কি করবে, আর কি বলবে ভেবে পেল না। সুভদ্রাও তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুভদ্রা আবার ডাকলঃ দিদি, ছোট বোন ভেবে পাশে ঠাঁই দিও। তোমাদের উভয়ের সেবাতেই আমার সুখ, আমার আনন্দ।

দ্রৌপদী সম্বিৎ পেল। চকিত আনন্দে চোখ মুখ উজ্জ্বল হল। একটা খুসির তরঙ্গ বয়ে গেল সারা অঙ্গে। কোষে কোষে তার বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হল। দুঃখ, ক্ষোভ, ঈর্ষা অভিমানের ভাব

দুর হল। খোলা মন নিয়ে সুভদ্রাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। সুডৌল, কোমল আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে সুভদ্রার চিবুক তুলে ধরল তার মুখের কাছে। চার আঁখি একত্রিত হল। নিশ্চল তারকাদ্বয়ের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল দ্রৌপদীর। দুই গালের ওপর ছোট্ট টোকা দিয়ে মৃদু হেসে মধুর স্বরে বললঃ বড় সুন্দর তুমি। মিষ্টি তোমার স্বভাব। অসংকোচে বলি, আমার আত্মাভিমান তুমি চূর্ণ করলে। আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন শুধু নও, আমার সখী। আমার দুঃখ সুখের প্রিয় সহচরী। চল বোন, আমার ঘরে চল।

সকাল থেকেই মনটা ভাল নেই দ্রৌপদীর। গতকালের ঘটনার ছাপ মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। কিন্তু সকালের রোদ ভরা আকাশে লেগেছে খুশির ঝলক। আকাশ ভরা সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় মন পুলকিত হল। অর্জুনের মুখ ভেসে উঠল চোখের তারায়। বারো বছর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। গোপন পথে সে তার খোঁজ নিত, কিন্তু অর্জুন তার কোন খবরাখবর রাখত কিনা জানা নেই। দ্রৌপদীও অর্জুনের কাছে সে খবর কোনদিন জানতে চায়নি। সম্পর্কটা শেষ না হলেও মনের দূরত্ব তাদের বেড়েছিল। মাঝখানে একটা বিরাট ফাঁক ছিল। কোনদিন তা ভরাট হবে বলে মনে হল না। ইতিমধ্যে দুটি সন্তানের জননী হল সে। জ্যেষ্ঠ প্রতিবিন্ধ্যার জন্ম যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, এবং সুতসোমের জন্ম ভীমের ঔরসে। অর্জুনের আকর্ষণে তাই শৈথিল্য অনুভব করল। ইন্দ্রপ্রস্থ স্বপ্নে দেখা অর্জুনের সেই মুখটা আজ হারিয়ে গেছে তার। মনটাও গেছে শুকিয়ে।

আকস্মিক ঘটনার চমকে মানুষ তার অনাবিষ্কৃত মনের অনেক রহস্যকে হঠাৎ জেনে ফেললে আত্মগোপনের আর কোন উপায় থাকে না। নিজেকে ঠকানো কিংবা প্রতারণা করার জন্য কোন অনুতাপ বা অনুশোচনায় জাগে না অন্তরে। নির্মল কৌতুক হাস্যে মুছে ফেলে গ্লানিকে। আচমকা সেই অনুভূতি হল দ্রৌপদীর। পরিচারিকা সংবাদ দিল অপরাহ্নে অর্জুন আসছে তার ঘরে। অমনি সব অভিমান ভেসে গেল, কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল, সারা অঙ্গে। বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল; মনের আকাঙ্ক্ষাগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। অর্জুনের উদগ্রীব তাগিদ অনুভব করল। নিজের হাতে সুচারু করে ঘর সাজাল। পরিপাটি করে শয্যা রচনা করল। নিজেও সাজল। দর্পণে মুখ দেখল। চূড়া করে অভিসারিকার সাজে কবরী বন্ধন করল; ফুলের মালায় শোভিত করল নিজেকে। মুখে চন্দন, অগুরু, শঙ্খচূর্ণের প্রলেপ লাগাল, অঙ্গে মাখল। ওষ্ঠ রাঙাল, চোখে কাজল টানল, ভুরু আঁকল। কপালে সিঁদুরের বড় টিপ পরল। রক্তবর্ণের রেশমি বস্ত্র পরিধান করে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াল। আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল। উপকরণের কোন অভাব কোথাও আছে কিনা তন্নতন্ন করে দেখল। তারপর গালের ওপর অর্জুনের প্রিয় টোলটি আগের মত হয় কি না দেখার জন্য লাজুক মেয়ের মত বহুবার হাসল। চোখের নিচেটা ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে কি না সেও দেখতে ভুললো না। কাজল টানা চোখে ভুরু ধনুকের মত কতটা বঙ্কিম হল, চোখের কটাক্ষে পুরুষের রক্তধারা নাচে কিনা দেখার জন্য বারংবার নানা ভঙ্গিতে অনুশীলন করল।

এইভাবে নিজেকে দেখা ও খোঁজা যখন শেষ হল তখন বিকেল গড়িয়ে আকাশখানা কমলা রঙের রোদে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। শরতের নীল আকাশ আরো গাঢ় নীলবর্ণ হল। তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘ পাখীর মত ডানা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে। জানালা দিয়ে আকাশটা দেখতে ভাল লাগছিল। বিকেলটাকে ভীষণ মিষ্টি মনে হল। দুরের আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অর্জুন এখনও এল না কেন? কখন শেষ হবে তার এই প্রতীক্ষা?

নিচের দিকে তাকাতে দেখতে পেল, সিঁড়ি ভেঙে অর্জুন দ্রুতবেগে উপরে উঠছে।

দ্রৌপদী সারা অঙ্গে শিহরণ জাগল। চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন হল তার। শশব্যস্ত হয়ে উঠল তার ভেতরটা।

অপরাহ্নের নিষ্প্রাভ সূর্যে আলোর আভাসে বৃক্ষের শাখায় পাখীর কলরব জেগে উঠেছে। দুরে কৃষ্ণচূড়ায় শাখায় শাখায় কুসুমিত পুষ্পের বর্ণচ্ছটায় যেন আকাশ হয়েছে রঞ্জিত। পুষ্পে পুষ্পে

মধুপের দুর্বোধ্য আলাপে প্রগলভ হয়ে উঠেছে বাতাস। সুগন্ধ পুষ্পের সুবাসে ভরে গেছে চতুর্দিক।

দ্রৌপদীর মোহিনীরূপ অর্জুনকে বিমোহিত করল। সত্তায় সত্তায় কিসের একটা হিল্লোল বয়ে গেল। চোখে তার খুশির লাবণ্য, মুখে মুগ্ধতা।

সহসা প্রগলভ হল তার অন্তর। মুগ্ধ কণ্ঠে অর্জুন বললঃ কী অপরূপ দেখাচ্ছে তোমায়! মনে হচ্ছে স্বর্গের অপ্সরী নেমে এসেছে ধরাধামে। বহুকাল পর আমার নয়ন হল রঞ্জিত। চিত্র নন্দিত হল, হৃদয় উৎফুল্ল হল। ভাবতে ভাল লাগে, তোমার অপার করুণায় ধন্য আমি।

স্নিগ্ধ হাস্যে দ্রৌপদীর মুখমণ্ডল দীপ্ত ও সুন্দর হল। চোখে বিলোল কটাক্ষের অশনি সংকেত। বললঃ তাই বুঝি। অথচ, তোমার মন ভোলানোর জন্য কিংবা ভালবাসার জন্য আমার সাজ নয়। অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায় প্রতিদিন দেহসজ্জা করি। পঞ্চস্বামীর হৃদয় অনুরাগরঞ্জিত করা আমার ধর্ম। পুরুষের পৌরুষকে তার হৃদয়কে আকৃষ্ট করা নারীর প্রকৃতিগত প্রবণতা। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন কারণ নেই।

তড়িতাহত হয়ে অর্জুন সহাস্যে বললঃ প্রিয়ে, স্বর্গের দুর্লভ অপ্সরা দর্শনের সৌভাগ্য হল আমার। অধীন তোমার সান্নিধ্য চির বঞ্চিত। আজ, কৃপা করে খুশি করলে তাকে আমি আনন্দিত। আমি পরিতৃপ্ত।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রৌপদী অশ্রু গোপন করল। বললঃ একক আনন্দের স্বাদ কখনও পাইনি জীবনে। তুমিও না। তবু তোমার ও আমার আনন্দের উপলব্ধির পার্থক্য আছে। পুরুষ জাতটা পাহাড়ী ঝর্ণার মত উদ্দাম গতিতে ছুটে চলে। পথের মায়া মোহে বাঁধা পড়ে না। উচ্ছল আনন্দ, আর উন্মাদনা পুরুষ প্রকৃতির অঙ্গ। তাই, কোন স্মৃতি আকুল করে না চিত্ত। তরঙ্গের মত সে শুধু ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু নারী সরোবরের মত। এখানে নেই ঝর্ণার উচ্ছলতা। ছোট গণ্ডীটির মধ্যে সে থাকে আনন্দ তন্ময়। বিশাল দুনিয়ার প্রতি তার আকর্ষণ নেই। নীল আকাশে, মুগ্ধ নয়নে সে পরিব্যাপ্ত বিশ্বনিখিলকে প্রত্যক্ষ করে। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত ঋতুর বিচিত্র আকাশ তার বুকে সুনিবিড় প্রেমের ছবি আঁকে। প্রেমানুভবের সে অক্ষয় স্মৃতির রোমাঞ্চিত শিহরণ তার বুকে উর্মির দোলা লাগায়। তাই, নারী সহজে বিস্মৃত হয় না কিছু।

অর্জুনের বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি মুগ্ধ অনুরাগে বিভোল হয়ে ওঠল। অস্ফুটস্বরে বললঃ এ যেন নারী পুরুষের অভিনব ভালোবাসার তত্ত্ব।

কোমল কণ্ঠে দ্রৌপদী বললঃ আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে এ সত্য উপলব্ধি করেছি। সব নারীই জীবনের প্রেম শতদল নিবেদন করে একজন পৌরুষময়, বীর্যবান রূপবান পুরুষকে। প্রেমিকার দেহ মন অহর্নিশ উদ্বেল হয়ে থাকে পুরুষের পৌরুষ ও সবল দেহ মনের স্পর্শ লাভের জন্য। আমার কল্পনায় সেই সামান্য স্পর্শের আকাঙ্ক্ষাও আর আসে না। আমার অনুভূতির মরা গাঙে স্রোতও বয়না আর। আমি এক প্রেমের ফসিল।

অর্জুন নীরব।

প্রশ্ন জাগল তার অন্তরে—তবে কি সুভদ্রাকে বিয়ে করে ভুল করল সে? কি ভুল? কার ভুল?

বিস্ময় ভরা সন্দিগ্ধ নয়নে গভীর ভাবে বারংবার দ্রৌপদীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপর অতি ধীরে কম্পিত ভগ্ন স্বরে বলল ঃ ভ্রম, ভ্রম, সবই ভ্রম দ্রৌপদী। মানুষ কি যে চায়—তা সে নিজেই ভাল করে জানে না। জানলেও বোঝে না সব। এটাই তার বিড়ম্বনা।

দিন মাস পর্যায়ক্রমে চলে যায়। দ্রৌপদীর মনোরাজ্যে অসহায়তা দিন দিন প্রকট হল। স্বামীদের ওপর তার কর্তৃত্ব ও একাধিপত্য শশীকলার মত দিন দিন হ্রাস পেতে লাগল। অমাবস্যার কাল ঘনিয়ে এল তার জীবনে। নৈরাশ্য হতাশার মধ্যে ডুবে গেল তার মন।

অর্জুন তার কাছে দূর গ্রহের ভিনদেশী মানুষ: সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাকে শুধু কল্পনা করা যায়, স্পর্শ করা যায় না। তার প্রতি কোন আকর্ষণ আর অনুভব করে না। সে এখন সুভদ্রার

প্রেমে লীন। সুভদ্রাই তার ধ্যান জ্ঞান। প্রথম প্রথম ঈর্ষা হ'ত। তারপরে গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন আর ওসব কিছু মনে হয় না, কারণ, ঘন-সান্নিধ্য ছাড়া পুরুষচিত্তকে ধরে রাখা নারীর পক্ষে খুব কঠিন। নারীর কাছে পুরুষ চায় উত্তেজনা, উন্মাদনা, আনন্দ আর পরিচর্যা। এগুলির অভাব সহ্য করা পুরুষের জীবনে কঠিন সমস্যা। কিন্তু পঞ্চ স্বামীর পুরুষ প্রাণের দাবিকে মেটাবে কি দিয়ে? এক এক স্বামীর কাছে যেতে পর্যায়ক্রমে তার পাঁচটি বছর লাগে। তার অস্তিত্ব স্বামীদের অন্তরে কেবল তৃষ্ণা জাগায়। তাই শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতায় আর্তি ভোলার জন্য তাদের নতুন জীবন সাথীর অন্বেষণ করতে হয়। এজন্য স্বামীদের কোন দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু, তার নারী মনটা প্রকৃত পশুর মত বোবা যন্ত্রণায় ছটফট করে। বুকের মধ্যে খাঁ-খাঁ করে। ঈর্ষায় করে চিন্ চিন।

এই পরিবারে সুভদ্রা বধূ হয়ে আসা থেকে নিঃশব্দে যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে খাক্ হতে লাগল দ্রৌপদীর মনের ভেতরটা। অর্জুনের সুভদ্রা বরণের পর নকুল চেদিরাজ কন্যা করেনুমতিকে বিবাহ করল। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে লাভ করল। এছাড়া জরাসন্ধের পৌলস্তী এবং যদুবংশীয় ভানুর কন্যা ভানুমতীকেও বিবাহ করল। অথচ, একদিন এরা সকলে ছিল দ্রৌপদীর বাধ্য ও অনুগত প্রণয়ী। কিন্তু আজ তারা নিঃশব্দে দ্রৌপদীর কাছ থেকে সরে গেল। কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল দ্রৌপদী। আর নিজেই মনে মনে তার জবাব দিল। স্বামীরা কেউ তাকে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত স্ত্রী বা জীবনসঙ্গী বলে ভাবতে পারে না, দাবিও করতে পারে না। তার সঙ্গে স্বামীদের সম্পর্ক বন্ধু, বয়স্যার, মহিষীর, কর্ত্রীর। জীবনের সর্বকাযের সর্বক্ষণের সঙ্গিনী হওয়ার কোন সুযোগ তার নেই। কিন্তু বাঁচতে গেলেই পুরুষের প্রতিমুহূর্তে একজন নারীর সাহচর্য্য একান্ত প্রয়োজন। নইলে, জীবন অর্থহীন, মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অর্জুনের মুখে তার প্রথম প্রতিধ্বনি শুনলঃ পুরুষের জীবনে নারী এক দুর্লভ রত্ন। সে তার জীবন। তৃষ্ণার যেমন জল, পুরুষের তেমনি নারী। তাকে ছাড়া জীবনের চাকা চলে না। অশ্বহীন রথ যেমন অচল, অনড় তেমনি নারীহীন পুরুষ গতিহীন। নারীই পুরুষকে দেয় প্রেম, আনন্দ, প্রেরণা, উৎসাহ, উদ্যম, সাহস, শক্তি, সুখ এবং পূর্ণতা। কামনার প্রদীপে নারী বাসনার দীপশিখা জ্বালায় পুরুষের প্রাণে। নিজেকে নন্দিত ও উদ্দীপিত করার জন্য একাধিক নারীকে বরণ করেছে। প্রেমহীন জীবনে, যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সকলে অভিশাপের মত ভয়ঙ্কর।

শেষ কথাটা ছুঁয়ে গেল দ্রৌপদীর হৃদয়। নিজের জীবনে তার প্রেমের পরশ পাথর কোথায়? এই প্রশ্নটা তরে মস্তিষ্কের কোষে কোষে বারংবার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। বুকের ভেতর তীব্র অস্বস্তির কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল। বুকের রক্তে তার হারানোর দুর্বিষহ জ্বালা। মনে মনে নিজের অভিশপ্ত জীবনকে ধিক্কার দিল।

অথচ, এরকম একটা অকল্পনীয় দুর্বিষহ অবস্থা যে কখনও উদ্ভব হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। দ্রৌপদী। পঞ্চপতি থাকা সত্ত্বেও সে এখন যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী। অন্যদের সঙ্গে তার সখীর সম্পর্ক। তাদের চোখে সে রাজমহিষী। তাদের কারো প্রণয়িণী নয়। কর্তৃত্ব করাই তার কাজ। সংসারে, পরিবারে সে শুধু কর্ত্রী। প্রেমহীন জীবনের হতাশার অবসাদ তার চোখের তারায় মরুভূমির মত ধু-ধু করে জ্বলতে লাগল।

নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার ভয়াবহ অনুভূতি তার চেতনাকে গ্রাস করল। অতীতের সব কথা, সব আশা, সব ব্যথা, সব অশ্রু, সব ছবি মুছে গিয়ে যন্ত্রণাময় এক অস্তিত্বের বন্ধন ভয়ংকর করে তুলল।

দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আকুল স্বরে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলঃ ধর্মরাজ একদিন তুমি বুঝিয়েছিলে মেয়েমানুষের ওপর হিংসে করে পুরুষজাতটা সৃষ্টির নিয়মকে উল্টে দিয়ে, নারীকে সতীত্বের সংস্কার আর উদ্ভট পিতৃত্ব প্রথার শিকলে বেঁধেছিল। পরিবার এবং সমাজের কর্তৃত্ব থেকে নারীকে হঠিয়ে দিয়ে সেই জায়গা তারা দখল করে নিল, যা ইচ্ছে তাই করল। তোমরা পাঁচভাই চেয়েছিলে, প্রাকৃতিক জগতে মা হতে যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের জন্ম, যেখানে মেয়েদের কর্তৃত্ব, মর্যাদা, গৌরব আছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তোমার বিশ্বাস, এবং আদর্শ আমার মনকে তোলপাড় করেছিল। সেদিন মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল এতদিন বাদে সে ভয়ংকর প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এসেছে তোমার। আজ, তোমার সব ভাইরা লোভ লালসায় মত্ত হয়ে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ভোগ করার

জন্য একাধিক বিবাহ করল। তোমার বিধান, তোমার শাসন তারা মানল না। তুমিও না। রাজা শিবির মেয়ে দেবিকাকে বিয়ে করতে তোমারও বিবেকে বাধল না। আমরা জীবন নিয়ে তোমরা সকলে এক অদ্ভুত খেলায় মাতলে। কেন? কি দিয়েছ তোমরা আমাকে? এই বুকটাকে শুধু খালি করে দিয়েছ। শুধুই হারিয়েছি। কি জন্যে? কার দোষে? বল। এর জবাব তোমাকেই দিতে হবে।

দ্রৌপদীর উত্তেজিত স্বর উগ্র থেকে উগ্রতর হল। চোখ দিয়ে তার আগুন বেরোতে লাগল। দ্রৌপদীর জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। তারপর গম্ভীর মুখে কম্পিত স্বরে বললঃ এ প্রশ্নে আমাকে করছ কেন? তুমি নিজেকে জিগ্যেস কর না কেন?

তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল দ্রৌপদীর। যুধিষ্ঠিরের উক্তি এতই ইংগিতপূর্ণ যে তার বুকটা কেঁপে উঠল। মনের মধ্যে প্রত্যুত্তর দেয়ার জোরে খুঁজে পেল না। অভিযোগের আশঙ্কায় তটস্থ হল। বিপন্ন বিব্রত মুখে সে অসহায়ের মত যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

।। সাত ।।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে পরম আত্মীয় হিসাবে কৌরবেরা নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বিস্ময়কর বিভ্রমোৎপাদক দৃশ্যবস্তু দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ ভ্রাতৃগণকে এক হাস্যকর অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিল। পাণ্ডব ভ্রাতারা তাদের অজ্ঞতা নিয়ে নানারকম কৌতুক এবং পরিহাস করল। সেই অপমান ও লাঞ্ছনার ইন্ধন জোগাল কর্ণ। তার পরামর্শে তৈরি হল ইন্দ্রপ্রস্থের অনুরূপ রাজপ্রাসাদ। নতুন প্রাসাদ শান্তিগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে আত্মীয় কুটম্ব হিসেবে পাণ্ডবেরা নিমন্ত্রিত হল। পিতৃব্যের আমন্ত্রণ রক্ষা করা যুধিষ্ঠির কর্তব্য বলে ভাবল। পঞ্চভ্রাতা সহ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, কুন্তী, অন্যান্য ভ্রাতৃবধূ, এবং দাস-দাসীর সমভিব্যহারে হস্তিনাপুরে গমন করল।

গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠান খুব সমারোহেই সম্পন্ন হল। ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে নিমন্ত্রিত ছোট বড় সকল নৃপতিই এসেছিল। আনন্দ, উত্তেজনায় বেশ কয়েকটি দিন কাটল। তারপর, কথায় কথায় দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়ার কথা তুলল। উৎসবের মত্ততাজনিত সুখ ও আনন্দকে উত্তেজনা পূর্ণ করে তোলার জন্যে দ্যূতক্রীড়া করা যুধিষ্ঠিরের আপত্তি ছিল। তাই সে বলল: শুধু উত্তেজনার জন্য দ্যূতক্রীড়া করতে রাজি নই। এ হল পাপ ক্রীড়া। এ খেলায় কখনও কারো ভাল হয় না।

শকুনি তৎক্ষণাৎ জিভ কেটে বলল: উঁহু কোলহল আর হৈ-চৈ করে কাটানোর জন্যে সাধারণভাবেই খেলা হবে।

যুধিষ্ঠির সরল মনে প্রশ্ন করল: কার সঙ্গে আমায় খেলতে হবে?

দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে বলল: আমার সঙ্গে। মানে, মাতুল শকুনি আমার হয়ে খেলবে। হার জিৎ আমার।

যুধিষ্ঠিরের ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্য স্ফুরিত হল। বলল: মাতুল দক্ষ অক্ষ ক্রীড়ক। তাঁর সমকক্ষ আমি নই। আমার মত একজন অদক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করলে তাঁর সম্মানহানি হবে।

শকুনি বিব্রতস্বরে বলল: এ তোমার বিনয়। দ্যূতক্রীড়ায় তুমি কম দক্ষ নও! তোমার সঙ্গে খেললে আমার যশ বিন্দু মাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।

যুধিষ্ঠিরের ভাবনা হল। ললাটে চিন্তার বলি রেখাগুলি স্পষ্ট ও গভীর হল। মনে হল, নিজের সৃষ্ট উর্ণতন্তুতে সে জড়িয়ে পড়েছে। তাকে চিন্তিত দেখে শকুনি বলল: এত ভাববার কি আছে?

যুধিষ্ঠির আত্মসম্বিত ফিরে পেল ভাব, সত্যি তো, এত ভাবনার কি আছে? সারাজীবন ধরে বিপদ বাধা জয় করে শুধু এগিয়ে গেছে। আজ সামান্য একটা সাধারণ খেলায় এত সাবধান হওয়ার কি আছে? সে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শুধু জয় জানে। রণে নিরাশ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে দ্যূতক্রীড়ায় নিরাশ করলে তার অপযশ হবে। উপস্থিত রাজন্যবর্গের কাছে তাকে ছোট হতে হবে। সুতরাং সব চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া করতে রাজি হল। বলল: বেশ আপনাদের ইচ্ছা তবে পূর্ণ হোক।

কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পর পর জিতবার সুযোগ দিল শকুনি। কিন্তু তার গোপন মনের

অভিপ্রায় ব্যক্ত হল না। পাণ্ডবদের বিজয়ের আনন্দ, উল্লাস উত্তেজনা তার মনে কোন প্রতিক্রিয়া জাগল না। তার নীরব নির্বিকার ঔদাসীন্য যুধিষ্ঠিরকে পুলকিত করল। শকুনি সম্পর্কে তার মনের ভয় ও আতঙ্ক কেটে গেল। আত্মপ্রত্যয় জাগল। প্রচ্ছন্ন গর্ব প্রকাশ পেল তার আচরণে ও আলাপে।

ক্রীড়ায় নিমগ্ন যুধিষ্ঠির। বিজয় আনন্দে নিজের মনেই স্বগতোক্তি করল। বলল: মাতুলকে পরাজিত করব স্বপ্নেও ভাবিনি। এ জয়ে আমি গৌরববোধ করছি। নিজের ওপর আস্থা বাড়ল।

শকুনির ওষ্ঠ বক্র হল। দুই-ভুরুর মাঝখানে কুটিল জিজ্ঞাসার এক বিস্ময় ফুটে উঠল। দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণের দিকে এক পলকের জন্য উদাস দৃষ্টিতে তাকাল। তাদের চোখ মুখে কথা হয়ে গেল। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে বললঃ মাতুল একের পর এক পরাজয় সইতে পারছি না আমি। বন্ধ কর, এ পাপ খেলা।

শকুনি হতাশ হয়ে মুখ তুলল। যুধিষ্ঠির দুহাতে পাশা চেপে ধরে হাতটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল। বলল: উঁহু, খেলা বন্ধ হবে কেন?

কর্ণ বলল: পণ-ছাড়া দূত্যক্রীড়া জমে না। উত্তেজনা, আনন্দ, দুঃখ বেদনা, দ্যূতক্রীড়ার প্রাণ। জেতার আনন্দের সঙ্গে হারানোর দুঃখ না থাকলে দ্যূতক্রীড়া উপভোগ হয় না।

দুঃশাসন শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলল: দ্যূতক্রীড়ায় ভালো হয় না কারো। একথা জেনে ধর্মরাজ পণবন্ধ হবেন বলে মনে হয় না।

লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শকুনির। হতাশ কণ্ঠে বলল: ধর্মরাজের মত একজন অক্ষ ক্রীড়কের পণবন্দি হয়ে খেললে তোমরা সব হারবে। তাব চেয়ে এ খেলা এখানেই বন্ধ হোক।

দুর্যোধন হতাশ গলায় বলল: মাতুল এ তুমি বলছ কি? তোমার মনোবল ভেঙে গেছে। অক্ষ ক্রীড়ায় তোমার এতদিনের অহংকার তা-হলে যুধিষ্ঠির চূর্ণ করল? ভাবতেও লজ্জা করছে আমার। তবে, ধর্মরাজ রাজি থাকলে, তোমার জন্য সর্বস্ব খোয়াতে আমার দুঃখ থাকবে না।

যুধিষ্ঠির তখন খেলায় নেশায় আত্মহারা। জয়ের নেশা তাকে এমন পেয়ে বসল যে ভালমন্দর বিচারবোধ পর্যন্ত থাকল না। অন্তরেব বিপুল হর্ষে সে আপন মনে ভাবল, আজ অদৃষ্ট প্রসন্ন তার। গ্রহবৈগুন্যে শকুনির দিনটা মন্দ। সুতরাং বিজয়লক্ষ্মী তার করতলে। পণবদ্ধ দ্যূতক্রীড়া তাকে সৌভাগ্যসম্পন্ন করবে। পণে দুর্যোধন সর্বস্বান্ত হবে। রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে দুর্যোধন ভিখারী হবে, একথা ভাবতে ভীষণ ভাল লাগল যুধিষ্ঠিরের। মনে হল, দুর্যোদন তার কৃপা অনুগ্রহ লাভের জন্য দীনবেশে তার সামনে দাঁড়িয়ে। এরকম একটা সুখস্বপ্ন তাকে আচ্ছন্ন করল। দুর্যোধনের সমগ্র সম্পত্তি দ্যূতক্রীড়ার পণে জিতে নেয়ার বাসনা প্রবল হল তার মনে। তাই, দ্বিধা না করেই বললঃ বেশ তোমরা যখন চাইছ, তখন আমিও বা পিছিয়ে থাকব কেন? তোমাদের রণসাধ অবশ্যই মেটাব। সম্পদ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত পণবদ্ধ খেলা চলবে।

পাণ্ডবভ্রাতারা সবিস্ময়ে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাল।

দুঃশাসন উত্তেজিত আনন্দে করতালি দিয়ে বলল: সাবাস! কে বলে যুধিষ্ঠির দুঃসাহসী নয়। তার মত ক্ষত্রিয় কে আছে?

কৌরবেরা উৎফুল্ল হল।

কর্ণের ওষ্ঠে একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। মনে মনে উচ্চারণ করলঃ ধর্মরাজ সত্যিই তুমি দুঃসাহসী। নইলে. এমন করে কেউ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে? অপটু হাতে পারবে শকুনির মত দক্ষ অক্ষ ক্রীড়কের কাছ থেকে ঈপ্সিত জয় আদায় করতে? সিংহের গুহায় ঢুকেছ। তুমি। আজ তোমার পরিত্রাণ নেই! দ্রৌপদীও পাবে না নিস্তার। সে হবে আমার দাসী। আমার রক্ষিতা।

কর্ণের দু'চোখে দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোল। মনে হল সে আগুনে একটি সংসার জ্বলছে, একটি সাম্রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে।

স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর অহঙ্কার, ঘৃণা, প্রত্যাখান অপমান কর্ণ ভুলতে পারেনি। ভোলার মত নয় বলেই মনের ভেতর তীব্র প্রতিহিংসায় আগুন জ্বলছে। সে আগুন সহজে নেভার নয় বলেই

কষ্ট পাচ্ছে অথচ মনের সে অনুভূতি কাউকে জানানোর নয়। অসহ্য অস্থিরতার মধ্যে তার দিন কাটে, রাত যায়। কি করলে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে চিন্তা করেও কূল-কিনারা পেল না। সে নারী। অন্তঃপুরচারিণী। তার ওপর প্রতিশোধ নেবে কি করে? অহোরাত্র এই চিন্তায় মন পুড়তে লাগল। তবু কর্ণ হতাশ কিংবা নিরুদ্যম হল না। মনের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল।

দুর্যোধনের প্রবল পাণ্ডব বিদ্বেষ এবং ঈর্ষাকে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের মূলধন করল কর্ণ। কিন্তু অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার মত ইন্ধন পাচ্ছিল না। দীর্ঘকাল পরে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের নির্মল কৌতুক এবং রসিকতাকে স্মরণ করে দুর্যোধনের মনে পাণ্ডব বিদ্বেষের আগুন জ্বালল।

দেখতে দেখতে দ্যূতক্রীড়া জমে উঠল। দর্শকদের উল্লাসে, চিৎকারে, উত্তেজিত কথাবার্ত্তায়, অট্টহাস্যে সভাগৃহ গমগম করতে লাগল। মুহূর্মুহু শকুনির জয় এবং যুধিষ্ঠিরের সাধারণ পরাজয় খেলাকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলল। একের পর এক পরাজিত হতে লাগল যুধিষ্ঠির। যত পরাজিত হয় সে, পণের অঙ্ক ততই দ্বিগুণ হতে লাগল।

যুধিষ্ঠির হারাল তার ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য, রাজ্য, সৈন্য, অশ্ব, হস্তী, প্রাসাদ সব। খেলার নেশায় মত্ত যুধিষ্ঠির চার ভাইকে এবং নিজেকেও পণ রাখল। কিন্তু শকুনির নিপুণ অক্ষক্রীড়ার দান তাকে সর্বস্বান্ত করল। সব খুইয়ে যুধিষ্ঠির মাথা নিচু করে বসে রইল। চোখে তার জল নেই। শ্রাবণের কালো মেঘের মত মুখখানা বিষাদে মলিন। একটু আগেই যে ছিল ভারতের রাজচক্রবর্তী মহারাজ যুধিষ্ঠির, এখন সে নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা এক সাধারণ মানুষ। এমন কি নিজেও সে নিজের অধীন নয়, অন্যের অধিকৃত সম্পত্তি। এ এক আশ্চর্য ভাগ্যলিপি যুধিষ্ঠিরের। এই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী সে নিজে। আর দায়ী তার কর্মফল। অনুতাপে অনুশোচনায় তার মন পুড়তে লাগল। যুধিষ্ঠির নির্বাক। শঙ্কা জড়িত অসহায় দৃষ্টিতে ভ্রাতাদের দিকে তাকাল। তাদের মুখমণ্ডলে রোষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। পাথর ছাপা হৃদয়গহ্বরে থেকে উৎসারিত হচ্ছিল যন্ত্রণামথিত শ্বাস প্রশ্বাসের হিমবাষ্প। কেবল ভীমের চক্ষু দুটিতে যেন সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল। কৌতুক দৃষ্টিতে কৌরবেরা পঞ্চপাণ্ডবকে দেখছিল। কর্ণের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ অন্য একটি প্রাসাদের গবাক্ষে। দ্রৌপদী নামটা চিন্তার তটভূমি স্পর্শ করে একটা অসাধারণ আলোড়ন এনে দিয়ে গেল তার রক্তে। মস্তিষ্কের কোষে ছড়াল উত্তেজনার আগুন। সহসা শকুনির কৌতুক কণ্ঠস্বরে ভেঙে গেল তার চিন্তার তন্ময়তা।

এবার কি পণ রাখবে সর্বহারা রাজা?

দুঃশাসন বিদ্রুপ করে বলল: রাজা! ও হো হো করে হেসে উঠল। হাসি আর কথা জড়িয়ে তার কণ্ঠ থেকে এক বিচিত্র স্বর নির্গত হল। বলল: পণ রাখার মত ওর আর আছে কি?

সকলের অলক্ষ্যে কর্ণ উঠে দাঁড়িয়েছিল। ক্রোধ-প্রতিহিংসায় তার দুই চক্ষু খদ্যোতের মত জ্বলছিল। মুখমণ্ডলে তার নির্মম কাঠিন্য। কতকাল ধরে পাণ্ডবদের এরকম একটা অসহায় মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে আছে। এ জন্য কত ষড়যন্ত্র কত পরিকল্পনা করেছে। প্রত্যাশা পুরণের সেই শুভক্ষণ সমাগত। শকুনি দুঃশাসনের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাক্য তার মনে যুগপৎ হর্ষ ও সংশয় সৃষ্টি করল। যুধিষ্ঠিরের পণ রাখার আর কি কিছুই নেই?

চোখের ওপর ভেসে উঠল স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর বহ্নিরূপ, প্রদীপ্ত দুটি চক্ষু তারকা। আরক্ত মুখ। কম্পিত স্বর। সহসা কানে তার তীক্ষ্ণ ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। শ্রদ্ধেয় সভাস্থ সজ্জনবৃন্দ শুনুন আপনারা, রাজকুমারী হয়ে কোন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে আমি পতিরূপে গ্রহণ করতে পারি না।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রদের আসন থেকে দুর্যোধন লাফিয়ে উঠে সগর্বে বলল: কে বলে বন্ধুবর কর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল? সুতপুত্র অধিরথ তার পিতা।

দ্রৌপদীর দু'চোখের আগুন। অধরে বিকৃত ঘৃণা। বক্র হাসিতে বিদ্বেষের বিষ। বলল: কুলশীল মানে দ্রৌপদী যোগ্য নয় সে। অক্ষত্রিয় তারা।

দুর্যোধন স্তব্ধ বিস্ময়ে দ্রৌপদীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ

হয়েছিল। ব্রাহ্মণ কুলে না জন্মে যদি অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হতে পারে তাহলে একজন অক্ষত্রিয় কেন ক্ষত্রিয় হতে পারবে না? তা ছাড়া অধিরথ বৃষ্ণি বংশীয়। চম্পানগরের সামন্তরাজ। কুলশীলমানে হীন নয় সে।

দ্রৌপদীর উত্তর শুনবার জন্য সভাস্থল স্তব্ধ হল। সূচীপতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না। দুর্যোধনের দু'চোখে কৌতুক। কর্ণের ভেতর সমুদ্রের নির্ঘোষ। আতঙ্কে তার মুখ শুকোল।

দ্রৌপদী চমকাল না। অবাকও হল না। ওষ্ঠযুগল স্মিতহাস্য সঞ্চার করে বলল: স্বয়ম্বর সভায় বর নির্বাচনের স্বাধীনতা পাত্রীর নিজস্ব। তাকে বাধ্য করার অধিকার কারো নেই। তাই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগেই বীরকে নিবৃত্ত করেছি।

সভাস্থ ব্যক্তিরা চমকে উঠল। বিদ্যুৎস্পর্শের মত কর্ণের অন্তঃকরণের কেঁপে উঠল। তীর বিদ্ধ পাখীর মত যন্ত্রণাকাতর হল তার মুখখানি। বুকের ভেতর একটা দারুণ কষ্ট। তার ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ক্ষমার বাঁধ ভেঙে দিল। তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে কর্ণ চিৎকার করে যুধিষ্ঠিরকে বললঃ পাঞ্চালীকে এবার পণ রাখ রাজা। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি। পণ রাখার এই সম্পদ তোমার এখনও অবশিষ্ট আছে। তাকেই পণ রাখ ভিখারী রাজা।

তারপর শকুনির খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললঃ মাতুল, এ বুকে বড় জ্বালা। শুধু প্রত্যাখ্যানের অপমান নয়, তার বংশ গৌরবের অহঙ্কার, রূপের গর্ব, ব্যক্তিত্বের তেজ, দর্পের কথা যখন মনে পড়ে, তখন আমার মাথার ভেতর আগুন জ্বলে। মাতুল, আমার বুকের কান্না শুনতে পাচ্ছ? আগুন। আগুন দেখতে পাচ্ছ। আমি অশান্ত। তোমার হাতের যাদু পারে আমার তাপিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়োতে। শকুনির ওষ্ঠে বঙ্কিম হাসি। চোখে আত্মপ্রত্যয়ের মুগ্ধতা।

বহুদূর হতে অশান্ত উত্তেজিত কোলাহলের ভেসে এল। দ্রৌপদী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। বাতাসে স্বর ভেঙে যাওয়ার জন্য কণ্ঠস্বর নির্ণয় করতে পারছিল না। কিন্তু এ হৈ-চৈ কেন? উত্তেজনার হেতু কি? এত উন্মত্ত উল্লাসই বা হচ্ছে কেন? এতগুলো কেন'র প্রশ্ন একসঙ্গে করল নিজেকে। কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা নিয়ে একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে পাঠাল তার সন্ধানে।

বাম চোখের পাতা হঠাৎ হঠাৎ লাফাতে আরম্ভ করল। অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। দুর্যোধনের নবনির্মিত শান্তি গৃহে দ্রৌপদী নিজেকে একটুও নিরাপদ মনে করল না। এখানে আসা থেকে সে বিপদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। মানুষের সন্দেহজনক কথাবার্তা, চলাফেরার মধ্যে অনুভব করছিল বিপদ সংকেত। তাই, এখানে একটি দিনও তার শান্তিতে কাটেনি। সর্বক্ষণ মনে হয়, বিপদের ছায়া তার পশ্চাদনুসরণ করছে। মনের সে উদ্বেগ যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে বলেছে কিন্তু কোন কথাই সে কান দেয়নি। বরং কৌতুক করে বলেছেঃ ভাগ্যের চাকা এখন উল্টো গেছে দ্রৌপদী। আমি হলাম সম্রাট যুধিষ্ঠির। আমার সৈন্যবল, অর্থবল, মিত্রবল, জনবল, রাজনৈতিক প্রতাপ মর্যাদাকে দুর্যোধন সমীহ করে। প্রত্যক্ষ কোন রাজনৈতিক সংঘর্ষে সে নামবে না। ঈর্ষার আগুনে তার মন পুড়লেও সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে সে সমাদর করে যাবে। এর অন্যথা কখনও হবে না কোনদিন। অকারণ তাকে সন্দেহ করছ তুমি। সন্দেহ কবা তোমাদের নারীজাতির স্বভাব।

প্রত্যুত্তরে দ্রৌপদী বলল: বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস না কবে ঠকা অনেক ভাল। তাতে অন্তত অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায়।

যুধিষ্ঠির অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলল: সত্য। কিন্তু অমূলক সন্দেহে অন্যের চরিত্র হনন হয়।

দ্বারদেশে পরিচারিকার মলিন বিবর্ণ মুখশ্রী তার চিন্তার তাল ভঙ্গ করল। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন কবল তাকে: তোর চোখে জল কেন? মুখ কেন শুকনো? কি সংবাদ এনেছিস, বল।

কঞ্চুকী অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল দ্রৌপদীর দিকে। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে সে আঙুলের অগ্রভাগে শাড়ীর আঁচল জড়াতে লাগল। ভীরু চোখে তার দিকে একবার করে তাকায়। আর একবার

করে চোখ নীচু করে। তবু তার অপ্রস্তুতভাবটা কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারল না। দ্বিধাভরা চোখে, কাঁপা কাঁপা গলায় বললঃ আমায় ক্ষমা করুন মহিষী। আমি বলতে পারব না। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। একটা বিরাট ভূমিকম্পে সব ভেঙে ধরাশায়ী হয়েছে যেন। উথালি-পাথালি ঝড়ে গাছগুলো দাপাদাপি করছে। বন্য বরাহ দু'খানা দাঁত দিয়ে যেন পৃথিবীর বুকখানা চিরে ফালা ফালা করে দিয়েছে। আকাশে চন্দ্র সূর্য নেই। ঘোর কলি।

কঞ্চুকীর কথায় দ্রৌপদী শুধু চমকাল না অবাক বিভ্রান্তস্বরে তিরস্কার করে বলল: কঞ্চুকী কি বাজে বক্‌ছিস্? তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। তুই কি পাগল হলি শেষে?

কঞ্চুকীর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হল। উদগত কান্না বুকে চেপে বললঃ পাগল হলে বাঁচতাম। এত কষ্ট হত না।

কষ্ট! যন্ত্রণামথিত অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল দ্রৌপদী। অশ্রুহীন শুষ্ক দুটি চোখে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা আরো নিবিড় হল। নিঃসংশয় হতে পারল না বলে প্রশ্ন করল।—কী বুঝেছিস তুই, কী দেখেছিস খুলে বল।

মানে, আমি দেখেছি, বলতে গিয়ে থামল। দ্রৌপদীর নিদারুণ দুর্ভাগ্যের সংবাদ মুখে উচ্চারণ করবে কি করে? ভেবে পেল না। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কথাগুলো অগোছলো হয়ে গেল। তাই একটু সময় নিয়ে, কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিল মনে। তবু, দ্বিধা গেল না।

দ্রৌপদীর মনে প্রশ্ন এবং সংশয় জাগল। এমন কি ঘটল যে, কঞ্চুকীর বলতে কষ্ট হচ্ছে? তার চোখে অশ্রু রেখা কেন? মনে দ্বিধা কিসের? দ্রৌপদী তার উৎকণ্ঠা আর চাপতে পারল না। কুপিতস্বরে জিগ্যেস করল: চুপ করে আছিস কেন? কি দেখেছিস বল? তোকে আমাব এই রত্ন হার দেব।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল কঞ্চুকী। তারপর স্খলিত ভেজা স্বরে বললঃ মহারাজ পাশা খেলায় সব খুইয়েছে। রাজ্য-সম্পদ-ধন কিছু নেই তাঁর। এমন কি তিনি নিজে এবং সোনার টুকরো তাঁর চার ভাই এখন দুর্যোধনের দাস। শুনলাম তোমাকেও পণ রেখে খেলা হয়েছে। মহারাজ তাতেও হেরেছেন। এখনি প্রতিহারী আসবে তোমায় নিতে যেতে।

সহসা বজ্রাঘাত হল যেন দ্রৌপদীব বুকে। সে আঘাতে দিশাহারা হয়ে পড়ল। এমন সঙ্কট তার ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে যে কখনও আসতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। বুকের গভীরে তার ভাষাহীন জিজ্ঞাসার আর্তি। দ্রৌপদী নির্বাক। অবাক বিভ্রান্ত চোখে কঞ্চুকীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর নির্গত হল না। অসহায় বিস্ময়ে শুধু উচ্চারণ করল, ষড়যন্ত্র। গভীর ষড়যন্ত্র।

অনন্তশূন্যের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। আপন মনে থেমে থেমে একটা একটা করে বিভ্রান্তভাবে উচ্চাণ করলঃ বিশ্বাস—ছলনা; আত্মীয়তা—ঈর্ষা; প্রেম—বিদ্বেষ; প্রতিহিংসা—রক্তে প্রতিহিংসার বীজ, জন্মও হিংসার অগ্নিকুণ্ডে—

প্রতিহারীর আকস্মিক প্রবেশে চমকে উঠলক সে। ক্রোধে দু'চোখে জ্বলে উঠল। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট। কথা বলার শক্তি নেই।

প্রতিহারী মাথা হেঁট করে তাকে অভিবাদন করল। বিনীতস্বরে বলল: মহিষী আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। অনুমতি না নিয়ে কক্ষে ঢোকার অপরাধে আমি অপরাধী নই। যা করেছি রাজাদেশে করেছি। আমি আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। সাধ্য কি রাজার আদেশ অমান্য করি। গুপ্তচর দেখে ফেললে আমার চাকরী যাবে, ছেলে পুলে পরিবার না খেয়ে মরবে। আমি—

তোমার দ্বিধা করার কিছু নেই। নিরুত্তাপ কণ্ঠে উচ্চারণ করল দ্রৌপদী।

প্রতিহারীর কণ্ঠে দ্বিধার অভিব্যক্তি। বললঃ মহারাজ দুর্যোধন আ-প্-নাকে—মানে, রাজসভায় আসতে আজ্ঞা করেছেন।

দ্রৌপদীর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে প্রশ্ন করলঃ তার অধিকার কি?

প্রতিহারী জবাব দিতে গিয়ে কুঁকড়ে গেল। বললঃ মহারাজ জানেন।

দ্রৌপদীর মুখে কষ্টের ছায়ায় একটা কাঠিন্য নেমে এল। দাঁতে দাঁত চেপে তার চোয়াল শক্ত

হয়ে গেল। আর চোখ দুটো খদ্যোতের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললঃ তোমার মহারাজকে গিয়ে বল, দ্রৌপদীকে আজ্ঞা করার অধিকার তাকে কে দিল? মহারাজকে জানিও, দ্রুপদ নন্দিনী তার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করেছে।

যে আজ্ঞা। দ্রৌপদীকে হাত তুলে নমস্কার করে প্রস্থান করল প্রতিহারী।

নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার এক ভয়াবহ অনুভূতি তার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করল। থেকে থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। চরম সঙ্কট মুহূর্তে পার্থ সখা শ্রীকৃষ্ণের কথা বারংবার মনে পড়তে লাগল তার। কল্লোলিত সমুদ্রের মত যে দুর্ভাগ্য অন্ধবেগে ধেয়ে আসছে তাকে প্রতিহত করবে কি দিয়ে? কৃষ্ণ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই তাকে সামলানো। কিন্তু পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ কোথায়? এক অসহায় উদ্বেগে তার চোখের দৃষ্টি স্থির। গভীর চিন্তিত মুখে একটি যন্ত্রনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ পরেই এল অমাত্য কণিক। কক্ষে প্রবেশ করেই বিনা ভূমিকায় বললঃ দ্রুপদ নন্দিনী! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হয়ে তোমাকে পণ রেখেছে। এখন মহারাজ দুর্যোধনের জয়লব্ধা তুমি। সভাগৃহে তিনি তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। আমার অনুগমন কর।

সম্মান প্রদর্শনে কণিকের কার্পণ্য এবং দ্বিধা দ্রৌপদীকে অবাক করল। দাসী জ্ঞানে কণিক তাকে 'তুমি' সম্বোধন করল—এই দুঃখে তার চোখে জল এল। চকিতের জন্য তাঁর ঠোঁট বাঁকল, নাসারন্ধ্র কাঁপল। ক্রোধে চোখ অঙ্গারবর্ণ হল। অমাত্য প্রধানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য সে বলল: প্রতিহারী, তুমি মূর্খের মত কথা বলছ। কোন রাজপুত্র, পত্নীকে পণ রেখে ক্রীড়া করে?

দ্রৌপদীর সম্বোধনে চমকে উঠল কণিক। কিন্তু মুখে তার কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না। ম্লান হেসে বলল: দ্যূতমদে মত্ত রাজার পক্ষে করা কোন কিছু অসম্ভব নয়।

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে দ্রৌপদী প্রশ্ন করল: আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে। তার সঠিক জবাব পাওয়ার পর রাজসভায় যাওয়া বিবেচনা করব। সর্বাগ্রে ধর্মরাজ নিজেকে, না আমাকে দ্যূতপণ রেখেছেন।

ধর্মরাজ সমস্ত ধন-সম্পদ-রাজ্য হারিয়ে প্রথমে ভ্রাতাদের তারপর নিজেকে এবং পরিশেষে আপনাকে সমর্পণ করেছেন।

দ্যূতক্রীড়ার জয়ে ক্ষাত্রগৌরব কোথায়? এ জয় ধর্মানুমোদিত নয়। দ্যূতক্রীড়ায় নারী কখনও পণ হিসাবে বিবেচিত হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির যদি বিভ্রান্তিবশত কোন অধর্ম করেন তাহলে তার দায় আমার নয়।

একথা আমাকে বলা নিরর্থক। রাজাদেশে আমি কাজ করি।

তাহলে তোমার রাজাকে গিয়ে জিগ্যেস কর, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ভার্যাকে পণ রাখার পূর্বেই পরাজিত হয়ে ভার্যার ওপর তার স্বত্ব হারিয়েছেন। অপরের দাস হয়ে পাঞ্চাল নন্দিনীকে পণ রাখার কোন অধিকার তাঁর নেই। তা-ছাড়া আমি তাঁর একার ভার্যা নই। অন্য স্বামীদের স্বত্ব আমার ওপর সমান। সুতরাং যুধিষ্ঠিরেব একার পরাজয়ে আমি রাজসভায় যেতে পারি না। অন্যদের মতামতেরও দরকার আছে।

কণিক হতভম্ব। মনের গভীরে চমক লাগল। বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, দ্রৌপদীর যুক্তি অকাট্য। পাণ্ডবদের সাধারণী ভার্যা সে। সুতরাং চার পাণ্ডবেরা ভার্যার স্বত্বকে অস্বীকার কবে বলপূর্বক তাকে রাজসভায় নিয়ে গেলে অধর্ম হবে। পরে, রাজনৈতিক সংকটও দেখা দেবে। সুতরাং, কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল।

কণিক চলে যাওয়ার পর দ্রৌপদী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। মনের মধ্যে তার বৈশাখী ঝড। একটা উত্তাল জিজ্ঞাসার আবর্ত সৃষ্টি হল তার বুকের মধ্যে। দেখতে দেখতে গোটা দুনিয়াটা তার চোখের উপর জ্বলতে লাগল। দ্রুপদের প্রতিহিংসার আগুন দুর্যোধনের ঈর্ষা, দম্ভের আগুন, কর্ণের অপমান, প্রতিশোধের আগুন, যুধিষ্ঠিরের কামনা এবং স্বার্থের আগুন আগ্নেয়গিরি মত তার মনের আকাশ রাঙিয়ে তুলল। এরা প্রত্যেকে যা করছে তার মধ্যে প্রত্যেকের নিজ নিজ যুক্তি, নীতি আদর্শ আছে। কিন্তু দ্রৌপদীর কোমল প্রাণ, স্পর্শ কাতর মন, প্রেমপিপাসু অন্তর যে তাদের উত্তাপে পুড়ে গেল সে কেউ দেখল না। পঞ্চপাণ্ডবের কেউ তা বোঝার চেষ্টা করল না। তার

নিজের ইচ্ছা দাম পেল না। পিতা, স্বামী সকলে নিজ নিজ স্বার্থ দেখল। তাদের ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে মনকে বলি দিতে বারংবার যে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল তা কেউ চেয়েও দেখল না। তাদের কাছে সে শুধু স্বার্থ, প্রয়োজন ছাড়া কিছু নয়। বিবেক বলে কোন বস্তু যদি যুধিষ্ঠিরের থাকত তা-হলে বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও নিজের স্ত্রীকে পণ রেখে কতকগুলো অমানুষকে দিয়ে লাঞ্ছিত করত না। দুঃখের কপালে অবশ্য সবই সয়। কিন্তু তার মত এরকম দুঃখী পৃথিবীতে কম জন্মে। অভিমানে তার দু'চোখে জলে ভরে গেল। মনে হল, এ পৃথিবীতে তার কোথাও আশ্রয় নেই।

এরকম স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে কতক্ষণ কাটল সে জানে না। চমক ভাঙল দুঃশাসনের আহ্বানে। সুন্দরী, দেবর দুঃশাসনের বাহুবন্দী হওয়ার সম্মতি দিতে তোমার এত দেরি হল কেন? বহু বল্লভা রমণীর এ লজ্জা মানায় না। আমার প্রশস্ত বক্ষই তোমার যোগ্য জায়গা।

অপমানে, দুঃখে, ক্রোধে দ্রৌপদীর দুই হাঁটু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। সারা দেহের উচ্চকিত রক্তে রক্তিম হল মুখমণ্ডল। শক্ত হল মুখ। নাকের পাটার দু'পাশে ফুলে উঠল। অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল দুই চোখ।

দুঃশাসন নির্বিকার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দ্রৌপদীর বক্ষ, কটি, জঙ্ঘা সে দেখতে লাগল। কামার্ত চোখে তার হাসি ঝিকমিক করছিল। দ্রৌপদীর মুখে চিন্তার ছায়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে গেল। ভাসা ভাসা দুটো চোখ তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল হল। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো হয় না। দুঃশাসনের বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। তাই মরিয়া হয়ে বিকট ভাবে হেসে উঠল দুঃশাসন। তার অট্টহাসির ভয়ঙ্কর শব্দে দ্রৌপদীর গাম্ভীর্য ভয়ে ভেঙে গেল। বিপদের আশঙ্কায় সে কক্ষান্তরে যেতে উদ্যত হল।

তক্ষুনি দুঃশাসন হাতখানা চেপে ধরল তার। বজ্র মুষ্টিতে সবলে বুকের মধ্যে নিষ্পেষিত করার চেষ্টা করতে লাগল। তার দ্রৌপদীকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বাধা পেয়ে দুঃশাসন শক্তি প্রয়োগ করে তাকে আকর্ষণ করতে লাগল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়ল দ্রৌপদীর। লোভার্ত দুঃশাসন বাম হাতে কাঁচুলির গিঁট একটানে খুলে ফেলল। দ্রৌপদী দ্রুতবেগে জুজুৎসুর কায়দায় তাকে ধরাশায়ী করে ঘর থেকে ছুটে পালাল।

দুঃশাসন তাড়াতাড়ি মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিপ্ত মাতঙ্গের মত দ্রৌপদীর পশ্চাদ্ধাবন করল। আর্ত চিৎকারে করতে করতে দ্রৌপদী দৌড়োচ্ছিল। কিন্তু বন্ধ দরজা খুলে কোনো কৌরব বধূ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। পলায়মান দ্রৌপদীর দোদুল্যমান কবরীর প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে দুঃশাসন পাশববলে তার গতিরুদ্ধ করল। দু'জনে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল তখন। একজনের চক্ষু প্রতিহিংসায় জ্বলছিল, অন্যজন ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বিব্রত এবং আতঙ্কিত।

দুঃশাসন দাঁত চেপে বললঃ এবার কোথায় পালাবি শয়তানী? চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তোকে নিয়ে যাব দ্যূতসভায়।

দ্রৌপদী দিশাহারা হয়ে হাত কামড়ে দিল তার। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে দুঃশাসন মুষ্ঠি-বদ্ধ কবরী ছেড়ে দিল তার। দ্রৌপদীর ছুটে পালানোর কোন চেষ্টা করল না। হাঁফাতে হাঁফাতে গর্জে উঠল। বললঃ শোন্ পাষণ্ড! নারী বলে অক্ষম ভেবো না আমায়। আমি জুজুৎসু যেমন জানি, দরকারে অসি ধরতেও পারি। বেয়াদপি না করে বল, কি করতে হবে আমায়? কোথায় যেতে হবে?

আহত বাঘের মত ক্রোধে গজরাতে লাগল দুঃশাসন। বললঃ তুই এখন কৌরবের দাসী। দাসীর এ স্পর্ধা যখন মহারাজ দুর্যোধন শুনবে তখন তোকে দাসীদের কুঠিতে পাঠাবে, প্রহরীদের সাথে রাত্রি যাপনের শাস্তি দেবে। দ্যূতসভায় পঞ্চপাণ্ডবের সম্মুখে তোকে দিয়ে ক্রীতদাসীর মত পদসেবা করাব, তোর দর্প, অহঙ্কার, তেজে আমি পদাঘাত করি।

বলা শেষ করে ক্ষিপ্ত হস্তে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে, বায়ুবেগে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। দ্রৌপদী কোন বাধা দিল না। বাধা দিতে ঘৃণা হল তার। নিজেকে তার ভারতবর্ষের নিঃসহায় নির্যাতিত নারীদের একজন মনে হল। তাদের মতই মুখ বুজে চোখের জলে দৈহিক নির্যাতনের

ব্যথা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। মুখ দিয়ে একটি কাতরোক্তিও নির্গত হল না। দুরাত্মা, পাষণ্ড দুঃশাসনের কাছে কাতর অনুনয় জানানো নিরর্থক। তাই, অরণ্যে রোদন করল না। কৌশলে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে শুধু বললঃ শোন দেবর দুঃশাসন, আমি রজঃস্বলায় আছি। এ অবস্থায় রমণীরা অশুচি থাকে। তাই সভায় আমাকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এতে তোমাদের নব গৃহের অমঙ্গল হবে, শুচিতা নষ্ট হবে। তুমি নিবৃত্ত হও। 'শান্তি গৃহে' অশান্তি এনো না ডেকে।

দুঃশাসন কর্কশকণ্ঠে অমার্জিত ভাষায় বলল তোর মত বহুভোগ্যা রমণীকে বিবস্ত্রা করে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল

চুপ করে গেল দ্রৌপদী। বুকের ভেতর থেকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠে এল গলার কাছে। হিংস্র একটা বিদ্বেষে ছেয়ে গেল তার মন। ঈশ্বরের কাছে মনে মনে অভিশাপ প্রার্থনা করে বললঃ 'হে বিধাতা আমার চোখের জলে লেখা হয় যেন এদের সর্বনাশ।'

গভীর দুঃখের মধ্যে সে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল। বিচিত্র জীবনের দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে যে সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে তার স্মৃতি দুলে উঠল মনে। সে সব কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা তার চিন্ চিন্ করে জ্বালা করে। জন্ম থেকে তাকে নিয়ে চলেছে এক বিচিত্র রাজনীতি। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে তার জীবনটা ক্রমে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। রাজনীতির ঘোলা জলের দুর্গন্ধভরা পচা পাঁকের গন্ধে তার সমস্ত চেতনা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। একটা ঘুমের মধ্যে যেন দুঃশাসন টানতে টানতে তাকে সভায় নিয়ে এল। দুর্যোধনের পায়ের কাছে সজোরে ঠেলে দিল। ধাক্কা সামলাতে না পেরে দ্রৌপদী মুখ থুবড়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। উঃ!—করে একটা অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করে উঠল দ্রৌপদী। অমনি কৌরব ভ্রাতারা সমস্বরে হো-হো করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। পঞ্চপাণ্ডবেরা একসঙ্গে চমকে উঠল। তাদের সর্বশরীর পলকের জন্য থর থর কেঁপে উঠল। কিন্তু হেঁট মাথা উঁচু করে পাঞ্চালীর দিকে তাকাতে পারল না। অপরাধবোধে নিশ্চল হয়ে রইল। কর্ণ সাতিশয় আহ্লাদিত হয়ে দুঃশাসনের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিল। তার সাহস এবং কর্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করল।

দ্রৌপদীকে নিয়ে শুরু হল কৌরবদের বর্বর খেলা। ভূলুণ্ঠিতা দ্রৌপদীর কান্না থরো থরো দেহটাকে তুলে ধরতেই দুর্যোধন তার হাতখানা প্রসারিত করে দিল। ঘৃণায় দ্রৌপদী ছিটকে সরে গেল দূরে। দুঃখে ক্রোধে তার দু'চোখ জ্বলে উঠল। দুর্যোধন কিছুমাত্র সংকুচিত হল না। জিভের সাহায্যে মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করল। বলল: অমন রূপ মাটিতে মানায় না। কদলী বৃক্ষ সদৃশ আমার এই ঊরুদেশই তোমাব যোগ্য আসন। এখানে বস সুন্দবী।

চোখ ফেটে জল এল দ্রৌপদীর। কিছুই বলল না, মানে বলতে পারল না। বলার কি থাকতে পারে? একান্ত অসহায়ের মত পঞ্চস্বামীর দিকে তাকাল। যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতারা মুকুট এবং রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে অনবত মুখে দুর্যোধনের পদপ্রান্ততলে বসে ছিল। চমকে উঠল দ্রৌপদী। প্রহৃত পশুর মত বোবা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল তার শরীর। উন্মাদের মত হিংস্র গলার চিৎকার করে সভাসদবর্গের উদ্দেশ্যে বললঃ এ আমি কোথায় এলাম? এ কি অরণ্য? এখানে শুধু মাংসলোলুপ হিংস্র শ্বাপদের বিচরণ? আমার চতুর্দিকে যাঁরা উপবিষ্ট তাঁরা কি অরণ্যে নির্বাক, নিস্পন্দ বৃক্ষ? হিংস্র শ্বাপদের বর্ব্বরতার নীরব সাক্ষী? আপনারা মানুষ না বৃক্ষ? আপনাদের পৌরুষ কোথায়? ক্ষত্রিয়ের দম্ভ, ব্রাহ্মণের তেজ ভারতবর্ষ থেকে কি বিলুপ্ত হয়েছে? প্রকাশ্য দিবালোকে সভাসদবর্গের সম্মুখে নারীর সম্ভ্রম, মর্যাদা এবং সতীত্ব নিয়ে যখন বর্বর কৌতুক এবং নির্যাতন চলে তখন বিপন্ন নারীর সতীধর্ম রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার কোন পুরুষ কি নেই এই সভায়?

কর্ণ তার আসন থেকে লাফিয়ে উঠে হো হো করে হেসে উঠল। তাব উত্তাল হাসির লহরী সভাকক্ষ প্লাবিত হল। কৌরববেরাও তার সঙ্গে যোগ দিল। কক্ষের দেয়ালে সে হাস্য প্রতিধ্বনিত হয়ে এক নারকীয় বীভৎসতা সৃষ্টি করল। উদ্‌গত হাসি দমন করে কথা বলতে গিয়ে কর্ণের কণ্ঠস্বব বিকৃত হল। বিদ্রূপ করে বললঃ সতী? পাঞ্চালী হচ্ছে সতী শিরোমণি। আহা কি সতী আমার! স্ত্রীলোকদের এক স্বামীই বিধান। কিন্তু দ্রৌপদী পাঁচ-পাঁচটা স্বামীর স্ত্রী। যাক বলে কুলটা, বারস্ত্রী।

বেশ্যা। বেশ্যাকে সভা মধ্যে বিবস্ত্রা করে নির্মল কৌতুক আনন্দ এবং মজা উপভোগ করতে বাধা নেই।

বিকর্ণ-র আহত পৌরুষ ক্রোধে গর্জে উঠল। বলল: কর্ণ, তোমার রসনায় বিষ আছে। তোমার মুখে কিছুই বাধে না। সত্যিই তুমি অত্যন্ত নীচ, অধম। ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য। জঘন্য প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে পাঞ্চালীকে তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় যে কথা বললে, সভ্য সমাজ কোনদিন তা ভুলবে না। তোমার চরিত্রের এই কলঙ্ক দাতাকর্ণ নামের ঔজ্জ্বল্যকে ঢেকে দেবে। বাড়ির পোষা কুকুরও তোমার নাম ধরে ডাকবে না।

ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে কর্ণ বলল : বিকর্ণ, তুমি বালক।

তরুণ শালবৃক্ষের মত বুক ফুলিয়ে বলল : তোমার কোন কথায় আমি ভুলব না। তুমি নীচ, স্বার্থপর। তোমার মুখ দর্শনও পাপ।

তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে ঝড়ের বেগে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল বিকর্ণ। তার গন্তব্য পথের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল: আমাকে শোনাচ্ছে ধর্মের কাহিনী। দুই ঠোঁট উল্টে বিরক্তিসূচক উচ্চারণ করল—ধর্ম? ধর্ম এক নয়, ধর্মের রূপ বহু। তা যদি না হত তা'হলে ধর্মজ্ঞ প্রপিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য নীরব থাকতেন না। ধর্মবোধেই তাঁরা নীরব নিশ্চল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্যধর্মের রক্ষা কবচে বাঁধা। তিনিও নীরব। স্ত্রীকে রক্ষা করার ধর্ম তিনিও পালন করেননি। ধর্ম এক বহুরূপী ধারণা।

এরকম একটা অদ্ভুত আশ্চর্য কথা বলতে পারে কর্ণ কেউ ভাবেনি। ভীষ্মও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিহুলতা কাটিয়ে উঠতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। তারপর, নির্দ্বিধায় বলল: আমরা কৌরবের অন্নদাস। তাদের বেতনভূক দাস। দাসের স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য আছে নাকি? নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে অস্বস্তির কাঁটা বুকে নিয়ে নির্বাক নিশ্চল বৃক্ষের মত নারী নির্যাতন দেখছি। এর চেয়ে দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনা পুরুষের জীবনে হয় না। আমরা যা পারলাম না বিকর্ণ তাই করে আমাদের চোখ খুলে দিল। তবু, বিকর্ণ ও আমি এক নই, বিকর্ণ অন্নদাস নয় বলেই তার ভেতর নির্ভীক পুরুষটা গর্জে উঠেছে। অকম্পিত কণ্ঠে তোমাদের অশিষ্ট, অভদ্র, অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু—

কর্ণ বিরক্ত হয়ে ভীষ্মের কথায় বাধা দিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললঃ এখানে উপদেশ শুনতে আসিনি আমরা।

ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত দাসী পুত্র যুযুৎসুর কণ্ঠস্বর বিদ্রূপে ক্ষুরধার হল। বললঃ এসেছি অপমানের প্রতিবিধান করতে।

কর্ণ কুপিত স্বরে বললঃ সৈনিককে নিরস্ত্র করা যেমন অসম্মানকর অপমানজনক কাজ, তেমনি বীরের উত্তোলিত ধনুঃশর নিক্ষেপের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ততোধিক মর্যাদাহানিকর ব্যাপার। স্বয়ম্বর সভায় পাঞ্চালী বিনা কারণে আমায় যে অনাদর এবং অসম্মান করেছিল, আমি তা সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব তাকে।

কর্ণের মুখভঙ্গি বদলে গেল। ক্রোধে তার সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। দু'চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। মনে হল, সে আগুনে বিশ্ব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মুখের চোয়াল তার শক্ত হল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে ওষ্ঠ দংশন করে মনোবেদনা দমনেব চেষ্টা করল। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বুকে তার জ্বালা ধরিয়ে দিল। দু'চোখে আগুন জ্বেলে দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদীর বসন উন্মোচনের ইঙ্গিত করে বললঃ দুঃশাসন তুমি দুঃসাহসী। তোমার সম্মুখে অবনতমুখী রৌরুদ্যমান ঐ বারাঙ্গনাকে বিবস্ত্রা করে স্বয়ম্বর সভায় আমার অপমানের প্রতিশোধ নাও।

কর্ণের স্বরে যন্ত্রণার হুংকার আদেশের মত শোনাল।

শকুনির অধরে বাঁকা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। চোখের চাহনি হল ক্রুর। প্রতিটি শব্দে সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। বললঃ অবশ্যই তাতে তাপিত হৃদয়ের সুতীব্র জ্বালার কিছুটা উপশম হবে। বন্ধুর জন্যে এটুকু উপকার নিশ্চয়ই করবে। তুমি তো দে-ব-র। পাঞ্চালীর ওপর পাণ্ডবদের

সকলের সমান অধিকার। তুমিও যখন তাদের ভ্রাতা তখন তোমারও ন্যায্য অধিকার আছে। তাকে নিয়ে কৌরবেরও যা খুশি করতে পারে।

কর্ণের মুখের ভাব কঠিন হল। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল একটা হিংস্র ভাব। সারা মুখ তার ঘৃণায় আরক্ত। ক্রোধে উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর বিকৃত হল। হুংকার দিয়ে বলল: দাসী। পাঞ্চালী এখন দাসী। দাসীর কোন অধিকার নেই। ইচ্ছাও নেই। প্রভুর দাবি পূরণ তার কাজ। ওকে আমার রক্ষিতা করে রাখব।

কর্ণের কথায় ছিল একটি নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ। যা ওকে পাপবোধ এবং দ্বিধা থেকে মুক্ত রেখেছিল।

দ্রৌপদী সাহস হারাল না। নিজের মনের জিজ্ঞাসায় সে অন্যমনস্ক। দৃষ্টিতে নির্বাক জিজ্ঞাসা। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির সে। পূজার দুর্গা প্রতিমার মত দুর্জয় আর অপরূপ দেখায় তাকে।

আসন্ন ঝড়ের পূর্বে চতুর্দিকে যেমন থম থম করে তেমন একটা নীরব গাম্ভীর্যে সে স্তব্ধ। যেন কোন যুদ্ধের সংকেত। চোখের কোণে নেই অশ্রুর আভাস। দৃঢ় প্রত্যয়ে দুই চোখ চক্ চক্ করছিল। উৎকণ্ঠিত মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ গভীর হল। মনের গভীরে অপমানের তীব্র বেদনা এবং লাঞ্ছনার ভয় তার চেতনার বিন্দুতে সংহত হয়ে এক অন্য মানবীতে পরিণত করল। সৈনিকের যেমন নির্ভয় অবলম্বন তার কৃপাণ, তেমনি দুর্জয় তেজ, সাহস, ব্যক্তিত্ব আত্মবল দ্রৌপদীকে কোষমুক্ত শাণিত কৃপাণের মত দীপ্ত করে তুলল।

দুঃশাসনের লোলুপ দৃষ্টি ক্ষুধিত হায়নার মত জ্বলছিল। দু'হাতে বুক চেপে ধরে নিরুদ্ধ আবেগে অস্ফুটে স্বরে অস্পষ্ট ভাষায় কি সব বিড় বিড় করে বলছিল। সাঁওতালি মাদল বাজতে লাগল তার রক্তে। উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করছিল তার কপালের দুটো শির। দ্রৌপদীর অসহনীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে এগোতে ভয় পেল। তাই যৌন উদ্দীপক কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি তার মনে ভয় ও আতঙ্ক জাগাতে চাইল। দুঃশাসনের দেহ ভঙ্গিমায় অন্তরের সুপ্ত লালসা এবং অতৃপ্ত ভোগাকাংখা এমনই নির্লজ্জের মত প্রকাশ পেল যে দ্রৌপদী লজ্জায় দৃষ্ট নত করল। অমনি ফাঁদে পড়া পাখীর মত দুঃশাসন শক্ত বাহুর বাঁধনে বাধল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘা খাওয়া বাঘিনীর মত ক্ষিপ্ত আক্রোশে দ্রৌপদী তার মুখে থুৎকাব দিল। ক্ষেপে গিয়ে দুঃশাসন শক্ত মুঠিতে তার শাড়ি ধরে টান দিল। দ্রুতে হস্তে দ্রৌপদী শাড়িটাকে শক্ত করে চেপে ধরল। কষ্টবিদ্ধ ঘৃণায় ধিক্কার এল আপনা হতে—ছিঃ। কালান্তক ধূর্জটির মত জ্বলে উঠল তার দুটি চোখ। অপ্রস্তুত বিস্ময়ে থমকে গেল দুঃশাসন। তার বক্ষ রক্ত হিম হল। হাত থেকে বস্ত্র স্খলিত হল। দুঃশাসনের চোখে চোখে রেখে কম্পিত কণ্ঠে বলল: স্তব্ধ হও দুরাচারী দুর্মদ দুরন্ত দুঃশাসন। আমার অঙ্গ স্পর্শ কর না। আমি নারী। লজ্জা, আত্ম-মর্যাদাবোধ ভারতীয় নারীর ভূষণ। পুরুষকেই নারীর লজ্জা। কিন্তু সেই পুরুষই দস্যুবৃত্তি করে নারীব লজ্জা সম্ভ্রম হরণ করে। আবার পুরুষের প্রেমের কাছে নারী তার লজ্জাকে উৎসর্গ করে। লজ্জা তার প্রেমের নৈবেদ্য। পূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করতে লজ্জা হল না তোমার? নারী কী তোমাদের খেলার পুতুল? যা খুশি করার খেলনা? তার হৃদয় নেই, মন নেই,—ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই? ইন্দ্রিয় উদ্দীপক শক্তি বলে সে শুধু নির্লজ্জ কামাচারের সঙ্গী? তার সামাজিক বন্ধন, দেহের পরাধীনতা বেশি বলে দুর্বৃত্ত পুরুষের অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হয়। নারীর লজ্জা, দুর্বলতার ওপর বিক্রম প্রকাশ করতে তোমাদের লজ্জা হয় না? এই বিক্রম নিয়ে তোমাদের পৌরুষের গর্ব? ধিক্ ধিক্ অমন পৌরুষকে।

দ্রৌপদীর বিরক্তিসঞ্জাত ঘৃণা, ধিক্কার, বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, তার মোহিনী ব্যক্তিত্ব সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে অপ্রস্তুত বিস্ময়ে হতবাক্ করল। কৌরব ভ্রাতাদের কোলাহল, কলরব, অট্টহাস্য স্তব্ধ হল। সকলে নির্বাক।

দ্রৌপদীর প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টিতে এমন একটা তীক্ষ্ণতা এবং কাঠিন্য ছিল মুখে যে সকলের মস্তিষ্কের সীমা স্পর্শ করল তা। সভাস্থ ব্যক্তিদের বুকের ভেতরটা চমকে গেল। একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা দ্রৌপদীর

কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে শ্লেষে শাণিত করে তুলল। বললঃ এখানে পুরুষ ছিল একজনই। সে হল বিকর্ণ। আর যারা আছে তাদের সঙ্গে জঙ্গলের পশুর পার্থক্যটা কোথায়? কামার্ত বাসনা নিয়ে লোলুপ দৃষ্টি মেলে তারা আমার নারী দেহটা দেখার জন্য উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে আছে। হরিণের মাংস হরিণের বৈরী। আমার এই নারী দেহটা আমারও পরম শত্রু। এর উলঙ্গরূপ দেখার প্রবল লোভে পিতৃস্থানীয় ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে। কখন আবরন-উন্মোচন করবে দুঃশাসন, তারই প্রতীক্ষা করছে যেন সকলে। তাই প্রকাশ্য-সভায় আমাকে বিবস্ত্রা করার সাহস পেল দুঃশাসন। কামুক পুরুষের কৌতূহল তাকে স্পর্ধিত করেছে। তার নির্লজ্জ বর্বর এবং অসামাজিক আচরণের তাই কেউ প্রতিবাদ করল না; উপভোগের উন্মাদনা নিয়ে তারা কেমন চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। ধিক্! ধিক্ আপনাদের কৌতূহলের! এতই যখন লোভ, তখন দুঃশাসনের দস্যুতা করার দরকার নেই। নিজের হাতেই আমি তা উন্মুক্ত করছি। দ্যাখ নরাধমেরা—বলে, দ্রৌপদী বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত হল।

দ্রৌপদীর তিরস্কার, ধিক্কার সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্তম্ভিত করল। লজ্জায় অধোবদন হল। তাবা কেউ কেউ চক্ষু বন্ধ পর্যন্ত করল। কর্ণ, দুঃশাসন, দুর্যোধন প্রমুখ ভ্রাতাদের নির্লজ্জ অসংযত কৌতূহলও লজ্জায় আরক্ত হল।

নারী নির্যাতনের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রকে যশহানির আশঙ্কায় বিচলিত করল। দেশে দেশে নারী নির্যাতনের এই ঘটনা কৌরবদের চির কলঙ্ক হয়ে থাকবে। দুষ্কৃতি এবং অত্যাচাবেব সাক্ষী হয়ে তাদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করবে। জরাসন্ধ, শিশুপালের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর শূন্যস্থান দখলেব জন্য যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে এই ঘটনার দ্বারা তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা আছে বলে মনে করল। এক ভয়ঙ্কর অনিষ্ট আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিত ও বিচলিত হল। উৎকণ্ঠা নিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে দ্রৌপদীর কাছে দাঁড়াল সে। অপরাধীর মত ভগ্নস্বরে বলল: কল্যাণী, এ নরাধমেরা জানে না কী করেছে? তুমি শান্ত হও মা। আমি তোমাকে পণ থেকে মুক্তি দিলাম। তোমাব পূর্ণ কর্তৃত্ব মহিমা নিয়ে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাও। আজ তোমায় যারা লাঞ্ছিত করল তাদের সকল পাপ আমি মাথায় করে তুলে নিলাম। তাদের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। মনে তোমার কোন ক্ষোভ কিংবা দুঃখ রেখো না মা। পাবলে, এই অক্ষম অন্ধ, দুর্বল বৃদ্ধ ছেলেটিকে মার্জনা কর। বলতে বলতে তার গলা ভারী হয়ে এল।

ধৃতরাষ্ট্রের করুণা ও অনুকম্পার বিনিময়ে রাজ্যলাভ যুধিষ্ঠির চিত্তে এক সুতীব্র অপমানবোধ জাগ্রত করল। কেননা এই দানগ্রহণের মধ্যে কোন গৌরব নেই, আছে শুধু নিন্দা, অপবাদ। দান হিসাবে রাজ্য গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রশক্তির অপমান। পাণ্ডবদেব নির্লোভ চরিত্রের কলঙ্ক। এই বদান্যতাকে কৌরবেরা রাজনৈতিক প্রচারের একটা ব্যাপার করে তুলবে। দেশে দেশে তাদের চরিত্র গৌরব এবং আদর্শকে হেয় করার উদ্দেশ্যে হয়ত ধৃতরাষ্ট্র এই কূট ছলনা করল? জতুগৃহের স্মৃতি এখনও তার মানস নয়নে মুদ্রিত। সুতরাং, পিতৃব্যের কোন বাক্যে প্রলুব্ধ হওয়া কিংবা বিভ্রান্ত হওয়া তার উচিত হবে না। শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক শপথবাণী "এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিছিন্ন ভারত বেঁধে দিব আমি।"—এই কথাগুলো মনে হতে সে বুকে বল পেল। নিজের ওপর ভরসা ও আস্থা দৃঢ় হল। কৃষ্ণ তাকে ধর্মরাজ্যের মনোনীত সম্রাট করেছে। ধৃতরাষ্ট্রের এই অনুগ্রহ সম্রাটের সেই গৌরব ম্লান করে দেবে। সুতরাং এ প্রস্তাব মেনে নেয়া তার কাছে কঠিন সমস্যা হল। কেননা, তাকে লোকে বলবে পাণ্ডবেরা আত্মমুখী বিলাসী, লোভী, স্বার্থপর, এদের কাছে বড় কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়। এরা বুলি সর্বস্ব মহৎ। ধর্মের ভেক্ পরে আছে। কৃষ্ণের ধর্মরাজ্যের রাজার চরিত্রে এই হীনতা মানায় না। আবার, ধৃতরাষ্ট্রে দান অস্বীকার করলে এক চরম গৃহ সংকটের সৃষ্টি হয়। নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনের সুখ ও শান্তি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে দ্রৌপদী এবং ভ্রাতারা ক্ষুব্ধ হবে। ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী হয়। বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে ভেঙে পড়বে

পারিবারিক ঐক্য। নষ্ট হবে সুখ-শান্তি। ছিন্নমূল পরিবারে তাকে বিচ্ছিন্ন এবং অযোগ্য-ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন করাই পিতৃব্যের গোপন অভিপ্রায় বলে মনে হল তার। কৃষ্ণেরও চোখে, এবং ভাইদের কাছে তাকে হেয় করাই পিতৃব্যের চক্রান্ত। এ ষড়যন্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করার পর যুধিষ্ঠির এই কূট পরাভবকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। ধৃতরাষ্ট্রের মতলব ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যের দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার কথা যখন ভাবছিল তখন দুর্যোধন পাণ্ডবদের উপর তার ক্রোধ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা নিতে পুনর্বার যুধিষ্ঠিকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল যুধিষ্ঠিরের। মনে হল, দৈব তার মনের কথা জেনেই যেন সমস্যার সমাধান করে দিল। নইলে, এরকম একটা আত্মদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেত না। দৈব বোধ হয় এতদিন পর প্রসন্ন হল তার। খুশির লহরী বয়ে গেল রক্তে। দ্বিরুক্তি না করে রাজি হল যুধিষ্ঠির। দূতকে বলল: দৈব বলে শুভাশুভ ফল ভোগ করে থাকে লোকে, অতএব পুনর্বার যদি ক্রীড়া করতে হয় তাহলে ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ভাগ্য ফল কখনও খণ্ডাবার নয়। দ্যূতক্রীড়া ক্ষতিকর জেনেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। বোধ হয়, আমার নিয়তিই আমাকে টানছে।

একথা শোনা মাত্র ভীমের দুচোখে আগুন ঠিকরে পড়ল। যুধিষ্ঠিরের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্বিকার ভাবে বলল: ক্ষত্রিয় নির্দ্বন্দ্ব হয়ে জয় পরাজয় গ্রহণ করে।

।। আট ।।

বিপন্নের মত আর্তকণ্ঠে দ্রৌপদীর নাম উচ্চারণ করতে করতে ভীম দৌড়ে তার ঘর এল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। চোখে মুখে উত্তেজনা। বুকে অশান্ত অস্থিরতা। বিচলিত স্পন্দিত বুকে জিজ্ঞাসা মর্মরিত হল: পাঞ্চালী! পাঞ্চালী!

ভীমের ব্যাকুল করা আহ্বানে দ্রৌপদীকে উৎকণ্ঠিত করল। শশব্যস্ত হয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। আঁখিতে তার বিপন্ন বিস্মিত জিজ্ঞাসা। বলল: কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

অস্ফুট স্বরে ভীম বলল: দ্রৌপদী প্রশ্ন কর না, তোমাকে সে দুর্ভাগ্যের কথা আমি জানাতে পারব না। তুমি সইতে পারবে না।

ভীমের বাক্যে কেঁপে উঠল দ্রৌপদীর বুকের ভেতরটা। দেহের শোণিতে শোণিতে বয়ে গেল কোন হিম শোণিত স্রোত। হাত হতে স্খলিত হল সুগন্ধ কুসুমগুচ্ছ। ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর জিগ্যেস করল: এমন কি হল যে, বলতে বুক ফাটছে তোমার?

ফাটবে না? আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যে তার কষ্ট ভোগ করতে হবে; এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই আমার। ক্রোধে দ্যূতাসক্ত ধর্মরাজের দুবাহু ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিলাম। শুধু অর্জুনের জন্য পাপ হাত দুটো শাস্তি দেয়া গেল না।

শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চীর মত দ্রৌপদী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে অবাক স্বরে বলল: তোমার কোন কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না হেঁয়ালীর মত লাগছে সব। স্পষ্ট করে বল।

দ্রৌপদীর সন্তর্পিত জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে ভীম বললঃ দ্রৌপদী, স্বপ্নেও ভাবিনি আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর এই বিড়ম্বনা হবে।

বিচিত্র এক হাস্য স্ফুরিত হল দ্রৌপদীর অধরে। বেদনার নিবিড় ঘন ছায়া অপসারিত হল মুখ থেকে। ভুরুতে কৌতুকের ঝিলিক। বলল: বুঝেছি। আমাকে নিয়ে তোমার কৌতুক হচ্ছে! ভয় দেখিয়ে লুঠ করতে এসেছ অবলা নারীর হৃদয়। তবে রে চোর!

মৃদু প্রহারের ভঙ্গীতে মুষ্ঠিবদ্ধ দুই হাত শূন্য উত্তোলিত করল। কিন্তু ভীমের দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট দুই স্থির আঁখির দিকে তাকিয়ে তার সব চপলতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

নির্বিকার কণ্ঠে ভীম বললঃ দ্যূতাসক্ত ধর্মরাজ দ্যূতপণে পুনরায় রাজ্য সিংহাসন সব হারিয়েছেন। আমরা আবার রাজ্যচ্যুত, আশ্রয়হীন, সম্পদহীন, ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য আবার নির্বাসিত আমরা।

বাক্যহারা অসহায়ের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দ্রৌপদী। কঠিন বেত্রাহতের মত বেদনায়

মর্মরিত হল তার বুকে। ক্রন্দনের রোল উঠল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। এক দুঃসহ বেদনায় বেদনার্ত হল তার মর্যাদাহত অন্তর। নিজের উপর তার অভিমান জাগল। মনে হল অদৃষ্ট লাঞ্ছিতা কোন অভিশপ্ত নারী সে। তাকে নিয়ে চলেছে এক আশ্চর্য খেলা। অদৃষ্টও সে খেলায় যোগ দিয়েছে।

আহত পাখির মত যন্ত্রণাকাতর চোখ তুলে তাকাল ভীমের দিকে। শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললঃ স্বামী, আমার জীবনের সব আনন্দ স্বপ্ন তোমাদের পাঁচভাই-এর নিষ্ঠুর অবহেলা, উপেক্ষার আঘাতে দলিত মথিত হয়েছে বারবার। আমার অন্তরকে এমন করে নিঃশেষ করে ফেললে কি দিয়ে তোমরা প্রেমকুঞ্জ রচনা করবে? আমিও বা কি দেব তোমাদের? কোথায় পাব প্রেমের উষ্ণতা?

ভীম কথা বলতে পারল না। করুণ নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে। চিন্তায় শুধু আবর্তিত হতে থাকে দ্রৌপদী আর ভীম।

এমন সময় যুধিষ্ঠির এল সেখানে। যুধিষ্ঠির উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত ভাব। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির দ্রৌপদীর নয়ন যুগল। যুধিষ্ঠিরের আগমনে কোন অভিব্যক্তি নেই তার। কেবল ভ্রূভঙ্গিমায় প্রকাশিত হল অন্তরের বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা।

যুধিষ্ঠিরের ঠোঁট কাঁপছিল। সে যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু কৃত অপরাধের সংকোচ এবং দ্রৌপদীর ক্রোধের ভয়ে বলতে পারল না। তার শরীর কাঁপছিল। স্বেদসিক্ত হল তার কলেবর। পৌরুষের গ্লানি, ব্যর্থতার যন্ত্রণা এবং মর্মপীড়ায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। সংশয় ও দুশ্চিন্তার কৃষ্ণ ছায়া তাকে আচ্ছন্ন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় করল।

বেশ কিছুক্ষণ তাদের নীরবে কাটল।

চুপ করে থাকতে থাকতে একটা মর্মস্পর্শী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল যুধিষ্ঠিরের। ধীরে ধীরে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠল। মাথা নিচু করে অস্ফুট স্বরে বলল : দ্রৌপদী! ইন্দ্রপ্রস্থে আমার স্থান নেই আজ। ভাইদের সংগে আমিও বনে নির্বাসিত হয়েছি। যাত্রার কয়েক দণ্ড বাকি আছে আর। তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম। আমার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা কর।

দ্রৌপদীর চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। যুধিষ্ঠিরের কথার জবাব দেবার মত কোন কথা খুঁজে পেল না। যাকে তিরস্কার করার জন্য মন উন্মুখ হয়েছিল, তার দুর্ভাগ্য দ্রৌপদীর অন্তঃকরণে করুণা সঞ্চার করল। বাক্যহীন ব্যথায় চেয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু মনের ব্যাকুলতা গোপন করতে পারল না। বুক ঠেলে একটা গভীর শ্বাস বেরিয়ে এল। এটি কোন দুঃখের দীর্ঘশ্বাস নয়, তার ক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের স্বস্তির নিঃশ্বাস। তারপর ধীরে শান্ত গলায় বলল : তোমাকে প্রবোধ দেবার ভাষা আমার নেই। আমার জন্যে তোমাদের এই দুর্ভোগ।

কেঁপে উঠল যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ। বলল : ও কথা বলছ কেন?

দ্রৌপদীর মুখের উপর ক্লান্ত ঔদাসীন্যের মলিন ছায়া থম থম করছিল। আর্ত কণ্ঠে বলল : আমার স্বয়ম্বরের স্মৃতি ব্যর্থ নৃপতিদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। সে আগুনে আমি পুড়ে ছারখার না হওয়া পর্যন্ত নিভবে না। তোমাদেরও বিড়ম্বনা ঘুচবে না।

দ্রৌপদীর শেষ কথার উত্তর দিতে পারল না যুধিষ্ঠির। এ কথার উত্তর হয় না। একমাত্র যুদ্ধেই তার মীমাংসা সম্ভব। কারণ দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য কর্ণ গোপনে দুর্যোধন, শকুনি, নরকাসুর এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীকে উত্তেজিত করছিল। তাদের অন্তরের বিদ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা, আক্রোশের পরিমাপ করার জন্য দ্রৌপদীকে পণ রাখল যুধিষ্ঠির। কিন্তু তার মনের এই সুগোপন অভিপ্রায় কাউকে বোঝানোর নয়। জানেও না কেউ। কেবল, যুধিষ্ঠির তার প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিল যে দ্রৌপদীর প্রতি পরাক্রান্ত নৃপতিদের দুর্বলতা ও ঈর্ষা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগাচ্ছে। শীঘ্রই তারা জোটবদ্ধ হয়ে এক বিরাট মহাসমরের আয়োজন করবে। তাই, অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীকে তাদের সম্মুখে হাজির করে তাদের মনোভাব এবং বিচারবোধ এবং অভিপ্রায়ের পরিমাপ করল। কিন্তু তাদের বিষোদ্গার যে এত নিষ্করুণ এবং মর্মান্তিক হবে যুধিষ্ঠিরের কল্পনাতে পৌঁছয়নি। তাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দ্রৌপদীকে বলল : তুমি বিড়ম্বনার প্রতীক নও। আনন্দ স্বরূপিণী। পূর্ণতার দীপশিখা। পাণ্ডবের ধ্রুবতারা। তোমাকে যারা অপমান করল তাদের

কখনো ক্ষমা করবে না পঞ্চপাণ্ডব। তোমার অপমানের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা হয়'তো একদিন যুদ্ধের আগুন হয়ে জ্বলবে। আমাদের মনের আগুন কোনদিন নিভবার নয়। তুঁষের আগুনের মত অনুক্ষণ জ্বলতে থাকবে বুকে।

দ্রৌপদীর অচঞ্চল চোখের কোণে চাঞ্চল্য জাগল না। বিস্ময়ের কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না তার মুখমণ্ডলে। ভুরুর নিচে ব্যথায় সুনিবিড় হল। শূন্য দৃষ্টি মেলে অন্যদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল : পৌরুষের আস্ফালনে কাজ কি স্বামী? তার চেয়ে বল না এখন কি করবে? কোথায় যাবে? কখন যাচ্ছ?

দ্রৌপদীর রূঢ় আচরণে যুধিষ্ঠির হতবাক্ হল। গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। বেদনায় থম থম করছিল তার চোখ দুটি। যুধিষ্ঠিরের অপরাধ তার মুখেই ছায়াপাত করল। বিভ্রান্ত লজ্জা এবং ভয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল : নারী ও শিশুদের দ্বারকায় রওনা করে দিয়ে আমরা যাত্রা করব।

দ্রৌপদীর মুখ করুণ দেখাল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। দ্রৌপদীর কালো চোখ, ডাগর দৃষ্টি গভীর, কিছুটা উদাস, যেন ছায়ার ঢাকা রোদ্দুরের মত মলিন, কিন্তু নিষ্প্রভ নয়। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। কিছু বলার জন্য তারা ঠোঁট কেঁপে উঠল। যুধিষ্ঠিরের দিকে ফিরে তাকাতেই তার চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল : জানতে চাও না দ্রৌপদী কি করবে?

যুধিষ্ঠিরের বুকে আঘাতের ব্যথা। দ্রৌপদীর প্রশ্নে থমকে যায়। বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল : ইচ্ছে হয় কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

দ্রৌপদী অবাক চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল। তার চোখে অপমানের জ্বালা, মুখে অস্বস্তি। একটা কষ্ট যন্ত্রণায় তীব্র হয়। নিঃশ্বাস আটকে আসে। আটকে যাওয়া স্বরকে মুক্ত করে বলল, কেন? তোমার সাহস হয় না কেন?

যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, তোমার কাছে আমি অন্যায় করেছি। আমার অপরাধের কোন ক্ষমা হয় না। কালিমালিপ্ত মুখ নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াব কি করে?

স্বামীর অধিকারে।

তোমার কাছে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ। তাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় রাজি হলাম। বনবাসের কৃচ্ছ্রতায়—

তোমার এ সিদ্ধান্ত ত্যাগ কর স্বামী।

তা হয় না দ্রৌপদী। তোমার আকর্ষণে, তোমাকে লাভ করতে একদিন কি অন্যায় না করেছি। সেকথা মনে হলে অনুতাপ হয়। তথাপি নির্বোধ আমি দ্যূত সভায় যেচে তোমায় পণ রেখে অপমান করেছি। নারীর জীবনে যা ভীষণ অপমানকর। তাই, বনবাসের শাস্তি আমার পাওয়া উচিত।

আত্মনির্যাতনের কঠোর কৃচ্ছ্রতা মুক্তি নয়। তাতে শুধু আত্মবিনাশই হয়।

আমি নিরুপায়।

চিন্তায় দ্বন্দ্বে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদী বলল : তুমি ভিন্ন আমার যে আর কোন অবলম্বন নেই। তোমার সঙ্গিনী হয়ে চলা ভিন্ন আমার যে আর কোন পথ নেই।

যুধিষ্ঠিরের অন্তর ভেদ করে একটা গভীর কম্পিত দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চোখ দুটি তৃপ্তি সুখের আনন্দে বুজে গেল। শান্তকণ্ঠে বলল : মহিষী সব জেনে শুনেও পারিনা তবু। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তা-হলে—

দ্রৌপদীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বলল : তুমি আজন্ম সুখে লালিত পালিত। দুঃখ কাকে বলে জান না, সুখ তোমার কাছে বড়।

দ্রৌপদীর কণ্ঠ থেকে অস্ফুট আর্তনাদের মত স্বর বের হল : উঃ ভগবান। তারপর আহত অভিমানে বলল : কে বলেছে আমার সুখের কপাল? আমার মত দুঃখী কে আছে? নব নব দুঃখে তোমরা ঋণী করে রেখেছে আমায়। তবু বলছ, আমার কাছে সুখ অনেক বড়! বলো, কোন সুখে রেখেছ আমায়?

আহত বিস্ময়ে চমকে উঠল যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদীর আকুল করা জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ হল তার বিবেক। মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে 'কেন' কথাটা বারংবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। উত্তর না পাওয়া জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলল, তোমার এইরকম মূর্ত্তি দেখলে আমার ভয় লাগে। বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। আমার সব জবাব ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠিরের জবাব শুনে অপ্রস্তুত বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল দ্রৌপদী। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা মলিন হাসি ঈদের চাঁদের মত ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়ে ক্ষণকালের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দ্রৌপদীর রাগও থিতিয়ে এল। মনের সমস্ত বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় মধ্যে সে তার রুক্ষ, উগ্র চেহারাটা দেখতে পেল। যুধিষ্ঠিরের সরল স্বীকারোক্তি তাকে চমকে দিল একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথা দমন করতে গিয়ে উদগত হাসি, ও কান্নার এক মিশ্র স্বর তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হল। বলল : মেয়েদের জীবনে এই একটাই তার জোবের জায়গা। নিজের জায়গা। যার উপর সে তার দুঃখ, রাগ, বিরক্তি, অভিমান, দেখিয়ে শান্তি পায়। পুরুষ হয়ে মেয়ে মানুষের মনের এই গোপন খবরটুকু রাখ না? বুঝতে পার না তাদের অসহায় মনের অভিব্যক্তিকে?

জিজ্ঞাসা নিবিড় অবুঝ চোখ মেলে সে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল।

ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর নির্বাক জিজ্ঞাসা নিয়ে দ্রৌপদীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদীর মনের জানালার এই বন্ধ কপাটটা খুলে কোনদিন তাকে দেখার চেষ্টা করেনি। হঠাৎ একটা ঝড়ের ধাক্কায় আজ খুলে গেল তা। অমনি চোখে পড়ল দ্রৌপদীর লুকোন গোপন মনের সম্পদ। এক নিমেষে দ্রৌপদীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব কাছের হয়ে গেল। ব্যবধান গেল ঘুচে। সংকোচ, সংশয় দূর হল। মনে হল এতকাল পরে দ্রৌপদী যেন তার কাছে প্রথম ধরা দিল।

উৎফুল্ল হল যুধিষ্ঠির। তথাপি, একটা গ্লানিকর লজ্জায় তরা মুখ থম থম করছিল। দ্বিধায় কেঁপে গেল স্বর। বলল : দ্রৌপদী, আমরা জন্য অনেক কষ্ট সয়েছ। তাই, বনবাসের কষ্ট দেব না তোমায়।

বঞ্চনার কষ্টে চোখ ছলছলিয়ে উঠল দ্রৌপদীর। একটা তীব্র অভিমানবোধে তার বুক টনটন করে উঠল। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জিগ্যেস করল : আমার অপরাধ জানতে পারি?

অপরাধ বলছ কেন? তোমাকে সঙ্গে নেবার সত্যি অনেক অসুবিধা আছে।

ভুরু কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল : অসুবিধা কেন?

কারণ অরণ্যের জীবন সুখের নয়। সেখানে নিরন্তর কষ্ট আর দুর্ভোগ। পদে পদে বিপদ। আহারে-বাসস্থানে, শয়নে-উপবেশনে কোন নিশ্চয়তা নেই। সর্বক্ষণ উদ্বেগ আর আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটতে হয়। রাত্রি আরো ভয়াবহ। নির্জনতা দুঃসহ। তুমি সে কষ্টের সঙ্গে পরিচিত নও। সইতে পারবে না।

দ্রৌপদীর হতাশ চোখের কালো তারা কয়েক পলক স্থির হয়ে বিদ্ধ হয়ে রইল যুধিষ্ঠিরের চোখে। দ্রৌপদীর মুখের অভিব্যক্তিতে যুগপৎ বিস্ময় আর বিরাগ ফুটল। অনুযোগ করে বলল : তোমাদের বনে পাঠিয়ে আমি সুখে থাকব, একথা তুমি জানলে কি করে? বলতে তোমার কষ্ট হল না? আমাকে তুমি কি ভাব বলত?

দ্রৌপদীর দুচোখের দৃষ্টি ব্যথায় ঘন হয়ে উঠল। অপ্রস্তুত বিস্ময়ে যুধিষ্ঠির ত্রস্ত ও ব্যস্ত লজ্জায় তার কথার মাঝখানে বিব্রত স্বরে বলল : বিশ্বাস কর, কোন কিছু ভেবে বলেনি। তোমাকে আঘাত কিংবা অপমান করব মনে করেও বলেনি।

যুধিষ্ঠিরের স্বীকারোক্তি দ্রৌপদীর রাগ আর বিদ্বেষকে বাড়িয়ে দিল। যুগপৎ বিতৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা এবং অনুরাগ অনুযোগের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। চিন্তার দ্বন্দ্বে বিমূঢ় নারীর অন্তর ভেদ করে নির্গত হল এক গভীর কম্পিত দীর্ঘনিঃশ্বাস। এক অবুঝ আত্মাভিমান তার কণ্ঠে অভিব্যক্ত হল। বলল : ছিঃ — কি করে ভাবলে তোমাদের বনে পাঠিয়ে সুখে থাকব! দিনগুলো সুখে কাটবে? তোমাদের ভুলে থাকা কি আমার সম্ভব? আহারে-বিহারে, শয়নে-উপবেশনে তোমাদের কথা মনে পড়বে না? আমি কি পাষাণ? মন বলে কি আমার কিছু নেই? পঞ্চেন্দ্রিয় হারিয়ে আমি কি নিয়ে থাকব?

দ্রৌপদী!

আমার স্বামীরা বনে বনে ঘুরবে; কোথায় থাকবে? কি খাবে? কেমন করে তাদের দিন কাটবে, এসব ভাবনা-চিন্তা করে দিন কাটানোর কষ্ট ভোগের চেয়ে, বনের কষ্ট অনেক ভাল। স্বামীর সঙ্গে বনে বাস করার সুখ আছে ভেবেই জনকনন্দিনী সীতা রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিল। স্বামীই নারীর একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন। তাদের ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকব? রাজ্যসম্পদ আমাকে কিছুই তৃপ্তি দেবে না। সব শূন্য নিরর্থক মনে হবে। সব মেয়েই জনকনন্দিনী হতে চায়। — একথা আজ যেরকম অনুভব করছি, আগে কখনও করিনি।

যুধিষ্ঠির হতবাক্ হল। অপলক দৃষ্টি দুই চোখে চক্‌চক্ করে উঠল। নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তারপর এক পা, এক পা করে সামনে অগ্রসর হল। আশ্বাসভরা মন নিয়ে দ্রৌপদী তাকে অনুগমন করল।

রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করে পাণ্ডবেরা বহু জনপদ অতিক্রম করে কাম্যকবনে উপস্থিত হল। বিশ্বস্রষ্টা যেন শোভাময়ী করে রচনা করেছে এ অরণ্য। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যেও শুধু রম্য নয়, মনোমোহিনী। ইন্দ্রের নন্দন কাননও এত অপরূপ নয়। প্রকৃতি নন্দিনী কাম্যকবনের রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হয়ে পাণ্ডবেরা সেখানেই তাদের বসতি নির্মাণ করবে ভাবল। পাহাড় ঘেরা স্রোতস্বিনীর তটভূমে সবুজ শ্যামলিমাময় বনবীথির বলে কুটীর নির্মাণ করল। শ্যামল অরণ্যের শান্ত স্নিগ্ধ নির্জন পবিবেশে অনেক মুনি ঋষিরাও বাস করেন। তাদের আশ্রমের কেন্দ্রভূমিতে গড়ে উঠেছে জ্ঞান-বিদ্যাপীঠ।

পত্র পুষ্পময় অরণ্যের এরূপ রমনীয় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরিচয় প্রথম। তার অভিজ্ঞতাও নতুন। তাই, ভাললাগার নেশা প্রবল। যত দেখে তত অবাক হয়। অরণ্যের স্তব্ধতা, পত্র পল্লবিত শ্যামল বনানীর বিস্তৃতি, তরুশ্রেণীর মত পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করায় সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য, পর্বতের গর্বোদ্ধত উন্নত শির, অটল গাম্ভীর্য, কল্লোলিত ঝর্ণার প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, শিলাগাত্রে আছড়ে পড়া স্রোতস্বিনীর অট্টহাস্য দ্রৌপদীর ভীষণ ভাল লাগল। তনু-মন-প্রাণ রোমাঞ্চিত হল ক্ষণে ক্ষণে। বন্ধনহীন প্রকৃতির এ-রূপ কখনও দেখেনি সে। তাই দেখার নেশায় মত্ত। উপভোগের আনন্দে আত্মহারা।

নতুনের মধ্যে একটা মোহ আছে, একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সেই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ গন্ধের উপলব্ধি তাকে আকুল করল। চেয়ে চেয়ে দেখার তৃপ্তি ও আনন্দ তাকে উদাস করে দিল।

কাম্যকবনেব চঞ্চল বনহরিণীর মত চপল চরণে বিচরণ করে বেড়াতে লাগল। সমস্ত বন উপবন হয়ে উঠল তার নিজ বাসভূমি। এখানে সে পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়া। তাদের হৃদয়ের রাণী। হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য দিয়ে ভরে রাখে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত। তার প্রেম মমতার পাশে বন্দী তারা।

বন-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে সে হয়ে ওঠে দ্বিতীয় শকুন্তলা। বিহঙ্গের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দ্রৌপদী বিভ্রান্ত করে তাদের। রঙিন প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটে মজা করে। অবনত বৃক্ষশাখাগুলি শাখা দুলিয়ে আহ্বান করে আনে তাকে। দুষ্টুমি করে ডালে ডালে জড়াপটি লাগিয়ে দিয়ে, দৌড়ে পালায়। খল-খল্ করে হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সরস্বতীর স্বচ্ছ স্ফটিক জলে। উন্মত্ত বারিরাশির বুকে জাগে মত্ত কামনার ঢেউ। মিলন ব্যাকুল উচ্ছল তরঙ্গ প্রতিমুহূর্তের উন্মত্ত আলিঙ্গনে আন্দোলিত করে তার বাহু, স্তন, কটি, জঙ্ঘা। স্নায়ুতন্ত্রী এক অচেনা আনন্দের গভীরে উপলব্ধিতে নিয়ে যায় তাকে। সুখের আবেশে ভাসতে ভাসতে বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতে ভাললাগে। স্নান শেষ হলে এখানে ওখানে ফুটে থাকা অজস্র ফুল দিয়ে সে কবরী সাজায়। নিরাভরণ অঙ্গ পুষ্পাভরণে ভরিয়ে তোলে। কণ্ঠহার করে দুলিয়ে দেয় বক্ষে। সুউন্নত কুচযুগ সজ্জিত করে পুষ্পমালায়। সুবাসিত পুষ্পরেণুতে প্রলিপ্ত করে দেহ।

এমনি করে কাটে দ্রৌপদীর দিন মাস বর্ষ। এক অব্যক্ত মুগ্ধ আবেশে বন্ধনহারা বনবিহঙ্গিনীর মত ঘুরে বেড়ায় কুঞ্জে কুঞ্জে বনবীথিকায়।

কাম্যকবনের অনুরাগে রঞ্জিত হয় দ্রৌপদীর চিত্ত। কাম্যকের বনপ্রকৃতির উদার সাহচর্য, মধুময় আনন্দ স্পর্শে সার্থক হয়ে ওঠে তার জীবন। অন্তহীন অবকাশ মুহূর্তগুলিতে বসে বসে তার চিন্তা করতে ভাল লাগে, ফেনায়িত ঝর্ণা যেন নৃত্যপটিয়সী নটীর মত তার সম্মুখে নৃত্য করছে। নটীর মণি নূপুরের নিক্কণ ধ্বনি লহরীর পর লহরী তুলে সারা কক্ষকে যেমন হিল্লোলিত করে, ঝর্ণার উচ্ছল ঊর্মিমালা তেমনি তার বুকের ভেতর ভাল লাগার অবেগে কলকলিয়ে ওঠে। বনের উতলা বাতাস সখীর মত ক্রীড়া করে তার সাথে। প্রিয় সখীর মত দুষ্টু চপল বাতাস মাঝে মাঝে অন্তর্বাসমুক্ত বক্ষের বসন ফেলে দিয়ে তার বক্ষশোভা দর্শনের জন্য কৌতুকক্রীড়ায় মেতে ওঠে। এমনি ভাবে হর্ষময় হয়ে ওঠে তার জীবনের দিনগুলি।

এখানে সে একা। কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়। স্বামীরা তার সর্বক্ষণেব সহচর। ছায়ার মত থাকে সাথে সাথে। তাদের নিবিড় সাহচর্য এবং সঙ্গ সুখের আনন্দে ভরে থাকে অন্তর। স্বামীরাও একা এখানে। সে তাদের একমাত্র ভার্যা। তাদের দুঃখী জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তাদের ওপর একার আধিপত্য তার। প্রেমের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাই, হৃদয়ে কোন বিক্ষোভ নেই, বেদনা নেই, বিরহ নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই। প্রেমের সৌরভে সুরভিত হয়ে থাকে দিবস রজনী।

পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে একত্রে শয়ন, বসন, উপবেশন, আহার বিহাব সব হয় তার। তবু সে ভার্যা নয়। তাদের প্রিয় সখী। তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সঙ্গিনী। অরণ্যের মত মুক্ত তার প্রেমজীবন। নারদকৃত কোন নিয়ম কিংবা বন্ধন নেই। আছে মনের আনুগত্য, বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা। তাই সকলের প্রতি তার ব্যবহার সমান। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। এখানে সবই মধুময়। প্রস্তর কঠিন শুচিনিষ্ঠা নিয়ে পঞ্চস্বামীকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধল। পঞ্চপাণ্ডবের প্রেম জীবনে সে অসিধারা ব্রত। সংযমের এক আশ্চর্য শপথ। আকাঙ্ক্ষার দীপ শিখা। বৃক্ষের মত তারা পাশাপাশি আছে, অথচ তাদের কারো সংগে কারো বিভেদ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঈর্ষা নেই, হিংসা নেই! বিবাহের পর দ্রৌপদী এই প্রথম পাণ্ডবদের নির্মল ভ্রাতৃপ্রেম দেখল। রম্য অরণ্যের রমণীয় অনুভূতিতে সকলে আবিষ্ট। পঞ্চস্বামী তার চেতনায় পৃথক কোন পুরুষ নয়, পাঁচজনে মিলে একজন। দ্রৌপদীর পঞ্চেন্দ্রিয় তারা।

বনবাসের নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তির মধ্যে দ্রৌপদীর মনের দুঃখ যন্ত্রণার তীব্রতা কমে গেল। প্রসন্ন চিত্তে একদিন পঞ্চস্বামীর সম্মুখেই প্রশ্ন উত্থাপন করল : যে যেমনটি চায় তেমনটি পেত তা-হলে পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু থাকত না। চাওয়াটা সহজ কিন্তু চাইলে কি পাওয়া যায়?

যুধিষ্ঠিরের দুই আঁখিতে বিহ্বলতা। মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল : চাওয়া একনিষ্ঠ হলে অপ্রাপ্যণীয় কিছু থাকে না।

ভাল লাগার অনুভূতিতে দ্রৌপদীর দুই চোখ বুজে গেল। মুখের ও চোখের রূপ বদলে গেল। কেমন একটা প্রসন্ন গৌরব বোধ জাগল তার বুকের ভেতর। প্রেম মুগ্ধ দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : তৃতীয় পাণ্ডব! তুমি বল, প্রেম কি অমনি অমনি পাওয়া যায়।

অর্জুন বিব্রত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল। চোখ নত করে বলল . প্রেম'তো আকাশের চাঁদ নয়, যে তা পাওয়া কঠিন হবে।

আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ দ্বিভাধরা চোখ; এক অদ্ভুত তন্ময়তায় দুরন্ত সুন্দর হয়ে উঠল। স্খলিতা ভেজা কণ্ঠে জিগ্যেস করল : ভালবাসার জন্যে আমি তো সব উজাড় করে দিলাম, তবু পেয়েছি কি সে সুখদুঃখের জীবনঘাটে ভরা প্রেমের অমৃত?

দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসু অভিযোগ অর্জুনের মাথা নুইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কেমন একটা অসহিষ্ণুতায় ভীম কষ্ট পাচ্ছিল। বুকের ভেতরে একটা প্রবল আপত্তি তাকে স্থির থাকতে দিল না। দ্বিধা কাটিয়ে জিগ্যেস করল : তোমার সংশয় কিসে? ভুবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে আলো সে কিন্তু কৃপণ নয়। আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম যে প্রেম সে'তো ফুল হয়ে ফুটে আছে তোমার হৃদয় কাননে।

বিদ্যুৎপ্রবাহের মত দ্রৌপদীর আপাদমস্তকে তপ্ত শোণিত স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল। তথাপি অতি স্থির কণ্ঠে বলল : নারীর প্রেম দুর্লভ ধন।

অর্জুন তৎক্ষণাৎ কথাটা লুফে নিয়ে বলল : আমার সেই দুর্লভ ধন পেয়েছি। ধনৈশ্বর্য কিংবা রাজ্যের বিনিময়েও তাকে পাওয়া যায় না। বাহুবলে কিংবা ঈর্ষা বিদ্বেষ-হিংসা দিয়েও জয় করা যায় না তাকে।

নকুল বলল : দেবতারাও এমন দুর্লভ রত্ন পায় না। তুমি আমাদের — শেষ কথাটা উচ্চারণ করার জন্য ওষ্ঠ উন্মুক্ত করেও বহুক্ষণ কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে নীরব থাকল।

অর্জুন ও নকুলের প্রশস্তি দ্রৌপদীকে মুগ্ধ করল। কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করে বলল : কাম্যকবনে আমরা সবাই কাম্য ধন পেয়ে সন্তুষ্ট আছি। কিন্তু তোমরা যাকে প্রেম বলছ, আমি তাকে বলি উপভোগের আনন্দ। ভোগের মত্ততা। উপভোগের সুখ-আনন্দ-বিলাস-উল্লাস-কখনো প্রেম নয়। আত্মসুখের উন্মাদনা। আমিও তার নেশায় ভুলেছিলাম।

যুধিষ্ঠির মনে মনে কৌতূহল বোধ করছিল। দ্রৌপদীর মনের জটিল গতির পরিমাপ করতে না পেরে সরল মনে বলল : কিন্তু প্রেম মধুর হয় অনুরাগের বাঁধনে। কাম্যকবনে এসে সে আসা পূরণ হয়েছে। আনন্দের বান ডেকেছে তোমার বুকে।

সঘন নিঃশ্বাসে দ্রৌপদীর বুকের মধ্যে নদীতে জোয়ার আসার মত একটা কুল কুল ধ্বনি ওঠে। পৌষের গাছের শুকনো পাতায় সড়সড় শব্দ বেজে ওঠার মত আওয়াজ হয়! কেমন যেন থমকে অবাক জিজ্ঞাসায় তাকিয়ে থাকে। নিশ্চল চক্ষু তারকায় একটা গভীর আর্তি ফুটে বেরোয়। তবু অস্থির অসংযত বক্ষ-যন্ত্রণা সংযত করে সে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল : একটি গোপন জ্বালা নিভৃত অবসরে আমার মনকে যে পোড়ায় প্রতিমুহূর্ত তার খোঁজ রাখ কি? নরপশুর হিংস্র নখের এ আঁচড় অবশ্য কোথাও লাগেনি, কিন্তু তার স্পর্শের গন্ধ আমার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে মাখামাখি। তাই'তো আমার জিজ্ঞাসা, তোমাদের অতুলনীয় অসামান্য, দুর্লভ প্রেমের গৌরব ও মর্যাদা রাখতে তোমরা কি করেছ?

ক্ষণকালের জন্য সে নীরব হল। চোখে মুখে অশান্ত উত্তেজনা। মস্তিষ্কের কোষে কোষে অগ্নিস্রোত বইতে লাগল। কিঞ্চিত রোষ কণ্ঠে বলল : ধর্মরাজ, প্রেম খেলার জিনিষ নয়। প্রেমের শক্তি দিয়ে প্রেমকে জয় করতে হয়। তার জন্য দরকার সাধনা। যুদ্ধ না শিখলে যেমন বীর হওয়া যায় না, রাজ্য ছাড়া যেমন রাজা হওয়া যায় না, তেমনি নারীর প্রেমময় হৃদয়ের পূজা পেতে হলে দরকার পুরুষের পৌরুষ। তার বীর্যের অহঙ্কার, শৌর্যের তেজ। পৌরুষহীন প্রেমে কোন আকর্ষণ নেই। নেই ভালবাসার নিষ্ঠা। আছে শুধু ভোগী-মানুষের উদ্দাম লালসার উল্লাস।

ভীমের প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। তার অনুভূতির মধ্যে একটা অধীর আনন্দের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল। সারা মুখে তার রক্তের ছোঁয়া লাগল। মস্তিষ্কের মধ্যে দ্রৌপদীর কথাগুলো আবর্তিত হতে লাগল। অসহায় পৌরুষের ক্রন্দন রোল উঠল তার অন্তরে। ঝড়ের মত কথাগুলো বলল : কৃষ্ণা, তোমার অপমান দুঃখ কিছুই ভুলিনি আমি।

চকিতে দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর কোমল হল। আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে বলল : জানি প্রিয়তম। ভ্রাতাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র পুরুষ। তোমার মধ্যে কোন কপটতা নেই। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমাকে অস্থির হতে দেখেছি। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পার না। স্বপ্নের মধ্যে তুমি বিড় বিড় করে কথা বল। ক্রুদ্ধ আক্রোশে অসহায়ভাবে শূন্যে হাত-আন্দোলিত করে কাকে যেন ভৎর্সনা কর। হিংস্র জিঘাংসায় উন্মত্তবৎ হয়ে আপন কেশদাম উন্মূল কর। তোমার ধমনীর প্রতি শোণিত কণিকায় অঙ্গীকার পূরণের অস্থিরতায় আর্তনাদ করে। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি তোমার আত্মগ্লানি এবং অসহায় পৌরুষের তীব্র জ্বালা। কিন্তু তোমার মত আর কোনো পাণ্ডব অঙ্গীকার পূরণের প্রত্যাশী নয়।

ভীম অপ্রস্তুত বিস্ময়ে উচ্চারণ করল : দ্রৌপদী!

উদগত অশ্রু সংবরণ করে পাঞ্চালী শান্ত কণ্ঠে ডাকল : প্রিয়তম।

একটু থেমে পুনরায় বলল : নারী পুরুষের পৌরুষকে তার বীর্যবত্তাকে শ্রদ্ধা করে। তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তারপর অকস্মাৎ ধর্মরাজ এবং অর্জুনের দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল . ধর্মরাজ, তোমাদের হেয় করার জন্যে কিন্তু আমি পাগলের মত প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিনি। এ আমার উচ্ছ্বাস কিংবা কৌতুকও নয়। আমি তোমাদের কাছে চেয়েছিলাম প্রতিশোধ। বনবাসে আমি তোমাদের প্রতিহিংসার পথের সঙ্গিনী। কিন্তু আমার গর্বিত প্রেমের সে প্রত্যাশা বোধ হয় ব্যর্থ হল তোমাদেরই অবহেলায়। দুর্ভাগ্য আমার! তোমাদের পাষাণ পুরুষ প্রাণে প্রেম দিয়েও আমি জাগাতে পারিনি। দ্রৌপদীর অপমানের জ্বালা প্রতিকারের চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছে। মনে হচ্ছে আমার রিক্ত প্রাণে আহ্বানের শক্তি নেই। শক্তি নেই ভালবাসার আকর্ষণের।

দ্রৌপদীর নারী হৃদয়ের মর্মস্পর্শী অভিযোগ এবং তীব্র তিরস্কারের মন ভোলানো আবেদন এত হৃদয়গ্রাহী যে যুধিষ্ঠিরের হৃদয় দ্রবীভূত হল। শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল : দ্রৌপদী রাজনীতিতে ভাববেগের কোন স্থান নেই। সময় সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়।

যুধিষ্ঠিরের কথাগুলো দ্রৌপদীর প্রণয়পীড়িত অন্তরে নিষ্ঠুর আঘাতের মত বাজল। রোষকষায়িত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে দীপ্ত ভঙ্গিতে বলল : মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতারা অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারেন কিন্তু আমি মানুষ, যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করার সময় আমার কোথায়।

সত্যিই প্রতীক্ষা করার সময় কোথায়? সহসা অন্য এক পুরুষকণ্ঠে কৌতুকসূচক পুনরুক্তি শুনে চমকে উঠল দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে তাকাল তারা। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল শ্রীকৃষ্ণ তাদের সম্মুখে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের মুখ।

সুস্বাগতম্, কল্যাণ হোক। বলে, ছুটে এসে যুধিষ্ঠির তাকে আলিঙ্গন করল। তারপর অন্য ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠের অনুগমন করল।

দ্রৌপদী একধারে নিশ্চল পাষাণমূর্তির মত প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল। কৃষ্ণের আগমনে তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। কৃষ্ণ তার আচ্ছন্ন এবং অভিভূত অবস্থা দেখেও দেখল না। পাণ্ডবদের কুশল গ্রহণে সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর দ্রৌপদীর খুব কাছে এসে কৃষ্ণ জিগ্যেস করল : প্রিয় সখী, তুমি কিছু বললে না? তোমার কাছে কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি? তোমাব কি হল? তোমাদের দুঃসময়ে উপস্থিত হইনি কেন জানতেও চাইলে না তো?

কৃষ্ণের বিস্মিত জিজ্ঞাসা দ্রৌপদীকে অপ্রস্তুত করল। সেই মুহূর্তে তার অন্যমনস্ক ভাব দূর হল। স্মিতহাস্যে অধর স্ফুরিত হল। কোমল কমনীয় কণ্ঠে সুতীব্র অভিমান জাগল। বলল : জেনে লাভ কি? অক্ষম অসহায় স্ত্রীলোক আমি। তোমাকে সাহায্য করার শক্তি আমার নেই। মন্ত্রণা নিতেও পুরুষ মানুষ আসে না স্ত্রীলোকের কাছে। বাতিলের খাতায় চিরকাল উপেক্ষিত যারা, তাদের আগ্রহ কিংবা ঔৎসুক্যের কোন মূল্য আছে সখা? অনধিকার-চর্চাব কোনো অধিকার নারীকে দেয়নি সমাজ এবং বিধাতা এমনকি তোমরাও না।

দ্রৌপদীর কথায় অভিভূত হল কৃষ্ণ। মৃদু স্বরে বলল : সখি, তুমি যা বললে, তার উত্তর জানা নেই।

আমার একটা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবে সখা?

একটা কেন হাজার প্রশ্নের উত্তর দেব বলে এসেছি।

বেশ-তা-হলে বল, সামান্যতেই নারী কাঁদে আর অভিমান করে কেন?

কৃষ্ণ নিরুত্তর। তাকে মৌন থাকতে দেখে দ্রৌপদী কোমল স্বরে বলল : এর উত্তরও তোমার জানা নেই অথচ দিকে দিকে কত রাজ্য জয় করেছ, কত নারীর হৃদয় জয় করেছ, কিন্তু তার মনের গভীরে নেমে দ্যাখনি কোথায় দুঃখ তার? কেন? কি জন্যে তাও জানতে চাওনি। তোমরা পুরুষজাতটাই স্বার্থপর। নারীকে তোমরা শুধু লুণ্ঠন কর, ক্রীতদাসের মত শৃঙ্খলিত কর, কখনও তার শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতার হিসাব কর না। অসুরনাশিনী চণ্ডীর মত সেও যে বিরাট শক্তির অধিকারী তাও মান না। অথচ, ললনাপ্রিয় তুমি। কিন্তু নারীর কোন মঙ্গলটা করেছ? তার হৃদয়-গুহারণ্যে কখনও ঢুকেছ? পরস্পরবিরোধী এক জটিল মন কেন তার অন্তর ক্ষত বিক্ষত করে, কেন তার বুকে আত্মগ্লানির দহন ও জ্বালা — এসব খোঁজ কখনও করেছ সখা? অসহায়তার দুঃখে, অপমানের বেদনায়, শক্তির দীনতায়, অনুগ্রহের যন্ত্রণায় সে কেবল নিজের উপর নিজে প্রতিশোধ

নেয়। ক্ষোভের আগুনে মুখ বুজে পোড়ে। তাই, তোমরা তাদের কাঁদতে দেখ শুধু।

কৃষ্ণ চমৎকৃত হল। অন্তরে অপ্রত্যাশিত হর্ষ দমন করে ঈষৎ হেসে বলল : সখি, আমার বহুকালের একটি বন্ধ ঘরের দরজা আজ খুলে গেল। তোমার কথা মনে রাখব। কিন্তু, তুমি হঠাৎ এ-রকম প্রশ্ন করলে কেন?

আয়তনয়না দ্রৌপদী বিলোল কটাক্ষে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলল : প্রশ্ন কোথায় করলাম? তোমার কৈফিয়তের জবাব দিলাম। আর —

আর কি?

দ্রৌপদীর ভুরু কুঞ্চিত হল। রহস্যঘন ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা নির্দেশ ছিল যা যুধিষ্ঠিরকে কথা বলতে বাধ্য করল। কৃষ্ণের কৌতূহলিত প্রশ্নের উত্তরে নিরুত্তাপ কণ্ঠে যন্ত্রবৎ বলল : পাঞ্চালীর অভিযোগ তার স্বামীদের বিরুদ্ধে। আমার ওপরে তার যত ক্রোধ। কিন্তু বিশ্বাস কর সখা, তার অন্তরের ইচ্ছা আমার কাছে দুর্বোধ্য।

দ্রৌপদীর দুই চক্ষু জ্বলে উঠল। যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধ সঞ্চারিত হল তার অন্তরে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অভিযোগের নানা অনুভূতি তার বুকের মধ্যে ঝড় তুলল। তথাপি, অশান্ত হৃদয়াবেগ দমন করে বলল : তুমি বোধ হয় আরো দুর্গম। ধরাছোঁয়ার বাইরে অন্য মানুষ। তাই কথা ও কাজে তোমার অমিল। তুমি বল, অনুরাগের বাঁধনে প্রেম হয় মধুর। প্রেম দিয়ে প্রেমকে উপলব্ধি করতে হয়। কোথায় তোমার সে উপলব্ধি? আমি তো চোখের ইঙ্গিতে, হাসির বিদ্যুৎ আভাসে ব্যক্ত করেছি আমার সুগোপন ইচ্ছা। তবু, তা অব্যক্ত রয়ে গেল কেন তোমার কাছে। এই হৃদয়বোধ আর প্রেম নিয়ে গর্ব কর তুমি?

যুধিষ্ঠির চমকিয়ে ওঠে। ভীরু চোখে একবার তাকিয়ে মুখ নিচু করল।

দ্রৌপদীকে অন্যরকম দেখায়। মাথা থেকে তার অবগুণ্ঠন সরে গেছে। খোঁপা ভেঙে ঘাড়ের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক লাল এবং ভেজা। কৃষ্ণের স্থির দৃষ্টি দ্রৌপদীর দিকে, অনুসন্ধিৎসু এবং তীক্ষ্ণ। ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী কৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হল। কৃষ্ণের গম্ভীর থমথমে মুখে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। বলল : প্রিয় সখী, কোন্দলের সময় নয় এখন।

অমনি নারীসুলভ অভিমানে দ্রৌপদী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অশ্রুতে প্লাবিত হল গণ্ডদেশ। অভিমানে ছাপিয়ে গেল কণ্ঠস্বর। কাঁপা গলায় সরোষে বলল : ও নামে ডেকো না আমায়। বড় অসহায় আমি। আমার কেউ নেই। পতি, পুত্র, বান্ধব, ভ্রাতা, পিতামাতা কেউ নেই। এমন কি তুমিও নও কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ নিরুত্তর। চোখে তার অনুরাগ-স্নিগ্ধ-করুণা-সুন্দর সম্মোহনী দৃষ্টি।

মুখে আঁচল চেপে ব্যাকুলিত কান্নায় দ্রৌপদী ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কৃষ্ণের মনে হল দ্রৌপদীর কান্নায় আগুনের উত্তাপ। তার বুকে আগ্নেয়গিরির দাবানল।

যুধিষ্ঠিরের হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন নেই যেন। বজ্রাহত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তীর-বিদ্ধ যন্ত্রণা নিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল : কৃষ্ণ, তেরো বৎসর ধরে বনবাসের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা পাঞ্চালীর পক্ষে খুবই শক্ত। কিন্তু আমি নিরুপায়, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

ভীমের ভুরু কুঞ্চিত হল। আহত ব্যাঘ্রের মত লাফিয়ে উঠল সে। দৃঢ় স্বরে বলল : মহারাজ, ধর্ম আদর্শ এসব নির্বোধ আর অক্ষমের আত্মরক্ষার বুলি। আপনি ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম জয় করা। বনবাসের কষ্ট ভোগ করা ক্ষত্রিয়ের লজ্জা।

ভীমের বাক্য শেষ হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির বলল : ধর্ম সবার উর্ধ্বে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ার মত ক্রোধে ভীমের সর্বশরীর জ্বলে উঠল। ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল তার দেহ। হিংস্র ব্যাঘ্রের মত সরোষে গর্জন করে বলল: মহারাজ ধর্ম ধর্ম করে আপনি ক্লীবত্ব লাভ করছেন। তাই, তেরো বছর প্রতীক্ষার কথা ভাবতে পারেন। পণ্ডিতেরা বলেন, দুঃসহ দুঃখের কাল এক অহোরাত্রেরই এক বৎসর বলে গণ্য হয়। অতএব তেরো দিনে আমাদের তেরো বৎসর পূর্ণ হয়েছে ভাবতে অসুবিধা কোথায়?

পাণ্ডবের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে কিছু করব না। তা-ছাড়া যুদ্ধ করার অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থাও

এখন নয়। পাণ্ডবের মিত্র-রাষ্ট্রের সংখ্যা নগণ্য। পাণ্ডব ও যাদবদের রাজনৈতিক প্রাধান্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ঈর্ষান্বিত। তাই তারা দুর্যোধনের ভ্রাতৃবিদ্বেষের ইন্ধন দিয়ে পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। যাদবদের কোণঠাসা করার মতলব এঁটেছে। এই সঙ্কটময় জটিল রাজনীতির মধ্যে যুদ্ধ করা উচিত নয়। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে কাজ করলে—

হঠাৎ দ্রৌপদীর ক্ষুব্ধ স্বর শোনা গেল: কৌরব দ্যূত-সভায় কোথায় ছিল তোমার নীতিবোধ? তোমার ধর্ম-জ্ঞান? বিবেক? মনুষ্যত্ব?

ঝড়ে যেমন তরুবর আন্দোলিত হয়, ক্রোধে উত্তেজনায় দ্রৌপদীর শরীর তেমন দুলছিল। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে তার বুক ওঠা-নামা করছিল। আঁখিদ্বয় নিদাঘ তপ্ত মধ্যাহ্নের মরু সূর্যের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। সক্ষোভে বলল ঃ ধিক পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে। ধিক ভীমবাহু ভীমসেনকে। ধিক অর্জুনের গাণ্ডীবকে। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করার ধর্ম তোমরা কেউ পালন করনি। প্রণয়বশে দুষ্কৃতিকারীর কার্যের কোন নিন্দাও করনি। দুঃশাসন যখন আমার বস্ত্র আকর্ষণ করল তখন কোথায় ছিল তোমার ধর্মজ্ঞান? বিবেক? বিচারবুদ্ধি? শরণাগত অসহায় রমণীকে রক্ষা করার পৌরুষ, ক্ষত্রিয়গর্ব কোন যমুনার জলে নিক্ষেপ করেছিলে? তোমাদের ভার্যা বলে গর্ব করতে আমার লজ্জা হয়। ধিক তোমাদের পৌরুষের।

এক অবর্ণনীয় দীপ্তিতে কৃষ্ণের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল। কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বলল: মনস্বিনী! দুঃখ কর না। এ-সবই অদৃষ্ট। তোমার দুঃসহ অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। তোমার জন্য নিরন্তর বেদনা অনুভব করি। তাই, তোমার দুঃখ, কষ্ট, বক্ষতাপ, অভিমানের প্রতিকার ত্বরান্বিত করতে এসেছিলাম। কিন্তু ধর্মরাজের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কথা চিন্তা করে আমাকে মত বদলাতে হল।

অমনি দুরন্ত আক্ষেপে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠল। একটা দুর্জয় অভিমানে দ্রৌপদীর ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শোনা গেল। যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ করে বলল কে চেয়েছে তোমার এই কৃপা? চাই না, তোমার করুণা।

দ্রৌপদী আর দাঁড়াল না। দ্রুতপদে স্থানান্তরে গমন করল। গমনোন্মুখ দ্রৌপদীর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবেরা বিভিন্ন তীর্থস্থান, জনপদের প্রধান নগর পরিভ্রমণ করতে লাগল। পরিব্রাজক এবং সাধুব বেশে, সাধারণ মানুষের পোষাকে, বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দ্রৌপদীর নির্যাতন, লাঞ্ছনা, ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের ভাগ্যবিপর্যয়, বন-বাসের নিদারুণ ক্লেশ, সত্য ও ধর্মের প্রতি তাদের গভীর আকর্ষণ, এবং সেজন্য মহৎ দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের মহিমাকে গল্প-কথকের মত উদাত্ত কণ্ঠে গান করে আবৃত্তি করে প্রচার করল। তাতে পাণ্ডবদের জনসমাদর বৃদ্ধি পেল। ভাষার বাধা দূর করার জন্য অর্জুন ভ্রাম্যমান পথাভিনয়ের ব্যবস্থা করল। দুঃশাসনের বর্বরতা, কর্ণের দুরন্ত প্রতিশোধপরায়ণতা, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার মনোভাব, দুর্যোধনের অশালীন আচরণ, শকুনিব কপটতা, ধৃতরাষ্ট্রের নীরব আশ্রয় প্রভৃতিকে মর্মস্পর্শী করে তুলল নাটকের মাধ্যমে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনার প্রতি সাধারণের কৌতুহল লক্ষ্য করে একদল পেশাদারী কথক: তাই নিয়ে গান বাঁধল। উপভোগ্য এবং আকর্ষণীয় জন-মনোরঞ্জন কাহিনী করে তোলার জন্য সত্য-মিথ্যায় অনেক রঙ চাপিয়ে তাকে আরো মর্মদাহী ও করুণ করে তুলল। দুর্যোধন বিরোধী একটা হাওয়া বইতে লাগল রাজ্যে রাজ্যে। রাজনীতিতে তাদের কোন স্থান না থাকলেও মানুষের হৃদয়-রাজ্যে তাদের নাম ও আদর্শ অক্ষয় হয়ে রইল। নৃপতিদের মনেও তার ঢেউ এসে লাগল। কার্যত দুর্যোধনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে পাণ্ডবেরা বেঁচে রইল।

চরের মুখে পাণ্ডবের গোপন রহস্যময় কার্যকলাপের বিস্তৃত সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন রীতিমত অবাক হল। হতাশা, ভয় আর বিষণ্ণতার কালো ছায়া নামল তার মুখে। গভীরভাবে সমস্ত পরিস্থিতি

অনুধাবনের চেষ্টা করল।

কাম্যকবন ছেড়ে কখনো তীর্থক্ষেত্রে, কখনো নগর, গ্রাম, লোকালয়ের বাইরে কোন নির্জন অরণ্যে তারা আশ্রয় নিল। কিন্তু কোথাও বেশিদিন অবস্থান করল না। তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে গুপ্তচরোও পারছিল না। নৃপতিরাও দুর্ভাবনায় ছিল। সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে পাণ্ডবেরা যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই, অনেক রাজাই তাদের ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের কথা ভেবে আতংকিত হল। ছোট বড় অনেক রাজ্য নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করল।

চলমান ঘূর্ণি বাতাসের মত গোটা ভারতবর্ষ তারা চরে বেড়াচ্ছিল। এতে তাদের কি লাভ? কি জন্যে এসব করছে? যুধিষ্ঠির মনে মনে হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন তাহলে দেখে? রাজা হওয়ার আশা করে? হাসি পেল দুর্যোধনের। আশা কুহকিনী! যুধিষ্ঠির এখনও দুর্যোধনকে চেনেনি। দুর্যোধন রাজা! কোন রাজাই তার অর্জিত রাজ্য সিংহাসনকে ফিরিয়ে দেয় না। সবাই পিতা ধৃতরাষ্ট্র নয়। শত্রুকে অল্প পীড়ন করে ক্ষমা বা দয়া প্রদর্শন করলেও মিত্র হয় না সে। যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তার মনের গতিবিধি অনুমান করে পূর্বাহ্নেই প্রচারে নেমেছে। নির্বোধ জানে না, অজ্ঞাতবাসের শর্ত পূরণ করা কত কঠিন। ভারতবর্ষের কোন অরণ্যে তার প্রবেশের পথ যাতে খোলা না থাকে তার জন্য থাকবে সতর্ক পাহারা। নগর জনপদ, গ্রাম, সর্বত্র গুপ্তচর ছায়ার মত অনুসরণ করবে তাদের। সুতরাং, অজ্ঞাতবাসের কালপূর্ণ হওয়ার সুযোগ তাদের আর কোনদিন আসবে না। তবু, সাবধান হওয়া দরকার। শত্রুকে দুর্বল ভেবে অবহেলা করা ঠিক নয়। তাকে বাড়তে দেওয়াও উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে, যুধিষ্ঠির বৃহত্তর রাষ্ট্রজোটের শক্তি কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হেনেছে। দিকে দিকে প্রজা বিদ্রোহ এবং গণরোষ, রাজ্যে অশান্তি এবং উপদ্রব বাঁধিয়ে তুলছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং অন্তর্কলহে তাদের বিচ্ছিন্ন এবং পঙ্গু করে দেয়া তার রাজনৈতিক চক্রান্ত। সুতরাং এ গোপন চক্রান্তজাল ভেঙে চুরমার করতে হবে। তার ঔদ্ধত্যের যথার্থ শিক্ষা দেয়া আশু প্রয়োজন। সেজন্য কর্ণ শকুনি এবং কণিককে নিয়ে এক গোপন জরুরী মন্ত্রণাসভা বসল। স্থির হল তাদের গোপন আস্তানা দ্বৈতবনের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন সেখানেই তারা বনবিহার করবে।

যাত্রার দিন স্থির হল। কৌরব ভ্রাতাদের সঙ্গে তাদের বধূরাও গেল। সঙ্গে দাস-দাসী, নটী, বীরঙ্গণা গাত্রসংবাহিকাও রইল। আরও থাকল কৌরবদের চতুরঙ্গ বাহিনী। কর্ণ দিল নেতৃত্ব।

গভীর অরণ্যের প্রবেশ পথে দুর্যোধন শিবির নির্মাণ করল। অরণ্যভূমির ওপর কড়া নজর রাখার জন্য সৈন্যদলকে বহু দলে বিভক্ত করে পাহারায় নিযুক্ত করা হল।

দ্বৈতবন ছিল গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের রাজ্য। পাণ্ডবদের বন্ধু তিনি। চরের মুখে দুর্যোধনের আগমন এবং তার অভিপ্রায় অবগত হয়ে বন রক্ষার সব আয়োজন করল দুর্যোধনের অগোচরে।

কিছুদিন বিশ্রামের পর দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসনকে নিয়ে মৃগয়াভিযানে দ্বৈতবনে প্রবেশ করল। সম্মুখভাগে রইল অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত গজ বাহিনী এবং অশ্ববাহিনী। পশ্চাতে পদাতিক সৈন্যদল। তাদের সম্মিলিত পদধ্বনি এবং রণডঙ্কার উচ্চ নিনাদে বনভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। বন্য পশুরা চমকে উঠল। উৎকর্ণ হয়ে বন্যপ্রাণীরা শব্দ ও ধ্বনি শুনে, দিক নির্ণয় করে শব্দের বিপরীত দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত হিংস্র বন্যপ্রাণীদের গগনভেদী চিৎকারে বনভূমি ঘন ঘন কম্পিত হল। বন্যপশুদের এবম্বিধ আচরণে পাণ্ডবেরা বিস্মিত ও শঙ্কিত হল।

পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার মতলব নিয়ে দুর্যোধন দ্বৈতবনে প্রবেশ করল। বন্যপ্রাণীদের দ্বারা পাণ্ডবদের বিপন্ন করা এবং হিংস্র পশুদের দিয়ে তাদের হত্যা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এতে লোকনিন্দা হবে না, কিন্তু সহজেই শত্রু নির্মূল হবে। তাই বন্যপ্রাণীদের তাড়িয়ে ক্ষেপিয়ে দিতে লাগল। তীর বিদ্ধ করে হিংস্র পশুদের আরো হিংস্র করে তোলা হল। সমগ্র বনভূমি দুর্যোধনের তাণ্ডবে অস্থির এবং ভয়ংকর হয়ে উঠল। গন্ধর্ব সৈন্য যে অলক্ষ্যে চতুর্দিক থেকে বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে ফেলেছে দুর্যোধনের জানতে কিছু বিলম্ব হল। অকস্মাৎ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সসৈন্য আত্মপ্রকাশ

দুর্যোধনকে বিস্মিত ও বিব্রত করল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দুর্যোধন চোখ তুলে তাকাতেই চিত্রসেন সরোষে গর্জন করে বলল: কৌরব কুলাঙ্গার দুর্যোধন স্তব্ধ হও। তোমার দুরভিসন্ধি আমি অবগত আছি। এ বনভূমি আমার রাজ্যের অন্তর্গত। কোন অধিকারে এ রাজ্যে দস্যুর মত প্রবেশ করেছ?

দুর্যোধন পাশবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গগনভেদী চিৎকার করে সরোষে বললঃ মূর্খ, তোমার স্পর্ধা এবং বাচালতায় আমি বিস্মিত। তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে আমার কৌতুক হচ্ছে। শোন ম্লেচ্ছ অরণ্যবাসী, তুমি দুর্যোধনের ক্রোধের পরিণাম অবহিত নও। হঠকারিতা কর না। পথ ছাড়।

শোন পামর, আমাকে তুই চিনিস না। গন্ধর্ববাজ চিত্রসেন আমি। তোর রাজ্যে কোন যোদ্ধাই আমার সমকক্ষ নয়। তোকে ভয় করার কোন কারণ নেই আমার।

স্তব্ধ হও অসভ্য বর্বর। একজন রাজার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হও তাও জান না। শিষ্টাচার সৌজন্য কিছুই শেখনি।

অট্টহাস্য করে বললঃ চিত্রসেন তোমার রক্ত চক্ষুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, নরাধম। এ বনের শান্তি বিঘ্ন করেছ কার হুকুমে? বন্যপ্রাণীদের বিরক্ত করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, জান তুমি?

শোন ম্লেচ্ছ রাজ, বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ কি? রাজায় রাজায় কথা হয় অস্ত্রে অস্ত্রে। তোমার হাতে অস্ত্র থাকতে নারীর মত আচরণ করছ কেন? ভীরু—

কথা শেষ করার আগেই দুর্যোধন চিত্রসেনকে অপ্রস্তুতভাবে আক্রমণ করার জন্য অসি উত্তোলন করল। কিন্তু চোখের নিমেষে কোষবদ্ধ তরবারি মুক্ত করে চিত্রসেন দুর্যোধনের আঘাত প্রতিহত করল। অমনি তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হল দু'পক্ষের সৈন্য বাহিনীর।

এক দণ্ডের মধ্যে শেষ হল যুদ্ধ। দুর্যোধন পরাভূত হয়ে বন্দী হল। কর্ণ শকুনি পলায়ন করল। কুপিত গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন রুষ্ট স্বরে বলল: দুর্যোধন তুমি এখন দাস আমার। তোমার ভ্রাতার ও আমার দাস। আর কৌরব বধূরা আমার প্রাসাদে দাসী এবং রক্ষিতা হয়ে থাকবে।

দুর্যোধনের অন্তর ভেদ করে নির্গত হল কম্পিত দীর্ঘশ্বাস। মাথা নীচু করে বলল: গন্ধর্বরাজ আমি বন্দী তোমার। কিন্তু আমাকে অপমান করা তোমার মত বীরের মানায় না।

তৎক্ষণাৎ চিত্রসেন কটূক্তি করে বলল: দ্যূতসভায় এ নীতিজ্ঞান তোমার কোথায় ছিল নরাধম? নিজের ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীকে অপমান করতে তোমার মত বীরপুংগবের লজ্জা করেনি? তোমার মুখে এসব কথা মানায় না। তুমি করুণার অযোগ্য। তোমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে রাখব। মানী দুর্যোধনের মানে আগুন লাগাব। দেখি, কে তোরে রক্ষা করে?

চিত্রসেনের আদেশে কৌরবদের সঙ্গে তাদের বধূরাও শৃংখলিত হল। লোহার শিকলে বাঁধা তাদের হাত পা। ঐভাবেই খালি পায়ে পথ চলতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। কপাল স্বেদ-সিক্ত হল। তবু করুণা কিংবা দয়া হল না গন্ধর্বদের প্রাণে। কিয়দ্দুর গমনের পর পথশ্রমে তারা পিপাসায় কাতর হল। ক্রমেই কণ্ঠ শুষ্ক হতে শুষ্কতর হয়ে এল। দৈহিক কষ্টের জন্য লম্বা শ্বাস নিচ্ছিল তারা। অসহায় কুলবধূরা কষ্ট সইতে না পেরে আকুলস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল। তাদের আর্তকরুণ কলরব এবং চিৎকারে পর্বত বনাঞ্চলের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হল। বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হল। অসাধারণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তারা ডাকতে লাগল : কোথায় তোমরা পাণ্ডব? কোথায় ধর্মরাজ, বলশালী ভীমসেন, গাণ্ডীবধারী অর্জুন—তোমরা কোথায়? আমরা বিপন্ন কুরু কুলবধূ। আমাদের রক্ষা কর।

আত্মরক্ষার সেই করুণ আর্তক্রন্দনের ধ্বনিতে দ্রৌপদী সচকিত হল। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল নারীকণ্ঠের অস্ফুট ক্ষণভঙ্গ দীর্ঘস্বর। ক্রমেই সে স্বর নিকটতর হতে লাগল। রক্ষা কর, রক্ষা কর। আত্মরক্ষার আর্তক্রন্দন যেন স্তব্ধ অচল অটবীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। দ্রৌপদীর হৃদয় চঞ্চল হল। কিন্তু কুরু কুলবধূ এই বিজন প্রদেশে তারস্বরে চিৎকার করবে কেন? কোথা থেকে তারা কিভাবে এল এখানে? গন্ধর্বরাই-বা তাদের শুধু শুধু বন্দী করতে গেল কেন? এসব জিজ্ঞাসা তার মনে এল? সংশয়ে সন্দেহে তার মন দুলতে লাগল। এ তার মনের কোন ভ্রান্তি নয়তো? অথবা, মস্তিষ্কের কোন উত্তপ্ত ভাবনা অমঙ্গল আর্তনাদের ভ্রম সৃষ্টি করছে না তো?

সংশয়ান্বিত দৃষ্টিতে দ্রৌপদী তাকিয়ে দেখল চতুর্দিক। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বার বার সে শুনতে লাগল কৌরব বধূদের অসহায় বিলাপ ধ্বনি। অতল অন্তরের নির্জন গোপন কক্ষ থেকে ভেসে এল দ্যূতসভায় লাঞ্ছিতা নারীর অসহায় ব্যাকুল আর্তকরুণ চিৎকার। চিন্তার চঞ্চলতায় ব্যাকুল হল সে। মনের মধ্যে তার দারুণ অস্থিরতা। কি করবে ভেবে পেল না। এক অতীত ঘটনার ছায়া তার মনের ওপর ছায়াপাত করল। দেখতে দেখতে তার মুখের ভাব বদলে গেল। চিন্তা আবর্তিত হতে লাগল দুঃখময় ঘটনার স্মৃতির গহ্বরে। বিক্ষুব্ধ অন্তরে জেগে উঠল ভয়ংকর রোষ। অর্ধচেতন প্রলাপের মধ্যে সে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল ঃ প্রতিশোধ। কথাটা নিদারুণ মর্মপীড়ায় পীড়িত করল তাকে। নারীই নারীদের শত্রু—এ প্রবাদ বাক্য কি সত্য? প্রশ্ন জাগল অন্তরে। অতিমাত্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল তার অন্তর। তার লাঞ্ছিতা নারী-অন্তর আর এক নির্যাতিত, অপমানিতা নারীর জন্য দরদ আর সহানুভূতিতে ব্যাকুল হল। কর্পূরের মত উবে গেল ক্রোধ, প্রতিহিংসার আক্রোশ। অন্তরের তীব্র বেদনা বাত্যাঘাতে উতলা হল তার হৃদয়। নারী হয়ে নারীর বেদনা মর্মে মর্মে যদি অনুভব না করে তা-হলে করবে কে? কে? এই একটি জিজ্ঞাসায় তার চিত্ত আলোড়িত হতে লাগল। পুরুষ নারীকে ভোগ-লালসার ক্রীড়া-সঙ্গী ছাড়া আর কিছু মনে করে না। নারীচরিত্রে এ-ক্ষত বড় গভীর এবং ভীষণ কলঙ্কময়। নারীর মত অসহায় দুর্ভাগা। এ ত্রিভুবনের আর কে হয়? এসব ভাবনায় তার অন্তর অতিমাত্রায় বিচলিত হল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত স্বগত করে বলল: না, না, প্রতিশোধ নয়। ওরা কৌরব বধূ নয়, নারী। আমার মতই অসহায়া লাঞ্ছিতা নারী। ওরা কেউ দোষী নয়। অপরাধ ওদের স্বামীর। ওদের জন্যে কিছু করা আমার কর্তব্য।

দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে দ্রৌপদী আকুল স্বরে অসহায় ভাবে ডাকলঃ মধ্যম পাণ্ডব! মধ্যম পাণ্ডব—তুমি কোথায়? শুনতে পাচ্ছ কৌরব কুলবধূদের আকুল করা অসহায় আর্তস্বর!

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কুটীরের একপ্রান্তে স্থির হয়ে বসে। মুখে তার এক অব্যক্ত যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। দু'চোখের পাতায় বেদনায় সুনিবিড় ছায়া থম থম করছে। মাঝে মাঝে দ্রৌপদীর দিকে ভীরু চোখে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নেয়; কি যেন বলতে চায় অথচ সংকোচে বলতে পারছে না। কথাগুলো তার গলার কাছে আটকে গেল যেন।

সহসা দ্রৌপদীর কণ্ঠে ব্যাকুল আহ্বান শুনে চমকে উঠল যুধিষ্ঠির। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতা নিয়ে দ্রুতপায়ে তার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। অবাক স্বরে বললঃ দ্রৌপদী তুমি!

উদ্‌ভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টিতে দ্রৌপদী তাকাল তার দিকে। চোখে তার স্তব্ধ বিস্ময়। মুখে অসহায় বিহ্বলতা। বললঃ ধর্মরাজ, কৌরব বধূদের আর্তচিৎকার শুনে আমি স্থির থাকতে পারছি না। বুক আমার ফেটে যাচ্ছে।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর চোখের দিকে স্থির ঝলকানো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়েছিল। হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। একটু পরে যাচাই করার জন্য বললঃ ওরা আমাদের শত্রু। পাণ্ডবদের প্রিয় ভার্যাকে যারা অপমান করেছিল ওরা তাদের স্ত্রী। ওদেরকে তুমি দয়া কিংবা করুণা করতে চাও? প্রতিশোধ নেবে না?

দ্রৌপদীর দুই আঁখিকোণে সুনিবিড় বেদনার ছায়া ঘন হয়ে উঠল। মৃদুস্বরে বললঃ ধর্মরাজ, তুমিও বিদ্রূপ করছ? বিস্মৃত হয়ো না আমি নারী। বর্বর পুরুষের নারীমেধ যজ্ঞ যে. নারীজীবনের কত কাছে, বেদনাময়, দুঃখকর তা তুমি জানবে কেমন করে?

আমি তো শুধু প্রতিশোধের কথা স্মরণ করে দিয়েছি—

প্রতিশোধের কথা আমি ভুলিনি রাজা। কিন্তু এভাবে নয়। এর মধ্যে পৌরুষ কোথায়? নির্বীর্য কাপুরুষের মত নারী নিগ্রহের এ দৃশ্য দর্শন করা কিংবা উপভোগ করা পুরুষের কলঙ্ক এবং অপমান; নারীর লজ্জা। নারী হয়ে আমি কখনও তা সইতে পারি?

যুধিষ্ঠিরের চোখে তখনো কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। গলা নামিয়ে বললঃ শত্রুর যে-কোন ক্ষতি, লাঞ্ছনা, অনিষ্ট প্রতিহিংসাই হর্ষোৎপাদন করে।

কথার পিঠেই দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।—ধিক্ ধিক্ সে নিকৃষ্ট প্রতিহিংসারে! এই হীন

প্রতিহিংসার বাসনা নিয়ে কেমন করে পাণ্ডবেরা তার বিবেকের কাছে, সনাতন ধর্মের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে? শরণাগতকে রক্ষা করা অত্যাজ্য ধর্ম বিসর্জন দিয়ে পাণ্ডবদের কোন ইষ্ট লাভ হবে? পাণ্ডবদের এ বিচ্যুতি কত কলঙ্কময় জানো।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল যুধিষ্ঠিরের। মুগ্ধ চোখে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বলল : সত্যিই তুমি অতুলনীয়া। রহস্যে ঢাকা এক আশ্চর্য নারী। তোমাকে যত দেখি তত অবাক হই। বিশ্বাস কর। শুধু তোমার মনস্তুষ্টির জন্য নিরুপায় আত্মহননে মগ্ন ছিলাম।

ধর্মরাজ, প্রণয়ের সময় এখন নয়। মধ্যম পাণ্ডব, গাণ্ডীবকে আদেশ দাও ওদের উদ্ধার করতে। ওদের আর্তকান্না আমি সইতে পারছি না।

মনের হর্ষ জানানোর জন্য ভীম সেই সময় এল সেখানে। দ্রৌপদীর কথা শুনে অবাক হল। গভীর হতাশায় মর্মরিত হল তার কণ্ঠস্বর। কুপিত কণ্ঠে বলল: কৌরবদের অন্যায় আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক তাদের ভার্যারা।

আতঙ্কিত উদ্বেগে বলল দ্রৌপদী: ভীমসেন নিষ্ঠুর কর না তোমার হৃদয়।

ভীমের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদের মত শব্দ বার হয়। বলল: পাঞ্চালী আমার বুকে স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত অঙ্গার।

জানি প্রিয়তম।

এর মধ্যে ভুলে গেলে কৌরব বধূদের ঔদাসীন্য। দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যখন তাদের ঘরে ছুটে গেলে, তারা তোমাকে আশ্রয় দেয়নি, রক্ষা করেনি, মুখের সহানুভূতিও জানায়নি। তোমার লাঞ্ছনার নীরব দর্শক ছিল তারা। সে অতীতকে ভুলব কেমন করে প্রিয়তমা!

দ্রৌপদীর দৃষ্টিতে যন্ত্রণা। কথা বলে না। নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করে এবং স্থির হয়। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। তারপর, হাসবার চেষ্টা করে বলল: তারা যে কত নিরুপায় আর অসহায় নারী আমার চেয়ে বেশী কারো জানা নেই। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তাদের মনে ভীরু অসহায়তাকে আমি দেখেছি। স্বামীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণের স্বাধীনতা, সাহস তাদের নেই, তাই, আজ কোন ক্ষোভ নেই আমার মনে।

ভীমসেন, তুমি না পাণ্ডব? পাণ্ডব মানে ন্যায়-সত্য-ধর্ম-আদর্শের প্রতীক। পাণ্ডব শত্রুতা জানে না। শত্রুদের দয়া করা, ক্ষমা করা, শরণাগতকে রক্ষা করা পাণ্ডবের অত্যাজ্য ধর্ম। সেই ধর্ম বিচ্যুত হলে, পাণ্ডব নামের কলঙ্ক হবে। এ হল আমাদের ভাগ্য দেবতার আর এক অগ্নিপরীক্ষা। আমার বিনীত অনুরোধ তুমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কর।

একটা তীব্র অভিমানবোধে তার বক্ষ বিদীর্ণ হল। আর্তস্বরে বলল: পাঞ্চালী, এর চেয়ে আমায় বিষ দাও, যত তোমার বিষ আছে সব দাও। কিন্তু আমাকে দুর্বল করে দিও না।

অর্জুন, নকুল, সহদেবও ছিল সেখানে। অবাক কৌতুহলিত চোখে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়েছিল। ঝটিতি অজস্র কথা ও জিজ্ঞাসা এক সঙ্গে তাদের বুকের মধ্যে উথালি পাথালি করে উঠল। অথচ, কেউ কোন কথা বলছিল না। চিন্তার দ্বন্দ্বে ভীমের আকস্মিক বিমূঢ়তা যখন দ্রৌপদীকে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে নির্বাক করল তখন অর্জুন শান্ত গলায় বলল: আমাদের পিতামহ এক। একই বংশধারা আমাদের শোণিতে প্রবাহিত। কৌরব বধূরা আমাদের ভ্রাতৃজায়া। তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করা আমাদেরও কর্তব্য। জেনে শুনে, তাদের লাঞ্ছনাকে উৎসাহিত করতে পারি না।

উদ্গত নিশ্বাস বুকে চেপে সহদেব প্রত্যুত্তর বলল: একজন চিরশত্রুর জন্য বিশ্বস্ত মিত্রকেও হারাতে পারি না।

হতাশ ভীমের চোখের ছটায় কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল। জিজ্ঞাসায় নিবিড় হল তার চোখ। ব্যগ্রতা নিয়ে সে সহদেবের কথাগুলো গিলতে লাগল।

সহদেব কোন দিকে না তাকিয়ে বলল: গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন পাণ্ডবদের পরম মিত্র। তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিকেরা আমাদের প্রহরায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত। পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা, অপমানের প্রতি তাঁর অন্তরের সহানুভূতি এবং প্রীতি জানাতে যদি দুষ্টমতি কৌরবদের বন্দী করে তাতে আমাদের ক্ষোভের কিছু

নেই। বরং মিত্রতা গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত।

ভীম তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে চিৎকার করে বলল: আলবৎ, তাই হওয়া উচিত। আমি গর্বিত। আমি উল্লসিত।

দ্রৌপদীর আয়ত চোখের তারায় ভ্রূকুটি। মুখেতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। কণ্ঠে তার বিষণ্ণ বেদনার সুর। ভীমসেন! নারীর বিনষ্ট সামাজিক মর্যাদা, গৌরব পুরুদ্ধার করে তাকে গৌরাবান্বিত করার মহান সঙ্কল্প ছিল তোমাদের। সেই আদর্শের বশবর্তী হয়ে আমাকে তোমরা বিবাহ করলে। সমগ্র নারী সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তা করে তোমাদের বরণ করেছি। কিন্তু আজ আমার সে স্বপ্ন ভাঙতে বসেছে। নিজেকেই তোমাদের সম্মুখে আজ জিগ্যেস করছি—নারীর দুর্গতি অপমানের কতটুকু প্রতিকার করেছ তোমরা? সমাজের কোন উচ্চ আসনে বসিয়েছ তাকে? কী দিয়েছ পাঞ্চালীর মত নারীদের? কিছু না। নারী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। এমন কি তোমাদের গৃহকর্ত্রীও পায়নি নারীর মর্যাদা। এখন আমি কি করে বুঝব যে, তোমরা নিজেদের জীবনকে নারীস্বাধীনতার আদর্শ করে তুলেছ? বল, চুপ করে রইলে কেন? আমি জানব, শুধুমাত্র ভোগাঙ্ক্ষার কাছে আমার নারীত্ব ও ধর্মকে ত্যাগ করেছি! ত্যাগ করেছি আমার জীবনের স্বপ্ন সাধনা সব!

দ্রৌপদীর তীব্র তীক্ষ্ণ অভিযোগ এবং তিরস্কারের ভাষা পঞ্চপাণ্ডবের মস্তিষ্কের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। উত্তেজিত আচ্ছন্নতায় কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। কেবল সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে একটি স্ফুরিত ঝংকার বাজছিল: কেন? কেন? আর সেই বারংবার প্রশ্ন যেন তাদের বুকের মধ্যে আঘাত করছিল। অসহনীয় আঘাতে বিপর্যস্ত ভীমের রোষকণ্ঠ থেকে সহসা ঘোষিত হল: আমরা সমস্ত বিপদ মাথার নিয়ে ফিরিয়ে আনব কৌরব বধূদের। তোমার স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না। আমিই চির বঞ্চিত থাকব।

পাণ্ডবদের কৃপামিশ্রিত অনুগ্রহ নিয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার গ্লানি, লজ্জা, অপমান ভুলতে পারছিল না দুর্যোধন। দিবসরাত্রি তার ঐ এক চিন্তা বৃশ্চিক দংশনের মত অন্তরকে দগ্ধ করতে লাগল। বধূদের ঘরে যাওয়া বন্ধ করল। এ কলঙ্ক কালিমালিপ্ত মুখ নিয়ে কেমন করে ভানুমতী, অশ্রুমতীর সম্মুখে দাঁড়াবে। ভার্যাদের মনে তার বীরত্ব সম্পর্কিত ভগ্ন বিশ্বাস পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে কি করে? এর চেয়ে মৃত্যু শতগুণ ভাল ছিল তার। মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা নিয়ে মরমে মরে গেল সে। পাণ্ডবদের দয়া করুণা অনুগ্রহের উপযুক্ত প্রতিশোধ কি করলে নেয়া যায় তার উপায় চিন্তা করতে লাগল। চিত্রসেন তাঁর কাছে এক আতঙ্ক, এক বিভীষিকা। সুতরাং তার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন চিন্তা সে করল না। চিরশত্রু পাণ্ডবেরা তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হল। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের শক্তি, সাহস, প্রেরণা, উদ্যম। তাকে পাণ্ডবদের কাছ থেকে দূরে—চিন্তায় বাধা পড়ল তার। কি করে তা সম্ভব? দশানন রাবণের সীতা হরণ, রামের সীতা উদ্ধারের কথা মনে পড়ল। হতাশ দীর্ঘশ্বাসে দুর্যোধন স্বগতোক্তি করল: আমার এ গ্লানি কলঙ্ক নিরাময়ের অতীত। এক জয়দ্রথই পারে তাকে কিছু শান্তি দিতে।

দুর্যোধন ভগ্নীপতি সৌবীর দেশীয় নরপতি জয়দ্রথ দূতের মুখে জ্যেষ্ঠ কৌরবদের মনোভাব অবগত হয়ে দ্বৈতবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মনে মনে একটা নির্ভুল অঙ্ক কষে নিল। এবার সংঘর্ষে বাঁধলে তার ও পাণ্ডবদের মধ্যে হবে। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন পাণ্ডবদের সাহায্যে হয়ত আর এগিয়ে আসবে না। কৌরববধূদের মুক্তিদানের ব্যাপারটা তার কাছে খুবই অপমানতুল্য ছিল। সৌবীররাজ গন্ধর্বরাজের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যতাকে মনে রেখেই সৈন্য সমভিব্যহারে দ্রৌপদীর অন্বেষণে যাত্রা করল।

চতুর্পার্শ্বস্থ ঘন নিঃসীম গভীর অরণ্যের সঙ্কীর্ণ পদচিহ্ন ধরে দ্রৌপদী একা বনে পরিভ্রমণ করছিল। পাখীর কলগীতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কোকিলকণ্ঠী দ্রৌপদী উদাত্ত কণ্ঠে আপন মনে ঋক্ পাঠ করে। গাছের শাখায় ডালে ডালে খুশির হিল্লোল বয়ে যায়। শাল-শিশু-মহুয়া-পলাশের ডালপালায় জাগে

যৌবন ছন্দের চঞ্চলতা।

সহসা যাত্রাপথে অপ্রত্যাশিত অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শুনে সে বিস্মিত ও বিচলিত হল। অশ্বকে পথ দেবার জন্য সঙ্কীর্ণ পথ-পার্শ্ব থেকে দ্রুত সরে দাঁড়াল। অশ্বারোহী রাজবেশধারী ক্ষাত্র যুবক জয়দ্রথ তৎক্ষণাৎ অশ্বের রাশ টেনে ধরল। দ্রৌপদীর সামনে অশ্ব নিয়ে দাঁড়াল। চোখে মুখে তার মুগ্ধতা। অবাক নয়নে দ্রৌপদীকে দেখতে লাগল। মনে হল সে যেন স্বর্গের অনিন্দ্যসুন্দরী এক অপ্সরাকে দেখছে। চোখের পলক পড়ে না মোটে। এ কি স্বপ্ন? মায়া? মতিভ্রম? বুকে তার উত্তাল সমুদ্রের কল্লোল। কানে বাজছে অসংখ্য উত্তরহীন প্রশ্নের ঝংকার। এ-কি সে। পাণ্ডব বাঞ্ছিতা ভুবনমোহিনী দ্রৌপদী? যাকে দেখে মনে উতলা হয়, ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, দেহে অস্থির যাতনা হয়, এ কি সেই দুর্লভ রত্ন দ্রৌপদী? দ্রৌপদী নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জয়দ্রথের বুকে বারংবার শিহরণ জাগল। মনের আকুলতা চোখের তারায় সুবিনিড় হয়ে উঠল। প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে তার মন-প্রাণ প্লাবিত করল। মনের মধ্যে তার অস্ফুট গুঞ্জন: আমি চাই তোমাকে। যে কোন মূল্যে তোমায় অধিকার করব। যদি ব্যর্থ হই, পাশব পৌরুষ বলে লুণ্ঠন করতেও দ্বিধা করব না। তোমার জন্য সব উজাড় করে দিতে পারি নারী।

দ্রৌপদী স্মিতহাস্যে অশ্বারোহী রাজপুত্রের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে অন্য পথে যেতে উদ্যত হল। অমনি জয়দ্রথ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তার পথ আগলে দাঁড়াল। যুবকের উদ্ধত অশিষ্ট আচরণে দ্রৌপদী শঙ্কিত ও রুষ্ট হল। লজ্জা সংকোচ ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটল তার মুখে। এক অজ্ঞাত বিপদাশংকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। তারপর মুখ নিচু করে দৃঢ় কণ্ঠে বলল : পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও উদ্ধত পথিক। আমি পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী। পঞ্চপাণ্ডব আমার স্বামী।

জয়দ্রথের দুই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। স্মিতহাস্যের লাবণ্যচ্ছটায় মুখমণ্ডল দ্যুতিময় হল। কৌতূহলিত চোখে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে কণ্ঠে বিলম্বিত স্বরে পুনরুচ্চারিত করল: উদ্-ধত-প-থি-ক!

জয়দ্রথের চোখে বিভোল যৌবনের বিভা। দ্রৌপদীর সামান্য স্পর্শের আকাঙ্খায় তার দেহ মন উতলা হল। অত্যুগ্র কামনা-তাড়িত হয়ে স্মিতহাস্যে বলল: আমি তোমার অন্বেষণে এসেছি সুন্দরী। তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্খায় বনে বনে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছি। আমার উদ্যম সফল হল। দেখে নয়ন সার্থক হল। চিত্ত নন্দিত করার জন্য তোমাকে আমার রাজমহিষী করব। চল সুন্দরী। রথ প্রস্তুত!

ক্রোধে ঘৃণায় দ্রৌপদীর সর্বশরীর রি-রি করে উঠল। কিন্তু এই নির্জন অরণ্যে মনের সে ভাব প্রকাশ পেলে নানা বিপদ হতে পারে। তাই, দ্রৌপদী ক্রোধ সংবরণ করল। কুটীরে স্বামীদের প্রত্যাগমনের এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং তাদের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ততক্ষণ উন্মত্ত যুবককে প্রেমের ছলনায় ভুলিয়ে রাখতে হবে।

বিলোল কটাক্ষে যুবকের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদী মৃদু মৃদু হাসে। মধুস্বরে বলল: অসংকোচে হৃদয় নিবেদনের পৌরুষ আছে তোমার। তুমি বীর। নির্ভীক। সাহসী। তোমাকে দেখে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। নারী পুরুষের বীর্যের গর্বকে পছন্দ করে, তাকে শ্রদ্ধা করে। পুরুষের প্রেমের বীর্যে আমিও অশঙ্কিনী।

জয়দ্রথ দ্রৌপদীর দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আরো ঘন হয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় সঙ্গে উচ্ছ্বাস মেশানো স্বরে বলল: আমি চাই তোমাকে সুন্দরী।

পুরুষ চিরকালই এ দাবি করে আসছে। নারী বীর্যহীনা বলে পুরুষ কেশর ফোলানো সিংহনাদ করে তার দাবি জানায়।

বীর্যের গর্বে নারীকে জয় করার আনন্দ আছে পুরুষের।

কিন্তু নারীর নেই। পাশব পৌরুষ-বলকে নারী ঘৃণা করে।

বিবর্ণ হল জয়দ্রথের মুখ। উত্তর দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। আলাপের মধ্যে এ রকম যতি পড়ায় বিব্রত অস্বস্তিতে জয়দ্রথের ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। দ্রৌপদীর চোখে জয়দ্রথকে

কেমন বোকা বোকা লাগছিল। তাই দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।

কেমন একটা অপমানবোধ জয়দ্রথ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দ্রৌপদী পা বাড়াতেই সে দুরন্ত দুঃসাহসে তার কাঁধের ওপর হাত রাখল। ভয়ে দ্রৌপদীর সর্বাঙ্গ হিমশীতল হল। বুকের মধ্যে ঝড় উঠল। তবু সে সাহস হারাল না। স্থির সংযত কণ্ঠে বলল: ছিঃ। এত ভীরু, কাপুরুষ তুমি যুবক! নির্জনে আমাকে একা পেয়ে পৌরুষ দেখাচ্ছ। ধিক তোমার বীর্যের গর্বকে।

দ্রৌপদীর ক্রুদ্ধ চেহারা আর তার কথাগুলো কেমন যেন চমকে দিল জয়দ্রথকে। পৌরুষের ধিক্কার জয়দ্রথের মনে গভীরভাবে বাজল। চকিত বিদ্ধ কষ্টের ছায়ায় মুখ খানি বিবর্ণ হল। অপ্রস্তুত বোধ করল। একটা অপরাধের ক্ষীণ হাসি নিয়ে সে বলল: মার্জনা কর সুন্দরী। আমার অন্তরের দুর্বোধ্য ইচ্ছাকে ভাষা দিয়ে তোমায় বোঝানোর মত অবস্থা আমার নেই। কিন্তু আমার চোখ, আমার হাসি, আমার অর্থপূর্ণ নীরবতা প্রতিমুহূর্ত তা বোঝাতে চাইছে। তাই, হাত দুটি অবাধ্য হয়ে উঠেছিল।

দ্রৌপদীর মস্তিষ্ক থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। তবু সংযতভাবেই আপনার কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করে বলল: স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান রক্ষা করে চলাই শাস্ত্রীয় বিধান। শাস্ত্রকারেরা বলেন নারী পাবক শিখা, নরকের দ্বার।

জয়দ্রথ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে বলল: শাস্ত্রকারেরা তাই অবশ্য বলে। তবু পুরুষ চায় নারীকে। তার মন প্রাণ আত্মাকে। এ দাবী তার অন্তরের। এখানে শাস্ত্রীয় বিধান খাটে না।

দ্রৌপদীর মুখে অসহায় উদ্বেগ প্রকটিত হল। কৃত্রিম স্মিতহাস্য সঞ্চার করে বললঃ এখন আমাদের কুটিরে, চল, পঞ্চপাণ্ডব মৃগয়ায় গেছে। শূন্যকুটীরে অতিথি জ্ঞানে তোমার যোগ্য পরিচর্যা করব।

জয়দ্রথ তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বললঃ আমার গৃহেই সে পরিচর্যা লাভ করে কৃতার্থ হতে চাই সুন্দরী। রথ প্রস্তুত।

অবাক বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দ্রৌপদী তাকাল তার দিকে। তারপর, অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে দেখল, দিনের আলো হলুদ হয়েছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। এখনই স্বামীরা এই পথে প্রত্যাবর্তন করবে। এখনও আরো কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত যুবককে ভুলিয়ে রাখতে হবে। কথার নেশায় তাকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তাই সে স্মিত হেসে বলল: কিন্তু আমি যে কি, তা তোমাকে জানতে হবে।

সব জেনেছি আমি।

তবু হাসে দ্রৌপদী। বললঃ লোকে বলে আমার এই রূপসর্বস্ব দেহটাই পুরুষকে আকর্ষণ করে। তুমি আমার কাছে কি প্রত্যাশা কর?

আমি তোমার সব চাই। বলতে বলতে জয়দ্রথ তার খুব কাছে এসে গিয়েছিল। দ্রৌপদী চতুরা ছলনা পটিয়সী নারীর মত একটু হাসির ঝংকারে তুলে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। অমনি বাঁধভাঙা বন্যার মত দুরন্ত আবেগে জয়দ্রথের বুক উথালি পাথালি করতে লাগল। তার দেহের শিরায় রক্ত টনটন করতে লাগল। বুকে শরীরের স্পর্শের অনুভূতি তীব্র হল। চোখে মত্ত আবেশ। মুখে থমথমে ভাব। ঠোঁটে প্রবৃত্তিজাত স্মিত হাসি। মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদীর বুক শুকিয়ে গেল। উদ্গাত হাসি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কিছু ভাল করে অনুভব করার আগেই জয়দ্রথের বাহু বন্দী হল সে। কিন্তু ঝটিতিতে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে দৌড়তে লাগল। তার হাসির তরঙ্গে চমকে গেল নির্জন অরণ্যের স্তব্ধতা। উচ্ছল হাসির নির্ঝর লহরীর পর লহরী তুলে সমগ্র অরণ্যভূমি প্লাবিত হল। দমফাটা হাসির মধ্যে তার এমন একটা অকারণ উচ্ছ্বাস আর প্রগলভতা ছিল, যা শুধু পাণ্ডবদের শোনানোর জন্যে। তাই, হাসি বারে বারে নতুন করে উচ্চকিত হয়ে উঠল। হাসির নির্ঝর সৃষ্টি করে দ্রৌপদী এমনভাবে ছুটছিল যে, জয়দ্রথের মনে হল সে যেন তার সঙ্গে প্রেমের লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠেছে। ব্যবধান যখন কমে আসছে বড় বড় গাছের গুঁড়ির আড়াল করে দ্রৌপদী জয়দ্রথের নাগালের বাইরে বাইরে থাকল। জয়দ্রথও তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উন্মাদের মত হা হা করে হাসতে লাগল।

আচমকা যুধিষ্ঠিরের কানে গেল তার অস্পষ্ট ক্ষীণধ্বনি। অমনি যুধিষ্ঠিরের বুকে কেঁপে উঠল। মুখ শুকিয়ে গেল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। হতচকিত দৃষ্টিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের

দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল: ভীম, অর্জুন—তোমরা শুনতে পাচ্ছ? কে যেন অশরীরীর মত হাসছে? এ হাসি স্বাভাবিক নয়। প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে না। এর মধ্যে হর্ষের কোন লক্ষণ নেই! বিপন্ন কোন নারীর ভাষাহীন এক আঁ-আঁ আর্তধ্বনি।

ভীমসেন বাতাসের বুকে কান পাতল। হঠাৎ, কোন কথা বলতে পারল না। ভাইদের দিকে তাকাল। তারপর, খানিকটা থেমে থেমে উচ্চারণ করল: ধর্মরাজ, এ হাসি আমাদের পাঞ্চালীর। হাসিতে আহ্বানের সংকেত। আর কালক্ষয় সম্ভব নয়। এখনি যাত্রা না করলে, পাঞ্চালীকে আমরা হারাব।

ভীমের কথা শেষ হওয়ার আগেই অর্জুন অশ্ব নিয়ে বায়ুবেগে ছুটল। তার দেখাদেখি, অন্য ভাইরা যে যার অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসল। চোখের পলকে তারা একদিকে ছুটল। নির্বিঘ্নে পালানোর পথ করে নিয়ে দ্রৌপদী প্রাণভয়ে যখন ছুটছিল, জয়দ্রথ হঠাৎ সজাগ হল। উদ্দাম প্রগলভ ও হাসি তার থমকে গেল। রথ নিয়ে তার গতিরোধ করল। দুর্বার আকাঙ্খা ধমনীতে তবল আগুনের স্রোতের মত বয়ে গেল। দেহের দাবী সম্পর্কে তার বোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হল। খপ্ করে তার হাত ধরে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিল। জড়িয়ে ধরা তাব দু'বাহুতে অমিত শক্তি। মনে হল, সে চেষ্টা করেও তার শক্ত হাতের বন্ধন খুলতে পারবেন না। জয়দ্রথ, দুর্জয়, দুঃসাহসী। প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির তাড়নায় তাকে বুকের মধ্যে নিষ্পেষিত করতে লাগল। কেমন একটা ভীরুতাবোধে দ্রৌপদী বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। খানিকটা লজ্জা ও ভয় পেল। তবু ঠোঁটেতে হাসি লেগেছিল। সেই হাসিতে একটা গ্লানিকর লজ্জার আভাস। অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে রেখে সে তার আগ্রাসী চুম্বন থেকে নিজেকে বাঁচাতে লাগল। তার পৌরুষ আহত করে নিবৃত্ত করার জন্য শ্লেষাত্মক বাক্যে বলল: যুবক তোমাকে আমি সাহসী ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি দুর্বৃত্ত ছাড়া আর কিছু নও। তোমার পৌরুষহীন প্রেমে আমার কোন আকর্ষণ নেই। প্রমত্ত লালসায়, ভোগাকাঙ্খায় তুমি অধীর, উন্মত্ত। তোমার অসংযত, অশিষ্ট, বর্বর আচরণে আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ এবং নিজেকে লাঞ্ছিত মনে করছি। ধিক তোমাকে।

জয়দ্রথ কিছুমাত্র বিচলিত হল না। ওর মনেও নেই কোন পাপের দ্বন্দ্ব। নির্বিকারভাবে বলল: সুন্দরী তোমার কোন বাক্যই বিদ্ধ কবতে পারবে না আমায়। আমি বঞ্চিত হতে রাজী নই। তোমাকে আমার রথে আরোহণ করতে হবে। আমার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তোমায় মহারাণী করব। তোমায় নিয়ে আমার নতুন জীবন-কুঞ্জ রচনা করব। জীবনের এত বড় একটা আকাঙ্খা ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।

হাত ধরা অবস্থায় জয়দ্রথ তাকে রথে তুলল।

দূরের আকাশ ধুলিজালে ঢেকে যেতে দেখল দ্রৌপদী। অশ্বক্ষুরের অস্পষ্ট ক্ষীণ পদধ্বনিও কানে শুনল। তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ভয় দূর হল। মুখে প্রসন্ন হাসির কৌতুকে উজ্জ্বল হল। তাই জয়দ্রথকে বাধা দান করা প্রয়োজন বোধ করল না। তার নির্দেশ মতই সে রথে আরোহণ করল।

উল্কার মত ছুটে আসছিল পঞ্চপাণ্ডব। পথেই জয়দ্রথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তাদের। কালান্তকের মত পঞ্চপাণ্ডব তার পথ আগলে দাঁড়াল। জয়দ্রথকে দেখামাত্র ভীম সরোষে গর্জন করে উঠল। হিংস্র আক্রোশে শার্দুল যেমন গর্জন করতে করতে তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভীমও তেমনি চলন্ত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে জয়দ্রথের উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর আরম্ভ হল দুই মহাশূরের প্রচণ্ড লড়াই। উল্লাসে উত্তেজনায় দ্রৌপদী ঘন ঘন উচ্চারণ করতে লাগল: মারো, আরো মারো। নারী নির্যাতনকারী দস্যু, লম্পটকে মারো। একেবারে মেরে ফেল।

ভীমের প্রচণ্ড প্রহারে জয়দ্রথ ক্লান্ত এবং অচৈতন্য হয়ে পড়ল। মুষ্ঠাঘাতে ভীম তার মস্তক বিদীর্ণ করতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠির তাকে নিবৃত্ত করে বলল: ভগিনী দুঃশলাকে পতিহীন কর না ভীম। শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে করুণা কর জয়দ্রথকে।

সরোষে গর্জন করে উঠল দ্রৌপদী। ক্ষমা কাকে কর ধর্মরাজ? অরণ্যের হিংস্র পশুকে বধ করার সময় তুমি তাকে ক্ষমা কর ধর্মরাজ? তার সঙ্গে এ নরপশুর পার্থক্য কোথায়? ভয়ংকর মৃত্যুরূপী

দানব বলে হিংস্র বন্য পশু যদি বধ্য হয়, তা হলে নারী জীবন-নাশিনী এ দুর্বৃত্ত কেন হবে না ভীমের বধ্য?

যুধিষ্ঠির কাতর অনুনয় করে বলল: দ্রৌপদী, দুঃশলা পতিহীন হবে।

এক অদ্ভুত বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল দ্রৌপদীর অধরে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-শ্লেষে তীক্ষ্ণ হল তার কণ্ঠস্বর। এই দুরাচারী কামুক যদি তার রাজ্যে আমাকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত তাহলে আমিও পতিহীন হতাম। ব্যভিচারের কলঙ্ক থেকে দুর্যোধন ভগিনী দুঃশলা আমাকে কখনও রক্ষা করতে আসত না। তোমার ক্ষমা দুর্বলের আত্মপ্রসাদ, নির্বোধের অহংকার। শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ব নয়। বরং ক্ষমা কলঙ্ক শত্রুকে অল্পপীড়ন করে ছেড়ে দেবার অর্থ; এক ভয়ঙ্কর বিপদকে জীইয়ে রাখা। তাই, তোমার কোন কথা আমি শুনব না।

যুধিষ্ঠিরের দুই চোখে করুণার নির্ঝর। দ্রৌপদীর করুণা লাভের জন্য অসহায় ভাবে ডাকল: দ্রৌপদী, এ আমার মিনতি—।

ঝংকার দিয়ে বলল দ্রৌপদী। না, না আমায় বল না। আমি পারব না। ক্ষমা করতে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই কখনও ধর্মরাজ।

তারপর রুদ্র দৃষ্টিতে ভীমের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদী কঠোর আদেশের সুরে বলল ঃ মধ্যম পাণ্ডব, তস্কর প্রতারককে অবশ্যই তার দণ্ড পেতে হবে। নারীনির্যাতনকারীর কোন ক্ষমা নেই। নরাধমের শাস্তি—

যুধিষ্ঠির আকুলস্বরে দ্রৌপদীর কথার মধ্যে বললঃ প্রিয়তম, দুঃশলা তোমার মতই নারী। নারীর মন দিয়ে তুমি তাকে বোঝার চেষ্টা কর। স্বামীকে হারিয়ে হতভাগিনী কি নিয়ে থাকবে? তার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা এবং হারানোর দুঃখটাকে তুমি যদি সহানুভূতির চোখে না দেখ তাহলে তোমার নারীত্বের অপযশ হবে। তুমিও নারী। নারীর মনোবেদনা, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা নিয়ে তুমি তাকে অনুগ্রহ কর। নারী হয়ে আর এক নারীকে করুণা কর।

যুধিষ্ঠিরের কথায় দ্রৌপদী সহসা বদলে গেল। তার বুকের ভেতর মোচড় দিল। মনটা কেমন করে উঠল। সে কোন কথা বলতে পারল না। যেন এক চিরজিজ্ঞাসার কাছে উৎকর্ণ, বোবা। উৎসুক অনুসন্ধিৎসু চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার যন্ত্রণাবিদ্ধ মনের ভেতর একটা সহানুভূতি এবং সমবেদনা বোধ কাজ করছিল। আচ্ছন্নের মত সে মাথা নাড়ল। যার অর্থ নানাবিধ এবং অপরিচ্ছন্ন। দ্রৌপদীর অন্যমনস্ক স্মৃতিপটে বারংবার আবির্ভূত হয় তার অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত জীবনের দুঃখ বেদনার চিত্র। বেদনা-করুণ অন্তরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হয়ে ওঠে। উদ্‌ভ্রান্তের মত অস্ফুট স্বরে আত্মবিলাপ করে বলে, স্বামী ছাড়া কি আছে নারীর জীবনে? সেই জীবনকে হত্যা করলে হতভাগিনী দুঃশলার কি থাকবে?

ভীমের পীড়নে ক্রমেই বলশূন্য শিথিল হয়ে আসছিল জয়দ্রথের দেহ। স্তিমিত হয়ে এল তার চক্ষু। নাড়ীর গতিও ক্ষীণ হল। জয়দ্রথের অবস্থা দেখে সহসা উৎকণ্ঠিত হল দ্রৌপদীর হৃদয়। ব্যাকুল স্বরে ব্যস্তভাবে বলল: ভীমসেন, তা-হলে করুণা কর—কৃপা কর দুরাত্মার। বিনিময়ে পাণ্ডবের দাসত্ব স্বীকার করে ফিরে যাক নিজ রাজ্যে।

রজনীর ঘন নিঃসীম অন্ধকারের মত হঠাৎ একদিন দ্রৌপদীর জীবনেও অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কিন্তু দ্রৌপদী কিছুই জানত না। অপ্রত্যাশিতভাবে সে চমকে এল তার জীবনে।

সেদিন সায়ংকাল। ব্যাসদেব এসেছেন কাম্যকবনে। দ্রৌপদী নিজহস্তে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করে কেশ দিয়ে মুছে দিল পদযুগল। তারপর পথশ্রমের ক্লেশে দূর করার জন্য ব্যজন করল তাঁকে। দ্রৌপদীর সাদর আপ্যায়নে খুশি হলেন মুনিবর। সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করে মুখপানে অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললেন: কল্যাণী তোমাকে একটা কথা বলব।

কম্পিত কণ্ঠে সবিনয় হাসি সঞ্চার করে বলল: অকপটে আপনার কথা বলুন ঋষিবর।

দ্বিধা ত্যাগ করে ব্যাসদেব বললেন: কল্যাণী, তুমি পাণ্ডবের শপথের বাণী। কিন্তু—

কিন্তু বলে থামলেন কেন ঋষিবর?

দ্রৌপদীর মুখে ভয় ও শঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠল।

ব্যাসদেব একটু ইতস্তত করে বললেন: নারী হল মহামায়ার অংশ। তার মায়ায় আবৃত সংসার। পঞ্চপাণ্ডবকে তুমিও মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছ। তোমার প্রেম ও মধুর সান্নিধ্যের মোহপাশে বন্দী তারা। তোমার আকর্ষণে তারা কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। নিজেদের ভালমন্দর বিচারবোধ পর্যন্ত হারিয়েছে।

দ্রৌপদী মাথা নিচু করে দাঁড়াল। আঁখিতে তার উষ্ণ অশ্রু টলটল করছিল। কম্পিত কণ্ঠে ভগ্নস্বরে বলল: ঋষিবর একথা বলছেন কেন? আমি তাদের নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু। তাদের দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনা। মরুভূমির মত তাদের শুষ্ক বুকে আশার কমল ফুটিয়েছি। আকাঙ্খার দীপ শিখাকে উজ্জ্বলিত করেছি। তবু, এই মর্মদাহী অভিযোগ কেন? আমি কোন ক্ষতি করেছি তাদের।

ব্যাসদেবের সহসা গম্ভীর হলেন। ডাকলেন: কৃষ্ণা।

স্নেহদৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলো স্বগত উচ্চারণ করলেনঃ তুমি আমার যজ্ঞের মঙ্গল ঘট। পঞ্চপাণ্ডব আমার দেবারতির পঞ্চপ্রদীপ। পুরোহিত ব্যাসদেব পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে দেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে একমনে প্রার্থনা করছেঃ হে পুষা, পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বলিত আলোয় দূর কর মনের অন্ধকার। জ্বাল জ্ঞানের আলো চৈতন্যময় কর জগৎকে। মধুময় প্রাণবন্ত কর এ ধরাতল।

বলতে বলতে তার দু'চোখ বন্ধ হয়ে এল। স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ উন্মনা দৃষ্টিতে দূরদিগন্তে মিশে যাওয়া আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে বলল: পঞ্চপাণ্ডব সহ শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বপ্ন কল্পনার কোটি ঐশ্বর্য নিয়ে আমার বুকের মধ্যে বিরাজ করছে।

তারপর সবিস্ময়ে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন: একি! তোমার চোখে জল! বড় কিছু পেতে হলে অনেক অশ্রু দিতে হয়। অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়।

দ্রৌপদী নীরব গম্ভীর। উত্তর দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শঙ্কিত স্বরে জিগ্যেস করল: আমায় কি করতে হবে ঋষিবর?

পরিবেশে তখনও বিরাজ করছে স্তব্ধতা। এমন সময় কৃতাঞ্জলিপুটে সেখানে এসে দাঁড়াল যুধিষ্ঠির সহ পঞ্চপাণ্ডব। সবিনয়ে মস্তক নত করে বলল: আমার প্রণাম গ্রহণ করুন মুনিবর।

আনন্দে ব্যাসদেবের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হল। স্মিত হেসে বললেন: কল্যাণ হোক বৎস! কুশল তো সব।

যুধিষ্ঠির সলাজ মৌন স্মিতহাস্যে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

তারপর, বিশ্রম্ভালাপে ব্যাসদেব বললেন: বৎস, ইদানীং তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। দুর্যোধন তোমাদের শত্রুর চোখে দেখে, তোমাদের অনিষ্ট করাই তার ধ্যান-জ্ঞান। ভবিষ্যতে তার কাছে ভাল ব্যবহারে প্রত্যাশা কর না। দুর্যোধন তোমাদের রাজ্য কোনদিনই ফেরৎ দেবে না। তবু, রাজ্যেদ্ধারের কোন সক্রিয় উদ্যোগ তোমাদের নেই—কেন?

এক কঠিন অস্থিরতার মধ্যে যুধিষ্ঠির ছট্‌ফট্‌ করছিল। ঈষৎ শিরশ্চালন করে বলল: আপনার অনুমান সত্য ঋষিবর। কিন্তু আমরাও বসে নেই।

গোপন সংগ্রামের প্রস্তুতি কী করেছ?

নিপীড়িত মানুষের প্রতি প্রেম ও মমতা জাগিয়েছি। গণ-অধিকার এবং মানুষের ন্যূনতম ন্যায্য দাবি ও ন্যায় বিচারের প্রার্থনা বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে তুলেছে। এই বিশাল ভারতবর্ষের অচল অনড় রথটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে শূদ্রজাতি তারাই সমাজে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। তাদের আজ ঘুম ভেঙেছে। এ দেশের শক্তি তারা। তারাই সমাজে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। তাদের সেবায়, শ্রমে সভ্যতা গড়ছে, শস্য ফলছে, পরিধেয় বস্ত্র তৈরি হচ্ছে, সৈনিকরূপে তারা দেশ রক্ষা করছে। আমি সেই অগণিত মানুষকে নিয়ে গড়ে তুলবে এক নতুন রাষ্ট্র, নতুন জাতি, নতুন স্বাধীনতা।

ব্যাসদেব অধরে মৃদু হাসি স্ফুরিত হল। বললেনঃ তোমার যজ্ঞ ফল সব বিপন্ন হতে বসেছে।

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির ফলে দেশে ভয়াবহ খাদ্যের অনটন। অনাহারে মানুষ মরছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেশকে গিলে খাচ্ছে। পরিত্রাতার মত দুর্যোধন তাদের মহা দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার বিপুল খাদ্য ভাণ্ডার থেকে দুর্গত মানুষদের আহারের ব্যবস্থা করে তাদের চিত্ত জয় করেছে। দুঃসময়ের বন্ধুকে কোনদিন দুঃস্থ জনগণ ত্যাগ করবে না। কিন্তু তোমাদের বর্ণাশ্রম প্রথাদ্রোহী কার্যের ফলে, সমাজে শৃঙ্খলাভঙ্গ হতে শুরু করেছে। সারা রাজ্যব্যাপী ঘনিয়ে উঠেছে অসন্তোষ। সে যে তোমাদের প্রশ্রয়ের কীর্তি এ কথা দুর্যোধন আর্যাবর্তের রাজাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, তোমার সম্পর্কে তাদের মনে চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে আছে। দুর্যোধন কৌশলে সমগ্র ভারতভূমি গ্রাস করতে বসেছে। আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে এক ভয়াবহ আসন্ন সংঘর্ষের বার্তা। তার প্রতিকারের তুমি কি করেছ?

ব্যাসদেবের কণ্ঠে কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পেল। যুধিষ্ঠিব তাঁর অসন্তোষ পরিমাপ করে বলল: আপনার দুশ্চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু বনবাসের থেকে এক অনিশ্চিত প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছি। এখনও সে অবস্থা কাটেনি। অবস্থা যে আরো জটিল হয়েছে, আপনার কথাতে তা বুঝতে পারছি। আমায় কি করতে হবে, আপনি শুধু পরামর্শ দিন। আপনার নির্দেশ আদেশজ্ঞানে মান্য করব।

গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করলেন ব্যাসদেব। তারপর বিচক্ষণের মত যুধিষ্ঠিরের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। তুমি কি ভাবছ তাই বল।

এ কথা শুনে যুধিষ্ঠির বিস্মিত হল। যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে অনুভূত হল উৎকণ্ঠা আর বিস্ময়। চিরকাল আপনার নির্দেশ মেনে চলেছি, আজ কেন তার ব্যতিক্রম হবে?

ব্যাসদেব ফিরে তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। তার আয়ত্ত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে একটা উদ্বেগ আর অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। একটা আহত বিষণ্ণতা তার প্রাণ জুড়ে। যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাসদেব মৃদু হেসে বললেন: বৎস, সঙ্ঘর্ষ হয় মানুষে মানুষে। স্বার্থের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত। দুর্যোধনের সঙ্গে তোমার বিরোধ স্বার্থ ও আদর্শের। দুর্যোধন চায় সমস্ত সম্পদ এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করতে। এ ধরনের লোকের হাতে মানুষ এবং দেশের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব হয়ে ওঠে নিপীড়নের একটা অস্ত্র। একদল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী স্বৈরাচারীর শাসনে প্রজাসাধারণের বৃহৎ অংশ পদদলিত হয়। হচ্ছেও তাই। দিকে দিকে প্রজা অসন্তোষ গণরোষে গর্জে উঠছে। সেই হিসেবে তুমি সঠিক পথ নির্বাচন করেছ। পুরাণে আছে, স্বর্গেও দেবতারাও যতক্ষণ মহাশক্তির সহায়তা পায়নি। ততক্ষণ তারা পরাজিত হয়েছে। তুমিও সেই মহাশক্তির জাগরণ ঘটিয়েছ। স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইর যে আদর্শ তুমি নিয়েছ তা আমি জানি। কিন্তু তোমার আদর্শ ও কর্মদক্ষতা কি মূল্য পাবে?

যুধিষ্ঠির স্খলিত স্বরে জিগ্যেস করল ঃ তা-হলে, কি করতে হবে আমায়?

কর্তব্য স্থির করতে হবে সমস্যার মূলে পৌঁছিয়ে। আজ বেশির ভাগ ভারত রাজ্য তোমার পক্ষ ত্যাগ করে দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছে। এই অবস্থায় তাদের আশায় ও ভরসায় থেকে রাজ্যোদ্ধারের চিন্তা করা দিবা স্বপ্ন দেখার মতই অবাস্তব।

যুধিষ্ঠির হঠাৎ অধৈর্য হয়ে কথার মধ্যে নিজের উৎকণ্ঠাকে প্রকাশ করে বলল ঃ আপনার বাক্যে আমি নিরুৎসাহ বোধ করছি। মনে হচ্ছে, অদৃষ্টের এক ঊর্ণজালে জড়িয়ে পড়ছি। অথচ, একদিন মহৎ রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে, বিপুল গণজাগরণের কর্মেচ্ছাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্যে ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে চলে এসেছি।

ব্যস্ত স্বরে ব্যাসদেব বললেন: তোমার আগমন তো নিষ্ফল হয়নি। বৎস। ছোট ছোট রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে যে আত্মকলহ তা দূর করে তাদের কাছাকাছি এনেছ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, মৈত্রী-নীতি প্রতিবেশী রাজ্য ও রাজ্যগুলির রেষারেষি হ্রাস করেছে। বর্ণাশ্রমের অচলায়তন ভেঙে দিয়েছে। নর দেবতার, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙেছে। কিন্তু এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় তোমার সফল কর্মোদ্যোগের মধ্যে প্রাচীর তুলে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাই কিছুই লাভ হল না তোমার।

যুধিষ্ঠিরের মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি অনিবার্যভাবে জাগে। সে কিছু বলতে পারে না। ব্যাসদেবের

মুখ থেকে তার দৃষ্টি নেমে যায় মাটির দিকে। তার সংশয় নিবিড় মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাসদেবের মনে হল যুধিষ্ঠির তার সত্তার গভীরে যেন নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আকুল কণ্ঠে অসহায়ভাবে ডাকল: মহর্ষি।

ব্যাসদেব সহজভাবে বললেন: বৎস, হতাশ হওয়ার কিছু নেই! মহাশক্তির বোধন পুজো তোমার শেষ হয়েছে। কিন্তু সেই জাগ্রত শক্তির সঙ্গে দেবদত্ত অস্ত্র, বুদ্ধি যুক্ত না হলে অসুর নিধন করবে কেমন করে?

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল যুধিষ্ঠিরের দুই চক্ষু। অবাক স্বরে জিগ্যেস করল: দেব অস্ত্র?

—হ্যাঁ। তবে এঁরা স্বর্গের দেবতা কি-না জানি না। হিমালয়ের সহনশীল উচ্চভূমিতে এঁরা বাস করেন। এঁরা মানুষ। একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী। সভ্যতায় সংস্কৃতিতে, প্রযুক্তিতে এঁরা এত উন্নত এবং অগ্রসর যে সমতলবাসীর মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। হিমালয় অধ্যুষিত এই বিরাট পার্বত্য অঞ্চল বহুশতাব্দী ধরে সভ্যতার শীর্ষস্থানে বিরাজ করছে। সমতলবাসীর চোখে এবং কল্পনায় এঁরাই দেবতা। এঁদের সংস্পর্শে থেকে তারা দূরে দূরে থাকে। তাদের নাম শুনলে ভয় পায় সমতল অঞ্চলের নৃপতিরা।

যুধিষ্ঠিরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বিস্ময়কর আর রহস্যপূর্ণ মনে হয়। ব্যাসদেবকে মনে হয় এক রহস্যময় পুরুষ। অপলক বিস্ময়ে ব্যাসদেবের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক বিভ্রান্তভাবে ঘাড় নেড়ে উচ্চারণ করে : পিতামহ, আপনি কি অমরাবতীর ইন্দ্র, কৈলাসের মহেশ্বর, সুমেরুর পবন, উত্তর কুরুবর্ষের সূর্য, সংযমনীর কৃতান্ত রাজের কথা বলছেন!

ব্যাসদেবের ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসির আভাস ফুটে ওঠে। হাসিতে দূর রহস্যের ইঙ্গিত। বললেন : হ্যাঁ বৎস। একমাত্র তাদের সাহায্যে তোমরা যে-কোন মহাযুদ্ধে সহজে জয়ী হবে। তাঁরা তোমাদের সবরকম সাহায্য দিতে আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। এঁদের উন্নত ধরনের যুদ্ধ-অস্ত্র এবং সমর সরঞ্জাম ব্যবহার ও প্রয়োগের কৌশল শিক্ষার জন্যে অনতিবিলম্বে সমরকুশলী পাণ্ডব সেনাধ্যক্ষ অর্জুনকে পার্বত্য-রাজ্যগুলিকে পাঠাও। একমাত্র এই পার্বত্য রাজারই তোমাদের প্রকৃত অকপট বন্ধু।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নয়! বৎস! দুর্যোধন চুপ করে নেই। তুমিও থাকবে না। এতকাল ধরে তুমি যা করেছ তার রাজনৈতিক মূল্য যে নেই, একেবারে তা নয়। কিন্তু বাহুবলই মানুষের শক্তির উৎস। শক্তিবৃদ্ধি ভিন্ন তুমি রাজ্য ফিরে পাবে না। দুর্যোধন বিনামূল্যে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। তার কাছে তুমি সহায়-সম্বলহীন বনবাসী ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছু নও। তবু, তোমাকে ভয় তার। গুপ্তচর ব্যবস্থা কঠোর হওয়ার আগেই তোমার যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ করতে হবে! ভবিষ্যতে কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষ হতে পারে—এই চিন্তা করেই প্রস্তুত থাকা রাজার কাজ। নইলে, সমূহ বিপদ হবে। তখন কি করবে? যুদ্ধেই জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়। কিন্তু তার আয়োজন কোথায় তোমাদের? কালক্ষয় না করে অবিলম্বে অর্জুনকে হিমালয় সুউচ্চ পার্বত্যদেশে পাঠিয়ে দাও। প্রচুর অস্ত্র তাদের। নিজের দেশে তারা যুদ্ধ চায় না। কিন্তু অন্যদেশে নতুন কোন রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের জন্য তারা সে অস্ত্র দেবে। সমতলভূমি দুর্যোধনের নেতৃত্বে ইন্দ্রবিরোধী যে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটানোর জন্য তোমাদের সাহায্যে তাদেরও বিশেষ দরকার। তোমাদের ওপর তাদের আস্থা আছে। আমার কথামতো কাজ করলো তোমরা লাভবান হবে।

যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল ব্যাসদেবের দিকে। কিছুক্ষণ কোন কথা সরল না তার মুখে। পরে, অবাক স্বরে উচ্চারণ করল: আপনি,—আপনি আমার জন্য এত করেছেন, ভাবতেই বিস্ময় লাগে। অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন আলো দেখতে পাচ্ছি। অর্জুন, অর্জুন!

ব্যাসদেবের গম্ভীর বিষণ্ণ থম থমে মুখের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বেলুনের মত চুপসে গেল। বিভ্রান্ত অবাক চোখে ব্যাসদেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাসদেবের চোখ শীতের স্থির সরস্বতী নদী। তার চঞ্চল স্রোতে সোনালী রোদের আলো ঝলমল করছে। বিরামহীন স্রোতের মত পেছনের ঘটনাগুলো মনের ওপর অশান্তভাবে আছড়ে পড়ছে। কিছুতে প্রতিহিংসার কথা ভুলে থাকতে দেয়

না তাকে। নিজের প্রতি বিস্ময়ে ধিক্কার জাগে। ঋষি হয়েও পারেননি সাধারণ মানুষের ক্রোধ প্রতিহিংসা জয় করতে। চিন্তার দ্বন্দ্বে বিমূঢ় হয়ে ব্যাসদেব তাকিয়ে থাকেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে কেমন একটা অন্যমনস্ক বিহ্বলতার ভাব। মুখে কষ্ট আর অপরাধের ছায়া।

ব্যাসদেবের আকস্মিক ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে যুধিষ্ঠির নিজেকে অপরাধী ভাবল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে আস্তে আস্তে বললঃ ঋষিবর আপনি সংক্ষুব্ধ কেন? অজ্ঞাতবশত যদি কোন প্রগলভতা করে থাকি তা হলে মার্জনা করুন আমাকে।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ব্যাসদেবের অধিকতর অস্বস্তিবোধ করে। অবাক বিভ্রান্ত মুখে শব্দ করেন— অ্যাঁ। না, আমি ভাবছিলাম— যদি কিছু করে থাকি সে কার জন্যে? আমার না তোমার?

যুধিষ্ঠির নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাসদেবের আদেশে অর্জুন গেল হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্যে। তাকে বিদায় দিতে দ্রৌপদীর ভীষণ কষ্ট হল। মনে হল, বক্ষপিঞ্জর ছেড়ে প্রাণপাখি যেন উড়ে গেল আকাশে। অর্জুন কাছে থাকতে যা বুঝতে পারেনি, তাকে বিদায় দিতে গিয়ে অনুভব করল সে কত আপনার। কত কাছের মানুষ। কি গভীর অন্তরের সম্পর্ক তার সঙ্গে। আজ যেমন অনুভব করল, আগে কখনও তা করেনি। তবু শঙ্কিত ভাবনায়, বিরহ যন্ত্রণায় তার চক্ষু সিক্ত হয়ে এল।

বেদনাময় স্মৃতির ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে দ্রৌপদীর অন্তর। দূরদিগন্তে মিশে যাওয়া সবুজ বনানীর গাঢ় সবুজবর্ণের সমান্তরাল রেখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন ভাবে তন্ময় হয়ে। স্তব্ধ গম্ভীর বনানীর নিঃসঙ্গ জীবনের অব্যক্ত শূন্যতা তাকে আরো বিষণ্ণ করে তোলে। থেকে থেকে একটা গভীর করুণ দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে।

কতকগুলি উৎসুক কৌতূহলিত চোখ তাকে নিরন্তর প্রশ্ন করছে। তাদের বোবা জিজ্ঞাসার কি উত্তর সে নিজেকে দেবে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কেবল স্বার্থের আদর্শের? মতবাদের?— ভালবাসার নয়!! এই ক্ষোভেই তার বুক জ্বলে। মনটাও গেছে শ্মশান হয়ে। অথচ, কেউ তার খোঁজ নিল না। জীবনের এই ফাঁক-ফাঁকির শূন্যতা পরিহাস করে বিধাতার ব্যঙ্গ হাসি সে শুনতে পাচ্ছে নানা সুরে।

তবু, এই সমাজে থাকতে হলে তাকে আপোষ করে চলতে হবে। নিজের মত করে নিজের পথে চলতে পারে—এক সন্ন্যাসী আর এক বীর। অর্জুন সেই বীর। নিজের পথের চলার ক্ষমতা রাখে সে। তার মধ্যে একটা অসাধারণত্ব আছে। নতুন ধরনের আদর্শ আছে। কিন্তু তার পিছনে মনুষ্যত্ব আছে কিনা এ প্রশ্নেব উত্তর অবশ্যই বার করতে হবে তাকে। অর্জুনকে দেখে সেই যে স্বয়ম্বরে মুগ্ধ হয়েছিল সেই মুগ্ধতাই অর্জুনের প্রেমের চৌম্বক আকর্ষণ কি? তার চোখ ধাঁধানো রূপ আর মন-রাঙানো পুরুষত্বের মধ্যে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি, —যার প্রভায় মানুষের জীবন সুন্দর, সার্থক আনন্দময় হয়, সেই সম্পদ কতখানি আছে তার মধ্যে— এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে তার ভেতরটা আবর্তিত হতে লাগল। হঠাৎ মনে হল অর্জুন কোনদিন ভালবাসেনি তাকে! বরং, আকারে ইংগিতে বলেছে পুরুষ চায় একজন সারাক্ষণের সঙ্গী। যে হবে তার একার মনের সঙ্গী। যার মনে থাকবে না অন্য পুরুষের চিন্তা। এই দাবি পূরণের জন্য একের পর এক অন্য নারী বরণ করেছে। উলুপী, চিত্রাঙ্গদা কেউ তাদের পিতৃরাজ্য ছেড়ে অর্জুনের জীবন সঙ্গিনী হয়নি। তার অন্তর শূন্যই রয়ে গেল। তাদের স্মৃতিতে মনকে ভারাক্রান্ত করে অর্জুন জীবনের অপব্যয় করল না। কিন্তু তার শূন্য হৃদয়ের মাঝখানে দ্রৌপদীকে বসাল না। এটাই তার আক্ষেপ। একমাত্র দুঃখ। অর্জুনের মন নিরন্তর আশ্রয় খুঁজছিল। সুভদ্রা তার সেই অবলম্বন। তার ভালবাসার কাছে নিঃশেষে সমর্পণ করল নিজেকে। সে আনন্দ চায়, ভালবাসা চায়, মনের একটি আশ্রয় চায়। সুভদ্রা হল তার সেই সব পেয়েছির দেশ। তার আকাঙ্ক্ষার স্বর্গ। এসব কথা মনের নেপথ্যে অনেককাল ধরে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, যার খবর নিজেও সে জানে না। নির্জন অরণ্যে হঠাৎ সেই

সত্যের মুখোমুখি হল। দ্রৌপদীর অতীতের ধ্যান ধারণা ধাক্কা খেল। একটা চমকানো ব্যথায় তাব বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগল। বঞ্চনার এই দুঃখটা তার অন্তরে আগুন হয়ে জ্বলতে লাগল। এইভাবে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হওয়া যে নিরর্থক অর্জুন তাকে শিখিয়েছে। তবু, অর্জুন সম্পর্কে তার দুর্বলতা কেন?—মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল, একটা কিছুকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে নিজের বঞ্চনাকে জোর করে ভুলে থাকা। নিজের সঙ্গে মানুষের এ এক অদ্ভুত লুকোচুরি। হয়ত এরকম কোন মানসিকতা তাকে অর্জুনের প্রতি মোহগ্রস্ত করেছে। একে মোহই বলবে। নইলে অর্জুন সম্পর্কে এত মন্দকথা কেন মনে হবে তার? নিজেকে আজকাল প্রায়ই প্রশ্ন করে; কী দিয়েছে তাকে অর্জুন? স্ত্রীর কোন্ বাসনা পূরণ করেছে? সে শুধু গ্রহণ করেছে, দেয়নি কিছু।

দিন মাস বছর কেটে যায়।

অর্জুনের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, দ্রৌপদীর মনে। এখন তার মুখ মনে করতে গেলে যুধিষ্ঠির, ভীম-এর মুখখানি সর্বাগ্রে ভেসে ওঠে। অবচেতন মন থেকে যেন উঠে আসে তারা। রোমন্থন করে তাদের যত প্রেম-কথা। নিজের অজান্তে রোমাঞ্চিত হয়। শিহরণ জাগে বুকে।

দিনান্তের রক্ত রবির আভায় বনভূমিতে জেগেছে ঘরমুখো পাখীর কলরব। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দ্রৌপদী তাকাল পশ্চিম দিগন্তে। অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করে সে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল তুলসী মঞ্চে। দূরে কৃষ্ণচূড়ার বনে প্রস্ফুটিত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় জেগেছে জীবনের উচ্ছ্বাস। বাতাসের প্রমত্ত সোহাগে সে অস্থির চঞ্চল।

সহসা পেছন থেকে যুধিষ্ঠির ডাকল : দ্রৌপদী।

দ্রৌপদীকে গায়ের আঁচল ঠিক করতে করতে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা নিবিড় দুটি চোখ মেলে তাকাল যুধিষ্ঠিরের দিকে। চোখে চোখ রেখে যুধিষ্ঠির সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করল: অমন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ? তোমাকে আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক, উদাসীন দেখি। কি হয়েছে তোমার? অর্জুনের একাকীত্বের কথা ভেবে বোধ হয় কষ্ট পাচ্ছ মনে?

যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা আর কৌতুহল এত দ্রুত একসঙ্গে উচ্চারিত হয় যা খুব স্বাভাবিক, সহজ। কিন্তু দ্রৌপদী তার প্রশ্নে বিব্রত করে। তবু সহজ স্বাভাবিকভাবে বলল ঃ আজকাল তোমরা দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। অনুশোচনার বুক ফেটে যায়। নিজের জ্বালায় যত জ্বলেছি ততই তোমাকে আঘাত করেছি নির্মমভাবে। তোমার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই।

দ্রৌপদীর বক্তব্য এতই অপ্রত্যাশিত যে যুধিষ্ঠির তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। সমবেদনা অভিব্যক্তি অনিবার্যভাবে জাগল তার অন্তরে। আস্তে আস্তে বললঃ একথা কেন বলছ? ও-সব ভেবে নিজেকে কষ্ট দাও কেন?

দ্রৌপদীর অপলক চোখে জিজ্ঞাসা জেগে থাকে। বলল ঃ বিশ্বাস কর, আমি যা করি নিজেও সব সময় বুঝি না। কেন যে এক একটা ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যায় বুঝতে পারি না? আমার ইচ্ছেতে যে হচ্ছে না এটা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তার ঝক্কিটা তবু আমার ওপরেই এসে পড়ছে। আমার মনের এই অসহায় অবস্থাটা বোঝাই কি করে?

যুধিষ্ঠির বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। দ্রৌপদীর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তার নিষ্পাপ চোখের তারায় ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি ঝিলিক দেয়।

॥ নয় ॥

হিমালয়ের বিভিন্নরাজ্যে ঘুরে বহু আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র সংগ্রহ করল অর্জুন। সেই সব অস্ত্র চ্যবন বনের ছোট বড় গিরিগুহায় লুকিয়ে রাখল। গুহামুখগুলি প্রস্তরখণ্ডে আবৃত্ত করল। শমীবৃক্ষকে নিশানা করে তারা পর্যটনে বার হল।

দ্বাদশ বৎসর শেষ হতে আর অল্পকাল বাকী। ঝটিকার মত তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে আত্মগোপনের নিরাপদ জায়গা অন্বেষণ করতে লাগল। বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তারা বিচ্ছিন্নভাবে অরণ্যপথ ধরে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী মৎসরাজ্যে পৌঁছল। মৎসরাজ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা ছিলেন না। তাঁর বাহুবল ছিল নগণ্য। দুর্যোধনও তাঁকে কৃপার চোখে দেখে। পান্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল তাঁর রাজ্য সীমানার কাছে কাটাবে না ভেবে সেখানে কোন গুপ্তচর নিয়োগ করেনি। মৎসরাজ্যে পাণ্ডবদের নিরাপদ আত্মগোপন সম্ভব নয় ভেবেই দুর্যোধন নিশ্চিন্ত ছিল। তার এই অসাবধানতার সুযোগ নিল কৌন্তেয়রা। বিরাটের রাজ অন্তঃপুরে অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিকে নির্বিঘ্ন করার জন্য মহর্ষি ধৌম্য বিরাট রাজের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ কবে তাঁকে রাজী করলেন। লোকচক্ষুর আড়ালে আড়ালে থাকার জন্য বিরাটের অন্তঃপুরে সেবকের ছদ্মবেশে থাকল তারা। বিরাটও তাদের সঙ্গে ভৃত্যের অনুরূপ আচরণ করেন। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজের বয়স্য হয়ে তাঁরা সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করেন। ভীম মহারাজের পাকশালায় রন্ধনক্রিয়াদি করে। অর্জুন নর্ত্তকীবেশে রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেয়, নকুল রাজার অশ্বপালন করে, সহদেব গোরক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকে, দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে মহারানী সুদেষ্ণাব রূপচর্চা করে।

সৈরিন্ধ্রীবেশী দ্রৌপদীর অনুপম রূপরাশি মহারানী সুদেষ্ণার রূপের গর্ব ম্লান করে দিল। তাকে দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না তার। মনে মনে ভাবে, এরকম অত্যাশ্চর্য রূপ কোন মানবীর হয় কি? এ কি কোন যক্ষরমনী? স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী অথবা অপ্সরা? হিমালয় নিবাসী কোন মায়াবী কিন্নর কন্যা নয়ত! সৈরন্ধ্রী নারীর ঈর্ষা। রূপ নয় তার, রূপের আগুন। তাকে গৃহে রাখাও বিপদ। তবু, কেমন যেন এক মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ল সে। বিরাট রাজার দৃষ্টিপথ থেকে সৈরিন্ধ্রীকে সব সময় দূরে দূরে রাখে সুদেষ্ণা। সৈরিন্ধ্রী। তার বুকের কাঁটা।

সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে একদিন অকস্মাৎ তার ভ্রাতা কীচক এল। সৈরিন্ধ্রী। তখন সুদেষ্ণার অঙ্গ বিলোপনে নিযুক্ত। কীচকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৈরিন্ধ্রী তার বসনখানি মুখের ওপর টেনে নিয়ে দ্রুতপ্রস্থান করল। এক ঝলক বিদ্যুতের মত কীচকের দুই চক্ষু সে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। মদন বাণে জর্জরিত হল কীচক। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে গন্তব্যপথের দিকে তাকিয়ে রইল। দুই চোখে তার বিভোর বিহ্বলতা। সুদেষ্ণা ভ্রাতার চিত্ত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হল। তার নির্লজ কামুকতা সুদেষ্ণার মনকে পীড়িত করল। চোখে মুখে তার ধিক্কার ঝলকে উঠল। ভ্রাতার অন্যমনস্ক নিবিষ্টতাকে ভর্ৎসনা করে বলল ছিঃ। ভগিনীর সামনে নির্লজ্জের মত একজন মহিলার জন্য ব্যাকুলতা দেখাতে তোমার সংকোচ হল না?

কীচক কিছুমাত্র বিব্রত হল না। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল: আমি সুন্দরের পূজারী।

সুন্দরটা ওর কোথায়? একটা জ্বলন্ত আগুন।

অরণ্যের দাবাগ্নির মত ভীষণ সুন্দর। মশালের মত শপথের বাণী ঐ নারী।

পতঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় না কীচক।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে কীচক সহজাভাবে জিগ্যেস করল: তোমার দাসীর নাম কি ভগিনী?

অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকাল তার দিকে। অধরে বক্রহাসি। বলল: সৈরিন্ধ্রী। গন্ধর্বেরা তার স্বামী। সৈরিন্ধ্রী বলে, গন্ধর্বেরা নাকি অলক্ষ্যে থেকে সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। কেউ তার অনিষ্ট চিন্তা করলে গন্ধর্বেরা যথাসময়ে তাকে রক্ষা করবে!

হো-হো করে প্রাণ খোলা হাসল কীচক। বলল: ভারী সুন্দর তোমার রূপকথার গল্প। সৈরিন্ধ্রীর ধোঁকায় আমি ভুলছি না। ওই রত্নটি আমার চাই। বিরাট সেনাপতি কীচককে অবশ্যই তোমাকে ওই রত্ন উপহার দিতে হবে ভগিনী।

কীচক, তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর। সৈরন্ধ্রী সত্যি গন্ধর্বদের স্ত্রী। বিশেষ সঙ্কটে পড়ে সে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করছে।

কীচক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুদেষ্ণার মুখের দিকে। হঠাৎ, গম্ভীর হল সে। চোখ স্থির। দৃষ্টিতে সন্দেহ। ভুরু কুঞ্চিত। চিন্তার রেখা ললাটে। সত্তার গভীরে ডুব দিয়ে সে যেন ব্যাকুল হয়ে কি অন্বেষণ করতে লাগল। আপন মনে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলঃ সৈ-রি-ন্ধ্রী-ই গন্-ধর্ব-দের স্ত্রী।

ওর অর্থ কি? একজনের নয়, কয়েকজনের ভার্যা সে। সং-ক-টে-এ পড়ে-এ। এসব কথার কি অর্থ? এরা কারা? তবে কি?

সুদেষ্ণা কীচকের দুর্বোধ্য কথা শোনে এবং খানিকটা অসহায় চোখে তাকায়। কীচকের স্থির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় গভীর মনোযোগ দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করছে। রহস্যের গভীরে কি যেন অন্বেষণ করে ফিরছে। পলকে একটা জিজ্ঞাসা মনের ভেতর জেগে ওঠে। ভ্রূকুটি বিস্ময়ে জিগ্যেস করে: কী ভাবছ? বিড় বিড় করে কি বলছ?

কীচক ঝটিতে সংবিত ফিরে পায়। মনের ভাব গোপন করে জিগ্যেস করল: এদের আর কোন পরিচয় জান ভগিনী?

কীচকের কৌতূহলিত প্রশ্নে বিব্রত হয় সুদেষ্ণা। সৈরিন্ধ্রীর অনিষ্ট আশঙ্কায় বুকের মধ্যে তার কেমন করে। কষ্ট এবং শঙ্কা যুগপৎ সুদেষ্ণার মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু সেজন্য রাগ, ঘৃণা, বা ধিক্কারের কোন ছাপ তার মুখে নেই। ভেসে ওঠা আয়ত চোখে নেই কোন কৌতুহল। সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে তার স্পর্শ-কাতর মনের দৃঢ়তা অভিব্যক্ত হল। বলল: এক সময় পাঞ্চাল নন্দিনী দ্রৌপদীর কেশসংস্কার করত, তার বেশ বিন্যাস করে দিত। যুধিষ্ঠিব রাজ্যচ্যুত হলে সৈরিন্ধ্রীও কর্মচ্যুত হয়। তখন কৃষ্ণ প্রিয়তম সত্যভামা এবং রুক্মিণীর পরিচারিকারূপে কাজ করত। কিন্তু তার ঐ মনভোলানো রূপের আকর্ষণে সে যখন কৃষ্ণ প্রেমে মজল তখন তাকে বিদায় নিতে হল। এখন আমার দাসী। কিন্তু তোমার নজর যখন পড়েছে তখন ওর আর মুক্তি নেই। এবার আমিই তাড়াব ওকে। বেচারা সৈরিন্ধ্রী।

চুক্ চুক্ করে মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করল কীচক। অবাক বিস্ময়ে বলল: ইস্। অমন রত্ন পেলে আমি মাথায় করে রাখব। গলার হার করে পরব। চোখের মণি করে দেখব। তোমার সৈরিন্ধ্রীকে আমায় দাও। আমি তাকে মহিষী করব।

সুদেষ্ণা হতভম্বের মত কীচকের দিকে তাকায়। চোখে ভ্রূকুটি। মুখে বিরক্ত। ক্রোধে মুখমণ্ডল কঠিন হল। বিতৃষ্ণা, ঘৃণা—ধিক্কারে রূপান্তরিত হয়। কণ্ঠস্বর তার তীক্ষ্ণ হয়।—ছিঃ! এত অধঃপতন হয়েছে তোমার! পরস্ত্রীতেও লোভ! আমার বীর ভ্রাতার গর্ব ধুলিসাৎ করলে তুমি। তোমাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমার নেই। কথা বলতেও ঘেন্না করছে।

মেঘমন্দ্র স্বরে কীচক চীৎকার করে উঠল তার কথার মধ্যস্থলে: ভগিনী সুদেষ্ণা। কীচকের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, সে সীমা লঙ্ঘন করলে ফলভোগ করতে হবে তোমাকেও।

বাধা পেয়ে সুদেষ্ণার দুই চোখ জ্বলে উঠল। কণ্ঠস্বর রূঢ় হল। গলায় তার সৈরিন্ধ্রীর প্রতি সমবেদনা। বলল: ভ্রাতা, তোমার'তো ভার্যা আছে। তার প্রতি যদি গন্ধর্বদের কুদৃষ্টি পড়ে তা-হলে তার অবস্থা কি হত? তোমার স্ত্রীর মনে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হত, অনুরূপ কষ্ট শঙ্কা সৈরিন্ধ্রীরও হবে। একথা মনে রেখে তোমারও উচিত অন্যের স্ত্রীকে যথোচিত মর্যাদা ও সম্মান দেয়া। স্ত্রীর সতীত্ব, আনুগত্য প্রত্যেক স্বামী চায়। তুমি কেন দস্যুবৃত্তি করে সৈরিন্ধ্রীকে অপরাধী করবে? সৈরিন্ধ্রীকে অনাথ মনে করে তাকে নিয়ে যা খুশি করার চিন্তা বর্বরতা।

কীচক কোন কথা বলে না। তার কালো চোখের তারায় অপলক দৃষ্টি এমনই নিষ্ঠুর এবং ক্রুর যে তা কথার চেয়ে বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ এবং বাঙ্ময়। সুদেষ্ণার সব কথা হঠাৎ থমকে যায়। কীচকের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় অনুভব করে ক্রোধের উত্তাপ। তার শক্ত মুখের রেখায় ক্রোধের ভয়ংকর অভিব্যক্তি। কীচককে কুপিত রাখার অর্থ মৎসরাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদ সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা। বিরাটরাজের নিজের বাহুবল কিছু নেই। কীচকের বিশাল সৈন্যবাহিনী তাঁর ভরসা। মৎস্যরাজ্যের সেনাপতি সে। শাসনকার্যও চলে তার প্রতাপে। বিরাট নামমাত্র রাজা। কীচক অসন্তুষ্ট হলে মৎস্যরাজ্যে সমূহ ক্ষতি হবে। কি দরকার কীচকের মত লোভী, স্বার্থপর, কুচক্রী, প্রতিহিংসাপরায়ণ একজন মানুষকে চটানো? সৈরিন্ধ্রী কে? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে? সামান্য একজন পরিচারিকা বৈ' তো কিছু নয়? তার জন্যে মৎস্যরাজ্যের বিপদ ডেকে আনবে কেন? সৈরিন্ধ্রীর মত কত রমণী প্রতিদিন পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে? তাদের কারো জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়নি কখনও। সৈরন্ধ্রীর জন্যে মন উতলা হবে

কেন? কীচককে সৈরিন্ধ্রীর চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। তার ওপর একটা রাজ্যের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা নির্ভর করছে। সুতরাং, কীচক কুপিত হলে মৎসরাজ্যের সর্বনাশ অনিবার্য। কীচকের স্বভাবের কথা ভেবে সুদেষ্ণা দিশেহারা হয়ে পড়ল। সঙ্কটটা বুঝতে পেরে সুদেষ্ণা নিজের আবেগ এবং ক্ষোভ সংযত করল। দরদ আর সহানুভূতি মেশানো কণ্ঠে বলল: তুমি আমার ভাই। তোমার মঙ্গল চাই। কারো চোখের জলে তোমার অকল্যাণ হলে সইতে পারব না বলে, মনের প্রতিক্রিয়া তোমাকে জানালাম। সৈরিন্ধ্রীর ভয়ঙ্কর গন্ধর্ব স্বামীদের কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন। তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। পাপ এবং শাপের ভয়ে আমার চিত্ত অস্থির।

কীচক সুদেষ্ণার ব্যাকুল কৈফিয়তের কোন জবাব দিল না। শুধু হাসল ঠোঁট উল্টে।

সুদেষ্ণা কনিষ্ঠ সহোদরের চোখে চোখ রেখে বলল: ভ্রাতা, প্রণয়ে কোন অপরাধ নেই। দেহের আকর্ষণে নয়, হৃদয়ের বন্ধনে বাঁধ তাকে। তার ইচ্ছায় চললে গন্ধর্ব স্বামীরা আর তোমাকে অপরাধী করতে পারবে না। সৈরিন্ধ্রী স্বেচ্ছায় তোমাকে বরণ করে এমন কিছু কাজ কর তুমি।

কীচকের চোখে মুখে এক পলকের জন্য রঙের ছটা খেলে গেল। খুশি হয়ে প্রশ্ন করলঃ কোন উপায়ে?

সুদেষ্ণা বিব্রত বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় তার দৃষ্টি স্থির। চোখে চোখে রাখল। দুরন্ত আক্ষেপের তার ঠোঁট দুটো কয়েকবার কেঁপে উঠল। বিরূপ কীচকের মন গলানোর প্রয়াসে কষ্টের মধ্যে কথাগুলো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলঃ তোমার আত্মতুষ্টির জন্যে তাকে তোমার কক্ষে সুরা সংগ্রহের জন্যে পাঠাব। তখন, তাকে পরিতুষ্ট করার সুযোগ পাবে তুমি।

সুদেষ্ণার গলায় ক্ষীণ একটা অপ্রস্তুত লজ্জা জড়ানো হাসির শব্দ শোনা যায়। কীচকের মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত একটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। অমনি সৈরিন্ধ্রীর শরীরী স্পর্শ তার অনুভূতির মধ্যে শিহরণ জাগায়।

কীচকের সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীর মেলামেশার সুযোগ করে দেবার জন্যে সুদেষ্ণা তাকে রূপচর্চার প্রসাধন কক্ষে সুরা আনার জন্যে পাঠাল।

সুদেষ্ণার কথা অনুসারে কীচক সেখানে গোপনে অবস্থান করছিল। সৈরিন্ধ্রী প্রবেশ করার পরেই কীচক তার অজ্ঞাতে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল। স্বর্ণকুম্ভ সংগ্রহ করে দ্রৌপদী যখন প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হল তখন দেখল, কৃতান্তের মত দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে আছে কীচক। বিস্ময়ে হতভম্ব হল সে। মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ, ভয়ে বুকের রক্ত হিম হল। হাত থেকে সুরার স্বর্ণপাত্র মেঝেয় পড়ে ঝন্ ঝন্ করে করুণ সুরে বেজে উঠল। কক্ষের দেয়াল গাত্রে প্রতিহত হয়ে আর্তনাদের মত শোনাল। ভয় ও শঙ্কা জড়িত অসহায় দৃষ্টিতে সে কীচকের দিকে তাকিয়ে রইল।

মুগ্ধ চোখে কীচক অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। আঁখিতে তার মদির বিহ্বলতা। স্নিগ্ধ হাসিতে বিগলিত ভাব। সুমধুর স্বরে বলল: সৈরিন্ধ্রী! ভীত হয়ো না। আমি কীচক। বিরাট রাজার শ্যালক। মৎস্যরাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার প্রণয়প্রার্থী। আমাকে করুণা করে কৃপা কর তুমি।

ক্রোধে ঘৃণায় সৈরিন্ধ্রীর বুকের মধ্যে রি-রি করে উঠল। তবু, নিজেকে সংযত করে যথাসম্ভব স্থির শান্ত কণ্ঠে বলল: মহামান্য কীচক, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। রমণীর প্রসাধন গৃহ প্রেম নিবেদনের যোগ্য স্থান নয়। আপনার মত বীরেব প্রণয় জ্ঞাপন উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশেই মানায়।

তোমার সন্ধানে প্রাসাদে কাননে দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করে এখানে এসেছি। তোমার নির্জন সান্নিধ্য লাভই আমার একান্ত কাম্য। নিজেকে নিবেদন করব বলেই এসেছি।

জড়তা কাটিয়ে সৈরিন্ধ্রী সহজ এবং স্বাভাবিক হল। অধরের হাসি বঙ্কিম হল। ভুরু কুঞ্চিত করে বলল: কিন্তু সেজন্য কক্ষের দ্বার বন্ধনের প্রয়োজন ছিল কি।

কীচক জবাব দিতে পারে না। সৈরিন্ধ্রীর শরীরের দিকে তাকায়। নীল রঙের রেশমের শাড়ির লাল পাড়ের নিচে লাল রঙে রাঙানো দুটি পা, কালো চুলের মাঝে আগুনের মত টকটকে লাল সিঁদুর। ক্ষণিকের জন্য তার মনকে বিরূপ বিস্ময়ে তোলপাড় করল। মনে হল, সৈরিন্ধ্রী যেন অনেক দূরে, পৃথিবীর বাইরে, দূরগ্রহের কোন অধিবাসিনী। তথাপি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করল।

মুখে প্রসন্ন হাসি, দৃষ্টিতে বিব্রত ভাব। বলল: দ্বার বন্ধ থাকলে আমাদের আলাপে কেউ ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

সৈরন্ধ্রীর নিঃশ্বাস পড়ে। জিগ্যেস করে: কেন?

তুমি বোঝ না, কেন?

সৈরিন্ধ্রীর ঘন বুকে নম্র নিঃশ্বাসে ফুলে ওঠে। বুকের ভয় এবং উদ্বেগে চোখের চাহনিতে নিবিড় হয়। বলল: তস্করের মত ভীরু প্রণয় নিবেদন করে রমণীর মন পাওয়া যায় না মহামান্য কীচক। রূপকথার রাজপুত্রের মত বিপদ বাধা তুচ্ছ করে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যে আসে সব নারী তাকেই কামনা করে। আকাঙ্ক্ষা ধন সে। তার প্রতীক্ষা শেষ হয় না কোনদিন। তাই, তাকে দেখামাত্র বুকে জাগে ঝর্ণার কল্লোল, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, প্রভঞ্জনের উন্মত্ততা। ভয়, বাধা তুচ্ছ হয়ে যায় মনে। নবীন সাথীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে তখন আর কোন দ্বিধা, সংশয় থাকে না মনে। কিন্তু আপনাকে এভাবে দেখে আমার চিত্ত জাগছে কৈ? হৃৎস্পন্দন হচ্ছে না কেন?

কীচকের চোখে হতাশার ছায়া করুণ হল। মিনতি করে বলল: সৈরিন্ধ্রী আমাকে শাসন কর, কিন্তু অবজ্ঞা কর না। আমার অসংস্কৃত অমার্জিত ব্যবহারের জন্য লজ্জিত আমি। কিন্তু, নির্জন কক্ষে তোমার সাহচর্যে আনন্দ উপভোগের বাসনা নিয়েই এসেছি।

কক্ষের বাইরেও সে সাহচর্য এবং সঙ্গসুখ লাভ করা যায় মহামান্য কীচক।

কীচক অপ্রস্তুত এবং বিব্রতবোধ করল। অসহায়ভাবে বলল: আমার চোখের ইঙ্গিতে, মুখের ভাষায়, হাসির আভাসে যে কথা বলতে চাই, সে কি তোমার কাছে খুবই দুর্বোধ্য?

সৈরিন্ধ্রী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তার শঙ্কা ও উদ্বেগ গোপন করল। মুক্তির প্রয়াসে কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম বিগলিত প্রসন্ন ভাব ফুটিয়ে তুলল। বলল: চলুন, মহারাণী সুদেষ্ণা কক্ষে যাই।

হঠাৎ কীচকের মুখের ভাব বদলে গেল। চোখে দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিল। ভুরু কুঁচকে গেল। দৃষ্টি প্রখর হল। চকিতে কণ্ঠস্বর গম্ভীর হল। বলল: আমি দুঃখিত দ্রৌপদী। তোমাকে আমি এখানে সম্পূর্ণ একা পেতে চাই।

সৈরিন্ধ্রী চমকে উঠল ক্ষণিকের জন্য। ভয়ে বিবর্ণ তার মুখ। বিব্রত বিস্ময়ে শশব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল: দ্রৌপদী! কে দ্রৌপদী! আমি সৈরন্ধ্রী। এককালে মহারাণী দ্রৌপদীর দাসী ছিলাম। আমার স্বামী হল গন্ধর্বেরা।

আমি জানি তুমি পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী। পঞ্চপাণ্ডব বিরাটের রাজ-অন্তঃপুরেই তোমার স্বামীরা সেবকের ছদ্মবেশে আছে।

দ্রৌপদী মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ করল। আমি গন্ধর্বদের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী! স্বামীরা অলক্ষ্যে আমাকে অনুসরণ করে।

মিছে কথা! তুমি দ্রৌপদী। তোমার গাত্রবর্ণ, তোমার পদ্মপলাশ লোচন, তোমার দীপ্ত নারীত্ব, মুখের কান্তি, কমনীয় তনু, কি দিয়ে ঢাকবে সুন্দরী? ছলনার দিন শেষ হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের দিন শেষ হতে বাকি মাত্র পঞ্চদশ দিন। দুর্যোধন আমার প্রিয় সখা। শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমি বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি। এখন স্থির কর—কি করবে? আমার মনোবাসনা পূরণ করবে, না আবার দ্বাদশবৎসর বনবাস নেবে? কি-হে সুন্দরী! তোমার মুখখানা অমন মলিন হল কেন? ভয় পেয়েছ? চমকে উঠলে যে?

দ্রৌপদী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অসহায় বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে কেমন আচ্ছন্নতা। কপালে, নাকে, চিবুকে, বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিপদের উৎকণ্ঠায় সে বিব্রত, বিহ্বল। কথা বলার মত শক্তি পর্যন্ত তার নেই। থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে কেবল মনে হতে লাগল, কীচককে কথা দিয়ে ভোলানো যাবে না। কিন্তু এখন সে কি করবে? তীব্র ঘৃণায় বুকের ভেতর এক নতুন প্রত্যয়ে শক্ত হয়ে ওঠে। এক পা এক পা করে কীচকের ছায়াকে পদদলিত করে সে দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে বলল: নির্জনতা আর অন্ধকার মানুষকে শুধু পাপে উৎসাহিত করে। মানুষের ভেতরেব জানোয়ারটাকে ক্ষুধিত করে তোলে। আমাকে একা পেয়ে যা খুশি অপমান করার অধিকার আপনার

আছে। বলবীর্যহীন নারী আমি।

সহসা তার দক্ষিণ স্কন্ধে বাম হস্ত স্থাপন করে কীচক তাকে আকর্ষণের চেষ্টা করলে, দ্রৌপদী বিদ্যুৎগতিতে তার হাতখানা প্রাণপণে কামড়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দ্বার খুলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। আর্তরবে ডাকতে লাগল: মহারাণী সুদেষ্ণা। মহারাণী সুদেষ্ণা।

দ্রৌপদীর গোপন সংকেত পেয়ে পঞ্চপাণ্ডব যথাকালে তার সঙ্গে গুপ্তস্থানে মিলিত হল। সকলের মুখে দুর্ভাবনা এবং কষ্ট। মাথা হেঁট করে বসেছিল তারা। প্রত্যেকেই কথা খুঁজছিল, না নির্দেশের অপেক্ষা করছিল; কিছু বোঝা গেল না। যুধিষ্ঠির কোন দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে চোখ করে বুকে দু'বাহু সাপটে জড়িয়ে অস্থির ভাবে পদচারণা করছিল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল তার। ভুরু কুঞ্চিত হল। আয়ত চোখের তারায় বিব্রত অসহায় ভাব।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদীর দিকে স্থির চোখে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই ভাল করে দেখা গেল না। কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চাঁদের আলোয় সবই অস্পষ্ট। এমন কি মুখের অভিব্যক্তিও। যুধিষ্ঠির সহসা কথা বলল। তার কণ্ঠস্বরে নেই উত্তেজনা, কিংবা কোন উষ্মা। সে যেন একটা আহত চিহ্ন। ভয়ে আড়ষ্ট। তার বেদনা জর্জরিত মুখখানি অসহায় এবং করুণ দেখায়। তার উৎসুক দৃষ্টি যে দ্রৌপদীর মুখের উপর নিবদ্ধ তার কথা থেকেই তা বোঝা গেল।

যুধিষ্ঠির বলল: প্রিয়তম, তোমার মনোবেদনা আমি জানি। কিন্তু কি করলে আমাদের সকলের ভাল হয়, সকল দিক রক্ষা পায় কিছু ভেবে পাচ্ছি না। কীচকের কাছে আমাদের ছদ্মবেশ গোপন নেই। এই মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা করে এগোতে হবে। উত্তেজনা কিংবা ক্রোধ প্রকাশের সময় নয় এখন। পারাবার পার হয়ে গোষ্পদে ডুবে মরার মতই বিড়ম্বনাকর দুঃখজনক আমাদের অবস্থা। অজ্ঞাতবাসের বাকি আর পক্ষক কাল। এ অবস্থায় সহিষ্ণুতা, সংযম এবং বুদ্ধি হবে সংকট উত্তরণের পথ।

দ্রৌপদী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। যুধিষ্ঠিরের কথার কোন জবাব হয় না। তাই নিরুত্তর থাকল সে। বুকের ভেতরটা রাগে ক্ষোভে ঘৃণায় জ্বলতে থাকল। মনের মধ্যে তার আকুল জিজ্ঞাসা; বিধাতা কেন নারীকে দিল না পুরুষের শক্তি, স্বাধীনতা, ক্ষমতা? কেন তাদের পরমুখাপেক্ষী দুর্বল করে রাখল? কি দোষ তারা করেছিল? পরনির্ভরশীল হওয়ার আত্মগ্লানিতে, হৃদয় মন পুড়ে যেতে লাগল। নারীর বড় শত্রু তার দেহ। সমাজ, সভ্যতা, প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার গোঁড়ামি সব মিলিয়ে নারীর দেহ-মনের বিরোধ এমনই জটিল যে তা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ নেই আর। অতিরিক্ত দেহ-সচেতনতাই নারীর আত্মগ্লানি এবং দুঃখ ভোগেব কারণ। নারী-ব্যক্তিত্বের অক্ষম অসহায়তা এ বোধকে আরো তীব্র করেছে। ব্যক্তিত্বের আত্মঘোষণা পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘিনীর অর্থহীন গর্জনের মত শোনায়। তবু অসহিষ্ণু প্রতিবাদ তাকে আত্মহারা করল।

দ্রৌপদীর কণ্ঠে ধিক্কার সোচ্চার হল।—ছিঃ, আমার কি কানাকড়ি মূল্য নেই তোমাদের কাছে? আমি কি শুধুই একটা খেলার পুতুল? আমাকে নিয়ে যা খুশি করার স্বাধীনতা তোমরা কোথা থেকে পেলে? আমার মন বলে কি কোন পদার্থ নেই? কীচকের বর্বরতার প্রতিবিধান স্বামী হয়ে তোমরা কি করলে?

যুধিষ্ঠির ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় ডাকল: দ্রৌপদী!

কষ্টবিদ্ধ ব্যথায় উৎকণ্ঠায় অপমানে দ্রৌপদীর ভুরু কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রবলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল: না, না, এ খেলা আর পারছি না। আমার দেহমন ক্লান্ত। তোমরা আমায় মুক্তি দাও।

দ্রৌপদীর দিকে এক আবেগ তীব্র জিজ্ঞাসায় তাকিয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে যুধিষ্ঠির বলল: দ্রৌপদী ভেঙে পড়লে তো হবে না। মনকে শক্ত করে আরো কিছুদিন এ বিশ্রী খেলা কীচকের সঙ্গে করতে হবে তোমাকে। তারপর, অজ্ঞাতবাসের দিন উত্তীর্ণ হলে দুর্বৃত্ত কীচককে হত্যা করে আমরা আত্মপ্রকাশের শুভমুহূর্ত ঘোষণা করব। ক্রোধ অভিমান ত্যাগ করে ছলনায় ভুলিয়ে রাখ তাকে। পাণ্ডবের স্বার্থে

এটুকু করতে হবে তোমায়।

কেন?

এই মুহূর্তে কীচক নিহত হলে আমাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। মৎস্যরাজ বিরাটও দুর্যোধনের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের কথায় দ্রৌপদী মুহূর্তে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ভাব এবং চোখে বিস্মিত জিজ্ঞাসা। আর্তস্বরে বলল: তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমায় কি ভাব তুমি? আমি কি একটা দেহযন্ত্র?

বুকের কাছে নিঃশ্বাস আটকে গিয়ে হঠাৎ যেন একটা তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে সে, যা একটা ব্যথার মত সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্রৌপদীর থমথমে করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে ভীমের কষ্ট হল। সহানুভূতিতে তার বুক কলকলিয়ে উঠল। অসহিষ্ণু হয়ে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে বলল: ধর্মরাজ, পাঞ্চালী কীচকের লাঞ্ছিত। পাণ্ডবের স্বার্থে তার নির্যাতনের দুঃখকে আর বাড়ানো উচিত না। পাঞ্চালী তার লাঞ্ছনার কাহিনী আমায় শুনিয়েছে। কীচক যে হাতে পাঞ্চালীর বুক স্পর্শ করেছে আমি সে হাত গুঁড়িয়ে দেব। আমাকে শুধু আদেশ কর।

ভীম! যুধিষ্ঠিরের আর্তস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল!

ধর্মরাজ, পাঞ্চালী আমার শরণাগত। তার দুঃখ আমি দূর করব।

আমাদের এখন সংকটের সময়।

কীচকের নির্যাতনের স্পর্ধাকে বাড়তে দেয় উচিত নয়। দুর্যোধনের বন্ধু সে। তাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। ক্ষতির আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা পুরুষের ধর্ম নয়। উদ্যোগেই সৌভাগ্যের মূল।

সহদেব বলল: শত্রুকে হত্যা করা শাস্ত্রীয় বিধি।

ভীম সে কথা লুফে নিয়ে বলল: মহারাজ আমি তাকে কৌশলে যমালয়ে পাঠাব।

ভীম! বিপদের সময় মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়। কীচকের মত প্রভাবশালী ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হলে আমরা বিপদে পড়ব।

ধর্মরাজ রাজ-অন্তঃপুরের সকলে জানে সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব-স্বামীরা অষ্টপ্রহর তাকে অলক্ষ্যে পাহারা দিচ্ছে। গন্ধর্ব সম্বন্ধে সাধারণের অতিলৌকিক ধারণা এবং বিশ্বাসকে আমি আত্মগোপন কৌশল করে তুলব।

বৃকোদর—

যুধিষ্ঠিরের অর্ধ সমাপ্ত কথার মধ্যে গর্জন করে উঠল দ্রৌপদী। রাগে, ঘৃণায় তার দুই চোখ জ্বলতে লাগল। উষ্মা জড়ানো গলায় বলল: বৃকোদর কি পাণ্ডবদের বাইরে? পাণ্ডবদের ভাল-মন্দ তোমার চেয়ে কি কম বোঝে সে? পাণ্ডবদের স্বার্থ তুমি ছাড়া অন্য ভাইরা চিন্তা করে না, কিংবা ভাল বোঝে না—এ ধারণা তোমার হল কেন? এত অহংকার কিসে তোমার? পাণ্ডবদের ভাল তুমি কী করেছ? তোমার কৃতকর্মের জন্যে সহদেব গোপালক, নকুল অশ্বপালক, বৃকোদর পাচক, শ্মশ্রু-গুম্ফহীন অর্জুন নারী বেশ ধারণা করে নৃপুংসক সেজেছে। ক্রীতদাসের মত জীবন-যাপন করছে। তোমার দ্যূতাসক্তিই এর কারণ। তুমি করুণারও অযোগ্য। তবু ভ্রাতৃবৎসল ভাইরা তোমাকে মান্য করে। তোমার আদেশ-নির্দেশ শোনে। কিন্তু তুমি তাদের কোন কথায় সম্মান রাখ না। এমন কি মানুষের গৌরব নিয়ে বাঁচার মর্যাদাবোধও স্বার্থরক্ষার তাগিদে ভুলে গেছ। স্বার্থ ছাড়া তুমি কিছু বোঝ না। স্বার্থের জন্য আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয়াকে আমি ঘৃণা করি। পশুর মত বাঁচার জন্য মানুষ জন্মায়নি। কিন্তু, তুমি নিবীর্যের মত সুযোগের প্রতীক্ষায় থাক। স্বার্থের জন্য নিজের পত্নীকে অন্য পুরুষের কক্ষে পাঠিয়ে তার মনোরঞ্জন শিক্ষা দাও। আশ্চর্য তোমার নীতিবোধ। চোখের ওপর পত্নীর নির্যাতন লাঞ্ছনা দেখেও তোমার পুরুষ চিত্ত চঞ্চল হয় না। পুরুষের কলঙ্ক তুমি। আসলে তুমি ভীষণ লোভী। স্বার্থপর। নিজেকে ছাড়া তুমি কাউকে ভালবাস না। ভাই-বন্ধু ভার্যা কেউ তোমার

স্বার্থের চেয়ে আপন নয়।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে থামল দ্রৌপদী। উদগত অশ্রু গোপন করতে গিয়ে একটা অস্ফুট আর্তস্বরে গোঙানির মত তার গলা দিয়ে বার হল। পঞ্চপাণ্ডব হতভম্বের মত অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। সকলের মুখেই একটা চকিত পরিবর্তন হয়। যুধিষ্ঠিরের মনে হল; দ্রৌপদীর সমস্ত জীবনটা যেন ব্যর্থ করে দিয়েছে। সে অনুতাপে অনুশোচনায় তার চোখে ছলছলিয়ে উঠল। কিন্তু অন্ধকারে, কেউ তা দেখতে পেল না। দ্রৌপদীর চোখেও অশ্রুর ঢল নামল।

চুপ করে অনেকক্ষণ কাটল। কেউ কোন কথা বলল না। যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলে গাত্রোত্থান করল। ভীম কেবল দূরের একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর হাঁটুর মধ্যে মুখ খুঁজে চুপ করে বসে রইল।

ভীম সরে যেতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কাছে সরে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল। অপরাধীর মত কাঁচু-মাচু মুখকরে বিব্রত স্বরে বললঃ দ্রৌপদী তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার লজ্জা করছে। হাজার অপরাধ করেছি আমি। কিন্তু সে কি নিজের জন্য শুধু? দ্যূতসক্তির জন্য ভাইদের কাছেও অপরাধী আমি। তাই, যা হারিয়েছি তাদের হাতে তা ফিরিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। অনুশোচনায় আমি জ্বলছি। কিন্তু তোমার মনের আগুনে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দগ্ধ হয়। আমার জীবনের একটি লোভকে তুমি কোনদিন ক্ষমা করলে না? আমাকে সহজভাবে স্বামী বলে মেনে নিলে না। এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

দ্রৌপদীর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললঃ সহজভাবে আমি তোমার জীবনে আসিনি বলেই—

কথা শেষ হওয়ার আগেই যুধিষ্ঠির বলল: আমি কি একা দায়ী সেজন্য? তবু, সব দোষ আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ তুমি। সকলের দাবি মেটাতে গিয়ে আমাকে পুড়ে পুড়ে ছাই হয় যেতে হচ্ছে। কেন, কেন? এভাবে আমি তোমার কাছে চির অপরাধী হয়ে থাকব কেন, তুমি আমায় প্রতিমুহূর্ত ভয় দেখাও? তোমার ঐ কঠিন সত্তাটাই আমার কাছে তোমাকে রহস্যময়ী করে রেখেছে! ওর আকর্ষণ আমি কিছুতে ত্যাগ করতে পারি না, মন চায় তোমার সব কিছু গ্রাস করতে।

নিয়েছ-তো সবই। বাকি কি আছে আর? শুধু একটা লজ্জা। তাও সহ্য হয়নি তোমার। কীচকের কাছে বিসর্জন দিতে বলছ।

দ্রৌপদীর কথার মধ্যে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলঃ দ্রৌপদী!

নারীর শেষ সম্বলটুকুও তুমি হরণ করতে উদ্যত।

তোমার মন-প্রাণ-অনুভূতি কি কিছুই নেই? সত্যি, তুমি বহ্নিকন্যা। তুমি নিজেও জ্বলছ, অন্যকেও জ্বালাচ্ছ।

তোমার মনটা ছোট বলে এর চাইতে আমার সম্পর্কে উঁচু ধারণা তোমার আসে না।

আসবে কোথা থেকে বল? স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কও তোমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে।

দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে তীক্ষ্ণ হল। বলল: মিথ্যের আড়ালে অনেক সত্য থাকে প্রিয়তম! লোকে তা দেখতে পায় না। দেখলেও স্বীকার করে না।

যুধিষ্ঠির কুপিত স্বরে প্রশ্ন করল: তুমি কি বলতে চাইছ, স্পষ্ট করে বল।

ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে পড়েছিল দ্রৌপদীর মুখে। আলো-আঁধারের অস্পষ্ট আলোয় দ্রৌপদীর দুই চোখের চাহনি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করছিল। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল: দেহের লাঞ্ছনার চেয়ে আত্মার অপমান আমাকে পুড়িয়ে মারে বেশি। তোমার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই বলে আমি কোনদিন তোমার কাছে নারীর মর্যাদা পাইনি, আমাকে প্রবৃত্তির তাড়নায় গ্রহণ করেছ তুমি।

লজ্জায় অপমানে যুধিষ্ঠিরের ভুরু কুঁচকে যায়। উত্তর দেবার সময় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। ধরা গলায় বলল: এ ধরনের কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুতে পারে আমি ভাবতেও পারি না। বিশ্বাস কর, আমি তোমায় ভীষণ ভালবাসি।

দ্রৌপদীর কণ্ঠে যুগপৎ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেল। যুধিষ্ঠিরের বিবেককে খোঁচা দেবার

জন্যে সে ইচ্ছা করে নির্বিকার ভাবে বলল: আমি তোমার তেষ্টা মেটানো জল।

দ্রৌপদীর রূঢ় বাক্য, নিষ্ঠুর আচরণ যুধিষ্ঠিরের ভেতরটা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আর্তকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: দ্রৌপদী—

দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বরে তখনও অবুঝ ক্রোধের অভিব্যক্তি। অস্বীকাব করতে পাব? লালসাকে ভালবাসা বল তুমি?

বিস্ময়ের সুরে উচ্চারণ করল যুধিষ্ঠির। ভুরু কুঁচকে গেল তার। বললঃ লালসা!

হ্যাঁ, আমার দেহের লালসা তোমাকে উন্মাদ করেছে!

যুধিষ্ঠিরের চোখে বিরক্তি আর বিস্ময় ফুটে উঠল। উদগত নিঃশ্বাস বুকে চেপে বললঃ ছিঃ, তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ বলে এত নির্মম, নিষ্ঠুর হতে তোমাব কষ্ট হচ্ছে না। যে মাটির ওপর আমরা নির্ভয়ে পা রেখেছিলাম, সেখানে হঠাৎ পা রাখার জাযগা হল না বলে তোমার আসল রূপটা বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা সকলে ভাগ্যের অধীন। ভাগ্যের স্রোতে ভেসে চলেছি। কিন্তু আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ ভাবে বাঁচা যায় না। তোমার কথাই ঠিক— আত্মাকে মেরে ফেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। সে বাঁচায় আনন্দ নেই। পাথর চাপা কুনো ব্যাঙের জড়ত্ব যে জীবন নয়, এই উপলব্ধিটা হতে এত দেরি হল কেন ভেবে পাই না। তবে, অনুভব করতে পারি একটা অদেখা চোরা স্রোতে যদি আতঙ্কে তলিয়ে যাই, তা-হলে কি হবে? এই ভেবে চুপ করে থাকি। মেনে নিই সব নিন্দা এবং অভিযোগ। কিন্তু একে আমার দুর্বলতা বলে ভাবতে পারি না। জীবন-যন্ত্রণাকে সহ্য করে আমি জীবনকে জয় করতে চাই। কিন্তু দস্যুবৃত্তি করে রাতারাতি জীবনের জ্বালা থেকে রেহাই পেতে চাই না। আমি সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার পরিণামকে দেখি। শেষ আঘাত হানবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করি। আমি পলাতক নই, ভীরুও নই। আমিও ভয় করি না কিছু। সব কিছুর জন্য প্রস্তুত আমি।

তাদের দুজনের কথাবার্তার মধ্যে ভীম নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যে কেউ তাকে দেখতে পেল না। অবাক চোখ অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল যুধিষ্ঠিরের দিকে।

যুধিষ্ঠিরের স্বীকারোক্তি দ্রৌপদীকে চমৎকৃত করল। অবাক চোখের বিস্ময়ের নিবিড়তা তার দৃষ্টি সহজ হয়ে আসে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলঃ তোমার জন্য সত্যি দুঃখ হয়। তুমি যদি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে তা-হলে তোমারে চিরতরে অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু অন্যায় করে অনুশোচনা কর, আঘাত দিতে ব্যথা পাও। নিষ্ঠুর হওয়ার আগে আত্মসমর্পণ কর। তাইতো ভাল লাগে তোমাকে। ঝগড়া করে নিজের মনে কষ্ট পাই, তিরস্কার করে বিবেককে ক্ষত-বিক্ষত করি। তবু মনের গ্লানি, দুঃখ ঘোচে না।

অন্ধকার নিশ্চুপ কোন শব্দ নেই। তথাপি নিঃশব্দে অন্ধকারের মাঝখানে তিনটি হৃদয়ে চকিতে শিহরণের তরঙ্গ খেলে যায়। স্বপ্নের মত একটা আচ্ছন্ন ভাব নেমে আসে যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বরে।

দ্রৌপদী, অন্ধকারের জোনাকির মত আমাদের পোড়া বুকের আগুন জ্বলছে আর নিভছে। আত্মা কষ্ট পাচ্ছে বলেই এ যন্ত্রণা আমাদের প্রত্যেকের। কেউ সহ্য করে, কেউ পারে না।

যুধিষ্ঠিরের কথাগুলো দ্রৌপদীর মনকে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাউকে ভাল করে দেখতে পেল না। তথাপি, উভয়েই উভয়ের অনুসন্ধিৎসু নিবিষ্ট দৃষ্টি প্রতি অঙ্গে অনুভব করতে পারছিল। যুধিষ্ঠির কথা বলছিল। সবই নিজেকে বোঝানোর জন্য। স্বগত ভাষণে বলল: সত্যিই আত্মাকে মেরে ফেলা যায় না। সে চেষ্টা করতে গেলে অপমানের বোঝা বাড়ে। তবু, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি। তাই, আত্মগ্লানির দেনা কেবলই বেড়েছে। ভীমকে নিবৃত্ত করব না। তার মন যা চায়, তাই করুক। সমগ্র জীবন ধরে শুধু পাণ্ডবদের মঙ্গল চেয়েছি। ভাইরা আমার কথা শুনে চলেছে। ধর্ম ও সত্যকে মেনেছি। তবু, বিড়ম্বনার অন্ত নেই, দুঃখের শেষ নেই। মানুষের বিষ নিঃশ্বাসে আমাদের জীবনটা শুকিয়ে গেল।

ভীম শশব্যস্ত হয়ে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ডাকল: ধর্মরাজ।

দরদ-মাখানো গলায় যুধিষ্ঠির বলল: দুঃখের প্রহরের শেষ হয় না কোনদিন। রাত্রির মতই সে

অন্ধকারে বিশ্বকে আবৃত রাখে। অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি এগোয় না বলে অজ্ঞাত ভয়, আশঙ্কা জাগে মনে। নিরাপত্তা বোধের অভাব মনকে দুর্বল এবং প্রত্যয়হীন করে। কিন্তু অন্ধকারও সত্য। তারও একটা জীবন আছে। তাকে ভয় করছি বলে, সে আমাদের কাঁদায়, দুঃখ দেয়। দুঃখের অভিজ্ঞানে আজ তাকে চিনলাম। আর ভুল হবে না।

অন্ধকারের মত সকলে মৌন। কেউ কথা বলতে পারল না। স্তব্ধ বিস্ময়ে অন্ধকারের মধ্যে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রত্যেকের চোখের তারা নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করছে। অনেকটা আচ্ছন্নের মত তারা পাশাপাশি হাঁটছিল। কিছুটা পথ একসঙ্গে যাওয়ার পর যে যার কক্ষের দিকে মন্থর পদে অগ্রসর হল।

কক্ষে ফিরে দ্রৌপদী দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। থেকে থেকে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ। আওয়াজটা থেমে থেমে বেশ কিছুক্ষণ অন্তর হচ্ছিল। দ্রৌপদী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। এ সাংকেতিক শব্দ তার চেনা। তবু বিভ্রান্ত সংশয়ে বিচলিত হল। কিছু পূর্বেই ভীম তার কক্ষে ফিরেছে। এখনই সে আসবে; কেন? দুরন্ত ভয় আর উৎকণ্ঠায় তার বুক তোলপাড় করতে লাগল। সাড়াশব্দ দিল না। চুপ করে শুয়ে থাকল। মনে তার হাজার প্রশ্ন।

সহসা চাপা গলায় অস্ফুট স্বরে ডাকল: কৃষ্ণা—আ—

নিমেষে সে বিছানায় উঠে বসল। মন থেকে সব ভয় উৎকণ্ঠায় অবসান হল।

দ্রুতপায়ে দ্বার খোলার জন্য ছুটে এল। সন্তর্পণে খিল খুললে। ভীমের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলল: তুমি!

দ্রৌপদীর বিস্ময়াবিষ্ট জিজ্ঞাসায় অপ্রস্তুত হয় ভীম। জবাব দেবার মত কথা পায় না খুঁজে। পাষাণ মূর্তির মতই নীরব স্থির দৃষ্টি তার। অধীর। বিচলিত অপরাধীর স্বরে বলেঃ তীব্র যন্ত্রণায় তাড়নায়, উন্মনা হয়ে যন্ত্রবৎ তোমার দ্বারে করাঘাতে করেছি। শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। তারপর তোমার নাম ধরে ডেকেছি। বল, অন্যায় কিছু করলাম।

ছিঃ, ও কি কথা। আমি তোমার হৃদয়ের ভালবাসার ভিখারিণী। তুমি ছাড়া অন্য কোন পাণ্ডব আমাকে রক্ষা করবে না। আমার বিপদ অপমানকে একা তুমি নিজের লাঞ্ছনা বলে ভাব। তোমার অন্তর সতত আমার মঙ্গল কামনায় ব্যগ্র। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সংগ্রাম পথের সঙ্গিনী। সে কথা ভাল করে জেনেই এসেছ তুমি। তোমার লজ্জা কিংবা সংকোচের কিছু নেই। দূর্ভাগ্য আমার। শক্তি নেই আমার ভালবাসার আকর্ষণের।

দ্রৌপদীর করুণ নারীর প্রেমস্পর্শে ভীমের হৃদয় দ্রব হল। তার হৃৎপিণ্ডের অণুতে অণুতে দ্রৌপদীর ব্যাকুলতা নিষ্ঠুর আঘাতের মত বাজল। তার অন্তরের ভালবাসা যেন আর্তরব করে উঠল। পৌরুষগর্বে ভীম অস্থির হল। শশব্যস্ত হয়ে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল: দুঃখ কর না পাঞ্চালী। কালই কীচকের শেষ রজনী। তাকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। পাণ্ডবের ভয়ঙ্কর শত্রু সে। তোমাকে নিয়ে সে এক অদ্ভুট কূট ষড়যন্ত্রে মেতেছে। তার সে ইচ্ছা পূরণ হবে না কোনদিন।

বিহ্বল বিস্ময়ে দ্রৌপদীর ভীমের দিকে তাকল। ঘন নীল নয়ন-যুগলে আনন্দ চঞ্চল স্বপ্নাতুর জিজ্ঞাসা নিবিড় হল। বলল—প্রিয়তম, নারী আমি। তোমার কথার মমার্থ উপলব্ধি করতে অক্ষম। কৃপা করে খুলে বল। কি করতে চাও? আমার মত নগণ্যা সামান্য এক রমণীর জন্য পান্ডবদের বিপদ হয় এখন কিছু কর না।

এ তোমার আত্মভিমানের কথা। এক অচল সত্যের অঙ্গীকারের কাছে পাণ্ডবেরা অসহায়। তাই জীবনসঙ্গিনীর প্রতি তাদের যে কর্তব্য বা ধর্ম তা রক্ষা করা হয়নি। এজন্য সকলের চিত্তে অনুতাপানলে নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু সে অনুভূতির প্রকাশ করতে পারছি না বলেই বিভ্রান্তি জমেছে মনে। থাক সে কথা। তোমার কৌতুহলিত জিজ্ঞাসার উত্তর দেব। কীচক বধের উদ্দেশ্যে তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারলে তবেই তাকে হত্যা করা সম্ভব। তোমার চাতুর্যের ওপর নির্ভর করছে সে সাফল্য।

দ্রৌপদীর দুই চোখে মুগ্ধতা। মুখে তার গভীর আগ্রহের ভাব। একটা নতুন প্রত্যয়ে শক্ত হল

মন। ভীমের চোখে চোখ রাখল। উদ্দীপিত কণ্ঠে বলল: বল—আমি করব। নিশ্চয়ই পারব।

ভীমের কোন ভাবান্তর নেই। টানা টানা বিস্তৃত চক্ষু দুটিতে ঔৎসুক্যের দীপ্তি। কথা বলার সময় তার দুই ভুরু কুঁচকে গেল। ভীম কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল: কাল উৎসবের দিন। সুদেষ্ণা তোমাকে কীচকের গৃহে সুরা সংগ্রহ করতে পাঠাবে। সে আদেশ প্রত্যাখ্যান কর না। কীচক তোমাকে পুনরায় প্রণয় নিবেদন করলে হাস্যমুখে তা বরণ করবে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের গোপনীয়তা প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কায় তুমি তার মনোবাঞ্ছা পূরণে রাজী—একথা স্পষ্ট করে তাকে জানাবে। কীচকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে আরো বলবে, এই গোপন সম্পর্ক পাণ্ডবেরা কখনও যেন জানতে না পায়। কীচক তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হবে। তখন তাকে নির্জন নৃত্যশিক্ষার কক্ষে নিশাকালে গোপনে উপস্থিত হতে বলবে।

ভীমের বাক্যে দ্রৌপদী অবাক হল। অসহায়বোধ করল। এক কোন্ নতুন সংকটে ভীম ফেলতে চাইছে তাকে ভেবে পেল না। বুক তার ধুক্ পুক্ করে। জিজ্ঞাসু চোখে ভীমের দিকে তাকাল। চকিতে তার কণ্ঠস্বরে একটা তীক্ষ্ণতা ঝলকিয়ে ওঠল: ভীমসেন, ধর্মরাজের সঙ্গে তোমার তফাৎ-টা কিসে? সেও মর্যাদা বিকিয়ে মানিয়ে নিতে বলেছিল?

ভীমকে অন্যরকম দেখায়। খুব অচেনা মনে হয়। কী করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে তার চিন্তায় আবর্তিত হচ্ছে যেন তার ভেতরটা!

দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসায় ভীম নির্বিকার। কোন মন্তব্য করল না। কঠিন সঙ্কল্পে তার মুখখানি শক্ত এবং নিষ্করুণ দেখাল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল: কীচক তোমাকে পাওয়ার লোভে নৃত্যগৃহে আসবে। আমি তোমার পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে কক্ষে তার অপেক্ষা করব। অন্তরালে আত্মগোপন করে তুমি আহ্বান করবে তাকে। অন্ধকারের মধ্যে দ্রৌপদী ভ্রমে সে আমাকে আলিঙ্গন করে যখন প্রণয় নিবেদন উদ্যত হবে তখন অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে নিহত করব। কেউ জানবে না তার হত্যাকারী কে? লোকে জানবে, অদৃশ্য গন্ধর্বেরা তাদের ভার্যা সৈরিন্ধ্রীকে রক্ষা করতে কীচককে হত্যা করেছে।

দ্রৌপদী অভিভূত। চোখে কোন জিজ্ঞাসা জাগে না, মুখে কোন কথা আসে না। কেবল একটা শঙ্কায় ছায়াপাত করে মনে। একটা নিরুত্তর জটিলতা সৃষ্টি হয় মনের মধ্যে। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যে সংকট দূব হওয়ার কোন আনন্দ অনুভব করতে পারে না। একটা বিহ্বল অনুভূতি তাকে আবিষ্ট করে রাখে দীর্ঘক্ষণ।

দ্রৌপদী আবেগহীন চোখে ভীমের মুখের দিকে তাকায়।

কীচক বধের সংবাদ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত রাণী সুদেষ্ণার অন্তঃস্থল কাঁপিয়ে তুলল। ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যু দুঃখে শোকে অভিভূত করল তাকে। সৈরিন্ধ্রী গন্ধর্ব স্বামীরা যে সত্যি সত্যি কীচককে হত্যা করতে পারে সুদেষ্ণা কখনও কল্পনা করেনি। নারী ধর্ম রক্ষার বর্মরূপে সৈরিন্ধ্রী গন্ধর্বদের নাম উল্লেখ করত। কিন্তু তার স্বামীরা পাহারাদার দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রাসাদে ঢুকল কি করে? রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাদের এই অমানবিক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তাদের এক অভাবনীয় ঔদ্ধত্যের পরিচয়। একে সাধারণ ঘটনা ভেবে তুচ্ছ করতে পারল না। সৈরিন্ধ্রীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে। যোগসূত্র ব্যতীত এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে না। সৈরিন্ধ্রীকে গুপ্তচর ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারল না সুদেষ্ণা। বিরাট রাজের অনিষ্ট করার মতলব তার মনে। কীচক যে মহারাজের প্রিয়পাত্র এবং এ রাজ্যের স্তম্ভ সে তা ভালভাবে জেনে এবং বুঝে তাকে রূপের মায়ায় বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি করে হত্যা করেছে। নইলে, তার মত বীরকে হত্যা করা দুরূহ। সৈরিন্ধ্রী কেন এসেছে? তার আগমনের উদ্দেশ্য কি? এই ভাবনায় তার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হল। মহারাজ করুণাবশত অল্পকালের জন্য কেন নিয়োগ করল তাকে? এই 'কেন' কথাটা তার মনে বারংবার আবর্তিত হতে লাগল। এখনই এর প্রতিকার প্রয়োজন। সৈরিন্ধ্রীর আগমনে পশ্চাতে যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র আছে তাতে কোন সন্দেহ

নেই। হয় তো কীচক বধের উদ্দেশ্যেই এ পুরীতে আগমন তার। মহারাজের দক্ষিণ বাহুটি ছেদন করে, তাকে দুর্বল এবং অসহায় করে কেউ হয়ত সৈরিন্ধ্রীকে দিয়ে বিরাট রাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত। একটা দারুণ শঙ্কা, সংশয়, ও দুশ্চিন্তা তাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল।

সহসা পান-পাত্র হাতে করে সৈরিন্ধ্রী প্রবেশ করল সেখানে। তাকে দেখা মাত্র ক্রোধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল সুদেষ্ণা। আঁখি কোণে জ্বলে উঠল বিতৃষ্ণা আর বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। সমস্ত হৃদয়ে ভেঙে দিয়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হল তার অন্তঃকরণ। বলল: বিশ্বাসঘাতিনী, প্রতারিকা, সর্বনাশিনী নারী! তোর জন্যে আমার ভাই-এর মৃত্যু হল। তোর গন্ধর্ব স্বামীরা তাকে হত্যা করেছে। আমার রাজ্যের ত্রিসীমানায় তোর আর থাকা চলবে না। তোর দর্শন পাওয়া মাত্রই তোকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। অথবা, তোর মত কুলটার স্বামীদের ছিন্নমুণ্ড যদি কেউ আমাকে উপহার দেয় তাকে আমার বক্ষের এই রত্নহার দেব।

সুদেষ্ণার বিক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বালাময়ী ভাষা সৈরিন্ধ্রীর মনে নানা মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তিরস্কারের অসংযত অপমানকর ভাষা তার অন্তঃকরণের প্রাণান্তক শেলের ন্যায় বিদ্ধ করল। এক গভীর হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সৈরন্ধ্রী বললঃ মহারাণী, এ অপরাধ তো আমার নয়। এ আপনার ভ্রাতার। তাকে অকপটে সব বলেছি। বারংবার সতর্ক ও সাবধানও করেছি। তবু, কামোন্মত্ত যুবক শোনেনি, মানেনি আমার কথা। তাদের তুচ্ছ করে, সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়ে আমার সঙ্গে সে মিলতে চাইলে, ক্ষুব্ধ স্বামীরা তার স্পর্ধার শাস্তি দিয়েছে। আমি অসহায়।

সুদেষ্ণা বিলাপ করে বলল: হায় সৈরিন্ধ্রী তুমি জান না, আমরা কি হারালাম! আমাদের সে দুর্ভাগ্য দেখার আগে তোমাকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করব।

সুদেষ্ণার ভয়াবহ সিদ্ধান্তে দ্রৌপদী বিচলিত হল না। নির্ভয়ে বলল: মহারাণী আপনি এ অভিলাষ ত্যাগ করুন। গন্ধর্ব স্বামীদের সতর্ক দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ। অনর্থক কয়েকটি জীবন অকালে প্রাণ হারাবে। আমার কথা তুচ্ছ করলে আপনাকে পুনরায় অনুতাপ করতে হবে।

সুদেষ্ণা চিন্তার দ্বন্দ্বে বিমূঢ় হল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। অবাক নয়নে অপলক তাকিয়ে থাকে তার চোখের দিকে। আচ্ছন্ন অবস্থায় বলল: কীচক বধের পর আর তোমাকে আমার ঘরে স্থান দিতে পারি না। আরো কত বিপদ হয়ত ডেকে আনবে তুমি। আমার চোখের সামনে থেকে এখনি দূর হও।

সুদেষ্ণার বাক্যে বিচলিত হল সৈরিন্ধ্রী। আশ্রয়হীন হওয়ার দুর্ভাবনায় হঠাৎ তার মুখখানি অন্ধকার। হয়ে গেল। হতাশ কাতর কণ্ঠে শুধালঃ মহারাণী, আমার জীবনটা সব কেমন প্রহেলিকার মত। মাঝে মাঝে আমিও অবাক হয়ে যাই। তবু, সব কথা বলার সময় হয়নি এখনো। আমার স্বামীদের শাপমুক্তি হতে আর মাত্র ত্রয়োদশ দিন বাকি। এই ক'টি দিন অনুগ্রহ করে আমাকে আশ্রয় দিন। আপনার মতই এক নারী আমি। এই মুহূর্তে ভীষণ অসহায়। আশ্রয়হীন অভাগিনীকে করুণা করে আরো কিছু দিন আশ্রয় দিন। আমাকে দিয়ে আপনাব কোন অনিষ্ট হবে না। শাপমুক্তির পর গন্ধর্ব স্বামীরা বিরাট রাজের বন্ধু হবে।

সুদেষ্ণা নীরব। কিন্তু তার আকুল আবেদনে এমন এক অসহায়তা প্রকাশ পেল যা সুদেষ্ণার নারী অন্তর স্পর্শ করে গেল। তার হৃদয় সহানুভূতিতে দ্রব হল। বুকের মধ্যে অনির্দিষ্ট ক্ষোভ, ভ্রাতার বর্বরতা, গন্ধর্বদের রোষ, রমণীর অসহায় করুণ নিবেদন সব মিলিয়ে তাকে বিহ্বল করল। আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে সে শুনতে লাগল সৈরন্ধ্রীর মিনতি।

মমতাশূন্য হয়ো না রাণী। মমতা, দয়া, সহানুভূতি, করুণা নারীর কল্যাণীরূপ। তাকে ত্যাগ করলে রমণী রমণীয় হয় না। দীন জনে দরদী হয়ে তাকে করুণা করা রমণীর ধর্ম। মহারাণী আপনি সে ধর্ম বিসর্জন দেবেন কেন? কার জন্যে ত্যাগ করবেন? আপনাকে রক্ষা করা যদি মহারাজের ধর্ম হয়, তা-হলে সৈরিন্ধ্রীর ধর্মনাশ থেকে বাঁচানোর জন্যে তাঁর স্বামীরা অপরাধী হবে কেন? দুষ্কৃতকারী কেন পাবে না তার শাস্তি? কীচক আপনার ভাই হলেও সে দুষ্কৃতকারী। একজন সাধারণ প্রজা যদি এ অপরাধে অপরাধী হত তাহলে শাস্তি পেত সে। মহারাণীর ভাই বলে যদি ক্ষমা পায় তা'হলে

দুর্নাম হবে মহারাণীর। রাণী আপনি নিষ্ঠুর হোন কিন্তু অত্যাচাবী হবেন না। আমাকে বিতাড়িত করা মানে একটা অন্যায় এবং জঘন্য অপরাধকে মেনে নিয়ে আমার ওপর অবিচার করা। এ'তো অত্যাচারের সামিল। নারীর প্রতি পুরুষের এই বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেয়া একজন নারীর কখনও শোভা পায় না। নারীর কলঙ্ক, নারীর লজ্জা, অপমান, যন্ত্রণা, নারী যেমন বোঝে অন্যে সেরকম অনুভব করে না। একজন সামান্য নির্যাতিতা, অপমানিতা নারী হয়ে আর এক নারীর কাছে সহৃদয় করুণা এবং সমবেদনা প্রার্থনা করছি। গন্ধর্ব স্বামীদের শাপমুক্ত হতে আর মাত্র ত্রয়োদশ দিন বাকি। এই কয়দিন আমায় আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন।

সৈরিন্ধ্রী বাক্য মন্ত্রের মত কাজ করল। এই মুহূর্তে সুদেষ্ণার মস্তিষ্কে অন্য কোন চিন্তা আসে না। সৈরিন্ধ্রীর করুণ মুখখানি চোখের উপর ভাসে। বাস্তবতা তাব অন্তর এক আশ্চর্য অনুভূতি জাগায়। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিঃশব্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল দ্রৌপদীর।

।। দশ ।।

অবশেষে অজ্ঞাতবাস নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল।

রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিরাটের মন্ত্রণাকক্ষে স্থির হল কৌরব রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ শেষবারের মত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাবে। সে কথা শুনে চমকে ওঠে দ্রৌপদীর সমস্ত আশা। মনে হল, ধর্মরাজ যেন প্রবল বিদ্রূপ করল তাকে। বেদনাময় অভিশপ্ত জীবনের আরো একটি সংযোজন যেন হল। লাঞ্ছনা, অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে দুঃসহ দুঃখের দহনে পুড়ে পুড়ে প্রতিহিংসার অনল জ্বালিয়ে রেখেছে বুকে। সে সব জেনেও কি যুধিষ্ঠির সন্ধিতে পক্ষপাতী হচ্ছে। দারুণ হতাশায় ভেঙে পড়ল সে। মনের মধ্যে অস্থির উত্তেজনায় নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে তার গৃহে আমন্ত্রণ কবে আনল।

স্তব্ধ কক্ষ! নীরবতা থমথম করছিল।

ভয়ে ভয়ে যুধিষ্ঠির পা রাখল কক্ষে! দুরু দুরু বুকে ডাকল: দ্রৌপদী! দ্বিধা দ্বন্দ্বের পীড়ায় তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল!

দ্রৌপদী নিরুত্তর। সঘন নিশ্বাসেব পতন শব্দ শোনা গেল!

যুধিষ্ঠিরের চোখে নিষ্পাপ সরলতা। মুখে সত্যনিষ্ঠার দৃঢ়তা। অধরে স্মিত হাসি। প্রসন্ন কণ্ঠে বলল: অসময়ে স্মরণ করে কৃতার্থ করলে আমায়।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় দ্রৌপদীর চিত্ত অস্থির হল। অসহায় নারীর সুতীব্র আত্মাভিমান মৃত্যুর মত আর্তরব করে কেঁদে উঠল। ক্রোধোদীপ্ত কণ্ঠে বললঃ কৌরব-সভায় কৃষ্ণকে পাঠিয়ে কি অভীষ্ট সিদ্ধ করতে চাও তুমি? তোমার কি উদ্দেশ্য? বারংবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে কাপুরুষেরা। পান্ডবদের শৌর্যবীর্যের গৌরব হানি করে দুর্যোধনের কৃপা গ্রহণ করতে তোমার লজ্জা কবে না? ঐ মুখ দেখাতে পাঞ্চালীকে লজ্জা করছে না?

যুধিষ্ঠির নির্বাক। মুখ তার বিবর্ণ মলিন। দৃষ্টি বেদনায় বিষণ্ণ।

দ্রৌপদীর ক্রোধোদীপ্ত দু'নয়ন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। কণ্ঠস্বরে তার ধিক্কার, ঘৃণা, বিদ্রূপেব অভিব্যক্তি। ছিঃ, শপথ বিস্মৃত হতে পারলে? পাঞ্চালীব বস্ত্রহরণের লাঞ্ছনা, ভীমের প্রতিজ্ঞা, অজ্ঞাতবাসের দাসত্ব এ সব মূল্যহীন হয়ে গেল? বনবাসের দিনগুলিতে নির্জনে নিভৃতে কণ্ঠলগ্ন হয়ে কতবার বলেছ, আমায় হৃদয় জ্বালা জুড়োতে যদি হস্তিনাপুর পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবু তা কববে তুমি। সে কি তবে কামুক পুরুষের নির্লজ্জ প্রগলভতা?

যুধিষ্ঠিবের ভুরু কুঁচকে যায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। অনেকটা গম্ভীরভাবে প্রতিবাদের সুরে বলে: দ্রৌপদী, অদৃষ্টের নির্দেশে মানুষ কাজ করে। যা ঘটবার তাই ঘটবে। পুরুষকার প্রেম, বীবত্ব এসব দিয়ে ভাগ্যের গতি বোধ করা যায় না। ভাগ্য শক্তিমান। সে নিজের নিয়মে চলে।

তা হলে, তুমি তার গতিপথ আটকে দিচ্ছ কেন? অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যের সঙ্গে সন্ধি করে লাভ কি?

বিষণ্ণ করুণ হাসি যুধিষ্ঠিরের অধরে। বললঃ তোমার অপমান, তোমার কান্না বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়। তোমার কান্নার ঋণ অনেক রক্তের মূল্যে শুধতে হবে বসুধাকে। পারবে সহ্য করতে? সে যে তোমার কান্নার চেয়েও ভয়ঙ্কর দ্রৌপদী!

আমি জানি সে পরিণাম। যুদ্ধ মানেই জয়-পরাজয়ের খেলা।

যুদ্ধ মানে ধ্বংস।

সে কথা জেনেও ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে। মৃত্যুর ভয়ে সে যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হয় না। নির্ভয়ে হাসিমুখে প্রাণ দেয় যুদ্ধে। মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে নিজেকে। তবু সে নিজেকে আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কেন জান? মৃত্যুর পর প্রত্যেকে চায় তার পরিচয় থাকুক পর প্রজন্মের কাছে। কিন্তু পাণ্ডবেরা আগামী দিনের মানুষেরা কাছে কী পরিচয় দেবে? ভীরু? কাপুরুষ? তোমাদের পুত্রেরা পিতার কী পরিচয় নিয়ে আত্মশ্লাঘা করবে? তাদের সে অপমান, সে লজ্জা আমি সইব কেমন করে? তার চেয়ে রক্তে রাঙানো মৃত্যু, ধ্বংস অনেক ভাল।

দ্রৌপদীর বাক্যে যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হল। বিব্রত কণ্ঠে বললঃ তুমি কেন বুঝতে চাও না, কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষ সাধারণ যুদ্ধ নয়। এ এক ভয়ংকর মহারণ। সমগ্র ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ এ থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

যুধিষ্ঠিরের উক্তি শুনে দ্রৌপদীর ভ্রূকুটি চোখের কোণে অর্থপূর্ণ একটা সূক্ষ্ম হাসি ফোটে। বিদ্রূপ মেশানো সে হাসি! অপলক চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে বলল: মরজীবনই সত্য। পরিচয়হীন আত্মবিলুপ্তি কোন মানুষের কাম্য নয়। পর প্রজন্মের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকা মানুষের সাধারণ প্রবণতা। কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষ করুণাহীন এক বীভৎস প্রতিহিংসার অক্ষয় স্মৃতি যদি হয়ে থাকে— মন্দ কি! আগামীকালের মানুষ এ থেকে নতুন পাঠ গ্রহণ করবে। এই অমরত্বের মূল্য কম কিসে?

অশ্রুভেজা করুণ আঁখি মেলে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: না, না দ্রৌপদী পারি না আমি। আমাকে মার্জনা কর। ব্যক্তিগত ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য বৃহৎ গণ-স্বার্থ বিপন্ন করার কোন অধিকার নেই আমার।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দ্রৌপদী বলল: গণস্বার্থ বিপন্ন করেছে দুর্যোধন। তোমার যুদ্ধ অধর্মের সঙ্গে ধর্মের, অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের, মিথ্যার সঙ্গে সত্যের। সভ্যতার ঊষাকাল থেকে চলছে এ লড়াই। এদের কখনও সন্ধি হয় না।

যুধিষ্ঠির শুধু চমকায় না, অবাক বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। দ্রৌপদীর যন্ত্রণাজর্জর আর্তরব যে কত গভীর মর্মান্তিক তা অনুভব করে। তবু নঙর্থকভাবে মাথা নাড়ল।

দ্রৌপদীর উত্তোলিত মুখ যুধিষ্ঠিরের চোখে চোখে স্থির। বললঃ ধর্মরাজ, দুর্যোধনকে ভুলো না। যুদ্ধ করে সে তোমার রাজ্য সিংহাসন জয় করেনি। বিশ্বাসঘাতকতা করে গ্রাস করেছে সব। অধর্মের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ধর্মই তোমার শক্তি। তুমি ভীত হচ্ছ কেন?

তারপর, যুধিষ্ঠিরের আরো ঘন হয়ে দাঁড়াল। ডাগর কাজল চোখে তার বিষণ্ণ বেদনার ঘন কালো ছায়া। সহসা যন্ত্রণামথিত দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল ব্যাকুল আর্তি। বলল: সারাজীবন ধরে লুকিয়ে রাখা বেদনা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমি আর পারছি না। মনে আমার সর্বগ্রাসী বহ্নি। এ আগুনে তুমি আমি পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব। বলতে বলতে তার গলার স্বর হারিয়ে যায়। রুদ্ধতাকে গ্রাস করে আকুল কান্নার রব।

যুধিষ্ঠিরের আত্মবিস্মৃতি হয়। সম্মোহিতের মত নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল: তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটে, মন পোড়ে, প্রাণ কাঁদে। আমি নিষ্ঠুর নই। তোমার প্রাণের জ্বালা যে প্রাণের মূল্যেই পরিশোধ হবে এ আমি জানি। যুদ্ধ আমাদের অদৃষ্টের লিখন। তবু, আগামীকালের মানুষের কাছে আমরা যাতে অপরাধী না হই সেজন্য এই চেষ্টা। বাস্তব ফল তার যাই হোক। এটুকু করতে আমায় বাধা দিও না।

দ্রৌপদী ফুঁপিয়ে ওঠার মত আর্তনাদ করল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, যুধিষ্ঠিরের মত স্বার্থপর, ভীরু, লোভী মানুষটার জন্যে তারা সারাজীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

প্রিয় সখি।

চমকে ফিরে তাকাল দ্রৌপদী। স্মিত হেসে বলল: তবু ভাল, মনে পড়ছে সখীকে তোমার।

কৃষ্ণের মুখে পরিচিত রহস্যময় হাসি। মধুর কণ্ঠে বলল: অটল প্রতিজ্ঞায় বন্দী ধর্মরাজ। তাইতো বৃথা ক্ষোভ জানাতে আসিনি সখি।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল দ্রৌপদীর। অবসন্ন কণ্ঠে বলল: মাঝে মাঝে আমিও ক্ষেপে যাই তার উপর। ধর্মরাজের দ্বিধা, ভীরুতা আমাকে অসহিষ্ণু করে। তবু তার সত্যরক্ষার জন্যে নিজেও দুঃখের তপস্যা করছি। কিন্তু কি লাভ হ'ল এই কৃচ্ছসাধনে?

করুণাসুন্দর নয়ন মেলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বলল: সখি, তোমার তপস্যা ব্যর্থ হয়নি। তোমার ঘনসান্নিধ্য তাদের মনে জ্বেলেছে প্রতিশোধের আগুন। তোমাকে সুখী করাই ছিল পাণ্ডবদের সুখ-স্বপ্ন বিলাসিতা। ধর্মরাজ উন্নতমানের অস্ত্রসংগ্রহ করতে পাঠাল অর্জুনকে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে তোমার লাঞ্ছনা অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। এটা কি তাঁর কম আয়োজন।

তবে, কেন সন্ধির প্রস্তাব?

যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ হতে এখনও কিছু বাকি ছিল। তাই, কালহরণ করতে হল সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে। সন্ধির নাম করে কালহরণ করা এবং শত্রুকে বিভ্রান্ত করা এক সমর কৌশল। তুমি শুনে খুশি হবে, কৌরবেরা সন্ধির সর্বশেষ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে।

দ্রৌপদীর মুখে হাসি ফুটল। উৎফুল্ল হয়ে বলল: তোমার কথা সত্য হোক সখা। এ বুকে বড় জ্বালা। দুঃশাসনের বক্ষরক্তে কেশদাম যতদিন সিক্ত না হচ্ছে, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ প্রত্যক্ষ না করছি, কর্ণের নিবীর্যের মত মৃত্যু বরণের সংবাদ না পাচ্ছি ততদিন এ অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে না।

প্রসন্ন কৌতুক দৃষ্টি মেলে কৃষ্ণ তাকাল দ্রৌপদীর দিকে। শান্ত কণ্ঠে বলল: তোমার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ হবে। এ কৌরবদের বিধিলিপি।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল দ্রৌপদীর। শশব্যস্ত হয়ে বলল: সখা, বাঁচালে আমায়। বহুকাল পরে, একটা পাষাণভার নামল বুক থেকে।

চির অভ্যস্ত রহস্যময় হাসিটি কৃষ্ণের অধরে বর্তুল হল। পর্বতের মত শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর হল সে। প্রশান্ত নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন তার মুখমণ্ডল। শূন্য উদাসদৃষ্টির মেলে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, বিধির বিধান কে পারে লঙ্ঘিতে? তুমি আমি সকলে সে কালচক্রের অধীন। মহাকালের রথচক্রতলে আমরা সকলেই নিষ্পেষিত হব। বলতে বলতে কৃষ্ণের দুই চোখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। কথা বন্ধ হয়ে গেল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মানুষের পর মানুষ মরছে। বহু মা'র কোল শূন্য হচ্ছে। কত নারী পতিহীন হল, সন্তান পিতৃহীন হল—তার ইয়ত্তা নেই। তবু যুদ্ধ থামছে না। ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠল যুদ্ধ।

শোকের সমুদ্র হল কুরুক্ষেত্র। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। শান্তি নেই দ্রৌপদীর মনে। অভিমন্যু, ঘটোৎকচের মৃত্যু তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাদের কাতর আর্তরব, যুদ্ধের কোলাহল, রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ, অস্ত্রের ঝংকার সব মিলিয়ে তার স্নায়ু মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ও আর্তি তাকে আকুল করল। কিছুতে ভুলতে পারে না শূন্যতা। বুকের মধ্যে তার হাহাকার। নিস্পন্দন ঘরের দেয়ালগুলো তার শোককে ব্যঙ্গ করে। নিজেকে তার প্রতিহিংসাময়ী এক ভয়ঙ্কর রাক্ষুসী মনে হয়। তার রোষের আগুনে হয়ত এ পাণ্ডব বংশও জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ঘরে এক মুহূর্তে তিষ্ঠোতে পারে না দ্রৌপদী। পাগলের মত ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। আর নীরবে

অশ্রুমোচন করে। মনের অন্তঃস্থল থেকে বুক খালি করা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে ঘন ঘন। বেদনার্ত সকরুণ দুটি চোখ মেলে সরসীর জলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে—এ কোন্ সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে পাণ্ডবদের? ভাগ্যের হাত ধরে কোন্ অজানা ভবিষ্যতে সে পাড়ি দিয়েছে? যুদ্ধে-কোন্ অমরার সন্ধান পাবে সে?—ভাগ্যের হাতে মানুষ পুতুল। শৌর্য-বীর্য দিয়ে মরণজয়ী যুদ্ধ কবে বীরের গৌরব খ্যাতি অর্জন করতে পারে। কিন্তু বিরূপ ভাগ্যকে জয় করবে কি দিয়ে? পুরাণেব দেবতারাও পারেনি। অবশ্য, নিয়তির শেষ কৌতুকে ধ্বংস হয়েছে অসুরেরা। কারণ জীবন মহান। মহত্ত্বের সন্ধান বীর্যের আহ্বানে হয় সার্থক। সারা জীবন ধরে পাণ্ডবেরা সত্যকে অন্বেষণ করেছে, ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছে জীবনে। তা-হলে ভাগ্য কেন বিরূপ হবে তাদের?—এই প্রত্যয়ই দ্রৌপদীর দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু বেশিক্ষণ সে ভাবনা স্থায়ী হয় না। অনুশোচনা, দুঃখে তার প্রাণ হাহাকার কবে ওঠে। তুচ্ছ ক্রোধ, ক্ষুদ্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উন্মাদনা বালক অভিমন্যু এবং তরুণ ঘটোৎকচের মৃত্যুর জন্য দায়ী এ দুঃখ সে ভুলবে কি করে? বরং তীব্র অনুশোচনায় সে অনুভব করে বীর বালকেরা আত্মদান কবে যেন তাদের জননীর পাপের ঋণ শোধ করে গেছে। এই অনুভূতি তার দুঃখকে আবো বাড়িয়ে দেয়। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী, পাপী মনে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার জন্যই হয়েছে। তার জেদ, তার প্রতিহিংসা, ক্রোধ, এ যুদ্ধের অন্যতম কারণ। তাই দিবারাত্র সে বিড় বিড় কবে বলে, প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলেছি বুকে। পাপ করেছি। আগুনে পুড়ে পুড়ে সে পাপ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই। সর্বসংহারী আগুনের মর্মদাহী জ্বালা এখনও ভোগ করতে হবে। এ হল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অদৃষ্টেব লিখন।

বেলা শেষের সূর্যের দিকে মুখ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্রৌপদী। বহু দূর থেকে যুদ্ধের অস্পষ্ট কোলাহল, মুমুর্ষ মানুষের কাতর আর্তরব, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ, আহত পশু ও মানুষের করুণ চীৎকাব তার কানে যাচ্ছিল। কিন্তু তার প্রতি মন ছিল না তার। এক ভয়ংকর ভাবনায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল তার চিত্ত। দুনিয়াকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কত চেষ্টা না করল ধর্মরাজ আর পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ। কিন্তু পারল কি? আসলে সব মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মৃত্যুর পর এ পৃথিবীতে কি থাকবে আর থাকবে না, তার বংশধরেরা কি পাবে আর পাবে না—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, তাই পৃথিবীটা এমন কবে জাহান্নামে গেল। শুধু আমি আর আমি। স্বার্থপরতাব বিষে নীল হয়ে গেছে পৃথিবী। সংক্ষুব্ধ মহাকাল তাই সৃষ্টির ওপর ক্ষেপে গিয়ে যেন সংহারে মেতেছে। ধ্বংস। ধ্বংস চান তিনি। কৃষ্ণ হয়ত সেইজন্য বলেছে: মহাকালের রথচক্রকালে আমরা সকলে একদিন নিষ্পেষিত হব। কারো মুক্তি নেই, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। নিজের মনে উচ্চারণ করল, মানুষ ভাগ্যের পুতুল। সেই পুতুল নিয়ে খেলা হচ্ছে। কে জানে কার ভাগ্যে কি আছে? এক বিমর্ষ ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল সে।

যুদ্ধের ষোল দিন হয়ে গেল।

কর্ণ, দুঃশাসন, দুর্যোধন এখনও জীবিত। তাদের কথা মনে হলে দ্রৌপদীর সর্বশরীর ক্রোধে, ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে। দুঃখ-শোকের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়া মনে প্রতিহিংসার আগুন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। এই তিনটি লোককে সে কিছুতে ক্ষমা করতে পারে না। এদের পাপে হাজার হাজার মানুষ মরেছে। এদের লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা এই যুদ্ধের কারণ। পাণ্ডবদের জীবনে এরা তিন রাহু। এককালে তাদের পাণ্ডব বিদ্বেষ এবং পাঞ্চালী আসক্তির জন্য অনেক লাঞ্ছনা, অপমান সইতে হয়েছে তাকে। সেদিনকার সব লাঞ্ছনার, যন্ত্রণার উপশম হবে তাদের নিধনে। যুদ্ধান্তে সে সংবাদ শোনার অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু প্রতিদিন তাকে হতাশ হতে হয়। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দারুণ দুঃখের মধ্যেও ঝাপটের পর ঝাপটা তুলে তাকে অস্থির কবে, ভীমসেন ব্যর্থতার লজ্জায় মুখ ঢেকে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে।

কিন্তু সেদিন ভীম ফিরল সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে। তাকে আহত মনে করে দ্রৌপদী তার সেবায় ছুটে এসেছিল। কিন্তু ভীমের অট্টহাসিতে চমক ভাঙল। মুখে, গ্রীবায়, দন্তে, ওষ্ঠে, জিহ্বায় তার রক্ত। পাগলের মত হাসছে সে। রক্তমাখা দু'খানা হাত দেখিয়ে বলল: দুঃশাসনের রক্ত। তার ফিন্‌কি

দেয়া রক্তে হোলি খেলেছি। দু'হাত কোষবদ্ধ করে তৃপ্ত শোণিত পান করে বুকের তৃষ্ণা মিটিয়েছি। পাঞ্চালী! প্রতিশোধ নিয়েছি। প্রতিশোধ! পান্ডব ভার্যার অপমান, ইজ্জত হানির প্রতিশোধ। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ বধের খল নায়কের শোণিত সারা অঙ্গ সিক্ত করে পুত্র শোকের জ্বালা জুড়িয়েছি। আজ কি আনন্দ আমার! কি আনন্দ—! এবার এই রক্তমাখা হাতে তোমার কেশ রাঙিয়ে আমার সত্য রক্ষা করব। পাঞ্চালী, কাছে এস।

রক্তমাখা ভীমের বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদী আঁৎকে উঠল। অ্যাঁ! অ......এক ভয়ার্তরব তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হল । ভয়ে তার দুই চোখ ঠিকবে বেরিয়ে এল যেন। ভীমের পাশব নিষ্ঠুরতায় দ্রৌপদীর অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠল, সভয়ে দুই পা পিছিয়ে যেতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। দাঁতের ওপর আঙ্গুল রেখে সভয়ে আর্তরব করল—অ্যাঁ! আ-আ—না, আমি এ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তোমাকে দেখতে চাইনি। তুমি সরে যাও আমার সামনে থেকে। আমি সইতে পারছিনা। আমার মাথা ঘুরছে। পা টলছে বলতে বলতে সে মূর্ছিত হয়ে টলে পড়ল ভীমের বুকের ওপব।

ক্রোধ, ঘৃণার লাভাস্রোত মুখ দিয়ে আর উদ্গীরণ হয় না দ্রৌপদীর। চোখের জলে তার বুকের আগুন নিভে গেছে, শোকে-দুঃখে মুখ তার বন্ধ হয়ে গেছে। শিলার মত স্থির, শান্ত, স্তব্ধ সে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের এই মৃত্যু, এই রক্তপাত, শোক, তাপ সব তার সর্বংসহা রূপের জন্য ঘটেছে ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে করে। মনে হয় এই যুদ্ধের সব পাপ তার। তারই দুঃখের সহানুভূতি, সমবেদনা জানাতে ভীম, ভাই-এর রক্ত পান করেছে, অন্যায় যুদ্ধে ভাই হয়ে ভাইকে আঘাত হেনে হত্যা করেছে। অর্জুনও যুদ্ধ-নীতি লংঘন করে ভাইকে বধ করেছে, কৃষ্ণ সত্যভঙ্গ করে অস্ত্রধারণ করেছে। ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির সত্য গোপন করে নিজের নামকে কলংকিত করেছে। এসব চিন্তায় অহরহ তার মন কষ্ট পায়। সঘন নিঃশ্বাসে ঘন ঘন আন্দোলিত হয় বুক। একটা অপরাধী মন সর্বক্ষণ তাকে কুরে কুরে খায়।

অশ্রুভেজা চক্ষু দুটি তার স্থির দক্ষিণ শ্মশান দিকে। অন্ধকাবে সারি সাবি অসংখ্য চিতা জ্বলছে। সদ্য নিহত বীর দুর্যোধনের চিতাও জ্বলছে তাদের পাশে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার আলোয় রাঙা হয়ে গেছে চার দিক। শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে দ্রৌপদী। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে। দৃষ্টিতে নির্বাক জিজ্ঞাসা। চিতা নয়-ও অগ্নিকটাহে যেন পুড়ছে এক অতৃপ্ত পিপাসা। করুণার বেদনায় তার দুই চোখ ছল ছল কবে উঠল। নিজের অজান্তে দুফোঁটা জল পড়ল তার জন্যে। বিস্মিত হল দ্রৌপদী। দুর্যোধনের জন্য চোখে জল? ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু হাসতে গিয়ে বুকের মধ্যে তার বিরাট শূন্যতা হাহাকার করে উঠল। একটা তীব্র ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। কষ্ট করে হাসল। কিন্তু উদ্গত হাসিতে তার ককিয়ে ওঠা কান্নার আর্তরব। সুখ-দুঃখের কোন পৃথক অনুভূতি দ্রৌপদীর মনে নেই। নিষ্ঠুর মৃত্যু সব একাকার করে দিয়েছে। দুঃখ হাহাকার কান্না তার কাছে এখন বাস্তব সত্য।

প্রভাতে পাণ্ডব শিবিরে প্রহরীদের আকস্মিক আর্তক্রন্দন এবং চিৎকার শুনে পঞ্চপাণ্ডব চমকে উঠল। নানা আতঙ্কিত সংশয়ে এবং জিজ্ঞাসা নিয়ে তারা সেখানে এল। প্রহরীরা অভাবনীয় ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পাষাণমূর্তির মত স্তব্ধ ভীরু চোখে তাদের দ্বিধা-সংকোচ, কাঁপা কাঁপা ঠোঁট, কথা বলার শক্তি নেই। চোখ ফেটে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছিল। তাদের এরকম নির্বাক নিশ্চল অবস্থা দেখে পাণ্ডবদের বঞ্চনার কষ্ট, দুঃখের আর্তি প্রগাঢ় হল। একটা মারাত্মক ভয়, আতঙ্ক এবং অস্থিরতা নিয়ে তারা পাঁচভাই শিবির মধ্যে প্রবেশ করল। এমন এক চরমক্ষণে কোথা থেকে সংবাদ পেয়ে দ্রৌপদীর আবির্ভূত হল। বিস্ময়ে হতচকিতে হল তারা। ত্রিভুবনের সমস্ত বিস্ময় যেন জমাট বদ্ধ হয়ে তাদের চেতনার বিন্দুতে কঠিন শিলাখণ্ডের মত আঘাত করল। হায় হায় করে উঠল তাদের অন্তর। চোখের সামনে দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্রের ছিন্ন শির, রক্তাপ্লুত দেহ শিবিরের ধূলিতলে স্থির। মুহূর্তের মধ্যে এক নিদারুণ ভয়াবহ করুণ দৃশ্যের সূচনা হল। শোকার্ত বুকফাটা আর্ত চিৎকারে

সে পঞ্চপুত্রের শবদেহের উপর পড়ে আথালি-পাথালি করতে লাগল। পুত্র শোকাতুর জননী দ্রৌপদী করুণ কণ্ঠে বিলাপ করে বলতে লাগল: হায়রে অদৃষ্ট এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন? হা-পুত্র, আমার পাপে তোদের প্রাণ দিতে হল। তোদের শিরে আঘাত হানার আগে, ঘাতক কেন আমার প্রাণ বধ করল না? কেন? আমি জননী নই পুত্র, আমি রাক্ষসী। এত রক্তপান করেও আমার তৃষ্ণা মেটেনি। উঃ! বুক আমার জ্বলে গেল। ধর্মরাজ, আরো রক্ত। আরো রক্ত চাই। বল স্বামী, সব হারিয়ে আমি কী নিয়ে থাকব? আমার দুঃখের সান্ত্বনা কী রইল? অবলম্বন কোথায়? সব হারানো, সব খোয়ানো অভিশপ্ত জীবন আমার? অনেকক্ষণ ধরে একটা আ-আ আর্তস্বর তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হল। তারপর পঞ্চপাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলল নরশোণিত লোলুপ, হিংস্র নেকড়ের নির্মম নিষ্ঠুরতার কি শাস্তি তোমরা দেবে? বৃকোদর, তোমার লৌহ মুদগর পুত্রহন্তার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সক্ষম হবে না?

যুধিষ্ঠিরের কোলে মুখ গুঁজে দ্রৌপদী ফুলে ফুলে কাঁদছিল। প্রিয়-ভার্যার কান্নায় মিশল তার নিজের চোখের জল। মরমী মনের ভাষার তার দুঃখকে সান্ত্বনা দিয়ে যুধিষ্ঠির বলল: দ্রৌপদী আমাদের জীবনটা এক বিয়োগান্তক নাটক। সারা জীবন ধরে আমরা শুধু নব নব দুঃখই পেলাম। তাই তো বিজয়ী পাণ্ডবের সঙ্গে বিধাতার শেষ নিষ্ঠুর কৌতুক।

স্খলিত কম্পিত ভেজা গলায় দ্রৌপদী বলল: পুত্রেরা মৃত্যু দিয়ে শোধ করল আমার প্রতিহিংসার ঋণ। স্বামী, প্রতিহিংসার মূল্য দিতে হয় মানুষকে, পৃথিবীকে। আমার পুত্রেরাও জননীর লজ্জা বাঁচাতে, পৃথিবীর মান রাখতে নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে শুয়েছে। ওরা এখন শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।
